Contents
তাবি'ঈদের
জীবনকথা
প্রথম খণ্ড
ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

তাবি'ঈদের জীবনকথা

[প্রথম খণ্ড]

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-842-015-0 Set

প্রথম প্রকাশ
রমজান ১৪২৩
কার্তিক ১৪০৯
নভেম্বর ২০০২

প্রচ্ছদ
হরফ ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

নির্ধারিত মূল্য : একশত দশ টাকা মাত্র

Tabieeder Jibankatha (Vol. I)
Written by Dr. Muhammad Abdul Mabud and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Masjid Campus Dhaka 1000 First Edition November 2002 Price Tk. 110.00 only.

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

ঈমানী শক্তি, দীনী আবেগ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং জ্ঞান ও কর্মগত সেবার দিক দয়ে ইসলামের রয়েছে তিনটি ধারাবাহিক 'খাইরুল কুরূন' তথা সর্বোত্তম যুগ। আর তা হলো সাহাবা, তাবি'ঈন ও তাবি'-তাবি'ঈনের যুগ। এ তিনটি যুগ বা সময়কালে মুসলিম জাতি দীন চর্চা, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ, পার্থিব সৌভাগ্য ও সফলতার চূড়ায় পৌঁছে যায়। এর পরে যে উন্নতি ও উৎকর্ষ মুসলমানরা অর্জন করে তা ছিল কেবল সভ্যতারূপী প্রাসাদের বাহ্যিক শোভা ও অলঙ্কার।

এই তিনটি যুগ তথা পর্যায়ের দ্বিতীয়টি হলো তাবি'ঈন-এর যুগ। 'তাবি'ঈন' আরবী শব্দ। এটি বহুবচন, একবচনে 'তাবি'ঈ'। মূল ধাতু ت - ب - ع, অর্থ : অনুসরণ করা, পরে আসা ইত্যাদি। আর 'তাবি'ঈ' শব্দটি কর্তৃবাচক বিশেষ্য, যার অর্থ অনুসরণকারী, পরে বা পিছনে আগমনকারী। যেসব মানুষ রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকালে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু কোন কারণে ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত থেকে যান। তবে তাঁর কোন সাহাবীকে দেখার সুযোগ লাভে ধন্য হন। তেমনিভাবে যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর জন্মগ্রহণ করেন, ঈমানদার মুসলমান হিসেবে বড় হন এবং কমপক্ষে রাসূলুল্লাহর (সা) একজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন– তাঁরা সবাই হলেন তাবি'ঈ। এক কথায়, যেসব মুসলমান রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখার সৌভাগ্য লাভ করেননি, তবে তাঁর কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় তাবি'ঈন। আর যাঁরা কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেননি, তবে কোন তাবি'ঈর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা হলেন তাবি'-তাবি'ঈন।

রাসূলে কারীমের (সা) উপর হিরা গুহায় প্রথম ওহী নাযিলের দিন থেকে তাঁর ওফাতের দিন পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় 'নুবুওয়াত ও রিসালাত'-এর যুগ। এর পরের ধারাবাহিক তিনটি যুগ হলো : সাহাবী, তাবি'ঈন ও তাবি'-তাবি'ঈন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) একটি হাদীছের প্রেক্ষিতে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, সাহাবীদের যুগ শেষ হয়েছে হিজরী ১১০ সনে। হিজরী ১১০ সনের পরে কোন সাহাবী বেঁচে ছিলেন বলে ধরা হয় না। তাবি'ঈদের যুগ হিজরী কত সাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়েছে, তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও হিজরী তৃতীয় শতকের কিছু সময় পর্যন্ত এ যুগ দীর্ঘায়িত হতে পারে। তবে হিজরী দ্বিতীয় শতকের গোটাটাই তাবি'ঈদের পদভারে পৃথিবী মুখর ছিল।

এই তিনটি তাবকা বা স্তরের মধ্যে দ্বিতীয় তাবকাটি এই হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, তাঁরা ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম, যাঁরা হলেন দীনের মূল উৎসধারা এবং তাবি'-তাবি'ঈন, যাঁদের মধ্যে অসংখ্য মনীষীর জন্ম হয়েছে– এই উভয় স্তরের মধ্যবর্তী

যোগসূত্র। তাঁরাই সাহাবায়ে কিরামের 'ইলম ও আখলাক তথা জ্ঞান ও নৈতিকতার কল্যাণকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন।

আল্লাহর কালাম ও রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছে এই তাবি'ঈদের বহু ফযীলত ও মর্যাদার কথা এসেছে। কুরআনে মুহাজির ও আনসারদের সাথে তাঁদের প্রতিও আল্লাহর সন্তুষ্টি ঘোষিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন ঃ

وَالسَّابِقُوْنَ الأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَار وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ.

– আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মধ্যে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উদ্যানসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। [সূরা আত-তাওবা-১০০]

উল্লেখ্য যে, উপরে উদ্ধৃত আয়াতে মুহাজির-আনসারদের সাথে আর যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা হলেন তাবি'ঈন। কারণ, সত্যিকারভাবে তাঁরাই মুহাজির ও আনসারদের ইত্তেবা' ও অনুসরণকারী এবং সময় ও কালের দিক দিয়েও তাঁরা ছিলেন মুহাজির-আনসারদের পরে। এ কারণে ইসলামী পরিভাষায় তাঁদেরকে তাবি'ঈ বলা হয়েছে। [ইবন তায়মিয়্যা, আর-রিসালা আত-তাদমুরিয়্যা, পৃ. ৩৭; তাফসীর মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ৫৯০]

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছে এর চেয়ে আরো স্পষ্টভাবে তাঁদের পরিচয় এসেছে এবং তাঁদেরকে "خَيْرٌ" তথা 'সবচেয়ে ভালো' অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন :

خَيْرُ أُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِيْنَ يَلُوْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

– আমার উম্মাতের মধ্যে সেই যুগের লোক সবচেয়ে ভালো যারা আমাকে পেয়েছে (সাহাবা)। তারপর ঐসব লোক যারা তাদেরকে পেয়েছে (তাবি'ঈন)। তারপর ঐসব লোক যারা তাদেরকে পেয়েছে (তাবি'-তাবি'ঈন)। [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল]

অন্য একটি বর্ণনায় কথাটি এভাবে এসেছে :

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .

– আমার যুগের লোকেরা সবচেয়ে ভালো। তারপর যারা তাঁদেরকে পেয়েছে (তাবি'ঈ)। তারপর যারা তাঁদেরকে পেয়েছে (তাবি'-তাবি'ঈ)। [সহীহ মুসলিম]

এই তিনটি যুগের লোকেরা স্ব স্ব যুগের জন্য ছিলেন খায়র ও বরকত তথা শুভ ও কল্যাণের নিমিত্ত। তাঁদেরই কল্যাণে ইসলামের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত বিজয় অর্জিত

কল্যাণের নিমিত্ত। তাঁদেরই কল্যাণে ইসলামের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত বিজয় অর্জিত হয়। [সহীহ মুসলিম]

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يأتى على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم.

– নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে যখন একদল লোক জিহাদ করবে। অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন যিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখেছেন? তারা জবাব দিবে : হাঁ। তখন তাদেরই জন্য বিজয় দেওয়া হবে। অতঃপর একটি দল জিহাদ করবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কোন সাহাবীকে দেখেছেন? তারা বলবে : হাঁ। তখন তাদের সম্মানে তাদের বিজয় দেওয়া হবে।

মানবজাতির এই পবিত্র প্রজন্মটি 'ইলম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মে ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের প্রতিচ্ছায়া। তাঁরা রাসূলে কারীমের শিক্ষা এবং সাহাবায়ে কিরামের জ্ঞান ও নীতি-আদর্শের উত্তরাধিকারকে মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। রিসালাত যুগের দূরত্ব এবং ব্যক্তিতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রভাবে ইসলামী জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে সকল দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছিল তার সংশোধন তাঁরা করেন। আর সংশোধন করতে না পারলেও ইসলামের মূল ও স্বচ্ছ ঝর্নাধারাকে বাইরের ধুলোবালি ও ময়লা-আবর্জনা থেকে নিজেদের চেষ্টায় নিরাপদ রাখেন। দীনী জ্ঞানের সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে নতুন নতুন জ্ঞান ও শাস্ত্রের ভিত্তি রচনা করেন, ইসলামী খিলাফতের সীমা-পরিধির বিস্তার ঘটান ও ইসলামকে ছড়িয়ে দেন। মোটকথা, সাহাবীদের যুগে যে সকল কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়েছিল তারা তা পূর্ণতায় পৌঁছে দেন এবং যা কিছু সে যুগে সম্পূর্ণ হয়েছিল, তা সংরক্ষণ করেন।

ইমাম যুহ্রী, মাকহুল শামী, ইবরাহীম নাখা'ঈ, কাজী শুরায়হ, 'আকরামা, সালিম (রহ) ইসলামী জ্ঞানের দিকটি সামাল দেন, আর মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, মুহাম্মাদ ইবন যুবায়র, ইমাম যায়নুল আবিদীন (রহ) নৈতিক শিক্ষাকে সজীব ও সতেজ করেন। হাসান বসরী, উওয়াইস কারানী, 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ (রহ) খোদায়ী 'ইশক ও মুহাব্বতের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতে রাশিদার নমুনাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। মোটকথা, তাবি'ঈন কিরাম 'ইলম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন। জ্ঞান ও নীতি-আদর্শের এই বিভক্তি কেবলমাত্র

আপেক্ষিক এবং প্রাধান্য লাভকারী গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে। অন্যথায় জ্ঞান ও নৈতিকতার যাবতীয় সৌন্দর্য কম-বেশী সাধারণভাবে এইসব মহান ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

তাঁদের সামষ্টিক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড হলো দীনী 'উলূম তথা দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞান যার উপর ইসলামী জীবন বিধানের অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তার সংরক্ষণ, প্রচার-প্রসার এবং কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক বিভিন্ন জ্ঞানের ভিত্তি রচনা করা। যদি এ সকল মনীষী জ্ঞানের এই ভাণ্ডারকে সংরক্ষণের জন্য সীমাহীন সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার না করতেন তাহলে তার একটি বড় অংশ হারিয়ে যেত। এই তাবি'ঈদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবি'-তাবি'ঈন, যাঁদের মধ্যে অসংখ্য ইমাম-মুজতাহিদের জন্ম হয়েছে, যাঁদের কল্যাণে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং পৃথিবীতে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে– তাঁরা এই তাবি'ঈদেরই সুযোগ্য শিষ্য-শাগরিদ।

সাধারণভাবে এমন প্রত্যেক নারী-পুরুষই তাবি'ঈ যিনি কোন সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেছেন, অথবা সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। কিন্তু যেমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে স্তরভেদ আছে তেমনি আছে তাবি'ঈদের মধ্যেও। আবূ বকর সিদ্দীকও (রা) সাহাবী, আর আবূ সুফয়ানও (রা) একজন সাহাবী। বিভিন্ন বিবেচনায় তাঁদের উভয়ের মর্যাদায় বিস্তর ব্যবধান। তেমনিভাবে ইমাম যায়নুল 'আবিদীনও (রহ) একজন তাবি'ঈ, আর ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়াও (রা) একজন তাবি'ঈ। কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্র নিকট এ দু'জনের সম্মান ও মর্যাদা সমান হবার নয়। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য।

তাছাড়া এই তাবি'ঈদের মধ্যে ছিলেন অনেক বড় বড় বিজয়ী বীর ও যোদ্ধা যাঁদের অসির শক্তি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল পেশীশক্তিকে নির্মূল করে দেয়। কিছু শাসক ও রাষ্ট্রনায়কও ছিলেন যাঁদের আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই শ্রেণীর তাবি'ঈর সকল প্রচেষ্টাকে মুসলিম উম্মাহ্ চিরকাল কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। তবে আমরা এসব শাসক ও রাষ্ট্রনায়কদের জীবন ও কর্মের আলোচনায় যাব না। কারণ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নামে স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে যা পড়া ও পড়ানো হয় তা মূলতঃ তাঁদেরই ইতিহাস। তাঁদের সম্পর্কে গবেষণা ও লেখালেখির লোকের অভাব নেই। আমরা কেবল সেই সব তাবি'ঈর জীবন আলোচনা করবো যাঁরা মুসলিম জাতির জন্য দীনী ও নৈতিক আদর্শ রেখে গেছেন, যাঁদের নৈতিক আদর্শের দ্বারা ইসলাম নতুন জীবন লাভ করেছে এবং যাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির প্রাসাদ রচিত হয়েছে। 'আবদুল মালিক, ওয়ালীদ, সুলাইমান, কুতাইবা ইবন মুসলিম, মূসা ইবন নুসায়র, মাসলামা, মুহাল্লাব ইবন আবী সুফরা প্রমুখের মত বীর যোদ্ধা ও রাষ্ট্রনায়ক মুসলিম উম্মাহ্ প্রতিটি যুগেই পেতে পারে; কিন্তু হাসান আল-বসরী, উওয়াইস আল-কারানী, সা'ঈদ ইবন আল মুসায়্যিব, ইবন শিহাব যুহরী, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন-এর

মত মানুষ জন্মের জন্য প্রয়োজন হয় শত শত বছরের। আমরা তাঁদেরই কথা পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

'তাবি'ঈদের জীবনকথা' প্রথম খণ্ডে বিশ জন বিখ্যাত তাবি'ঈর জীবনী স্থান পেয়েছে। অতি সংক্ষেপে তাঁদের জীবন ও কর্মের কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠক একটু গভীরভাবে পাঠ করলে লক্ষ্য করবেন যে, তাঁদের মধ্যে বিচিত্রমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। তাঁদের অনেককে দেখা যায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের নিকট ছড়িয়ে থাকা ইসলামের বিভিন্ন জ্ঞান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য জীবনপাত করছেন, কাউকে দেখা যায় স্বৈরাচারী উমাইয়্যা শাসকদের যুল্ম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন, আবার কেউ বা দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব ও সুখ-সম্ভোগ হতে দূরে থেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে নির্ভেজাল যুহ্দ ও তাকওয়ার জীবন যাপন করছেন। তবে তাঁদের সবার উপরে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও কর্মের ছাপ ও প্রভাব পুরোপুরি বিদ্যমান। সত্য, সুন্দর ও মানবতার আহ্বানে সাড়া দিতে কাউকে ইতস্ততঃ দেখা যায় না। আর তাই দেখা যায়, দুনিয়ার প্রতি সম্পূর্ণ নির্মোহ স্বভাবের এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে 'ইবাদাত-বন্দেগীতে মশগুল উওয়াইস আল-কারানীকে জিহাদে যোগদান করে শাহাদাত বরণ করতে। আর 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহর মত 'আবিদ ব্যক্তি জিহাদের ডাক এলেই নির্বাচিত বন্ধুদের নিয়ে একটি দল গঠন করে জিহাদে চলে যেতেন। হাসান আল-বসরী (রহ) যাঁকে সুফীকুল শিরোমণি মানা হয়, আজকের দিনের তথাকথিত সুফীদের জীবন ও তাঁর জীবনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। আল-আহনাফ ইবন কায়সের (রহ) মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও তাকওয়া-পরহিযগারীর এক অপূর্ব সমন্বয়। মোটকথা, সাহাবায়ে কিরামের (রা) সাহচর্য তাবি'ঈদের যাবতীয় সুপ্ত প্রতিভা ও যোগ্যতাকে আলোড়িত ও উৎকর্ষমণ্ডিত করে তোলে। তাঁদের একেক জনের মধ্যে একেকটি এবং কারো মধ্যে একাধিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইতিপূর্বে আমরা যেমন 'আসহাবে রাসূলের জীবনকথা'য় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেছি, তেমনিভাবে এ ক্ষেত্রে তাবি'ঈদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ধারাবাহিকভাবে পাঠকদের নিকট উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাবি'ঈদের জীবনকথা লিপিবদ্ধ করে চলছেন।

তাবি'ঈদের জীবনকথা প্রথম খণ্ড পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি।

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

بسم الله الرحمن الرحيم

'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র (রা)

হযরত 'উরওয়া (রহ)-এর ডাক নাম আবূ 'আবদিল্লাহ। তাঁর পিতা-বিখ্যাত সাহাবী এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী হযরত যুবায়র ইবন আল-'আওয়াম (রা) এবং মাতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) কন্যা হযরত আসমা' (রা)। তাঁর ধমনীতে একদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী যুবায়র (রা) ও অন্য দিকে রাসূলুল্লাহর বন্ধু আবূ বকরের খুন প্রবহমান ছিল। উমাইয়্যা স্বৈরশাসনের প্রতি বিদ্রোহী প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) ছিলেন তাঁর সহোদর এবং মুস'আব ইবন যুবায়র ছিলেন বৈমাত্রেয় ভাই।[১]

তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।[২] তাঁর জন্মসন নিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। খলীফা ইবন খায়্যাত হিজরী ২৩ সনে তাঁর জন্মের কথা বলেছেন। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হিঃ ২৩ সনের পরে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] অনেকে, হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতের শেষ অথবা হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতের প্রথম দিকে জন্মগ্রহণ করেন- কথাটি এভাবে বলেছেন।[৪] ইবন খাল্লিকান হিঃ ২২, মতান্তরে হিঃ ২৬ সনে তাঁর জন্মের কথা উল্লেখ করেছেন।[৫] হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতের ছয় বছর অতিক্রম করার পর তাঁর জন্ম হয়- একথা বলেছেন মুস'আব ইবন 'আবদিল্লাহ।[৬] 'আল্লামা যিরিকলী হিঃ ২২ খ্রীঃ ৬৪৩ সনে জন্ম ও হিঃ ৯৩ খ্রীঃ ৭১২ সনে মৃত্যুর কথা বলেছেন।[৭]

হযরত 'উরওয়ার (রহ) শিশু ও কিশোর জীবনের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বিক্ষিপ্ত কিছু কথা বিভিন্ন গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন শিশু অবস্থায় তাঁর মহান পিতা তাঁকে কোলে করে দোলাতে দোলাতে নীচের এই শ্লোকটি গুন্ গুন্ করে আওড়াতেন :[৮]

أَبْيَضُ مِنْ آلِ أَبِي عَتِيْقٍ+ مُبَارَكٌ مِنْ وَلَدِ الصِّدِّيْقِ
أَلَذُّ كَمَا رِيْقِيْ.

– তুমি আবূ 'আতীকের সন্তান-সন্ততিদের চেয়ে শুভ্রতর, সিদ্দীকের সন্তানদের থেকেও

---

১. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৪
২. তাবাকাত-৫/১৮২
৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৪২২
৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৩
৫. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৮
৬. তারীখ ইবন 'আসাকির-১১/২৮৩
৭. আল-আ'লাম-৪/২২৬
৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৮০

কল্যাণময়। আমার নিকট অধিকতর সুস্বাদু, যেমন আমার মুখের লালা আমার নিকট সবচেয়ে বেশী সুস্বাদু।

হযরত 'উরওয়া বলেছেন, 'আমি আমার শৈশব অবস্থায় 'উছমানকে (রা) যারা গৃহবন্দী করেছিল তাদেরকে দেখতে একদিন দাঁড়ালাম। দেখলাম, একটি লোক 'উছমানের নিকট পৌঁছার জন্য কাঠের সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে। আমার ভাই 'আবদুল্লাহ তাকে মেরে মাটিতে শুইয়ে দেন। আমি আমার সংগের অন্য ছেলেদেরকে বললাম : এ লোকটিকে মেরেছে আমার ভাই। এরপর বিদ্রোহীরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আমাকে ন্যাংটা করে ফেলে। যখন তারা দেখে, আমি এক নাবালক শিশু তখন ছেড়ে দেয়।'[৯] উটের যুদ্ধে তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যাওয়া হয়নি। তিনি বলেছেন, 'উটের যুদ্ধের সময় যুদ্ধে যাওয়ার বয়স না হওয়ার কারণে আবূ বকর ইবন 'আবদির রহমান ইবন আল-হারিছ ও আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।'[১০] ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন বলেন, 'উরওয়ার বয়স সে সময় তেরো বছর ছিল।'[১১]

হযরত 'উরওয়া বিয়ে করেন খলীফাতু রাসূলিল্লাহ 'উমার ইবনুল খাত্তাবের পৌত্রী সাওদা বিন্ত 'আবদিল্লাহ (রা)কে। তাঁর বিয়ের ঘটনাটিও বেশ চমকপ্রদ। হজ্জ মওসুমে সাওদার পিতা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) সহ বহু সাহাবী মদীনা থেকে মক্কায় গেছেন। বিপুল সংখ্যক সাহাবীর সাথে হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) কা'বা তাওয়াফ করছেন। 'উরওয়াও (রা) তাঁদের পিছে পিছে তালবিয়া পাঠ করতে করতে তাওয়াফ করে চলেছেন। হযরত 'আবদুল্লাহর মেয়ে সাওদার কথা 'উরওয়া জানতেন এবং মনে মনে তাঁকে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন। তাঁর মহান পিতার নিকট প্রস্তাবটি দেওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় তিনি ছিলেন। এখন এই তাওয়াফের মাঝে তিনি সুযোগ পেয়ে যান। তাওয়াফের এক পর্যায়ে তিনি হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) একেবারে কাছাকাছি চলে যান এবং অত্যন্ত সাহসের সাথে বলে ফেলেন : 'চাচা, আমি আপনার মেয়ে সাওদাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক।' হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) কথাটি শুনে একটু ঘাড় কাত করে 'উরওয়ার দিকে তাকালেন। কোন জবাব দিলেন না। তারপর আপন মনে তালবিয়া ও দু'আ-ইসতিগফার পাঠ করতে করতে তাওয়াফে মশগূল হয়ে গেলেন।

হজ্জ শেষে হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) মদীনায় ফিরে গেলেন। আর 'উরওয়াও আল-'আকীকে তাঁর নিজের বাড়ীতে ফিরে গেলেন। বিষয়টি তিনি মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন না। তিনি মদীনায় হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) বাড়ীতে গিয়ে আবার প্রস্তাব দানের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিছুদিন পর তিনি 'আবদুল্লাহর (রা) সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ীতে গেলেন। তখন কথার মাঝে এক পর্যায়ে তিনি 'উরওয়াকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন : তুমি সাওদা সম্পর্কে কি যেন বলছিলে? 'উরওয়া বললেন : হাঁ, বলেছিলাম। তিনি বললেন :

---

৯. তারীখ ইবন 'আসাকির-১১/২৮৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৪২৩
১০. তাবাকাত-৫/১৭৯
১১. তারীখ ইবন 'আসাকির-১১/২৮৩; তাহযীব আত-তাহযীব-৭/১৮৩

তুমি যখন তার কথা বলেছিলে তখন আমরা তাওয়াফের মধ্যে ছিলাম। আল্লাহ আমাদের সামনে হাজির ছিলেন। তা তোমার কি তার প্রতি আগ্রহ আছে? 'উরওয়া সায় দিলেন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ ও তাঁর দাস নাফি'কে ডাকার জন্য লোক পাঠালেন।

ছেলে 'আবদুল্লাহ ও দাস নাফি' আসার পর তাঁদেরকে লক্ষ্য করে হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) বলেন : এ হচ্ছে 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র ইবন আল-'আওয়াম। তোমরা তার অবস্থা জান। সে সাওদাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। আমি রাজি হয়েছি এবং সাওদাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিলাম। 'উরওয়া, তুমি কবুল করছো?
'উরওয়া বললেন : হাঁ, আমি কবুল করেছি।
'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার : আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি দান করুন।
এভাবে অতি সরল ও অনাড়ম্বরভাবে 'উরওয়া ও সাওদার বিয়ে সম্পন্ন হয়।[১২]

এই সাওদার গর্ভে জন্ম নেন তাঁদের বিখ্যাত চার ছেলে : ইয়াহইয়া, 'উছমান, হিশাম ও মুহাম্মাদ। এ চারজনই তাঁদের পিতা 'উরওয়া থেকে বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে হিশাম ইবন 'উরওয়া তাঁর অন্য তিন ভাইকে ডিঙ্গিয়ে যান।[১৩]

হযরত 'আলী (রা) ও হযরত মু'আবিয়ার (রা) দ্বন্দ্ব-সংঘাতে তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করেননি।

হযরত 'উরওয়ার (রহ) ভাই হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) ও তাঁর প্রতিপক্ষ উমাইয়্যা খলীফা 'আবদুল মালিকের মধ্যে যে সব দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তাতে তিনি ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করেন। 'আবদুল্লাহর (রা) বাহিনীকে স্বৈরাচারী শাসকের প্রতিভূ হাজ্জাজের বাহিনী মক্কায় অবরোধ করে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়। তখন 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পরিবার ও কুরায়শ বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আলোচনায় বসেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকলে হাজ্জাজের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করার জন্য আহ্বান জানান। 'উরওয়া (রহ) ভাইয়ের পাশে একই খাটের উপর বসা ছিলেন। তিনি হাজ্জাজের সাথে আপোষ-মীমাংসার পরামর্শ দেন এবং এ ব্যাপারে হযরত হাসান ইবন 'আলীর (রা) পদাঙ্ক অনুসরণের আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, হযরত হাসান (রা) হযরত মু'আবিয়ার (রা) অনুকূলে তাঁর খিলাফতের অধিকার ত্যাগ করেন। 'উরওয়ার কথা শোনার সাথে সাথে হযরত যুবায়র (রা) তাঁর একটি পা উঁচু করে 'উরওয়াকে এমন জোরে একটি লাথি মারেন যে, তিনি খাটের উপর থেকে ছিট্‌কে নীচে পড়ে যান। তারপর তিনি 'উরওয়াকে লক্ষ্য করে বলেন : ওহে 'উরওয়া! তোমার কথা শুনলে আমার অন্তর তোমার অন্তরের মত হয়ে যাবে। তোমরা যা বলছো তা মেনে নিলেও আমি খুব অল্প সময়ই বাঁচবো। অপমানের একটি লাথির চেয়ে সম্মানের একটি অসির আঘাত খাওয়া অনেক ভালো।[১৪]

---

১২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৪৩২
১৩. 'আসরুত তাবি'ঈন-৫১
১৪. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪১৫

হাজ্জাজের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) শাহাদাত বরণ করলেন। হাজ্জাজ তাঁর লাশটি দাফন-কাফনের জন্য না দিয়ে মক্কার এক উন্মুক্ত স্থানে ঝুলিয়ে রাখেন। এ সময় 'উরওয়া মক্কা থেকে পালিয়ে শামে খলীফা 'আবদুল মালিকের দরবারে হাজির হন। খলীফা তাঁকে প্রীতি ও সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। 'উরওয়ার সাথে বুক মিলিয়ে একই আসনে পাশাপাশি বসান। হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) নিহত হওয়ার খবর খলীফা তখনো পাননি। 'উরওয়ার মুখেই খবরটি প্রথম লাভ করেন এবং সাথে সাথে সিজদায়ে শোকর আদায় করেন। তারপর 'উরওয়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে তক্ষুণি 'আবদুল্লাহর (রা) লাশ হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়ে হাজ্জাজের নিকট চিঠি পাঠান। আর সেই সাথে তাঁর এমন আচরণের জন্য খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

এদিকে 'আবদুল্লাহকে হত্যার পর হাজ্জাজ 'উরওয়ার সন্ধানে ছিলেন। যখন তাঁর কোন সন্ধান পেলেন না তখন তিনি 'আবদুল মালিককে লিখলেন যে, 'উরওয়া তাঁর ভাইয়ের সাথে ছিলেন। ভাই নিহত হওয়ার পর তিনি আল্লাহর সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে কোথাও পালিয়ে গেছেন। 'উরওয়া তখন শামে খলীফার দরবারে। এ কারণে 'আবদুল মালিক জবাবে লিখলেন যে, "তিনি পালিয়ে যাননি। বরং আমার বায়'আত গ্রহণ করেছেন। আমি তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে নিরাপত্তা দান করেছি। তিনি মক্কায় ফিরে যাচ্ছেন। সেখানে তাঁর সাথে যেন কোন রকম অসদাচরণ করা না হয়।" এ ভাবে তিনি 'আবদুল মালিকের আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করে মক্কায় ফিরে যান। তাঁর ফেরার পর 'আবদুল্লাহর লাশ দাফন করা হয়।[১৫]

'উরওয়া যদিও 'আবদুল মালিকের আনুগত্যের বায়'আত করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে আর কোন তিক্ততা বিদ্যমান ছিল না তবুও তিনি উমাইয়্যাদের অমানবিক আচরণ ও স্বৈরাচারী রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এ কারণে তিনি শহরের আবাস ছেড়ে মদীনার অদূরে 'আকীক উপত্যকার পল্লীতে বসবাস শুরু করেন।[১৬]

'আবদুল্লাহ ইবন হাসান বর্ণনা করেন, 'আলী ইবন হুসায়ন (যায়নুল 'আবেদীন) ও 'উরওয়া প্রতিদিন 'ঈশার নামাযের পর মসজিদে নাবাবীর এক কোণে বসতেন। আমিও তাঁদের সাথে বসতাম। একদিন কথার মধ্যে বানূ উমাইয়্যাদের জুলুম-অত্যাচারের প্রসঙ্গ উঠলো। তিনি এ মত প্রকাশ করলেন যে, যখন কারো মধ্যে তাদের এ অত্যাচার-উৎপীড়নে বাধা দানের ক্ষমতা নেই তখন কতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে থাকা সমীচীন। আল্লাহ এ জুলুমের শাস্তিস্বরূপ একদিন না একদিন তাদের উপর 'আযাব নাযিল করবেন। 'উরওয়া 'আলী ইবন হুসায়নকে বললেন, যে ব্যক্তি জালিমদের থেকে দূরে থাকবে, আল্লাহ তার এই অসন্তুষ্টির কথা অবগত হবেন। আশা করা যায়, আল্লাহ যখন তাদের উপর কোন মুসীবত নাযিল করবেন তখন তাদের থেকে দূরে

---

১৫. আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/২৯১
১৬. তাবাকাত-৫/১৭৯

অবস্থানকারীদেরকে– তা সে সামান্য দূরত্বেই হোক না কেন, নিরাপদে রাখবেন। এ আলোচনার পর তিনি 'আকীক চলে যান।[১৭] লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তাদের মসজিদে খেল-তামাসা, তাদের হাট-বাজারে অহেতুক কাজ-কারবার এবং তাদের রাস্তা-ঘাটে নির্লজ্জতার প্লাবন বয়ে চলেছে।[১৮] তাঁকে যখন মদীনায় ফিরে যাবার কথা বলা হতো তখন বলতেন, মদীনায় এখন কী আছে? সেখানে এখন আছে শুধু কারো সম্পদের প্রতি ঈর্ষাকাতর অথবা কারো বিপদে উৎফুল্ল মানুষ।[১৯]

ইবন ইউনুসের বর্ণনা মতে জানা যায় যে, 'উরওয়া সাত বছর মিসরে ছিলেন।[২০] 'উরওয়া ছিলেন ঐসব মহান ব্যক্তিবর্গের উত্তরসূরী যাঁরা ছিলেন ইল্ম ও 'আমল– এ দুইটি সীমাহীন সাগরের সঙ্গমস্থল। তাঁর মহান পিতা যুবায়র ইবন আল-'আওয়াম ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী, নানা ছিলেন সিদ্দীক ও রাসূলুল্লাহর (সা) বন্ধু, খালা 'আইশা (রা) ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন, মা আসমা' (রা) লাভ করেছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে 'জাতুন নিতাকায়ন' উপাধি, তাঁর বড় ভাই 'আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন একজন 'আলিম সাহাবী। মোটকথা তাঁর গোটা পরিবারই ছিল 'ইলম, আমল, এবং দীন ও আখলাকের মর্যাদায় আদর্শ স্থানীয়। এই পরিবেশে 'উরওয়া চোখ খোলেন এবং বেড়ে ওঠেন। এ কারণে তিনি 'ইলম, 'আমল এবং দীনী ও আখলাকী মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ পারিবারিক মীরাছ হিসেবে লাভ করেন। ইমাম নাবাবী লিখেছেন, তাঁর গুণ ও বৈশিষ্ট্য অগণিত। তাঁর মহত্ত্ব, উঁচু মর্যাদা ও জ্ঞানের ব্যাপকতার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য আছে।[২১] ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে মদীনার ইমাম ও 'আলিম বলে উল্লেখ করেছেন।[২২] হাদীছ ও ফিকাহ্ উভয় শাস্ত্রে তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল। ইবন সা'দ বলেছেন :[২৩] 'তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত রাবী, প্রচুর হাদীছের বর্ণনাকারী, উঁচু মর্যাদা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ফকীহ্।' 'আল্লামা যিরিকলী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন এভাবে :[২৪]

أحد الفقهاءالسبعة بالمدينة. كان عالما بالدين، صالحا، كريما، لم يدخل في شيء من الفتن.

– তিনি মদীনার সাত ফকীহ্র অন্যতম। দীনের একজন 'আলিম, নেক্কার ও শরীফ মানুষ ছিলেন। কোন রকম গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলায় জড়াননি।

'উরওয়া তাঁর ভাই, মা, খালা সবার নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন।[২৫] হযরত

---

১৭. প্রাগুক্ত
১৮. মুখতাসার সিফাতুস সাফওয়া-৩২
১৯. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/৩৪৫
২০. তাহযীব আত-তাহযীব-৭/১৮৫
২১. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩২
২২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৩
২৩. তাবাকাত-৫/১৭৯
২৪. আল-আ'লাম-৪/২২৬
২৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৭/১৮১

'আয়িশা (রা) থেকে বিশেষভাবে এ জ্ঞান অর্জন করেন। কুবায়সা বলেন, আমাদের সবার চেয়ে 'উরওয়া 'আয়িশার (রা) নিকট বেশী যাওয়া-আসা করতেন। আর 'আয়িশা (রা) ছিলেন সবার চেয়ে বেশী জ্ঞানের অধিকারিনী। তিনি হযরত 'আয়িশার (রা) জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রায় নিজের বুকের মধ্যে ধারণ করে ফেলেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আয়িশার (রা) মৃত্যুর চার-পাঁচ বছর পূর্বে তাঁর সব হাদীছ আমি সংরক্ষণ করে ফেলেছিলাম। তিনি যদি সেই সময় মারা যেতেন তাহলে তাঁর কোন হাদীছ বাকী থাকার জন্য আমার কোন আফসোস থাকতো না। কারণ, তাঁর সব হাদীছই তো আমি তখনই স্মৃতিতে ধারণ করে ফেলেছিলাম।[২৬]

হযরত 'আয়িশা (রা) ছাড়াও তিনি একদল উঁচু স্তরের সাহাবীর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন।[২৭] যেমন : 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা), উসামা ইবন যায়দ (রা), যায়দ ইবন ছাবিত (রা), আবূ আইউব আল-আনসারী (রা), আবূ হুরায়রা (রা), সা'ঈদ ইবন যায়দ (রা), 'আমর ইবন নুফায়ল (রা), হাকীম ইবন হিযাম (রা), হিশাম ইবন হাকীম (রা), জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা), মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা), হাসান ইবন 'আলী (রা), নুমান ইবন বাশীর (রা), 'আমর ইবন আল-'আস (রা), মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান (রা), 'আমর ইবন সালামা (রা), উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা), উম্মু হাবীবা (রা) ও আরো অনেকে। এমনিভাবে তিনি তাবি'ঈদের একটি বিরাট সংখ্যা থেকে হাদীছ শোনেন।[২৮]

উল্লিখিত এসব মহান ব্যক্তির রূহানী ফয়েজ ও বরকতে 'উরওয়ার জ্ঞানের সীমা ও পরিধি চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রশস্ততা লাভ করে। ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রী বলতেন, 'উরওয়া ছিলেন হাদীছের সাগর যা কখনো ঘোলা হয় না।[২৯]

'উরওয়ার ছেলে হিশাম, যিনি নিজেই একজন বড় মাপের মুহাদ্দিছ ছিলেন, বলতেন আমরা পিতার হাদীছের দু'হাজার ভাগের এক ভাগও অর্জন করতে পারিনি।[৩০] ইবন 'উয়ায়না বলতেন, 'আয়িশার (রা) হাদীছের জ্ঞান তিন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী ধারণ করেন– আল-কাসিম, 'উরওয়া ও 'আমারাহ্।[৩১]

বিখ্যাত তাবি'ঈদের একটি দল তাঁর থেকে হাদীছ শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। যেমন: 'আতা', ইবন আবী মুলায়কা, 'আররাক ইবন মালিক, আবূ সালামা ইবন 'আবদির

---

২৬. প্রাগুক্ত-৭/১৮২
২৭. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৫
২৮. তাবাকাত-৫/১৭৯; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬২; তাহযীবুল আসমা'-১/৩৩১; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/১৮১
২৯. তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব-৭/১৮২; তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/৩৩২
৩০. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/৩৩২
৩১. প্রাগুক্ত

রহমান, যুহ্‌রী, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, তাঁর নিজের ছেলেরা– হিশাম, মুহাম্মাদ, ইয়াহইয়া, 'আবদুল্লাহ, 'উছমান, পৌত্র 'উমার ইবন 'আবদিল্লাহ এবং আবুয যান্‌দ, ইবনুল মুনকাদির, সালিহ ইবন কায়সান ও আরো অনেকে।[৩২]

তবে তাঁর বিশেষ শাস্ত্র ছিল ফিকাহ্‌। এ শাস্ত্রের জ্ঞানও তিনি খালা 'আয়িশার (রা) নিকট থেকে অর্জন করেন।[৩৩] এ শাস্ত্রে তিনি এত বড় পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, তৎকালীন মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত ফকীহ্‌র মধ্যে গণ্য হতেন।[৩৪]

ফিকাহ্‌ বিষয়ে তিনি কিছু গ্রন্থও রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর কিছু হাররার হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলার সময় যখন ইয়াযীদের বাহিনী মদীনায় হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালায় তখন তিনি নিজেই জ্বালিয়ে দেন। কিন্তু পরে এই জ্বালিয়ে ফেলার জন্য আফসোস করতেন।[৩৫] তিনি বলতেন, অমরা আল্লাহর কিতাবের বর্তমানে অন্য কোন পুস্তক রচনা করতাম না। এ কারণে আমি আমার লেখা বই নষ্ট করে ফেলি। কিন্তু আল্লাহর কসম, এখন আমার এমন ইচ্ছা হয় যে, যদি আমার পুস্তকগুলি বিদ্যমান থাকতো এবং আল্লাহর কিতাবও যথাস্থানে চিরকাল বর্তমান থাকতো তাহলে কতনা ভালো হতো।[৩৬]

তিনি বলতেন, যে মানুষটির মধ্যে তুমি একটি ভালো গুণ দেখবে তাকে ভালোবাসবে এবং বিশ্বাস করবে তার মধ্যে এ রকম আরো বহু ভালো গুণ আছে। আর যার মধ্যে একটি মন্দ দেখবে তাকে ঘৃণা করবে এবং বিশ্বাস করবে তার মধ্যে এ রকম আরো মন্দ লুকিয়ে আছে।[৩৭]

তিনি যখন মানুষকে বিলাস-ব্যাসন ও বিত্ত-বৈভবের দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকে যেতে দেখতেন তখন তাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের অভাব দারিদ্র ও রূঢ় বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির বলেছেন : একদিন আমার সাথে 'উরওয়ার দেখা হলো। আমার একটি হাত মুঠ করে ধরে তিনি বললেন : ওহে আবূ 'আবদিল্লাহ! আমি সাড়া দিলাম। তিনি বললেন : আমি একদিন আমার মা 'আয়িশার (রা) কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন : আমার ছেলে শোন! আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে এমনভাবে কাটিয়েছি যে, কোন কোন সময় একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীতে বাতি জ্বলতো না এবং অন্য কোন প্রয়োজনেও আগুন জ্বলতো না। আমি বললাম : আম্মা! আপনারা তাহলে জীবন ধারণ করতেন কিভাবে? বললেন : খেজুর ও পানির উপর নির্ভর করে।[৩৮]

---

৩২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬২; তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/৩৩১
৩৩. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫৩
৩৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪২১; তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/৩৩১
৩৫. তাবাকাত-৫/১৭৯
৩৬. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/১৮৩
৩৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/২০২
৩৮. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৫০

ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর যোগ্যতা এত পরিমাণ ছিল যে, অনেক বড় বড় সাহাবী বিভিন্ন মাসয়ালায় তাঁর শরণাপন্ন হতেন। তবে এত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন। কোন মাসয়ালায় শুধু যুক্তি ও কিয়াসের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত দিতেন না।[৩৯]

তিনি তরুণদেরকে জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ দিতেন। বলতেন, তোমাদের মত আমরাও এক সময় ছোট ছিলাম। আজ সেই দিন এসেছে যখন আমাদেরকে বড়দের মধ্যে গণ্য করা হয়। তোমরা যদিও আজ তরুণ, তবে এমন এক সময় আসবে যখন বড় হবে। এ কারণে জ্ঞান অর্জন করে নেতা হয়ে যাও– যাতে মানুষ তোমাদের প্রয়োজন অনুভব করে।[৪০]

'ইলমের সাথে 'উরওয়ার মধ্যে 'আমলও ছিল। তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের বাস্তব নমুনাস্বরূপ ছিলেন। 'ইজলী বলেন, 'উরওয়া সত্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন।[৪১] ইবন শিহাব যুহ্‌রী বলেন, তিনি সৎ 'আলিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৪২]

তিনি একজন বড় মাপের 'আবিদ ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ মানুষ ছিলেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন, তাঁর সত্তার মধ্যে জ্ঞান, রাজনীতি ও 'ইবাদাত, সব কিছুর সমাবেশ ঘটেছিল।[৪৩] অত্যন্ত নিয়ম-নিষ্ঠার সাথে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। একবার একটি রোগের কারণে যখন তাঁর পা কাটা হয়েছিল তখন একটি রাত ছাড়া আর কখনো তাহাজ্জুদ বাদ যায়নি।[৪৪] 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহার নিষিদ্ধ দিনগুলি ছাড়া বাকী বারো মাসই রোযা রাখতেন। সফর অবস্থায়ও রোযা ছাড়তেন না। অন্তিম রোগ শয্যায়ও এ অভ্যাসে কোন পরিবর্তন হয়নি। মৃত্যুর দিনও তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। তাঁর পুত্র হিশাম বলতেন, তাঁর পিতা সারা বছর লাগাতার সিয়াম পালন করতেন।[৪৫]

কুরআন তিলাওয়াত ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কাজ। এক-চতুর্থ অংশ কুরআন প্রতিদিন নাজেরা তিলাওয়াত করতেন। অবশিষ্ট অংশ রাতে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে শেষ করতেন।[৪৬] এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে শুধু সেই রাতে যে রাতে পা-টি কেটে ফেলা হয়।

তিনি ছিলেন সবর ও ইসতিক্বামাত–ধৈর্য ও দৃঢ়তার বাস্তব প্রতীক। বড় বড় পরীক্ষা ও বিপদ-আপদে মুখ থেকে কখনো উহ্ ধ্বনিও উচ্চারিত হতো না। একবার শামে গেলেন খলীফা 'আবদুল মালিকের দরবারে। সাথে ছেলে মুহাম্মাদও ছিলেন। তিনি গেলেন শাহী আস্তাবল দেখতে। সেখানে একটি পশু তাকে গুতা দেয়। আর সেই আঘাতে তিনি মারা

---

৩৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/১৮৩
৪০. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/২০৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৯; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/২০২
৪১. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/১৮২
৪২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/৫৪
৪৩. শাযারাত আয-যাহাব-১/১০৩
৪৪. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫৪
৪৫. তাবাকাত-৫/১৮০
৪৬. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/১৮৩; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬২

যান। এ ঘটনার পরপরই 'উরওয়ার পায়ে একটি মারাত্মক বিষাক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হয়। চিকিৎসকরা পা-টি কেটে ফেলার পরামর্শ দেয়। অন্যথায় সারা দেহে পচন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। যদিও 'উরওয়া সে সময় বার্ধক্যে পৌছে গিয়েছিলেন, তবে তিনি একজন নব্যযুবকের মত সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দান করেন। পা বিচ্ছিন্ন করার পূর্বে চিকিৎসক তাঁকে সামান্য মদ পান করতে বলে, যাতে কষ্টের অনুভূতি কিছুটা কম হয়। তিনি বললেন, যে রোগে আমার সুস্থ হওয়ার সামান্য আশা আছে তাতে আমি হারাম বস্তুর সাহায্য নিব না। চিকিৎসক বললো, তাহলে অচেতন করে দেয় এমন কিছু ঔষধ সেবন করুন। বললেন, আমার দেহের একটি অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হবে, আর আমি তার কষ্ট অনুভব করবো না– এ আমার পছন্দ নয়। অপারেশনের সময় তাঁকে ধরার জন্য কয়েক ব্যক্তি আসে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এখানে কি কাজ? তারা বললো, বেশী কষ্টের সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। এ কারণে আমরা আপনাকে সামাল দিতে এসেছি। তিনি বললেন, আমার বিশ্বাস আছে, তোমাদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন আমার হবে না। অত্যন্ত শান্ত ও স্থির অবস্থায় তাঁর পা কেটে ফেলা হয়। পায়ের পাতার উপর গিরা থেকে যখন কাটা হয় তখন তাঁর মুখ থেকে তাসবীহ ও তাহ্‌লীল উচ্চারিত হচ্ছিলো। রক্ত বন্ধ করার জন্য যখন ক্ষতস্থান সেলাই করা হয় তখন ব্যথার তীব্রতায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তবে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পান। নিজ হাতে মুখের ঘাম মোছেন।। তারপর পা'র বিচ্ছিন্ন অংশটুকু চেয়ে নিয়ে ওলট-পালট করে দেখেন এবং তাকে লক্ষ্য করে এ কথাগুলো উচ্চারণ করেন :[৪৭] সেই সত্তার শপথ! যিনি তোমার দ্বারা আমার দেহের ভার বহন করিয়েছেন। তিনি ভালো করেই জানেন আমি তোমার দ্বারা কোন হারাম অথবা পাপের পথে চলিনি। যেদিন তাঁর পা-টি কেটে ফেলা হয় সেদিনও তাঁর তাসবীহ-তিলাওয়াতের নিয়মে কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।[৪৮]

ইবন কুতায়বা বলেছেন, শামে খলীফা আল-ওয়ালীদের তত্ত্বাবধানে যখন 'উরওয়ার পায়ের অপারেশন করা হয় তখন আল-ওয়ালীদ বন্ধুদের সাথে কথা বলছিলেন। এত নীরবে কাজটি সম্পন্ন হয় যে, তিনি টের পেলেন না অপারেশন কখন শেষ হলো। যখন সেঁক দেওয়া হচ্ছিল তখন সেঁকের গন্ধে তিনি বুঝতে পারেন, অপারেশন শেষ হয়েছে।[৪৯]

এ সফরে তাঁর পুত্র-বিয়োগ ও দেহের উপর মারাত্মক বিপদ সত্ত্বেও তাঁর মুখ দিয়ে কখনো কোন অভিযোগের শব্দ উচ্চারিত হয়নি। সব সময় আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আমার চার হাত-পা থেকে তুমি মাত্র একটি নিয়েছো এবং তিনটি অবশিষ্ট আছে। চার ছেলের মধ্য

---

৪৭. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৬-২৫৭; সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৮
৪৮. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৫
৪৯. আল-মা'আরিফ-২২২; ওয়াফয়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৫

থেকে মাত্র একটিকে নিয়েছো, এখনো তিনটি জীবিত রেখেছো। তুমি কিছু নিলে অনেক কিছু এখনো রেখে দিয়েছো। কিছুদিন বিপদ-আপদে রাখলেও অনেক দিন সুস্থ ও শান্তিতে রেখেছো।[৫০] এ সফর থেকে মদীনায় ফেরার পর আত্মীয়-বন্ধু ও আম-জনতা সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি তাদের সামনে আল কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করেন :[৫১]

لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا.

– আমরা আমাদের এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।[৫২]

হযরত 'উরওয়ার (রহ) পা কেটে ফেলার পর অনেকেই তাঁকে সান্ত্বনা দান করেন। সেই সময় 'ঈসা ইবন তালহা একদিন তাঁকে সান্ত্বনা দেন এভাবে : আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে দিয়ে কুস্তি লড়াতাম না। আল্লাহ্ আমাদের জন্য আপনার বেশীর ভাগ জিনিসই বিদ্যমান রেখেছেন। আপনার কান, চোখ, জিহ্বা, বুদ্ধি, দুই হাত ও একটি পা এখনো আমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন। তাঁর একথা শুনে তিনি বলেন, হে 'ঈসা, আল্লাহর কসম! আপনি যে ভাষায় আমাকে সান্ত্বনা দিলেন তেমন আর কেউ দেয়নি।[৫৩]

হযরত 'উরওয়ার পা কেটে ফেলার পর 'আব্স গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আল-ওয়ালীদের দরবারে আসে। তাদের মধ্যে একজন অন্ধ ব্যক্তিও ছিল। আল-ওয়ালীদ লোকটির চোখ কিভাবে নষ্ট হয়েছে তা জানতে চান। লোকটি বললো : আমীরুল মু'মিনীন! আব্স গোত্রে আমার চেয়ে বেশী সম্পদশালী কেউ ছিল না। এক রাতে আমি এক উপত্যকায় অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ প্লাবন দেখা দেয় এবং আমার পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ, গবাদি পশু সবই ভাসিয়ে নিয়ে যায়, বেঁচে থাকে শুধুমাত্র একটি উট ও একটি সদ্যভূমিষ্ঠ শিশু। উটটি ছিল খুবই বেপরোয়া ও অবাধ্য। সে ছুটে পালিয়ে যায়। আমি তার পিছু ধাওয়া করে কিছু দূর যেতেই আমার ছোট্ট ছেলেটির আর্তচিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখি তার মাথাটি একটি নেকড়ের মুখে। নেকড়ে শিশুটিকে খাচ্ছে। আমি উটটি ধরলাম। কিন্তু সে আমার মুখে এমন প্রচণ্ড লাথি মারে যে আমার মুখ গুঁড়ো হয়ে যায় এবং আমার চোখ দু'টি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলে। এভাবে আমি ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, চোখ– সব হারানো একজন ব্যক্তিতে পরিণত হই।

লোকটির দুঃখের কাহিনী শোনার পর আল-ওয়ালীদ বলেন, তোমরা একে 'উরওয়ার নিকট নিয়ে যাও। তাহলে তিনি জানতে পারবেন, তাঁর চেয়ে বড় বিপদগ্রস্ত মানুষও এ পৃথিবীতে আছে।[৫৪]

---

৫০. আল'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/২২০; মুখতাসার সিফাতুস সাফওয়া-১৩১
৫১. সূরা আল-কাহ্ফ-৬২
৫২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৬
৫৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৭০
৫৪. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৬

হযরত 'উরওয়ার (রহ) দৃষ্টিতে পার্থিব বিত্ত-বৈভব ও ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের কোনই গুরুত্ব ছিল না। এ কারণে তিনি কখনো আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট দুনিয়ার কোন সুখ-সম্পদ চাননি। একবার হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালে 'উরওয়া, তাঁর ভাই মুস'আব ও 'আবদুল্লাহ এবং 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান– এই চারজন মসজিদুল হারামে একত্র হন। তাঁদের কেউ একজন প্রস্তাব করলেন, আসুন, আজ আমরা এই ঘরে আল্লাহকে সামনে রেখে প্রত্যেকে নিজের একান্ত বাসনার কথা প্রকাশ করি। সবাই প্রস্তাবটি মেনে নিলেন। প্রথমে 'উরওয়ার ভাই 'আবদুল্লাহ বললেন, আমি এই দুই হারামের বাদশাহ ও খিলাফতের মসনদে আসীন হই– এই আমার ইচ্ছা। মুস'আব বললেন, আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে, আমি 'ইরাকীদের কর্তৃত্বের অধিকারী হই এবং কুরাইশদের সবচেয়ে দুই সুন্দরী নারী–সাকীনা বিনত হুসায়ন ও 'আয়িশা বিনত তালহাকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করি। 'আবদুল মালিক বললেন, আমি মু'আবিয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গোটা পৃথিবীর বাদশাহ হই– এই আমার বাসনা। সবার শেষে 'উরওয়া বললেন, তোমরা যা চাচ্ছো তার কিছুই আমি চাই না। আমি দুনিয়াতে যুহ্দ, আখিরাতে কামিয়াবী চাই এবং এমন ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে চাই যার থেকে এই 'ইলম বর্ণনা করা হবে।[৫৫]

আল্লাহ পাক চারজনের দু'আই কবুল করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) সাত বছর হারামের খলীফা ছিলেন। সাকীনা ও 'আয়িশা দুই সুন্দরীকেই মুস'আব বিয়ে করেন। 'আবদুল মালিক সিন্ধু থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল খিলাফতের খলীফা হন, আর 'উরওয়া আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বিশেষ ব্যক্তিদের মর্যাদা লাভ করেন। এ কারণে খলীফা 'আবদুল মালিক বলতেন : কেউ যদি কোন জান্নাতী লোককে দেখে খুশী হতে চায় সে যেন 'উরওয়া ইবন যুবায়রকে দেখে।[৫৬]

খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের দৃষ্টিতে 'উরওয়া ছিলেন অতি উঁচু স্তরের মানুষ তিনি 'উরওয়ার জ্ঞান-গরীমার প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

ইবন শিহাব আয-যুহ্রী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একবার আমি মদীনার কিছু লোকের সাথে খলীফা 'আবদুল মালিকের দরবারে গেলাম। দলটির মধ্যে আমাকে সর্ব কনিষ্ঠ দেখে খলীফা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কে? আমি পরিচয় দিলাম। তিনি বললেন : তোমার বাপ-চাচা ইবনুল আশ'আছের বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলায় ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। আমি বললাম : আমীরুল মু'মিনীন! আপনার মত ব্যক্তিরা ক্ষমা করে দিলে তা আর মনে রাখে না। কথাটি তাঁর ভালো লাগে। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তুমি কোথায় বড় হয়েছো? বললাম, মদীনায়। আবার জিজ্ঞেস করলেন : কার কাছে শিক্ষা লাভ করেছো? বললাম : সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, সুলায়মান ইবন ইয়াসার ও কাবীসা ইবন যুআয়বের নিকট। তিনি বললেন : তা 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়রের নিকট

---

৫৫. প্রাগুক্ত-৩/২৫৮
৫৬. প্রাগুক্ত

যাওনি কেন? তিনি এমন সাগর যে ছোট ছোট নদী-নালার পানি তা ময়লা করতে পারে না। যুহ্‌রী বলেন : অতঃপর আমি সেখান থেকে মদীনায় ফিরে 'উরওয়ার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করিনি।[৫৭]

খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান একবার 'উরওয়াকে সঙ্গে করে তাঁর একটি বাগানে গেলেন। "কি সুন্দর!" বলে 'উরওয়া তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করলেন। সাথে সাথে 'আবদুল মালিক বলে উঠলেন : আল্লাহর কসম! আপনি এর চেয়েও সুন্দর। এই বাগানটি তো বছরে মাত্র একবার ফল দেয়। আর আপনি তো আপনার ফল দেন প্রতিদিন।[৫৮]

হযরত 'উরওয়ার ভাই হযরত 'আবদুল্লাহ নিহত হবার পর একবার তিনি খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের দরবারে যান। একদিন খলীফাকে বললেন : আমি চাই আপনি আমার ভাইয়ের তরবারিটি আমাকে ফেরত দিন। খলীফা বললেন : সেটা তো অনেক তরবারির মধ্যে আছে, আমি তো তা চিনতে পারবো না। 'উরওয়া বললেন : সব তরবারি আমার সামনে হাজির করা হলে আমি আমার ভাইয়ের তরবারিটি চিনতে পারবো। খলীফা সব তরবারি হাজির করতে বললেন। সবগুলো হাজির করা হলে তিনি তার মধ্য থেকে একখানি ধারভাঙ্গা ভোঁতা তরবারি বেছে নেন, বলেন : এটিই আমার ভাইয়ের তরবারি। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন : এটি কি আপনি আগে চিনতেন? বললেন : না। খলীফা প্রশ্ন করলেন : তাহলে এখন কিভাবে চিনলেন? বললেন : জাহিলী কবি আন-নাবিগা আয-যুবয়ানীর এই পংক্তিটি দ্বারা :[৫৯]

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم + بهن فلول من قراع الكتائب.

– শত্রু সৈন্যদেরকে অতিরিক্ত আঘাত করার কারণে তরবারির ধার ভেঙ্গে যাওয়া ছাড়া তাদের মধ্যে আর কোন ত্রুটি নেই।

উমাইয়্যা খিলাফতের খলীফারা ও তাঁদের আঞ্চলিক শাসকেরা বিভিন্ন সময় তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। খলীফা আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিকের খিলাফতকালে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) মদীনার ওয়ালীর দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি মদীনায় আসলেন। মদীনাবাসীরা তাঁর আবাসস্থলে এসে তাঁকে স্বাগতম ও সালাম জানালো। তিনি জুহ্‌রের নামায আদায় করার পর মদীনার তৎকালীন দশজন বিখ্যাত ফকীহ্‌কে– যাঁদের নেতা ছিলেন 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র, ডেকে পাঠালেন। তাঁরা উপস্থিত হলে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও স্বাগতম জানানোর পর্ব শেষ করে এক বৈঠকে বসেন। বৈঠকের শুরুতে তিনি এক স্বাগত ভাষণে বলেন : 'আমি আপনাদেরকে এমন একটি বিষয়ের জন্য ডেকেছি যাতে আপনাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে এবং আপনারা সত্যের ব্যাপারে আমার সহযোগী হবেন। আমি আপনাদের সবার

---

৫৭. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৫২
৫৮. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/১৪৪, ২৩০
৫৯. প্রাগুক্ত-২/২৩০

অথবা কোন একজনের মত ও সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন হুকুম জারী করবো না। আপনারা যদি দেখেন কেউ কারো প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করছে, অথবা আমার কোন কর্মকর্তার কোন জুলুম-অত্যাচারের কথা আপনারা জানতে পারেন, সাথে সাথে তা আমাকে জানানোর জন্য আমি আপনাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। বৈঠক শেষে 'উরওয়া 'উমারের সাফল্য কামনা করে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন।[৬০]

যদিও তিনি দুনিয়ার ধন-ঐশ্বর্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, তা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাঁকে অঢেল সম্পদ দান করেন। তিনি একজন বড় বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। পিতা হযরত যুবায়র (রা) তৎকালীন আরবের একজন বড় সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি কয়েক কোটি দিরহাম রেখে যান। এ বিপুল অর্থ-সম্পদ তাঁর ছেলেরা লাভ করেন। 'উরওয়াও তাঁর একটি অংশ লাভ করেন। হযরত যুবায়রের (রা) সম্পদের এক-অষ্টমাংশে তাঁর চার জন স্ত্রীর প্রত্যেকে বারো লাখ করে পেয়েছিলেন।[৬১] এ দ্বারা তাঁর পরিবারের সম্পদ সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা যায়।

আল্লাহ তা'আলা 'উরওয়াকে যেমন বিত্তশালী করেন তেমনি তাঁর চিত্তের প্রশস্ততাও দান করেন। তিনি বড় দরাজ দিলের মানুষ ছিলেন। অনেকগুলো খেজুরের বাগান ছিল তাঁর। খেজুর পাকার মওসুমে বাগানের ঘেরা তুলে দেওয়া হতো। মানুষ বাগানে ঢুকে ইচ্ছেমত খেত এবং যাওয়ার সময় প্রচুর নিয়ে যেত। এ সময় তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন :[৬২]

وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ .

– যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন এ কথা কেন বললে না : আল্লাহ যা চান তাই হয়। আল্লাহর দেওয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই।[৬৩]

তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। মদীনায় 'বি'রে 'উরওয়া' নামে দীর্ঘকাল যাবত যে পাতকুয়াটি প্রসিদ্ধ ছিল তা তিনিই মানুষের পানি-কষ্ট দূর করার জন্য খনন করেন। বলা হয়েছে যে, মদীনায় অন্য কোন কুয়ার পানি এ কুয়ার পানির চেয়ে বেশী মিষ্টি ছিল না।[৬৪]

হযরত 'উরওয়া (রহ) যদিও একজন 'আবিদ ও দুনিয়াবিরাগী মানুষ ছিলেন, তবে তাঁর স্বভাবে একটা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ ছিল। প্রতিদিন গোসল করতেন, দামী পোশাক পরতেন, গরমের মওসুমে রেশমের আঁচলযুক্ত কিংখাবের আবা তাঁর গায়ে শোভা পেত। মুহাম্মাদ ইবন হিলাল বলেন : আমি 'উরওয়াকে দেখেছি, তিনি গোঁফ বেশী লম্বা

---

৬০. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৭
৬১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু বারাকাকাতিল গাযী ফী মালিহি
৬২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৬; সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৮
৬৩. সূরা আল-কাহ্ফ-৩৯
৬৪. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৭

হতে দিতেন না। সুন্দর করে ছেঁটে ফেলতেন। তিনি জাফরানী রংয়ের চাদর গায়ে দিতেন। কালোর কাছাকাছি রংয়ের খিজাব লাগাতেন।[৬৫]

তিনি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করেন। এক সময় বসরায় আবাসন গড়ে তোলেন। মিসরেও যান। সেখানে বিয়ে করেন এবং সাত বছর অবস্থান করেন। শেষ জীবনে মদীনায় ফিরে আসেন এবং মদীনার নিকটবর্তী 'ফুর'আ'র পার্শ্ববর্তী 'মাজাহ' নামক তাঁর নিজ পল্লীতে ইনতিকাল কলেন। এই পল্লীটির অবস্থান ছিল 'আর-রাবযা'র পাশে এবং মদীনা থেকে চার রাত্রির পথের দূরত্বে। পল্লীটি ছিল খেজুর উদ্যানে সুশোভিত এবং মিষ্টি পানিতে সমৃদ্ধ। ফকীহ্দের রীতি অনুযায়ী এই পল্লীতেই তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুর সনটিকে ফকীহ্দের সন বলা হতো। কারণ, এ বছর বহু ফকীহ্র মৃত্যু হয়। তাঁর জন্মের সনের মত মৃত্যু-সন নিয়েও মতভেদ আছে। হিজরী ৯৩, ৯৪ ও ৯৯ সনের কথা বলা হয়েছে।[৬৬]

---

৬৫. তাবাকাত-৫/১৭৯, ১৮০
৬৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৩, তাহযীব আল-আসমা'-১/৩৩২, তাবাকাত-৫/১৮২, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৫৮

হাসান আল-বসরী (রহ)

হযরত হাসান (রহ)-এর ডাক নাম আবূ সা'ঈদ। পিতার নাম ইয়াসার। জ্ঞানগত পূর্ণত্বার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী তাবি'ঈদের পুরোধা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎ:কর্ষের দিক দিয়ে ছিলেন ওলীকুল শিরোমণি।

হযরত হাসান আল-বসরীর পিতা ইয়াসার ছিলেন দাস। তাঁর দাসত্বের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। একটি বর্ণনা এ রকম যে, তাঁর পিতা ছিলেন দক্ষিণ ইরাকের মায়সানের বন্দীদের একজন। আনাস ইবন মালিকের ফুফু রুবায়' বিন্ত নাদার তাঁকে খরীদ করে মুক্তি দেন। দ্বিতীয় বর্ণনাটি এ রকম, তাঁর পিতা-মাতা উভয়ে ছিলেন বানু নাজ্জার তথা এক আনসারীর দাস-দাসী। তিনি তাঁদেরকে তাঁর স্ত্রীর মাহরের বিনিময়ে বানু সালামাকে দান করেন। আর বানু সালামা তাঁদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়। তৃতীয় একটি বর্ণনা এ রকম যে, তাঁর পিতা ছিলেন হযরত যায়িদ ইবন ছাবিতের দাস, আর মাতা খায়রাহ্ ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামার (রা) দাসী। তবে এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, ইয়াসার ও তাঁর স্ত্রী উভয়ে ছিলেন দাস-দাসী।[১] আর এই তৃতীয় বর্ণনাটি সর্বাধিক সঠিক ও গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়।

হযরত হাসান আল-বসরী হিজরী ২১ খ্রীষ্টাব্দ ৬২৪ সনে হযরত ফারূকে আ'জমের (রা) খিলাফতকালের দুই বছর বাকী থাকতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।[২] উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামার (রা) সাথে তাঁর মায়ের দাসত্বের সম্পর্ক থাকায় তিনি যে সৌভাগ্য লাভ করেন তা খুব কম ভাগ্যবান ব্যক্তিই লাভ করতে পেরেছেন। সা'ঈদ নামে হযরত হাসানের এক বড় ভাই ছিলেন। তিনি হিঃ ১০০ সনে ইনতিকাল করেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামার (রা) নিকট সংবাদবাহক এ সুখবর নিয়ে এলো যে, তাঁর দাসী 'খায়রা' একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছে। উম্মুল মু'মিনীনের (রা) অন্তর খুশীতে ভরে গেল এবং তাঁর গম্ভীর মুখমণ্ডল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি সাথে সাথে লোক পাঠালেন, সদ্যজাত শিশু ও তার মাকে নিয়ে আসার জন্য, যাতে শিশুর মা সুস্থ হয়ে উঠা পর্যন্ত তাঁর কাছে থাকতে পারে। উল্লেখ্য যে, 'খায়রা' ছিল উম্মুল মু'মিনীনের অতিপ্রিয় দাসী। তিনি তার সন্তান প্রসবের এ খবরটি পাওয়ার জন্য খুবই উদগ্রীব ছিলেন। তাই তার পুত্র সন্তান প্রসবের খবর শুনে মা ও সন্তানকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই 'খায়রা' তার সদ্যজাত শিশুকে কোলে করে উম্মুল মু'মিনীনের নিকট চলে আসলো। শিশুটির উপর চোখ পড়তেই তার প্রতি উম্মুল মু'মিনীনের অন্তরে গভীর মায়ার সৃষ্টি হয় এবং প্রশান্তিতে অন্তরটি ভরে যায়। শিশুটির ছিল মায়াবী ও সবার দৃষ্টিকাড়া সুন্দর চেহারা। যে দেখতো তারই অন্তরে শিশুটির জন্য মায়া-মমতা সৃষ্টি হয়ে

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ– ১/৭১; আল-আ'লাম-২/২২৬
২. ড. 'উমার ফাররূখ : তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী– ১/৬৪৫

যেত। উম্মুল মু'মিনীন (রা) 'খায়রা'কে জিজ্ঞেস করলেন : বাচ্চার নাম রেখেছো? বললোঃ আম্মা, এখনো নাম রাখা হয়নি। আপনি রাখবেন তাই আমরা কিছু চিন্তা করিনি। তিনি বললেন : আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণার উপর ভরসা করে আমি এর নাম রাখছি আল-হাসান। তারপর তিনি হাত তুলে শিশুর কল্যাণের জন্য দু'আ করেন।

আল-হাসানের জন্মগ্রহণের এ আনন্দ কেবল উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামার (রা) গৃহেই সীমিত থাকেনি, বরং এ আনন্দে মদীনার আরো একটি গৃহ অংশগ্রহণ করে। সে গৃহটি ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) কাতিবে ওহী (ওহী লেখক) মহান সাহাবী হযরত যায়দ ইবন ছাবিতের (রা)। কারণ, শিশু হাসানের পিতা ইয়াসার ছিলেন হযরত যায়দের সবচেয়ে বেশী সম্মানিত ও প্রিয় ব্যক্তি।

এই শিশু আল-হাসান ইবন ইয়াসার– যিনি পরবর্তীকালে হাসান আল বসরী নামে প্রসিদ্ধ হন, রাসূলুল্লাহর (সা) একটি পরিবারে, তাঁর অন্যতম বেগম হিন্দা বিন্ত সুহায়ল, উরফে উম্মু সালামার (রা) ঘরে লালিত-পালিত হয়ে বেড়ে ওঠেন। উম্মু সালামা (রা) ছিলেন বুদ্ধি, দৃঢ়তা ও মর্যাদার দিক দিয়ে তৎকালীন 'আরবের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণতার অধিকারিণী। রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমদের মধ্যে বিদ্যা ও হাদীছ বর্ণনার দিক দিয়ে হযরত 'আয়িশার (রা) পরেই যাঁর স্থান। যাঁর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) তিনশো সাতাশিটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সেই জাহিলী 'আরব সমাজে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মহিলা কিছু লিখতে-পড়তে জানতেন, তিনি তাঁদেরই একজন।

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামার (রা) সাথে শিশু হাসানের সম্পর্কের এখানেই শেষ নয়। সম্পর্ক মাতৃত্বের পর্যায়ে চলে যায়। শিশু হাসানের মা উম্মুল মু'মিনীনের এটা-ওটা কাজের জন্য এদিক ওদিক গেলে তিনি যখন কান্না জুড়ে দিতেন তখন উম্মুল মু'মিনীন তাঁকে থামানোর জন্য মায়ের আদরে কোলে নিয়ে নিজের পবিত্র স্তনের বোঁটা তাঁর মুখে পুরে দিতেন। শিশু হাসান উম্মুল মু'মিনীনের বুকের পবিত্র দুধ পান করে পরিতৃপ্ত হতেন এবং কান্না থামিয়ে দিতেন। এভাবে হযরত উম্মু সালামা (রা) দুই দিক দিয়ে হযরত হাসানের মা হন : কুরআন ঘোষিত বিশ্বের সকল ঈমানদার ব্যক্তিদের মা এবং দুধ মা। হযরত উম্মু সালামার ঘরের শিশু হবার সুবাদে অন্যান্য উম্মুহাতুল মু'মিনীনের (রা) আদর ও স্নেহ লাভে ধন্য হন এবং চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সবার ঘরে অবাধে যাতায়াতের সুযোগ লাভ করেন। তারপর তিনি পিতার সাথে বসরায় চলে যান এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। এ কারণে তাঁকে আল-বসরী বল হয়।[৩]

হযরত হাসানের পিতা-মাতা উভয়ে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। তারপর এই পরিবারটি 'ওয়াদি আল-কুরা'তে বসবাস করতো। মাঝে মাঝে তারা মদীনায় আসতো। হাসানের মা শুধুমাত্র উম্মু সালামার (রা) সাথেই যোগাযোগ রাখতেন না, বরং তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমদের সকলের কাছেই যেতেন। মায়ের সাথে শিশু হাসানও তাঁদের

---

৩. ড. রা'ফাত আল-বাশা : সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন– ২/৬-১১

কাছে আসা-যাওয়া করতেন। সুতরাং দু'জনই তাঁদের আলো এবং নুবুওয়াত ও রিসালাতের আলো থেকে অনেক কিছু অর্জন করেন। মা তাঁর ছেলেকে এ অর্জনে সাহায্যও করেন। ফলে তিনি আরবী ভাষার উপর চমৎকার দক্ষতা অর্জন করেন। মা খায়রা উম্মু সালামার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) অনেক হাদীছ বর্ণনা করতেন। তিনি তাঁর অনেক উপদেশের মধ্যে এসব হাদীছ মানুষকে শোনাতেন। আর এর একটা গভীর প্রভাব পড়ে তাঁর দুই ছেলে হাসান ও সা'ঈদের উপর। হাসান শৈশব থেকেই জামি' মসজিদে যাওয়া-আসা শুরু করেন। আর এর মধ্য দিয়ে কুরআন হিফ্জ করেন ও লেখা শিখে ফেলেন। তারপর মদীনার অলি-গলিতে রিসালাত ও নুবুওয়াতের যে ফয়েজ ও বরকতের প্লাবন তখন বয়ে চলেছিল তা থেকে অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন।

হযরত 'আলীর (রা) খিলাফতকালে পৌঁছে আমরা দেখতে পাই এ পরিবারটি তার মাতৃভূমিতে ফিরে যাচ্ছে এবং বসরায় বসতি স্থাপন করছে। আমরা আরো দেখতে পাই হাসান, তাঁর সময়ের বিচিত্রমুখী ঘটনাবলীতে অংশগ্রহণ সযত্নে এড়িয়ে চলছেন। বিভিন্ন ঘটনা ও ফিত্না-বিশৃঙ্খলায় কোনভাবে অংশগ্রহণ না করার নীতি ও পন্থাকে তিনি আজীবন আঁকড়ে থাকেন। সূক্ষ্ম ও সঠিক অর্থে তিনি দীনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। আল-কুরআনের পঠন-পাঠন, হাদীছের বর্ণনা এবং ইসলামী বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন। আমরা এটাও দেখি যে, হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতের ব্যাপারে হযরত হাসান (রা)সহ উম্মাতের ঐকমত্যের পর খিলাফতের পূর্বাঞ্চলে প্রেরিত বাহিনীর সাথে তিনিও যোগ দিচ্ছেন। খুরাসের কোন কোন ওয়ালীর সেক্রেটারী হিসেবেও কাজ করছেন। সেখানে প্রায় দশ বছর কাটানোর পর বসরায় ফিরে আসেন। হিজরী ১১০ সনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই বসরাতেই অবস্থান করেন। তারপর তিনি দীনী বিষয়ে পঠন-পাঠনে একনিষ্ঠভাবে মনোযোগী হন। সে সময়ে বসরার এমন কোন জ্ঞানকেন্দ্র ছিল না যেখান থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেননি। অল্প দিনের মধ্যে তিনি একজন বড় ওয়া'ইজ তথা ধর্মীয় বক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। বসরার যুবক শ্রেণীর মানুষ তাঁর প্রতি এমন আগ্রহী হয়ে ওঠে যে, তার কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। হাজ্জাজের সময়ে তিনি বসরার সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও বক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বয়ান ও বাগ্মিতায় তাঁর মত দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না।[৪]

হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) যে সময় জন্মগ্রহণ করেন তখন সাহাবায়ে কিরামের বিশাল একটি সংখ্যা বিদ্যমান ছিলেন। আর এমন স্থানে তিনি বেড়ে ওঠেন যার প্রতিটি অলি-গলি ছিল মহানবীর (সা) জ্ঞানের ভাণ্ডার। সর্বোপরি তিনি এমন সব মহান ব্যক্তির সুহবত ও সাহচর্য লাভ করেন যাঁরা ছিলেন ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির জীবন্ত নমুনা এবং নবীর (সা) আখলাক ও নৈতিকতার বাস্তব রূপ। ফলে তাঁর গোটা জীবন জ্ঞান ও কর্ম,

---

৪. ড. শাওকী দায়ফ : তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী– ২/৪৪৬

Contents

মহত্ত্ব ও পূর্ণতা, তাকওয়া ও খোদাভীরুতার মত যাবতীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীতে পূর্ণ হয়ে যায়। ইবন সা'দ লিখেছেন :[৫]

كان الحسن جامعًا، عالما عاليا، رفيعا فقيها مأمونا عابدا ناسكا، كبيرالعلم فصيحا جميلا وسيفاً.

–হাসান বসরী ছিলেন বহু পূর্ণতার সমাবেশ, উঁচু স্তরের 'আলিম, সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি, ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ফকীহ্, পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি নির্মোহ 'আবিদ, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাষী সুদর্শন এক পুরুষ।

মোট কথা, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ যোগ্যতা ও উৎকর্ষের পূর্ণরূপ ছিলেন তিনি। ইমাম আয-যাহাবী লিখেছেন :[৬]

حافظ، علامة من بحور العلم، فقيه النفس، كبير الشان، عديم النظير، مليح التذكير، بليغ الموعظة، رأس فى أنواع الخير.

– তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিজ, জ্ঞানের সাগর, ফকীহ্, বিশাল কর্মকাণ্ডের অধিকারী, অতুলনীয়, চমৎকার উপদেশ দানকারী, বাগ্মী-বক্তা এবং বহু রকম কল্যাণকর কাজের নেতা।

'আল্লামা নাবাবী লিখেছেন : তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত 'আলিম। তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে সবাই একমত।[৭] ইমাম আয-যাহাবী হাদীছ গ্রন্থাবদ্ধকারীদের তৃতীয় স্তর (তাবকা), যাকে তিনি তাবি'ঈদের মধ্যম স্তর বলেছেন, হাসান আল-বসরীকে (রহ) তার প্রধান পুরুষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৮]

তাঁর সময়ের সকল জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম শা'বী বলতেন, আমি এই দেশের (ইরাকে) অন্য কাউকে তাঁর চেয়ে ভালো পাইনি। কাতাদা মানুষকে এই বলে উপদেশ দিতেন, তোমরা হাসান বসরীর অনুসরণ করবে। আমি মতামত ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাঁর চেয়ে বেশী আর কাউকে দেখিনে। আ'মাশ বলতেন, হাসান জ্ঞান সংরক্ষণ করতেন এবং তা বলতেন। ইমাম বাকির বলতেন, হাসানের কথা আম্বিয়ায়ে কিরামের (আ) কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

গালিব আল-কাত্তান বলতেন, তাঁর যুগের 'আলিমদের উপর হাসানের এ শ্রেষ্ঠত্ব ছিল পাখীদের মধ্যে চড়ুই পাখীর উপর বাজপাখীর শ্রেষ্ঠত্বের মত। কেউ যদি সে যুগের

---

৫. তাবাকাত– ৭/১১৪
৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ– ১/৭২
৭. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত– ১/১৬১
৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ– ১/৭১

সবচেয়ে বড় 'আলিমকে দেখতে চায় সে যেন হাসানকে দেখে। 'আমর ইবন মুররা বলতেন, হাসান ও মুহাম্মাদ- এই দুই শায়খের কারণে আমার বসরাবাসীদের প্রতি ঈর্ষা হয়। ইউনুস ইবন 'উবায়দুল্লাহ ও হুমায়দ আত-তাবীল বলতেন, আমি বহু ফকীহ্কে দেখেছি, কিন্তু হাসানের চেয়ে পূর্ণ ব্যক্তিত্বের আর কাউকে পাইনি। 'আতা' ইবন আবী রাবাহ মানুষকে উপদেশ দিতেন, তোমরা তোমাদের মসলা-মাসায়িলের ব্যাপারে হাসানের কাছে যাও। তিনি একজন অনেক বড় 'আলিম, ইমাম ও নেতা। ইমাম মালিক বলতেন, তোমরা হাসানের নিকট মসলা-মাসায়িল জিজ্ঞেস করবে। কারণ তিনি জ্ঞান সংরক্ষণ করেছেন, আর আমরা ভুলে গেছি। অনেকে তো এমন কথাও বলতেন, হাসান যদি পূর্ণ বয়সের সময় সাহাবীদের যুগ লাভ করতেন তাহলে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উঁচু স্তরের সাহাবীরা তাঁর মুখাপেক্ষী হতেন।[৯]

যদিও হাসানের মধ্যে বহু জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছিল তা সত্ত্বেও তাঁর জীবনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হয়েছে ইবাদাত-বন্দেগী ও আধ্যাত্মিক সাধনার কর্মকাণ্ডে। এ কারণে তাঁর রূহানী মর্যাদার তুলনায় তাঁর 'ইলমী যোগ্যতার খুব কম বিবরণ পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও যতটুকু পাওয়া যায় তদদ্বারা তাঁর বিভিন্ন শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রমাণ লাভ করা যায়। তাফসীর, ফিকাহ্, হাদীছ তথা সকল দীনী জ্ঞানে তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল।

আল-কুরআনের মুফাসসির বা ভাষ্যকার হিসেবে তিনি তেমন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেননি। তবে অত্যন্ত পরিশ্রম করে তাফসীরের জ্ঞান অর্জন করেন। মাত্র বারো বছর বয়সে কুরআনের হাফিজ হন। আবূ বকর আল-হিন্দীর বর্ণনা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এক একটি সূরার তাফসীর, তাবীল, শানে নুযূল ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন শেষ না হতো তিনি সামনে এগুতেন না।[১০] তাঁর এ অধ্যবসায় তাঁকে কুরআনের একজন বড় 'আলিম বানিয়ে দেয় এবং তিনি তাফসীরের দারসও দিতেন।[১১]

ইমাম আয-যাহাবী যে বলেছেন, তিনি মহাজ্ঞানী ও জ্ঞানের সাগর ছিলেন,[১২] এ দ্বারাই তাঁর হাদীছ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির আন্দাজ করা যায়। হাদীছের জ্ঞান তিনি যে সব মহান ব্যক্তির নিকট থেকে অর্জন করেন তাঁরা সকলে ছিলেন এ শাস্ত্রের এক একজন স্তম্ভস্বরূপ। সাহাবীদের মধ্যে 'উছমান (রা), 'আলী (রা), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা), আনাস ইবন মালিক (রা), জাবির ইবন মু'আবিয়া (রা), মা'কাল ইবন ইয়াসার (রা), আবূ বাকরা (রা), সামুরা ইবন জুনদুব (রা), মুগীরা ইবন শু'বা (রা), 'আমর ইবন তাগলিব (রা), 'ইমরান ইবন হুসাইন ও জুনদুব আল-বাজালী

---

৯. দ্র. তাবাকাত- ৭/১১৪; হাসান আল-বসরীর জীবনী।
১০. শাজারাতুয যাহাব- ১/১৩৭
১১. তাহযীব আত-তাহযীব- ২/২৬৪
১২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৬২

থেকে সরাসরি এবং 'উমার ইবন আল-খাত্তাব, উবাই ইবন কা'ব (রা), সা'দ ইবন 'উবাদা, 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা), 'উছমান ইবন আবিল 'আস (রা) এবং মা'কাল ইবন সিনান থেকে পরোক্ষভাবে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। তাছাড়া উঁচু স্তরের তাবি'ঈদের বিরাট একটি দলের নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন।[১৩]

যতদূর জানা যায়, সম্ভবত তাঁর বিশেষ কোন হালকায়ে দারস ছিল না। আর এটা তিনি পছন্দও করতেন না। অনেকটা বাধ্য হয়ে তিনি হাদীছ বর্ণনা করতেন। তিনি বলতেন, "আল্লাহ যদি জ্ঞানী ব্যক্তিদের থেকে অঙ্গীকার না নিয়ে থাকতেন তাহলে আমি তোমাদের সব জিজ্ঞাসার জবাবে হাদীছ বর্ণনা করতাম না।"[১৪]

কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব এমন ছিল যে, মানুষ তাঁর পিছু ছাড়তো না। অধিকাংশ জ্ঞানপিপাসু মানুষ তাঁর সামনে হাজির হয়ে উপকৃত হতেন। তিনি যেখানে যেতেন সেখানে মানুষের ভিড় জমে যেত। সে সময় মদীনার পরে মক্কা ছিল জ্ঞানের দ্বিতীয় কেন্দ্রস্থল। তিনি সেখানে গেলেও মানুষের ভিড় জমে যেত। মক্কাবাসীরা তাঁকে মঞ্চে বসিয়ে হাদীছ শুনতো। শ্রোতাদের মধ্যে মুজাহিদ, 'আতা' ও তাউসের (রহ) মত লোকেরাও থাকতেন। তাঁরা সবাই বলাবলি করতেন, আমরা এ ব্যক্তির মত দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি।[১৫]

রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে উচ্চারিত শব্দ ও বাক্যে হাদীছ বর্ণনা করা অতি জরুরী বলে মনে করতেন না। বরং ভাব ও অর্থ বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করতেন। হাদীছের পরিভাষায় যাকে 'রিওয়ায়াত বিল মা'না' বলা হয়। তাঁর বেশীর ভাগ বর্ণনা 'রিওয়ায়াত বিল মা'না' হতো। অনেক সময় একই হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে শব্দের পার্থক্য ও কম-বেশী হয়ে যেত। তবে ভাব ও অর্থের কোন তারতম্য হতো না।[১৬] ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেন, আমি ইবন 'আওনকে বলতে শুনেছি ঃ আমি ছয়জনকে পেয়েছি যাঁদের মধ্যে তিনজন শব্দ ও বর্ণসহ বর্ণনার ব্যাপারে ভীষণ কঠোর ছিলেন। আর অপর তিনজন ভাব ও অর্থ বর্ণনার অনুমতি দিতেন। প্রথম তিনজন হলেন : আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, রাজা' ইবন হায়ওয়া ও মুহাম্মাদ ইবন সীরীন। আর শেষোক্ত তিনজন হলেন : আল-হাসান, শা'বী ও ইবরাহীম আ'ন-নাখা'ঈ।[১৭]

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও তাঁর শিষ্য-শাগরিদের গণ্ডি ও পরিধি ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত। এখানে তাঁর কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ হুমায়দ আত-তাবীল, য়াযীদ ইবন আবী মারয়াম, কাতাদা, বাকর ইবন 'আবদিল্লাহ মুযনী, জারীর ইবন আবী হাযিম, আবু আশহাব, রাবী' ইবন সাবীহ, সা'ঈদ ইবন জারীরী, সা'দ ইবন ইবরাহীম, সাম্মাক ইবন হারব, ইবন 'আদন, খালিদ আল-

---

১৩. প্রাগুক্ত- ১/৬১; তাহযীব আত-তাহযীব- ২/২৬৪
১৪.তাবাকাত- ৭/১১৭
১৫. প্রাগুক্ত
১৬. প্রাগুক্ত
১৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন- ২/৩২২

হায্যা, 'আতা' ইবন সাইব, 'উছমান আল-বাত্তি, কুররা ইবন খালিদ, মুবারাক ইবন ফুদালা, ইয়া'লা ইবন যিয়াদ, হিশাম ইবন হাস্সান, ইউনুস ইবন 'উবায়দ, মানসূর ইবন যাদান, সা'ঈদ ইবন বিলাল, মুজাহিদ, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ্, তাউস (রহ) ও আরো অনেকে।[১৮]

তিনি ছিলেন ফিকাহ্ শাস্ত্রের একজন ইমাম এবং বসরার 'মুফতীয়ে আ'জম (সর্বশ্রেষ্ঠ মুফতী)। কাতাদা বলেছেন, হাসান হালাল ও হারামের সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন।[১৯] আইউব বলেছেন, আমার চোখ হাসানের চেয়ে বড় কোন ফকীহ্কে দেখেনি। রাবী ইবন আনাস বলেছেন, আমি পুরো দশ বছর হাসানের নিকট যাওয়া-আসা করেছি এবং সব সময় তাঁর নিকট থেকে নতুন নতুন মাসআলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি।[২০]

কিছু বর্ণনায় জানা যায়, তিনি হাদীছ ও ফিকাহ্ বিষয়ে, কিছু বইও লিখেছিলেন। ইবন আবী লায়লা 'ঈসা ইবন মূসার সূত্রে বলেন : হাসান ছিলেন বসরার ফকীহ্।[২১]

এই ইজতিহাদ ও গবেষণার জন্য গবেষকসুলভ জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল। সুতরাং যে সব বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডারে কোন রিওয়ায়াত না থাকতো, সে ক্ষেত্রে তিনি কিয়াস ও ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত দিতেন। একবার আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহ্মান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যে সব মাসআলায় মানুষকে ফাতওয়া দেন, তার সব ক্ষেত্রে কি আপনার নিকট কোন 'রিওয়ায়াত' থাকে? বললেন : আল্লাহর কসম! সব ক্ষেত্রে থাকে না। তবে আমার মতামত ও সিদ্ধান্ত প্রশ্নকারীদের সিদ্ধান্তের চেয়ে তাদের জন্য ভালো হয়ে থাকে।

শুদ্ধ ও সঠিক হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত ও মতামত সিদ্ধান্ত দানকারী সাহাবাদের সমমান ও পর্যায়ের হতো। আবূ কাতাদা মানুষকে মসলা-মাসাইল জানার জন্য হাসানের নিকট যাওয়ার কথা বলতেন। তিনি বলতেন আল্লাহর কসম! আমি তার সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশী অন্য কারো সিদ্ধান্তকে 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) সিদ্ধান্তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিনি। কোন কোন বিজ্ঞ 'আলিম তো এমন কথাও বলেছেন, হাসানের যদি সাহাবায়ে কিরামের যুগে জ্ঞান-বুদ্ধির বয়স হতো, তাহলে তাঁরা তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী হতেন।[২২]

তিনি ইসলামী জ্ঞান ছাড়াও ভাষা ও সাহিত্যের একজন বড় বিশেষজ্ঞ এবং বিশুদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাষী ব্যক্তি ছিলেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন, তিনি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষিতায় রা'উবা ইবন 'আজাজের সমকক্ষ ছিলেন।[২৩] তার বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা-

---

১৮. তাহযীব আত-তাহযীব– ২/২২৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ– ১/৭১
১৯. তাবাকাত– ৭/১১৮
২০. তাহযীব আত-তাহযীব– ২/২৬৫; বুতরুস আল-বুসতানী : দাইরাতুল মা'আরিফ– ৭/৪৪
২১. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ– ৩/৪১৫
২২. তাবাকাত– ৭/১১৮
২৩. শাজারাতুয যাহাব– ১/১৩৮

ভাষণ শুনে কোন কোন আরব ব্যক্তি মন্তব্য করতো তিনি বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাষিতায় একজন নির্ভরযোগ্য আরব।[২৪]

উমায়্যা যুগের শ্রেষ্ঠ দুই আরব কবি জারীর ও ফারাযদাক। দুই জনের মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ছিল। ফারাযদাক সব সময় হাসান আল-বসরীর মজলিসে উঠাবসা করতেন। আর জারীর বসতেন ইবন সীরীনের (রহ) মজলিসে। তাঁরা দুইজন এই দুই কবির কবিতা শুনতেন।[২৫]

প্রখ্যাত ভাষাবিদ আবূ 'আমর ইবন আল-'আলা' বলেছেন :[২৬]

لم أرقرويين أفصح من الحسن والحجاج

-'আমি আল-হাসান আল-বসরী ও হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও শুদ্ধভাষী দুইজন গ্রামবাসীকে দেখিনি।'

তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হলো, এ দুইজনের মধ্যে কে বেশী শুদ্ধভাষী? বললেন : হাসান। ইমাম আল-গাযালী (রহ) বলেছেন :[২৭]

وكان الحسن البصرى أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء، وأقربهم هديا من الصحابة، وكان غاية فى الفصاحة.

-'মানুষের মধ্যে হাসান আল-বসরী ছিলেন কথার দিক দিয়ে নবীদের কথার সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ এবং হিদায়াতের দিক দিয়ে সাহাবীদের বেশী নিকটবর্তী। তাছাড়া ভাষার শুদ্ধতায় ও স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি ছিলেন একজন চূড়ান্ত পর্যায়ের মানুষ।'

তিনি ভুল আরবী বলা মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বললো : আমাদের একজন ইমাম আছেন যিনি কুরআন পাঠে ভুল করেন। বললেন : তাকে বিদায় করে দাও। কারণ, স্বর-ধ্বনি হলো কথার অলঙ্কার।

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে- 'ইয়া আবূ সা'ঈদ' বলে ডাক দেয়। (শুদ্ধ হবে ইয়া আবা সা'ঈদ) তিনি বললেন : দীনার-দিরহামের চিন্তা তোমাকে- ইয়া আবা সা'ঈদ বলা থেকে বিরত রেখেছে।[২৮]

জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাহচর্য এবং তাঁদের সাথে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, বিতর্ক ও চিন্তা-অনুধ্যান তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। একবার কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি সাক্ষাতের জন্য আসলেন। কথায় কথায় দুপুর হয়ে গেল। শুধু দুপুর নয়, বরং দুপুরও গড়িয়ে গেল। তখন তাঁর ছেলে এসে

---

২৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন- ১/২০৫
২৫. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ- ৫/৩৮৩; ৬/১২৫
২৬. ইবন খাল্লিকান : ওয়াফায়াতুল আ'য়ান- ২/৭০; বুতরুস আল-বুসতানী-৭/৪৪; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন- ১/১৬৩
২৭. ইহইয়া'উ 'উলূম আদ-দীন- ১/১৬৮; আল-আ'লাম- ১/১০৬
২৮. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ- ২/৪৭৯-৪৮০

অতিথিদের বললেন, আপনারা আমার পিতার উপর অনেক বড় বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে একটু বিশ্রাম নিতে দিন। এখনো পর্যন্ত তিনি কিছু খাননি। তিনি ছেলের কথা শুনে তাকে ধমক দিয়ে বললেন, তাঁদের দর্শনের চেয়ে বেশী আমার চোখের প্রশান্তির জন্য আর কোন কিছু নেই। যখন দুইজন মুসলমান পরস্পর মিলিত হতেন, তাঁরা একে অপরকে হাদীছ শোনাতেন, আল্লাহর যিকর ও তাহমীদ-তাকদীস করতেন। এমন কি তাঁদের দুপুরের বিশ্রামের কোন সময় ও সুযোগ হতো না।[২৯]

তিনি মনে করতেন, একজন মানুষ শুধু জ্ঞান অর্জন করলেই তাকে প্রকৃত জ্ঞানী বলা যায় না। বরং প্রকৃত জ্ঞানী হওয়ার জন্য বহুবিধ শর্ত আছে। একবার মাতারুল ওয়াররাক তাঁর কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করে বললেন, অন্য ফকীহ্‌রা তো আপনার বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে কাঁদাক! তুমি কি কখনো ফকীহ্ দেখেছো এবং ফকীহ্ কাকে বলে তা জান? ফকীহ্ তিনি, যিনি পার্থিব সুখ-সম্পদের প্রতি বিমুখ, খোদাভীরু, নিজের চেয়ে উঁচু মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির প্রতি বেপরোয়া, নিজের চেয়ে নিচু মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে নিয়ে হাসি-তামাসা করেন না এবং আল্লাহ তাঁকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা দ্বারা তুচ্ছ পার্থিব সুখ-সুবিধা পেতে চান না।[৩০]

তিনি কুরআনের ধারক-বাহকদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করতেন। বলতেন, এক ব্যক্তি কুরআনকে পণ্যের মত এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে যায় এবং বিনিময়ে মানুষের নিকট থেকে অর্থ-সম্পদ পেতে চায়। আরেক ব্যক্তি কুরআনের বর্ণসমূহ মুখস্থ করে, কিন্তু তার সীমা-সরহদের কোন পরোয়া করে না। তার বিনিময়ে শাসক শ্রেণীর নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, দেশবাসীর অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নেয়। এ জাতীয় কুরআনের বাহকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। আর তৃতীয় এক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, তার ঔষধ তার নিজের অন্তরের রোগের উপর প্রয়োগ করে, রাত জাগে, তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, খোদাভীতি ও আত্মমর্যাদাবোধের পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করে এবং অন্তরে ব্যথা-বেদনা অনুভব করে। আল্লাহর কসম! এ জাতীয় কুরআনের বাহকের সংখ্যা লাল দিয়াশলাইয়ের সংখ্যার চেয়েও কম। তাঁদের বরকতেই আল্লাহ বৃষ্টি দেন, বিজয় দান করেন এবং বালা-মুসীবত দূর করেন।[৩১]

হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) একজন বাগ্মী, বাকপটু ও মিষ্টভাষী মানুষ ছিলেন। তিনি যখন কথা বলতেন তখন মুখ দিয়ে যেন মুক্তো ঝরে পড়তো। বিখ্যাত আরব পণ্ডিত আল-জাহিজ বলেছেন :[৩২] 'হাসান ছিলেন একজন দুনিয়া=বিরাগী 'আবিদ, বড় মাপের 'আলিম, তুখোড় বক্তা ও ভালো কাহিনী বলিয়ে মানুষ।' তিনি অনেক বাগ্মী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলেছেন, 'আমরা হাসান আল-বসরীর চেয়ে বড় কোন বক্তাকে জানিনে।'[৩৩]

---

২৯. তাবাকাত– ৭/১১৯
৩০. প্রাগুক্ত,
৩১. আল-ইক্‌দ আল-ফারীদ– ২/২৪০
৩২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৩০৮, ৩৬৭
৩৩. প্রাগুক্ত-১/৩৫৪

Contents

সে যুগে বসরায় একদল খোদাভীরু 'আবিদ লোক ছিলেন, যারা জীবন যাপনে ছিলেন অতি সাধারণ। বাঁশ জাতীয় এক প্রকার গাছ দিয়ে তৈরি সাধারণ ঘরে বসবাস করতেন। বক্তৃতা-ভাষণের মাধ্যমে তারা মানুষকে উপদেশ দিতেন। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ বলেন :[৩৪]

أخطب الناس صاحب العمامة السوداء بين أخصاص البصرة، إذا شاء خطب وإذا شاء سكت.

'বসরায় বাঁশের ঘরে বসবাসকারীদের মধ্যে এই কালো পাগড়ীধারী (হাসান) হলেন সবচেয়ে বড় খতীব। তিনি যখন ইচ্ছা ভাষণ দেন, আর যখন ইচ্ছা চুপ থাকেন।' তিনি যখন আখিরাতের বর্ণনা করতেন কিংবা সাহাবায়ে কিরামের যুগের চিত্র তুলে ধরতেন তখন চোখ দিয়ে তাঁর অশ্রুর বন্যা বয়ে যেত।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপকতা সম্পর্কে ছাবিত ইবন কুররার অভিমত এ রকম : 'তিনি স্বীয় 'ইলম ও তাকওয়া, যুহ্দ ও পরহেযগারী, পরমুখাপেক্ষীহীনতা ও দৃঢ় মনোবল, সৌন্দর্য ও পবিত্রতা, অনুধাবন শক্তি ও 'ইলমে মা'রিফাতের দিক দিয়ে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ছিলেন।

নানা ধরনের লোক সমবেত হতো এবং সবাই সমানভাবে তাঁর উপদেশ থেকে উপকৃত হতো। একই মজলিসে তাঁর নিকট থেকে কেউ হাদীছের জ্ঞান অর্জন করছেন, কেউ তাফসীর শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করছেন, কেউ 'ইলমে ফিকাহ্র দারস গ্রহণ করছেন, কেউ ফাতওয়া জিজ্ঞেস করছেন, বিচার-আচারের নিয়ম-কানুন শিখছেন এবং কেউ ওয়াজ শুনছেন। তিনি ছিলেন যেন এক মহা সমুদ্র যাকে উত্তাল তরঙ্গ সর্বদা আন্দোলিত করছে। তিনি যেন এক উজ্জ্বল প্রদীপ যা মজলিসকে আলোকিত করছে। আমর বিন মা'রূফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার তথা ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ-এর ক্ষেত্রে তাঁর কর্মধারা, বাকপটুতা এবং শাসকমণ্ডলী ও আমীর-উমারাদের সামনে তাঁর মর্যাদা পূর্ণ ভাষায় সত্য প্রকাশ্যের ঘটনাবলী ভুলবার মত নয়।'[৩৫]

তিনি কেবল বাগ্মী ও কামালিয়াতের অধিকারীই ছিলেন না, একজন হৃদয়বান ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি যা কিছু বলতেন তা তার অন্তরের গভীরতম স্থান থেকেই বের হতো। আর তাই অন্যের অন্তরে গভীর প্রভাব ফেলতো। তাঁর বক্তৃতা-ভাষণ শুনে শ্রোতার সর্বাঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো। আর এ কারণে বসরা থেকে কূফা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় অনেক বড় বড় 'আলিম ও শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও তাঁর দারসের হালকা মানুষকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করতো। আর এর মূল কারণ হলো কালামে নুবুওয়াতের সাথে তাঁর কথার গভীর মিল।

---

৩৪. প্রাগুক্ত-১/৩৯৮; ২/২৮৬
৩৫. তারীখে দা'ওয়াত ও 'আযীমাত, (বাংলা অনু.)-১/৪৬-৪৭

মানুষ তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা ছিল অভিভূত এবং তাঁকে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মধ্যে গণ্য করতো। তৃতীয় শতাব্দীর অমুসলিম দার্শনিক ছাবিত বিন কুর্‌রাহ্-এর মন্তব্য হচ্ছে, উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার যে কয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপর অন্যান্য উম্মার ঈর্ষা করা উচিত, তাঁদের মধ্যে হাসান আল-বসরী (রহ) অন্যতম। মক্কা আল-মুকাররামা সব সময়ই ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সেখানে সকল শাস্ত্রের জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাগম ঘটে, কিন্তু মক্কার অধিবাসীরাও হাসান আল-বসরীর জ্ঞানের গভীরতা দেখে এবং তাঁর বক্তৃতা-ভাষণ শুনে বিস্ময়ের সাথে বলেছে : আমরা তাঁর মত কোন লোক আর দেখিনি।[৩৬]

জাহিরী 'ইলমে যদিও হাসান আল-বসরী তাঁর সময়ে শায়খুল ইসলামের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তবে তাঁর গর্ব ও গৌরব এবং খ্যাতির মূল ভিত্তি এটাই ছিল না। বরং 'ইরফান ও হাকীকাত ছিল তাঁর আসল ও প্রকৃত শাস্ত্র। তাঁর সত্তাটি তাসাউফের উৎস এবং 'ইলমে বাতিনের মূল ঝর্নাধারা। তাসাউফের সকল নদী এই উৎস থেকেই প্রবাহিত হয়েছে। সুতরাং তাসাউফের অধিকাংশ বড় বড় সিলসিলা তাঁরই মাধ্যমে হযরত 'আলী (রা) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এভাবে তাঁরই মাধ্যমে যেন দুনিয়াতে এ নূরের দরিয়া বহমান রয়েছে।

হযরত 'আলী (রা) থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি মুহাদ্দিছদের নিকট প্রমাণিত নয়। তবে 'ইলমে তাসাউফের ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) হযরত 'আলী (রা) থেকেই রূহানী ফয়েজপ্রাপ্ত ছিলেন। হযরত শাহ ওয়ালী আল্লাহ (রহ) লিখেছেন, "তরীকতের ইমামদের মতে হাসান আল-বসরী নিশ্চিতভাবে হযরত 'আলীর (রা) সাথে সম্পৃক্ত। মুহাদ্দিছীন কিরামের নিকট এ সম্পর্ক প্রমাণিত নয়। তবে শায়খ আহমাদ কাসতাশী তাঁর 'ইকদুল ফারীদ ফী সালাসিলি আহলিত তাওহীদ' গ্রন্থে একটি আলোচনায় তাসাউফপন্থীদের সমর্থন করেছেন।" অন্য এক স্থানে তিনি লিখেছেন, সূফীরা এ ব্যাপারে একমত যে, হাসান আল-বসরী (রহ) হযরত 'আলীর (রা) নিকট থেকে ফয়েজ লাভ করেছেন।[৩৭]

প্রথম পর্বের ও পরবর্তী কালের সকল সূফী হযরত হাসান আল-বসরীকে এই নূরানী সিলসিলার উৎসধারা এবং 'শায়খুশ শুয়ূখ' (শায়খদের শায়খ) বলে গণ্য করেন। তাঁর বাণী দ্বারা তাঁরা প্রমাণ উপস্থাপন করেন। সূফীদের আলোচনায় তাঁর নামটি তালিকার শীর্ষস্থানে থাকে। তাঁর সকল বাণী ও কথা তাসাউফ শিক্ষার পাঠ্যসূচী হিসেবে গণ্য করা হয়। শায়খ ফরীদ উদ্দীন 'আত্তার, শায়খ 'আলী ইবন 'উছমান হাজবীরী (মৃত্যু ৪৬৫হি.), শায়খ আবূ নাসর সাররাজ (মৃত্যু ৩৭০ হি.), শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রাওয়ার্দি (রহ) প্রমুখ

---

৩৬. ইবনুল জাওযী ঃ আল-হাসান আল-বসরী-৬৯-৭০
৩৭. ইনতিবাহুন ফী সালাসিলি আওলিয়াইল্লাহ, ১৮, ৩১

সূফী তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য ও লেখায় হযরত হাসান আল-বসরীর কথাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।[৩৮]

হযরত হাসান আল-বসরী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীতে পূর্ণতা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন যুহ্দ ও তাকওয়ার বাস্তব প্রতিকৃতি এবং নৈতিক গুণাবলীর জীবন্ত চিত্র। তিনি যদিও নুবুওয়াত ও রিসালাতের পবিত্র যুগ দেখার সুযোগ পাননি এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সুহ্বত লাভের গৌরব অর্জন করতে পারেননি, তবুও তাঁর চরিত্র ও নৈতিকতা যেন সেই পবিত্র ছাঁচে ঢালাই করে গড়ে তোলা হয়। তাবি'ঈদের দলে তাঁর চেয়ে বেশী আর কারো জীবন রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের জীবনের অনুরূপ ছিল না। তাঁর প্রতিটি আচরণে সাহাবীদের আচার-আচরণের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতো। উঁচু স্তরের তাবি'ঈগণও একথা অকপটে স্বীকার করেছেন। হযরত আবু বুরদা, যিনি ছিলেন একজন উঁচু স্তরের তাবি'ঈ, বলতেন, আমি সাহাবীদের দলের বাইরের কোন লোককে হাসানের চেয়ে বেশী রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিনি।[৩৯] ইমাম শা'বী সত্তর জন সাহাবীকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আর এ সৌভাগ্যে সম্ভবত তিনি হাসান আল-বসরী থেকেও এগিয়ে ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রতি সীমাহীন সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাতেন। একবার ইমাম শা'বীর ছেলে প্রশ্ন করলো, আব্বা! আমি দেখি, আপনি এই শায়খ (হাসান)-এর সাথে যেমন আচরণ করেন, তেমন আচরণ আর কারো সাথে করেন না। এর কারণ কি? তিনি বললেন : বেটা, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সত্তর জন সাহাবীকে দেখেছি। কিন্তু হাসানের চেয়ে অন্য কাউকে তাঁদের মত দেখিনি।

হৃদয়ের দুঃখ-বেদনাই হলো আধ্যাত্মিকতার উৎস। সেখান থেকেই উৎসারিত হয় যাবতীয় 'ইবাদাত-বন্দেগী, তাকওয়া-পরহেযগারী, আত্মসংযমের অনুশীলনী ইত্যাদির মত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী। হযরত হাসানের অন্তরটি সব সময় এত বেদনাবিধুর থাকতো যে, তার থেকে ব্যথার সুর ছাড়া আর কিছুই ধ্বনিত হতো না। ইউনুস বলেন, তাঁর উপর সব সময় একটা বেদনা ও বিষণ্নতার ছাপ লেগে থাকতো। তাঁর ঠোঁট হাসি যে কি জিনিস তা জানতো না। তিনি বলতেন, মু'মিনের হাসি হলো তার উদাসীনতার ফল। বেশী হাসলে অন্তর মরে যায়। তিনি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে অস্থিরভাবে কাঁদতেন।

তাঁর মধ্যে এত বেশী পরিমাণে খোদাভীতি সৃষ্টি হয় যে, প্রতিটি মুহূর্ত ভীত-শংকিত থাকতেন। ইউনুস ইবন 'উবায়দ বলেন, হাসান যখন আসতেন, মনে হতো তাঁর কোন অতি প্রিয়জনকে কবরে দাফন করে আসছেন। আর যখন বসতেন তখন মনে হতো তিনি এমন একজন কয়েদী যাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর যখন জাহান্নামের আলোচনা করতেন তখন মনে হতো তা কেবল তাঁর জন্যই তৈরী করা হয়েছে।[৪০]

---

৩৮. তাযকিরাতুল আওলিয়া-১/৩২৪
৩৯. তাবাকাত-৭/১৮
৪০. শাযারাতুয যাহাব-১/১৩৮

হযরত হাসান আল-বসরীর জীবনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবটুক যুহ্দ ও তাকওয়ার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। তাঁর সত্তাটি ছিল 'ইবাদাত-বন্দেগী ও রূহানী রিয়াদাত বা আধ্যাত্মিক সাধনা ও অনুশীলননের বাস্তব প্রতিকৃতি। হাজ্জাজ আল-আসওয়াদ বলেন, এক ব্যক্তি কামনা করতো, যদি সে হাসানের যুহ্দ, ইবন সীরীনের তাকওয়া, 'আমির ইবন 'আবদি কায়সের 'ইবাদাত এবং সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের ফিকাহ্র জ্ঞান অর্জন করতে পারতো! লোকেরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের পর দেখতে পেল, এক হাসানের মধ্যে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর মজলিস-মাহফিলে এক আখিরাত ছাড়া আর কোন কিছুর আলোচনা হতো না। আশ'আছ বর্ণনা করেছেন, যখন আমরা হাসানের কাছে যেতাম তখন আমাদের কাছে না দুনিয়ার কোন খবর জিজ্ঞেস করা হতো, আর না দুনিয়ার কোন খবর দেওয়া হতো। কেবল আখিরাতের আলোচনাই চলতো। আল-'উতবা বলেন, আমি আমার শায়খদের বলতে শুনেছি : তাবি'ঈদের আট ব্যক্তি পর্যন্ত এসে যুহ্দ (তপস্যা ও বৈরাগ্য) শেষ হয়েছে। তাঁরা হলেন : 'আমির ইবন 'আবদিল কায়স, আল-হাসান ইবন আবিল হাসান আল-বসরী, হারিম ইবন হায়্যান, আবু মুসলিম আল-খাওলানী, উওয়ায়স আল-কারানী, আর-রাবী' ইবন খুছায়ম, মাসরূক ইবন আল-আজদা' ও আল-আসওয়াদ ইবন য়াযীদ।[৪১]

ফরজ ও সুন্নাত ছাড়া তাঁর বিশেষ 'ইবাদাতসমূহ সম্পূর্ণ গোপনে ও নির্জনে হতো। সে সময় তিনি ভিন্ন এক জগতে অবস্থান করতেন। হুমায়দ বলেন, একবার আমরা যখন মক্কায় ছিলাম তখন শা'বী হাসানের সাথে একান্তে সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আমি তাঁর ইচ্ছার কথা হাসানকে জানালাম। তিনি বললেন, যখন ইচ্ছা, আসুক। দেখা হবে। কথামত একদিন তিনি আসলেন। আমি দরজায় হাজির ছিলাম। আমি তাঁকে জানালাম, এখন হাসান ঘরে একাকী আছেন। আপনি ভিতরে যান। কিন্তু একা ভিতরে যাওয়ার সাহস তাঁর হলো না। এ কারণে, আমাকেও সাথে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সুতরাং আমিও সাথে চললাম। যখন আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম তখন হাসান কিবলামুখী হয়ে এক বিস্ময়কর ভঙ্গি ও অবস্থায় উচ্চারণ করে চলেছেন : ওহে বানী আদম, তুমি কিছু ছিলেনা, তোমাকে অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তুমি চেয়েছো, তোমাকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যখন তোমার পালা এসেছে, তোমার কাছে চাওয়া হয়েছে, তখন তুমি অস্বীকার করে বসেছো। আফসোস! তুমি কত বড় খারাপ কাজ করেছো। একথা বলতে বলতে তিনি অচেতন হয়ে পড়ছিলেন। তারপর আবার চেতনা ফিরে পেয়ে একই বাক্যগুলি আবার আওড়াচ্ছিলেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে শা'বী আমাকে বললেন, ফিরে চলো। এখন শায়খ ভিন্ন জগতে আছেন।

খালিদ ইবন সাফওয়ানের নিকট হাসান আল-বসরী (রহ) সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন : হাসানের বাহির ভিতরের সাথে এবং ভিতর বাইরের সাথে সবচেয়ে বেশী

---

৪১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৭১

সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তিনি অন্যকে যা কিছু করার জন্য বলতেন নিজে তা সবচেয়ে বেশী 'আমল করতেন। দুনিয়ার যা কিছু মানুষের হাতে, সে ব্যাপারে তিনি মুখাপেক্ষীহীন। আর দীনের যা কিছু তাঁর কাছে আছে সে ব্যাপারে মানুষ তাঁর মুখাপেক্ষী।[৪২]

তাঁর কাছে যুহ্দ ও তাকওয়া কেবল মৌখিক দাবী এবং বাহ্যিক বেশ-ভূষার নাম নয়। বরং তার মূল প্রাণসত্তা হলো 'আমল ও ইখলাস। তিনি বলতেন, মানুষ মুখে যা কিছু বলে তার কিছু যদি করতো, তাহলে তা তার জন্য মর্যাদার কাজ হতো। আর যদি করার চেয়ে বেশী বলে, তাহলে তা হবে তার জন্য লজ্জার বিষয়। তাঁর গোটা জীবনই ছিল কর্মের বাস্তব নমুনা। আবু বাকর আল-হুযালী বলেন, তিনি যতক্ষণ নিজে কোন কাজ না করতেন ততক্ষণ অন্যকে করার জন্য বলতেন না। আর যতক্ষণ কোন কাজ নিজে ছেড়ে না দিতেন, অন্যকে তা থেকে বিরত থাকার কথা বলতেন না। কোন এক ব্যক্তি ইউনুস ইবন 'উবায়দের কাছে প্রশ্ন করে : তুমি এমন কাউকে কি জান যিনি হাসান আল-বসরীর মত এত 'আমল করেন! তিনি বলেন : এত 'আমল তো দূরের কথা, এমন কোন ব্যক্তিকেও আমি জানিনে যিনি মুখে হাসানের মত কথা বলেন।[৪৩]

ইখলাস ছাড়া শুধু হালকায় বসে যিকর-আযকার করা এবং ছিঁড়া মোটা কাপড় পরাকে তিনি ধোঁকাবাজি বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন, আমাদের হালকায় বহু লোক বসে। কিন্তু তাদের অনেকের উদ্দেশ্য থাকে পার্থিব সুখ-সুবিধা প্রাপ্তি। একবার তাঁর সামনে মোটা পোশাক পরার আলোচনা উঠলে তিনি বলেন, এ ধরনের লোকেরা তাদের অন্তরের গভীরে অহংকারের প্রতিমা লুকিয়ে রাখে, আর প্রকাশ্য পোশাক-আশাকে বিনয়ী ও স্বল্পে তুষ্টি ভাব প্রকাশ করে। এমন মোটা পোশাকের চেয়ে মূল্যবান পোশাক পরা অনেক শ্রেয়।[৪৪]

মোটা ও কমদামী পোশাকের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য মাঝে মধ্যে তিনি মূল্যবান পোশাকও পরতেন। কুলছুম ইবন জাওশান বলেন, একবার হাসান দামী জোব্বা গায়ে দিয়ে চাদর ঝুলিয়ে বাইরে গেলেন। তাঁকে এ পোশাকে দেখে এক ব্যক্তি বললো, আপনার মত মানুষের গায়ে এ পোশাক মানায় না। তিনি বললেন, তোমরা জান না যে, দোযখীদের বড় একটি অংশ কমদামী মোটা পশমী পোশাক পরিধানকারীরাই হবে।

মানুষের সবচেয়ে বড় দুশমন তার 'নাফ্স' নিজে। সে তাকে আত্মতুষ্টি, রিয়াকারি, অহংকার ইত্যাদি ধোঁকার জালে আবদ্ধ করে ধ্বংস করে দেয়। হযরত হাসান আল-বসরী এই ধোঁকা এবং চাকচিক্যময় মরীচিকার ব্যাপার নিয়ে সব সময় ভীষণ ভীত থাকতেন এবং উঠতে বসতে এই দু'আ করতেন : 'হে আল্লাহ্, শির্ক, অহমিকা, কপটতা, রিয়া, ধোঁকাবাজি, খ্যাতি ও প্রচারের ইচ্ছা এবং আমার দীনের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে আমাদের অন্তরগুলিকে দীনের উপর স্থির ও অটল রাখ এবং সত্য-সঠিক ইসলামকে

---

৪২. প্রাগুক্ত-২/২৩০
৪৩. শাযারাতুয যাহাব-১/১৩৭
৪৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/১৫৩; 'উয়ূন আল-আখবার-২/৩৭২

আমাদের দীন বানিয়ে দাও। তিনি বলতেন, নাফসের স্বভাব হলো কামনা-বাসনার প্রতি ঝোঁক প্রবণতা, তোমরা যিকরের সাহায্যে তা পরিশুদ্ধ কর।[৪৫]

তিনি সাধারণ মানুষের ভক্তি ও ভালোবাসাকেও একটি পরীক্ষা বলে মনে করতেন। কারণ, তাতে যে ব্যক্তিকে অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানো হয় তার মনে অহংকার জন্ম নিতে পারে। আর তাতে তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই তিনি অহেতুক ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখানো পছন্দ করতেন না।

নাফসের ধোঁকা ও আত্ম-অহমিকার হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি নিজের প্রশংসা শোনা একেবারেই পছন্দ করতেন না। সা'ঈদ ইবন মুহাম্মাদ আছ-ছাকাফী বলেন, যদি কেউ হাসানের সামনে তাঁর প্রশংসা করতো, তা হলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন। আর যদি মানুষ তাঁর জন্য দু'আ করতো, তিনি দারুণ সন্তুষ্ট হতেন। তিনি মনে করতেন, একজন উপদেশ দানকারীর উপদেশের প্রভাব ও কার্যকারিতা নির্ভর করে তার নিজের অন্তরের নিষ্ঠা ও পরিশুদ্ধির উপর। অপরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে কাউকে উপদেশ দান করলে তা শ্রোতার মনে কোন রেখাপাত করে না। একবার এক ব্যক্তি হযরত হাসানের (রহ) উপস্থিতিতে মন গলে যায়, উপদেশমূলক এমন অনেক কথা বললেন। হাসান মনোযোগ সহকারে লোকটির কথা শুনলেন। কিন্তু তিনি তাঁর অন্তর নরম হওয়ার মত কিছুই অনুভব করলেন না। তখন তিনি লোকটিকে বললেন : হয় আমাদের মধ্যে কোন মন্দ আছে, নয়তো আছে তোমার মধ্যে।[৪৬]

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি তাঁর যুগের দুনিয়া বিরাগী লোকদের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ব্যাপকভাবে এ দুনিয়াতে যুহ্দ ও তাকওয়া অবলম্বনের আহ্বান জানাতেন। তবে প্রচলিত অর্থে তিনি কোন সূফী ছিলেন না। আসলে তাসাউফ ও যুহ্দ দু'টি ভিন্ন জিনিস। তবে সূফীরা যাহিদ হয়ে থাকেন। তবে সব যাহিদ ব্যক্তি সূফী হন না। তাসাউফ ও সূফী মতবাদের উৎপত্তি তো হাসান আল-বসরীর (রহ) যুগের বেশ পরে। আর একথাই বলেছেন বিশিষ্ট মিশরীয় পণ্ডিত ডঃ শাওকী দায়ফ।[৪৭]

যুহ্দ ও তাকওয়া বা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার প্রতি উদাসীনতা ও খোদাভীরুতার জন্য তাঁর সময়কালের লোকেরা যেমন তাঁকে অনেক উঁচু স্তরের ব্যক্তি বলে মনে করেছে, তেমনিভাবে পরবর্তীকালের পৃথিবীর মানুষ তাঁকে তেমনই বিশ্বাস করেছে। তাঁর এ যুহ্দ ও তাকওয়ায় কোন রকম ভনিতা ও কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। এর ভিত্তি ছিল সম্পূর্ণ ইসলামী আদব-আখলাকের উপর। নুবুওয়াতের কেন্দ্রভূমি মদীনায় অবস্থিত তার প্রকৃত উৎস থেকে তিনি তা আহরণ করেন। পরবর্তীকালের প্রত্যেকটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদেরকে তাঁরই অনুসারী বলে দাবী করেছে। তাদের 'আকীদা-বিশ্বাসকে তাঁরই 'আকীদা-বিশ্বাস বলে মনে করেছে। যেমন জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের

---

৪৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৪১; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৯৭
৪৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৪/২৯
৪৭. ডঃ শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব-২/৪৭

লোকেরা যেমন বলতো, তিনি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন, জগতের সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। তেমনিভাবে কাদরিয়্যা সম্প্রদায় দাবী করতো যে, তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ তাঁর কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর সূফীরা তো তাঁকে তাদের ইমামের স্থান দান করেন।

পরস্পর বিরোধী বর্ণনা বিচার-বিশ্লেষণ করে অনেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তিনি ছিলেন একজন কাদরী। কারণ, তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি এমন বিশ্বাস পোষণ করে যে, সব ধরনের পাপ আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, কিয়ামতের দিন সে কালো মুখ নিয়ে উঠবে। আর তিনি যদি জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতেন তাহলে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের 'আকীদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী 'আব্বাসী যুগের প্রখ্যাত লেখক আল-জাহিজ তাঁর ভূয়ষী প্রশংসা করতেন না। তাঁর 'আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন' গ্রন্থে যেখানেই হাসান আল-বসরীর নামটি এসেছে, অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে খুব বড় করে উল্লেখ করেছেন। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, একবার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ 'কাদর' সম্পর্কে হযরত হাসানের (রহ) মতামত জানতে চেয়ে তাঁকে একটি চিঠি লেখেন। তিনি সে চিঠির যে জবাব দেন তাতে ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার করা আল্লাহর জন্য অপরিহার্য–যা তিনি বিশ্বাস করতেন, লেখেন। খলীফা আবদুল মালিকের নিকট পাঠানো অপর একটি চিঠিতে একই ভাব ব্যক্ত করেন বলে বলা হয়েছে।[৪৮]

কিছু কিছু বর্ণনা দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, হযরত হাসান আল-বসরী 'কাদরিয়্যা' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু একথা সঠিক নয়। সম্ভবত এমন প্রচারের কারণ এই যে, উঁচু স্তরের তাবি'ঈদের অনেকে এ ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, কাদরিয়্যাদের অনেকের সাথে মেলামেশাও পছন্দ করতেন না। আর তিনি তাদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসায় কোন দোষ মনে করতেন না। তাঁদের সাথে খোলামেলা আলোচনাও করতেন।[৪৯] তাঁর এ উদারতার কারণে কোন কোন অনভিজ্ঞ লোক তাঁকে কাদরিয়্যাদের বিশ্বাসের প্রতি সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। অথচ তিনি এমন বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। 'উমার বলেন, কাদরিয়্যারা হাসানের নিকট আসা-যাওয়া করতো। তবে তাদের ধ্যান-ধারণা পরস্পরের বিপরীতে ছিল। হাসান বলতেন, আদমের সন্তানেরা! তোমরা আল্লাহকে নারাজ করে কোন মানুষের খুশী অর্জন করবে না। আল্লাহর নাফরমানীর ব্যাপারে কারো আনুগত্য করবে না, আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কোন মানুষের প্রশংসা করবে না। যে জিনিস আল্লাহ তোমাকে দেননি তার জন্য কোন মানুষকে তিরস্কার করবে না। আল্লাহ মাখলূকাতকে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজের সৃষ্টি করার নীতির উপর চলছেন। কোন ব্যক্তি যদি ধারণা করে যে, সে তার লোভের দ্বারা রিযিক বৃদ্ধি করতে পারে,

---

৪৮. প্রাগুক্ত-২/৪৮

৪৯. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/৩৭৭, ৩৮৬-৩৮৭

তাহলে সে তার জীবনকাল বৃদ্ধি করে, তার দেহের রং পরিবর্তন করে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কিছু সংযোজন করে তার সত্যতা প্রমাণ করুক। যখন এমনটি হবার নয় তখন বুঝা যায় মানুষের কোন কর্তৃত্ব নেই। সবকিছু আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী চলছে।[৫০]

আসল কথা হলো, তাঁর কিছু দ্ব্যর্থবোধক অস্পষ্ট কথার ভুল অর্থ করা হয়েছে। যদি কোনভাবেই কাদরিয়্যাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন তাহলে পরবর্তীকালে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ইমাম আল-আসমা'ঈ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাসান এক পর্যায়ে কদর-এর কিছু অংশের উপর আলোচনা করতেন। কিন্তু পরে তা থেকে ফিরে আসেন। কাজী 'আতা' ইবন ইয়াসার ছিলেন একজন কাদারী। তাঁর বাগ্মিতাও ছিল জাদুর মত ক্রিয়াশীল। তিনি এবং সা'ঈদ জুহানী হাসানের নিকট আসতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কাছে প্রশ্ন করতেন। তাঁরা বলতেন, আবু সা'ঈদ! এই শাসকরা মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত করে, তাদের ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়, আর বলে এসব কাজ আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী হচ্ছে। হাসান একথা শুনে বলতেন, আল্লাহর এই দুশমনেরা মিথ্যাবাদী। এ জাতীয় কিছু ঘটনার দ্বারা কিছু লোক তাঁকে কাদারী বলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।[৫১] অথচ এ একটি বিশেষ ঘটনা ছিল, কাদরের 'আকীদার সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই।

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের প্রধান পুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবন 'আতা ছিলেন হাসান আল-বসরীর (রহ) অন্যতম ছাত্র। একবার হাসান আল-বসরীকে কাবীরা গোনাহ্ বা মারাত্মক পাপের অধিকারী ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। অর্থাৎ পরকালে তার অবস্থান কোথায় হবে- জান্নাত না জাহান্নামে? তিনি জবাব দিতে কিছুক্ষণ দেরী করলেন। এই দেরী দ্বারা সম্ভবত তিনি এটাই বুঝাচ্ছিলেন যে, সেটা নির্ভর করবে আল্লাহর ফয়সালা ও মর্জির উপর। কিন্তু তাঁর ছাত্র ওয়াসিল ইবন 'আতা প্রশ্নটির চূড়ান্ত জবাব দিয়ে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, কাবীরা গোনাহ্কারীর অবস্থান হলো দুইটি অবস্থার মধ্যবর্তী একটি পর্যায়ে। সে পূর্ণ মু'মিন নয়। কারণ সে ঈমানের বিষয়সমূহের অন্তত কোন একটি বাদ দিয়েছে। তেমনিভাবে সে পূর্ণ কাফিরও নয়। কারণ, এখনো সে ঈমানের আনুসঙ্গিক বহু কর্ম সম্পাদন করে থাকে। তবে সে ফাসিক। সুতরাং সে 'ফিস্ক'-এর পর্যায়ে আছে, যা ঈমান ও কুফর-এর মধ্যবর্তী একটি পর্যায়। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না এবং আখিরাতে সে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি স্থানে অবস্থান করবে। হাসান আল-বসরীর (রহ) যে সকল ছাত্র ওয়াসিলের এই মতকে গ্রহণ করে, তিনি তাদেরকে হাসানের দারসের মজলিস থেকে সরিয়ে নিয়ে মসজিদের এক কোণে বসান এবং তাদের সামনে নিজের মতটি ব্যাখ্যা করতে থাকেন। যারা সেদিন ওয়াসিলকে অনুসরণ করে তাদের লক্ষ্য করে হাসান আল-

---

৫০. তাবাকাত-৭/১২৭
৫১. শাযারাতুয যাহাব-১/১৩৮

বসরী (রহ) বলেন : اِعْتَزَلَ عَنَّا - সে আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আর সেই থেকে ওয়াসিলের বিরুদ্ধবাদীরা ওয়াসিল ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি 'আল-মু'তাযিলা' নামটি আরোপ করে।[৫২]

হযরত হাসান আল-বসরীর শিরা-উপশিরার রক্ত সর্বদা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জন্য টগবগ করতো। যদিও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ছাড়া তাঁর জিহাদে অংশগ্রহণের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে সীরাত বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত যে, শৈশব থেকে তাঁর অন্তরে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর তীব্র বাসনা বিদ্যমান ছিল এবং তিনি বুদ্ধি-জ্ঞান হওয়ার পর জিহাদকে নিজের জীবনের বিশেষ 'আমল বা কর্ম হিসেবে গ্রহণ করেন।[৫৩]

কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি তাঁর সময়ে সংঘটিত অধিকাংশ জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। তবে কাবুল, আন্দাকান ও উজবেকিস্তানের অভিযান ছাড়া অন্যান্য অভিযানের ব্যাপারে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত এর কারণ এই যে, তিনি ছিলেন একজন নীরব কর্মী মানুষ। খ্যাতি ও প্রচার ছিল তাঁর খুবই অপ্রিয়। তাঁর জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য হতো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। এ জন্য একজন সাধারণ সিপাহী হিসেবে সৈন্য-বাহিনীতে যোগদান করতেন। আর এ ধরনের সাধারণ সিপাহীদের বিবরণ ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে বিশেষ একটা স্থান পায় না।

হযরত হাসান (রহ) যে একজন সাহসী পুরুষ ছিলেন সে কথা অনেকেই বলেছেন। ইমাম আয-যাহাবী (হি. ৭৪৮/খ্রী. ১৩৪৭) বলেছেন :

" كان أحد الشجعان الموصوفين يذكر مع قطرى بن الفجاءة."

–হাসান ছিলেন নন্দিত সাহসী বীরদের একজন– কাতারী ইবন আল-ফুজায়ার সাথে যার নামটি স্মরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, কাতারী ছিলেন উমাইয়্যা যুগের একজন বিখ্যাত খারিজী নেতা।

অত্যাচারী শাসক এবং স্বৈরাচারী আমীর-উমারার মুখোমুখি সত্যের ঘোষণা দান এবং আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ছিল উম্মাতের সত্যনিষ্ঠ মানুষের চিরকালীন বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তবে এক্ষেত্রে হাসান আল-বসরীর কর্মপদ্ধতি ছিল ভিন্ন ধরনের। তিনি তাদের বিপরীতে নীরব থাকা উত্তম মনে করতেন। 'আম্মারা ইবন মাহ্‌রান বলেন, একবার লোকেরা হাসান আল-বসরীকে বললো, আপনি শাসকদের নিকট গিয়ে তাঁদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করেন না কেন? জবাব দিলেন, একজন মু'মিনের তার আত্মাকে হেয় করা উচিত নয়। এ যুগের আমীরদের তলোয়ার আমাদের জিহ্বাকে অতিক্রম করে গেছে। যখন আমরা তাঁদের সাথে কথা বলি তখন

---

৫২. আবদুল কাহির আল-বাগদাদী : আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক, পৃ. ৯৭-৯৮; ডঃ 'উমার ফাররূখ : তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-১/৬৪৬

৫৩. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৭১

তাঁরা আমাদেরকে জবাব দেয় তলোয়ার দিয়ে। এ অবস্থায় তিনি জুলুমের তরবারির মুকাবিলায় তাওবার ঢাল ব্যবহারের উপদেশ দিতেন। আবু মালিক বলেন, হাসানকে যখন বলা হতো, আপনি ময়দানে নেমে এই অবস্থার পরিবর্তন করেন না কেন? বলতেন, আল্লাহ্ তরবারির সাহায্যে নয়, বরং তাওবার সাহায্যে পরিবর্তন করেন। তিনি বলতেন, যখন মানুষকে তাদের শাসকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের বিপদ-মুসীবতে ফেলা হয়, আর তারা ধৈর্য ধারণ করে, তখন আল্লাহ তাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি সেই মুসীবত থেকে মুক্ত করেন। তবে যারা তরবারি কোষমুক্ত করে এবং তার উপর নির্ভর করতে আরম্ভ করে, আল্লাহর কসম! কখনো তার ভালো ফলাফল বের হয় না।

এ কারণে তিনি সব সময় যাবতীয় হৈ-হাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লব থেকে দূরে থাকতেন। উমায়্যাদের শাসনকালে অনেক বড় বড় বিপ্লব ও বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী তাদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু হযরত হাসান আল-বসরী নিজের নীতির ভিত্তিতে তার কোনটিতে অংশগ্রহণ করেননি। শুধু তাই নয়, তিনি অন্যদেরকেও তাদের খপ্পরে পড়া থেকে বিরত রাখতেন। খলীফা 'আবদুল মালিকের সময় যখন ইবনুল আশ'আছ এবং ইয়াযীদ ইবন আবদুল মালিকের সময় ইবনুল মুহাল্লাব বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেন তখন কিছু মানুষ হাসান আল-বসরীকে জিজ্ঞেস করলো, এই ফিতনা ও বিশৃঙ্খলায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে আপনার মত কি? বললেন, দুই দলের কোনটির সাথে যোগ দেবে না। একজন শামী ব্যক্তি প্রশ্ন করে বসলো, আমীরুল মু'মিনীনের সাথেও কি যোগ দেওয়া যাবে না? তিনি শামী ব্যক্তিকে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পূর্বে উচ্চারিত বাক্যটি আবার উচ্চারণ করে বললেন, হাঁ, আমীরুল মু'মিনীনের সাথেও না।[৫৪]

ইবনুল আশ'আছ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিশাল একটি দল, যার মধ্যে কিছু উঁচুস্তরের তাবি'ঈও ছিলেন, তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে। 'উকবা ইবন আবদুল গাফির, আবুল জাওযা' ও আবদুল্লাহ ইবন গালিবের মত কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন : আবু সা'ঈদ এমন খোদাদ্রোহী, যে অন্যায়ভাবে মানুষের রক্ত প্রবাহিত করে, অবৈধভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করে, নামায ত্যাগ করে, এমন এমন করে– তার সাথে লড়াই করার ব্যাপারে আপনার মত কি?

বললেন, আমার মতে লড়াই করা উচিত নয়। কারণ, সে যদি আল্লাহর 'আযাব হয়ে থাকে তাহলে তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে হঠাতে পারবে না। আর যদি বিপদ-মুসীবত হয়ে থাকে তাহলে ধৈর্য ধারণ করা উচিত। যতক্ষণ না আল্লাহ্ নিজেই তার ফায়সালা করেন। আল্লাহ্ বড় ফায়সালাকারী।

ইবনুল আশ'আছের বিপ্লব ও বিদ্রোহের সময়কালে হযরত হাসান আল-বসরী নিজেই বড় ধরনের মুসীবতে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোন রকম নিজকে

---

৫৪. তাবাকাত-৭/১১৮-১১৯

বিপদমুক্ত করেন। তিনি এত বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে, শুধু বসরা কেন, গোটা ইরাকে তাঁর বিরাট প্রভাব ছিল। ইবনুল আশ'আছের বিপ্লব থেকে তাঁর দূরে থাকার কারণে বহু সতর্ক মানুষ তাঁকে সাহায্য না করে দূরে সরে থাকতো। এ কারণে লোকেরা ইবনুল আশ'আছকে বললো, আপনি যদি চান যে, যেভাবে মানুষ উটের যুদ্ধে 'আয়িশার (রা) উটের পাশে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছে, সেভাবে আপনার জন্য যুদ্ধ করুক তাহলে যে কোন ভাবে হাসানকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে চলুন। এ পরামর্শের পর ইবনুল আশ'আছ তাঁকে জোর-জবরদস্তি সহকারে নিয়ে যান। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে তিনি তো গেলেন। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি যেই না তাঁর থেকে একটু উদাসীন হয়েছে, অমনি তিনি জীবন বাজি রেখে একটি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপর সাঁতার কেটে কোন রকম জীবন বাঁচিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন।

সেই সময় সা'ঈদ ইবন আবিল হাসান নামে এক ব্যক্তি– যিনি হাজ্জাজের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং মানুষকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতেন, হাসান আল-বসরীর নিকট জানতে চাইলেন, আমরা না আমীরুল মু'মিনীনের আনুগত্য ত্যাগ করেছি, আর না তাঁকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনতে চাচ্ছি। আমরা বরং কেবল এ কারণে আমীরুল মু'মিনীনের উপর বিরক্ত যে, তিনি হাজ্জাজের মত একজন জালিম ব্যক্তিকে শাসক বানিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনার মতামত কি? আর শামবাসীদের ব্যাপারেও বা আপনার ধারণা কি? তিনি হামদ ও ছানা পেশের পর বলেন : ওহে জনগণ! আল্লাহ হাজ্জাজকে শাস্তি হিসেবে চাপিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে তরবারির সাহায্যে আল্লাহর শাস্তির মুকাবিলা করবে না।[৫৫] বরং ধৈর্য, সহনশীলতা ও নীরবতা অবলম্বন কর। ... আর আল্লাহর দরবারে অন্তরের প্রশান্তি ও বিনীত ভাব দ্বারা কাজ করবে। আপনারা শামীদের ব্যাপারে আমার মত জানতে চেয়েছেন। আমার ধারণা যে, হাজ্জাজ দুনিয়ার কিছু তাজা গ্রাসের বিনিময়ে তাদের দ্বারা কাজ করাতে পারেন।[৫৬]

হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) সর্বক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসকদের জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীরব থাকেননি। যখনই তিনি নিজের মতামত, সিদ্ধান্ত ও ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছেন তখনই নির্ভীক চিত্তে সঠিক কথা বলে দিয়েছেন। এ বিষয়ে অনেক ঘটনা ও তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইয়াযীদ ইবন 'আবদুল মালিকের সময়ে 'উমার ইবন হুবায়রা খুরাসান ও 'ইরাকের ওয়ালী নিযুক্ত হন। তিনি 'ইরাকে এসে তথাকার শ্রেষ্ঠ 'আলিম, যেমন : হাসান আল-বস্‌রী, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন এবং ইমাম শা'বীকে ডেকে ফাত্‌ওয়া জিজ্ঞেস করার ভঙ্গিতে তাঁদেরকে প্রশ্ন করলেন : ইয়াযীদ আল্লাহর খলীফা। আল্লাহ তাঁকে বান্দাদের উপর তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। আল্লাহ তাঁর নিকট থেকে নিজের আনুগত্য এবং আমাদের (আমীরদের) থেকে ইয়াযীদের আদেশ-নিষেধের বাস্তবায়নের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। আপনাদের জানা আছে যে,

---

৫৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/৫০
৫৬. তাবাকাত-৭/১১৮-১২০

তিনি আমাকে ওয়ালী নিয়োগ করেছেন এবং আমার নিকট বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ পাঠান। আমি তা কার্যকর করে থাকি। এ অবস্থায় এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? ইবন সীরীন ও শা'বী তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেকটা পরোক্ষভাবে জবাব দিলেন। হাসান একেবারেই চুপচাপ ছিলেন। সবশেষে ইবন হুবায়রা তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। তিনি জবাব দিলেন এভাবে : 'ওহে ইবন হুবায়রা, ইয়াযীদের ব্যাপারে আপনি আল্লাহকে ভয় করুন, আল্লাহর ব্যাপারে ইয়াযীদকে ভয় করবেন না। আল্লাহ আপনাকে ইয়াযীদের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। কিন্তু সে আপনাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারবে না। সে সময় খুবই নিকটে যখন আল্লাহ আপনার নিকট এমন ফেরেশতা পাঠাবেন যে আপনাকে রাষ্ট্রীয় পদ থেকে নামিয়ে এবং প্রাসাদের প্রশস্ততা থেকে বের করে কবরের সংকীর্ণতার মধ্যে নিক্ষেপ করবেন। সে সময় কেবল আপনার কর্ম ছাড়া আর কেউ আপনাকে উদ্ধার করতে পারবে না।

আল্লাহ তাঁর দীন এবং তাঁর বান্দাদের সাহায্যের জন্য বাদশাহ ও বাদশাহী বানিয়েছেন। এ কারণে আল্লাহর দেয়া বাদশাহীর বদৌলতে আপনারা আল্লাহর দীন এবং তাঁর বান্দাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসবেন না। আল্লাহর অবাধ্যতার ব্যাপারে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা উচিত নয়। সুতরাং ইয়াযীদ যা লিখেছেন তা আল্লাহর কিতাবের সাথে মিলান। যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে পালন করুন। আর যদি আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থী হয়, পালন করবেন না। কারণ, ইয়াযীদের চেয়ে আল্লাহ এবং ইয়াযীদের চিঠির চেয়ে আল্লাহর কিতাব আপনার নিকট অগ্রগণ্য। হাসানের (রহ) এ বক্তব্য শুনে ইবন হুবায়রা তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে থাপ্পড় মেরে বলেন : কা'বার প্রভুর শপথ! এই শায়খ আমাকে সত্য কথা বলেছেন। তারপর তিনি অঝোরে কাঁদতে থাকেন। এরপর তিনি হাসানকে (রহ) চার হাজার ও অন্যদেরকে দুই হাজার করে দিরহাম দানের নির্দেশ দেন। হাসান তাঁর দিরহামগুলি দরিদ্র লোকদের মধ্যে বিলি করে দেন।[৫৭]

তিনি তিন ধরনের মানুষের সমালোচনাকে গীবত বলে মনে করতেন না। ১. প্রকাশ্য পাপাচারে লিপ্ত ফাসিক, ২. অত্যাচারী শাসক, ৩. বিদ'আতী ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে তার বিদ'আত ত্যাগ করে।[৫৮]

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ জুম'আর খুতবা এত দীর্ঘ করতেন যে, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যেত। শ্রোতারা যখন বিরক্ত হয়ে বার বার সূর্যের দিকে তাকাতো তখন তিনি তাদেরকে ধমক দিতেন এবং মনোযোগ সহকারে তাঁর বক্তব্য না শোনার জন্য তিরস্কার করতেন। হাসান আল-বসরী (রহ) হাজ্জাজের এরূপ আচরণের কঠোর ভাষায় নিন্দা করতেন। একবার তিনি হাজ্জাজ সম্পর্কে বলেন : 'এই ক্ষীণ ও দুর্বল দৃষ্টির ক্ষুদ্র লোকটির কর্মকাণ্ড

---

৫৭. ইবন খাল্লিকান : ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/১২৮; ইবন কুতায়বা : 'উয়ূন আল-আখবার-২/৩৪৩; ইবন আবিল হাদীদ : শারহু নাহ্জিল বালাগা-৪/৫৯

৫৮. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/৩৩৭

কতনা বিস্ময়ের! সে এসে আমাদের দীনের ব্যাপারে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছে, সে মিম্বরে উঠে খুতবা দিয়ে থাকে, আর লোকেরা সূর্যের দিকে তাকায়। সে বলে : তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা সূর্যের দিকে তাকাও কেন? আল্লাহর কসম! আমরা সূর্যের জন্য নামায পড়ি না। আমরা নামায পড়ি সূর্যের প্রভুর জন্য। তোমরা কেন বলো না : হে আল্লাহর দুশমন, নিশ্চয় আল্লাহর রাতের কিছু অধিকার আছে যা তিনি দিনের বেলা কবুল করেন না। তেমনিভাবে আছে দিনের বেলার কিছু অধিকার যা তিনি রাতে কবুল করেন না।... এমন কথা তারা কেমন করে উচ্চারণ করবে? তাদের প্রত্যেকের মাথার উপর যে তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন করে তাগড়া জোয়ান সৈনিক।'[৫৯] আর একবার তিনি হাজ্জাজের একটি ভাষণ শুনে মন্তব্য করেন : এর জন্য দুর্ভাগ্য। আল্লাহর ব্যাপারে সে কতনা ধোঁকার মধ্যে আছে।[৬০] হাজ্জাজের মৃত্যুর খবর শুনে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। একবার ইয়াযীদ আর-রাক্কাশী হাসান আল-বসরীর (রহ) মজলিসে বললেন : আমি হাজ্জাজের ভালো আশা করি। হাসান (রহ) বলে উঠলেন : আমি আশা করি আল্লাহ তোমার আশার বিপরীত কাজ করবেন।[৬১]

বর্ণিত হয়েছে যে, হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ওয়াসিত[৬২] নগরে একটি 'আলিশান বাড়ী তৈরী করেন। নির্মাণ কাজ শেষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণীর বহু মানুষকে আমন্ত্রণ জানান। হাসান আল-বসরীকেও (রহ) আমন্ত্রণ জানানো হলো। সেখানে জনসমাগম হবে এবং উপদেশমূলক কিছু কথা বলা যাবে- হযরত হাসান (রহ) এ সুযোগ হারাতে চাইলেন না। তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, অসংখ্য আমন্ত্রিত মানুষ ঘুরে-ফিরে বাড়ীটি দেখছে এবং তার নির্মাণ-শৈলী, কারুকাজ, মনোরম সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছে। তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং নিজেকে প্রস্তুত করে সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে ভাষণ দিতে আরম্ভ করলেন। ভাষণটির কিছু অংশ নিম্নরূপ :

'সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের। পৃথিবীর রাজা-বাদশারা সবসময় নিজেদের সম্মান ও মর্যাদাকে দেখে, আর আমরা প্রতিদিন তাদের মধ্যে একটি করে উপদেশ ও অভিজ্ঞতা পেয়ে থাকি। তাদের অনেকে প্রাসাদ নির্মাণ করে, কারুকাজ করে, সুদৃশ্য ও কোমল বিছানায় সুসজ্জিত করে। উৎকৃষ্ট ও মনোরম পোশাক-পরিচ্ছদ ও উন্নত জাতের বাহনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। তারপর লোভী-পারিষদবর্গ, নরকের শয্যাসঙ্গিনী ও অসৎ সহচররা তাকে সবসময় ঘিরে থাকে। আর সে বলে : ওহে তোমরা দেখ, আমি কী তৈরী করেছি! ওহে বিভ্রান্ত ব্যক্তি, আমরা দেখেছি। ওহে নিকৃষ্ট পাপাচারী, তারা কী ছিল? আসমানের অধিবাসীরা তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, আর দুনিয়ার

---

৫৯. ড. আবদুল জলীল শালবী : আল-খিতাবা ওয়া ই'দাদ আল-খাতীব, পৃ. ২৬৭
৬০. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৪/১২৪
৬১. প্রাগুক্ত-৫/৪৯
৬২. দক্ষিণ ইরাকে দাজলা ও ফুরাতের মধ্যবর্তী স্থানের একটি শহর। হাজ্জাজ এ শহরটি পত্তন করেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। (জামহারাতু খুতাবিল আরাব-২/৪৯৪)

অধিবাসীরা তোমাকে অভিশাপ দিয়েছে। তুমি অস্থায়ী ঘরকে বানিয়েছো, আর চিরস্থায়ী ঘরকে ধ্বংস করেছো, ধোঁকার জগতে তুমি ধোঁকা খেয়েছো। সুতরাং প্রতিফল লাভের জগতে অবশ্যই হেয় ও অপমানিত হবে। তিনি এভাবে বলে চলেছেন। এমন সময় শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন হাজ্জাজের প্রতিশোধের ভয়ে ভীত হয়ে বললো : ওহে আবু সা'ঈদ, থামুন, আপনি থামুন। যথেষ্ট হয়েছে। তারপর তিনি একথা বলতে বলতে বেরিয়ে যান : নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 'আলিমদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তাঁরা যেন মানুষের নিকট আল্লাহর বিধান বর্ণনা করেন এবং তা যেন গোপন না রাখেন।'

হযরত হাসানের এ বক্তব্য হাজ্জাজের কানে গেল। তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্য থেকে শামের অধিবাসীদের ডেকে একত্র করলেন। তারপর তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : ওহে শামের অধিবাসীগণ, তোমাদের উপস্থিতিতে বসরার একজন দাস আমাকে গালাগালি করলো, আর তোমরা তার কোন প্রতিবাদ করলে না? তারপর হাজ্জাজ হযরত হাসানকে (রহ) তাঁর দরবারে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। তিনি ঠোঁট নেড়ে অস্ফুট স্বরে বিড় বিড় করে কিছু আওড়াতে আওড়াতে হাজ্জাজের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে হাজ্জাজ বলে উঠলেন : ওহে আবু সা'ঈদ, আপনি যা কিছু বলেছেন, তা বলার সময় আমার ইমারাতের (শাসন কর্তৃত্বের) কোন হক কি আপনার উপর ছিল না? হযরত হাসান (রহ) জবাবে বললেন : হে আমীর! আল্লাহ আপনার প্রতি সদয় হোন! নিশ্চয় যে ব্যক্তি আপনাকে ভয় দেখিয়ে আপনার নিরাপত্তার বিশ্বাসকে শঙ্কাগ্রস্ত করে তুলেছেন, তিনি আপনার অধিকতর মঙ্গল আকাংখী ঐ ব্যক্তির থেকে যে আপনাকে নিরাপত্তার বাণী শুনায়। আপনি যা ধারণা করেছেন, আমার উদ্দেশ্য তা ছিল না। এখন আপনার হাতে দুইটি বিষয় আছে : ক্ষমা ও শাস্তি। আপনি প্রথমটি করুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম মুখপাত্র। তাঁর এ কথায় হাজ্জাজ লজ্জিত হন এবং যথেষ্ট হাদিয়া-তোহফা দিয়ে সম্মানের সাথে তাঁকে বিদায় করেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত হাসান (রহ) প্রবেশের পর হাজ্জাজ তাঁকে হাত দিয়ে ইশারা করে বলেন : এখানে, আমার কাছে বসুন। বসার পর হাজ্জাজ প্রশ্ন করেন: 'আলী ও 'উছমান সম্পর্কে আপনি কি বলে থাকেন? হাসান বললেন : আমি বলে থাকি আমার চেয়ে ভালো ব্যক্তির সেই কথাটি যা তিনি আপনার চেয়ে মন্দ এক ব্যক্তির নিকট বলেছিলেন। ফির'আওন মূসাকে (আ) বলেছিল :[৬৩]

فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْأُوْلَى؟ قَالَ : عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتَابٍ لَايَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسَى.

---

৬৩. সূরা ত্বাহা-৫১

– অতঃপর সেই পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা কি? মূসা বললেন : তাদের জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা হারিয়ে ফেলেন না এবং ভুলেও যান না।

'আলী ও 'উছমান (রা) সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। হাজ্জাজ বললেন : আবু সা'ঈদ, সত্যি আপনি 'আলিমদের নেতা। একথা বলার পর তিনি মূল্যবান সুগন্ধি ও 'আতর আনান এবং হযরত হাসানের (রহ) দাড়িতে নিজ হাতে মাখিয়ে দেন। তারপর সম্মানের সাথে তাঁকে বিদায় দেন। তিনি যখন হাজ্জাজের দরবার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন দারোয়ান তাঁর পিছনে কিছুদূর যেয়ে বলে : আবু সা'ঈদ, হাজ্জাজ আপনার সাথে যে আচরণ করেছেন, আপনাকে ডেকে আনার উদ্দেশ্য কিন্তু তাঁর ভিন্ন ছিল। আপনি যখন হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন সেখানে উন্মুক্ত তরবারি হাতে জাল্লাদ দাঁড়িয়ে ছিল এবং মাথা কাটার জন্য চামড়াও বিছানো ছিল। আমার প্রশ্ন হলো, আপনি হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত হওয়ার সময় ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কি আওড়াচ্ছিলেন? বললেন : আমি বলছিলাম :[৬৪]

يَا عُدَّتِي عند كربتي، ويا صاحبي عند شِدَّتِي، ويا ولِّ نعمتي، وَيَا إلهي وإله آبائي إبراهيمَ واسحاقَ ويعقوب، ارزقني مودَّته، واصرف عني أذاه.،

–'আমার বিপদের সময় হে আমার সাজ-সরঞ্জাম, আমার কষ্টকর ও দুঃসহ সময়ে হে আমার বন্ধু, হে আমার দান ও অনুগ্রহের মালিক, হে আমার ইলাহ এবং আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুবের (আ) ইলাহ! আপনি আমাকে তার ভালোবাসা দান করুন এবং তার শাস্তি থেকে আমাকে বাঁচান।' আমার প্রভু আমার কথা শুনেছেন।

বসরায় মারওয়ান ইবন আল-মুহাল্লাব মানুষকে শামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিতেন। আর হাসান আল-বসরী সে সময় তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে বারণ করতেন। তিনি বলতেন : ওহে মানুষ! তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান কর, তোমাদের হাতকে গুটিয়ে রাখ এবং তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর। অস্থায়ী দুনিয়া এবং তার ভিতরের অতি তুচ্ছ জিনিস যার অধিকারীরা কেউ স্থায়ী নয়, তার প্রতি লোভের বশবর্তী হয়ে তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না। এই দুনিয়াদার লোকেরা যা কিছু অর্জন করেছে আল্লাহ তাদের প্রতি খুশী নন। জেনে রাখ, ফিতনা যখন দেখা দেয় তখন তার অধিকাংশ শিকার হয় বাগ্মী বক্তাগণ, কবিরা, নির্বোধ ব্যক্তিবর্গ এবং অহংকারী ও ভবঘুরে লোকেরা। একমাত্র অজ্ঞাত-অপরিচিত এবং অতি পরিচিত আল্লাহভীরু লোকেরা তা থেকে নিরাপদ থাকে। তোমাদের মধ্যে যারা গোপনে অপরিচিত অবস্থায় আছে তাদের

৬৪. ইবনুল জাওযী : আল-হাসান আল-বাসরী, পৃ. ৫৩; আস-সায়্যিদ আল-মুরতাদা : কিতাবুল আমালী, ১/১১২

উচিত সত্যকে আঁকড়ে থাকা এবং এই দুনিয়া নিয়ে মানুষ যে ঝগড়া-বিবাদ করছে তা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখা। তাদের সত্য-প্রীতির জন্য আল্লাহ তাদরেকে মর্যাদা দান করবেন। আর তোমাদের প্রসিদ্ধ ভদ্রজনেরা– যারা তাদেরই সমগোত্রীয় লোকদের দুনিয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব-ফাসাদ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে, আল্লাহ তাঁদেরকে হিদায়াত দান করবেন, বড় রকমের প্রতিদান দিবেন এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট তারা সম্মানিত হবে।[৬৫]

হযরত হাসানের (রহ) এসব কথা মারওয়ান ইবন আল-মুহাল্লাবের কানে গেল। তিনি জনগণকে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন : 'আমি জেনেছি, এই গর্বিত, পথভ্রষ্ট বৃদ্ধ (হাসান) মানুষকে আমার আহ্বানে সাড়া দিতে বারণ করছে। আল্লাহর কসম! তাঁর প্রতিবেশী যদি তাঁর ঘরের একটি বাঁশ খুলে নেয় তাহলে তাঁর নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। আমাদের কল্যাণ আমরা চাইবো, আমাদের উপর যে অত্যাচার-উৎপীড়ন চালানো হয় তার প্রতিবাদ আমরা করবো, তাতে কি তিনি আমার ও আমার শহরবাসীর বিরুদ্ধাচরণ করবেন? আল্লাহর কসম! হয় তিনি আমাদের আলোচনা এবং বসরার উবুল্লায় ও ফুরাতের তীরে বসবাসকারী নিম্ন শ্রেণীর লোক– যারা আমাদের কেউ নয়, তাদেরকে আমাদের পাশে সমবেত করা থেকে বিরত থাকবেন, না হয় আমি তাঁকে শক্ত লোহার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করবো।' মারওয়ানের এ কথা হযরত হাসানের (রহ) কানে গেলে তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! তার ইচ্ছা ও কামনা দ্বারা আল্লাহ আমাকে সম্মানিত করলে আমি অপছন্দ করবো না। লোকেরা বললো : মারওয়ান যদি আপনার বিরুদ্ধে লড়তে চায়, আর আপনিও যদি তাই চান তাহলে আপনাকে আমরা রক্ষা করবো। হযরত হাসান (রহ) তাদেরকে বললেন : তাহলে তো আমি আপনাদেরকে যা করতে নিষেধ করে থাকি, তারই বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। আমি আপনাদেরকে অন্যদের সাথে মিলে একে অপরকে হত্যা না করতে বলে থাকি। আর আমিই এখন আমার সাথে যোগ দিয়ে একে অপরকে হত্যা করার জন্য আপনাদেরকে আহ্বান জানাবো? মারওয়ানের বিরুদ্ধে হযরত হাসান (রহ) তাঁর বক্তব্য বন্ধ করেননি। মারওয়ানও আর বেশী বাড়াবাড়ি করেননি।[৬৬]

আন-নাদার ইবন 'আমর যখন বসরার ওয়ালী তখন একদিন তিনি হাসান আল-বসরীকে (রহ) বলেন : ওহে আবু সা'ঈদ! আল্লাহ তা'আলা তো এই দুনিয়া এবং তার মধ্যে যত সৌন্দর্য ও ভোগের বস্তু আছে সবই তাঁর বান্দার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন :[৬৭]

كلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين.

---

৬৫. তারীখ আত-তাবারী-৮/১৫৩
৬৬. প্রাগুক্ত-৮/৫১৩
৬৭. সূরা আল-আ'রাফ-৩১

–তোমরা খাও, পান কর। অপচয় করো না। কারণ, তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

তিনি আরো বলেছেন :[৬৮]

قل من حرَّم زينة الله التى أخرج لعباده والطيِّبات من الرزق، قل هى للذين امنوا فى الحياة الدنيا.

–আপনি বলুন : আল্লাহর সাজ-সজ্জাকে– যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন : এসব অনুগ্রহ আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য।

জবাবে হাসান (রহ) বললেন : ওহে জনাব, আল্লাহকে ভয় করুন। যে কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আপনি আপনার অন্তরে প্রাধান্য দিচ্ছেন তা ত্যাগ করুন। কারণ, তা আপনাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। না দুনিয়া, আর না আখিরাতের কল্যাণ কাউকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী দেয়া হয়। ইহকাল ও পরকাল এই দুইটি ভিন্ন জগত। যে এখানে কাজ করবে সে তা লাভ করবে। আর সে এখানে তার জন্য নির্ধারিত অংশটুকুই পাবে। আর যে কাজ না করবে সে ইহ ও পরকাল উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু নবী মুহাম্মাদকে (সা) নির্বাচন করেন এবং তাঁকে রিসালাত দান করে গোটা সৃষ্টি জগতের প্রতি রাসূল হিসেবে পাঠান। তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেন। দুনিয়াতে তাঁর জন্য কিছু সীমা নির্ধারণ করে দেন এবং এখানে তাঁর জীবনকালও বেঁধে দেন। তারপর আল্লাহ বলেন :[৬৯]

لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة.

–নিশ্চয় তোমাদের জন্য আছে আল্লাহর রাসূলের জীবনের মধ্যে উত্তম আদর্শ।

–আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমরা যেন তাঁর আদেশ মেনে চলি, তাঁর পথ অনুসরণ করি, তাঁর সুন্নাতের উপর 'আমল করি। আমরা যতটুকু তা করতে পারবো, মনে করবো, তা সম্ভব হয়েছে সেই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে। আর যতটুকু করতে অপারগ হবো, তার জন্য আল্লাহর সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করবো। আর এটাই আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ। আর আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার মধ্যে যেমন কোন কল্যাণ নেই, তেমনি নেই তাদের মধ্যেও যারা আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করে।

আন-নাদার বললেন : ওহে আবু সা'ঈদ! আমরা যে জীবনের মধ্যে আছি, সে অবস্থায় আমরা আমাদের প্রতিপালককে ভালোবাসবো।

হাসান (রহ) বললেন : রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে একদল লোক এমন কথাই বলেছিল। আল্লাহ তখন এ আয়াতটি নাযিল করেন :[৭০]

---

৬৮. প্রাগুক্ত-৩২
৬৯. সূরা আল-আহযাব-২১
৭০. সূরা আলে 'ইমরান-৩১

Contents

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللهُ.

–(হে মুহাম্মাদ) আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণকে ভালোবাসার চিহ্ন ও প্রমাণ হিসেবে, আর যারা তাঁর বিরোধী হবে তাদেরকে মিথ্যাবাদী ঘোষণা করেছেন। সুতরাং ওহে জনাব, আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহর কসম! আপনার পূর্বে বহু জাতিকে আমি আপনার অবস্থানে দেখেছি। তারা সুউচ্চ গম্বুজ তৈরী করেছে, উন্নত জাতের বাহন পশু তাদেরকে খুশী করেছে, মানুষকে দেখানোর জন্য গর্বভরে দীর্ঘ আঁচল টেনে চলেছে, প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, ভালো জিনিসগুলো নিজেরা বেছে নিয়েছে, পোশাক-পরিচ্ছদে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করেছে, কিন্তু একদিন তাদের ক্ষমতা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, দুনিয়ায় যা কিছু তারা জমা করেছিল, সবই ছেড়ে যেতে হয়েছে। তাদেরকে তাদের মহাপ্রভুর সামনে হাজির হতে হয়েছে। তাদের কর্ম তাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে। শেষ বিচারের দিন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। সেদিন তাদের অবস্থা হবে এরূপ :[৭১]

يوم يفر المرأ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.

–যেদিন মানুষ পালাবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে। তার মা, বাবা, স্ত্রী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।[৭২]

আর একদিন তিনি আন-নাদার ইবন 'আমরের দরবারে উপস্থিত হয়ে নিম্নের উপদেশমূলক কথাগুলো বলেন :

ওহে আমীর! আল্লাহ আপনার সহায় হোন! সেই ব্যক্তি আপনার বন্ধু যে দীনের ব্যাপারে আপনাকে উপদেশ দেয়, আপনার দোষ দেখিয়ে দেয় এবং আপনাকে সত্য-সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়। আর সেই ব্যক্তি আপনার শত্রু যে আপনাকে ধোঁকা দেয় এবং আপনার প্রশংসা করে। ওহে আমীর! আল্লাহকে ভয় করুন! সত্য-সঠিক পথ, জীবনাচার, প্রকাশ্য ও গোপন সর্বক্ষেত্রে আপনি আপনার জাতির বিরুদ্ধাচরণ করছেন। তা সত্ত্বেও আপনি আশার পিছনে ছুটছেন এবং ওজর ও কৈফিয়ত তৈরি করছেন। আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন! মানুষ দু'ধরনের : দুনিয়ার অন্বেষণকারী ও আখিরাতের অন্বেষণকারী। আল্লাহর কসম! আখিরাতের অন্বেষণকারী তার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পেয়ে গেছে এবং প্রশান্তিতে আছে। আর অন্য দলটি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব,

---

৭১. সূরা 'আবাসা-৩৪

৭২. ইবনুল জাওযী : আল-হাসান আল-বাসরী, পৃ. ৫০-৫১

Contents

হে আমীর! আপনি ক্ষণস্থায়ী জীবনের অন্বেষণ এবং চিরস্থায়ী জীবন পরিত্যাগের মাধ্যমে দুর্ভাগ্য ডেকে আনবেন না। তাহলে পরিণতিতে আপনাকে লজ্জা ও অনুশোচনায় জর্জরিত হতে হবে। শুনুন, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন :

'সেইসব রাজা-বাদশারা কোথায় যারা তাদের অংশের ব্যাপারে উদাসীন ছিল। আর এ অবস্থায় সাকী তাদেরকে মৃত্যুর পিয়ালা পান করিয়েছে?'

আমি বৃদ্ধির পর ঘাটতির এবং সত্য-সঠিক পথ প্রাপ্তির পর পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে আল্লাহর পানাহ্ চাই। ওহে আমীর! কোন একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষের একটি কথা আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলতেন : 'একজন মানুষের ধোঁকা ও প্রতারণার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে কোন প্রতারকের বিশ্বাসভাজন হবে এবং তার কর্মকাণ্ডের সহায়ক হবে।'[৭৩]

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের (রহ) খিলাফতকাল ছিল হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) জীবনের সবচেয়ে বেশী আনন্দময় সময়। কারণ, তিনিও ছিলেন একজন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ যাহিদ খলীফা। হযরত হাসান মাঝে মাঝে তাঁর দরবারে যেতেন এবং তাঁকে উপদেশ দিতেন। তাঁর সময়ে কিছু দিনের জন্য হযরত হাসান বিচারকের পদও অলংকৃত করেন। উভয়ের মধ্যে সব সময় পত্র যোগাযোগ হতো। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে তাঁদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পত্র সংরক্ষিত রয়েছে।[৭৪] 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর হযরত হাসানকে লিখলেন :

'এ দায়িত্ব দিয়ে আমাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আমাকে সাহায্য করতে পারে এমন কিছু সাহায্যকারী আমার জন্য দেখুন।' জবাবে হযরত হাসান (রহ) লিখলেন : 'দুনিয়াদার লোক– তা তাদেরকে তো আপনি চাচ্ছেন না। আর আখিরাতমুখী মানুষ– তা তারা তো আপনাকে চাইবে না। সুতরাং আপনি আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন।'[৭৫]

খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের (রহ) পুত্র আবদুল মালিকের ইনতিকালের পর হযরত হাসান (রহ) খলীফাকে সমবেদনা জানিয়ে একটি পত্র লেখেন। পত্রে কবিতার এই চরণটিও উল্লেখ করেন :[৭৬]

وَعُوِّضْتَ أَجْرًا مِنْ فَقِيْدٍ فَلاَيَكُنْ + فَقِيْدُكَ لاَيَأْتِيْ وَأَجْرُكَ يَذْهَبُ -

– মৃতের বিনিময়ে আপনাকে প্রতিদান দেয়া হয়েছে। সুতরাং এমন যেন না হয় যে, আপনার মৃত ছেলেও ফিরে এলো না এবং আপনার প্রতিদানও চলে গেল।

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর ন্যায়পরায়ণ শাসকের গুণাবলী কি তা জানতে চেয়ে হযরত হাসানকে (রহ) একটি পত্র লেখেন।

---

৭৩. জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-২/৪৯৪

৭৪. আল'-ইকদ আল-ফারীদ-১/৩৪; ৩/১৫০; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-২/৪৯৫-৪৯৮; ইবনুল জাওযী : সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১২১

৭৫. আল-আ'লাম-২/১০৬

৭৬. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/৩০৩, ৩১১

জবাবে হযরত হাসান (রহ) খলীফাকে যে পত্রটি লেখেন তাতে ন্যায়পরায়ণ শাসকের একটি পরিচিতি তুলে ধরেন। পত্রটির কিছু অংশ নিম্নরূপ :[৭৭]

'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ শাসককে প্রত্যেক ঝোঁকপ্রবণ মানুষের জন্য অবলম্বন, প্রত্যেক অত্যাচারীর জন্য সত্য-সঠিক পথ, প্রত্যেক বিনষ্ট ও বিকৃত মানুষের জন্য সংশোধন, প্রত্যেক দুর্বলের জন্য শক্তি, প্রত্যেক অত্যাচারিতের জন্য সুবিচার এবং প্রত্যেক দুঃখিতজনের আশ্রয়স্থল করে দিয়েছেন। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন সেই রাখালের মত যে তার উটের প্রতি দয়াশীল, উটগুলোকে উৎকৃষ্ট চারণভূমিতে চরায়, বিপজ্জনক চারণভূমি থেকে রক্ষা করে, হিংস্র জীব-জন্তু থেকে আগলে রাখে এবং ঠাণ্ডা-গরমের কষ্ট থেকে রক্ষা করে। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন সেই পিতার মত যিনি তাঁর সন্তানদের প্রতি স্নেহপ্রবণ। তাদের শৈশব কালে আদর-স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেন, বড় হলে শিক্ষা দান করেন। জীবনকালে তাদের জন্য আয় করেন এবং মৃত্যুর পরেও তাদের খরচের জন্য সঞ্চয় করে রেখে যান। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন সেই স্নেহময়ী মায়ের মত যিনি তাঁর সন্তানকে পেটে ধারণ করার ও দুধ পান করানোর কষ্ট স্বীকার করেন, শৈশবে লালন-পালন করেন, সন্তান জেগে থাকলে তিনিও জেগে রাত কাটান, সন্তান ঘুমালে তিনিও ঘুমান, সন্তানকে কখনো দুধ পান করান, আবার কখনো দুধ পান থেকে বিরত রাখেন, সন্তানের সুস্থতায় উৎফুল্ল হন এবং অসুস্থতায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে দণ্ডায়মান। তিনি আল্লাহর কথা শোনেন, বান্দাদের শোনান, তিনি আল্লাহকে দেখেন, তাদেরকে দেখান, তিনি আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং তাদেরকে সেদিকে চালিত করেন। অতএব, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ আপনাকে যা কিছুর অধিকারী করেছেন সে সব বিষয়ে আপনি সেই দাসের মত হবেন না যার নিকট তার মনিব কোন কিছু গচ্ছিত রেখেছে, তার অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছেন, অতঃপর সে অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করে পরিবার-পরিজনকে বিতাড়িত করেছে। ফলে তারা বিত্তহীন হয়ে পড়েছে।

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা এবং সেখানে আপনার লোক-লস্কর ও সাহায্যকারীর স্বল্পতার কথা স্মরণ করুন। আপনি মৃত্যু ও তার পরবর্তী মহা ভীতিকর অবস্থার জন্য পাথেয় প্রস্তুত করুন। হে আমীরুল মু'মিনীন! জেনে রাখুন, আপনি যে বাড়ীতে আছেন, সেটি ছাড়াও আপনার অন্য একটি বাড়ী আছে। সেখানে আপনার অবস্থান হবে অনেক দীর্ঘ। আপনার আত্মীয়-বন্ধুরা আপনাকে একাকী কবরের গর্তে রেখে আপনার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। আপনি সেই দিনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করুন যে দিন কেউ আপনার সংগী হবে না। যে দিন মানুষ তার ভাই, মাতা-পিতা, স্ত্রী ও

---

৭৭. প্রাগুক্ত-১/৩৪; আল-হাসান আল-বাসরী-৫৬

সন্তানদের থেকে পালিয়ে যাবে। হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে। তখন সকল গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর গ্রন্থ ছোট-বড় কিছুই উপেক্ষা করছে না। সবই লিখে রাখছে। অতএব হে আমীরুল মু'মিনীন! মৃত্যুর আগমন এবং আশা-আরজু বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে আপনি সুযোগের ব্যবহার করুন। আপনি আল্লাহর বান্দাদেরকে জাহিলী আইন ও রীতি-পদ্ধতিতে শাসন করবেন না। আপনি তাদের সাথে অত্যাচারী শাসকদের মত আচরণ করবেন না। তাদের উপর ক্ষমতাগর্বী ও অহঙ্কারীদের মত প্রভুত্ব কায়েম করবেন না।'

একবার তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) এক পত্রের জবাবে তাঁকে উপদেশ দেন এভাবে :[৭৮] 'এ দুনিয়া হচ্ছে স্বপ্ন, আর আখিরাত হচ্ছে বাস্তব। মৃত্যু এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা। আমরা আছি স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে। যে ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের হিসাব করেছে সে লাভবান হয়েছে, আর যে উদাসীন থেকেছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে পরিণতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছে সে মুক্তি লাভ করেছে। যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। যে ধৈর্য ধরেছে, সফলকাম হয়েছে। যে ভয় করেছে, নিরাপদ থেকেছে। যে চিন্তা করেছে, দেখেছে। যে দেখেছে, বুঝেছে। যে বুঝেছে, জেনেছে। যে জেনেছে, 'আমল করেছে। আপনার যখনই পদস্খলন হবে, ফিরে আসবেন। যখন অনুতপ্ত হবেন, চলা শুরু করবেন। যখন কোন কিছু জানা না থাকে, জিজ্ঞেস করবেন। যখন রেগে যাবেন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। মনে রাখবেন, নিজের নফ্‌সকে সব সময় অনুগত রাখাই হলো সবচেয়ে ভালো কাজ।'

হাসান আল-বসরী (রহ) বিশ্বাস করতেন, হযরত 'উছমান ইবন 'আফ্‌ফান (রা) অন্যায়ভাবে নিহত হন। তিনি একথাও বিশ্বাস করতেন যে, সিফ্‌ফীন যুদ্ধের পরে 'আলী ইবন আবী তালিব (রা) ও মু'আবিয়া ইবন আবী সুফয়ানের মধ্যের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শালিস নিয়োগ সঠিক ছিল না। তাঁর মতে খিলাফতের প্রকৃত অধিকারীর শালিস মেনে না নেয়াটাই উচিত ছিল।[৭৯]

এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো : আবূ সা'ঈদ! লোকেরা ধারণা করে, আপনি নাকি 'আলীর (রা) প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন? একথা শুনে তিনি এত কাঁদলেন যে চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। তারপর বললেন : 'আলী (রা) ছিলেন আল্লাহর শত্রুদের প্রতি নিক্ষিপ্ত তাঁর একটি সঠিক তীর। এই উম্মাতের রাব্বানী বা আল্লাহ ওয়ালা মানুষ, অনেক মর্যাদার অধিকারী এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট-আত্মীয়। আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে উদাসীন ও নিদ্রিত থাকতেন না, আল্লাহর অধিকারের ব্যাপারে বিতৃষ্ণ ও

---

৭৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৫১
৭৯. 'উমার ফাররূখ : তারীখ আল-আদাব-১/৬৪৫

বীতস্পৃহ হতেন না, আল্লাহর অর্থও আত্মসাৎ করতেন না। আল-কুরআন তার সিদ্ধান্ত সমূহ দান করেছে, আর তিনি তা বাস্তবায়নে সফলকাম হন।[৮০]

সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে। একবার তাঁর উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কিরাম প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলো। তিনি বললেন :[৮১]

رَحِمَ اللّٰهُ، شَهِدُوْا وَغِبْنَا، وَعَمِلُوْا وَجَهِلْنَا، فَمَا اجْتَمَعُوْا عَلَيْهِ اِتَّبَعْنَا، وَمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَقَفْنَا.

– আল্লাহ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করুন। তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, (উপস্থিত থেকেছেন) আমরা অনুপস্থিত ছিলাম। ঐকমত্য পোষণ করেছেন আমরা তা অনুসরণ করেছি। আর যা কিছুর ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন, আমরা সেখানে থেমে গিয়েছি।

মুহাম্মাদ ইবন য়াযীদ বলেছেন। আবূ সা'ঈদ আল-হাসান আল-বসরী শাসক শ্রেণীকে অপছন্দ করতেন। তাঁদের মতের সাথে একমত হতেন না। তাঁর মজলিসে 'উছমানের (রা) প্রসঙ্গ উঠলে তাঁর প্রতি তিনবার আল্লাহর রহমত কামনা করতেন। আর যারা তাঁকে হত্যা করেছে তাদেরকে তিন বার লা'নাত (অভিশাপ) দিতেন। তিনি বলতেন, আমরা যদি তাদরেকে লা'নাত না দেই তাহলে আমাদেরকে লা'নাত দেয়া হবে। তারপর 'আলীর (রা) প্রসঙ্গ উঠলে বলতেন : তিনি ছিলেন সব সময় সফলকাম, আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত মানুষ।[৮২]

অহেতুক ও বাজে কথা তিনি খুব কম বলতেন। তাঁর বেশীরভাগ কথা ও আলোচনা হতো জ্ঞান ও উপদেশমূলক।[৮৩]

বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তিনি মানুষকে উপদেশ দান করতেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রহস্যাবলী ও বিধি-নিষেধ স্পষ্টভাবে তুলে ধরতেন। তাঁর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাণীসমূহের কিছু এখানে উপস্থাপন করা হলো:[৮৪]

১. অন্তরমাঝে যে সব কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয় এবং দূর হয়ে যায়, তা সব শয়তানের পক্ষ থেকে। এ সব কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য আল্লাহর যিকর ও কুরআন তিলাওয়াতের সাহায্য নেয়া উচিত। আর যে সব কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়ে স্থায়ী হয়ে যায়, বুঝতে হবে

---

৮০. আবূ 'আলী আল-কালী : আল-আমালী-৩/১৯৪; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/৫৪; আল-'ইকদ-২/২২৯

৮১. আল-'ইকদ-২/২৩০

৮২. প্রাগুক্ত-২/২৩৫

৮৩. শাযারাতুয যাহাব-১/১৩৮

৮৪. দ্রঃ সিফাতুস সাফওয়া-৪/১২৬; আল-ইক্দ আল-ফারীদ-২/২২০, ২২২, ২২৭, ২৪০, ২৪৪, ২৯৩, ৩২২, ২৫৯; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৭২, ২৪২; ৩/১৩২-১৩৭; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-২/৪৯৯

তা নফ্সের পক্ষ থেকে। আর তা দূর করার জন্য নামায, রোযা ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাহায্য নেয়া উচিত।

২. আল্লাহ যে বান্দার কল্যাণ চান তাঁকে পরিবার-পরিজনের বন্ধন ও ভালোবাসার মধ্যে জড়িত করেন না।

৩. বিনীত ও বিনম্র হওয়ার শর্ত এই যে, ঘর থেকে বেরিয়ে যার সাথে দেখা হবে তাকে নিজের চেয়ে ভালো ও বড় মনে করবে।

৪. বান্দা যখন পাপ করার পর তাওবা করে তখন তা আল্লাহর সাথে তার নৈকট্য বৃদ্ধি করে দেয়।

৫. এক ব্যক্তি হযরত হাসানের (রহ) নিকট তার অন্তর কঠোর ও শক্ত হওয়ার অভিযোগ করলো। তিনি তাকে বললেন, তুমি তোমার অন্তরকে যিক্‌র ও ফিকরের বিভিন্ন স্তরে উন্নীত কর।

৬. মৃত ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর হয় তারই পরিবার-পরিজন। কারণ, তারা তার জন্য কান্নাকাটি করে। অথচ এর পরিবর্তে মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা কি তাদের জন্য সহজ হতো না?

৭. এক ব্যক্তির সাথে শত্রুতার বিনিময়ে হাজার মানুষের বন্ধুত্বও ক্রয় করো না।

৮. লালসা একজন 'আলিমকে হেয় ও অপমান করে।

৯. মানুষের প্রকাশ্যে নিজের নফসের নিন্দে মন্দ করা মূলত: তার প্রশংসা করারই নামান্তর।

১০. নিজের ভাইয়ের সম্মান করবে। তাহলে তাদের সাথে তোমার ভালোবাসার সম্পর্ক চিরকাল অটুট থাকবে।

১১. যদি নিজের মৃত্যুর চলাফেরার প্রতি আদম সন্তানের দৃষ্টি থাকতো তাহলে তার ধোঁকাবাজ আশা তার দুশমন হয়ে যেত।

১২. যে ব্যক্তি তার বিনয়ীভাবের জন্য পশমের মোটা পোশাক পরে, আল্লাহ তার দৃষ্টি ও অন্তরের আলো বাড়িয়ে দেন। আর যে লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে পরে, তাকে খোদাদ্রোহীদের সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

১৩. হায়, আমি যদি এমন কোন খাবার খেতে পেতাম যা পেটে গিয়ে ইটে পরিণত হয়ে যেত! কারণ, আমি শুনেছি, ইট পানিতে তিন শো বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে।

১৪. একবার তাঁর সামনে আলোচনা হচ্ছিল যে, ফকীহ্ এমন এমন কথা বলেন। তিনি বললেন, তোমরা কখনো ফকীহ্ দেখেছো কি? ফকীহ্ তিনি যিনি দুনিয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখেন, দীনের ব্যাপারে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হন এবং সব সময় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ইবাদাতে নিমগ্ন থাকেন।

১৫. তিনি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলতেন, যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ ও সোনাকে সম্মান দিয়েছে, আল্লাহ তাকে হেয় ও অপমান করেছেন।

১৬. জ্ঞানী ব্যক্তিদের জিহ্বা তাদের অন্তরের পিছনে থাকে। যখন সে কিছু বলতে চায় তখন প্রথমে অন্তরের সাথে পরামর্শ করে। যদি সে কথায় তার কোন উপকার

থাকে তাহলে বলে। অন্যথায় থেমে যায়। আর মূর্খ ব্যক্তির অন্তর থাকে তার জিহ্বার একেবারে আগায়। সে তার অন্তরের সাথে কোন পরামর্শ করে না। জিহ্বায় যা আসে তাই বক বক করে বলে যায়। তার পক্ষে হোক বা বিপক্ষে।

১৭. প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া হচ্ছে তোমাদের বাহন। যদি তোমরা তার পিঠে আরোহী হয়ে যাও সে তোমাদেরকে বহন করবে। আর সে যদি তোমাদের পিঠে আরোহী হয় তাহলে তোমাদের ধ্বংস করে ছাড়বে।

১৮. যদি তোমরা কোন ব্যক্তির সাথে শত্রুতা করতে চাও তাহলে প্রথমে তার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ। যদি সে আল্লাহর বাধ্য ও অনুগত হয় তাহলে এ কাজ থেকে দূরে থাক। কারণ, আল্লাহ কখনো তাকে তোমাদের আয়ত্তে দেবেন না। তোমাদের জন্য একাকীও তাকে ছেড়ে দেবেন না। আর যদি সে আল্লাহর না ফরমান বান্দা হয় তাহলে তোমাদের তার সাথে শত্রুতার কোন প্রয়োজনই নেই। নিজেদের নফ্সকে অহেতুক এ শত্রুতায় জড়িয়ে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত করো না। কারণ, সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর সাথে শত্রুতাই তার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।

১৯. যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে তার সাথে বন্ধুত্ব করা তোমাদের জন্য জরুরী। কারণ, যে ব্যক্তি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষকে ভালোবাসে, সে যেন আল্লাহকেই ভালোবাসে।

২০. আমি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিনি যে দুনিয়া চেয়েছে এবং সে আখিরাত পেয়েছে। এর বিপরীতে যে আখিরাত চায় সে দুনিয়াও পেয়ে যায়। তাহলে এমন জিনিস কেন চাওয়া হবে না যাতে দুইটি জিনিসই পাওয়া যায়?

২১. ইসলাম এই যে, তুমি তোমার অন্তর আল্লাহর নিকট অর্পণ করবে এবং প্রত্যেক মুসলিম তোমার হাত থেকে নিরাপদ থাকবে।

২২. তিনি বলতেন, দুনিয়ার সব মানুষের যদি প্রচুর বুদ্ধি থাকতো তাহলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত।

তাঁর মতে মানুষ তিন প্রকারের। এক প্রকারের মানুষ খাদ্যের মত যা সবার প্রয়োজনে আসে। আর এক প্রকারের মানুষ হলো ঔষধের মত– মাঝে মাঝে যার প্রয়োজন পড়ে। তৃতীয় প্রকারের মানুষ হলো রোগের মত। কোন দিন যার কোন প্রয়োজন কেউ বোধ করে না।

২৩. তিনি বলতেন : মন্দের মূল তিনটি এবং শাখা ছয়টি। মূল তিনটি হলো : হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা এবং দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা। আর শাখা ছয়টি হলো : নিদ্রা, পেট ভরে খাওয়া, আরাম-আয়েশ, নেতৃত্ব, প্রশংসা পাওয়া ও গর্ব-অহংকারের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা।

২৪. তাঁর মতে, একজন মানুষ 'আলিম হলেই 'আবিদ হয় না। কখনো কোন মানুষ 'আলিম হয়, কিন্তু 'আবিদ হয় না। এ দু'টি ভিন্ন জিনিস। দু'টিকে পৃথকভাবে অর্জন করতে হয়। তাই অনেক সময় অনেক নির্বোধ ও স্বল্পবুদ্ধির মানুষও বড় 'আবিদ হয়ে থাকেন। কথাটি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলতেন : একজন

মানুষ কখনো 'আবিদ হয়, কিন্তু বুদ্ধিমান হয় না। আবার কখনো একজন মানুষ 'আবিদ ও বুদ্ধিমান- দু'টিই হয়, কিন্তু জ্ঞানী হয় না।

২৫. তিনি বলতেন : জ্ঞান দুই প্রকার। অন্তরে অর্জিত জ্ঞান ও জিহ্বায় অবস্থিত জ্ঞান। প্রথম প্রকারের জ্ঞানই কল্যাণকর। আর দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান আল্লাহর বান্দাদের উপর তাঁর সাক্ষ্য-প্রমাণ।

হযরত হাসান (রহ) তাঁর সংগী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রয়োজনের প্রতি সব সময় সতর্ক থাকতেন। তিনি বলতেন : এক বছরের 'ইবাদতের চেয়ে আমার কোন ভাইয়ের একটি প্রয়োজন পূরণ করা আমার নিকট বেশী প্রিয়।[৮৫]

তিনি আমীর-উমারাদের প্রদত্ত হাদীয়া-তোহফা গ্রহণ করতেন। হিশাম ইবন হাস্সান বলেন : আমি নিশানা দেয়া চার কোণা বিশিষ্ট একটি কালো কাপড়ের উপর হাসানকে নামায আদায় করতে দেখেছি। মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক সেই কাপড়টি তাঁকে হাদীয়া দেন।[৮৬]

তিনি ছিলেন বিনয় ও নম্রতার প্রতীক। ভদ্রতা, ও শিষ্টাচারিতার বাস্তব নমুনা। ইমাম আল-আসমা'ঈ বর্ণনা করেছেন। 'উছমান আশ-শাহ্হাম একদিন হাসানের (রহ) দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ডাকালেন : ওহে আবূ সা'ঈদ! তিনি সাড়া দিলেন এই বলে : ওহে জনাব, আমি আপনার সামনে হাজির। তিনি বললেন : আমার আহ্বানে এমনভাবে সাড়া দিচ্ছেন? হাসান বললেন : আমি আমার চাকর-বাকরের ডাকেও এমনভাবে সাড়া দিয়ে থাকি।[৮৭]

কারো সংগে দেখা হলে তার সাথে সালাম বিনিময়ের পূর্বে ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করা তিনি পছন্দ করতেন না। আবূ বাকর ইবন আবী শায়বা বলেন : হাসান, ইবরাহীম ও মায়মূন ইবন মাহ্রান– কোন ব্যক্তি আস্-সালাম না বলা পর্যন্ত 'আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন'– এ জাতীয় কথা বলা মোটেই পছন্দ করতেন না।[৮৮]

ইবন 'আবদি রাব্বিহি বলেছেন, অসাধারণ প্রতিভা, ফিকাহ্ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান এবং অতুলনীয় যুহ্দ ও তাকওয়ার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হাসান আল-বসরী (রহ) তাঁর জীবনে এক পর্যায়ে খুরাসানে আর-রাবী' ইবন যিয়াদ আল-হারিছীর সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেন। তারপর হযরত 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীয (রহ) তাঁকে বসরার কাজী নিয়োগ করেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে প্রশ্ন করে : বসরার কাজী হিসেবে কাকে নিয়োগ দিলেন? তিনি বললেন : আমি তাবি'ঈদের নেতা আল-হাসান ইবন আবিল হাসান আল-বসরীকে বসরার কাজী নিয়োগ করেছি।[৮৯]

---

৮৫. আল-'ইকদ-১/২৩৪
৮৬. প্রাগুক্ত-১/২৭৪
৮৭. আল'-ইকদ আল-ফারীদ-১/৩৪; ৩/১৫০; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-২/৪৯৫-৪৯৮; ইবনুল জাওযী : সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১২১
৮৮. আল-আ'লাম-২/১০৬
৮৯. আল'-ইকদ আল-ফারীদ-১/৩৪; ৩/১৫০; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-২/৪৯৫-৪৯৮; ইবনুল জাওযী : সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১২১

এভাবে তিনি হযরত হাসান আল-বসরীকে তাবি'ঈদের নেতা বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত হাসান ছিলেন নন্দিত সাহসী বীরদের একজন। বীরত্ব ও সাহসিকতায় উমাইয়্যা যুগের বিখ্যাত খারিজী নেতা কাতারী ইবন ফুজাআর সাথে তাঁর নামটি স্মরণ করা হয়।[৯০]

হযরত হাসানের (রহ) ওয়াজ-নসীহতের ভিত্তি ছিল আল-কুরআন, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবন ও কর্ম। বিশেষতঃ 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) জীবন। তিনি 'উমারের (রা) বহু কথা ও উপদেশ বাণী বর্ণনা করেছেন।[৯১]

তিনি তাঁর ওয়াজ-নসীহতে সব সময় মানুষকে এই দুনিয়া ও এর ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসিতা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানাতেন। পরকালের জীবন এবং সেখানে পাপীরা যে শাস্তি ভোগ করবে তা স্মরণ করিয়ে দিতেন। তাকওয়া ও 'আমলে সালিহ-এর প্রতি উৎসাহ দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ, যাঁরা দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে আখিরাত কামনা করেছেন, তাঁদেরকে অনুসরণের আহ্বান জানাতেন। তিনি বলতেন : তাঁরা ছিলেন আঙ্গুর গাছের মত, যার পাতা সুন্দর এবং ফল সুমিষ্ট।[৯২] আল-জাহিজ তাঁর বহু উপদেশ বাণী সংকলন করেছেন। এখানে তাঁর একটি ওয়াজের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো :[৯৩]

'ওহে আদমের সন্তান! তুমি তোমার দুনিয়াকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। তাহলে দু'টিতেই লাভবান হবে। দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে বিক্রি করো না, আর তা করলে দু'টিতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ওহে আদমের সন্তান! যখন তুমি কাউকে কোন ভালো কাজ করতে দেখবে তখন তুমি তার প্রতিযোগিতা করবে। আর যদি কাউকে কোন খারাপ কাজের মধ্যে দেখ তাহলে তার প্রতিযোগিতার ইচ্ছা করবে না। এখানে অবস্থান অল্পদিনের, আর সেখানের অবস্থান অতি দীর্ঘ। আল্লাহর কসম! জেনে রাখ, তোমাদের এই উম্মাতের পর আর কোন উম্মাত নেই। আর তোমাদের নবীর পরে অন্য কোন নবী নেই এবং তোমাদের কিতাবের পরে আর কোন কিতাব নেই। তোমরা মানুষকে চালনা করছো, আর সময় বা কাল তোমাদেরকে চালিত করছে। যিনি মুহাম্মাদের (সা) সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, দেখেছেন যে, তিনি প্রতিদিনের প্রয়োজন পূরণের জন্য সকাল-সন্ধ্যা কাজ করেছেন। তিনি ইটের উপর ইটও যেমন রাখেননি, তেমনি বাঁশের উপর বাঁশও রাখেননি। তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

এ পৃথিবীর বহু জাতি ও সম্প্রদায় তাঁর জীবনের প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং তাঁর রব বা প্রভু যে জন্য তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তা তারা ঘৃণা করেছে। তাই আল্লাহ তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।

ওহে আদমের সন্তানেরা! তোমরা জেনে রাখ, যে দিন তোমরা মায়ের পেট থেকে পড়েছো, সেদিন থেকেই তোমাদের নির্ধারিত আয়ু কমছে। আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি

---

৯০. আল-আ'লাম-২/১০৬
৯১. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/৩০৩, ৩১১
৯২. প্রাগুক্ত-১/৩৪; আল-হাসান আল-বাসরী-৫৬
৯৩. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৫১

করুণা করুন, যে দেখে, তারপর চিন্তা করে। চিন্তা করে, তারপর উপদেশ গ্রহণ করে। দেখে, তারপর ধৈর্য ধরে। অনেক জাতি-গোষ্ঠী দেখে, কিন্তু ধৈর্য ধারণ করে না, ভয়-ভীতি তাদের অন্তরকে নিয়ে যায়। তারা যা চায় তা পায়নি এবং যা ছেড়ে এসেছে সেখানে আর ফিরে যায়নি।

ওহে আদমের সন্তান! তোমরা আল্লাহর এ বাণী স্মরণ কর :[৯৪]

وكل انسان الزمناه طـائره فـي عنقـه ونخـرج لـه يـوم القيامـة كتابـا يلقـاه منشورا، اقرأ كتابك، كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا.

– আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাবো তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।

তোমরা দুনিয়ার স্বচ্ছতাকে গ্রহণ কর এবং পঙ্কিলতাকে বর্জন কর। যা পঙ্কিল হয় তা স্বচ্ছ নয়, আর যা স্বচ্ছ হয় তা পঙ্কিল নয়। যা তোমাদেরকে সন্দেহ-সংশয়ে ফেলে তা ছেড়ে দাও– সেই পর্যন্ত যা তোমাদেরকে সন্দেহে ফেলে না। অনৈতিকতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, আলিমদের সংখ্যা কমে গেছে, সুন্নাহর বিলুপ্তি ঘটেছে এবং বিদ'আত ছড়িয়ে পড়েছে। আমি এমন সব লোকের সঙ্গ পেয়েছি যাঁদের সাহচর্য চোখের পুত্তলি ও অন্তরের স্বচ্ছতা ছাড়া আর কিছু ছিল না। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু হারাম করেছেন তা তোমরা যতটুকু পরিহার করে চলো, তাঁরা তার চেয়ে বেশী পরিহার করে চলতেন আল্লাহ তাঁদের জন্য যা কিছু হালাল করেছেন, তা। তোমরা উত্তর ঠিক করে রেখ। কারণ, তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি সেই যে তার নিজের মত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার দীনকে গ্রহণ করে না। বরং তার প্রভুর পক্ষ থেকে যেভাবে এসেছে সেভাবে গ্রহণ করে। যে দুনিয়ার প্রশংসা করেছে, সে আখিরাতের নিন্দামন্দ করেছে। আল্লাহর সাক্ষাৎকে কেবল সেই ব্যক্তি অপছন্দ করে যে তাঁর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির মধ্যে অবস্থানকে পছন্দ করেছে।'

হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) ওয়াজ ছিল সাহাবীদের ওয়াজ-নসীহতের ন্যায় সহজ সরল ও আকর্ষণীয়। তাতে দুনিয়ার অনিত্যতা, জীবনের অবিশ্বস্ততা, আখিরাতের গুরুত্ব, ঈমান ও 'আমলের শিক্ষা, তাকওয়া ও খোদাভীতির প্রশিক্ষণ এবং নাফ্সের ফেরেব ও ধোঁকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকতো। যে যুগে মানুষের কাঁধের উপর বস্তুবাদের মারাত্মক দানব ভর করেছিল, মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) বিধি-বিধান সম্পর্কে গাফিল হয়ে পড়েছিল এবং সাধারণ মানুষ, এমন কি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও ধন-দৌলত, সুখ-সম্ভোগ ও ভোগ-বিলাসিতার সয়লাবে খড়কুটোর ন্যায় ভেসে যাচ্ছিল, সে যুগে এরূপ ওয়াজ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনও ছিল। যেহেতু তিনি সাহাবায়ে কিরামের (রা) যুগ নিজ চোখে দেখেছিলেন, তাঁদের সুহ্বত ও সাহচর্যের ফয়েয ও বরকত লাভে ধন্য হয়েছিলেন,

---

৯৪. 'উমার ফাররূখ : তারীখ আল-আদাব-১/৬৪৫

তারপর উমায়্যাদের স্বৈরাচারী শাসনও দেখেছিলেন, তাই তাঁর ওয়াজ-নসীহতে অধিকাংশ সময় বিরাট আবেগ ও দরদের সাথে সাহাবায়ে কিরামের (রা.) ঈমানী অবস্থা এবং 'আমল-আখলাকের বৈশিষ্ট্যগুলোর চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যেত। যখন তিনি তাঁর দেখা দুটো যুগের তুলনা করতেন তখন তাঁর দরদী অন্তরে দারুণ আবেগ সৃষ্টি হতো। ফলে তাঁর বর্ণনা অব্যর্থ তীরে পরিণত হতো। তাঁর ওয়াজসমূহ শুধু হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষকই ছিল না; বরং তা ছিল সে যুগের বাকপটুতা, আলংকারিক ভাষা ও উন্নতমানের সাহিত্যেরও নমুনা। একবার তিনি তাঁর এক ওয়াজে সে যুগের অধিবাসীদের অবস্থার পর্যালোচনা এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) আদর্শ চরিত্রের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন :[৯৫]

'হায় আফসোস! আশা-আকাংখা ও কল্পনা-বিলাসী পরিকল্পনা মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছে। মুখে বড় বড় কথা আছে, কিন্তু কাজে নেই। 'ইলম ও মা'রিফাত আছে, কিন্তু তার দাবী পূরণ করবার জন্য ধৈর্য নেই। ঈমান আছে, কিন্তু য়াকীন নেই। আমার কী হয়েছে, আমি মানুষ দেখি, তবে কোন বুদ্ধিমান মানুষ পাই না। লোকেরা প্রবেশ করে, অতঃপর তারা বের হয়ে যায়। তারা সবকিছু জানে, তারপর তা অস্বীকার করে। প্রথমে তারা একটি বস্তুকে হারাম করে, তারপর তাকেই আবার হালাল করে নেয়। তোমাদের দীন ও ধর্ম তোমাদের মুখের একটি মিষ্টি-মধুর উচ্চারণ ছাড়া আর কিছু নয়। যদি প্রশ্ন করা হয়, হিসাব-নিকাশের দিনে তুমি বিশ্বাসী? জবাব দেয়, হাঁ। শেষ বিচার দিনের মালিকের কসম! সে মিথ্যা বলে। মু'মিনের আখলাক ও চরিত্র এই যে, দীনের ক্ষেত্রে সে হবে শক্ত, ঈমানে হবে পাকাপোক্ত। তার থাকবে 'ইলম-এর সাথে 'হিলম' (বিচক্ষণতা) এবং হিলম-এর সাথে 'ইলম। সে হবে বুদ্ধিমান, তবে নম্র প্রকৃতির। সংযম তার দারিদ্র ও অভাব-অনটনকে ঢেকে দেবে। ধনী হয়ে গেলেও মধ্যমপন্থা সে কখনো পরিত্যাগ করবে না। ব্যয়ের ক্ষেত্রে সে মিতাচারী, বিপর্যস্ত মানুষের প্রতি দয়ালু ও দানশীল, অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে দরাজ হস্ত, উদার মন এবং ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে জোর তৎপর ও অনড়।'

এভাবে এ বক্তৃতায় তিনি মু'মিনের চরিত্রের গুণ-বৈশিষ্ট্য অতি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

প্রায় অধিকাংশ ওয়াজের পর তিনি বলতেন : এই ওয়াজ ও নসীহতের ভিতর তো কোন জিনিসের ঘাটতি নেই, তবে অন্তরের মধ্যেও প্রাণ স্পন্দন থাকতে হবে।[৯৬]

হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) একবার রমাদান মাসে একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা হাসাহাসি করছিল, তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : 'ওহে

---

৯৫. আবূ 'আলী আল-কালী : আল-আমালী-৩/১৯৪; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/৫৪; আল-'ইকদ-২/২২৯
৯৬. আল-'ইকদ-২/২৩০

লোকেরা! আল্লাহ তা'আলা রমাদান মাসকে তাঁর সৃষ্টির জন্য প্রতিযোগিতার ময়দান করে দিয়েছেন। যেখানে তারা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রতিয়োগিতা করবে। একটি দল অগ্রগামী হয়েছে। সুতরাং তারা সফলকাম হয়েছে। আরেকটি দল পিছনে পড়ে গেছে। সুতরাং তারা ব্যর্থ হয়েছে। আজকের দিনে অহেতুক হাসি-তামাশায় লিপ্ত ব্যক্তিদের দেখে অবাক হতে হয়, যে দিন প্রতিযোগিতায় অগ্রগামীরা সফলকাম হচ্ছে, আর পশ্চাৎগামীরা ব্যর্থ হচ্ছে। ওহে, আল্লাহর কসম! দৃষ্টির পর্দা যদি উঠে যেত তাহলে সৎকর্মশীলকে তার সৎকাজ এবং অসৎকর্মশীলকে তার অসৎকাজ ব্যস্ত করে রাখতো।'[৯৭]

তিনি বলতেন : ওহে আদমের সন্তান! তুমি তোমার নির্ধারিত জীবনকাল অতিক্রম করতে পারবে না। তোমার সব আশা-আকাংখাও পূর্ণ করতে পারবে না। তোমার নির্ধারিত রিযক লাভেও ব্যর্থ হবে না। নির্ধারিত রিযকের বাইরে অতিরিক্ত রিযকও তোমাকে দেয়া হবে না। তাহলে তুমি কিসের জন্য জীবনপাত করছো?'[৯৮]

'আব্বাসীয় যুগের প্রখ্যাত লেখক আল-জাহিজের 'আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন', ইবন কুতায়বার ''উয়ূন আল-আখবার', ইবন 'আবদি রাব্বিহি-এর 'আল-'ইকদ আল-ফারীদ'সহ বিভিন্ন বিখ্যাত গ্রন্থে হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) প্রচুর ওয়াজ-নসীহত ও বাণী সংকলিত রয়েছে। আস-সাররাজের 'আল-লুম'আ' ও আবূ নু'আয়মের 'হিলয়াতুল আওলিয়া' গ্রন্থসহ বহু প্রাচীন গ্রন্থে তাঁর জীবনী আলোচিত হয়েছে। ইমাম আল-গাযালী তাঁর 'ইহয়া'উ 'উলূম আদ-দীন' গ্রন্থে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বার বার তাঁর নাম ও বাণী উল্লেখ করেছেন।

হাসান আল-বসরীর ব্যক্তিত্ব এবং দা'ঈ হিসেবে তাঁর যোগ্যতা

হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সেই সব যোগ্যতারই সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন যা সেই যুগের বিশেষ অবস্থায় দীন ও ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং দীনী দা'ওয়াত কার্যকর করার জন্য খুবই জরুরী ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে সামগ্রিকতা, হৃদয়গ্রাহিতা এবং পরিপূর্ণতার সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি দীনের ক্ষেত্রে পূর্ণ পাণ্ডিত্য এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। উন্নত ও উঁচু স্তরের মুফাস্সির এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ ছিলেন। তাঁকে বাদ দিয়ে সে যুগে ইজতিহাদ ও সংস্কারমূলক কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হতো না। সাহাবায়ে কিরামের (রা) একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি পেয়েছিলেন এবং সে যুগটিকে তিনি খুব ভালোমতই অধ্যয়ন করেছিলেন। মুসলমানদের জীবনে এবং ইসলামী সমাজে যে সব পরিবর্তন ঘটেছিল তিনি সে সবের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তিনি তাঁর যুগের সমাজ এবং সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর জীবন-যিন্দেগী সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। সমাজের বৈশিষ্ট্যাবলী এবং তার রোগব্যাধি সম্পর্কেও একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় ওয়াকিফহাল ছিলেন।

---

৯৭. প্রাগুক্ত-২/২৩৫
৯৮. শাযারাতুয যাহাব-১/১৩৮

হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) দা'ওয়াত ও ইসলাহী (আহ্বান ও সংস্কার) কর্মকাণ্ডের শক্তি ও প্রভাবের মধ্যে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি জীবনের এক একটি দিক পাকড়াও করেছেন এবং সমাজের আসল রোগ কোথায় তা খতিয়ে দেখেছেন। তাঁর যুগে আরো অনেক ওয়া'ইজ ও দা'ঈ ছিলেন, কিন্তু তৎকালীন সমাজ যেভাবে তাঁর দা'ওয়াতকে গ্রহণ করেছিল সেভাবে অন্য কারো দা'ওয়াতকে গ্রহণ করেনি। এর কারণ, তাঁর বক্তৃতা-ভাষণ ও দারস থেকে সে যুগের বিগড়ে যাওয়া সমাজের উপর সরাসরি চপেটাঘাত পড়তো। যেমন, তিনি নিফাকের স্বরূপ বর্ণনা করতেন, মুনাফিকদের চরিত্র ও অভ্যাসসমূহ স্পষ্ট করে তুলে ধরতেন। কারণ, তিনি দেখেছিলেন সে যুগের শাসক শ্রেণী, সামরিক কর্মকর্তা, ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগামী ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল সদস্যদের জীবনে কিভাবে তার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। তিনি আখিরাত বিস্মৃতি এবং পার্থিব কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসার প্রাবল্যের নিন্দা করতেন। সে যুগের অনেক লোকই এই সংক্রামক রোগের শিকার হয়ে গিয়েছিল। তিনি মৃত্যু ও তার পরবর্তী অনন্ত জীবনের ছবি আঁকতেন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে শ্রোতার চোখের সামনে তা তুলে ধরতেন। ক্ষমতাশীল ও প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী লোকদের এমন একটি শ্রেণী সে সময়ে গড়ে উঠেছিল যারা মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হয়ে পড়েছিল।

মোট কথা, তাঁর দা'ওয়াত, ওয়াজ-নসীহত ও সংস্কারমূলক দার্স সে যুগের মন-মানস ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সংগে এতই সংঘাত ও সংঘর্ষশীল ছিল যে, তৎকালীন সমাজের পক্ষে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা কিংবা সম্পর্কচ্যুত হয়ে থাকা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তাই অধিকহারে লোক তাঁর বক্তৃতা-ভাষণ শুনতো এবং তাদের পাপক্লিষ্ট মনে দাগ-কাটতো। তিনি তাঁর বক্তৃতা ও হালকায়ে দারস থেকে দীন ও ঈমানের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতেন এবং নিজের সাহচর্য ও 'আমল দ্বারা তাদের আত্মাকেও প্রশিক্ষণ দিতেন। ষাট বছরের দীর্ঘ সময় ধরে তিনি এই দা'ওয়াতী কার্যক্রম ও সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। আর এতে ঈমান, ইসলাম ও 'আমলের বাস্তব সত্য লাভ করে ধন্য হয়েছে অগণিত মানুষ। 'আওয়াম ইবন হাওশাব বলেন : হাসান (রহ) ষাট বছর পর্যন্ত স্বীয় কাওমের মধ্যে সেই কাজটি করেছেন যা আম্বিয়ায়ে কিরাম নিজ নিজ উম্মাতের মধ্যে করতেন।[৯৯]

আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিদের অনেকে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার আগেই আল্লাহ ইশারা-ইঙ্গিতে দুনিয়াবাসীকে তা জানিয়ে দেন। খোদ কুরআন পাকেই রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের ইঙ্গিত দান করা হয়েছিল। কোন কোন ব্যক্তি স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) ওফাতের ইশারা লাভ করেছিলেন। তাঁর ওফাতের অল্প কিছু দিন পূর্বে এক ব্যক্তি

---

৯৯. দ্রঃ সিফাতুস সাফওয়া-৪/১২৬; আল-ইক্দ আল-ফারীদ-২/২২০, ২২২, ২২৭, ২৪০, ২৪৪, ২৯৩, ৩২২, ২৫৯; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৭২, ২৪২; ৩/১৩২-১৩৭; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-২/৪৯৯

স্বপ্নে দেখে যে, একটি পাখী মসজিদের সবচেয়ে সুন্দর পাথরটি উঠিয়ে নিয়ে গেছে। সে যুগে স্বপ্নের সবচেয়ে বিখ্যাত তা'বীর (ব্যাখ্যা)কারী ছিলেন হযরত ইবন সীরীন। তিনি এ স্বপ্নের তা'বীর করেন এই বলে যে, হাসান (রহ) ইনতিকাল করবেন।[১০০]

এই স্বপ্নের অল্প কিছু দিন পরেই হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) অন্তিম রোগে আক্রান্ত হন। অসুস্থতার মধ্যে তিনি বলতেন, "হায়, মানুষ যদি তার সুস্থতার সময় অসুস্থতার সময়ের জন্য কিছু রেখে দিত।" জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে তিনি ছেলেকে তাঁর রচনাবলী একত্র করার নির্দেশ দিলেন। ছেলে নির্দেশ পালন করলেন। তারপর চাকরকে চুলা জ্বালাতে বললেন। তারপর সেই আগুনে নিজের সমস্ত রচনাবলী নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিলেন। শুধুমাত্র একখানি গ্রন্থ বাকী রাখলেন।[১০১] সম্ভবতঃ এটি পবিত্র কুরআন বিষয়ক ছিল। কুরআনের সম্মানেই এটি রেখে দেন।

জীবনের একেবারে প্রান্তবেলায় লেখককে ডেকে তিনি লেখালেন : হাসান একথা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। আর যে মরণকালে অন্তরের সাথে এই সাক্ষ্য দিয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১০২]

এই সব প্রস্তুতির পর হিজরী ১১০/খ্রীষ্টাব্দ ৭২৮ সনের এক জুম'আর দিনের রাতে আখিরাতের পথে যাত্রা করেন।[১০৩] বিখ্যাত তাবি'ঈ মুহাদ্দিছ হযরত আইউব ও হযরত হুমায়দ আত-তাবীল (রহ) তাঁকে গোসল দেন।[১০৪] দ্বিতীয় দিন জুম'আর নামাযের পর জানাযার নামায পড়া হয়। জানাযায় মানুষের উপচে পড়া ভিড় জমে। লাশ দাফনের জন্য বসরার সব মানুষ গোরস্তানে চলে যায়। ফলে শহর একেবারেই শূন্য হয়ে যায় এবং ঐ দিন বসরার জামে' মসজিদে 'আসরের নামায আদায়ের জন্য কোন নামাযী ছিল না। ফলে সেদিন মসজিদে 'আসরের নামাযের জামা'আত হতে পারেনি।[১০৫] তিনি ৮৮ বছর জীবিত ছিলেন।[১০৬]

হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের সাথে বাহ্যিক রূপ ও সৌন্দর্যও লাভ করেছিলেন। দৈহিকভাবে তিনি দারুণ সুন্দর ছিলেন।[১০৭] এই সৌন্দর্যের সাথে

---

১০০. আল-'ইকদ-১/২৩৪
১০১. প্রাগুক্ত-১/২৭৪
১০২. প্রাগুক্ত-২/৪২৬
১০৩. প্রাগুক্ত-২/৪৩৪
১০৪. প্রাগুক্ত-৪/১৬৭, ১৬৯
১০৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭১
১০৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/১৩৭
১০৭. ড: শাওকী দায়ফ : তারীখুল আদাব-২/৪৪৭

আল্লাহ তাঁর মধ্যে দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও ভীতির ভাবও দান করেছিলেন। যে কোন মজলিসে বা মাহফিলে তিনি বসতেন না কেন, সবার মধ্যে মানুষের দৃষ্টি তাঁর উপর গিয়ে পড়তো। 'আসিম আহওয়াল বর্ণনা করেছেন। একবার তিনি বসরা যাবার সময় ইমাম শা'বীকে জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে কি আপনার কোন প্রয়োজন আছে? শা'বী বললেন, হাসানকে আমার সালাম পৌঁছে দেবে। 'আসিম বললেন, আমি তো তাঁকে চিনি না। শা'বী তাঁকে এই চিহ্ন বলে দিলেন যে, বসরায় প্রবেশ করার পর সবচেয়ে সুন্দর যে লোকটি তোমার নজরে পড়বে এবং যাঁকে দেখে তোমার অন্তরে সবচেয়ে বেশী সম্ভ্রমমূলক ভীতি সৃষ্টি হবে, তাঁকেই সালাম পৌঁছাবে। এই চিহ্নের উপর ভিত্তি করে শা'বী সালাম পাঠান, আর 'আসিম ঠিকভাবেই হাসান আল-বসরীকে চিনে ফেলেন।[১০৮]

তিনি ছিলেন সুদর্শন মানুষ। দৈহিক সৌন্দর্যের সাথে পোশাক-পরিচ্ছদও হতো খুবই সুন্দর। অতি মূল্যবান ও সুন্দর কাপড় ব্যবহার করতেন। বড় বড় মজলিস-মাহফিলে যাওয়ার জন্য ভালো কাপড় ও পোশাক আনাতেন। শাতা'র কাতান, ইয়ামনের চাদর এবং ফুল করা চাদর ব্যবহার করতেন। জুব্বা, চাদর এবং পাগড়ী ছিল তাঁর মূল পোশাক। মাথায় পাগড়ী ছাড়া ঘর থেকে বের হতেন না।

১০৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/১৩২; 'উয়ূন আল-আখবার-২/৩৪৪

Contents

ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ আত-তায়মী (রহ)

ইবরাহীম আত-তায়মীর ডাকনাম আবূ আসমা। পিতা ইয়াযীদ ইবন শারীক আত-তায়মী। পিতা-পুত্র উভয়ে ছিলেন কূফার ভোগ-বিলাস বিমুখ তাপস শ্রেণীর তাবি'ঈদের অন্তর্ভুক্ত। সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে ইবরাহীম বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন না। তবে কূফার বা 'আমল 'আলিমদের মধ্যে গণ্য হতেন।[১] ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে হাদীছের হাফিজদের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং তাঁর 'তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ' গ্রন্থে তৃতীয় স্তরে তাঁর নামটি সন্নিবেশ করেছেন।[২]

ইবরাহীম আত-তায়মীর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যুহ্দ ও তাকওয়া। তাঁর পিতা ইয়াযীদও ছিলেন একজন বিখ্যাত 'আবিদ ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ স্বভাবের মানুষ। তিনি অনেক সম্পদ অর্জন করেন, কিন্তু ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দেননি। এমনকি তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদেও ঐশ্বর্যের কোন ছাপ পড়তে পারেনি। একবার ছেলে ইবরাহীম পিতার গায়ে একটি অতি সাধারণ তুলোর জামা দেখে, যার হাতাটা কবৃজি পর্যন্ত ছিল, বলেন, আব্বা আপনি একটু ভালো পোশাক কেন পরেন না? জবাবে তিনি বলেন, বেটা, যখন আমি বসরা থেকে এসেছিলাম, তখন বহু ভালো পোশাক তৈরি করেছি। কিন্তু তাতে আমার আনন্দে, আমার চিত্তের উৎফুল্লতায় কোন বৃদ্ধি ঘটেনি। আর তা দ্বিতীয়বার লাভ করার ইচ্ছাও আমার মধ্যে জাগেনি। আমি এটা চাই যে, যে পবিত্র লুকমাটি আমি আহার করি সেটি আমার সবচেয়ে অপ্রিয় ব্যক্তির মুখে থাক। কারণ, আমি আবু দারদার (রা) মুখ থেকে শুনেছি, দুনিয়াতে এক দিরহামের অধিকারী ব্যক্তির চেয়ে দুই দিরহামের অধিকারী ব্যক্তির নিকট থেকে বেশী হিসাব নেয়া হবে।[৩]

পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন পিতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কল্যাণে ইবরাহীম শৈশব থেকেই দুনিয়ার সুখ-ঐশ্বর্যের প্রতি বিমুখ হয়ে যুহ্দ ও 'ইবাদাতের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তাই পরবর্তীকালে তিনি তাঁর সময়ের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আবিদের মধ্যে পরিগণিত হন। ইবন হিব্বান বলেছেন : তিনি ছিলেন একজন 'আবিদ ব্যক্তি এবং একাধারে অনেক দিন ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করার উপর ক্ষমতাবান।[৪] ইবন হাজারও একথা বলেছেন।[৫] আল-আ'মাশ বলেন ঃ আমি ইবরাহীম আত্-তায়মীকে বলতে শুনেছি যে, তিনি একাধারে তিরিশ দিন না খেয়ে থাকতে পারেন।[৬] 'ইবাদাতের প্রতি তিনি এত গুরুত্ব দিতেন যে, ফরজ নামাযের জামা'আতে কখনো তাঁর প্রথম তাকবীর তথা তাকবীর তাহ্রীমা ছুটে যেত না।

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩; তাকরীব আত-তাহযীব-১/৭৫
২. দ্র. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩; জীবনী নং ৬৮।
৩. ইবন সা'দ, তাবাকাত-৬/২৮৬
৪. তাহ্যীবুত তাহযীব-১/১৫৪
৫. তাহযীবুল কামাল ফী-আসমা' আর-রিজাল-২/২৩২
৬. প্রাগুক্ত-১/২৩৩; তাযকিরাতুল-হুফ্ফাজ-১/৭৩

আর যারা এ ব্যাপারে উদাসীন থাকতো তাদের সম্পর্কে তিনি বলতেন, প্রথম তাকবীরের ব্যাপারে যাদেরকে তোমরা উদাসীন দেখবে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।[৭] তিনি এত একাগ্রচিত্তে নামায আদায় করতেন যেন তাঁর ইহজাগতিক সব চিন্তা ও অনুভূতি লোপ পেতো। আল-আ'মাশ বলেন, তিনি যখন সিজদারত অবস্থায় থাকতেন তখন পাখী উড়ে এসে তাঁর পিঠের উপর বসতো এবং ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মারতো।[৮] তিনি একাধারে দুই মাস রোযা রাখতেন এবং এ সময়কালে প্রতিদিন শুধু একটি আঙ্গুর দ্বারা ইফতার করতেন। এ ছাড়া আর কিছুই খেতেন না।[৯]

'ইবাদাতে এত গভীর নিমগ্নতা এবং দুনিয়ার প্রতি এমন চরম উপেক্ষা সত্ত্বেও একে তিনি যথেষ্ট মনে করতেন না। তিনি বলতেন, আমি যখন আমার কথা ও কাজের মধ্যে তুলনা করি তখন আমার মিথ্যাবাদী হওয়ার ভয় দেখা দেয়।[১০]

তিনি ছিলেন আত্মত্যাগ ও আত্মদানের বাস্তব নিদর্শন। অন্যের জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে আত্মত্যাগের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হন। তাঁর এমন আত্মত্যাগের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও পাওয়া দুষ্কর। বিখ্যাত 'আলিম তাবি'ঈ ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ ছিলেন তাঁর সমসাময়িক মানুষ। আর এই ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ ছিলেন স্বৈরাচারী ও জালিম শাসক হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের দুশমন। হাজ্জাজ তাঁকে ধরার জন্য তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দেন। সরকারী বাহিনী ইবরাহীম আন-নাখা'ঈকে খুঁজতে থাকে। ইবরাহীম আন-নাখা'ঈর প্রতি হাজ্জাজের দুশমনীর কথা ইবরাহীম আত-তায়মীর জানা ছিল। একদিন পুলিশ আন-নাখা'ঈর খোঁজে ইবরাহীম আত্-তায়মীর বাড়িতে হানা দেয়। তারা আন– নাখা'ঈকে চিনতো না। তারা জিজ্ঞেস করলো ইবরাহীম কে? আত্-তায়মী বললেন। আমি ইবরাহীম। তিনি জানতেন, তারা ইবরাহীম আন-নাখা'ঈকে তালাশ করছে। কিন্তু তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে, এ আশঙ্কায় তাঁকে বাঁচানোর জন্য নিজের সঠিক পরিচয় গোপন রাখেন। পুলিশ আন-নাখা'ঈ মনে করে ইবরাহীম আত্-তায়মীকে হাজ্জাজের কাছে নিয়ে যায়। হাজ্জাজ তাঁকে দীমাস জেলখানায় বন্দী করে রাখার নির্দেশ দেন। এ জেলখানাটি হাজ্জাজ তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের উপর নির্যাতনের জন্য বিশেষভাবে নির্মাণ করেন। এটাকে বন্দীশালা না বলে মৃত্যুর ঠিকানা বলাই অধিক সঙ্গত।

সেখানে ঠাণ্ডা-গরম ও রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তারপর একই শৃঙ্খলে দুই কয়েদী বেঁধে রাখার ব্যবস্থা ছিল। এই মাত্রাছাড়া যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগের কারণে অল্পদিনের মধ্যে তাঁর মুখমণ্ডলের রং পাল্টে যায়। তাঁর মা একদিন তাঁকে দেখতে যান, কিন্তু ছেলে ইবরাহীম আত্-তায়মী কথা না বলা পর্যন্ত তাঁকে চিন্‌তে পারেননি। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এ নির্যাতন সহ্য করতে থাকেন। অবশেষে একদিন এই বন্দীদশায়

---

৭. শা'রানী, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, পৃ: ৩৬
৮. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১/১৫৪
৯. আশ-শা'রানী, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, ১/৩৬; তাবি'ঈন, পৃ. ২
১০. তাবাকাত ইবন সা'দ-৬/২৮৫

তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর রাতে হাজ্জাজ স্বপ্নে দেখেন যে, শহরে আজ একজন জান্নাতী ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। সকালে খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন যে, জেলখানায় ইবরাহীম আত্-তায়মী মৃত্যুবরণ করেছেন। একথা শুনে তিনি মন্তব্য করেন, মনে হচ্ছে স্বপ্নটি ছিল একটি শয়তানী ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা)। অতঃপর হাজ্জাজের নির্দেশে ইবরাহীম আত্-তায়মীর মৃতদেহটি ময়লা-আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়া হয়।[১১] খলীফা ইবন খায়্যাত তাঁর তারীখে হিজরী ৯৩ সনে যে সকল মনীষী মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ আত-তায়মী ওয়াসিতে হাজ্জাজের বন্দীশালায় মৃত্যুবরণ করেন।' মুগলাতায় বলেছেন, 'হাজ্জাজ, ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ আত-তায়মী ও ইবরাহীম আন-নাখা'ঈকে খুঁজছিলেন। আন-নাখা'ঈ আত্মগোপন করলেও আত-তায়মী করেননি। তাঁকে জেলে নেওয়া হয় এবং সেখানে তাঁকে হত্যা করা হয়।' অবশ্য ড. বাশ্শার 'আওয়াদ মা'রূফ বলেছেন, তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত যত বর্ণনা পাওয়া যায় তা পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, হাজ্জাজ তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেননি, বরং জেলখানায় অন্য কোন কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।[১২]

আবূ দাউদ বলেছেন, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়নি।[১৩] তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের একটু মতভেদ আছে। আল-আজরী বলেন ঃ আমি আবূ দাউদকে বলতে শুনেছি যে, ইবরাহীম, হাজ্জাজ ও সা'ঈদ ইবন যুবাইর একই বছর মারা যান। আর সেই সনটি হলো হিজরী ৯৫।[১৪] ইমাম আয-যাহাবী বলেছেন, তিনি আনাস ইবন মালিক (রা)-এর আগে মারা যান। আর সেটা হলো হিজরী ৯২ সন।[১৫] আল-ওয়াকিদী বলেছেন, তিনি হিজরী ৯৪ সনে মারা গেছেন।[১৬]

ইবরাহীম আত-তায়মী আনাস ইবন মালিক (রা), তাঁর পিতা ইয়াযীদ ইবন শারীক আত-তায়মী, আল-হারিস ইবন সুওয়াইদ, 'আমর ইবন মায়মূন আল-আওদী' 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা ও উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে 'আয়িশার (রা) সূত্রে তাঁর বর্ণিত হাদীছ মুরসাল শ্রেণীর।[১৭] কারণ, তিনি সরাসরি 'আয়িশার (রা) নিকট থেকে হাদীছ শোনেননি। একথা বলেছেন ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী। দারুকুতনী বলেছেন, তিনি হাফসা ও 'আয়িশা (রা) থেকে হাদীছ শোনার সুযোগ পাননি। কারণ, তিনি তাঁদের দুই জনের যুগ লাভ করেননি।[১৮]

আর তাঁর থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা হলেন ঃ বায়ান ইবন বিশর, আল-হাকাম ইবন 'উতাইবা, যুবাইদ ইবন আল-হারিস,

---

১১. প্রাগুক্ত; তাহযীবুত তাহযীব-১/১৫৪
১২. তাহযীবুল কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-২/২৩৩
১৩. তাহযীবুত তাহযীব-১/১৫৪
১৪. তাহযীবুল কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-২/২৩৩
১৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩
১৬. তাহযীবুত তাহযীব-১/১৫৪
১৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩; তাহযীবুল কামাল-২/২৩২
১৮. তাহযীবুত তাহযীব-১/১৫৪; মীযানুল ই'তিদাল-১/৭৪

মুসলিম আল-বিত্তীন, ইউনুস ইবন 'উবাইদ ও আরো অনেকে।[১৯] হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর স্থান নিরূপণ করতে গিয়ে রিজাল শাস্ত্রবিদগণ অভিন্ন মতে পৌঁছতে পারেননি। ইবন মু'ঈন, আবু যুর'আ, ও ইমাম জাহাবী তাঁকে ছিকা' (বিশ্বস্ত) বলেছেন। আবূ হাতিম বলেছেন, তাঁর থেকে হাদীছ গ্রহণ করা যায়। ইবন হিব্বান তাঁকে তাঁর আস-ছিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[২০] অনেকে তাঁকে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে 'তাদলীস' করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। আল-কারাবীসী বলেছেন, যায়দ ইবন ওয়াহাব থেকে তিনি যা বর্ণনা করেছেন, তার অধিকাংশ মুদাল্লাস।[২১]

ইবরাহীম আত-তায়মী বিভিন্ন ধরনের কিস্সা-কাহিনী ও ইতিহাসের ঘটনাবলী বলে মানুষকে ও'আজ নসীহত করতেন।[২২] তাঁর এমন কিছু কথা আছে যা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ। যেমন তিনি বলতেন, মানুষের জন্য জ্ঞানের ফলাফলের মধ্যে খোদাভীতি এবং মূর্খতার ফলাফলের মধ্যে নিজের কর্মের উপর গর্ব ও অহংকার যথেষ্ট। লোভ মানুষকে খারাপ কাজের জন্য উৎসাহিত করে।[২৩]

ইবরাহীম আত-তায়মী তাঁর দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন জীবনে লাল রঙের বিশেষ ধরনের কাপড় ও পোশাক ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। 'আওয়াম ইবন হাওশাব বলেন : 'আমি ইবরাহীম আত-তায়মীর গায়ে লাল চাদর দেখেছি। আমি তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখেছি লাল কাপড়-চোপড় এবং লাল পর্দা।'[২৪]

---

১৯. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/৭৩; তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১/১৫৪
২০. প্রাগুক্ত
২১. তাহ্যীবুত তাহযীব-১/১৫৪
২২. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-২/৪৩৫
২৩. শা'রানী, তাবাকাত-১/৩৬
২৪. ইবন সা'দ, তাবাকাত-৬/২৮৫

ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ আন-নাখা'ঈ (রহ)

ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ (রহ) কূফার বিশিষ্ট তাবি'ঈ ফকীহ্দের একজন। তাঁর ডাকনাম আবূ 'ইমরান ও আবু 'আম্মার এবং পিতার নাম ইয়াযীদ ইবন আসওয়াদ আন-নাখা'ঈ। আন-নাখা' ইয়ামনের মাযহিজের একটি বড় গোত্রের নাম। আন-নাখা' ছিল মূলত জাসার ইবন 'আমর ইবন 'উল্লাহ্ ইবন খালিদ ইবন উদাদ-এর উপাধি। আন-নাখা' অর্থ দূরে সরে যাওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া। যেহেতু তিনি তাঁর মূল গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে যান, তাই এ উপাধি লাভ করেন। তাঁর সাথে আরো বহু মানুষ গোত্রের আদি বাসস্থান থেকে বেরিয়ে যায়। একথা ইবনুল কালবী তাঁর 'জামহারাতু আন নাসাব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[১] ইবরাহীম এ গোত্রের সন্তান তাই তাঁকে আন-নাখা'ঈ বলা হয়। এ শাখা গোত্রটি কূফায় বসবাস করতো। তাঁর মা আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ ও 'আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদের বোন মুলায়কা বিন্ত ইয়াযীদ।[২] ইবরাহীমের জন্মসন হি. ৪৬/খ্রী. ৬৬৬।

ইবরাহীমের গোত্র আন-নাখা' হিজরী ১১ সনে আরতাত ইবন শুরাহীল ও আল-আরকাম আল-জুহায়শ নামক দু'ব্যক্তিকে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠায়। তাঁরা মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করেন। রাসূল (সা) তাঁদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন এবং তাঁরা বিনা দ্বিধায় ও বিনা প্রশ্নে সে দা'ওয়াত কবুল করেন। সেখানে তাঁরা তাঁদের গোটা গোত্রের পক্ষ থেকে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) হাতে বায়'আত করেন। রাসূল (সা) তাঁদের এমন সুন্দর আচরণে ভীষণ খুশী হন। তিনি তাঁদের দু'জনকে প্রশ্ন করেন : তোমাদের গোত্রে তোমাদের মত লোক আরো আছে কি? তাঁরা বলেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের পিছনে এমন সত্তর (৭০) জন লোক রেখে এসেছি যাঁদের প্রত্যেকেই আমাদের দু'জনের চেয়ে ভালো। তখন রাসূল (সা) তাঁদের জন্য এই দু'আ করেন : اللَّهُمَّ بَارِكْ فِى النَّخَعِ – হে আল্লাহ! নাখা' গোত্রে বরকত ও সমৃদ্ধি দান করুন! উল্লেখ্য যে, এই আরতাত ও তাঁর ভাই দুরায়দ (রা) কাদেসিয়ার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৩]

রাসূলুল্লাহর (সা) এই দু'আ কবুল হয়। এই দু'আর বরকতে এই নাখা' গোত্রে অনেক বড় বড় 'আলিম, মুহাদ্দিছ ও ফকীহর জন্ম হয়।

ইবরাহীমের পরিবারটি ছিল 'ইলম ও 'আমলের পরিবার। চাচা 'আলকামা ও মামা আল আসওয়াদ– দু'জনই ছিলেন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ। তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে তিনি বেড়ে ওঠেন। 'আলকামার দারসে হাদীছের পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে, মুহাম্মাদ ইবন সীরীনের মত বিখ্যাত মুহাদ্দিছও তাতে অংশগ্রহণ করতেন। ইবরাহীমও এই হালকায়ে দারস থেকে জ্ঞান

---

১. ইবন খাল্লিকান : ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৫-২৬
২. তাহযীব আল-কামাল-ফী আসমা' আর-রিজাল-২/২৩৪; আল-আ'লাম-১/৮০
৩. আসরুত তাবি'ঈন-৪৯২

আহরণ করেন।[৪] তাছাড়া চাচা ও মামার মাধ্যমে তখনকার অনেক বড় বড় ব্যক্তি ও মনীষীর বৈঠকে বসা ও মেলামেশার সুযোগ তিনি লাভ করেন। শৈশবে তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট আসা-যাওয়া করতেন। আবু মা'শার বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম রাসূলুল্লাহর (সা) কোন কোন বেগমের ('আয়িশার রা.) নিকট আসা-যাওয়া করতেন।[৫] আবু আয়্যুব তাঁর এ বর্ণনার প্রতিবাদ করে বলেন, তা কেমন করে সম্ভব। জবাবে তিনি বলেন, শৈশবে বালিগ হবার আগে তিনি চাচা 'আলকামা ও মামা আসওয়াদের সাথে হজ্জে যেতেন। আর ঐ দুইজনের ছিল হযরত 'আয়িশার (রা) প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা। হযরত 'আয়িশার (রা) মজলিসে তাঁদের আসা-যাওয়া ছিল।[৬] যদিও হযরত 'আয়িশার মুখ থেকে ইবরাহীমের হাদীছ শুনার কোন প্রমাণ নেই, তবুও তাঁর মত উঁচু স্তরের ব্যক্তিত্বের মজলিসে শরীক হওয়া কল্যাণ ও সৌভাগ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট ছিল। আহমাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-'ইজলী বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কোন সাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেননি। তবে তিনি সাহাবীদের একটি দলকে লাভ করেছেন। 'আয়িশাকে (রা) দেখেছেন। তাঁর সময়ে তিনি ও শা'বী কুফাবাসীদের ফকীহ্ ছিলেন।[৭] ইমাম আয-যাহাবী বলেন, তিনি যায়দ ইবন আরকাম ও অন্য সাহাবীদের দেখেছেন। তবে কোন সাহাবী থেকে হাদীছ শোনেননি।[৮]

এ সব মহান ব্যক্তিদের সুহবত ও সাহচর্য ইবরাহীমকে জ্ঞানের সাগরে পরিণত করে। তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের মধ্যে পরিগণিত হন। ইমাম নাবাবী লিখেছেন, তাঁর মহত্ব ও মর্যাদা এবং দীনের তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণতার ব্যাপারে সবাই একমত। আবু যুর'আ নাখা'ঈ বলেন, তিনি ছিলেন ইসলামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম।[৯] হাদীছ ও ফিকাহ্ উভয় শাস্ত্রে তাঁর ছিল সমান পারদর্শিতা। ইবন খাল্লিকান তাঁকে ফকীহ্ ও বিখ্যাত ইমামদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন।[১০]

তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছের একজন। ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে দ্বিতীয় তাবকার হাফিজে হাদীছের মধ্যে গণ্য করেছেন। হাদীছের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন তাঁর দুই মামা আসওয়াদ ও 'আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ এবং মাসরূক, 'আলকামা, আবু মা'মার, হাম্মাম ইবন হারিছ, কাজী শুরায়হ, সাহ্ম ইবন মিনজাব প্রমুখের ন্যায় বিখ্যাত মুহাদ্দিছদের নিকট থেকে। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর শিষ্য শাগরিদদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেন : আ'মাশ, মানসূর, ইবন 'আওন, যুবায়র আল-ইয়ামানী, হাম্মাদ ইবন সুলায়মান, মুগীরা ইবন মাকসাম আদ-দাব্বী ও আরো অনেকে।[১১]

---

৪. ইবন সা'দ : তাবাকাত-৬/২৭০
৫. ইবন খাল্লিকান-১/২৫; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪; সিফাতুস সাফওয়া-৩/৪৭
৬. তাবাকাত-৬/২৭১
৭. তাহ্যীবুল কামাল-২/২৩৭
৮. মীযানুল 'ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল-১/৭৪
৯. তাহ্যীবুল আসমা'-১/১০৪
১০. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৫
১১. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১/১৭৭; তাহ্যীবুল কামাল-২/২৩৫-২৩৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর জানার পরিধি ছিল সীমাহীন। আ'মাশ বলতেন, আমি যখনই ইবরাহীমের নিকট কোন হাদীছ বর্ণনা করেছি, তখনই তিনি সেই হাদীছের ব্যাপারে অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে আমার জানার পরিধির বিস্তার ঘটিয়েছেন।[১২] ইবন মু'ঈন ইমাম শা'বীর মুরসাল বর্ণনার চেয়ে ইবরাহীমের মুরসাল হাদীছসমূহকে বেশী পছন্দ করতেন।[১৩] হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে মূল শব্দের বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতেন না। রিওয়ায়াত বিল মা'না বা অর্থ ও ভাবের বর্ণনাকে তিনি যথেষ্ট মনে করতেন।[১৪] আবু উসামা আল- অ'মাশের সূত্রে বলেন :

كان إبراهيم صيرفيُّ الحديث ـ

ইবরাহীম ছিলেন হাদীছের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী বিশেষজ্ঞ।[১৫]

তবে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি আরোপ করে হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে তিনি অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। মারফূ' হাদীছ তাঁর স্মৃতিতে থাকা সত্ত্বেও তিনি তা বর্ণনা করতেন না। আবু হাশিম বর্ণনা করেছেন। আমি ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহর (সা) কোন হাদীছ কি আপনার নিকট পৌঁছেনি? সেগুলি আমাদেরকে শোনালে আমরা বর্ণনা করতে পারতাম। তিনি জবাব দিলেন, কেন পৌঁছুবে না। তবে 'উমার, 'আবদুল্লাহ, 'আলকামা ও আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করা আমার জন্য সহজ মনে করি।[১৬]

ফিকাহ্ ছিল ইবরাহীমের বিশেষ শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ ও ইমাম। এ শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতার ব্যাপারে সবাই একমত।[১৭] 'আল্লামা যাহাবী তাঁকে ইরাকের ফকীহ্ এবং ইমাম নাওবী কূফার ফকীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শা'বী ইবরাহীমের মৃত্যুর সময় বলেন, তিনি নিজের চেয়ে বড় কোন 'আলিম এবং বড় কোন ফকীহ্ রেখে যাননি। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হাসান বসরী ও ইবন সীরীনও কি নয়? শা'বী জবাব দিলেন, শুধু হাসান বসরী ও ইবন সীরীন কেন, বসরা, কূফা, হিজায ও শামে কেউ নেই।[১৮] তাঁর সময়ের অনেক বড় বড় 'আলিম ফিকহী মাসআলার প্রশ্নকারীদেরকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। সা'ঈদ ইবনে জুবাইরের নিকট কেউ কোন ফাতওয়া জিজ্ঞেস করতে আসলে তিনি বলতেন, ইবরাহীমের বর্তমানে আমার নিকট জিজ্ঞেস করছো?[১৯] আবূ ওয়াইলের নিকট কোন ফাতওয়া জিজ্ঞেসকারী এলে তিনি তাকে ইবরাহীমের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তাকে একথাও বলে দিতেন যে, তাঁর জবাবটি আমাকে জানিয়ে যাবে।[২০] ইবন হাজার বলেন ঃ

---

১২. তাবাকাত-৬/১৮৯
১৩. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১/১৭৭
১৪. তাবাকাত-৬/১৯০
১৫. তাহ্যীবুল কামাল-২/২৩৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩ আবূ নু'আয়ম : আল-হিল্য়া-৪/২২০
১৬. তাবাকাত-৬/২৭২
১৭. তাহ্যীবুল আসমা'-১/১০৪
১৮. প্রাগুক্ত-১/১০২; তাহ্যীবুল কামাল-২/২৩৮
১৯. তাবাকাত-৬/২৭০
২০. প্রাগুক্ত-৬/২৭২

তিনি ছিলেন একজন ফকীহ্ ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ। তবে তাঁর থেকে বহু মুরসাল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[২১]

শা'বী, ইবরাহীম ও আবুদ দুহা মসজিদে বসে হাদীছ বিষয়ে আলোচনা করতেন। যখন তাঁদের কাছে কোন বিষয়ে হাদীছ না থাকতো, তাঁরা ইবরাহীমের দিকে তাকাতেন।[২২]

তাঁর এত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জ্ঞানের প্রকাশ ও প্রচার হোক তা পছন্দ করতেন না। এ কারণে কেউ কিছু জিজ্ঞেস না করলে নিজের থেকে কোন জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন না।[২৩] প্রশ্ন করলেও প্রথমত ভড়কে যেতেন। যুবায়দ বলেছেন, আমি যখনই কোন বিষয় সম্পর্কে ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করেছি তখনই তাঁর চেহারায় একটা বিরক্তির ছাপ লক্ষ্য করেছি।[২৪]

এর একটা বড় কারণ এই ছিল যে, জ্ঞানের একটা মস্ত বড় জিম্মাদারী অনুভব করতেন। তিনি বলতেন, এমন এক সময় ছিল, মানুষ যখন কুরআনের তাফসীর করতে ভয় করতো। আর এখন এমন হয়েছে যে, কারো ইচ্ছা হলেই মুফাস্সির হয়ে যাচ্ছে। আমার এটাই বেশি পছন্দ যে, জ্ঞানের ব্যাপারে আমি মুখ থেকে একটি শব্দও উচ্চারণ না করি। যে সময়ে আমি ফকীহ্ হয়েছি, এটি খুব বাজে সময়।[২৫] আমি এমন সব লোককেও দেখেছি, যারা ভরা মজলিস-মাহফিলেও তাঁদের সবচেয়ে বেশী জানা হাদীছগুলোও বর্ণনা করতেন না।

মূলত এই জিম্মাদারী ও সতর্কতার কারণে বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব দানের ব্যাপারে সীমাহীন সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আ'মাশ বলেন, একবার আমি ইবরাহীমকে বললাম, আমি আপনার নিকট কয়েকটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে চাই। বললেন : এ আমার মোটেই পছন্দ নয় যে, কোন বিষয়ে আমি বলি যে, এটা এমন, অথচ সেটা তার বিপরীত।[২৬]

তাঁর জ্ঞানের প্রচারবিমুখ হবার দ্বিতীয় কারণ এ হতে পারে যে, তিনি খ্যাতি ও লোক দেখানো ভাবকে খুবই ঘৃণা করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, যে ব্যক্তি মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে মুখ থেকে একটি শব্দও উচ্চারণ করে সে তাঁরই বদৌলতে সোজা জাহান্নামে গিয়ে পড়বে। এর জন্য তাঁর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ উদ্দেশ্য হবার কোন প্রয়োজন নেই।[২৭]

ইবন খাল্লিকান বলেন, ইবরাহীমের সাথে কোন লোক সাক্ষাৎ করতে চাইলে, সাক্ষাৎ দান পছন্দ করতেন না। দাসী বলে দিতেন : তাঁর সাথে মসজিদে সাক্ষাৎ করুন। অনেক সময় তিনি তাঁর ছাত্র, সঙ্গী-সাথী ও বাড়ির লোকদের বলে দিতেন, আমি কোথায় আছি, কেউ যদি তোমাদের কাছে জানতে চায়, তোমরা তাকে বলে দিবে, আমরা জানিনে। আর এটা কোন

---

২১. তাকরীব আত্-তাহ্যীব-১/৪৬
২২. তাহ্যীবুল কামাল-২/২৩৮; আবূ হাতিম : আল-জারহু ওয়াত তা'দীল-১/১৪৪
২৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭২
২৪. তাবাকাত-৬/২৭১
২৫. শা'রানী ঃ আত্-তাবাকাত আল-কুবরা-১/৩৬
২৬. ইবন সা'দ ঃ তাবাকাত-৬/১৯০
২৭. শা'রানী-১/৩৬

মিথ্যা হবে না। কারণ, আমার স্থান থেকে বেরিয়ে যাবার পর আমি কোথায় আছি তাতো তোমাদের জানা থাকেনা।[২৮]

তবে সীমাহীন সতর্কতা সত্ত্বেও তিনি নিজ থেকে তাঁর 'ইলমের প্রচার-প্রসারের দ্বার রুদ্ধ করে দেননি। তিনি মানুষের জিজ্ঞাসার জবাবে মাসআলা বলতেন। আর এ জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দেন যখন ইচ্ছুক প্রত্যেকেই মাসআলা জিজ্ঞেস করতে পারতো। তখন তিনি জবাব দিতেন। হাসান ইবন 'উবায়দুল্লাহ বলেন, একবার আমি ইবরাহীমকে বললাম, আপনি আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করবেন না? তিনি বললেন, তোমরা চাও যে আমি অমুকের মত হয়ে যাই। তুমি যা বলছো তাই যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তাহলে গোত্রের মসজিদে চলে এসো। সেখানে যখন কোন ব্যক্তি কিছু জিজ্ঞেস করবে, তোমরাও জবাবটি জেনে যাবে।[২৯]

ইসলামের প্রথম পর্বের অনেক ইমাম মুজতাহিদ জ্ঞানকে গ্রন্থাবদ্ধ করণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা স্মৃতিতে ধারণ ও সংরক্ষণ করতেন। ইবরাহীমেরও তাঁদের মত লেখার চেয়ে স্মৃতির উপর আস্থা ছিল বেশী। তিনি লিখতেন না। ফুদায়ল বলেন, আমি একবার ইবরাহীমকে বললাম যে, আমি অনেক মাসআলা খাতায় লিখেছিলাম। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আল্লাহ আমার নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছেন। জবাবে তিনি বললেন, মানুষ যখন কোন কিছু লিখে নেয় তখন ঐ লেখার উপরই তাঁর সবটুকু আস্থা এসে যায়। আর মানুষ যখন জ্ঞানের সন্ধান করে তখন আল্লাহ তাকে প্রয়োজন মত দান করেন।[৩০]

এই অগাধ 'ইলমের সাথে সাথে তাঁর মধ্যে 'আমলও ছিল। তিনি তাঁর 'ইল্‌ম অনুযায়ী 'আমল করতেন। তিনি ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের একজন 'আবিদ ও যাহিদ ব্যক্তি। খোদাভীতির চরম রূপ তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। পার্থিব ভোগ-বিলাসিতার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে উঠেছিলেন। রাতের নির্জনতায় মানুষের চোখের আড়ালে আল্লাহর 'ইবাদাতে মশগুল হয়ে যেতেন। তালহা বলেন, মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে ইবরাহীম ভালো একটি নতুন কাপড় পরে সুগন্ধি গায়ে লাগিয়ে মসজিদে চলে যেতেন। সকাল পর্যন্ত সেখানে থাকতেন। সকালে রাতের সুন্দর পরিচ্ছদ খুলে আবার সাধারণ পোশাক পরতেন।[৩১]

এভাবে সারারাত 'ইবাদাতে নিমগ্ন থাকার কারণে তার দেহ একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে যেত। আ'মাশ বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম অধিকাংশ সময় নামায শেষ করে আমাদের কাছে আসতেন। অপরাহ্ন পর্যন্ত মনে হতো তিনি যেন অসুস্থ। একদিন পর পর তিনি নিয়মিত রোযা রাখতেন।[৩২]

ঈমান ও 'আকীদার ব্যাপারে পূর্বসূরীদের 'আকীদা-বিশ্বাস থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়া তিনি মোটেই বরদাশত করতেন না। মুরজিয়াদের 'আকীদা তেমন কোন মারাত্মক বিষয়

---

২৮. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৫
২৯. তাবাকাত-৬/২৭০
৩০. প্রাগুক্ত-৬/২৭২
৩১. প্রাগুক্ত-৬/২৭৬
৩২. প্রাগুক্ত-৬/২৭৬; তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/৭৪

ছিল না। অনেক খ্যাতিমান তাবি'ঈ এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ইবরাহীম ছিলেন এর ঘোর বিরোধী। তিনি বলতেন, এটা একটি বিদ'আত। তোমরা সব সময় এর থেকে দূরে থাকবে। মুরজিয়াদের সাথে উঠাবসা করবে না। যারা মুরজিয়াদের মতবাদে বিন্দুমাত্র বিশ্বাসী হতো তাদেরকে তাঁর নিকট আসতে বারণ করতেন।[৩৩]

উম্মাতের সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের দু'আর দরখাস্ত করার ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। সাহাবী ও তাবি'ঈরাও একে অপরের কাছে দু'আর আবেদন করেছেন এবং তাঁরা দু'আও করেছেন। কিন্তু এ কাজটি কিছু বিদ'আতের পথ খুলে দেয় এবং সাধারণ মানুষের 'আকীদায় দুর্বলতা সৃষ্টি করে। এ কারণে, ইবরাহীম এ কাজকে অপছন্দ করতেন। একবার এক ব্যক্তি এসে বললো, আবু 'ইমরান, আপনি একটু দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ আমাকে রোগ থেকে মুক্তি দেন।

লোকটির এ ধরনের আবেদনকে তিনি মোটেই পছন্দ করলেন না। তিনি লোকটিকে বললেন, একবার এক ব্যক্তি হুযায়ফার (রা) নিকট তার মাগফিরাতের জন্য দু'আর আবেদন করে। হুযায়ফা দু'আর পরিবর্তে বলেন, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা না করুন। এ কথা শুনেই লোকটি হুযায়ফা থেকে দূরে সরে যায়। কিছুক্ষণ পর হুযায়ফা লোকটিকে ডেকে তার জন্য দু'আ করেন এই বলে, আল্লাহ্ যেন তোমাকে হুযায়ফার স্থানে প্রবেশ করান। এ দু'আর পর তিনি লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি খুশী হয়েছো? তোমাদের মধ্য থেকে কিছু কিছু মানুষ কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট এই বিশ্বাস নিয়ে যায় যে, সে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সকল স্তর অতিক্রম করে এক উঁচু মর্যাদার ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে। তাকে এ ঘটনা শুনিয়ে তিনি সুন্নাতের কিছু আলোচনা করে তা অনুসরণের আদেশ দেন এবং বিদ'আতের আলোচনা করে তার প্রতি তাঁর অনীহার কথা প্রকাশ করেন।[৩৪]

তবে ছোট ছোট ব্যাপারে তিনি তেমন কঠোর হতেন না এবং কঠোর হওয়া পছন্দও করতেন না। একদিন দুই ব্যক্তি তাঁর নিকট আসে। একজনের মাথার চুল ছেড়ে দেওয়া এবং অন্যজনের বটা। কারকাদ সানজী ইবরাহীমকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আবু 'ইমরান, ঐ ব্যক্তির চুল খোলা রাখতে এবং ঐ ব্যক্তিকে চুল বটতে বারণ করবেন না?

ইবরাহীম বললেন, একথা আমার বুঝে আসে না যে, তোমাদের মধ্যে বানূ আসাদের কঠোরতা সৃষ্টি হয়ে গেছে, না বানূ তামীমের নিষ্ঠুরতা?[৩৫]

সাহাবায়ে কিরামের পরস্পরের বিভেদ, ঝগড়া ও মত পার্থক্যের সমালোচনা, সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ এবং কোন একপক্ষ অবলম্বন করাকে তিনি ভীষণ অপছন্দ করতেন। এ ব্যাপারে তিনি চুপ থাকা সমীচীন মনে করতেন। তাঁর এক শাগরিদ হযরত 'উসমান (রা) ও 'আলী (রা)-এর বিবাদ সম্পর্কে একবার তাঁকে প্রশ্ন করে। জবাবে তিনি শুধু বলেন, আমি না সাবাঈ, আর না মুরজী। আর একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বলে, আবু বাকর (রা) ও 'উমারের (রা) তুলনায় 'আলী (রা) আমার নিকট বেশী প্রিয়। তিনি তাকে বলেন, একথা 'আলী (রা)

---

৩৩. তাবাকাত-৬/২৭৩-২৭৪
৩৪. প্রাগুক্ত-৬/২৭৬
৩৫. প্রাগুক্ত

শুনলে তোমাকে শাস্তি দিতেন। যদি তোমার এ ধরনের কথা বলতেই হয় তাহলে আমার কাছে বসবেনা। তিনি বলতেন, 'উসমানের (রা) চেয়ে 'আলীর (রা) প্রতি আমার মুহাব্বত বেশী। তবে আকাশ থেকে আমি মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাই তাও ভালো, কিন্তু এ আমি কল্পনাও করবো না যে, 'উসমানের (রা) প্রতি আমার অন্তরে কোন রকম খারাপ ধারণা পোষণ করি।[৩৬]

তিনি তাঁর এত মহত্ব ও উঁচু মর্যাদা সত্ত্বেও খুবই চুপচাপ ও একাকী থাকতেন। অতি সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। লোক-লৌকিকতার কোন পরোয়া করতেন না। তাঁর মধ্যে বিনয় ও নম্রতার অবস্থা এমন ছিল যে, ঠেস দিয়ে বসাও তিনি পছন্দ করতেন না।[৩৭] কখনো কখনো সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য মানুষের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। আ'মাশ বর্ণনা করেন যে, আমি অনেক সময় ইবরাহীমকে অন্যের বোঝা মাথায় উঠানো অবস্থায় দেখেছি। তিনি বলতেন, আমি সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে এমনটি করে থাকি।[৩৮]

তাঁর এহেন বিনয় ও নম্র ভাব প্রকাশ সত্ত্বেও মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি একটা সম্ভ্রম মিশ্রিত ভীতি বিরাজমান থাকতো। মুগীরা বলেন, আমরা শাসক শ্রেণীর আমীর–উমারাদের মত ইবরাহীমকে ভয় করতাম।[৩৯]

দেশের শাসন কর্তৃত্বে যথা ওয়ালী ও আমীর -উমারাদের সাথে ইবরাহীমের সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মাঝে মাঝে উপহার-উপঢৌকন বিনিময় হতো। বেশীরভাগ বিশিষ্ট আমীরগণ তাঁর সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতেন।[৪০] শাসক শ্রেণীর হাদীয়া তোহফা গ্রহণে তিনি কোন রকম দোষ মনে করতেন না। তিনি বরং এটাকে খারাপ মনে করতেন যে, আল্লাহ কাকেও কিছু দান করেন, আর সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তবে তিনি শুধু গ্রহণ করতেন না, তাদেরকে দিতেনও। আল-হাসান ইবন 'আমর বলেন : তিনি হাঁস কিনে ঘিয়ে ভেজে আমীরদের নিকট পাঠাতেন।[৪১]

তবে তিনি অত্যাচারী ও উৎপীড়ক আমীর-উমারার ভীষণ বিরোধী ছিলেন। এ কারণে স্বৈরাচারী হাজ্জাজের সাথে কোনদিন আপোষ করেননি। হাজ্জাজ ছিলেন তাঁর চরম দুশমন। তিনি হাজ্জাজের কঠোর সমালোচনা করতেন। তাঁর উপর অভিশাপ দিতেও দোষের কিছু মনে করতেন না। একবার এক ব্যক্তি হাজ্জাজ এবং তাঁর মত অন্য জালিমের উপর লা'নাত বা অভিশাপ দানের ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করে। জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহ নিজেই তো বলেছেন :[৪২]

أَلاَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ -

---

৩৬. প্রাগুক্ত-৬/২৭৫
৩৭. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১/১৭৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৪
৩৮. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-১/১৯৪; তাবাকাত-৬/২৭৮
৩৯. তাবাকাত-৬/২৭২, তাকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪
৪০. তাবাকাত-৬/২৭৭
৪১. প্রাগুক্ত-৬/২৭৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪
৪২. তাবাকাত-৬/২৭৯

–‘ওহে জেনে রাখ, অত্যাচারী উৎপীড়কদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।’ হাজ্জাজের মৃত্যুর পর তিনি এত খুশী হন যে, সিজদায় লুটিয়ে পড়েন এবং চোখ থেকে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।[৪৩]

তিনি হাজ্জাজকে গালি দিতেন এবং বলতেন, হাজ্জাজের নির্দেশে একজন মানুষ অন্ধ হলে তাই তার যুলমের জন্য যথেষ্ট।[৪৪]

হাজ্জাজের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েন। লোকেরা তাঁর এমন অস্থিরতার কারণ জিজ্ঞেস করলো। বললেন, এর চেয়ে মারাত্মক সময় আর কোনটি আছে যখন আল্লাহর দূত জান্নাত অথবা জাহান্নামের পয়গাম নিয়ে উপস্থিত হবে? আমি এই পয়গামের বিপরীতে কিয়ামত পর্যন্ত বর্তমান অবস্থায় বিদ্যমান থাকতে পছন্দ করি।[৪৫] এই অসুস্থতায় হিজরী ৯৫ সনের শেষ অথবা ৯৬ সনের প্রথম দিকে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল উনপঞ্চাশ বা পঞ্চাশ বছর অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী।[৪৬] হাজ্জাজের ভয়ে আত্মগোপন করে থাকা অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে একথা বলেছেন আহমাদ আল-‘ইজলী।[৪৭]

পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি খুব পরিপাটি থাকতেন। মূল্যবান রঙ্গীন পোশাক পরতেন। জাফরানী ও লাল পোশাক পরাকে কোন দোষ মনে করতেন না। শীতের মওসুমে খেঁক-শিয়ালের চামড়ার পোশাক পরতেন। খেঁকশিয়ালের চামড়ার টুপি মাথায় দিতেন। পাগড়ী পরতেন। লোহার আংটি ডান হাতের আঙ্গুলে পরতেন।[৪৮] ইমাম শা'রানী বলেছেন, তিনি নিজেকে গোপন করার জন্য রঙ্গীন পোশাক পরতেন। যাতে এটা বুঝা না যায় যে, তিনি কারীদের কেউ, না দুনিয়াদার লোকদের কেউ।[৪৯]

তিনি অনেক জ্ঞানগর্ভ ও উপদেশমূলক কথা বলতেন। যেমন তিনি বলতেন :

১. একজন মানুষ চল্লিশ বছর পর্যন্ত যে স্বভাবের উপর বিদ্যমান থাকে, পরে তা আর পরিবর্তন করতে পারে না।[৫০]

২. ঈমানের পরে একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করা।

   এ কারণে অসুস্থতার কথা বলাও তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, যখন রোগীর নিকট তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তখন তার উচিত প্রথমে ভালো বলা, তারপর প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা। কারণ, কষ্টের কথা বলাও ধৈর্যের পরিপন্থী কাজ।

---

৪৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪
৪৪. তাবাকাত-৬/২৭৮-২৭৯
৪৫. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৫
৪৬. তাক্রীবুত তাহ্যীব-১/৪৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪; তাবাকাত-৬/২৮৪
৪৭. তাহ্যীবুল কামাল-২৩৭, ২৪০
৪৮. তাবাকাত-৬/২৮০-২৮১
৪৯. তাবাকাতে শা'রানী-১/৩৬
৫০. তাবাকাত-৬/২৭৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩

৩. একজন মানুষের জন্য এতটুকু পাপই যথেষ্ট যে, মানুষ দীন অথবা দুনিয়ার কোন ব্যাপারে তার প্রতি আঙ্গুল দিয়ে দেখায়।[৫১]
৪. তিনি বলেছেন, অতিরিক্ত কথা ও অতিরিক্ত সম্পদে মানুষ ধ্বংস হয়।[৫২]
৫. তিনি আরো বলেছেন, ওজর ও কৈফিয়াত দান থেকে দূরে থাক। কারণ, তা মিথ্যাকে মিশিয়ে দেয়।[৫৩]
৬. একবার তিনি মানসূর ইবন মু'তামিরকে (মৃ. হি. ১৩২) বলেন ঃ বোকার মত প্রশ্ন করবে এবং বুদ্ধিমানের মত মনে রাখবে।[৫৪]

তিনি খুব নির্বিরোধ মানুষ ছিলেন। তিনি বলেছেন : আমি কখনো কারো সাথে ঝগড়া করিনি।[৫৫]

ইবরাহীম তাঁর ঘরে খুরমা রাখা পছন্দ করতেন। কোন ব্যক্তি তাঁর ঘরে এলে, কোন কিছু না থাকলে, বাড়ির লোকদের বলতেন, আমাদেরকে খুরমা দাও। কোন ভিক্ষুক এলে কিছু না থাকলে তাকে খুরমা দিবে।[৫৬]

ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ কুরআন বুঝে পড়ার প্রতি গুরুত্ব দিতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো যে, সে প্রতি তিন দিনে কুরআন শেষ করে। তিনি তাকে বললেন : তুমি যদি ত্রিশ দিনে শেষ করতে এবং জানতে যে তুমি কি জিনিস পড়ছো তা হলেই ভালো হতো। তিনি তাঁর ছাত্র-শিষ্য ও সঙ্গী-সাথী এবং অনুরাগীদেরকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন : তোমরা যখন কারো বাড়িতে যাবে তখন বাড়িওয়ালা যেখানে বসায় সেখানে বসবে। আবূ বাকর ইবন আবী শায়বা বলেন : আল-হাসান, ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ ও মায়মুন ইবন মাহরান—এ তিনজন কোন ব্যক্তি কাউকে সালাম দেয়ার আগে 'আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন' বলা ভীষণ অপছন্দ করতেন।[৫৭]

তিনি অস্বাভাবিক কোন ঘটনা বা বস্তুতে তেমন বিশ্বাস করতেন না। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন যে রাতের অন্ধকারে আলো দেখে? তিনি বলেন : সে আলো শয়তানের পক্ষ থেকে। এমন আলো যদি ভালো কোন কিছু হতো তাহলে তা বদরবাসীদেরকে দেখানো হতো। বাকিয়্যা বলেন : ইবরাহীম আমাকে বলেন : তুমি লেজ হও, মাথা হয়োনা। কারণ, মাথা ধ্বংস হয়, লেজ বেঁচে যায়।[৫৮]

---

৫১. তাবাকাতে শা'রানী-১/৩৬
৫২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-'১/২৫০, ২৯৯ প্রাগুক্ত-১/১৯২; 'উয়ূন আল-আখবার-৩/১০১
৫৩. প্রাগুক্ত-১/১৯২; 'উয়ূন আল-আখবার-৩/১০১
৫৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৫০, ২৯৯
৫৫. তাবাকাত-৬/২৭৩
৫৬. প্রাগুক্ত-৬/১৯০; ২৭৫
৫৭. ইবন 'আবদি রাব্বিহি : আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/২২৯, ২৩৪, ২৩৯
৫৮. প্রাগুক্ত-৩/১৯৮, ২০১

Contents

সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ)

হযরত সা'ঈদের ডাক নাম আবূ মুহাম্মাদ। পিতা মুসায়্যিব ইবন হাযন কুরায়শ গোত্রের মাখযূমী শাখার সন্তান এবং মা উম্মু সা'ঈদ নামে যিনি পরিচিত, আসলাম গোত্রের হাকীম ইবন উমায়্যার কন্যা।[১]

হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব ছিলেন সেই সব অতি সম্মানিত ও পবিত্র-আত্মা মহান তাবি'ঈর একজন যাঁরা তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর পথিকৃৎ ও ইমামের মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁর সম্মানিত পিতা মুসায়্যিব (রা) ও পিতামহ হাযন (রা) উভয়ে ছিলেন সাহাবী। দু'জনই মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নিয়ম ছিল, জাহিলী যুগে রাখা যে সব নামের মধ্যে কোন মন্দ অর্থ পেতেন, তা পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখা। অকল্যাণ ও অশুভ অর্থবহ কোন নাম তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। এ কারণে হাযন (রা) ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নামটি পরিবর্তন করে সাহ্ল রাখতে চান। উল্লেখ্য যে, হাযন শব্দটির অর্থ কষ্ট, শোক, দুঃখ, বিষণ্ণতা ইত্যাদি। কিন্তু হযরত হাযন (রা) তখন একজন নও মুসলিম। আজন্ম লালিত বিশ্বাস ও সংস্কার সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। তাই তিনি বিনয়ের সাথে 'আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ নামটি আমার পিতা-মাতার দেওয়া। তাছাড়া এ নামেই আমি সবার কাছে পরিচিত। অনুগ্রহ করে এটি পাল্টাবেন না। রাসূল (সা) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন এবং পূর্বের নামটি বহাল রাখেন। কিন্তু এ নামের অশুভ পরিণতি এ পরিবারটিকে ভোগ করে যেতে হয়।

পরবর্তীকালে সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব বলতেন, দুঃখ-কষ্ট চিরকাল আমাদের পরিবারের নিত্য সঙ্গী হয়ে থেকেছে।[২]

হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) খিলাফতের দ্বিতীয়, মতান্তরে চতুর্থ বছরে হযরত সা'ঈদ (রহ) জন্মগ্রহণ করেন। একটি বর্ণনা এমনও আছে যে, হযরত 'উমারের (রা) শাহাদাতের দু'বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়। তবে প্রথম বর্ণনাটি অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়।[৩]

হযরত সা'ঈদ (রহ) খিলাফতে রাশিদার শেষ পর্যায়ে একেবারেই অল্প বয়স্ক ছিলেন। তাই তাঁর জীবনে এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নেই। হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালেও তাঁকে কোন দৃশ্যপটে দেখা যায় না। তবে একথা জানা যায় যে, তিনি তখন জ্ঞান অর্জনের পালা শেষ করে তাদরীস ও ইফতা (শিক্ষা ও ফাতওয়া দান)-এর মসনদে আসীন হয়েছেন।[৪]

---

১. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৬২

২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/৩০১; তাবাকাত-৫/৮৮

৩. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৭৮; সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৪

৪. তাবাকাত-৫/৯০

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) সময়কাল থেকে তাঁর পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। আর এ ইতিবৃত্তের সূচনা হয়েছে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সত্য উচ্চারণের মাধ্যমে। সত্য বলার ব্যাপারে তিনি কারো পরোয়া করতেন না। এমন কি খলীফা ও স্বৈরাচারী আমীর উমারার বিরুদ্ধেও তিনি চুপ থাকেননি। আর তাই দেখা যায় তাঁর কর্ম-জীবনের সূচনাতেই খলীফাদের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) খিলাফতের দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। জাবির ইবন আসওয়াদ তাঁর পক্ষে মদীনাবাসীদের বায়'আত নেওয়ার জন্য আসলেন। তখন সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করে বললেন, যতক্ষণ না কোন এক ব্যক্তির ব্যাপারে মুসলমানদের ঐকমত্য হয় ততক্ষণ কারো হাতে বায়'আত করা উচিত নয়।[৫]

সে সময় সা'ঈদকে মদীনার বিশিষ্ট বুযর্গ ব্যক্তি গণ্য করা হতো। তাঁর বিরোধিতার অর্থ ছিল মদীনার একটি হাতও বায়'আতের জন্য বাড়ানো হবে না। এ কারণে জাবির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তাকে বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু শত নিপীড়ন ও নির্যাতন সত্ত্বেও সত্য বলা থেকে তাঁর মুখ বন্ধ করা যায়নি। বেত্রাঘাতের সময়ও তিনি মুখে সত্যের ঘোষণা দিতে থাকেন। জাবিরের ছিল চার স্ত্রী। একজনকে তিনি তালাক দেন। তাঁর 'ইদ্দাত শেষ হওয়ার আগেই তিনি পঞ্চম বিয়েটি করে ফেলেন। এমন কাজ স্পষ্টতঃই হারাম ছিল। যখন সা'ঈদের পিঠে বেত্রাঘাত চলছিল তখন তিনি বলছিলেন, আল্লাহর কিতাবের হুকুম শোনানো থেকে কেউ আমাকে বিরত রাখতে পারবে না; আল্লাহ বলেছেন :[৬]

فَانْكِحُوْا ماطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ.

– আর যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সে সব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত।

আর আপনি চতুর্থ স্ত্রীর 'ইদ্দাতকাল অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন।

খুব শিগগিরই আপনার জন্য একটি খারাপ সময় আসবে। এ ঘটনার অল্প কিছুদিন পর হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) নিহত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের সাথে জাবিরের এই অসদাচরণের কথা জানতে পেরেছিলেন। তিনি সা'ঈদের সম্মান ও মর্যাদার কথা জানতেন। এ কারণে তিনি জাবিরকে একটি চিঠি লিখে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেন এবং তাঁর সাথে যে কোন রকমের রূঢ় আচরণ থেকে বিরত থাকতে বলেন।[৭]

---

৫. প্রাগুক্ত

৬. সূরা আন-নিসা-৩

৭. তাবাকাত-৫/৯০

'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) পরে 'আবদুল মালিক খলীফা হন। তাঁর সাথেও সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের বিরোধ বজায় থাকে। উমাইয়া রাজতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খলীফা মারওয়ান ইবন হাকাম তাঁর মৃত্যুর পূর্বে যথাক্রমে 'আবদুল মালিক ও তাঁর ভাই 'আবদুল আযীযকে খলীফা মনোনীত করে যান। মারওয়ানের মৃত্যুর পর 'আবদুল মালিকের মনে অসৎ উদ্দেশ্যের উদয় হয়। তিনি তাঁর দুই ছেলে ওয়ালীদ ও সুলায়মানকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যেতে চান। কিন্তু কাবীসা ইবন যুওয়াইব তাঁকে বোঝান যে, এ কাজ করলে আপনার সুনাম নষ্ট হবে। তাই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। কিন্তু 'আবদুল মালিকের সৌভাগ্য যে, কিছু দিন পর 'আবদুল 'আযীয স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

'আবদুল 'আযীযের মৃত্যুর পর 'আবদুল মালিকের ইচ্ছা পূরণের বাধা দূর হয়ে যায়। তিনি নিজের মৃত্যুর পর যথাক্রমে ওয়ালীদ ও সুলায়মানকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে তাঁদের পক্ষে বায়'আত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশের শাসকদের নির্দেশ দেন। মদীনার তৎকালীন ওয়ালী হিশাম ইবন ইসমা'ঈল মদীনাবাসীদের বায়'আত গ্রহণের ধারাবাহিকতায় সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবকে ডেকে পাঠান। তিনি হিশামকে বলেন, আমি একটু চিন্তা-ভাবনা না করে বায়'আত করতে পারছিনে। মতান্তরে, তিনি একথা বলেন যে, বর্তমান খলীফা 'আবদুল মালিকের জীবদ্দশায় অন্য কারোর বায়'আত করতে পারিনে।

হযরত সা'ঈদের এমন স্পষ্ট জবাবে হিশাম ক্ষেপে যান এবং তাঁকে বেত্রাঘাত করেন। তারপর রা'স আছ-ছানিয়্যা- যেখানে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো, অত্যন্ত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পাঠিয়ে দেন। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব বুঝেছিলেন, নিশ্চিত তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। তিনি ফাঁসিতে ঝুলার জন্য প্রস্তুত হয়েও গিয়েছিলেন। ফাঁসিতে ঝুলানোর পরে পরনের কাপড় খুলে গিয়ে সতর উন্মুক্ত হয়ে যেতে পারে ভেবে নীচে জাঙ্গিয়াও পরে নিয়েছিলেন। সম্ভবত রা'স আছ-ছানিয়্যা নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে ভয় দেখানো। এ জন্য সেখানে নিয়ে আবার ফিরিয়ে আনা হয়। যখন ফিরিয়ে আনা হয় তখন সা'ঈদ প্রশ্ন করেন : আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? তারা জবাব দেয় : জেলখানায়। তাঁকে জেলে বন্দী করে রাখা হয়। হিশাম তাঁর এসব কর্মকাণ্ডের বিবরণ খলীফার দরবারে পাঠিয়ে দেন।[৮]

জেলে বন্দী অবস্থায় তাঁকে বুঝিয়ে নরম করার চেষ্টা করা হয়। আবূ বাকর 'আবদুর রহমান তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, সা'ঈদ আপনি একেবারেই বোধ-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন। জবাবে তিনি বলেন, আবূ বাকর, আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাঁকে দুনিয়ার সকল শক্তির উপর মহাশক্তি বলে বিশ্বাস করুন। আবূ বাকর হাল ছেড়ে দেননি। তিনি বার বার জেলখানায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে একই কথা বলে তাঁকে নরম করার চেষ্টা

৮. প্রাগুক্ত-৫/৯২-৯৩; আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৪/৪২১

করতে থাকেন। সা'ঈদ তাঁকে শেষ জবাব দেন এই বলে : আল্লাহর কসম! আপনার অন্তর ও চোখ,উভয়ের আলো যেতে বসেছে। এমন শক্ত জবাব শুনে আবূ বাকর ফিরে যান। হিশাম আবূ বাকরের নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চান, সা'ঈদ কি মার খাওয়ার পর একটু নরম হয়েছে? আবূ বাকর জবাব দেন, আল্লাহর কসম! তাঁর সাথে আপনার এরূপ আচরণে তিনি আরো শক্ত হয়ে গেছেন। এখন তাঁকে বশে আনার আশা আপনার ত্যাগ করা উচিত।[৯]

কাবীসা ইবন যুওয়াইব ছিলেন 'আবদুল মালিকের ব্যক্তিগত সচিব। সকল শাহী ডাক প্রথমে তাঁর কাছে আসতো। প্রথমে তিনি সেগুলি পড়তেন, তারপর খলীফা 'আবদুল মালিকের সামনে পেশ করতেন। হিশাম সা'ঈদের সাথে তাঁর আচরণের বিবরণ দিয়ে যে চিঠিটি খলীফার নিকট পাঠান স্বাভাবিকভাবে সেটিও কাবীসার হাতে পড়ে। তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান পরিণামদর্শী মানুষ। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি। এ কারণে হিশামের ফিরিস্তি পাঠ করে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। সাথে সাথে তিনি চিঠিটি নিয়ে 'আবদুল মালিকের নিকট যান এবং তাঁকে বলেন, হিশাম স্বেচ্ছাচারীর মত যা ইচ্ছা তাই করে। ইবন মুসায়্যিবকে এভাবে পেটায় এবং ঢোল-শোহরাত করে তা প্রচার করে। আল্লাহর কসম! এই বাড়াবাড়ি ও কঠোরতার কারণে তিনি আরো শক্ত হয়ে যাবেন। যদি তিনি বায়'আত নাও করেন তাহলেও তাঁর দিক থেকে বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। তিনি এমন লোকদের কেউ নন যাঁদের মধ্যে কপটতা আছে অথবা ইসলাম ও মুসলমানদের কোন রকম ক্ষতির কারণ হতে পারে। তিনি আহ্লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আ'র অন্তর্গত একজন মানুষ। আপনি নিজেই সা'ঈদের নিকট হিশামের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে একটি চিঠি লিখুন। 'আবদুল মালিক বললেন, তুমিই আমার পক্ষ থেকে একটি চিঠি লিখে পাঠাও। তাতে একথা স্পষ্ট করে বলে দেবে যে, হিশাম আমার ইচ্ছার বিপরীত কাজ করেছে। এটা তার নিজেরই সিদ্ধান্ত ছিল। কাবীসা তখনই সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবকে একটি চিঠি লেখেন। তিনি সেটি পাঠ করে মন্তব্য করেন, আমার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। তার ও আমার মাঝখানে আল্লাহ আছেন।

সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবকে চিঠি পাঠানোর পর খলীফা 'আবদুল মালিক হিশামের কর্মকাণ্ডে বিরক্তি প্রকাশ ও তাকে তিরস্কার করে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবকে বেত্রাঘাতের পরিবর্তে তাঁর সাথে সদাচরণ করা উচিত ছিল। আমার ভালো করেই জানা আছে, তাঁর দিক থেকে কোন রকম বিরোধিতা ও বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা নেই। এ চিঠি পেয়ে হিশাম ভীষণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এবং সা'ঈদকে মুক্তি দেন।[১০]

হিশাম তাঁকে বেত্রাঘাত করে যখন জনগণের সম্মুখে এনে দাঁড় করান তখন এক মহিলা সা'ঈদেকে বলে : শায়খ, আপনাকে হেয় ও লাঞ্ছনার স্থলে এনে দাঁড় করিয়েছে। তিনি

---

৯. তাবাকাত-৫/৯৪

১০. প্রাগুক্ত-৫/৯৩-৯৪; হিলয়াতুল আওলিয়া-২/১৭১-১৭২

জবাব দেন, না, আমি বরং লাঞ্ছনা থেকে পালিয়েছি।[১১]

একবার মুসলিম ইবন 'উকবা সা'ঈদকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। তখন 'আমর ইবন 'উছমান ও মারওয়ান সাক্ষ্য দেন যে, তিনি একজন পাগল। অতঃপর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।[১২]

একথা ঠিক যে খলীফা ওয়ালীদের সাথে হযরত সা'ঈদের বড় রকমের কোন বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। তবে তাঁর সামনে কোন দিন মাথাও নত করেননি।

এটা অবাক হবার মত ব্যাপার যে, হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের মত স্বৈরাচারী ও জালিম শাসক, যাঁর নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে সে যুগের উমায়্যা শাসনের বিরোধী খুব কম লোকই রেহাই পেয়েছে, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের সাথে কোন রকম অসদাচরণ করেননি। আর এতে সে যুগের মানুষ দারুণ বিস্ময় প্রকাশ করতো। অনেকে কৌতূহলবশতঃ সা'ঈদকে জিজ্ঞেসও করতেন, এটা কি করে সম্ভব যে, হাজ্জাজ আপনার নিকট কাউকে পাঠাচ্ছে না, আপনার স্থান থেকে আপনাকে অপসারণ করছে না এবং আপনাকে কোন রকম কষ্টও দিচ্ছে না? তিনি জবাব দিতেন, আল্লাহর কসম! আমি নিজেও এর কারণ জানিনে। অবশ্য একটি ঘটনা একবার তাঁর সাথে আমার ঘটেছিল। সে তার পিতার সাথে মসজিদে নামায পড়ছিল। ঠিকমত রুকূ-সিজদা হচ্ছিল না। আমি তাকে সতর্ক করার জন্য একমুঠ কঙ্কর তার প্রতি ছুড়ে মারি। মানুষের ধারণা, এরপর থেকে তার নামায ঠিক হয়ে যায়।[১৩]

খলীফা ওয়ালীদের সময়কালে হিজরী ৯৪ সনে হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) অন্তিম রোগে আক্রান্ত হন। জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্তে পুত্র মুহাম্মাদকে দাফন-কাফনের ব্যাপারে ওয়াসীয়াত করেন। তিনি বলেন, লাশের খাটিয়া লাল চাদর দিয়ে ঢাকবে না, গোরস্তানে নেওয়ার সময় আগুন জ্বালাবে না, এমন সব লোক শবানুগামী হবে না যারা আমার এমন সব গুণের কথা বলে বিলাপ করবে যা প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে নেই। শববাহী খাটিয়া উঠানোর কোন ঘোষণা দেবে না। তা উঠানোর জন্য মাত্র চার ব্যক্তিই যথেষ্ট। কবরের পাশে তাঁবু স্থাপন করবে না।

একেবারে অন্তিম মুহূর্তে নাফি' ইবন জুবায়র পাশে ছিলেন। তিনি মুহাম্মাদকে বললেন বিছানা কিবলামুখী করে দিতে। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব তখনও সচেতন ছিলেন। তিনি বলেন, এমনটি করার প্রয়োজন নেই। আমি এই কিবলার উপর জন্মেছি, এর উপরই মরবো এবং ইন্‌শাআল্লাহ কিয়ামতের দিন এই কিবলার উপরই উঠবো।

কিছুক্ষণ পর অচেতন অবস্থা দেখা দেয়। তখন নাফি' শয্যাটি কিবলামুখী করে দেন। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব আবার চেতনা ফিরে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার শয্যাটি কিবলামুখী করে দিয়েছে কে? কারো জবাব দানে হিম্মত হলো না। কিন্তু তিনি জ্ঞান থাকা অবস্থায় নাফি'কে বলতে শুনেছিলেন। তাই তিনি স্বগতোক্তির মত জবাব

---

১১. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৩/১৬৯

১২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৭৭; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫৬

১৩. তাবাকাত-৫/৯৫

দিলেন, নাফি' করে থাকবে। তারপর বললেন : আমি যদি মুসলমান হই তাহলে যে দিকেই মুখ করে মরি না কেন, কিবলামুখীই থাকবো। আর যদি ইসলামী মিল্লাতের উপর না থাকি, আর অন্তর কিবলামুখী না থাকে, তাহলে মুখ কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেওয়াতে কোন লাভ নেই। আমি মুসলমান। যে দিকেই আমার মুখ থাকুক না কেন, তা কিবলামুখীই হবে।

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ[১৪]

– যেদিকেই তোমরা তোমাদের মুখ ফেরাও না কেন সেদিকেই আল্লাহর মুখমণ্ডল।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অল্প কিছু দীনার তাঁর কাছে ছিল। তার জন্য আল্লাহর দরবারে কৈফিয়াত দেন এই বলে : হে আল্লাহ! তুমি ভালো করেই জান, এগুলি আমি আমার লজ্জাস্থান ঢাকা এবং দীনের হিফাজতের উদ্দেশ্যে রেখে দিয়েছিলাম।

এই রোগেই হিজরী ৯৪ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[১৫] মোট পঁচাত্তর (৭৫) বছর জীবন লাভ করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ বছর বড় বড় অনেক ফকীহ্র ইনতিকাল হয়। এ কারণে এ বছরকে 'সানাতুল ফুকাহা' (ফকীহ্দের বছর) বলা হয়।[১৬] মাকহূল বলেন, সা'ঈদের মৃত্যুর খবর যখন তাঁর নিকট পৌঁছে তখন মানুষ তা শুনে দাঁড়িয়ে যায়।[১৭]

হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন নুবুওয়াত ও রিসালাতের পবিত্র অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে। তবে সেই সমাপ্তির পর খুব বেশী দিন অতিক্রান্ত হয়নি। মদীনার অলি-গলিতে দু'চারজন ছাড়া অধিকাংশ উঁচু স্তরের সাহাবী তখনো তা'লীম ও তারবিয়্যাতের সুমহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। হযরত সা'ঈদের ছিল জ্ঞান অর্জনের প্রতি স্বভাবগত তীব্র স্পৃহা। এ কারণে, ঐ সকল মহান ব্যক্তির সাহচর্য, ফয়েজ ও বরকত তাঁকে 'ইলম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের মোহনায় পরিণত করে। এ ব্যাপারে সকল সীরাত লেখক ও রিজাল শাস্ত্রবিদ একমত যে, তিনি তাঁর সময়ে 'ইলম ও 'আমল এবং সামগ্রিকভাবে জ্ঞান, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী, পূর্ণতা ও উৎকর্ষে একক ও অতুলনীয় ছিলেন। ইমাম নাবাবী লিখেছেন, অগ্রগামিতা, নেতৃত্ব, মহত্ত্ব, জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যান্য কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে তিনি যে তাঁর সমকালীনদের ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে সকল 'আলিম একমত।

ইবন হিব্বান লিখেছেন, তিনি তাঁর যুগে মদীনার সকল অধিবাসীর নেতা ছিলেন।[১৮]

---

১৪. সূরা আল-বাকারা-১১৫

১৫. তাঁর মৃত্যু-সন সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। আল-হায়ছাম ইবন 'আদী, সা'ঈদ ইবন 'উফায়র, ইবন নুমায়র প্রমুখ ব্যক্তিরা হি. ৯৪ সনের কথা বলেছেন। কাতাদা হি. ৮৯, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান ৯১, দামরা ৯২ এবং আলী আল-মাদানী ও ইবন মা'ঈন ১০৫ সনের কথা বলেছেন। হাকেম বলেছেন, হাদীছের অধিকাংশ ইমাম শেষোক্ত মতের উপর। ইমাম আয-যাহাবী বলেছেন, হি. ৯৪ সনের মতটি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। (ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৭৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৬)

১৬. তাবাকাত-৫/১০৫-১০৬

১৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৫

১৮. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২২০

ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে ইমাম, শাইখুল ইসলাম ও শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯] ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন, তাঁর সত্তার মধ্যে হাদীছ, ফিকাহ্, যুহ্দ, তাকওয়া, 'ইবাদাত তথা সার্বিক জ্ঞান ও কর্মগত পূর্ণতার সমাবেশ ঘটেছিল।[২০]

'ইবনুল 'ইমাদের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, কুরআনের তাফসীরে হযরত সা'ঈদের পূর্ণ পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা ছিল। কিন্তু কুরআনের ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের কারণে মুফাস্সির হিসেবে তিনি তেমন খ্যাতি লাভ করেননি। কুরআনের তাফসীরের ব্যাপারে তিনি এত সতর্ক ও কঠোর ছিলেন যে, কোন আয়াতের তাফসীরের ব্যাপারে কখনো মুখ খোলেননি। কোন আয়াতের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে বলতেন : আমি কুরআনের ব্যাপারে কোন কথা বলবো না।[২১] এমন সীমাহীন সতর্কতা অবলম্বনের কারণে কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা কতখানি ছিল তা প্রকাশ পায়নি।

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছের ব্যাপারে তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ ও রুচি। মাত্র একটি হাদীছের জন্য বহু রাত ও বহু দিনের পথ সফর করতেন।[২২] তাঁর মধ্যে হাদীছ শোনা ও সংগ্রহ করার যেমন একটা প্রবল উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল, তেমনিভাবে তাঁর জন্মস্থান মদীনা ছিল ইল্মে হাদীছের মূল স্তম্ভ সাহাবায়ে কিরামের পদভারে সর্বদা সরগরম। হযরত 'উছমান, 'আলী, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, যায়দ ইবন ছাবিত, হাস্সান ইবন ছাবিত, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, আবূ হুরাইরা, আবূ দারদা' আনসারী, আবূ যার আল গিফারী, আবূ কাতাদা আনসারী, হাকীম ইবন হিযাম, জুবায়র ইবন মুত'ইম, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র, সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, মিসওয়ার ইবন মাখরামা, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, আবূ সা'ঈদ খুদরী, মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান, মা'মার ইবন 'আবদিল্লাহ, 'আবদুল্লাহ্ ইবন যায়দ হারিছী, 'আত্তাব ইবন উসায়দ, 'উছমান ইবন আবিল 'আস (রা)সহ আরো অনেক বিশিষ্ট সাহাবীকে তিনি জীবদ্দশায় পান এবং তাঁদের থেকে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান লাভের সুযোগ হাতছাড়া করেননি। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রা), যিনি সর্বাধিক সংখ্যক রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ স্মৃতিতে ধারণ করেন– তিনি ছিলেন সা'ঈদের শ্বশুর। আর এই সম্পর্কের কারণে তিনি বিশেষভাবে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে সবচেয়ে বেশী ফয়েজ ও বরকত লাভে ধন্য হন। আর তাই, তাঁর হাদীছের বেশীর ভাগ হযরত আবূ হুরাইরার (রা) সূত্রে বর্ণিত দেখা যায়।[২৩] হযরত সা'ঈদের (রহ) মেধা এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, কোন কথা একবার শ্রুতিগোচর হলে

---

১৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৬
২০. শাযারাতুয যাহাব-১/১০৩
২১. তাবাকাত-৫/১০১
২২. প্রাগুক্ত-৫/৮৯; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৫
২৩. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৭৫; তাহযীবুত তাহযীব-৪/৮৪; তাহযীবুল আসমা'-১/২২; সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৫

আর কখনো তা ভুলতেন না। চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যেত।[২৪] তাঁর এমন তীক্ষ্ণ মেধা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের পরিধিকে অনেক বাড়িয়ে দেয়।

সে যুগের সকল 'আলিম স্মৃতিতে হাদীছ ধারণ করার তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার কথা এক বাক্যে স্বীকার করতেন। মাকহুল ছিলেন সে যুগের একজন ইমাম ও মুহাদ্দিছ। তিনি বলতেন, আমি জ্ঞানের অন্বেষণে গোটা পৃথিবী ভ্রমণ করেছি। কিন্তু সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের মত 'আলিম কোথাও পাইনি।[২৫] ইমাম যাইনুল 'আবিদীন বলতেন, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব ছিলেন অতীত কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে বেশী জানা মানুষ।[২৬] 'আলী ইবন আল-মাদীনী বলতেন, আমি তাবি'ঈদের মধ্যে সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের মত এত বিশাল জ্ঞানের অধিকারী আর কাউকে জানিনে।[২৭]

হাদীছ শাস্ত্র বিশারদদের নিকট হযরত সা'ঈদের বর্ণিত হাদীছের স্থান এত উঁচুতে ছিল যে, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) ও অন্যরা তাঁর মুরসাল হাদীছকেও সহীহ-এর মর্যাদা দান করতেন।[২৮] ইমাম শাফি'ঈ বলতেন, সা'ঈদের 'মুরসাল' হাদীছসমূহ আমাদের নিকট 'হাসান' হাদীছের সমতুল্য।[২৯] যদিও হযরত 'উমারের (রা) নিকট সা'ঈদের (রহ) হাদীছ শুনার কোন প্রমাণ নেই, তা সত্ত্বেও ইমাম আহমাদ তাঁর সূত্রে সা'ঈদের সরাসরি বর্ণিত হাদীছ দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন।[৩০] ইয়াহইয়া ইবন মু'ঈন হযরত সা'ঈদের (রহ) 'মুরসাল' হাদীছসমূহকে হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) 'মুরসাল'সমূহের উপরও প্রাধান্য দিতেন। 'আলী ইবন আল-মাদীনী বলতেন : কোন মাসআলায় সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের শুধু এতটুকু বলে দেওয়া যে, এ ব্যাপারে হাদীছ বিদ্যমান আছে– যথেষ্ট মনে করা হয়।[৩১]

হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের (রহ) পঠন-পাঠনের বিশেষ বিষয় ছিল ফিকাহ্ শাস্ত্র। তিনি তাঁর সময়ের মদীনার সেই সাতজন ফকীহ্র মধ্যে গণ্য হতেন যাঁরা ছিলেন এই শাস্ত্রের ইমাম।[৩২] শুধু তাঁদের মধ্যে নয় বরং গোটা তাবি'ঈ জামা'আতের মধ্যে তাঁর স্থান ও মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চে। ইবন হিব্বানের বর্ণনা এ রকম যে, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব তাঁর সময়ে মদীনাবাসীদের নেতা ছিলেন এবং ফাতওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ছিল তাঁদের সবার উপরে। তাঁকে 'ফকীহ্ আল-ফুকাহা' (ফকীহ্দের ফকীহ্) বলা হতো। কাতাদা (রহ) বলতেন, আমি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের চেয়ে বেশী হালাল ও হারাম জানা ব্যক্তি কাউকে দেখিনি। সুলায়মান ইবন মূসার বর্ণনা এ রকম যে, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব ছিলেন

---

২৪. তাবাকাত-৫/৯০
২৫. তাহ্যীবুল আসমা'-১/২২০; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৪
২৬. তাবাকাত-৫/৫০
২৭. তাহযীবুল আসমা'-১/২২০
২৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৪
২৯. তাহযীবুত তাহযীব-৪/৮৬
৩০. প্রাগুক্ত-৪/৮৫
৩১. তাহযীবুল আসমা'-১/২২০
৩২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৭৫; আ'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন-১/২৫

'আফকাহুত তাবি'ঈন' (তাবি'ঈদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ্)।[৩৩] মদীনার বাইরে থেকে ফিকাহ্ শাস্ত্রের যে সব ছাত্র মদীনায় আসতো তাদেরকে সোজা তাঁর বাড়ীটি দেখিয়ে দেওয়া হতো। মায়মূন ইবন মাহ্রান বর্ণনা করেছেন, আমি যখন মদীনায় গেলাম এবং সেখানকার সবচেয়ে বড় ফকীহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম তখন লোকেরা আমাকে সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিল।[৩৪] 'আবদুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলাম বর্ণনা করেছেন, চার 'আবদুল্লাহ- 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর পরে ইসলামী বিশ্বে ফিকাহ্র পদটি মাওয়ালীদের দখলে চলে যায়। মক্কার ফকীহ ছিলেন 'আতা', ইয়ামানের তাউস, ইয়ামামার ইয়াহইয়া ইবন আবী কাছীর, বসরার হাসান আল-বসরী, কূফার ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ, শামের মাকহূল এবং খুরাসানের 'আতা' খুরাসানী। কেবল মদীনার পদটি একজন কুরায়শী অর্থাৎ সা'ঈদের অধিকারে ছিল।[৩৫]

হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব যদিও হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও হযরত আবূ বাকরের (রা) যুগটি পাননি এবং হযরত 'উমার ফারূকের খিলাফতকালে ছিলেন অল্প বয়স্ক, তা সত্ত্বেও নিজের চেষ্টা-সাধনার দ্বারা তাঁদের সকলের বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত সমূহের সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। তিনি নিজেই বলতেন, এখন রাসূল (সা), আবূ বাকর ও 'উমারের (রা) ফায়সালা ও সিদ্ধান্তসমূহ আমার চেয়ে বেশী জানা কোন লোক নেই। বিশেষভাবে 'উমারের (রা) বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে বেশী অভিজ্ঞ ছিলেন। এ কারণে তাঁকে 'রাবিয়াতু 'উমার' বলা হতো।[৩৬] হযরত 'উমারের (রা) বিচার-ফায়সালা ও সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল যে, হযরত 'উমারের (রা) পুত্র 'আবদুল্লাহ- যিনি তাঁর জ্ঞান-গরিমার জন্য 'হাবরুল উম্মাহ' নামে খ্যাত ছিলেন, নিজের পিতার কোন কোন বিষয় ও অবস্থা তাঁর নিকট থেকে জেনে নিতেন।[৩৭] ফিকাহ্ শাস্ত্রে হযরত 'উমারের (রা) স্থান ও মর্যাদা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর সময়ে অসংখ্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হয় এবং তিনি তার সমাধান দান করেন। এসব সমাধান ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব সবচেয়ে বেশী জানতেন। তেমনি হযরত 'উছমানের (রা) ফায়সালা ও সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। ইমাম যুহ্রী বলতেন :[৩৮]

كان أعلم بقضاء عمر وعثمان

---

৩৩. তাহ্যীবুল আসমা'-১/২২০
৩৪. তাবাকাত-৫/৯০
৩৫. শাযারাতুয যাহাব-১/১০৩
৩৬. প্রাগুক্ত-১/৮৯
৩৭. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৪/৮৪
৩৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৫

– তিনি 'উমার ও 'উছমানের ফায়সালা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।

তাঁর এ সব বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপকতা শুধু তাবি'ঈ কেন, সাহাবীদের মধ্যেও খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। এ কারণে সাহাবীদের যুগেই তিনি ইফতার মসনদ অলঙ্কৃত করেন। অনেক বড় বড় ও উঁচু স্তরের সাহাবী তাঁর এ যোগ্যতার কথা স্বীকার করতেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার বলতেন, আল্লাহর কসম! তিনি মুফতীদের মধ্যে একজন।[৩৯] মাঝে মাঝে তিনি তাঁর নিকট আগত ফাতওয়া জিজ্ঞেসকারীদেরকে সা'ঈদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁর নিকট কোন একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাকে বললেন, তুমি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের কাছে যাও। তারপর তিনি যে জবাব দেন, আমাকে একটু জানিয়ে যাবে। লোকটি তার নির্দেশ পালন করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) সা'ঈদের জবাব শুনে মন্তব্য করেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি না যে, তিনি 'আলিমদেরই একজন।[৪০] ইমাম আয-যুহ্‌রী বলেন, বংশ বিদ্যার জ্ঞান অর্জনের জন্য ইবন সু'বারের মজলিসে বসতাম। একদিন আমি তাঁর কাছে ফিকাহ বিষয়ের একটি মাসয়ালা জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের কাছে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন।[৪১] ইমাম যুহ্‌রী ও ইমাম মাকহূলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : আনপারা যাঁদের থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফাকীহ কে? তাঁরা জবাব দেন : সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব।[৪২]

হযরত সা'ঈদের সমকালীন বড় বড় 'আলিম ও উঁচু স্তরের তাবি'ঈগণ তাঁর যোগ্যতা ও পূর্ণতার স্বীকৃতি দান করেছেন। তাঁরা তাঁদের নিকট আসা বহু জটিল মাসয়ালার সমাধানের জন্য তাঁর সাহায্য নিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে তাঁর থেকে উপকৃত হওয়ার উপদেশ দিতেন। হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) মত বিশাল ব্যক্তিও যখন কোন মাসয়ালার সমাধান বের করতে সমস্যায় পড়তেন তখন তাঁর কাছে লিখে পাঠাতেন।[৪৩] ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রী বর্ণনা করেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবন ছা'লাবা আমাকে এই উপদেশ দেন যে, যদি তুমি ফিকাহ্ অর্জন করতে চাও তাহলে এই শায়খের (সাঈদ ইবন মুসায়্যিব) পিছু লও।[৪৪]

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করা ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত দিতেন না। তিনি তাঁকে এত বেশী তা'জীম করতেন যে, কোন কিছু জানার প্রয়োজন হলে তাঁকে ডেকে পাঠানো সমীচীন মনে করতেন না, বরং লোক পাঠিয়ে জেনে নিতেন। তিনি বলতেন, মদীনায় এমন কোন 'আলিম নেই যিনি তাঁর 'ইলমসহ 'আমার নিকট আসেননি। শুধু ইবন মুসায়্যিবের 'ইলম আমার কাছে আনা হয়, তাঁকে আসার কষ্ট

---

৩৯. তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব-৪/৮৪
৪০. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/৩৭৫
৪১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৯৮
৪২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৭৫
৪৩. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫৫
৪৪. তাহযীবুত তাহযীব-৪/৮৪

দিইনা।[৪৫] একবার তিনি এক ব্যক্তিকে ইবন মুসায়্যিবের নিকট কোন একটি মাসয়ালার সিদ্ধান্ত জানার জন্য পাঠান। লোকটি তাঁকেই সংগে করে তাঁর দরবারে হাজির হন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে দেখা মাত্র বলে ওঠেন, সে ভুল করে আপনাকে আসার কষ্ট দিয়েছে। আমি তো তাকে শুধু আপনার নিকট থেকে সমাধানটি জেনে আসার জন্য পাঠিয়েছিলাম।[৪৬]

হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের (রহ) শিষ্য-শাগরিদের বেষ্টনী অত্যন্ত প্রশস্ত। তাঁর কয়েকজন বিশেষ বিখ্যাত শাগরিদের নাম এখানে দেওয়া হলো :

সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার, যুহরী, কাতাদা, শুরায়ক ইবন আবী-নুমায়র, আবুয যানাদ, সা'ঈদ ইবন ইবরাহীম, 'আমর ইবন মুররা, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আনসারী, দাঊদ ইবন আবী হিন্দা, তারিক ইবন 'আবদির রহমান, 'আবদুল হামীদ ইবন জুবায়র, শু'বা, 'আবদুল খালিক ইবন সালামা, 'আবদুল মাজীদ ইবন সুহায়ল, 'আমর ইবন মুসলিম, ইমাম বাকির, ইবন মুনকাদির, হাশিম ইবন হাশিম ইবন 'উতবা, ইউনুস ইবন ইউসুফ ও আরো অনেকে।[৪৭]

হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) তৎকালীন আরবের একজন শ্রেষ্ঠ বংশবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। 'আল্লামা আল-জাহিজ বলেছেন : 'এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম বংশ বিদ্যাবিশারদ হলেন আবূ বাকর (রা)। তারপর যথাক্রমে 'উমার (রা), জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা), সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব ও তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ।' তিনি মানুষকে এ বিদ্যা শিক্ষাও দিতেন।[৪৮]

আরবী ভাষায় তাঁর প্রচণ্ড দখল ছিল। তিনি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির ভাষা জ্ঞান সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন। একবার কেউ একজন তাঁকে প্রশ্ন করলো : আচ্ছা বলুন তো, সবচেয়ে বেশী শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষী কে? বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা)। লোকটি বললো : না, আমি তাঁর বিষয়ে জানতে চাচ্ছিনে। জানতে চাচ্ছি, আপনার সমকালীনদের মধ্যে কে? বললেন : মু'আবিয়া, তাঁর পুত্র, সা'ঈদ আল-আশদাক ও তাঁর পুত্র 'আমর ইবন সা'ঈদ। আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবায়র তাঁদের পরের স্তরের। তবে তাঁর কথায় তেমন সম্মোহনী শক্তি নেই।[৪৯]

হযরত সা'ঈদ ছিলেন একজন নির্ভেজাল সম্মানিত দীনী ব্যক্তিত্ব। তা সত্ত্বেও একজন কাব্য-রসিক ব্যক্তি ছিলেন। কবিতা আবৃত্তি শুনার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। এটাকে তিনি তাকওয়া-পরহিযগারীর পরিপন্থী কাজ বলে মনে করতেন না। আল-আসমা'ঈ বলেছেন : একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, 'ইরাকে কিছু তাপস লোক এমন আছেন

---

৪৫. তাবাকাত-৫/৯০
৪৬. প্রাগুক্ত
৪৭. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৪/৮৫; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৫
৪৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৩১৮, ৩২০, ৩২৮, ৩৫৬
৪৯. প্রাগুক্ত-১/৩১৪

যাঁরা কবিতা শুনা ও কাব্যচর্চা করা খারাপ মনে করেন। তিনি মন্তব্য করলেন, তাঁরা অনারব তপস্য-সংস্কৃতি ধারণ করেছেন।[৫০] তিনি নিজে কবিতা রচনা করতেন না, তবে কবিতা শুনতে পছন্দ করতেন।[৫১] তিনি বলেছেন : আবূ বাকর (রা) একজন কবি ছিলেন। 'উমার (রা) ও 'আলী (রা)- উভয়ে কবি ছিলেন। 'আলী (রা) এই তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবি।[৫২]

স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন বড় বিশেষজ্ঞ। এই শাস্ত্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রায় স্বভাবগত। এ শাস্ত্রের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন হযরত আবূ বাকর সিদ্দীকের (রা) কন্যা হযরত আসমা'র কাছ থেকে। আর তিনি অর্জন করেন তাঁর মহান পিতার থেকে।[৫৩]

স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর ভীষণ খ্যাতি ছিল এবং অসংখ্য মানুষ তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য তাঁর কাছে আসতো। যখন কোন ব্যক্তি তাঁর নিকট কোন স্বপ্ন বর্ণনা করতো, তিনি তা শুনার পর প্রথমেই বলতেন, তুমি ভালো স্বপ্ন দেখেছো।[৫৪] এখানে কয়েকটি স্বপ্ন ও তার তা'বীর বর্ণনা করা হলো :

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) ও খলীফা 'আবদুল মালিকের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের সময়কালে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, 'আবদুল মালিককে আমি চিৎ করে ফেললাম। তারপর উপুড় করে তাঁর পিঠে চারটি পেরেক মেরে দিলাম। এ স্বপ্নের কথা শুনে তিনি লোকটিকে বললেন, তুমি নিজে স্বপ্ন দেখনি। লোকটি বললো, আমিই দেখেছি। তখন সা'ঈদ (রহ) বললেন, যদি তুমি সত্য কথাটি না বল তাহলে আমিই বলে দিচ্ছি। তখন লোকটি স্বীকার করলো যে, সে নয় বরং 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) স্বপ্নটি দেখেছেন এবং ব্যাখ্যা জানার জন্য তাকে পাঠিয়েছেন। সা'ঈদ (রহ) বললেন : তুমি যদি স্বপ্নটি সঠিকভাবে বর্ণনা করে থাক তাহলে 'আবদুল মালিক 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রকে হত্যা করবে এবং তাঁর বংশধারা থেকে চারজন খলীফা হবে।

আরেক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে, 'আবদুল মালিক চারবার মসজিদে নববীর সামনে পেশাব করেছেন। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) তার এই ব্যাখ্যা দেন যে, 'আবদুল মালিকের বংশ থেকে চারজন খলীফা হবে। এই দুইটি স্বপ্নের ব্যাখ্যাই সত্যে পরিণত হয়। 'আবদুল মালিকের সাথে সংঘর্ষে ইবন যুবায়র নিহত হন। 'আবদুল মালিকের চার ছেলে ওয়ালীদ, সুলায়মান, ইয়াযীদ (২য়) ও হিশাম খলীফা হন।[৫৫]

আবুল হাসান আল-মাদায়িনী বলেন : খলীফা 'আবদুল মালিক একবার স্বপ্নে দেখেন যে,

---

৫০. প্রাগুক্ত-১/২০২
৫১. তাবাকাত-৫/৬৮
৫২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/২৮৩
৫৩. তাবাকাত-৫/৯১
৫৪. প্রাগুক্ত-৫/৯২
৫৫. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৭৮

তাঁর স্ত্রী 'আয়িশা বিনত হিশাম তাঁর মাথা বিশ টুকরো করে ফেলেছেন। ঘুম ভেঙ্গে যাবার পর ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। স্বপ্নটির ব্যাখ্যা জানার জন্য সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের নিকট লোক পাঠালেন। এই 'আয়িশা ছিলেন নির্বোধ মহিলা। সা'ঈদ বললেন: একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিবে এবং সেই সন্তান বিশ বছরের জন্য দেশের রাজা হবে। এ ব্যাখ্যা সত্যে পরিণত হয়েছিল। আয়িশার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন 'আবদুল মালিকের পুত্র হিশাম।[৫৬]

শুরায়ক ইবন নুমায়র একবার বর্ণনা করলেন যে, আমি দেখলাম, আমার একটি দাঁত আমার হাতে খসে পড়লো এবং সেটাকে মাটিতে পুঁতে রাখলাম। সা'ঈদ (রহ) তার ব্যাখ্যা দিলেন যে, তোমার খান্দানের মধ্যে তোমার সমবয়সী কোন ব্যক্তির মৃত্যু হবে এবং তুমি তাকে দাফন করবে। আরেক ব্যক্তি একবার বর্ণনা করলো যে, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার নিজের হাতে আমি পেশাব করছি। সা'ঈদ ব্যাখ্যায় বললেন, তোমার স্ত্রী তোমার মাহরিম (নিকট আত্মীয়- যাকে বিয়ে করা বৈধ নয়)। অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, লোকটির স্ত্রী তার দুধ বোন। মুসলিম আল-খায়্যাত বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি তার স্বপ্নের বর্ণনায় বললো, একটি কবুতর মসজিদের মিনারের উপর এসে বসে পড়লো। ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, হাজ্জাজ, জা'ফর ইবন আবী তালিবের (রা) পৌত্রীকে বিয়ে করবেন। আরেক ব্যক্তি তার স্বপ্নের বর্ণনা দেয়, সে দেখে একটি ছাগল মদীনার ছানিয়্যাতুল বিদা থেকে দৌড়ে এসে বলতে থাকে– আমাকে জবাই কর। আমাকে জবাই কর, আমি জবাই করলাম। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) ব্যাখ্যায় বললেন, ইবন সালা' মৃত্যু বরণ করবে। ইবন সালা' মদীনার মওয়ালীদের একজন ছিলেন।

'আবদুর রহমান ইবন সায়িব বর্ণনা করেছেন। ফাহ্ম গোত্রের এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে, সে আগুনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) ব্যাখ্যা দিলেন যে, তুমি মৃত্যুর পূর্বে সমুদ্র ভ্রমণ করবে এবং তোমার মৃত্যু হবে হত্যার মাধ্যমে। 'আবদুর রহমান বলেন, সত্যিই লোকটি সমুদ্র ভ্রমণ করে এবং ভ্রমণকালে মরতে মরতে বেঁচে যায়। তারপর 'কুদায়দ'-এর যুদ্ধে সে নিহত হয়।

হুসাইন ইবন 'উবাইদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। আমার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার কোন সন্তান হলো না। একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, কে যেন আমার কোলে একটি ডিম ছুড়ে দিল। আমি সা'ঈদ ইবন আল- মুসায়্যিবের (রহ) নিকট স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, ঐ ডিমটি একটি অনারব মুরগীর ডিম। তুমি কোন অনারব মেয়েকে বিয়ে কর। একথার পর আমি একটি অনারব দাসীকে বিয়ে করি। তারই গর্ভে আমার এক ছেলের জন্ম হয়।

একবার এক ব্যক্তি বর্ণনা করলো, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি ছায়ায় বসে আছি। তারপর উঠে রোদে গেলাম। হযরত সা'ঈদ এর ব্যাখ্যায় বললেন, আল্লাহর কসম! যদি

---

৫৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৪৬

তোমার এ স্বপ্ন সত্য হয় তাহলে তুমি ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। এ কথা শুনে লোকটি তার বর্ণনা ঠিক করে বলে, আমাকে জোর করে রোদে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর আমি সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে আসি। তখন হযরত সা'ঈদ তাঁর পূর্ব ব্যাখ্যার সাথে একথাটি যোগ করেন– 'কাফির হওয়ার জন্য তোমার উপর চাপ প্রয়োগ করা হবে।' লোকটি খলীফা 'আবদুল মালিকের খিলাফতকালে কোন একটি যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর হাতে বন্দী হয় এবং চাপের মুখে ইসলাম ত্যাগ করে। পরে মুক্তি পেয়ে মদীনায় ফিরে আসে। ঘটনাটি সে নিজেই বর্ণনা করতো। এসব স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার কথা ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে বর্ণনা করেছেন।

হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণী

তিনি বলতেন, শয়তান যখন কোন কাজের ব্যাপারে কোন মানুষের নিকট থেকে হতাশ হয়ে যায় তখন সে কোন নারীর মাধ্যমে তা সম্পন্ন করে। আমি আমার নফ্স-এর ব্যাপারে নারীকে বেশী ভয় করি। উপস্থিত লোকেরা বললো, আবূ মুহাম্মাদ! আপনার মত বয়োবৃদ্ধ মানুষের তো নারীর প্রতি কোন আকর্ষণ থাকার কথা নয়। তাছাড়া কোন নারীও আপনার প্রতি কোন রকম আকর্ষণ বোধ করবে না। তাহলে ভয় কিসের? বললেন, তা সত্ত্বেও আমি যা কিছু তোমাদেরকে বলছি, সেটাই হলো বাস্তবতা।[৫৭]

তিনি বলতেন, বান্দার জন্য তার নফ্স-এর সবচেয়ে বড় সম্মান করা হলো আল্লাহর আনুগত্য করা, আর তার সবচেয়ে বড় অবমাননা হলো আল্লাহর নাফরমানী করা। এ দুনিয়া এমন এক মরীচিকা যার দিকে প্রত্যেকে ঝুঁকে যায়, যাকে অন্যায়ভাবে সকলে অর্জন করতে চায়, অন্যায়ের মাধ্যমে পেতে চায় এবং অনুপযুক্ত স্থানে তা ব্যয় করে। দুনিয়ার ধন-সম্পদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই– যদি না তা নিজের দীন ও আত্মসম্মানের রক্ষণাবেক্ষণ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়। জুলমের সহায়ক ও সহযোগীকে যখনই দেখবে, ঘৃণা করবে। যাতে তোমার ভালো কাজগুলো নষ্ট হয়ে না যায়।

তিনি বলতেন, সব মানুষ তার সব কর্ম সম্পাদন করে আল্লাহর আশ্রয় ও তত্ত্বাবধানে। আল্লাহ যখন কাউকে হেয় ও অপমান করতে চান তখন তাকে স্বীয় আশ্রয় ও তত্ত্বাবধান থেকে বের করে দেন। ফলে মানুষের মধ্যে তার গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে যায়।

কোন ভদ্র মানুষ, কোন 'আলিম এবং কোন পূর্ণ মানব এমন নেই যার মধ্যে কিছু না কিছু ত্রুটি নেই। তবে তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ এমন আছেন যাঁদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা উচিত নয়। আর তাঁরা হলেন ঐসব লোক যাঁদের ভালো কাজ তাঁদের মন্দ কাজের চেয়ে বেশী। তাঁদের এ ভালো কাজের জন্য তাঁদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করা উচিত।[৫৮]

হযরত সা'ঈদের (রহ) দাস 'বারদ' একবার তাঁর মনিবের নিকট কিছু মানুষের 'ইবাদাত

---

৫৭. তাবাকাত-৫/১০০; সিফাতুল সাফওয়া-২/৪৪
৫৮. সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৫

প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেন : মানুষ জুহ্‌র থেকে 'আসর পর্যন্ত একাধারে 'ইবাদাত করতে থাকে। হযরত সা'ঈদ (রহ্) বললেন, আল্লাহর কসম! এটা 'ইবাদাত নয়। তুমি কি জান 'ইবাদাত কাকে বলে? 'ইবাদাত বলে, আল্লাহর আদেশসমূহের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা ও তাঁর নিষেধসমূহ থেকে দূরে থাকাকে।[৫৯]

হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ্) যেমন জ্ঞানগত পূর্ণতার অধিকারী ছিলেন, তেমনিভাবে উন্নত নৈতিকতা, চারিত্রিক গুণাবলী ও যোগ্যতারও অধিকারী ছিলেন। 'ইলম ও 'আমল– জ্ঞান ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রে তাঁর ছিল সমান কর্তৃত্ব। তিনি ছিলেন একজন উঁচু মানের 'আবিদ ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ মানুষ। ইবন খালিকান লিখেছেন, ফিকাহ্, হাদীছ, দীনদারী, তাকওয়া-পরহিযগারী, 'ইবাদাত তথা সব ধরনের মহত্ত্ব ও গুণাবলীতে তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয় তাবি'ঈদের অন্তর্গত।[৬০] ইমাম নাবাবী লিখেছেন, তাঁর জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্ব এবং তাঁর দীনী মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সকল 'আলিমের মতামত ও মন্তব্যের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে।[৬১]

তিনি জামা'আতে নামায আদায়ের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। একাধারে চল্লিশ বছর, মতান্তরে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এক ওয়াক্ত নামাযও জামা'আত ছাড়া আদায় করেননি। কখনো এমন সময়ে মসজিদে আসার ঘটনা ঘটেনি যখন লোকেরা নামায শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। জামা'আতের প্রথম কাতারে সব সময় নামায আদায় করতেন। তিনি বলতেন, পঞ্চাশ বছর যাবত নামাযের মধ্যে অন্য কারো পশ্চাদ্দেশের উপর আমার দৃষ্টি পড়ার কোন সুযোগ হয়নি।[৬২]

রাজনৈতিক হৈ-হাঙ্গামা ও বিপর্যয়- বিশৃঙ্খলার সময় যখন ঘর থেকে বের হওয়া মোটেই নিরাপদ ছিল না, তখনও তিনি মসজিদ ছাড়েননি। মদীনার ইতিহাসে 'হাররা'র বিশৃঙ্খলা একটি বিখ্যাত ঘটনা। এ ঘটনা ইয়াযীদ ও 'আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়রের (রা) বিরোধের সময়কালে সংঘটিত হয়। মদীনাবাসীরা যখন ইয়াযীদের আনুগত্য ত্যাগ করে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) পক্ষে 'আবদুল্লাহ ইবন হানজালাকে তাঁদের ওয়ালী বলে ঘোষণা দেয়, তখন ইয়াযীদের বাহিনী মদীনা ঘেরাও করে একাধারে তিন দিন পর্যন্ত মদীনায় পাইকারীভাবে গণহত্যা চালায় এবং লুটপাট করে। এমন ভীতিকর ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় কেউ ঘরের বাইরে পা রাখতে সাহস করতো না। মদীনার মসজিদগুলো একেবারে জনশূন্য হয়ে থাকতো। এমন ভয়াবহ ও ভীতিকর সময়েও হযরত সা'ঈদ (রহ্) মসজিদে যাওয়া থেকে একদিনও বিরত থাকেননি। তিনি মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন। বানূ উমাইয়্যারা তাঁকে দেখে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতো, তোমরা এই বৃদ্ধকে একটু দেখ। এমন অবস্থায়ও তিনি মসজিদ ছাড়ছেন না।

---

৫৯. তাবাকাত-৫/১০০
৬০. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/২৬২; তাহযীবুত তাহযীব-৪/৮৭
৬১. তাহ্যীবুল আসমা'-১/২২০
৬২. তাবাকাত-৫/৯৭; ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/২৬২

জামা'আতের সাথে নামায আদায় করার প্রবল ইচ্ছার কারণে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও এমন স্থানে যেতেন না যেখানে জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের ব্যবস্থা থাকতো না। তাঁর চোখে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। লোকেরা তাঁকে মদীনার বাইরে 'আকীক' চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কারণ, সেখানকার সবুজ পরিবেশ তাঁর চোখের জন্য উপকারী হতে পারে। তিনি বললেন, সকালের ফজরের নামাযের জামা'আতে অংশগ্রহণের কি হবে?

ইবন শিহাব যুহরী বর্ণনা করেছেন। একবার আমি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের (রহ) সামনে পল্লী এলাকার সৌন্দর্য এবং সেখানকার চমৎকার জীবনাচারের আলোচনা করে তাঁকে বললাম, আপনি যদি কিছু দিনের জন্য সেখানে গিয়ে থাকতেন তাহলে ভালো হতো। তিনি বললেন, আমার রাত্রিকালীন নামাযের জামা'আতে উপস্থিতির কি হবে?

হযরত সা'ঈদের (রহ) 'ইবাদাতের মূল সময় ছিল রাতের অন্ধকার। সেই সময় তিনি আত্মসমালোচনা করতেন। প্রত্যেক রাতে তিনি নিজের নফসকে সম্বোধন করে বলতেন, ওহে যাবতীয় মন্দ ও খারাপের উৎস, ওঠো, তোমাকে আমি ঐ উটের মত বিধ্বস্ত করে ছাড়বো যে পরিশ্রান্ত ও দুর্বলতার জন্য চলার সময় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। একথা বলে তিনি তাহাজ্জুদ নামাযে নিমগ্ন হয়ে যেতেন এবং সুবহে সাদিক পর্যন্ত নামায আদায় করে চলতেন। রাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দু'টি পা ফুলে যেত। সকালে আবার নফসকে সম্বোধন করে বলতেন : তোমাকে এ কাজেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এ কাজের জন্যই তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৬৩] বর্ণিত হয়েছে, পঞ্চাশ, মতান্তরে চল্লিশ বছর যাবত 'ঈশার নামাযের ওজুতে ফজরের নামায আদায় করেছেন।[৬৪]

নিষিদ্ধ দিনগুলি ছাড়া তিনি সারা বছর রোযা রাখতেন। মাগরিবের সময় বাড়ী থেকে কিছু পানীয় পাঠিয়ে দেওয়া হতো তা দিয়েই মসজিদে ইফতার সেরে নিতেন।

প্রায় প্রত্যেক বছরই হজ্জ আদায় করতেন। কিছু কিছু বর্ণনা মতে তাঁর হজ্জের মোট সংখ্যা পঞ্চাশে পৌঁছেছে।[৬৫] বানূ উমাইয়্যাদের সাথে মতপার্থক্য ও বিরোধের কারণে কিছুদিনের জন্য তারা তাঁকে হজ্জ আদায় থেকে বিরত রাখেন। 'আলী ইবন যায়দ একবার তাঁকে বলেন, আপনার সম্প্রদায়ের ধারণা, আপনাকে হজ্জ আদায়ে এ জন্য বাধা দেওয়া হয়েছিল যে, আপনি আপনার নিজের উপর এটা আবশ্যিক করে নিয়ে ছিলেন যে, যখনই কা'বা দেখবেন তখনই মারওয়ান বংশের জন্য বদদু'আ করবেন। তিনি বললেন, একথা সত্য নয়। তবে আমি প্রত্যেক নামাযের সময় তাদের জন্য বদদু'আ করে থাকি। সারা জীবনে একটি হজ্জ বা একটি 'উমরা ফরজ। কিন্তু আমি বিশটিরও বেশী হজ্জ আদায় করেছি। তোমাদের সমাজে এমন বহু মানুষ আছে, যারা নিজেদেরকে ভীষণ দীনদার বলে মনে করে থাকে। তারা হজ্জ ও 'উমরা করে মারা যায়। কিন্তু তাদের হজ্জ

---

৬৩. সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৪
৬৪. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/২৬২
৬৫. সিফাতুস সাফওয়া-২/৪৪

হয় না। আমি তো নফল হজ্জ ও 'উমরা অপেক্ষা জুম'আর নামাযের বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

কুরআন পাকের তিলাওয়াত কখনো বাদ যেত না। সফরের অবস্থায়ও বাহনের পিঠে বসে তিলাওয়াত করতেন। তিনি সকল সম্মানীয় ব্যক্তি ও বস্তুর খুবই তা'জীম ও সম্মান করতেন। নবী-রাসূলদের প্রতি এত বেশী ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল যে, তাঁদের নামে নিজের ছেলেদের নাম রাখা বেয়াদবী মনে করতেন। কুরআন ও মসজিদের প্রতি এত সম্মান দেখাতেন যে শব্দ দু'টির ক্ষুদ্র অর্থ বুঝানোর জন্য রূপান্তরও মনঃপূত ছিল না। ইবন হারমালা বর্ণনা করেছেন, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) বলতেন, তোমরা مصيحف ও مسيجد (ছোট মসজিদ, ছোট কুরআন) বলবে না। আল্লাহ যে জিনিসকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তাকে সম্মান কর। আল্লাহ যে জিনিসকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তা শ্রেষ্ঠ এবং ভালো।

অসুস্থ অবস্থায়ও হাদীছ বর্ণনার সময় শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে যেতেন। একবার কোন এক ব্যক্তি তাঁর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর নিকট একটি হাদীছ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি শুয়ে ছিলেন, হঠাৎ উঠে বসলেন। প্রশ্নকারী বললেন, আমি চাচ্ছিলাম আপনার কোন কষ্ট না হোক। তিনি বললেন, আমি শুয়ে শুয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ বর্ণনা করা খারাপ মনে করি।

স্বভাব-চরিত্র ও আদত-অভ্যাসে তিনি ছিলেন সাহাবায়ে কিরামের অনুরূপ। বহু বড় বড় সাহাবী তাঁর স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের তারিফ করেছেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলতেন, যদি রাসূল (সা) তাঁকে দেখতেন, খুশী হতেন। স্বভাবগত ভাবেই তিনি ছিলেন খুবই কোমল মনের ও নির্বিরোধ প্রকৃতির মানুষ। মতবিরোধ, যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব-ফাসাদ খুবই অপছন্দ ছিল। 'ইমরান ইবন 'আবদিল্লাহ খুযা'ঈ বর্ণনা করেছেন, সা'ঈদ ইবন আল মুসায়্যিব (রহ) কারো সাথে ঝগড়া করতেন না। কেউ যদি তাঁর চাদরটি কেড়ে নিতে চাইতো তাহলে তিনি তা স্বেচ্ছায় তার দিকে ছুড়ে দিতেন। শরীয়াতের নিষিদ্ধ বিষয়ের ব্যাপারে এত বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, শিশুদের খেলাধুলোর প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। নিজের মেয়েকে হাতির দাঁতের তৈরি পুতুল নিয়ে খেলতে দিতেন না। তিনি গলায় তাবীজ ঝুলানোকে কোন দোষ মনে করতেন না। একবার তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : لا بأس – এতে কোন দোষ নেই।[৬৬]

তবে সত্য বলার ব্যাপারে তাঁর এ কোমল স্বভাব রুক্ষ ও কঠোর রূপ ধারণ করতো। ইমাম আয-যাহাবী বলেছেন, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব খুবই সত্যভাষী ছিলেন। সত্য বলার প্রয়োজন হলে তিনি কখনো চুপ থাকতেন না। বানূ উমাইয়্যার সমালোচনায় তাঁর ভাষার তরবারি সবসময় কোষমুক্ত থাকতো। তাদের সমালোচনায় কখনো তিনি বিরত থাকতেন না। মুত্তালিব ইবন সায়িব বর্ণনা করেছেন, একবার আমি সা'ঈদ ইবন

---

৬৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৬/২৭৪

মুসায়্যিবের সাথে বাজারে বসে ছিলাম। এমন সময় বানূ উমাইয়্যার এক আর্দালী সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি বানূ উমাইয়্যার ডাকবাহক? সে বললো : হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : তাদেরকে তুমি কেমন দেখে এসেছো? বললো : ভালো অবস্থায়। সা'ঈদ বললেন : তারা তো মানুষকে অভুক্ত রেখে কুত্তার পেট ভরায়। একথা শুনে ডাকবাহক ভীষণ ক্ষেপে গেল। আমি তাকে কোন রকম বুঝিয়ে বিদায় করে দিই। তারপর সা'ঈদকে বললাম, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি কেন এভাবে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তুলছেন? সা'ঈদ বললেন : ওরে নির্বোধ, চুপ কর। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহর অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করবো ততক্ষণ তিনি আমাকে তাদের হাতের মুঠোয় তুলে দেবেন না।[৬৭]

হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) খলীফা ও আমীরদের প্রতি মুখাপেক্ষীহীনতার ভাব তাঁদেরকে উপেক্ষার স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল। তিনি একাধিক উমাইয়্যা খলীফার যুগ লাভ করেন। কিন্তু তাদের কারো সামনে মাথা নোয়াননি। শুধু তাই নয়, বরং তাদের কাকেও সাক্ষাৎ দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করেননি। খলীফা 'আবদুল মালিকের সাথে তাঁর এ রকম কয়েকটি ঘটনার কথাই ইতিহাসে পাওয়া যায়। যাতে তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'আবদুল মালিক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তিনি তাঁকে সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকার করতেন। একবার খলীফা 'আবদুল মালিক মদীনায় গেলেন। তিনি মসজিদে নববীর দরজায় দাঁড়িয়ে মসজিদের অভ্যন্তরে অবস্থানরত সা'ঈদের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁকে লোক মারফত ডেকে পাঠালেন। 'আবদুল মালিকের লোক সা'ঈদের নিকট গিয়ে বললো, আমীরুল মু'মিনীন দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চান। জবাবে সা'ঈদ বললেন : আমার কাছে আমীরুল মু'মিনীনের কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি আমার কাছে আমীরুল মু'মিনীনের কোন প্রয়োজন থেকেও থাকে তাহলে তা পূরণ হবার নয়। লোকটি ফিরে গিয়ে 'আবদুল মালিককে তাঁর জবাবটি জানিয়ে দিল। তিনি আবার লোকটিকে সা'ঈদের নিকট একই কথা বলে পাঠালেন। তবে বলে দিলেন, যদি তিনি না আসতে চান জোর করে আনবে না। লোকটি আবার গেল এবং একই জবাব পেল। লোকটি বললো, যদি আমীরুল মু'মিনীনের নিষেধ না থাকতো তাহলে আমি তোমার মাথা কেটে নিয়ে যেতাম। তিনি বার বার তোমাকে ডাকছেন, আর তুমি এভাবে প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছ। সা'ঈদ বললেন, যদি তিনি আমার সাথে কোন ভালো আচরণের ইচ্ছা করে থাকেন তাহলে আমি তা তোমাকে দান করলাম। আর যদি তাঁর অন্য কোন ইচ্ছা থেকে থাকে তাহলে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিশেষ বৈঠক থেকে উঠবো না যতক্ষণ না তিনি যা করতে চান তা করে ফেলেন। 'আবদুল মালিকের পাঠানো সেই লোকটি ফিরে গিয়ে তাঁকে সা'ঈদের সব কথা জানিয়ে দিল। 'আবদুল মালিক মন্তব্য করলেন : আল্লাহ আবূ মুহাম্মাদের প্রতি দয়া করুন! তাঁর কঠোরতা বেড়েই চলেছে।[৬৮]

---

৬৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৪৫
৬৮. তাবাকাত-৫/৯৫

একবার খলীফা 'আবদুল মালিক মদীনা আসলেন। একদিন রাতের বেলা তাঁর চোখে মোটেই ঘুম আসছিল না। তিনি তাঁর এক নিরাপত্তা রক্ষীকে নির্দেশ দিলেন : তুমি মসজিদে গিয়ে দেখ তো মদীনার কোন কাহিনী বলিয়ে লোক পাও কিনা। পেলে নিয়ে আসবে। নিরাপত্তা রক্ষী মসজিদে গেল। কিন্তু এত গভীর রাতে কিসসা-কাহিনী বলার লোক থাকবে কেন। হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) মসজিদের এক কোণে বসে যিকির ও দু'আ-ইসতিগফারে মশগূল ছিলেন। রক্ষীটি সা'ঈদকে চিনতো না। সে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো এবং হাতের ইশারায় তাঁকে ডাকলো। কিন্তু তিনি কোন প্রকার সাড়া না দিয়ে নিজের জায়গায় বসে রইলেন। রক্ষী মনে করলো, এ ব্যক্তি ইচ্ছা করে তার ইশারায় সাড়া দিচ্ছে না। সে আরো একটু নিকটে গিয়ে ইশারা করলো এবং বললো, আমি তোমাকে ইশারা করেছি, তুমি দেখতে পাওনি? সা'ঈদ (রহ) বললেন : তুমি তোমার প্রয়োজনের কথা বল। রক্ষী বললো : আমীরুল মু'মিনীনের চোখ খুলে গেছে। তিনি আমাকে হুকুম করেছেন : কোন কথা বলার লোক নিয়ে এসো। এ কারণে তোমাকে যেতে হবে। সা'ঈদ বললেন : তিনি কি আমাকে ডেকেছেন? রক্ষী বললো : না। তিনি বলেছেন : তুমি যেয়ে দেখ, শহরের কোন কিসসা-কাহিনী বলার লোক যদি পাও নিয়ে এসো। আমি তোমার চেয়ে উপযুক্ত কোন লোক পাইনি। একথা শুনে সা'ঈদ বললেন : তুমি ফিরে গিয়ে আমীরুল মু'মিনীনকে বলে দাও যে, আমি তাঁর গল্প-কাহিনী বলা লোক নই। এমন জবাব শুনে রক্ষী মনে করলো, এ হয়তো কোন পাগল হবে। এ কারণে সে ফিরে গেল এবং 'আবদুল মালিককে বললো, মসজিদে শুধু এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে ইশারা করলাম, কিন্তু সে তার স্থান থেকে একটুও নড়লো না। তারপর আমি তার নিকটে গিয়ে বললাম, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে পাঠিয়েছেন, কোন কাহিনী বলিয়ে লোক নিয়ে যাওয়ার জন্য। লোকটি জবাব দিল তুমি যেয়ে আমীরুল মু'মিনীনকে বল, আমি তাঁর গল্প-কাহিনী বলার লোক নই। 'আবদুল মালিক তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবহিত ছিলেন। এ কারণে ঘটনাটি শুনে তিনি বলে ওঠেন : এ তো সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব। তাঁকে ছেড়ে দাও।[৬৯]

তিনি খলীফা 'আবদুল মালিককে এত শক্ত জবাব দিতেন যা একজন সাধারণ মানুষকেও দেওয়া যায় না। একবার 'আবদুল মালিক তাঁকে বললেন : আবূ মুহাম্মাদ! এখন আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে, যদি কিছু ভালো কাজ করি তাহলে তাতে খুশী অনুভব করি না। আর খারাপ কাজ করলেও তাতে দুঃখ অনুভব করি না। তিনি বললেন : এখন আপনার অন্তর একেবারেই মরে গেছে।

খলীফা 'আবদুল মালিক-এর পরে তাঁর পুত্র ওয়ালীদের সাথেও হযরত সা'ঈদের (রহ) কর্মধারা একই রকম ছিল। মসজিদে নববীর পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণের পর যখন ওয়ালীদ পরিদর্শনে এলেন তখন মসজিদের অভ্যন্তরের সব মানুষকে বের করে দেওয়া হয়। সা'ঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রহ) মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। তাঁকে উঠানোর

---

৬৯. প্রাগুক্ত-৫/৯৬

হিম্মত কারো হয়নি। এক ব্যক্তি শুধু এতটুকু বলে যে, এ সময় যদি আপনি একটু সরে যেতেন! তিনি জবাব দেন, আমার ওঠার যে সময় আছে তার আগে আমি উঠবো না। তারপর তাঁর কাছে আবেদন জানানো হলো, ঠিক আছে উঠবেন না, তবে অন্ততঃ এতটুকু করুন যে, যখন আমীরুল মু'মিনীন এদিক দিয়ে যাবেন তখন সালাম দেওয়ার জন্য একটু উঠে দাঁড়াবেন। বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তার জন্য উঠে দাঁড়াতে পারিনে। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খলীফা ওয়ালীদকে মসজিদ ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। তিনি সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) মর্যাদা ও তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ কারণে তিনি সা'ঈদকে ওয়ালীদের দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্য এদিক সেদিক ঘোরাতে থাকেন। কিন্তু ওয়ালীদ কিবলার দিকে তাকাতেই এক সময় সা'ঈদের উপর দৃষ্টি পড়ে। ওয়ালীদ জিজ্ঞেস করেন : এই বৃদ্ধ কে? সা'ঈদ তো নয়? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয জবাব দিলেন : হাঁ, তিনিই। তারপর তাঁর পক্ষ থেকে কৈফিয়াত দিতে গিয়ে তাঁর বিভিন্ন অসুবিধার কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন: এখন তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন ও চোখে কম দেখেন। যদি তিনি আপনাকে চিনতে পারতেন তাহলে সালাম দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেন। ওয়ালীদ বললেন : হাঁ, আমি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অবগত। আমি নিজেই তাঁর কাছে যাচ্ছি। অতঃপর ওয়ালীদ এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে তাঁর কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : শায়খ, আপনার শরীর কেমন আছে? শায়খ নিজের জায়গায় বসে বসেই জবাব দিলেন : আলহামদুলিল্লাহ। ভালো আছি। তবে এতটুকু সৌজন্য বজায় রাখলেন যে, ওয়ালীদের কুশলও জিজ্ঞেস করলেন। এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের পর ওয়ালীদ একথা বলতে বলতে ফিরে যান যে, এ হলো পুরাতন স্মৃতি।

হযরত সা'ঈদ (রহ) শরী'আতের হুকুম-আহকামের ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন, তবে কারো গোপন পাপের কথা প্রকাশ করা মোটেই পছন্দ করতেন না। এ ব্যাপারে অন্যদেরকেও গোপন করার নির্দেশ দিতেন। ইবন হারমালা বর্ণনা করেছেন, একদিন আমি প্রত্যুষে ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এক ব্যক্তিকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পাই। আমি তাকে জোর করে টেনে-হেঁচড়ে আমার ঘরে নিয়ে আসি। এরপর সা'ঈদের সাথে আমার দেখা হয়। তাঁর কাছে আমি জানতে চাইলাম, এক ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তিকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পেল, এ অবস্থায় সে কি করবে? তাকে কি বিচারে সোপার্দ করে তার উপর হদ জারী করাবে? সা'ঈদ বললেন : তুমি যদি তাকে তোমার কাপড় দিয়ে ঢাকতে পার তাহলে ঢেকে দাও। একথা শুনে আমি ঘরে ফিরে এলাম। তখন লোকটির নেশার ঘোর কেটে গেছে। আমাকে দেখামাত্রই তার চেহারায় লজ্জা ও অনুশোচনার ভাব ফুটে ওঠে। আমি তাকে বললাম : তোমার লজ্জা হয় না? সকালে তোমাকে যদি এ অবস্থায় গ্রেফতার করে নিয়ে যেত এবং তোমার উপর হদ জারী করা হতো তাহলে মানুষের দৃষ্টিতে তোমার মর্যাদা কোথায় নেমে যেত? তোমার জীবদ্দশায় তোমার মৃত্যু হতো। তোমার সাক্ষ্য পর্যন্ত গ্রহণ করা হতো না। আমার এ উপদেশ শুনে লোকটি বললো : আল্লাহর কসম!

ভবিষ্যতে আমি এমন কাজ আর করবো না। এই গোপন রাখার ফল এই হলো যে, সে চিরদিনের জন্য তাওবা করে নিল।[৭০]

হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) মেয়ের বিয়ের ঘটনাটি আত্মত্যাগ, সহমর্মিতা, দারিদ্রপ্রীতি, আড়ম্বরহীনতা প্রভৃতি দিক থেকে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। তাঁর মেয়েটি ছিল খুবই সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। খলীফা 'আবদুল মালিক তাকে পুত্রবধূ করার প্রস্তাব পাঠান। সা'ঈদ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 'আবদুল মালিক খুব চাপ প্রয়োগ করেন এবং নানা ধরনের কঠোরতার আশ্রয় নেন। কিন্তু সা'ঈদ (রহ) প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ওপর অটল থাকেন। কিছুদিন পর তিনি কুরায়শ বংশের এক অতি সাধারণ ও দরিদ্র ব্যক্তির সাথে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেন। সেই ব্যক্তির নাম ছিল আবূ বিদা'আ।

এই ঘটনাটি আবূ বিদা'আ নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) নিকট নিয়মিত যাতায়াত করতাম। একবার কিছুদিন বিরতির পর গেলাম। সা'ঈদ প্রশ্ন করলেন : এতদিন কোথায় ছিলে? আমি বললাম : আমার স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় উপস্থিত হতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ আমাকে সংবাদ দাওনি কেন, আমিও কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করতাম। কিছুক্ষণ পর আমি যখন উঠতে গেলাম তখন তিনি বললেন, তুমি কি দ্বিতীয় বিয়ের কোন ব্যবস্থা করেছো? আমি বললাম : আমি একজন রিক্ত-নিঃস্ব সামান্য আয়ের মানুষ। আমার সাথে কে তার মেয়ের বিয়ে দেবে?

তিনি বললেন : আমি দেব। তুমি প্রস্তুতি নাও। আমি বললাম : খুবই আনন্দের বিষয়। হযরত সা'ঈদ (রহ) দুই অথবা তিন দিরহাম দেন মাহরের বিনিময়ে আমার সাথে তাঁর মেয়ের বিয়ে পড়িয়ে দেন। আমি সেখান থেকে যখন উঠলাম তখন খুশীর আতিশয্যে কি করবো তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। বাড়ীতে ফিরে এসে বউকে ঘরে তুলে আনার জন্য ধার-দেনার চিন্তা-ভাবনায় পড়ে গেলাম।

সন্ধ্যার সময় সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব মেয়েকে তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য বললেন। দু' রাক'আত নামায তিনি নিজে পড়লেন এবং দু রাক'আত নামায মেয়ের দ্বারা পড়ালেন। তারপর তাকে সংগে করে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। আমি তখন রোযা ইফতারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। হঠাৎ কেউ দরজায় টোকা দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম : কে? জবাব দিল : সা'ঈদ। আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব তো তাঁর নিজের বাড়ী এবং মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যান না। তাহলে এ সা'ঈদ কে? উঠে দরজা খুলে দেখি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব। তাকে দেখে আমি বললাম, আপনি কষ্ট করে এসেছেন কেন। আমাকে ডেকে পাঠালেই' তো পারতেন। তিনি বললেন : না, আমাকে তোমার কাছে আসা উচিত ছিল। আমি বললাম : বলুন, কি করতে হবে। বললেন : তুমি একা আছো আর এদিকে তোমার স্ত্রীও আছে। আমার মনে হলো, তুমি একাকী রাত কাটাবে কেন। এ কারণে স্ত্রীকে সংগে করে নিয়ে এসেছি। সে তার পিতার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল।

---

৭০. প্রাগুক্ত-৫/১০১

তিনি তাকে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমার স্ত্রী লজ্জায় সংকুচিত হয়ে পড়লো। আমিও ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। তারপর আমি ঘরের ছাদে উঠে চিৎকার করে প্রতিবেশীদেরকে জানিয়ে দিলাম যে, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব তাঁর মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি আমার স্ত্রীকে আমার বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছেন। আমার মা রীতি অনুযায়ী তিন দিন পর্যন্ত নতুন বউকে সাজ-গোছ করালেন। সাজ-গোছের পর আমি তাকে দেখলাম। সে ছিল খুবই সুন্দরী, কুরআনের হাফিজা, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের 'আলিমা এবং স্বামীর অধিকার সচেতন এক মহিলা।[৭১]

হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) একজন তাপস ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ মানুষ ছিলেন– একথা সত্য। তবে দুনিয়াকে এত পরিমাণ ত্যাগ করা পছন্দ করতেন না যাতে একজন মানুষ তার মান-সম্মান বজায় রাখতে এবং সমাজের অন্যদের সাথে ভদ্রভাবে ওঠা-বসা করতে পারে না। আর এ কারণে তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবসার মত একটি পবিত্র পেশা গ্রহণ করেন। যয়তুনের তেলের ব্যবসা করতেন।[৭২]

জীবনের এক পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় ভাতা পেতেন। কিন্তু পরে তা গ্রহণ করা ছেড়ে দেন। তাঁর ভাতার তিরিশ হাজার দিরহামেরও বেশী অর্থ বাইতুল মালে জমা ছিল। এ অর্থ গ্রহণ করার জন্য বহুবার তাকিদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে বার বার অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি বলতেন, যতক্ষণ আল্লাহ আমার ও বানূ মারওয়ানের মধ্যে কোন ফায়সালা না করেন ততক্ষণ আমার এ অর্থের কোন প্রয়োজন নেই।[৭৩]

শেষ জীবনে তাঁর দাড়ি ও মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল, যা কখনো স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতো, আবার কখনো দাড়িতে খিজাব লাগাতেন। গোঁফ কখনো চিকন, আবার কখনো পুরো করে ছাঁটতেন। পোশাক-পরিচ্ছদে তাঁর বিশেষ কোন রুচি ছিল না। তবে সাধারণভাবে একটু ভালো পোশাক পরতেন। সাদা পোশাক বেশী পছন্দ ছিল। পাগড়ী কালো হতো। তবে মাঝে মাঝে সাদা পাগড়ীও পরতেন। কখনো কখনো তাজ তথা মুকুটের মত উঁচু টুপি ব্যবহার করতেন। কাঁধের উপর চাদর ব্যবহার করতেন, তাতে কাতানের কারুকাজ করা আঁচল থাকতো। মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম রেশমের চাদরও পরতেন। পাজামা, জামা, লুঙ্গি, মোজা ইত্যাদিও পরতেন।[৭৪]

হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে নিম্নের চরণটি আবৃত্তি করেন :

هو الموت لامنجى من الموت والذى + نحاذر بعد الموت أنكى وافظع

– এই সেই মৃত্যু যে মৃত্যুর থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। আর মৃত্যুর পরে যে জিনিসের আমরা ভয় করি তা অতি মারাত্মক ও ভয়াবহ।

---

৭১. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/২৬৭
৭২. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/৪৭
৭৩. প্রাগুক্ত-১/৯৫
৭৪. প্রাগুক্ত-১/১০৩

Contents

তারপর তিনি এই দু'আ করেন : 'হে আল্লাহ আমার পদস্খলনকে কম করে দেখুন, ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা করে দিন, আপনি আপনার জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দ্বারা সেই ব্যক্তির মূর্খতা ও বর্বরতাকে ঢেকে দিন যে আপনার নিকট ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু আশা করে না এবং শুধু আপনার উপরই সে নির্ভর করে। আপনার ক্ষমা অতি ব্যাপক। হে আমার রব! ভুল-ভ্রান্তির অধিকারী বান্দার জন্য আপনি ছাড়া পালানোর কোন স্থান নেই।' দাঊদ ইবন আবী হিন্দা বলেন, মু'আবিয়ার (রা) এই শেষ উক্তিগুলির কথা শুনে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব মন্তব্য করেন : 'তিনি বাধ্য হয়ে সেই সত্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন যাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমি আশা করি আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ দেখাবেন।'[৭৫]

ইবন শিহাব আয-যুহ্রী বলেন, আমি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবকে বললাম : 'উছমান (রা) কিভাবে নিহত হলেন তা কি আমাকে একটু বলবেন? মানুষের ও তাঁর ভূমিকা কী ছিলো? মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহাবীরা তাঁকে এভাবে লাঞ্ছিত করলেন কেন? তিনি বললেন : তিনি অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন। যারা তাঁকে হত্যা করেছে তারা জালিম। আর যারা তাঁকে লাঞ্ছিত করেছে তারা মাজুর, অক্ষম। আমি প্রশ্ন করলাম : তা কিভাবে? তারপর তিনি 'উছমান (রা) হত্যার প্রেক্ষাপট বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন।[৭৬]

---

৭৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৮০
৭৬. প্রাগুক্ত-৪/২৮৭-২৯২

সা'ঈদ ইবন জুবায়র আল-ওয়ালিবী (রহ)

প্রখ্যাত তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবন জুবায়রের ডাক নাম ছিল আবূ 'আবদিল্লাহ, মতান্তরে আবূ মুহাম্মাদ। পিতা জুবায়র ইবন হিশাম আল-কুফী আল-আসাদী আল-ওয়ালিবী। বানূ ওয়ালিবার সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকা অথবা তাদের সাথে দাসত্বের সম্পর্ক থাকার কারণে তাঁকে আল-ওয়ালিবী বলা হতো।[১] যে সকল মহান তাবি'ঈ 'ইলম ও আমলের সমাবেশ স্থল বলে বিবেচিত ছিলেন তিনি তাঁদের একজন।

সা'ঈদের (রহ) জীবনের যাত্রা দাসত্বের মধ্য দিয়ে হলেও সীমাহীন সাধনা ও প্রতিভা বলে তাবি'ঈ 'আলিমকুলের শিরোমণিতে পরিণত হন। ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে একজন কারী, ফাকীহ্ ও শ্রেষ্ঠ 'আলিম বলে উল্লেখ করেছেন।[২] ইমাম নাবাবী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :[৩]

كان سعيد من كبار أئمة التابعين ومتقدميهم فى التفسير والحديث والفقه والعبادة والورع وغيرها من صفات أهل الخير.

– সা'ঈদ তাবি'ঈদের শ্রেষ্ঠ ইমামদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। তাফসীর, হাদীছ, ফিকাহ্, 'ইবাদাত, যুহ্দ ও তাকওয়া, তথা সৎ মানুষদের সকল উৎকর্ষতায় তাবি'ঈদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

আশ'আছ ইবন ইসহাক বলেন : সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে একজন মস্তবড় 'আলিম বলা হতো।[৪]

সা'ঈদের যখন বুদ্ধি হয় তখন শ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কিরামের বড় একটি সংখ্যা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তবুও সেই সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র একটি দল, যেমন : 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা), আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা), আবূ হুরাইরা (রা), 'আইশা সিদ্দীকা (রা), আনাস ইবন মালিক (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা), আবূ মাসউদ (রা), প্রমুখ 'আলিম সাহাবী তখনো জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁদের বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করেন। বিশেষ করে হাবরুল উম্মাহ্ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাসের (রা) জ্ঞানের সাগর থেকে সর্বাধিক ফায়দা হাসিল করেন।[৫] একদল বিখ্যাত তাবি'ঈর নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন। যেমন : জা'ফার ইবন আবী মুগীরা, আবূ বিশর জা'ফার ইবন ইয়াস, আয়্যুব, আল-আ'মাশ, 'আতা' ইবন সায়িব ও আরো অনেকে।[৬]

---

১. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬
২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭২
৩. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬
৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৬
৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৪/১১; ইবন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৭১
৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৬

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাসের হালকায়ে দারসের পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল যে, সেখানে তাফসীর, হাদীছ, ফিকাহ্, ফারাইজ, সাহিত্য, রচনা, কাব্য ও কবিতা, মোটকথা সব ধরনের জ্ঞান ও শাস্ত্রের সাগর যেন উথলে উঠতো।[৭] সা'ঈদ ইবন জুবায়র এই সীমাহীন অথৈ সাগর থেকে সর্বাধিক পরিতৃপ্ত হন। অত্যন্ত নিয়মানুবর্তিতার সাথে এই হালকায়ে দারসে তিনি শরীক হতেন। সেখানে তাঁর জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি ছিল এ রকম যে, বাইরের প্রশ্নকারীরা ইবনুল 'আব্বাসকে (রা) যে সব প্রশ্ন করতো, যে সব মাসআলা জিজ্ঞেস করতো এবং ইবনুল 'আব্বাস যে সব জবাব দিতেন, সা'ঈদ চুপচাপ বসে তা শুনতেন। মাঝে মাঝে নিজেও কিছু প্রশ্ন করতেন। এসব প্রশ্নের মধ্যে হাদীছও থাকতো এবং ফিকাহ্র মাসাইলও থাকতো। কিন্তু তা লেখার ব্যাপারে ইবনুল 'আব্বাসের (রা) বারণ ছিল। এ কারণে কিছু দিন যাবত ইবন জুবায়র শুনে মুখস্থ করে রাখতেন। তবে মনে হয়, তিনি পরে লেখার অনুমতি লাভ করেন এবং লেখা আরম্ভ করেন। কোন কোন দিন এত বেশী মাসআলা উপস্থাপিত হতো যে, লিখতে লিখতে তাঁর কাগজ শেষ হয়ে যেত এবং কাপড় ও অস্ত্রশস্ত্রের উপর লেখার প্রয়োজন দেখা দিত। ঘটনাক্রমে এমনও কোন কোনদিন হতো যে, কোন প্রশ্নকারী এলো না, সেদিন একটি হাদীছও লেখার সুযোগ হতো না। সেদিন খালি হাতে ফিরে আসতেন।[৮]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাসের (রা) পরে তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে সবচেয়ে বেশী ফায়দা হাসিল করেন। সা'ঈদ ইবন জুবায়রের কূফা অবস্থান কাল পর্যন্ত, যখন তিনি নিজেই মুফতীর স্বীকৃতি পেয়ে গিয়েছিলেন, ইবন 'উমার (রা) থেকে জ্ঞান অর্জন ও 'ইলমী ফায়দা হাসিলের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান ছিল। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, যখন কোন বিশেষ মাসআলায় কূফার 'আলিমগণের মতবিরোধ হতো, তখন আমি তা লিখে নিতাম এবং ইবন 'উমারের (রা) নিকট জিজ্ঞেস করতাম।[৯] এ সব মহান ব্যক্তির কল্যাণ ও বরকতে তিনি কুরআন, তাফসীর, হাদীছ, ফিকাহ্, ফারাইজ তথা সমস্ত দীনী 'ইলমের সাগরে পরিণত হন।[১০]

তিনি কুরআনের একজন ভালো কারী ছিলেন। তারজী'[১১]-এর সাথে কিরআত করতেন। কিন্তু গানের সুরে তিলাওয়াত করা তাঁর ভীষণ অপছন্দ ছিল।[১২] আবূ শিহাব বর্ণনা করেছেন। রমাদান মাসে সা'ঈদ ইবন জুবায়র আমাদের নামায পড়াতেন। তিনি 'তারজী'' করে কিরআত পড়তেন। মাঝে মাঝে একই আয়াত দুইবার করে পাঠ করতেন।[১৩] 'আতা' ইবন আস-সায়িব বলেন : একদিন সা'ঈদ ইবন জুবায়র এক

---

৭. আল-হাকিম ঃ আল-মুস্তাদরিক-৩/৫৩৮
৮. ইবন সা'দ ঃ আত-তাবাকাত-৬/২৫৭
৯. প্রাগুক্ত-৬/২৫৮
১০. তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬
১১. কণ্ঠের মধ্যে ধ্বনি ঘুরিয়ে সুমধুর সুরে আবৃত্তি করা।
১২. আত-তাবাকাত-৬/২৬
১৩. প্রাগুক্ত

ব্যক্তিকে বললেন : আমার পরে তোমরা এ কি নতুন জিনিস চালু করেছো? লোকটি বললো : আপনার পরে তো আমরা নতুন তেমন কিছু চালু করিনি। তিনি বললেন : এই অন্ধ লোকটি ও ইবনুস সায়কল তোমাদেরকে গানের সুরে কুরআন শেখায়।[১৪] সব মশহুর কিরআতের তিনি ছিলেন একজন 'আলিম। ইসমা'ঈল ইবন 'আবদিল মালিক বর্ণনা করেন, সা'ঈদ রমাদান মাসে আমাদের ইমামতি করতেন। নিয়ম ছিল এক রাতে 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের (রা) কিরআত অনুযায়ী কুরআন শোনাতেন, আরেক রাতে শোনাতেন যায়দ ইবন ছাবিতের (রা) কিরআত অনুযায়ী। এভাবে পালাক্রমে প্রতি রাতে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রসিদ্ধ কারীদের কিরআত শোনাতেন।[১৫]

কিরআত ও তাফসীর এ দুই শাস্ত্রের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন এ শাস্ত্রদ্বয়ের ইমাম হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট থেকে। আয়াতের শানে নুযূল এবং তার তাফসীর ও তাবীলের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। যখন তাঁর সামনে কোন আয়াত পাঠ করা হতো তিনি তার বিস্তারিত প্রেক্ষাপট ও ব্যাখ্যা বলে দিতেন। আবূ ইউনুস বর্ণনা করেন, একবার আমি সা'ঈদ ইবন জুবায়রের সামনে এ আয়াত ঃ

إلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ[١٦]

পাঠ করলাম। তখন তিনি বললেন, এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা ছিলেন মক্কার কিছু মজলুম মানুষ। আমি বললাম, আমি এমন লোকদেরই (অর্থাৎ হাজ্জাজের জুলুমের শিকার) নিকট থেকে এসেছি। সা'ঈদ বললেন, ভাতিজা! আমরা তাদের বিরুদ্ধে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কি আর করা যাবে, আল্লাহর মর্জি তো এটাই।[১৭]
আ'মাশ বর্ণনা করেন, সা'ঈদ ইবন জুবায়র–

إِنَّ أَرْضِيْ وَاسِعَةٌ[১৮]–এ আয়াতের তাফসীরে বলতেন যে, এর অর্থ হলো, যখন কোথাও পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হয় তখন সেখান থেকে বের হয়ে যাও।

তিনি তাফসীরের দারসও দিতেন। ইবন ইয়াস বর্ণনা করেন, 'আযরাহ তাফসীরের বই (সম্ভবত হাতে লেখা কপি) এবং দোয়াত নিয়ে সা'ঈদ ইবন জুবায়রের নিকট যেতেন।[১৯] কিন্তু কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তিনি তাফসীর লিখে রাখা পছন্দ করতেন না। একবার এক ব্যক্তি তার নিজের জন্য তাফসীর লিখে রাখার অনুমতি দানের আবেদন জানান। তিনি বললেন, তাফসীর লিখে রাখার পরিবর্তে আমার এটাই পছন্দ যে, আমার একটি পাশ অবশ হয়ে যাক।[২০]

---

১৪. প্রাগুক্ত
১৫. ইবন খাল্লিকান-২/৩৭১
১৬. সূরা আন-নিসা'-৯৮
১৭. আত-তাবাকাত-৬/২৬২
১৮. সূরা আল-আনকাবূত-৫৬
১৯. আত-তাবাকাত-৬/২৬৬
২০. ইবন খাল্লিকান-২/৩৭২; ড. হাসান ইবরাহীম হাসান ঃ তারীখ আল-ইসলাম-১/৫০৩

তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছ তাবি'ঈদের একজন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সাহাবীদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা), আনাস ইবন মালিক (রা), আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা), আবূ মাস'উদ আল-বাদরী (রা), 'আইশা সিদ্দীকা (রা), 'আদী ইবন হাতিম (রা) প্রমুখের নিকট হাদীছ শোনেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাসের (রা) হালকায়ে দারস থেকে বেশী উপকৃত হন। অন্যদের তুলনায় তাঁর মেধা ও ধারণ ক্ষমতা বেশী হবার কারণে হযরত ইবনুল 'আব্বাস (রা) তাঁকে বেশী স্নেহ করতেন এবং তাঁর শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা দূর করার উদ্দেশ্যে কখনো কখনো পরীক্ষামূলকভাবে তাঁর থেকে তিনি হাদীছ শুনতেন। মুজাহিদ বলেন, একবার ইবনুল 'আব্বাস (রা) ইবন জুবায়রকে বললেন, কিছু হাদীছ শোনাও। ইবন জুবায়র অতি বিনয়ের সাথে বললেন, আপনার উপস্থিতিতে আমি হাদীছ শুনাই কেমন করে। ইবনুল 'আব্বাস (রা) বললেন, এটাও আল্লাহর এক বিশেষ করুণা যে, তুমি আমার সামনে হাদীছ বর্ণনা করছো। যদি সঠিক বর্ণনা কর তাহলে ভালো। আর যদি ভুল কর তাহলে আমি ঠিক করে দিব।[২১]

বানূ বিদা'আর মুআয্যিন বর্ণনা করেন। আমি একবার হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাসের (রা) কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি রেশমের গদির উপর ঠেস দিয়ে বসে আছেন এবং সা'ঈদ ইবন জুবায়র তাঁর গায়ের কাছে বসা। ইবনুল 'আব্বাস (রা) তাঁকে বলছেন, তুমি আমার কাছ থেকে বহু হাদীছ মুখস্থ করেছো। আমি দেখবো, তুমি তা কিভাবে বর্ণনা কর।[২২]

ইবন জুবায়রের প্রতি হযরত ইবনুল 'আব্বাসের (রা) এমন মনোযোগী হবার কারণেই তিনি হাদীছের হাফিজদের ইমাম ও নেতায় পরিণত হন। তাঁর বর্ণিত হাদীছের একটি বড় অংশই ইবনুল 'আব্বাসের সূত্রে বর্ণিত। এর দ্বারাই হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর স্থান কোন পর্যায়ে তা অনুমান করা যায়।

ফকীহ্ গোষ্ঠীর মধ্যেও তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এ শাস্ত্রের জ্ঞানও তিনি অর্জন করেন হযরত ইবনুল 'আব্বাস (রা) থেকে। এ শাস্ত্রে তিনি এত পূর্ণতা অর্জন করেন যে, তৎকালীন ফিকাহ্র কেন্দ্র বলে পরিচিত কূফার তাবি'ঈ মুফতীদের এক অন্যতম ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।[২৩] কিছু দিন কূফার কাজীর পদও অলংকৃত করেন। পরে কূফার কাজী আবূ বুরদা ইবন আবী মূসা আশ'আরীর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন।[২৪] কিছু দিন 'আবদুল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাসউদের সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন

---

২১. আত-তাবাকাত-৬/২৫৬; তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬
২২. আত-তাবাকাত-৬/২৫৭
২৩. তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬
২৪. ইবন কুতায়বা : আল-মা'আরিফ-১৯৭; ইবনুল জাওযীর সিফাতুস সাফওয়া-৩/৪৩; আ'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/২৮

করেন।[২৫] 'ইলম ও ইফতার কেন্দ্র ভূমি মক্কায় যখন আসতেন তখন সেখানেও ফাতওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকতেন।[২৬] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাসের (রা) ইবন জুবায়রের ফাতওয়ার উপর এত আস্থা ছিল যে, কূফার কোন লোক যদি তাঁর নিকট কোন ফাতওয়া চাইতে আসতো তাহলে তিনি তাকে বলতেন, তোমাদের ওখানে কি সা'ঈদ ইবন জুবায়র নেই?[২৭] তালাক সংক্রান্ত মাসআলায় তিনি একজন বড় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন :[২৮]

أعلم التابعين بالإطلاق سعيد بن جبير

–'তাবি'ঈদের মধ্যে তালাক বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জানা ব্যক্তি সা'ঈদ ইবন জুবায়র।'

অংকে তিনি বেশ পাকা ছিলেন। এ কারণে ফারায়িজ (দায়ভাগ) শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর সময়ের বড় বড় সাহাবী ফারায়িজ সম্পর্কে তাঁদের নিকট জানতে আসা লোকদেরকে ইবন জুবায়রের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। একবার হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট ফারায়িজ সম্পর্কে জানার জন্য এক ব্যক্তি এলো। তিনি সেই ব্যক্তিকে বলেন, তুমি ইবন জুবায়রের নিকট যাও। সে আমার চেয়ে বেশী হিসাব-নিকাশ জানে। সে তোমাকে তাই বলে দিবে যা নির্ধারিত আছে।[২৯] তিনি যখন মদীনায় যেতেন তখন সেখানকার 'আলিমরা তাঁর নিকট ফারায়িজ শিখতেন। 'আলী ইবন হুসায়ন বর্ণনা করেন, যখন সা'ঈদ ইবন যুবায়র আমাদের এখান দিয়ে যেতেন তখন আমরা তাঁর নিকট ফারায়িজ এবং এমন সব কথা জিজ্ঞেস করতম যা দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে বেশ উপকৃত করতেন।[৩০]

মোটকথা সা'ঈদ ইবন জুবায়রের ব্যক্তিসত্তাটি ছিল বহু জ্ঞান ও শাস্ত্রের সমাহার। যার কিছু কিছু করে সবটুকু ধারণ করতেন সেই যুগের বহু জ্ঞানী ব্যক্তি। কিন্তু ইবন জুবায়র এককভাবে তাঁদের সব জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। খসীফ বর্ণনা করেছেন, তালাকের মাসআলার সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব। হজ্জে ছিলেন 'আতা', হালাল-হারামে তাউস, তাফসীর শাস্ত্রে মুজাহিদ এবং এসব জ্ঞানের সমাহার ছিল সা'ঈদ ইবন জুবায়রের একক ব্যক্তিসত্তা।[৩১]

তিনি জ্ঞানের এমন একটি উৎস ছিলেন যার প্রয়োজন অনুভব করতেন সেই যুগের সব শ্রেণীর 'আলিমগণ। মায়মুন ইবন মাহরান বর্ণনা করেছেন যে, সা'ঈদ ইবন যুবায়র যখন ইনতিকাল করেন তখন ধরাপৃষ্ঠে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যে তাঁর জ্ঞানের প্রয়োজন

---

২৫. ইবন 'আবদি রাব্বিহি : আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/১৬৭, ১৬৯
২৬. ইবন খাল্লিকান-১/২০৪
২৭. আত-তাবাকাত-৬/২৫৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৬; তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬
২৮. শাযারাতুয যাহাব-১/১০৮
২৯. আত-তাবাকাত-৬/২৫৮; তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬
৩০. আত-তাবাকাত-৬/২৫৮
৩১. ইবন খাল্লিকান-১/২০৫

অনুভব করতো না।[৩২]

ইমাম বুখারী তাঁর তারীখে উল্লেখ করেছেন যে, সুফয়ান ছাওরী জ্ঞানের ক্ষেত্রে সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে ইবরাহীম আন-নাখা'ঈর উপর প্রাধান্য দিতেন।[৩৩] কূফাবাসীদের কেউ যখন হযরত ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট কোন মাসআ'লা জানতে আসতো তিনি তাকে বলতেন : কেন, তোমাদের মধ্যে কি সা'ঈদ ইবন জুবায়র নেই?[৩৪]

সা'ঈদ ইবন জুবায়র তাঁর এই বিশাল জ্ঞান ও বিভিন্ন শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য শুধু নিজের মধ্যে পুঞ্জিভূত করে রাখেননি, বরং যতটুকু সম্ভব অন্যদেরকেও তাদ্বারা উপকৃত হবার সুযোগ দিয়েছেন। হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে তাঁর কিছু অদূরদর্শী সঙ্গী-সাথী তাঁকে তিরস্কার করতেন। জবাবে তিনি তাঁদেরকে বলতেন, এ জ্ঞান কবরে নিয়ে যাবার চেয়ে তোমাদের নিকট এবং তোমাদের সঙ্গী-সাথীদের নিকট বর্ণনা করা আমার বেশী পছন্দনীয়।[৩৫]

তাঁর ছাত্র-শাগরিদের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম : 'আবদুল মালিক, 'আবদুল্লাহ, ইয়া'লা ইবন হাকীম, ইয়া'লা ইবন মুসলিম, আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ, আবুয যুবায়র মাক্কী, আদাম ইবন সুলায়মান, আশ'আছ ইবন আবীশ শা'ছা', যার ইবন 'আবদিল্লাহ মুরাহহিবী, সালিম আল-আফতাস, সালামা ইবন কুহায়ল, তালহা ইবন মুসাররিফ, 'আতা' ইবন সাইব প্রমুখ।[৩৬]

জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে তাঁর এ উদারতা ঐসব লোকদের জন্য ছিল যাঁরা সেই জ্ঞানের মর্যাদা দিত। অন্যথায় অযোগ্য ব্যক্তিদের নিকট তিনি তাঁর জ্ঞানকে লুকিয়ে রাখতেন। মুহাম্মাদ ইবন হাবীব বর্ণনা করেছেন। সা'ঈদ ইবন জুবায়র ইসফাহানে অবস্থানকালে মানুষ যখন তাঁর নিকট হাদীছ সম্পর্কে জানতে চাইতো, বলতেন না। কিন্তু যখন কূফা আসলেন তখন তাঁর উদারতার স্রোত জারি হয়ে গেল। লোকেরা প্রশ্ন করলো, আবূ মুহাম্মাদ, কি ব্যাপার! আপনি ইসফাহানে হাদীছ বর্ণনা করতেন না, অথচ কূফায় এসে বর্ণনা করছেন? তিনি জবাব দিলেন, নিজের পণ্য সেখানেই উপস্থাপন কর যেখানে তার মর্যাদার সমঝদার লোক থাকে। মোটকথা, উলুবনে মুক্তো না ছড়ানোর যে কথাটি বলা হয় তিনি তাই বলতেন।

'ইবাদত, যুহ্দ ও তাকওয়ার তিনি ছিলেন বাস্তব নমুনা। এ ব্যাপারে তাবি'ঈদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। খাওফে খোদা বা আল্লাহভীতি তাঁর অন্তরে এত দৃঢ়মূল হয়েছিল যে, সবসময় তাঁর চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত থাকতো। রাতের অন্ধকারে যেটি ছিল

---

৩২. আত-তাবাকাত-৬/২৬৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৭
৩৩. তাহ্যীবুল আসমা' ১/২১৬
৩৪. প্রাগুক্ত
৩৫. আত-তাবাকাত-৬/২৫৮
৩৬. তাহযীবুত তাহযীব-৪/১২; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৬

তাঁর ইবাদাত ও মা'শুকের সাথে একান্ত সংলাপের সময়, অস্থিরভাবে কাঁদতেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছিল এবং দু'চোখ বেয়ে সবসময় পানি ঝরতে থাকতো।[৩৭]

তাঁর নামায ছিল একাগ্রতা এবং খুশু-খুজুর বাস্তব রূপ। কখনো কখনো এক রাক'আতে পুরো কুরআন শেষ করতেন। ভয়ঙ্কর শাস্তি ও 'আযাবের আয়াতগুলো বারবার আওড়াতেন। সা'ঈদ ইবন 'উবায়দ বর্ণনা করেছেন। আমি সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে নামাযে ইমামতির অবস্থায় এ আয়াতটি–[৩৮]

إِذِ الأَغْلاَلُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلَ يَسْحَبُوْنَ فِيْ الْحَمِيْمِ.

বার বার আওড়াতে শুনেছি।[৩৯] কুসাম ইবন আয়্যুব বলেন, আমি তাঁকে এ আয়াত-[৪০]

واتقوا يوما ترجعون فيه إلي الله. বিশ বারের অধিক আওড়াতে শুনেছি।[৪১] সুবহে সাদিক থেকে ফজরের নামায পর্যন্ত যিকরে মশগুল থাকতেন। এ সময় কেবল আল্লাহর যিকর ছাড়া কারো সাথে কোন কথা বলতেন না।[৪২]

রমজান মাসে তাঁর সব ধরনের 'ইবাদাতের মাত্রা বেড়ে যেত। মাগরিব থেকে 'ঈশা পর্যন্ত সময়টুকু সাধারণত রোযাদারদের একটু আরাম ও বিশ্রামের সময় বলে মনে করা হয়, তা তিনি কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন।[৪৩] রমজানে কখনো কখনো এক বৈঠকে পুরো কুরআন খতম করতেন।[৪৪] তিনি তাঁর গোত্রের মসজিদে ই'তিকাফ করতেন।[৪৫]

তিনি কতবার হজ্জ আদায় করেছিলেন তাঁর সঠিক সংখ্যা বলা যায় না। তবে বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা এতটুকু জানা যায় যে, তিনি অধিকাংশ হজ্জ আদায় করতেন এবং তীব্র আবেগ ও উৎসাহের কারণে কূফা থেকেই ইহরাম বেঁধে বের হতেন। মক্কায় অবস্থানকালে বেশী বেশী তাওয়াফ করতেন।[৪৬]

কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ ও আসক্তি। সাধারণত দুই রাতে কুরআন খতম করতেন। কেবল সফর এবং অসুস্থ অবস্থায় এই অভ্যাসের তারতম্য দেখা

---

৩৭. সিফাতুস সাফওয়া-১/১৫০; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৬
৩৮. সূরা আল-মু'মিন-৩৮
৩৯. আত-তাবাকাত-৬/২৬০
৪০. সূরা আল-বাকারা-৩৮
৪১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৬
৪২. সিফাতুস সাফওয়া-১/১৫১
৪৩. আত-তাবাকাত-৬/২৫৯
৪৪. ইবন খাল্লিকান-১/২০৫
৪৫. আত-তাবাকাত-৬/২৬০
৪৬. প্রাগুক্ত-৬/২৬৪

যেত। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি কা'বার অভ্যন্তরে এক রাকআতে পূর্ণ কুরআন পাঠ করেছি।[৪৭]

তিনি নিজেকে অসম্ভব তুচ্ছ ও হেয় মনে করতেন। এ কারণে কোন পাপাচারীকে তার পাপ কাজের ব্যাপারে সতর্ক করতে লজ্জা বোধ করতেন। তিনি বলতেন, আমি কোন ব্যক্তিকে কোন পাপ কাজ করতে দেখি, কিন্তু আমার নিজের দৃষ্টিতে আমি এতই তুচ্ছ যে, অন্যকে সতর্ক করতে আমার দারুণ লজ্জা হয়।[৪৮]

কারো গীবাত করা এবং কারো গীবাত শোনা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। মুসলিম আল-বিত্তীন বলেন, সা'ঈদ তাঁর সামনে কাউকে কারো গীবাত করতে দিতেন না। গীবাতকারীকে বলতেন, যা কিছু তোমার বলার থাকে সেই ব্যক্তির মুখের উপর বলো।[৪৯]

তাঁর নিকট 'ইবাদাতের এক ভিন্ন অর্থ ছিল। শুধু নামায, রোযা ও তাসবীহ-তাহ্লীলকে তিনি 'ইবাদাত বলে জানতেন না। বরং তার একটি বিশেষ ও ব্যাপকতর অর্থ আছে। তিনি মনে করতেন, আনুগত্য হলো বড় ইবাদাত। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে, সেই যাকির। আর যে আল্লাহর অবাধ্যতা করে সে যাকির নয়। তা সে যতই তাসবীহ পাঠ বা কুরআন তিলাওয়াত করুক না কেন। কোন এক ব্যক্তি একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, সবচেয়ে বড় 'ইবাদাতকারী ব্যক্তি কে? বললেন, যে ব্যক্তি পাপ করার পর তাওবা করেছে এবং যখন তার পাপের কথা স্মরণ হয়েছে তখন তার বিপরীতে নিজের 'আমলকে অতি তুচ্ছ মনে করেছে।[৫০]

তিনি 'উলামায়ে সূ' বা অসৎ 'আলিমদেরকে মুসলিম উম্মার জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক বলে মনে করতেন। হিলাল ইবন জানাব একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, মানুষের ধ্বংস ও বিপর্যয় কোথা থেকে হবে? বলেন, তাদের 'আলিমদের থেকেই।[৫১]

সা'ঈদ ইবন জুবায়র জীবনের একটি দীর্ঘ সময় মদীনায় ছিলেন। তারপর সেখান থেকে অন্যত্র চলে যান। কিছু দিন ইরাকের বিভিন্ন শহরে ঘোরাফেরা করেন। পরে কূফায় বসতি স্থাপন করেন।[৫২] কূফায় অবস্থানকালে কিছু দিন তথাকার কাজী 'আবদুল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'উদ এবং কিছু দিন আবূ বুরদা ইবন আবূ মূসা আল-আশ'আরীর সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন।[৫৩]

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ তাঁকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। তাঁর প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনও করতেন। তাঁকে কূফার জামে' মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করেন। কূফার কাজী হিসেবেও নিয়োগ দেন। কিন্তু কাজীকে অবশ্যই আরব বংশোদ্ভূত হতে হবে–

---

৪৭. প্রাগুক্ত-৬/২৫৯
৪৮. সিফাতুস সাফওয়া-১/১৫১
৪৯. আত-তাবাকাত-৬/২৬৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৭
৫০. সিফাতুস সাফওয়া-১/১৫১
৫১. আত-তাবাকাত-৬/২৬২
৫২. ইবন খাল্লিকান-১/২০৫
৫৩. তাহযীবুত তাহযীব-৪/১৩

কূফাবাসীদের এমন দাবীর প্রেক্ষিতে তাঁকে সরিয়ে আবূ বুরদা ইবন আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে তাঁর স্থলে নিয়োগ দেন। তবে হাজ্জাজ আবূ বুরদাকে বলে দেন, তিনি যেন ইবন জুবায়রের সাথে পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ না করেন।[৫৪]

তাঁর সাথে হাজ্জাজের এত সদয় ব্যবহার সত্ত্বেও তিনি বিন্দুমাত্র তাঁর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। এ কারণে ইবনুল আশ'আছ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেন, ইবনু জুবায়র তাঁর সঙ্গী হয়ে যান।

খলীফা আবদুল মালিকের খিলাফতকালে সীসতানের শাসক রাতবীলের আচরণ বিদ্রোহের পর্যায়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে তিনি খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিতেন। এ কারণে হাজ্জাজ তাঁকে শায়েস্তা করার জন্য 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবী বাকরাকে নির্দেশ দেন। 'উবায়দুল্লাহ হিজরী ৯ সনে সীসতানে অভিযান পরিচালনা করে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু পেছনের নিরাপত্তা বিধানের কথা ভুলে যান। এ জন্য রাতবীল তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেন। ফলে মুসলিম বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তাদের জীবন ও অর্থের দারুণ ক্ষয়ক্ষতি হয়। তারা ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এ পরাজয় হাজ্জাজকে ভীষণ আহত করে। তিনি আবার মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রহমান ইবন আশ'আছকে চল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়ে অভিযানের নির্দেশ দেন। আর এ বাহিনীর বেতন-ভাতার অর্থ বণ্টনের দায়িত্ব দেন সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে। ইবনুল আশ'আছ রাতবীল শাসিত অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তথাকার বহু এলাকা পদানত করেন এবং এক বছরের জন্য অগ্রাভিযান বন্ধ করে দিয়ে হাজ্জাজকে অবহিত করেন। হাজ্জাজ রাতবীলের উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিলেন। এ কারণে তিনি ইবনুল আশ'আছকে লিখলেন, এটা কোন আরাম-আয়েশের সময় নয়। আমার এ নির্দেশ পৌঁছার সাথে সাথে অভিযান শুরু করবে। আর তুমি যদি অপারগ হও তাহলে বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব তোমার ভাতিজা ইসহাকের হাতে অর্পণ করবে।

ইবনুল আশ'আছ মুসলিম বাহিনীর স্বার্থেই অগ্রাভিযান বন্ধ করেছিলেন। তাই তিনি হাজ্জাজের এমন কঠোর নির্দেশে ক্ষেপে যান। তিনি রাতবীলের সাথে সন্ধি করে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেন। তাঁর বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ছিল ইরাকের। তারা আগে থেকেই হাজ্জাজের জুলুম-অত্যাচারে ক্ষেপে ছিল। এখন সুযোগ পেয়ে তারাও ইবনুল আশ'আছের সহযোগী হয়ে গেল। ধীরে ধীরে হাজ্জাজের বিরোধিতা খলীফা আবদুল মালিকের বিরোধিতার রূপ নিলো। ইবন জুবায়রও ইবনুল আশ'আছের সহযোগী হলেন। ইবনুল আশ'আছ সীসতান থেকে ইরাকে পৌঁছলেন। তাঁকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে হাজ্জাজ সসৈন্যে বের হলেন। কয়েক মাস সংঘর্ষ চললো। ইবনুল আশ'আছ ইরাকের একটি বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে নেন। হাজ্জাজের সাথে এই

---

৫৪. ইবন খাল্লিকান-১/২০৫

বিরোধিতায় কূফার বহু 'আলিম ও কারী ইবনুল আশ'আছকে সহযোগিতা করেন। ইবন জুবায়র ছিলেন এই দলটির নেতা। তিনি রণক্ষেত্রে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন। বানূ উমাইয়্যা ও হাজ্জাজের জুলুম-নির্যাতন মূলক শাসন, তাদের ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড, আল্লাহর বান্দাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন, নামায আদায়ে বিলম্বকরণ এবং মুসলমানদেরকে হেয় ও অপমান করার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তাদেরকে আহ্বান জানাতেন।[৫৫]

হাজ্জাজবিরোধী এমন তীব্র আবেগ ও উত্তেজনার সময়ও তিনি সত্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুৎ হতেন না। যাবারকান আসাদী নামক একজন দাসের মনিব ছিল হাজ্জাজের পক্ষে। আর দাসটি ছিল হাজ্জাজের বিপক্ষে। দাসটি ইবন জুবায়রের নিকট জানতে চায় যে, এমতাবস্থায় সে যদি ইবনুল আশ'আছের পক্ষে যোগদান করে যুদ্ধে মারা যায় তাহলে আল্লাহর দরবারে এ জন্যে তাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে কিনা। ইবন জুবায়র তাকে জবাব দিলেন : তুমি যুদ্ধ করবে না। তোমার মনিব যদি উপস্থিত থাকতো তাহলে তাকে সংগে নিয়ে হাজ্জাজের পক্ষে যুদ্ধ করতে।[৫৬]

হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রথম দিকে ইবনুল আশ'আছের শক্তি ও ক্ষমতা দৃঢ় ছিল এবং ইরাকের একটি বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করতে সক্ষমও হন। কিন্তু তিনি হাজ্জাজের এই বিরোধিতায় রাষ্ট্রকেও জড়িয়ে ফেলেন। এ কারণে দীর্ঘদিন তাঁর মুকাবিলায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে 'দিয়ারে জামাজিম'[৫৭]-এর যুদ্ধে ইবনুল আশ'আছের শোচনীয় পরাজয় হয় এবং তাঁর শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। তিনি পালিয়ে সীসতানে চলে যান।

ইবনুল আশ'আছের পরাজয়ের পর ইবন জুবায়র মক্কায় চলে যান। মক্কার তৎকালীন ওয়ালী খালিদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল কাসরী তাঁকে গ্রেফতার করে হাজ্জাজের নিকট পাঠিয়ে দেন।

তাঁর গ্রেফতারের ঘটনাটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ইবনুল আশ'আছের বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবার পর সা'ঈদ (রহ) পালিয়ে মক্কায় চলে আসেন এবং সেখানে আত্মীয়-বন্ধুদের আশ্রয়ে অবস্থান করতে থাকেন। এ সময় বানু উমাইয়্যাদের পক্ষ থেকে খালিদ ইবন 'আবদুল্লাহ আল-কাসরী ওয়ালীর দায়িত্ব নিয়ে মক্কায় আসেন। তাঁর জুলুম-অত্যাচার ও দুষ্কর্মের কথা মানুষের জানা ছিল। এ কারণে সা'ঈদের বন্ধুরা তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁদের কেউ কেউ সা'ঈদের কাছে এসে বলেন ঃ খালিদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-কাসরী ওয়ালীর দায়িত্ব নিয়ে মক্কায় এসেছেন। তাঁর হাত থেকে আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। আমাদের অনুরোধ আপনি খুব তাড়াতাড়ি এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান। জবাবে তিনি বলেন : আল্লাহর

---

৫৫. আত-তাবাকাত-৬/২৬৫

৫৬. প্রাগুক্ত-৬/২৬৬

৫৭. কূফা থেকে সাত ফারসাখ দূরে অবস্থিত একটি স্থান। (আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/১৭৬)

কসম! আমি একবার পালিয়ে আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয়েছি। এখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার এ স্থানেই আমি অবস্থান করবো। আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হোক।

মানুষের ধারণা সত্যে পরিণত হলো। খালিদ সা'ঈদ ইবন জুবায়রের অবস্থানের কথা জানতে পেয়ে তাঁকে গ্রেফতার করার জন্য একটি বাহিনী পাঠান। তাঁরা সা'ঈদের বাড়ীতে যায় এবং তাঁকে গ্রেফতার করে সবার সামনে প্রকাশ্যে হাত-পায়ে লোহার বেড়ী পরায়। তারপর তারা তাঁকে হাজ্জাজের নিকট যেতে হবে বলে জানায়। তিনি স্থির ও প্রশান্ত চিত্তে সব কিছু মেনে নেন।

তারপর তিনি উপস্থিত আত্মীয়-বন্ধুদের লক্ষ্য করে বলেন : এই জালিমের হাতেই আমি নিহত হবো। একবার এক রাতে আমি ও আমার দু'বন্ধু 'ইবাদাত ও দু'আর মধ্যে ছিলাম। আমরা অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রতার সাথে এই দু'আ করেছিলাম ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে শাহাদাত দান করুন!' আমার সেই বন্ধুদ্বয়কে আল্লাহ এরই মধ্যে শাহাদাত দান করেছেন। একমাত্র আমি এখনো তার প্রতীক্ষায় আছি।

তাঁর এই কথার মাঝখানে তাঁর ছোট্ট মেয়েটি ছুটে এসে দেখতে পায়, পিতার হাতে-পায়ে বেড়ী বাঁধা এবং সৈন্যরা তাঁকে টানা-হেঁচড়া করছে। অবুঝ মেয়েটি তাঁর আব্বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ-মাউ করে কাঁদতে থাকে। তিনি অত্যন্ত দরদের সাথে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে বলেন ঃ আমার কলিজার টুকরো মেয়ে তোমার মাকে বলবে : ইনশা'আল্লাহ জান্নাতে তাঁর সাথে আমার আবার দেখা হবে। এরপর তিনি সৈনিকদের সাথে চলতে থাকেন।

হাজ্জাজের সামনে বন্দীদের উপস্থিত করা হলো। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন 'আমির আশ-শা'বী, মুতাররিফ ইবন 'আবদিল্লাহ আশ-শিখ্খীর ও সা'ঈদ ইবন জুবায়রের (রহ) মত প্রখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ। শা'বী ও মুতাররিফ ক্ষেত্র বিশেষে চাতুরি ও কৌশল অবলম্বনকে দোষের কিছু মনে করতেন না। কিন্তু সা'ঈদ ইবন জুবায়র (রহ) কোন অবস্থায়ই ছল-চাতুরি পছন্দ করতেন না। বন্দীদের পৌঁছার পূর্বেই হাজ্জাজের নিকট খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের এই মর্মে একটি চিঠি পৌঁছে যে, বন্দীদের মধ্যে যারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে 'কুফর' বলে স্বীকার করবে তাদেরকে মুক্তি দিবে। আর যারা মনে করবে যে, বিদ্রোহে অংশগ্রহণের পরেও তারা মু'মিন আছে তাদেরকে হত্যা করবে। শা'বী ও মুতাররিফকে হাজ্জাজের সামনে হাজির করা হলে তাঁরা দু'জন সরাসরি কুফরী কাজ করেছেন বলে স্বীকার না করলেও বাকচাতুরির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে হাজ্জাজের দাবীকে অনেকটা মেনে নেন। ফলে হাজ্জাজ তাদের দু'জনকে মুক্তি দেন। সবশেষে সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে হাজির করা হয়।[৫৮]

হাজ্জাজ সা'ঈদ ইবন জুবায়রের নিকট পর্যুদস্ত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁকে দেখা মাত্র তাঁর মাথায় রক্ত উঠে যায়। তখন দু'জনের মধ্যে নিম্নোক্ত ধরনের সংলাপ হয় :

---

৫৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/১৭৬, ৪৬৪; ৫/৫৪

হাজ্জাজ : আপনার নাম?

ইবন জুবায়র : সা'ঈদ ইবন জুবায়র। (উল্লেখ্য যে, সা'ঈদ অর্থ সৌভাগ্যবান, আর জুবায়র অর্থ ভাঙ্গা হাড় জোড়াদানকারী)

হাজ্জাজ : না, আপনার নাম বরং এর বিপরীত 'শাকী ইবন কুসায়র' হওয়া উচিত। (শাকী অর্থ হতভাগা, আর কুসায়র অর্থ হাড় ভঙ্গকারী)

ইবন জুবায়র : আমার মা আমার নামের ব্যাপারে আপনার চেয়েও বেশী জানতেন।

হাজ্জাজ : আপনার মা ছিলেন একজন হতভাগীনী এবং আপনিও একজন হতভাগা।

ইবন জুবায়র : অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল অন্য এক সত্তারই আছে।

হাজ্জাজ : আমি আপনার পার্থিব জীবনকে দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনে পরিণত করে দেব।

ইবন জুবায়র : আমার যদি এমন বিশ্বাস হতো যে, এটা আপনার ক্ষমতার আওতায় আছে তাহলে আমি আপনাকে আমার মা'বুদ (উপাস্য) বানিয়ে নিতাম।

হাজ্জাজ : মুহাম্মাদ (সা)-এর ব্যাপারে আপনার কিরূপ ধারণা?

ইবন জুবায়র : তিনি সঠিক পথের দিশারী নেতা এবং রহমতের নবী।

হাজ্জাজ : 'আলী ও 'উছমানের (রা) ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তাঁরা জান্নাতে আছেন না জাহান্নামে?

ইবন জুবায়র : সেখানে যদি আমার যাওয়া হতো এবং তাঁদেরকে স্বচক্ষে দেখতে পেতাম তাহলে তাঁদের সম্পর্কে বলতে পারতাম (অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর আমি কেমন করে দেব?)।

হাজ্জাজ : খলীফাদের ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

ইবন জুবায়র : আমি তাঁদের মুখপাত্র নই।

হাজ্জাজ : তাঁদের মধ্যে কাকে আপনি সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন?

ইবন জুবায়র : যিনি আমার স্রষ্টার নিকট বেশী পছন্দনীয়।

হাজ্জাজ : স্রষ্টার নিকট কে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয়?

ইবন জুবায়র : এ জ্ঞান তো কেবল সেই সত্তারই আছে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন।

হাজ্জাজ : 'আবদুল মালিকের ব্যাপারে আপনার রায় কি?

ইবন জুবায়র : আপনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে কি জিজ্ঞেস করছেন যার পাপসমূহের একটি পাপ হলো আপনার বিদ্যমানতা।

হাজ্জাজ : আপনি কি ইবনুল আশ'আছের সাথে বিদ্রোহে শরিক হওয়াকে কুফরী কাজ বলে বিশ্বাস করেন?

ইবন জুবায়র : আমি যেদিন থেকে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, সেদিন থেকে আর কখনো কুফরী কাজ করিনি।

হাজ্জাজ : আপনি হাসেন না কেন?

ইবন জুবায়র : সে কেমন করে হাসতে পারে যাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর সেই মাটিকে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

হাজ্জাজ : তাহলে আমরা বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডের সময় হাসি কেন?

ইবন জুবায়র : সবার অন্তর এক রকম হয় না।

হাজ্জাজ : আপনি কখনো বিনোদনের সাজ-সরঞ্জাম দেখেছেন?

এ প্রশ্নের পর হাজ্জাজ সেতার ও বাঁশি বাজানোর নির্দেশ দেন। সেই সুর শুনে ইবন জুবায়র কেঁদে ফেলেন। হাজ্জাজ বললেন : এখানে কান্নার এমন কি হলো। সুর তো চিত্তবিনোদনের জিনিস। ইবন জুবায়র বললেন : না, তা হবে কেন। এ তো বিষাদের করুণ অভিব্যক্তি। বাঁশির সুর আমাকে সেই মহা প্রলয়ের দিনটির কথা স্মরণ করে দিয়েছে যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। আর একথাও মনে করে দিয়েছে যে, এ বাঁশিটি কোন গাছের একটি টুকরো, যা হয়তো অন্যায়ভাবে কাটা হয়েছে। আর এর তারগুলিও কোন বকরী-পাঁঠার শিরা-উপশিরা, যেগুলিকে কিয়ামতের দিন আবার জীবিত করা হবে। একথা শুনে হাজ্জাজ বললেন : সা'ঈদ, তোমার অবস্থার জন্য আফসোস হয়। সা'ঈদ বললেন : এমন ব্যক্তি আফসোসের যোগ্য কেমন করে হতে পারেন যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে ঢুকানো হয়েছে? এরপর আবার নিম্নোক্ত সংলাপ শুরু হয় :

হাজ্জাজ : আমি কি আপনাকে কূফার ইমাম বানাইনি?

ইবন জুবায়র : হাঁ, বানিয়েছিলেন।

হাজ্জাজ : আমি কি আপনাকে কূফার কাজীর পদে নিয়োগ দিইনি? তারপর যখন কূফাবাসীরা এ নিয়োগের বিরোধিতা করে দাবী করলো যে, কূফার কাজীকে একজন আরব বংশোদ্ভূত ব্যক্তি হতে হবে, তখন আমি আবূ বুরদাকে কাজী নিয়োগ করি। তবে তাঁকে একথাও বলে দিই, তিনি যেন আপনার সাথে পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ না করেন।

ইবন জুবায়র : হাঁ, আপনার কথা ঠিক।

হাজ্জাজ : আমি কি আপনাকে আমার বিশেষ পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত করিনি? অথচ অন্যরা সবাই ছিল আরবের বিখ্যাত গোত্রপতি।

ইবন জুবায়র : হাঁ, একথাও ঠিক।

হাজ্জাজ : আমি কি আপনাকে এক লাখ নগদ অর্থ দরিদ্র লোকদের মধ্যে বণ্টনের জন্য দিইনি এবং তার কোন হিসাবও নিইনি?

ইবন জুবায়র : হাঁ, দিয়েছেন।

হাজ্জাজ : আমার এত অনুগ্রহের পরেও আমার বিরুদ্ধাচরণের জন্য আপনাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করলো?

ইবন জুবায়র : আমার গলায় ইবনুল আশ'আছের বাই'আতের বেড়ী ছিল।

হাজ্জাজ : আল্লাহর একজন দুশমনের বাই'আতের প্রতি এত আনুগত্য, আর আমীরুল মু'মিনীনের বাই'আত ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কথা ভুলে গেলেন? আল্লাহর কসম!

আমি আপনাকে হত্যা করে জাহান্নামে না পাঠিয়ে এ স্থান ত্যাগ করবো না। বলুন, আপনি কিভাবে মরতে ইচ্ছা করেন। জাল্লাদ আপনার সামনে উপস্থিত।

ইবন জুবায়র : আল্লাহর কসম! আপনি দুনিয়াতে আমাকে যেভাবে হত্যা করবেন, আল্লাহ আখিরাতে আপনাকে সেভাবে হত্যা করবেন। আপনিই বেছে নিন, আমাকে কিভাবে হত্যা করবেন।

হাজ্জাজ : আপনি কি চান, আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিই?

ইবন জুবায়র : যদি আপনি ক্ষমা করেন, তবে তা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকেই (সেটা আপনার কোন করুণা হবে না)।

হাজ্জাজ : আমি আপনাকে হত্যা করবো।

ইবন জুবায়র : আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। যদি আমার সে সময় এসে থাকে তা হলে তা তো একটি স্থিরকৃত বিষয়। তা থেকে পালানোর কোন উপায় নেই। আর যদি বেঁচে যাই তা হলে তাও আল্লাহর হাতে।

উপরোক্ত সংলাপের পর হাজ্জাজ জাল্লাদকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন কাঁদতে আরম্ভ করলেন। ইবন জুবায়র তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কাঁদছো কেন? লোকটি বললো : আপনার হত্যার নির্দেশ শুনে। বললেন: এজন্য কাঁদার কোন প্রয়োজন নেই। এ ঘটনা তো সেই অনাদি কাল থেকে আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তারপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :[৫৯]

مَاأَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِيْ كِتَابٍ قَبْلَ أَن نَبْرَأَهَا.

– এমন কোন বিপদ নেই যা পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের নিজেদের উপর আপতিত হয়, আর আমরা তা সৃষ্টি করার পূর্বে একটি কিতাবে (অর্থাৎ ভাগ্যলিপিতে) লিখে রাখিনি।

বধ্যভূমিতে যাবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি ছেলেকে দেখার জন্য ডাকলেন। সে এসে কাঁদতে লাগলো। তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি কাঁদছো কেন? সাতান্ন বছরের বেশী তোমার পিতার জীবনই ছিল না। তাহলে কাঁদার কি কারণ থাকতে পারে।

অতঃপর তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে হাসতে হাসতে বধ্যভূমির দিকে চলতে থাকেন। হাজ্জাজকে বলা হলো যে, এ সময়ও ইবন জুবায়রের ঠোঁটে হাসি শোভা পাচ্ছে। হাজ্জাজ তাঁকে আবার ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি হাসছিলেন কেন? ইবন জুবায়র বললেন : আল্লাহর মুকাবিলায় আপনার দুঃসাহস এবং আপনার মুকাবিলায় তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখে।

তাঁর এ জবাব শুনে হাজ্জাজ নিজের সামনেই হত্যার চামড়া বিছানোর নির্দেশ দিলেন এবং হত্যারও ইঙ্গিত করলেন। ইবন জুবায়র বললেন : দু'রাক'আত নামায আদায়ের

---

৫৯. সূরা আল-হাদীদ-২২

Contents

সুযোগ দিন। হাজ্জাজ বললেন : যদি পূর্ব দিকে মুখ করে পড়তে পারেন তাহলে দেওয়া যেতে পারে। বললেন : কোন পরোয়া নেই। তারপর পাঠ করেন এ আয়াত :

اَيْنَمَا تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ.

– যে দিকেই তোমরা তোমাদের মুখ ফেরাও সে দিকেই আল্লাহর মুখমণ্ডল বিদ্যমান।

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

– আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখ ফিরালাম সেই সত্তার দিকে যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিক (অংশীবাদী)-দের অন্তর্ভুক্ত নই।[৬০]

তারপর হাজ্জাজ তাঁকে মাথা নিচু করার নির্দেশ দিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় ও আনুগত্যের সাথে মাথা নিচু করে পাঠ করলেন :

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰي.

– আমি এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আবার সেই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব। তারপর সেই মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করবো।

তারপর কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে দু'আ করেন : 'হে আল্লাহ! আমার হত্যার পর তাঁকে আর কাউকে হত্যার ক্ষমতা ও সুযোগ দেবেন না।'

জাল্লাদ কোষমুক্ত তরবারি হাতে প্রস্তুত ছিল। হাজ্জাজের নির্দেশের পর হঠাৎ তরবারি ঝলকে উঠলো এবং একজন সত্যের সৈনিকের মাথা মাটিতে তড়পাতে লাগলো। মাটিতে পড়ার পর তাঁর মুখের সর্বশেষ উচ্চারণ ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। এ হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয় হিজরী ৯৪ সনের শা'বান মাসে। তখন ইবন জুবায়রের বয়স হয়েছিল ৫৭, মতান্তরে ৪৯ বছর। অনেকে বলেছেন, ইবরাহীম আত-তায়মী, হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ, সা'ঈদ ইবন জুবায়র একই বছর মারা যান। আর সেটা ছিল হিজরী ৯৫ সন। ওয়াসিতে তাকে দাফন করা হয়। হাজ্জাজের দারোয়ান বলেছেন, আমি সা'ঈদ ইবন জুবায়রের মাথা কাটার পর মাটিতে পড়ে তড়পাতে তড়পাতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করতে দেখেছি।[৬১] ইমাম নাবাবী বলেছেন, হাজ্জাজ ঠাণ্ডা মাথায় এবং অন্যায়ভাবে সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে হত্যা করেন।[৬২]

সা'ঈদ ইবন জুবায়রের (রহ) ব্যক্তিত্ব এত বিশাল ছিল যে, তৎকালীন সকল বড় তাবি'ঈ

---

৬০. সূরা আল-আন'আম-৯

৬১. সা'ঈদ ইবন যুবায়রের সাথে হাজ্জাজের আচরণ ও তাঁর হত্যার ঘটনাটি রিজাল শাস্ত্রের প্রায় সকল গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর তা সাজালে আমাদের এ বর্ণনার রূপ লাভ করে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : ইবন খাল্লিকান, খ.২, পৃ. ৩৭২-৩৭৪; শাযারাতুয যাহাব-খ.১ পৃ. ১০৯-১১০; আত-তাবাকাত, খ. ৬, পৃ. ২৬৩-২৬৬; আল-'ইকদ আল-ফারীদ, খ.৫, পৃ. ৫৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, খ.১, পৃ. ৭৬-৭৭. তাহ্যীবুল কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল, খ.২, পৃ-২৩২; আয-যাহাবী; তারীখ আল-ইসলাম, খ. ৩. পৃ. ৩২৮।

৬২. তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৬

তাঁর শাহাদাতের ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। হযরত হাসান বাসরী (রহ) বলেন: 'হে আল্লাহ! আপনি ছাকীফ গোত্রের এ পাপাচারী (হাজ্জাজ) থেকে বদলা নিন। আল্লাহর কসম! ধরা পৃষ্ঠের সকল অধিবাসীও যদি তাঁর হত্যায় অংশগ্রহণ করতো তাহলেও আল্লাহ তাদের সকলকে নিম্নমুখী করে জাহান্নামে ফেলতেন।[৬৩]

সা'ঈদ ইবন জুবায়রের (রহ) গায়ের রং ছিল কালো। মাথার চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল। খিজাব লাগানো পছন্দ ছিল না। এক ব্যক্তি কালো খিজাব লাগানোর ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাঁর বান্দার চেহারা নূর দ্বারা আলোকিত করেন, আর বান্দা তা কালো খিজাব দ্বারা অন্ধকার করে দেয়।[৬৪]

সা'ঈদ ইবন জুবায়রের (রহ) বদ-দু'আ ব্যর্থ হয়নি। অন্যায়ভাবে ঝরানো তাঁর রক্ত তৎপর হয়ে ওঠে। তাঁর নিহত হবার পরেই হাজ্জাজ মস্তিষ্কের কঠিন রোগে আক্রান্ত হন এবং শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে অচেতন হয়ে পড়তেন। তখন দেখতেন যে, ইবন জুবায়র (রহ) তাঁর কাপড় ধরে তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, 'ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই আমাকে কোন অপরাধে হত্যা করেছিস?' এ দুঃস্বপ্ন দেখে ভীত-চকিত অবস্থায় উঠে বসে পড়তেন। তারপর আপন মনে বলতে থাকতেন, সা'ঈদের সাথে আমার সম্পর্ক কি? এই মাথা খারাপ অবস্থায় হাজ্জাজ হিজরী ৯৫ সনে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে স্বৈরাচারী হাজ্জাজের জীবনের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে। ইবন জুবায়রের (রহ) হত্যার পর কোন মানুষের প্রাণনাশের সুযোগ আল্লাহ তাকে আর দেননি।[৬৫]

হাজ্জাজের মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে। সে হাজ্জাজকে জিজ্ঞেস করে : আল্লাহ তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করছেন? হাজ্জাজ বলেন : আমার নির্দেশে নিহত প্রত্যেক ব্যক্তির বদলায় আমাকে একবার করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু সা'ঈদ ইবন জুবায়রের (রহ) বদলায় হয়েছে সত্তুরবার।[৬৬]

তিনি আরো বলেন, আমি এখন অপেক্ষায় আছি, একজন একেশ্বরবাদী যা কিছুর অপেক্ষায় থাকে, তার।[৬৭]

'আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ ও 'আবদুল মালিক– এ তিন ছেলে তিনি রেখে যান।[৬৮]

---

৬৩. ইবন খাল্লিকান-২/৩৭৪
৬৪. আত-তাবাকাত-৬/২৬৭
৬৫. ইবন খাল্লিকান-২/৩৭৩
৬৬. প্রাগুক্ত-২/৩৭৪
৬৭. আল-'ইক্দ অল-ফারীদ-৫/৫৬
৬৮. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২১৭

সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (রা)

সালিম একজন বিখ্যাত তাবি'ঈ। ডাক নাম আবূ 'উমার, 'উমায়র বা আবূ 'আবদিল্লাহ।[১] তাঁর পিতা হযরত ফারূকে আ'জাম 'উমার (রা)-এর সুযোগ্য সন্তান হযরত 'আবদুল্লাহ (রা)। পিতৃকুলের মত তাঁর মাতৃকুলও অত্যন্ত অভিজাত। খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে শাহেনশাহে ইরান ইয়াযদিগিরদের যে কন্যারা বন্দী হয়ে মদীনা এসেছিলেন তাঁদেরই একজনকে হযরত 'আবদুল্লাহকে দান করা হয়েছিল। তাঁরই গর্ভে সালিমের জন্ম হয়। এভাবে তাঁর ধমনীতে ইরানের শাহী খান্দানের রক্তও প্রবাহিত ছিল।[২] হযরত উছমানের (রা) খিলাফতকালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা একজন উম্মু ওলাদ।[৩]

উল্লেখ্য যে, শেষ পারস্য সম্রাট ইয়াযদিগিরদ-এর তিন কন্যা যুদ্ধবন্দী হিসেবে মদীনায় আসেন। সমতা ও সাম্যের প্রতীক খলীফা 'উমার (রা) নিয়ম অনুযায়ী তাঁদেরকে দাসী হিসেবে বিক্রীর উদ্যোগ নেন। দুঃখ ও হতাশায় তখন কন্যাদের দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। আর তা দেখে হযরত 'আলীর (রা) অন্তর বিগলিত হয়। তিনি শাহেনশাহে ইরানের কন্যাদেরকে যথাযথ মর্যাদা দানের জন্য তৎপর হন। তিনি খলীফা 'উমারকে (রা) বলেন, সাধারণ যুদ্ধবন্দী মহিলাদের মত এই তিন সম্রাট কন্যার সাথে একই আচরণ করা ঠিক হবে না। অতঃপর আলী (রা) ও অন্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শের পর কুরায়শ বংশের সম্মানীয় তিন যুবকের হাতে তিনজনকে তুলে দেওয়া হয়। সেই তিন যুবক হলেন : হুসায়ন ইবন 'আলী (রা), মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা) ও আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা)। পরবর্তীতে এই তিন বোন তিনজন বিখ্যাত সন্তানের গর্বিত মা হন। প্রথমজন হলেন 'আলী যয়নুল 'আবিদীনের গর্বিত মা। দ্বিতীয়জন জন্ম দেন কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরকে (রা)। এই কাসিম ছিলেন মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহ্র অন্যতম। আর তৃতীয়জন হলেন সালিম ইবন 'আবদিল্লাহর (রা) সম্মানিতা জননী।

সালিমের পিতা হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) ঐসব ব্যক্তিদের একজন যাঁরা ছিলেন 'ইলম ও 'আমল এবং যুহ্দ ও তাকওয়ার বাস্তব প্রতীক। তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সালিমও পিতার যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে গড়ে ওঠেন। সীরাত বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত যে, 'উমারের (রা) সাথে সাদৃশ্য ছিল 'আবদুল্লাহর। আর 'আবদুল্লাহর সন্তানদের মধ্যে তাঁর সাথে বেশী সাদৃশ্য ছিল সালিমের।[৪] এভাবে সালিম ছিলেন যেন তাঁর দাদা 'উমার ফারূকের (রা) বাস্তব প্রতিকৃতি।

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৮; তাবাকাত-৫/১৯৫

২. তাহযীবুত তাহযীব-৩/৪৩৮

৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৫৮। কোন দাসী সন্তানের মা হলে ইসলামের পরিভাষায় 'উম্মু ওলাদ' বলা হয়। এমন দাসীকে ক্রয়-বিক্রয়, দান বা এ জাতীয় কোনভাবে হস্তান্তর করা বৈধ নয়।

৪. তাবাকাত-৫/১৯৬; তারীখ ইবন আসাকির-৭/১৩

সালিম মদীনার ঐসব তাবি'ঈর অন্তর্ভুক্ত যাঁরা ছিলেন 'ইলম ও 'আমল উভয় ক্ষেত্রের অধিপতি। ইমাম আয-যাহাবী লিখেছেন, তিনি ছিলেন ফকীহ্, হুজ্জাত এবং ঐ সকল বিশেষ 'আলেমের অন্তর্গত যাঁদের সত্তায় 'ইলম ও 'আমলের সমাবেশ ঘটেছিল।[৫] তিনি তাঁকে একজন ইমাম, যাহিদ (দুনিয়া বিরাগী), হাফিজ, মদীনার মুফতী, কুরায়শ বংশীয় ইত্যাদি বলেও উল্লেখ করেছেন।[৬] ইমাম নাবাবী লিখেছেন, সালিমের ইমামত, মহত্ত্ব, বৈরাগ্য, আল্লাহভীতি ও অত্যুচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে সবাই একমত।[৭] ইবন খাল্লিকান তাঁকে মদীনার অন্যতম ফকীহ্ এবং তাবি'ঈ, 'আলিম ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের নেতা বলেছেন।[৮]

তাফসীর, হাদীছ, ফিকাহ্ তথা সব শাস্ত্রে তাঁর সমান দক্ষতা ও পারদর্শিতা ছিল, কিন্তু অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বনের কারণে কুরআন পাকের তাফসীর বর্ণনা করতেন না।[৯] আর এজন্য মুফাস্সির হিসেবে তিনি কোন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেননি।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) ছিলেন হাদীছের এক শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। সালিম বেশীর ভাগ হাদীছ তাঁর নিকট থেকেই শুনেছেন। ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ বলেন : আমি সালিমকে প্রশ্ন করলাম : আপনি কি আপনার পিতা 'আবদুল্লাহর নিকট থেকে কোন হাদীছ শুনেছেন? বললেন : একবার নয়। এক শো বারেরও বেশী শুনেছি।[১০] তাছাড়া আরো অনেক উঁচুস্তরের সাহাবী, যেমন : আবূ হুরাইরা (রা), আবূ আইউব আল-আনসারী (রা), উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা সিদ্দীকা (রা), যায়িদ ইবন খাত্তাব, আবূ লুবাবা, রাফি' ইবন খাদীজ সাফীনা, আবূ রাফি' (রা) প্রমুখ থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন।[১১] এসব মহান ব্যক্তিদের ফয়েজ ও বরকতে তাঁর জ্ঞানের পরিধি সীমাহীন বিস্তার লাভ করে। ইবন সা'দ লিখেছেন, সালিম ছিলেন নির্ভরযোগ্য, বহু হাদীছের ধারক এবং অত্যুচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি।[১২]

সালিমের নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন : 'আমর ইবন দীনার, ইমাম যুহ্রী, মূসা ইবন 'উকবা, হুমায়দ আত-তাবীল, সালিহ ইবন কাইসান, 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন হাফ্স, আবূ ওয়াকিদ আল লায়ছী, 'আসিম ইবন 'আবদিল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবন আবী বাক্র, হানজালা ইবন আবী সুফয়ান, আবূ কিলাবা জুরমী ও আরো অনেকে। এসব শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ মুহাদ্দিছ ছিলেন তাঁর ছাত্র।[১৩]

---

৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৮
৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৫৮
৭. তাহযীবুল আসমা'-১/৩৭
৮. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৪৯
৯. তাবাকাত-৫/২০০
১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৫৮, তারীখ ইবন 'আসাকির-৭/১৪
১১. তাহযীবুত তাহযীব-৩/৪৩৭
১২. তাবাকাত-৫/১৯৮
১৩. তাহযীবুত তাহযীব-৩/৪৩৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৫৯

হযরত সালিমের জ্ঞান চর্চার বিশেষ ক্ষেত্র ছিল ফিকাহ্ শাস্ত্র। এ শাস্ত্রে তিনি ইমামের মর্যাদা অর্জন করেন। কোন কোন ইমাম, যাঁদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন মুবারাকও আছেন, তাঁকে মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহ্র মধ্যে গণ্য করতেন।[১৪] সাতজন ফকীহ্র নির্ধারণে মতপার্থক্য আছে। বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ চিন্তা ও দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন জনের নাম বলেছেন। যাই হোক না কেন, এই তালিকার মধ্যে সালিমের নামটিও উচ্চারিত হয়েছে। ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর যোগ্যতা ও উৎকর্ষতার সবচেয়ে বড় সনদ এই যে, মদীনার ফাতওয়া দানকারী দলটির তিনিও একজন বিশেষ সদস্য ছিলেন।[১৫] তাঁদের মতামতের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে কোন কাজীই সিদ্ধান্ত দান করতেন না।[১৬]

হযরত সালিমের মধ্যে যে পরিমাণ জ্ঞান ছিল সেই পরিমাণ 'আমলও ছিল। ইমাম মালিক (রহ) বলতেন, সালিমের যুগে যুহ্দ ও তাকওয়ায় এবং মহত্ত্ব ও মর্যাদায় তাঁর চেয়ে বেশী পূর্বসূরীদের সাথে সাদৃশ্যের অধিকারী কেউ ছিলেন না।[১৭] ইমাম নাবাবী, ইমাম আয-যাহাবীসহ অন্যান্য সীরাত বিশেষজ্ঞ তাঁর যুহ্দ ও তাকওয়া এবং ইল্ম ও 'আমলের ব্যাপারে একই রকম বর্ণনা দিয়েছেন।

'আকীদা-বিশ্বাসে তিনি সত্যনিষ্ঠ পূর্বসূরীদের সাদামাটা ও নির্ভেজাল বিশ্বাসের অনুসারী ছিলেন। সুতরাং পরবর্তীকালে 'আকীদার ব্যাপারে যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয় তিনি তা ভীষণ ঘৃণা করতেন। কাদরিয়া গোষ্ঠী, যারা তাকদীরের উপর ভিত্তি করে ভালো ও মন্দের বিশ্বাস করতো তাদের প্রতি তিনি অভিশাপ দিতেন।[১৮]

তিনি প্রতিটি ব্যাপার ও বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যে কথার মধ্যে মিথ্যার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকতো তা পছন্দ করতেন না। তাঁর সময়ে 'সাতগজী' বলে একটি কাপড় প্রসিদ্ধ ছিল। আসলে তা সাত গজের চেয়ে কিছু কম হতো। কিন্তু 'সাতগজী' বলেই তা প্রচলিত ছিল। মারওয়ান ইবন যুবায়র বর্ণনা করেছেন : একবার সালিম কাপড় কিনতে আসলেন। আমি তাঁর সামনে 'সাতগজী' মেলে দিলাম। সেটি সাত গজের চেয়ে একটু কম ছিল। তিনি বললেন, তুমি তো সাত গজ বলেছিলে। আমি বললাম, আমরা এটাকে 'সাতগজী' বলে থাকি। তিনি বললেন, মিথ্যা এভাবেই হয়ে থাকে।[১৯]

একজন মুসলমানের রক্ত হযরত সালিমের নিকট এত সম্মানের ছিল যে, কোন অপরাধী মুসলমানের উপরও তিনি হাত উঠাতেন না। একবার জালিম হাজ্জাজ তাঁকে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দেয়, যে হযরত উছমানের হত্যার অন্যতম সাহায্যকারী ছিল।

---

১৪. তাহযীবুল আসমা'-১/২০৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬১
১৫. আ'লাম আল মুওয়াক্কি'ঈন-১/২৫
১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬১
১৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৯
১৮. তাবাকাত-৫/২০০
১৯. প্রাগুক্ত-৫/১৯৯

তিনি তলোয়ার হাতে করে অপরাধীর দিকে এগিয়ে যান। নিকটে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি মুসলমান? সে উত্তর দেয়, হাঁ, আমি মুসলমান। কিন্তু আপনাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা পালন করুন। তিনি আবার তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি কি আজ সকালে ফজরের নামায আদায় করেছো? সে উত্তর দিল, হাঁ, আদায় করেছি। এ কথা শুনে সালিম ফিরে যান এবং হাজ্জাজের সামনে তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, এ ব্যক্তি মুসলমান। আজ সকাল পর্যন্ত সে নামায আদায় করেছে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে সকালের নামায আদায় করেছে সে আল্লাহর হিফাজত ও নিরাপত্তায় এসে গেছে। হাজ্জাজ বললো, আমরা তো তার সকালের নামাযের জন্য হত্যা করছিনে, বরং এ জন্য হত্যা করছি যে, সে 'উছমানের (রা) হত্যাকারীদের একজন সাহায্যকারী ছিল। সালিম বললেন, এ জন্য আরো মানুষ বর্তমান আছে যারা 'উছমানের রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার আমাদের চেয়েও বেশী হকদার। সালিমের পিতা হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) এ ঘটনা শুনে মন্তব্য করেন, সালিম বুদ্ধিমানের কাজ করেছে।[২০]

তিনি এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট নিজের প্রয়োজনের কথা বলা পছন্দ করতেন না। খলীফা ও আমীর-উমারাদের ধন-দৌলত এবং তাঁদের দান-খয়রাতের ব্যাপারে এত উদাসীন ও বেপরোয়া ছিলেন যে, তাদের অনেকের আবেদন ও অনুরোধের পরেও কখনো কোন ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। খলীফা সুলায়মান মতান্তরে হিশাম ইবন 'আবদুল মালিক ছিলেন তাঁর একজন গুণমুগ্ধ ব্যক্তি। তিনি সালিমকে অতিরিক্ত সম্মান করতেন। তিনি মাঝে মধ্যে অতি সাধারণ মোটা ছেঁড়া কাপড় পরে নির্দ্বিধায় তাঁর দরবারে ঢুকে যেতেন। আর এ অবস্থায় খলীফা তাঁকে সংগে করে এক সাথে খলীফার আসনে গিয়ে বসতেন।[২১] একবার তিনি হজ্জে যান। কা'বার আঙ্গিনায় খলীফা হিশাম/সুলায়মানের সাথে দেখা হয়। খলীফা তাঁর নিকট আবেদন করেন, আপনার যা যা প্রয়োজন আমাকে বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহর ঘরের মধ্যে অন্য কারো কাছে কিছুই চাইবো না।[২২]

কা'বার আঙ্গিনা থেকে বের হওয়ার পর খলীফা তাঁকে বললেন, এবার আপনার প্রয়োজনের কথা একটু বলুন। বললেন : দুনিয়ার প্রয়োজন না আখিরাতের? খলীফা বললেন : দুনিয়ার প্রয়োজনের কথাই বলুন। বললেন : এই দুনিয়ার যিনি মালিক তাঁর কাছেই তো আমি কিছু চাইনি। আর যে এর কোন কিছুর মালিক নয় তার কাছে কি চাইবো?[২৩]

একবার 'আরাফার দিনে তিনি এক ব্যক্তিকে মানুষের নিকট সাহায্য চাইতে দেখে বললেন : ওরে নির্বোধ! আজকের দিনে তুই অল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে চাইছিস?[২৪]

---

২০. তাবাকাত-৫/১৯৫; তারীখ ইবন 'আসাকির-৭/১৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬৬
২১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৯
২২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৫০; আল-বায়ান ওয়াত তাবঈন-৩/১২৭
২৩. সিফাতুস সাফওয়া-২/৫১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬৬
২৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/২৮০

আশ'আব বলেন : সালিম আমাকে বলেছেন, তুমি এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কিছু চাইবে না।[২৫]

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) যখন মদীনার ওয়ালী ছিলেন তখন হযরত সালিম (রহ) তাঁর দরবারে যাওয়া-আসা করতেন। সেখানে একবার তাঁর সাথে আরব কবি দুকায়ম ইবন আর-রাজা'র পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) খলীফা হওয়ার পর সালিম ও মুহাম্মাদ ইবন কা'বকে দরবারে ডেকে পাঠান। তাঁরা উপস্থিত হলে খলীফা বলেন : আপনারা আমাকে কিছু উপদেশ দিন। সালিম বললেন : আপনি মানুষকে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা জ্ঞান করবেন। তারপর পিতার সেবা ও ভ্রাতার নিরাপত্তা বিধান করবেন। আর পুত্রের প্রতি স্নেহপরায়ণ হবেন।[২৬]

হযরত সালিমের ওয়াজ-নসীহত ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক ও প্রভাব সৃষ্টিকারী। একবার 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীয (রহ) তাঁকে লিখলেন, আপনি আমাকে 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) কিছু সিদ্ধান্ত লিখে পাঠান। জবাবে তিনি লিখে পাঠান, 'উমার, সেইসব বাদশাহকে স্মরণ করুন যাদের সেইসব চোখ অন্ধকার হয়ে গেছে যা কখনো দেখার স্বাদ থেকে তৃপ্ত হতো না। সেইসব পেট ফেটে গেছে যা প্রাসাদের অঢেল সম্পদ দ্বারা কখনো পরিতৃপ্ত হতো না। আজ তারা যমীনের টিলার নীচে মৃত পড়ে আছে। যদি তারা আমাদের জনপদের নিকটবর্তী হতো তাহলে তাদের সেই দেহের দুর্গন্ধ আমাদের বিরক্তি ও কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতো।[২৭]

হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর মহান পিতা হযরত 'উমার ফারূকের (রা) মত খুব কমই স্নেহ-মমতার আতিশয্য দেখাতেন। কিন্তু পুত্র সালিমের চারিত্রিক গুণাবলী ও উৎকর্ষতার কারণে তাঁর প্রতি আবেগের তীব্রতা ছিল একটু বাড়াবাড়ি রকমের। সালিমের বয়স যখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যায় তখনো 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁকে স্নেহ-মমতার প্রাবল্যে চুমা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা কি অবাক হও না এই দেখে যে, একজন বৃদ্ধ তাঁর প্রৌঢ় ছেলেকে চুমা দেয়? যাঁরা তাঁর এমন পক্ষপাতমূলক স্নেহ-মমতার সমালোচনা করতো তাদের জবাবে তিনি নিম্নের চরণটি আবৃত্তি করতেন।[২৮]

يَلُوْمُوْنَنِي فِيْ سَالِمٍ وَأَلُوْمُهُمْ # وَجِلْدَةُ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالأَنْفِ سَالِمٌ

–মানুষ আমাকে সালিমের ব্যাপারে তিরস্কার করে এবং আমিও তাদের তিরস্কার করি। সালিম চোখ ও নাকের মধ্যবর্তী ত্বকের মত আমার প্রিয়।

সালিমের জীবন যাপন প্রণালী ছিল অতি সহজ ও সাধারণ। কৃত্রিম লৌকিকতা, ভনিতার লেশমাত্র তাতে ছিল না। ইমাম যাহাবী লিখেছেন, তাঁর জীবন ছিল শুষ্ক কাটখোট্টা ও

২৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬৩
২৬. আল-'ইকদ আল ফারীদ-১/৪০; ২/৮৫
২৭. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৫০
২৮. সিফাতুস সাফওয়া-২/৫০; তাবাকাত-৫/১৯৫; আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/৪৩৭; ৫/২৮৭

অতি সাদামাটা। বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের জন্য সব সময় মোটা পশমের পোশাক পরতেন। মাইমূন ইবন সাহ্রান বলেন, তিনি তাঁর পিতার মতই ছিলেন। বিলাসিতা ও সৌখিনতার লেশমাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ ও সচ্ছলতাও তাঁর ছিল না। বর্ণিত আছে, বাজারে কেনাবেচা করতেন। নিজ হাতে সব কাজও করতেন।[২৯] হানজালা বলেন, আমি সালিমকে বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করতে দেখেছি।[৩০] তাঁর সমসাময়িক অন্য একজন তাবি'ঈ আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ পরতেন রেশম ও পশম মিশ্রিত এক প্রকার পোশাক, আর তিনি পরতেন মোটা পশমী পোশাক; দু'জন মদীনার একই মজলিস ও মসজিদে বসতেন। কেউ কাউকে কোন ব্যাপারে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না।[৩১] তিনি কুরবানীর পশুর চামড়ার তৈরী পোশাকও পরতেন।[৩২] বাম হাতের আঙ্গুলে রূপোর আংটি ধারণ করতেন এবং তাতে তাঁর নামটি অংকিত থাকতো। জামা ও চাদর পরতেন। জামাটি পায়ের নলার মাঝ বরাবর লম্বা ছিল। টুপি ও পাগড়ী পরতেন। পাগড়ীর এক মাথা পিছন দিকে এক বিঘত বা তার কিছু বেশী ছেড়ে রাখতেন।[৩৩]

তিনি যে পোশাক পরতেন তার মূল্য হতো মাত্র দুই দিরহাম।[৩৪] শুকনো রুটি ও যয়তুনের তেল ছিল তাঁর প্রধান খাদ্য। তাঁর দাদা হযরত ফারূক আ'জমের (রা) জীবনও ছিল এমন। তিনি গোশত খুব কম খেতেন। মানুষকে গোশত বেশী খেতে নিষেধ করতেন। বলতেন, গোশত কম খাবে। কারণ, তার মধ্যে মদের মতই তেজী ভাব আছে।[৩৫]

এমন অতি সাধারণ খাবার খাওয়া সত্ত্বেও তাঁর শরীর ছিল খুবই পুষ্ট ও সজীব। একবার হজ্জের মওসুমে যখন দেহে শুধু ইহ্রামের পোশাক থাকে, তাঁর দেহের এমন সজীবতা দেখে খলীফা হিশাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কী খান? তিনি বলেন, রুটি ও যয়তুনের তেল। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, এ খাবার কিভাবে খাওয়া হয়? তিনি বলেন, এগুলো আমি ঢেকে রেখে দিই এবং ক্ষিদে অনুভব করলে তখন খেয়ে নিই। আর কখনো গোশত পেলে তাও খাই।[৩৬]

হযরত সালিম বৃদ্ধ বয়সে হিজরী ১০৬ মতান্তরে ১০৭ ও ১০৮ সনের জিলহজ্জ মাসে মদীনায় ইনতিকাল করেন।[৩৭] হিশাম ইবন 'আবদুল মালিক হজ্জ আদায় শেষে তখন মদীনায় অবস্থান করছিলেন। তিনিই জানাযার নামায পড়ান। মানুষের এত ভিড় হয় যে, বাকী'র ময়দানে জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়।[৩৮]

---

২৯. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/২৫০
৩০. সিফাতুস সাফওয়া-২/৫১
৩১. আল-'ইকদ আল ফারীদ-২/৩৭৩; ৬/২২৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৪৫৯
৩২. আল-'ইকদ আল ফারীদ-৬/২০১
৩৩. তাবাকাত-৫/১৯৬, ১৯৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬৪
৩৪. সিফাতুস সাফওয়া-২/৫১; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৯
৩৫. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৪৯
৩৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬৩; তাবাকাত-৫/২০০; ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৪৯
৩৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৯
৩৮. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-২/৩৪৭; তাবাকাত-৫/১৯৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৪৬৫

তিনি কয়েকজন সন্তান রেখে যান। তাঁরা হলেন : 'উমার, 'আবূ বাকর, 'আবদুল্লাহ, 'আসিম, জা'ফর, 'আবদুল 'আযীয, ফাতিমা, হাফসা ও 'আবাদা।[৩৯] শেষ বয়সে তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে যায়।

হযরত সালিম (রহ) যে বছর মারা যান খলীফা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক সে বছর হজ্জের সফরে মদীনায় যান। মদীনা পৌঁছে এক ব্যক্তিকে বললেন : দেখ তো মসজিদে কে আছে। সে বললো : একটি লম্বা কালো মানুষ আছে। হিশাম বললেন : তিনিই সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ। তাঁকে ডেকে আন। লোকটি সালিমের নিকট গিয়ে বললো : আমীরুল মু'মিনীন আপনাকে ডেকেছেন, চলুন। তবে আপনি ইচ্ছা করলে লোক পাঠিয়ে আপনার অন্য পরিধেয় বস্ত্র আনিয়ে নিতে পারেন। সালিম বললেন : আপনার অকল্যাণ হোক! আমি এক চাদর ও এক জামা পরে আল্লাহর যিয়ারতে এসেছি। এ অবস্থায় আমি যাব হিশামের কাছে? যাই হোক, তিনি হিশামের কাছে যান এবং হিশাম তাঁকে দশ হাজার মুদ্রা উপহার দেন। এরপর হিশাম মদীনা থেকে মক্কায় যান এবং হজ্জ আদায় করেন। হজ্জ শেষ করে তিনি আবার মদীনায় যান। সেখানে পৌঁছে জানতে পান যে, সালিম (রহ) কঠিন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করছেন। হিশাম তাঁকে দেখতে যান এবং তাঁর অবস্থা কেমন তা জিজ্ঞেস করেন, এরপর সালিম (রহ) মারা যান এবং হিশাম তাঁর জানাযার নামায পড়ান। নামাযের পর তিনি মন্তব্য করেন : আমার হজ্জ অথবা সালিমের জানাযার নামায পড়া এ দু'টির কোনটির জন্য আমি বেশী খুশী তা বলতে পারবো না।[৪০]

খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান একবার হজ্জের সময় হাজ্জাজকে লিখলেন : হজ্জের নিয়মাবলীর ব্যাপারে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারকে (রা) অনুসরণ করবে। আরাফার দিনের আগের রাতে হাজ্জাজ গেলেন 'আবদুল্লাহ (রা) ও তাঁর ছেলে সালিমের নিকট। সালিম তাঁকে বললেন : আজ যদি আপনি সুন্নাত অনুসরণ করতে চান তাহলে খুতবা সংক্ষেপ করে তাড়াতাড়ি নামায পড়বেন। কথাটি হাজ্জাজের মনোপূত হলো না, তিনি 'আবদুল্লাহর (রা) দিকে তাকালেন। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন : সে ঠিক বলেছে।[৪১]

ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেন : অধিকাংশ মদীনাবাসী দাসীদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো না। অথচ এই দাসীদের পেটেই জন্ম নিয়েছেন 'আলী ইবন আল-হুসাইন, আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ও সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ। আর তাঁরা ফিকাহ্, 'ইলম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সকল মদীনাবাসীকে অতিক্রম করে গেছেন। তারপর মানুষ দাসীদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।[৪২]

---

৩৯. তাবাকাত-৫/১৯৫
৪০. আল 'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৪৬-৪৪৭
৪১. প্রাগুক্ত-৫/৩৫
৪২. প্রাগুক্ত-৬/১২৮; তারীখ ইবন 'আসাকির-৭/১৪

তাউস ইবন কায়সান (রহ)

আবূ 'আবদির রহমান তাউস ইবন কায়সান ছিলেন বুহায়র ইবন রীসান-এর দাস। কোন কোন বর্ণনা মতে তাঁর আসল নাম যাকওয়ান, আর তাউস তাঁর উপাধি। তাঁর পিতা কায়সান ছিলেন অনারব বংশোদ্ভূত। তিনি আলে হামদান-এর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে ইয়ামনের 'জানাদ' শহরে বসতি স্থাপন করেন। তাউস ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ।

'আল্লামা নাবাবী লিখেছেন, তাউস ছিলেন জ্ঞানী, মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের অন্তর্ভুক্ত মানুষ। তাঁর মহাত্ম্য, মর্যাদা, পাণ্ডিত্য, যোগ্যতা ও স্মৃতি শক্তির ব্যাপারে সবাই একমত।[১] ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন :

তিনি ছিলেন একজন ইমাম এবং 'ইলম ও 'আমলের দিক দিয়ে ছিলেন খ্যাতিমান 'আলিমদের একজন।[২]

তিনি হাদীছের একজন বড় হাফেজ ছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে ধারণকৃত হাদীছ 'আলীমদের নিকট স্বীকৃত ছিল।[৩] তিনি পঞ্চাশ জন সাহাবীর দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র, যায়দ ইবন আরকাম, যায়দ ইবন ছাবিত, আবূ হুরায়রা, 'আয়িশা সিদ্দীকা, সুরাকা ইবন মালিক, সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, জাবির (রা) প্রমুখ সাহাবীর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণ করেন।[৪] হাবরুল উম্মাহ্ 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ থেকে বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জন করেন।

ফিকাহ্ শাস্ত্রে প্রচণ্ড দখল ছিল। ইবন খাল্লিকান লিখেছেন :[৫]

كان فقيهًا جليل القدر رفيع الذكر.

'তিনি ছিলেন সুমহান মর্যাদার ও সুউচ্চ খ্যাতির অধিকারী একজন ফকীহ্।' তাঁর শিষ্য-শাগরিদের গণ্ডি অনেক প্রশস্ত। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্রের নাম : ছেলে 'আবদুল্লাহ, ওয়াহাব ইবন মায়সারাহ্, হাবীব ইবন আবী ছাবিত, সাম ইবন 'উতায়বা, হাসান ইবন মুসলিম, সুলায়মান ইবন মুসা, 'আবদুল করীম জাযারী, আবদুল মালিক ইবন মায়সারা, 'আমর ইবন শু'আয়ব, 'আমর ইবন দীনার, 'আমর ইবন মুসলিম, কায়স ইবন সা'দ, মুজাহিদ, লায়ছ, আবূ সুলায়ম, হিশাম ও আরো অনেকে।[৬]

---

১. তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২৫১
২. শাযারাতুয যাহাব-১/১৩৩; সিফাতুস সাফওয়া-২/১৬০
৩. তাহ্যীবুল আসমা'-১/২৫১
৪. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৫/৯; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯০
৫. ওয়াফয়াতুল আ'য়ান-১/২৩৩
৬. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৫/৯; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯০

জ্ঞান-গরিমার দিক দিয়ে তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। ইবন 'উয়ায়না বর্ণনা করেছেন। আমি 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা যাঁদের সাথে ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট যেতেন তাঁরা কারা? বললেন : 'আতা ও তাঁর দলের সাথে। আমি বললাম : আর তাঊস? বললেন : তিনি যেতেন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে।[৭]

তাঁর সমকালীন সকল 'আলিম তাঁর গভীর জ্ঞানের স্বীকৃতি দিতেন। 'আমর ইবন দীনার বলতেন, আমি তাঊসের সমকক্ষ কোন ব্যক্তিকে দেখিনি।[৮] অনেকে বলতেন, তাঊস হলেন ইয়ামনের ইবন সীরীন। সা'ঈদ ইবন আবী সীরীন বর্ণনা করেছেন কায়স ইবন সা'দ বলতেন, তাঊস হলেন আমাদের এখানের ইবন সীরীন।[৯] কোন কোন 'আলিম তাঁকে হযরত সা'ঈদ ইবন জুবায়রের (রা) সমকক্ষ বলে মনে করতেন। 'উছমান দারিমী বর্ণনা করেছেন, আমি ইবন মু'ঈনকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তাঊসকে বেশী পছন্দ করেন, না সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে? কিন্তু তিনি কাউকে প্রাধান্য দেননি।[১০]

হযরত তাঊস যে পরিমাণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন ঠিক সেই পরিমাণ 'আমলও তাঁর মধ্যে ছিল। ইবন হিব্বান বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়ামনের বিখ্যাত 'আবিদ ব্যক্তিদের একজন ছিলেন।[১১] অতিরিক্ত ইবাদাতের কারণে কপালে সিজদার দাগ পড়ে গিয়েছিল। মৃত্যু শয্যায়ও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন।[১২] চল্লিশ বার হজ্জ আদায় করেন।[১৩] কা'বা তাওয়াফের সময় নীরব থাকতেন। কারো কোন কথার জবাব দিতেন না। বলতেনঃ তাওয়াফ হচ্ছে নামায।[১৪]

তিনি তাঁর সাধ্যমত আল্লাহর রাস্তায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতেন। একবার একজন শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির জরিমানার অর্থ পরিশোধ করে তাঁকে কয়েদখানা থেকে মুক্ত করেন।

দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব ও তার চাওয়া-পাওয়ার বাসনা থেকে একেবারেই মুখপেক্ষীহীন ছিলেন। কখনো দুনিয়ার সুখ-সম্পদ প্রাপ্তির কামনা করেননি। সব সময় এই দু'আ করতেন : 'হে আল্লাহ! আমাকে তুমি অর্থ-বিত্ত ও সন্তান-সন্ততি থেকে বঞ্চিত রাখ এবং তার পরিবর্তে ঈমান ও 'আমলের ঐশ্বর্য দান কর।'[১৫] শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি এবং বিত্তশালীদেরকে তিনি সব সময় এড়িয়ে চলতেন। তাদেরকে কখনো ভালো মনে করতেন না। ইবন 'উয়ায়না বর্ণনা করেছেন। তিন ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা সরকার ও সরকারী

---

৭. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৩৩
৮. তাহ্যীবুল আসমা'-১/২৫১
৯. তাবাকাত ইবন সা'দ-৫/৩৯৪
১০. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৫/৯
১১. প্রাগুক্ত
১২. তাবাকাত-৫/৩৯৩, ৩৯৫
১৩. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৫/৯
১৪. তাবাকাত-৫/৩৯৩
১৫. প্রাগুক্ত

কর্মকর্তাদের এড়িয়ে চলতেন। সাহাবী আবূ যার আল-গিফারী তাঁর যুগে এবং তাউস ও ছাওরী তাঁদের নিজ নিজ সময়ে।[১৬] তিনি বলতেন, বিত্তশালী অভিজাত শ্রেণী থেকে বেশী মন্দ আর কাউকে দেখিনি।[১৭]

তাউস ইবন কায়সানের জন্মভূমি ইয়ামনের ওয়ালী ছিলেন সে সময় স্বৈরাচারী হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের ভাই মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ হিজাযে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রকে (রা) হত্যার মাধ্যমে তাঁর আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দিয়ে নিজের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সুসংহত করে ইয়ামনে তাঁর ভাইকে ওয়ালীর দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। ভাই হাজ্জাজের বহু দোষ মুহাম্মাদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু তাঁর মধ্যে ভালো গুণও কিছু ছিল। একবার শীতকালের এক সকালে তাউস ইবন কায়সান গেলেন মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফের নিকট। সংগে ছিলেন ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্।[১৮] তাঁরা সবাই নিজ নিজ আসনে স্থির হয়ে বসার পর মুহাম্মাদকে লক্ষ্য করে তাউস ওয়া'আজ-নসীহত করতে শুরু করলেন। বহু মানুষ তাঁদের সামনে বসা ছিল। তখন বেশ ঠাণ্ডাও ছিল। মুহাম্মাদ তাঁর চাকরকে ডেকে বললেন : ওহে তুমি একটি 'তায়লাসান'[১৯] নিয়ে এসে এই তাউসের দু'কাঁধের উপর বিছিয়ে দাও। চাকরটি একটি অতি সুন্দর 'তায়লাসান' নিয়ে এসে তাউসের দু'কাঁধের উপর বিছিয়ে দেয়। তাউস ওয়া'আজ করা অবস্থায় কাঁধটি একটু দুলিয়ে আস্তে করে তায়লাসানটি ফেলে দেন। ওয়াহাব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু প্রত্যক্ষ করলেন। মুহাম্মাদ খুবই অপমান বোধ করলেন। রাগে-ক্ষোভে তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। তারপর তাউস ও তাঁর সঙ্গী-ওয়াহাব যখন মজলিস থেকে উঠে চলা শুরু করলেন তখন ওয়াহাব তাউসকে বললেন : আপনার তায়লাসানের প্রয়োজন না থাকলেও মানুষকে মুহাম্মাদের ক্রোধ থেকে বাঁচানোর জন্য তখন সেটি নিয়ে নেওয়া উচিৎ ছিল। আর খুব বেশী হলে আপনি সেটি বিক্রি করে তার মূল্য গরিব-মিসকীনদের মধ্যে বিলি করে দিতে পারতেন। তাউস বললেন : হাঁ, আপনি যা বলেছেন, তা ঠিক। তবে আমার যদি এমন আশঙ্কা না থাকতো যে, আমার পরে 'আলিমরা বলবে– আমরাও গ্রহণ করবো যেমন তাউস গ্রহণ করেছেন। তারপর তারা যা কিছু গ্রহণ করবে তা আপনার কথা মত দান করবে না। অর্থাৎ তারা আমার কাজকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে আমীর-উমারাদের নিকট থেকে হাদীয়া-তোহফা গ্রহণ করবে।[২০]

মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ এ অপমান ভুললেন না। তিনি তাউসকে উচিত শিক্ষা দিতে চাইলেন। তিনি একটি সূক্ষ্ম চাল চাললেন। সাতশো স্বর্ণমুদ্রা একটি থলেতে ভরলেন।

---

১৬. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৫/১০

১৭. তাবাকাত-৫/৩৯৩

১৮. ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্ পারশ্য বংশোদ্ভূত একজন বিখ্যাত তাবি'ঈ। প্রাচীন আরব ও আহলি কিতাবদের ইতিহাসে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন।

১৯. 'তায়লাসান' একপ্রকার অতি মূল্যবান সবুজ চাদরকে বলা হয়। সাধারণতঃ অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ব্যবহার করে থাকে।

২০. সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন, ২৮২-২৮৩

তারপর তাঁর অতি বিশ্বস্ত ও কাছের একজন চালাক-চতুর লোককে বললেন : তুমি এই থলেটি তাউসের নিকট নিয়ে যাবে এবং বিভিন্ন বাহানায় তাঁকে এটি গ্রহণ করতে রাজী করাবে। যদি তা পার তাহলে তুমি হবে আমার অতি কাছের লোক এবং তোমার বেতন-ভাতা আমি বাড়িয়ে দিব। থলেটি হাতে নিয়ে লোকটি বের হলো। সান'আ'র নিকটবর্তী 'আল-জানাদ' নামক যে পল্লীতে তাউস থাকতেন, লোকটি সেখানে উপস্থিত হলো। সালাম, কুশল বিনিময় ও আলাপচারিতার মাধ্যমে লোকটি তাউসের সাথে বেশ ভাব জমিয়ে ফেললো। এক পর্যায়ে সে বললো : জনাব, এই থলের এই জিনিসগুলো আমীর আপনার খরচের জন্য পাঠিয়েছেন। তাউস বললেন : এগুলো আমার প্রয়োজন নেই। লোকটি নানা কৌশলে তাঁকে রাজী করাতে চাইলো। বহু যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। লোকটি একটি সুযোগ খুঁজছিল। এক সময় সে তাউসের অমনোযোগিতার সুযোগে জানালার ফাঁক দিয়ে থলেটি ঘরের মধ্যে ছুড়ে মারে। তারপর সে ফিরে গিয়ে আমীরকে বলে : তাউস থলেটি গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মাদ তো মনে মনে দারুণ খুশী হলেন। কিন্তু তখন চুপ থাকলেন। কয়েক দিন কেটে গেল। তারপর একদিন তাঁর পারিষদবর্গের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তিকে তাউসের নিকট পাঠালেন। তাদের সাথে গেল আগের সেই লোকটি, যে থলে নিয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মাদ তাদেরকে নির্দেশ দিলেন : তোমরা তাঁকে একথা বলবে– আমীরের দূতটি সে দিন ভুল করে থলেটি আপনাকে দিয়ে গেছে। আসলে সেটি আরেকজনকে দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। আমরা সেটি ফেরত নিয়ে প্রকৃত মালিককে দেওয়ার জন্য এসেছি।

তাউস বললেন : ফেরত দিব কি? আমি তো আমীরের কোন অর্থই গ্রহণ করিনি। ঐ দু'ব্যক্তি জোর দিয়ে বললো : না, আপনি গ্রহণ করেছেন। তাউস তখন থলেটি যে নিয়ে এসেছিল তার দিকে ফিরে বললেন : আমি কি আপনার কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করেছিলাম? লোকটি ভয়ে কেঁপে উঠলো। বললো : না। আমি আপনার অমনোযোগিতার সুযোগে থলেটি জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ছুড়ে মেরেছিলাম। তাউস বললেন : এই সেই জানালা। আপনারা সেখানে দেখতে পারেন। লোক দু'টি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে থলেটি যেমন ছিল তেমনই পড়ে আছে। শুধু মাকড়সা তার উপর একটি জাল বুনেছে। তারা থলেটি নিয়ে আমীর মুহাম্মাদের কাছে ফিরে গেল।[২১]

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফের এই ধৃষ্টতার বদলা নেন অন্যভাবে। আর তা তাউসসহ বহু মানুষের সামনে। সেটা কিভাবে ঘটেছিল তা তাউসের জবানীতেই শোনা যাক :

তাউস বলেন, আমি যখন মক্কায় হজ্জের উদ্দেশ্যে কা'বার তাওয়াফ করছিলাম তখন হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ লোক মারফত আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি আমাকে 'মারহাবান, আহলান ওয়া সাহলান' বলে স্বাগতম জানিয়ে তাঁর

---

২১. প্রাগুক্ত-২৮৩-২৮৫

কাছেই বসালেন। নিজ হাতে বালিশ এগিয়ে দিয়ে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসার জন্য বললেন। তারপর হজ্জের বিভিন্ন মাসয়ালা যা তাঁর জানা ছিল না, সে সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমরা যখন এই আলোচনার মধ্যে আছি, তখন কা'বা তাওয়াফরত এক ব্যক্তির 'তালবিয়া' পাঠের ধ্বনি হাজ্জাজের কানে গেল। লোকটি একটু উঁচুস্বরে তালবিয়া উচ্চারণ করছিল। সেই ধ্বনিতে ছিল অন্তরকে ধাক্কা দেয় এমন একটি সুরের ঝঙ্কার। হাজ্জাজ লোকটিকে ডেকে আনার জন্য বললেন। লোকটি আসার পরে তাঁদের মধ্যে নিম্নরূপ কথাবার্তা হয় :

হাজ্জাজ : আপনি কোন গোত্রের লোক?

লোকটি : মুসলমানদের একজন।

হাজ্জাজ : আমি এটা জানতে চাইনি। তোমার মাতৃভূমি কোনটি তা জানতে চেয়েছি।

লোকটি : ইয়ামানের অধিবাসী।

হাজ্জাজ : তোমাদের আমীরকে (মুহাম্মাদ) কেমন দেখে এসেছো?

লোকটি : আমি দেখে এসেছি, তিনি একজন বিশাল দেহের অধিকারী, সুন্দর পোশাক পরিধানকারী, দক্ষ অশ্বারোহী এবং অসংখ্য মানুষকে স্বাগতম জানাচ্ছেন ও বিদায় দিচ্ছেন।

হাজ্জাজ : আমি তোমার কাছে এসব জানতে চাইনি।

লোকটি : তাহলে আপনি কী জানতে চেয়েছেন?

হাজ্জাজ : আমি জানতে চেয়েছি, তোমাদের মধ্যে তার জীবনধারা কেমন?

লোকটি : আমি তাঁকে ছেড়ে এসেছি একজন ভীষণ অত্যাচারী, সৃষ্টির বাধ্য ও স্রষ্টার অবাধ্য মানুষ হিসেবে।

একথা শুনে পারিষদবর্গের সামনে লজ্জায় হাজ্জাজের মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি লোকটিকে বললেন : তুমি যা কিছু বললে তা বলতে কে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে? আমার কাছে তার স্থান কোন পর্যায়ের তা কি তুমি জান না?

লোকটি বললো : আপনার কাছে তাঁর যে স্থান, তার চেয়ে অধিক সম্মানীয় আল্লাহর কাছে আমার যে স্থান, তাকি আপনি দেখছেন না? আমি এসেছি আল্লাহর ঘরের আঙ্গিনায়, তাঁর নবীকে স্বীকার করি এবং তাঁর দীনের দাবীসমূহ পূরণ করি।

তারপর হাজ্জাজ চুপ হয়ে যান। কোন জবাব দানের আর চেষ্টা করলেন না।

তাউস বলেন : তারপর লোকটি দেরী না করে যাবার জন্য উঠে পড়লো এবং কোন রকম অনুমতি নেওয়া-দেওয়ার পরোয়া না করে দ্রুত চলে গেল। আমিও তার পিছনে পিছনে চললাম এবং মনে মনে বললাম : 'লোকটি নেককার, তাকে অনুসরণ কর। তাকে ধর।' আমি তাকে অনুসরণ করলাম। তাকে এ অবস্থায় পেলাম যে, সে কা'বার চত্বরে এসে কা'বার গিলাফ ধরে মুখটা কা'বার দেওয়ালে ঠেকিয়ে বলছে :

"হে আল্লাহ! আমি তোমার উপর অটল আছি এবং তোমার বাহুতলে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! তুমি তোমার দান-অনুগ্রহের উপর আমার নির্ভরতা দাও, তোমার তত্ত্বাবধানের প্রতি আমার সন্তুষ্টি দাও, নিকৃষ্ট ধরনের কৃপণদের কৃপণতা থেকে আমাকে মুক্তি দাও

এবং নিজেকে প্রাধান্য দানকারীদের কর্তৃত্বে যা কিছু তা থেকে মুখাপেক্ষীহীন কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটবর্তী প্রশস্ততা, তোমার অনাদি কাল ব্যাপী শুভ ও কল্যাণ এবং তোমার সুন্দরতম অভ্যাস কামনা করি। ইয়া রাব্বাল 'আলামীন!"

তারপর মানুষের একটি প্রবল ভীড়ের ধাক্কা তাকে সরিয়ে আমার দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। আমি ধরে নিলাম, আমি আর তার সাক্ষাৎ পাব না। কিন্তু 'আরাফা'র দিনের সন্ধ্যায় মানুষ যখন মুযদালাফার দিকে যাচ্ছে তখন আবার তার দেখা পেলাম। আমি তার কাছে এগিয়ে গিয়ে শুনলাম, সে বলছে :

"হে আল্লাহ! যদি তুমি আমার হজ্জ, আমার কষ্ট-ক্লান্তি, আমার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কবুল না কর, তাহলে আমার এসব কিছু কবুল না করার বিনিময়ে আমার উপর অপতিত বিপদ-মুসীবতের প্রতিদান থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।"

তারপর সে মানুষের ভীড়ের মধ্যে পড়ে যায় এবং অন্ধকারে আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। আমি যখন তাকে ফিরে পাওয়ার আশা ত্যাগ করলাম তখন আল্লাহর কাছে এই বলে দু'আ করলাম : হে আল্লাহ! তুমি তার ও আমার দু'আ কবুল কর, তার ও আমার আশা পূরণ কর এবং আমার ও তার পা সুদৃঢ় রাখ, সেই দিন, যে দিন সকল পা পিছলে যাবে। আর হাওজে কাওছারের পাশে তাকে ও আমাকে একত্র করো। ইয়া আকরামাল আকরামীন।[২২]

একবার মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ কিছু দিনের জন্য তাউসকে তাহসীলদার হিসেবে নিয়োগ করেন। এই দায়িত্বের সাথে তাঁর মত ব্যক্তির কী-ই বা সম্পর্ক হতে পারে? এ দায়িত্ব তিনি যে ভাবে পালন করতেন তার একটি বর্ণনা তিনি নিজে দিয়েছেন। ইবরাহীম ইবন আয়সারা তাঁকে প্রশ্ন করলো : তাহসীলদারের দায়িত্ব পালনকালে আপনি কি করতেন? বললেন : খাজনা-ট্যাক্স যাদের বকেয়া পড়েছিল, তাদেরকে বলতাম : আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন! তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তা থেকে শরী'আতের হক আদায় করে তা পাক-সাফ করে ফেল। একথা বলার পর যদি তারা বকেয়া খাজনা দিয়ে দিত তাহলে তা নিয়ে নিতাম। অন্যথায় তাদেরকে আর ডাকতামও না।[২৩]

একবার খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলেন। একটা গভীর আবেগভরা অন্তর নিয়ে কা'বার আঙ্গিনায় বসে আছেন। হঠাৎ তাঁর দেহরক্ষীর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন : আমাদেরকে দীনের তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারেন এবং মহান আল্লাহর এই মহান দিনে আমাদেরকে কিছু উপদেশ বাণী শোনাতে পারেন এমন একজন 'আলিমের খোঁজ কর।

রক্ষীটি হজ্জ উপলক্ষে আগত মানুষের ভীড়ের দিকে চলে গেল এবং তাদেরকে আমীরুল মু'মিনীনের উদ্দেশ্যের কথা বললো। তাকে এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হলো : এই যে, ইনি হলেন তাউস ইবন কায়সান। তিনি এ যুগের ফকীহদের নেতা এবং

---

২২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/৪২৩-৪২৪; প্রাগুক্ত-২৮৫-২৮৮
২৩. তাবাকাত-৫/৩৯৪

আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত সত্যভাষী। আপনি তাঁর কাছেই যান।

রক্ষীটি এক পা দু'পা করে তাউসের কাছে গেলেন। তাঁকে বললেন : ওহে শায়খ, আপনি আমীরুল মু'মিনীনের ডাকে একটু সাড়া দিন। তাউস কোন রকম ইতস্তত: ভাব না করে রাজী হলেন। কারণ, তিনি বুঝতেন, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের দা'ওয়াত দানের কোন সুযোগই হাতছাড়া করা উচিত নয়। সব সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করা উচিত। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন, শাসন কর্তৃত্বের ব্যক্তিদের ত্যাড়ামি ও বক্রতা সোজা করা, তাদেরকে জুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত রাখা এবং তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করার উদ্দেশ্যে যে কথা বলা হয়, তাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো কথা।

তাউস রক্ষীর সংগে চললেন। আমীরুল মু'মিনীনের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম দিলেন ও কুশল জিজ্ঞেস করলেন। খলীফা সুন্দরভাবে জবাব দিয়ে সম্মানের সাথে তাঁকে কাছে বসালেন। তারপর হজ্জের নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে যা জানার প্রয়োজন মনে করলেন তা জিজ্ঞেস করলেন এবং অত্যন্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে কান লাগিয়ে সব কথা শুনলেন।

তাউস বলেন : আমি যখন বুঝতে পারলাম, আমীরুল মু'মিনীনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেছে এবং তাঁর আর প্রশ্ন করার কিছু নেই তখন আমি মনে মনে বললাম : ওহে তাউস! এ এমন একটা মজলিস, যে মজলিস সম্পর্কে আল্লাহ তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন। তারপর আমি আমীরুল মু'মিনীনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললাম : হে আমীরুল মু'মিনীন! জাহান্নামের অভ্যন্তরে একটি কূপের উপর থেকে একটি পাথর ফেলে দিলে সত্তর বছর গড়ানোর পর তার তলায় গিয়ে পৌঁছবে। হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি জানেন আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের কূপ কাদের জন্য তৈরী করেছেন? তিনি কোন রকম ভাবা-চিন্তা ছাড়াই বলে উঠলেন : না, আমার জানা নেই। আল্লাহ আপনার অকল্যাণ করুন! কাদের জন্য তৈরী করেছেন বলুন।

আমি তখন বললাম : কূপটি আল্লাহ তাদের জন্য তৈরী করেছেন যাদেরকে তিনি মানুষের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন, অতঃপর তারা জুলুম-অত্যাচার করেছে।

আমার এ কথা শোনার সাথে সাথে সুলায়মানের উপর যেন বজ্রপাত হলো। আমার মনে হলো তাঁর পাঁজর ভেদ করে প্রাণটি যেন বেরিয়ে যাবে। তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। সেই নিঃশব্দ কান্নায় তাঁর অন্তরের তন্ত্রীগুলো ছিন্ন হয়ে মৃত্যু বরণ করবেন বলে আমার মনে হলো। এ অবস্থায় আমি তাঁকে রেখে চলে আসি। আমি যখন আসি তিনি তখন বার বার বলছিলেন : আল্লাহ আপনার ভালো প্রতিদান দিন।[২৪]

'উমার ইবন 'আবদিল আযীয খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে একবার তাউসকে বলেনঃ আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা আমীরুল মু'মিনীন সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিককে

২৪. সওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন-২৮৯-২৯১

বলুন। তিনি সোজা বলে দিলেন, আমার কোন প্রয়োজন নেই।[২৫]

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। একদিন লোক মারফত তাউসকে বলে পাঠালেন : ওহে আবূ আবদির রহমান! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

তাউস এক লাইনের একটি চিঠি লিখলেন।

লাইনটি হলো এই :

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَّكُوْنَ عَمَلُكَ خَيْرًا كُلُّهُ، فَاسْتَعْمِلْ أَهْلَ الْخَيْرِ، وَالسَّلَامُ.

– যদি আপনি চান আপনার সব কাজ ভালো হোক, তাহলে ভালো লোকদেরকে নিয়োগ করুন। ওয়াস-সালাম!

চিঠিটি পড়ে 'উমার মন্তব্য করেন : উপদেশের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কথাটি দু'বার উচ্চারণ করেন।[২৬]

হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর তাঁর সাথে তাউসের একটি ঘটনার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। ঘটনাটি বেশ প্রসিদ্ধ ও চমকপ্রদ। খলীফা হিশাম একবার হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসলেন। সেখানে অবস্থানকালে একদিন মক্কার অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে বললেন : তোমরা রাসূলুল্লাহর (সা) কোন সাহাবীকে খুঁজে বের করে আমার কাছে নিয়ে এসো তো। তারা বললো : আমীরুল মু'মিনীন! সাহাবীরা তো একের পর এক সবাই তাঁদের পরোয়ারদিগারের সান্নিধ্যে চলে গেছেন। তাঁদের আর কেউ এখন জীবিত নেই।

হিশাম বললেন : ঠিক আছে। তাহলে তাবি'ঈদের কাউকে নিয়ে এসো। তারা তাউসকে নিয়ে হাজির করলো। তাউস খলীফার ডাকার অপেক্ষা না করে সোজা তাঁর ঘরে ঢুকে বিছানার এক পাশে জুতোজোড়া খুলে রেখে তাঁকে সালাম করলেন। তারপর খলীফার কুনিয়াত বা ডাকনাম না ধরে তাঁর আসল নাম ধরে তাঁকে সম্বোধন করেন। তাছাড়া খলীফার অনুমতি ছাড়াই তাঁর বিছানায় গিয়ে বসে পড়েন।

তাউসের এমন স্পর্ধা দেখে ক্রোধে, উত্তেজনায় খলীফার মাথায় যেন রক্ত উঠে গেল। তিনি তাউসের এসব আচরণকে দুঃসাহস বলে ভাবলেন এবং তাঁর মজলিসের লোকজন ও পারিষদবর্গের সামনে তাঁকে হেয় ও অপমান করা হয়েছে বলে মনে করলেন। তবে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেন এই বলে যে, তিনি তো আল্লাহর 'হারাম'-এ অবস্থান করছেন। তারপর তিনি নিজের প্রতি মনোযোগী হন এবং তাউসকে বলেন : তাউস! আপনি যা করলেন, তা এমনটি করতে আপনাকে কিসে উৎসাহিত করেছে?

তাউস : কী এমন কাজ আমি করেছি?

---

২৫. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৬৮

২৬. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৩৩

খলীফা আবার রেগে গেলেন। বললেন : আপনি জুতা খুলেছেন আমার বিছানার পাশে, খলীফাতুল মুসলিমীন বলে সম্বোধন করে আমাকে সালাম করেননি, আমার কুনিয়াত বা ডাকনাম না বলে নাম ধরে ডেকেছেন, তারপর আমার অনুমতি ছাড়াই আপনি বসে পড়েছেন।

অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে তাউস বললেন : আপনার বিছানার পাশে আমার জুতো খোলার বিষয়টি– তা আমি তো প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহ রাব্বুল 'ইজ্জাতের সামনে খুলে রাখি। তিনি তো কখনো আমাকে তিরস্কার বা আমার উপর রাগ করেন না। আর আপনি যে বললেন, আমি আপনাকে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করে সালাম করিনি। তা মু'মিনদের সবাই তো আপনাকে আমীর বলে স্বীকার করে না। আমার ভয় হয়েছে, আমি আপনাকে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করলে মিথ্যাবাদী হয়ে যাই কিনা। আর আপনি যে বললেন, আমি আপনার কুনিয়াত (ডাকনাম) ধরে না ডেকে আসল নাম ধরে ডেকেছি। তার কারণ এই যে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীদের নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। যেমন : ইয়া দাউদ, ইয়া ইয়াহইয়া, ইয়া 'ঈসা ইত্যাদি। আর তাঁর শত্রুদের ডেকেছেন কুনিয়াত ধরে। যেমন :[২৭] تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ.

– আবূ লাহাবের হাত দু'টি ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে।

আর আপনি যে বলেছেন, আমি আপনার অনুমতি না নিয়েই বসে গেছি। কারণ, আমি আমীরুল মু'মিনীন 'আলী ইবন আবী তালিবকে (রা) বলতে শুনেছি :

'তুমি যদি একজন জাহান্নামী ব্যক্তিকে দেখতে চাও তাহলে এমন একজন বসা ব্যক্তিকে দেখ যার চার পাশে বহু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।' তাই আমি চাইনি, আপনি তেমন কোন ব্যক্তি হোন যাকে জাহান্নামীদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

হিশাম আর কোন কথা না বলে লজ্জায় মাথা নীচু করলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা উঁচু করে বললেন : ওহে আবূ 'আবদির রহমান, আমাকে কিছু উপদেশ বাণী শোনান। তাউস বললেন : আমি 'আলী ইবন আবী তালিবের (রা) মুখে শুনেছি : জাহান্নামে কিছু সাপ আছে যা খুব শক্ত, লম্বা ও মোটা স্তম্ভের মত, আর কিছু বিচ্ছু আছে যা খচ্চরের মত। সেগুলো দংশন করবে এমন শাসকদেরকে যারা তাদের প্রজাদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে না। একথা বলে তাউস আর অপেক্ষা করলেন না। উঠে চলে গেলেন।[২৮]

হযরত তাউস (রহ) যেমন কোন কোন শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিকে উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দিতেন তেমনিভাবে কোন কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে উপেক্ষাও করতেন। তাঁর ছেলে বলেন :

---

২৭. সূরা লাহাব-১; রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা আবূ লাহাব মক্কার অংশীবাদীদের অন্যতম নেতা ছিল। সে এবং তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহকে (সা) ভীষণ কষ্ট দিয়েছে।

২৮. সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন-২৯৪

একবার আমরা আমার পিতার সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে ইয়ামন থেকে বের হলাম। পথে কোন একটি শহরে আমরা যাত্রাবিরতি করলাম। সেই শহরের শাসক ছিল ইবন নাজীহ নামে এক দুরাচারী। সে সত্য ও ন্যায়ের কোন পরোয়া করতো না এবং অন্যায় ও অপকর্মে ছিল ভীষণ পটু। আমরা নামায আদায় করতে মসজিদে গেলাম। সেখান থেকে ইবন নাজীহ আমার পিতার আগমনের কথা জেনে গেল। সে মসজিদে ছুটে এলো এবং আমার পিতার সামনে বিনীতভাবে বসে তাঁকে সালাম করলো। কিন্তু আমার পিতা তাঁর সালামের জবাব দিলেন না। তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে পিছন দিয়ে বসলেন। সে উঠে ডান দিকে এসে কথা বলতে চাইলো। কিন্তু তিনি মুখ ঘুরিয়ে বসলেন। সে বাম দিকে এসে কথা বলার চেষ্টা করলো। এবারও তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এ অবস্থা দেখে আমি উঠে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে সালাম করলাম। তাকে বললাম : আমার পিতা আপনাকে চেনেন না। তিনি বললেন, আমাকে চেনেন বলেই আমার সাথে এমন আচরণ করলেন। তারপর লোকটি আর কোন কথা না বলে উঠে চলে গেল।

আমরা ঘরে ফিরে এলাম। আমার পিতা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : ওরে নির্বোধ, তাদের অনুপস্থিতিতে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের নিন্দা করে থাক। আর যেই না তারা সামনে এলো অমনি কথার মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে ফেললে! নিফাক (কপটতা) কি এছাড়া অন্য কিছু?[২৯]

হযরত তাউস (রহ) কেবল খলীফা ও আমীরদেরকে উপদেশ বাণী শোনাতেন না, বরং উপদেশের প্রয়োজন আছে অথবা উপদেশ শোনার প্রতি আগ্রহ আছে বলে যাকে মনে করতেন, তাকে উপদেশ দান করতেন। এ ক্ষেত্রে 'আতা' ইবন আবী রাবাহ'র একটি ঘটনা উল্লেখ করার মত। 'আতা' বলেন : তাউস ইবন কায়সান একবার আমাকে এমন এক অবস্থানে দেখলেন যা তাঁকে তুষ্ট করেনি। তিনি বললেন : 'আতা'! যে তোমার সামনে তার দ্বার রুদ্ধ করে দেয় এবং তোমার সামনে দ্বার রক্ষী দাঁড় করিয়ে দেয় তার কাছে তোমার প্রয়োজনের কথা বলা থেকে দূরে থেক। তার কাছেই তোমার প্রয়োজনের কথা বলো যে তোমার জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত রাখে, তোমার প্রয়োজনের কথা বলার জন্য তোমাকে আহ্বান জানায় এবং তা পূরণের প্রতিশ্রুতি দেয়।[৩০]

তিনি ছেলেকে বলতেন : বেটা! তুমি জ্ঞানীদের সাহচর্যে থাকবে এবং তাদের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করবে– যদিও তুমি তাদের কেউ নও। আর মূর্খদের সাহচর্যে থাকবে না। কারণ, তুমি তাদের সাহচর্যে থাকলে তাদের প্রতি তোমাকে সম্পৃক্ত করা হবে– যদিও তুমি তাদের কেউ নও। জেনে রাখ, প্রত্যেক জিনিসেরই একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। আর একজন মানুষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো তার দীন ও নৈতিকতার পূর্ণতা।[৩১]

---

২৯. হিলয়াতুল আওলিয়া' লি আবীন'আয়ম-৪/১৬
৩০. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৬৭
৩১. হিলয়াতুল আওলিয়া-৪/১৩; সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন-২৯৬

হযরত তাউসের পুত্র 'আবদুল্লাহও ছিলেন পিতার মত। পিতা তাঁকে নিজের মত করে গড়ে তুলেছিলেন। তাই পিতার স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-আদর্শ তিনি লাভ করেছিলেন। একবার 'আব্বাসীয় খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূর 'আবদুল্লাহ ইবন তাউস ও মালিক ইবন আনাসকে দরবারে ডেকে পাঠান। তাঁরা দু'জন গেলেন। দরবারে ঢুকে আসন গ্রহণ করার পর খলীফা 'আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেন : আপনার পিতা আপনাকে যেসব হাদীছ শুনিয়েছেন তার থেকে একটি হাদীছ আমাকে শোনান। আবদুল্লাহ বললেন, 'আমার পিতা আমাকে বলেছেন : কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি সবচেয়ে কঠিন 'আযাব ভোগ করবে যাকে আল্লাহ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছেন, অতঃপর সে তাঁর শাসন-কর্তৃত্বে জুলুম-অত্যাচারের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে।' এই উপদেশমূলক হাদীছ শোনার পর খলীফা মানসূর কিছুক্ষণ একেবারে চুপ হয়ে বসে থাকেন। তারপর খলীফা 'আবদুল্লাহকে তিনবার দোয়াত-কলম হাতে নিতে বলেন। কিন্তু 'আবদুল্লাহ খলীফার আদেশ পালন করলেন না। অবশেষে খলীফা তাঁকে প্রশ্ন করেন : আপনি দোয়াত-কলম হাতে নিচ্ছেন না কেন? বললেন : আমি এজন্য নিচ্ছি না যে, যদি আপনি অন্যায় ও অবিচারমূলক সিদ্ধান্ত লেখান তাহলে তাতে আমারও অংশগ্রহণ হয়ে যাবে। তাঁর এমন কাটখোট্টা কথা শুনে খলীফা তাঁদের দু'জনকে দরবার থেকে উঠিয়ে দেন। মালিক ইবন আনাস বলেন : আমি 'আবদুল্লাহর কথা শুনছিলাম, আর ভয়ে আমার কাপড় গুটিয়ে নিচ্ছিলাম। এই জন্য যে কখন না জানি তার রক্তে আমার কাপড় ভিজে যায়। খলীফা যখন আমাদেরকে উঠিয়ে দিলেন তখন আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম : এটাই তো আমি চাচ্ছি। এরপর আবদুল্লাহ আমার একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হন।[৩২]

হযরত তাউস (রহ) একশো অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী বছর জীবন লাভ করেছিলেন। তবে তার বার্ধক্য তাঁর মেধার স্বচ্ছতা, চিন্তার সূক্ষ্মতা ও তাৎক্ষণিক জবাব দানের ক্ষমতার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি। 'আবদুল্লাহ আশ-শামী নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আমি তাউসের নিকট থেকে কিছু শেখার জন্য তাঁর গৃহে গেলাম। আমি তাঁকে চিনতাম না। দরজায় টোকা দিতে একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে বললাম : আপনিই কি তাউস ইবন কায়সান? বললেন : না, আমি তাঁর ছেলে। বললাম : আপনি যদি তাঁর ছেলে হন, তাহলে নিশ্চয় আপনার পিতা বার্ধক্যের ভারে একেবারে বোধসোধ হারিয়ে ফেলেছেন। আমি তাঁর জ্ঞান থেকে কিছু অর্জনের উদ্দেশ্যে বহু দূর থেকে এসেছি। বললেন : আল্লাহ আপনার অকল্যাণ করুন! আল্লাহর কিতাবের বাহকেরা কখনো বোধসোধ হারায় না। ভিতরে আসুন।

আমি ঘরে ঢুকে তাউসকে সালাম করলাম। তারপর বললাম : আপনার জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কিছু অর্জন এবং আপনার কিছু উপদেশ বাণী শোনার উদ্দেশ্যে আমি এসেছি। বললেন :

---

৩২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৩৩

প্রশ্ন করুন। তবে সংক্ষেপ করবেন। বললাম : আমার সাধ্য অনুযায়ী সংক্ষেপ করবো– ইনশাআল্লাহ। তিনি বললেন : আপনি কি তাওরাত, যাবূর, ইনজীল ও আল কুরআনের সার কথা শুনতে চান? বললাম : হাঁ, তা বলুন।

বললেন : আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করুন যে তার চেয়ে ভীতিপ্রদ অন্য কিছু আপনার কাছে থাকবে না। আর তাঁর প্রতি এমন আশাবাদী থাকবেন যে, তাঁকে আপনার ভয়ের চেয়েও সে আশা প্রবল হবে। মানুষের জন্য তাই পছন্দ করুন যা নিজের জন্য পছন্দ করেন।[৩৩]

হযরত তাউস আল্লাহর কালামের দ্বারা কোন রকম আর্থিক সুবিধা লাভ করাকে ভীষণ খারাপ এবং কুরআনের সম্মান পরিপন্থী কাজ বলে মনে করতেন।

একবার কিছু লোকের কুরআন মজীদের হাদীয়া গ্রহণ করতে শুনে তিনি 'ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করেন।[৩৪]

তিনি যুবকদের নিত্য-নতুন চাল-চলন ও রং-ঢং মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার কা'বার তাওয়াফের সময় কিছু কুরাইশ যুবকের স্বাচ্ছন্দময় নতুন স্টাইলের পোশাক দেখে তাদেরকে ভীষণ তিরস্কার করেন। তাদেরকে বলেন : তোমরা এমন পোশাক পরেছো যা তোমাদের বাপ-দাদারা কখনো পরেননি। আর এমন ভঙ্গিতে চলছো যে নর্তকীরাও তেমন চলতে পারে না।[৩৫]

তিনি 'ঈদের দিনে নির্মল আনন্দ-উল্লাস করা প্রয়োজন মনে করতেন। এ দিন বাড়ীর সব মহিলা, এমন কি দাসী-বাঁদীদের হাতে-পায়ে মেহেদী লাগানোর তাকিদ দিতেন। বলতেন : আজ 'ঈদের দিন। তোমরা এটা কর।[৩৬]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি প্রায় প্রতি বছর হজ্জ আদায় করতেন। শেষ বয়সেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ আবেগ-আগ্রহকে অতি সুন্দরভাবে কবুল করেছেন। হিজরী ১০৬ সনের জিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ সন্ধ্যায় তিনি তাঁর জীবনের ৪০তম হজ্জ আদায়কালে 'আরাফাত থেকে মুযদালিফায় রওয়ানা হন। মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও 'ঈশার নামায আদায়ের পর একটু বিশ্রামের জন্য মাটিতে একটু পাশ দেন। এ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এভাবে চিরদিনের জন্য তিনি পবিত্র ভূমিতে থেকে যান। সূর্যোদয়ের পর দাফনের উদ্যোগ নেওয়া হলো; কিন্তু মানুষের অসম্ভব ভীড়ের কারণে মরদেহ সরানো সম্ভব হলো না। অবশেষে মক্কার আমীর ইবরাহীম ইবন হিশাম আল-মাখযূমী কাফন-দাফনের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে পুলিশ পাঠান। জানাযায় অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়। ভীড়ের চোটে মানুষের কাপড়-চোপড় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

---

৩৩. হিলয়াতুল আওলিয়া-৪/১১; সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন-২৯৮
৩৪. তাবাকাত-৫/৩৯৫
৩৫. প্রাগুক্ত
৩৬. প্রাগুক্ত-৫/৩৯৩

অনেকের হাত-পা ভেঙ্গে যায়। জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তৎকালীন খলীফাতুল মুসলিমীন হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকও ছিলেন।[৩৭]

প্রখ্যাত তাবি'ঈ 'আতা' হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি মনে করি তাউস জান্নাতের অধিকারীদের একজন।[৩৮]

তাউস বলতেন : সত্যনিষ্ঠ কথা সাদাকা বা দানস্বরূপ।[৩৯] তিনি আরো বলতেন : চটকানো আটার জন্য যতটুকু লবণের প্রয়োজন হয়, দুনিয়ায় ততটুকুই যথেষ্ট।[৪০]

'আবদুল্লাহ বলতেন : আমার পিতা বাহনের পিঠে আরোহণ করার সময় পাঠ করতেন ঃ[৪১]

اللهم لك الحمد، هذا من فضلك، ونعمتك علينا فلك الحمد ربنا. سبحان الذى سخَّرلَنَا هذا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ.

হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার। এটা আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ ও দান। সুতরাং হে আমাদের প্রভু! সকল প্রশংসা আপনার। 'তিনি কতনা পবিত্র, যিনি এই বাহনকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না।'

তিনি বজ্রপাতের শব্দ শুনে বলতেন।[৪২] سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ.

তিনি কত না পবিত্র যাঁর তাসবীহ তুমি পাঠ করছো।

'আবদুল্লাহ বলেন, তিনি আরো বলতেন : একজন মানুষের অধিকারে যেসব ধন-সম্পদ থাকে তা ব্যয় করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করাকে বলে- اَلْبُخْلُ। আর কোন মানুষ যদি অন্যের ধন-সম্পদ অবৈধ পথে তার অধিকারে চলে আসার কামনা করে তাহলে তাকে বলে- اَلشُّحُّ।[৪৩]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের সময় যে দু'আটি পাঠ করতেন তাউস সেটি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দু'আটি এই:

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ.

---

৩৭. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/৩৩৩; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯০
৩৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০
৩৯. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৫৮
৪০. প্রাগুক্ত-৩/২৮৯
৪১. হিলয়াতুল আওলিয়া-৪/৫
৪২. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৬৬
৪৩. হিলয়াতুল আওলিয়া-৪/৬

اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِي مَاقَدَّمْتُ وَتَأَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَمَاأَعْلَنْتُ،

أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ. (متفق عليه)

– হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা আপনার। আপনি সত্য, আপনার বাণী সত্য, আপনার অঙ্গীকার সত্য, আপনার সাক্ষাৎ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য, মুহাম্মাদ সত্য এবং সকল নবী সত্য।

হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনার উপর ভরসা করেছি, আপনার দিকে ফিরে এসেছি, আপনার সাথে বিবাদ করেছি এবং আপনার কাছে বিচার দিয়েছি। সুতরাং আপনি আমার আগে-পিছের গোপন ও প্রকাশ্য সকল পাপ ক্ষমা করে দিন।

আপনি প্রথম, আপনি শেষ, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনি ছাড়া কোন কৌশল, কোন শক্তি নেই।

'আতা' ইবন আবী রাবাহ (রহ)

বিখ্যাত মুহাদ্দিছ তাবি'ঈ হযরত 'আতা'র (রহ) পিতার নাম আবু রাবাহ আসলাম। ইয়ামানের জানাদ একটি রত্নগর্ভা স্থান বলে খ্যাত। হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকালের সূচনাপর্বে, মতান্তরে খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালের শেষের দিকে এই জানাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেন[১] এবং মক্কায় বেড়ে ওঠেন। আলে আবী মায়সারা ইবন খুছায়ম আল-ফিহ্রীর মাওলা বা আযাদকৃত দাস ছিলেন।[২] ডাকনাম ছিল আবূ মুহাম্মাদ। সীরাত বিশেষজ্ঞরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৩] তিনি ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ, শুদ্ধ ও মিষ্টভাষী এবং অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এক মনীষী।[৪]

'আতা তাঁর শৈশবকালেই রাত-দিনের সবটুকু সময়কে তিনভাগে ভাগ করে নেন। এক ভাগে স্বীয় মনিবের সেবা ও তার প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম সম্পাদন করতেন। আরেক ভাগ প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাতে ব্যয় করতেন। আরেক ভাগ জ্ঞান অর্জনের জন্য নির্ধারণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) যেসব 'আলিম সাহাবী সে সময় জীবিত ছিলেন, তিনি নিয়মিতভাবে তাঁদের নিকট যাতায়াত করতেন। জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর এমন প্রবল আগ্রহ দেখে মনিব তাঁর প্রতি সদয় হন। তিনি মনে করেন, তাঁকে সুযোগ দিলে ভবিষ্যতে তিনি একজন বড় 'আলিম হবেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে বিশেষ অবদান রাখতে পারবেন। এমন একটি মহৎ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি 'আতাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। আর তখন থেকেই মসজিদুল হারামকে তিনি আবাসস্থল বানিয়ে নেন। সেখানে বিশ্রাম নেন, সেখানের কোন দরসের হালকায় বসে জ্ঞান আহরণ করেন এবং সেখানেই আল্লাহর 'ইবাদাতে মগ্ন হয়ে পড়েন।[৫]

সুউচ্চ মর্যাদা, পার্থিব ভোগ-বিলাস বিমুখতা এবং আল্লাহর প্রতি শক্ত ঈমান ও ভীতির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন প্রথম স্তরের তাবি'ঈদের অন্যতম। ইবন হাজার 'আসকালানী বলেন, তিনি ফিকাহ্, অন্যান্য জ্ঞান, তাকওয়া-পরহিযগারী এবং মহত্ব ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের মধ্যে পরিগণিত। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম ও বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ ছিলেন।[৬] ইমাম নাওবী বলেন, তিনি মক্কার মুফতী এবং বিখ্যাত ইমামদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। অনেক বড় বড় ইমাম তাঁর অগাধ জ্ঞানের স্বীকৃতি দান করেছেন।[৭] ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, জ্ঞানের ভাণ্ডার আল্লাহ্ তাঁকে দান করেন যাঁকে তিনি ভালোবাসেন। জ্ঞান

---

১. তাবাকাত-৫/৪৬৭
২. ইবন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬১; সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৯
৩. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৩
৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮
৫. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবিঈন-১৩
৬. তাহযীবুত তাহযীব-৭/২০৩
৭. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৩

যদি কারো সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হতো তাহলে উচ্চবংশ, মতান্তরে নবীর (সা) বংশই তার অগ্রাধিকারী হতো। কিন্তু 'আতা' ছিলেন হাবশী দাস, ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব ছিলেন নাওবী, আল-হাসান আল-বসরী ও ইবন সীরীন ছিলেন দাস।[৮] ইমাম যাহাবী তাকে মক্কার মুফতী, মুহাদ্দিছ ও নেতৃস্থানীয় 'আলিম বলে উল্লেখ করেছেন।[৯] ইবন আবী লায়লা তাঁকে মক্কার ফকীহ্ বলেছেন।[১০]

হযরত 'আতা' সম্পর্কে একবার মক্কাবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ তোমাদের মধ্যে 'আতগ্না' ইবন আবী রাবাহ্ কেমন ছিলেন? তারা বলেছিল ঃ তিনি ছিলেন সুস্থতার মত, না হারানো পর্যন্ত যার গুরুত্ব বুঝা যায় না।[১১] ইমাম আল-আওযা'ঈ বলতেন, 'আতা' যখন ইনতিকাল করেন তখন তিনি মানুষের নিকট ধরাপৃষ্ঠের সবচেয়ে বেশি প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন।[১২] তিনি দুইশো সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন।[১৩] 'আবদুর রহমান ইবন মাহদী বলেন : আমি মক্কায় 'আতা' ইবন আবী রাবাহ, ইরাকে মুহাম্মাদ ইবন সীরীন ও শামে রাজা' ইবন হায়ওয়া—এ তিনজনের মত আর কাউকে দেখিনি।[১৪] সালামা ইবন কুহায়ন বলতেন, আমি 'আতা', তাউস ও মুজাহিদ ছাড়া এমন কাউকে দেখিনি যে তাঁর জ্ঞানের দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করেছেন।[১৫] সা'ঈদ ইবন আবী 'আরূবা বলতেন ঃ[১৬]

إذا اجتمع أربعة لم أبال بمن خالفهم الحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم وعطاء، هؤلاء أئمة الأنصار.

'আল-হাসান আল-বসরী, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ, 'আতা' ইবন আবী-রাবাহ্– এ চারজন যখন কোন বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন তখন কেউ তাঁদের বিরোধিতা করলে আমি তার পরোয়া করিনে। এঁরা হলেন আনসারদের ইমাম।'

কুরআন, হাদীছ, ফিকাহ্ তথা সকল ইসলামী জ্ঞানে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। হাদীছের বিখ্যাত হাফিজদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে প্রথম স্তরের হুফ্ফাজে হাদীছের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইবন সা'দ তাঁকে 'কাছীরুল হাদীছ' বা বহু হাদীছের ধারক বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি প্রায় দু'শো মহান সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন এবং তাঁদের অনেকের নিকট থেকে হাদীছ শুনার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। যে সকল মহান সাহাবীর নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন এবং যাঁদের সূত্রে হাদীছ

---

৮. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৯
৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮
১০. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/৪১৬
১১. প্রাগুক্ত-২/২৩১, ৩/১৬৯
১২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮; তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৩
১৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৫১, টীকা-২,
১৪. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/২৩১
১৫. তাবাকাত-৫/৪৬৭
১৬. তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৩
১৭. তাবাকাত-৫.৪৫৭, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮

বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবায়র (রা), মু'আবিয়া (রা), উসামা ইবন যায়দ (রা), জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা), যায়দ ইবন আরকাম (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন সায়িব আল-মাখযূমী (রা), 'আকীল ইবন আবী তালিব (রা), 'আমর ইবন আবী সালামা (রা), রাফি' ইবন খাদীজ (রা), আবুদ দারদা' (রা), আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা), আবূ হুরাইরা (রা), উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) ও উম্মু হানী (রা)।[১৮]

অনেক তাবি'ঈর নিকট থেকেও তিনি হাদীছ শুনেন। আবূ সালিহ্ আস সাম্মান, সালিম ইবন শাওয়াল, সাফওয়ান ইবন ইয়া'লা ইবন উমাইয়্যা, 'উবায়দ ইবন 'উমায়র, 'উরওয়া ইবন যুবায়র, ইবন আবী মুলায়কা, 'ইমাদ ইবন আবী 'আম্মার, আবুয্ যুবায়র, মূসা ইবন আনাস, হাবীব ইবন আবী ছাবিত প্রমুখ তাবি'ঈ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেন এবং হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন তাঁদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। বিশেষ কয়েকজনের নাম এই : আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ, যুহ্‌রী, মুজাহিদ, আইউব আস-সিখতিয়ানী, আ'মাশ, আওয়াযা'ঈ, ইবন জুরায়জ, আবুয্ যুবায়র, হাকাম ইবন 'উতবা, আবূ হানীফা, হুসায়ম আল-মু'আল্লিম, হাম্মাম ইবন ইয়াহইয়া, জারীর ইবন হাযিম, 'আমর ইবন দীনার, মালিক ইবন দীনার, কাতাদা ও আরো অনেকে।[১৯]

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছের এত সম্মান দিতেন যে, হাদীছ আলোচনার মাঝখানে কথা বলা দারুণ অপছন্দ করতেন। কেউ কথা বললে ভীষণ ক্ষুব্ধ হতেন। মু'আয ইবন সা'ঈদ আল-আ'ওয়ার বর্ণনা করেন। একদিন আমরা 'আতা'র নিকট বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি হাদীছ বর্ণনা করলো। অন্য এক ব্যক্তি মাঝখানে কিছু বলে উঠলো। 'আতা' ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন ঃ এটা কেমন নৈতিকতা, কেমন স্বভাব! আল্লাহর কসম! মানুষ এ জন্য হাদীছ বর্ণনা করে যেন তা দ্বারা জ্ঞান অর্জিত হয়। যদি কেউ কোন হাদীছ বর্ণনা করে– যদিও সে হাদীছটি আমার কাছ থেকেই শুনেছে, আমি তা চুপচাপ এমনভাবে শুনে যাই যেন বর্ণনাকারী মনে করে এটি আমি এই প্রথম শুনছি। এর পূর্বে হাদীছটি আর কখনো শুনিনি। 'আমর ইবন 'আসিম বলেন, আমি 'আতা'র এ কথাটি 'আবদুল্লাহ ইবন মুবারাকের নিকট বর্ণনা করলে তিনি শুনে বললেন, আমি যতক্ষণ না নিজে গিয়ে এই মেহেদীর মুখ থেকে কথাটি নিজ কানে শুনবো, আমার পায়ের জুতো খুলবোনা।[২০] তিনি যেমন রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ বর্ণনা করতেন তেমনি হুবহু তা অনুসরণও করতেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহ) বলেছেন :[২১]

ليس فى التابعين أحد اكثر اتباعا للحديث من عطاء .

---

১৮. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬১; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮, তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৩
১৯. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬১; তাহযীবুত তাহযীব-৪/১৯৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/১২১; তাহ্যীবুল আসমা'
২০. তাবাকাত-৫/৪৬৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/১২১
২১. তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৩

- তাবি'ঈদের মধ্যে 'আতা'র চেয়ে বেশী হাদীছের অনুসরণকারী দ্বিতীয় কেউ নেই। ইমাম বাকির লোকদের বলতেন, যতটুকু সম্ভব তোমরা 'আতা' থেকে হাদীছ গ্রহণ কর।[২২]

অন্যান্য শাস্ত্রে বিচরণ থাকলেও তাঁর বিশেষ শাস্ত্র ছিল ফিকাহ্। তাঁর ফিকাহ্র জ্ঞানের ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিছ, ফকীহ্ ও ইমাম একমত। ইবন হাজার লিখেছেন, ফিকাহ্তে তিনি নেতৃস্থানীয় তাবি'ঈদের মধ্যে ছিলেন।[২৩] রাবী'আ, যিনি নিজেই একজন বড় ফকীহ্ ছিলেন, বলতেন, ফাতওয়ার ক্ষেত্রে 'আতা' ছিলেন সকল মক্কাবাসীর উপরে। মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ আদ দীবাজ বলতেন, আমি 'আতা'র চেয়ে কোন ভালো মুফতী দেখিনি।[২৪] তাঁর মজলিসে আল্লাহর যিক্র বন্ধ হতো না। কোন প্রশ্ন করা হলে সুন্দর জবাব দিতেন। ইমাম আবূ হানীফা বলতেন, আমি 'আতা'র চেয়ে ভালো আর কাউকে পাইনি।[২৫] অনেক বড় বড় সাহাবী পর্যন্ত তাঁর ফিকাহ্র জ্ঞানের স্বীকৃতি দান করেছেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) ও হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) যখন মক্কায় যেতেন এবং বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে জানার জন্য মানুষ তাঁদের নিকট ভিড় করতো তখন তাঁরা বলতেন : ওহে মক্কাবাসী! তোমাদের এখানে 'আতা' বর্তমান থাকতে তোমরা আমার কাছে ভিড় করেছো?[২৬] ইমাম আছ-ছাওরী বর্ণনা করেছেন। একবার 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার মক্কায় আসলেন। মানুষ বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য ভিড় করলো। তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন : তোমাদের মধ্যে 'আতা' থাকতে তোমরা আমার জন্য প্রশ্নসমূহ জমা করে রাখ?[২৭]

তাঁর সময়ে মক্কার ইফতার মসনদের অলঙ্কার হিসেবে মাত্র দুই ব্যক্তি গণ্য হতেন। একজন তিনি এবং অন্যজন মুজাহিদ। তবে দুইজনের মধ্যে প্রাধান্য ছিল তাঁর।[২৮] ইবন খাল্লিকান বলেছেন, সে যুগের মক্কার ফাতওয়া তাঁদের দুইজনের নিকট গিয়ে শেষ হয়েছে।[২৯] রাবী'আ বলেছেন, ফাতওয়ার ক্ষেত্রে 'আতা' মক্কাবাসীদের সকলকে ডিঙ্গিয়ে গেছেন।[৩০]

তাঁর এত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ফাতওয়া দানের ব্যাপারে দারুণ সতর্ক ছিলেন। কখনো কোন মাসআলায় নিজের মত প্রকাশ করতেন না। কোন মাসআলায় যদি কুরআন-হাদীছের কোন দলীল প্রমাণ তাঁর জানা না থাকতো তিনি সাফ বলে দিতেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। 'আবদুল 'আযীয ইবন রাফী' বলেন, একবার 'আতা'র নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাব দিলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। লোকেরা বললো, আপনার মতের ভিত্তিতেই জবাব দিন না কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর সামনে আমার লজ্জা হয় এই ভেবে যে, তাঁর যমীনে আমার সিদ্ধান্তের অনুসরণ করা হবে।[৩১]

---

২২. প্রাগুক্ত-১/৩৩৪
২৩. তাহযীবুত তাহযীব-৪/২০৩
২৪. প্রাগুক্ত-৭/২০১
২৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮
২৯. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬১
৩০. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৪
৩১. তাহযীবুত তাহযীব-৭/২০৩

তবে একজন ফকীহ্ ও মুফতীকে নিজস্ব মতামত ও সিদ্ধান্ত অবশ্যই দান করতে হয়। তিনি সবসময় নিজের মতামত ব্যক্ত করার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারেন না। এ কারণে 'আতা' যখন কিয়াস বা অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ফাতওয়া দিতেন তখন তা স্পষ্ট করে বলে দিতেন। ইবন জুরায়জ বলেন, 'আতা' যখন কোন বিষয় বর্ণনা করতেন তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম এটা 'ইলম না সিদ্ধান্ত? যদি তিনি হাদীছের ভিত্তিতে বলতেন তাহলে তা যেমন বলে দিতেন, তেমনিভাবে কিয়াস ও সিদ্ধান্ত হলে তাও উল্লেখ করতেন।[৩২]

হজ্জের আহকাম ও বিধি-বিধানের তিনি একজন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম মুহাম্মাদ আল-বাকির বলতেন, হজ্জের বিষয়ে 'আতা'র চেয়ে বেশি জানা লোক কেউ আর বেঁচে নেই।[৩৩] উমাইয়্যা শাসনকালে হজ্জের সময় ঘোষণা দেওয়া হতো যে, হজ্জের মাসআলার ব্যাপারে 'আতা' ইবন আবী রাবাহ্ ছাড়া আর কেউ ফাতওয়া দিতে পারবে না।[৩৪] কাতাদা বলতেন, হজ্জের বিধি-বিধান 'আতা' সবচেয়ে বেশী জানেন।[৩৫] ইবনুল জাওযী বর্ণনা করেছেন ঃ উমাইয়্যা খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক একবার তাঁর দুই ছেলেকে সংগে নিয়ে 'আতা'র নিকট যান। তিনি তখন নামাযে দাঁড়িয়ে। তাঁরা পাশে বসলেন। নামায শেষ করে তিনি পাশে বসা খলীফার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। তাঁরা হজ্জের বিধি-বিধান ও রীতি পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। 'আতা' তাঁদের দিকে মুখ না ঘুরিয়ে পিছনে রেখেই সব প্রশ্নের জবাব দিলেন। প্রশ্নোত্তর শেষ হলে সুলায়মান তাঁর দুই ছেলেকে বললেন : ওঠো, আমরা জ্ঞান অর্জনের জন্য এখানে এসেছি। এই কালো দাসের নিকট আমাদের এ অপমান আমি কখনো ভুলবো না।[৩৬]

এরপর খলীফা তাঁর পুত্রদ্বয়কে সংগে নিয়ে সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সা'ঈর উদ্দেশ্যে চললেন। চলার পথে তাঁরা শুনতে পেলেন, ঘোষকরা ঘোষণা করছে, 'ওহে মুসলিম জনগণ! হজ্জের মওসুমে এখানে একমাত্র 'আতা ইবন আবী রাবাহ্ ছাড়া আর কেউ জনগণের মধ্যে ফাতওয়া দিতে পারবে না। তাঁকে পাওয়া না গেলে 'আবদুল্লাহ ইবন আবী নাজীহ্ ফাতওয়া দিবেন।' এ ঘোষণা শুনে খলীফার এক পুত্র পিতার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীনের একজন ওয়ালী এ ঘোষণা কিভাবে দিতে পারেন যে, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ্ ছাড়া আর কেউ ফাতওয়া দিতে পারবে না? তা ছাড়া আমরা এমন লোকের নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞেস করতে কেনই বা গেলাম যিনি খলীফাকে কোন আমলই দিলেন না– যথাযথ সম্মান প্রদর্শন তো দূরের কথা।

খলীফা সুলায়মান তাঁর ছেলেকে বললেন : বেটা! এই যাঁকে তুমি দেখলে, যাঁর সামনে

---

৩২. তাবাকাত-৫/৩২৫
৩৩. প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮
৩৪. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৪
৩৫. তাবাকাত-৫/৪৬৭
৩৬. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৯

আমাদেরকে এমন অপদস্ত হতে হলো, তিনি 'আতা' ইবন আবী রাবাহ। মসজিদুল হারামের তিনি মুফতী। এই মর্যাদাপূর্ণ আসনে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) উত্তরাধিকারী। তারপর তিনি আরো বলেন : 'বেটা! জ্ঞান অর্জন কর। জ্ঞানের দ্বারাই নীচ লোকেরা সম্মানীয় হয়, উদাসীনরা সতর্ক হয় এবং দাসেরা রাজাদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়।' উল্লেখ্য যে, 'আতা ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ দাস।[৩৭]

অতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষ যাদের হজ্জের মওসুমে তাঁকে দেখার, তাঁর সাথে থাকার এবং তাঁর খিদমত করার সুযোগ ঘটতো তারাও হজ্জের মাসলা-মাসাইলে অভিজ্ঞ হয়ে যেত। এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা আছে। ইমাম আবু হানীফা বলতেন, হজ্জের সময় একজন নাপিত, যে 'আতা'-কে দেখেছিল, আমাকে পাঁচটি স্থানে হজ্জের বিধান শিখিয়েছেন। মাথার চুল মুড়ানোর আগে আমি দাম-দস্তুর ঠিক করতে চাইলাম। সে বললো, 'ইবাদাতে কোন শর্ত করা যায় না। বসে যান, হাজামত শেষ হোক। আমি সোজা কিবলার দিকে মুখ না করে একটু বেঁকে বসলাম। সে কিবলামুখী হয়ে বসতে ইঙ্গিত করলো। আমি বাম দিক থেকে মাথা মুড়াতে চাইলাম। সে বললো, ডান দিক ঘুরান। আমি ডান দিক ঘুরিয়ে দিলাম, সে মুড়াতে লাগলো। আমি চুপচাপ বসে থাকলাম। সে বললো, তাকবীর পাঠ করতে থাকুন। হাজামত শেষ হলে আমি যাবার জন্য উঠলাম। সে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছেন? আমি বললাম, আমার আবাসস্থলে। সে বললো, প্রথমে দুই রাকা'আত নামায আদায় করুন, তারপর যান। আমার ধারণা হলো, এই নাপিতের এ রকম মাসআলা জানার কথা নয়– যদি না সে অন্য কারো নিকট থেকে জেনে থাকে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমাকে যে কথাগুলি শিখালে, তা কোথা থেকে শিখেছো? সে বললো, আমি 'আতা' ইবন আবী রাবাহ্‌কে এমন করতে দেখেছি।[৩৮]

'আতা'র মধ্যে 'ইলমের সাথে সাথে 'আমলও ছিল। যুহ্‌দ ও তাকওয়ার দিক দিয়ে তাবি'ঈনের মধ্যে তিনি বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিলেন। ইবন হাজার লিখেছেন যে, 'ইলম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তাবি'ঈদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়।[৩৯] ইমাম আয-যাহাবী লিখেছেন, জ্ঞান, পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্যের প্রতি বৈরাগ্য ও আল্লাহর 'ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে 'আতা'র গুণ-বৈশিষ্ট্য অনেক।[৪০]

'আতা'র ঈমান ছিল অতি উঁচু স্তরের। এ সম্পর্কে 'আবদুর রহমান বলেন, গোটা মক্কাবাসীর ঈমান সম্মিলিতভাবে 'আতা'র ঈমানের সমান ছিল না।[৪১]

তাঁর 'ইবাদাত-বন্দেগীর অবস্থা ইবন জুরায়জের একটি মন্তব্য দ্বারা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, বিশ বছর মসজিদ ছিল 'আতা'র বিছানা।[৪২]

---

৩৭. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবিঈন, পৃ. ১১-১২
৩৮. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬১-২৬২
৩৯. তাহযীবুত তাহযীব-৭/২০৩
৪০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১৯৮
৪১. তাবাকাত-৫/৩৪৬
৪২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১৯৮; তাহযীবুত তাহযীব-৭/২০২

প্রতি রাতে তাহাজ্জুদে দুইশ' অথবা তার চেয়ে বেশী আয়াত তিলাওয়াত করতেন। বেশী 'ইবাদাতের কারণে কপালে সিজদার দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।[৪৩] কোন একটি মুহূর্ত তাঁর আল্লাহর স্মরণ ছাড়া কাটতো না। 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবন 'উছমান বর্ণনা করেছেন, আমি 'আতা'র চেয়ে ভালো কোন মুফতী দেখিনি। তাঁর মজলিসে সব সময় আল্লাহর স্মরণ চলতে থাকতো এবং লোকেরা জ্ঞানের আলোচনা ও তর্ক-বাহাছ করতো। 'আতা' যখন কিছু বলতেন অথবা কোন প্রশ্ন করা হতো, খুব সুন্দরভাবে জবাব দিতেন।[৪৪]

তিনি মক্কায় অবস্থান করতেন। এ কারণে কোন বছরই তাঁর হজ্জ বাদ পড়তো না। তিনি সত্তর বার হজ্জ আদায় করেছেন বলে জানা যায়।[৪৫] হাদীছ অনুসরণের ব্যাপারে অত্যধিক যত্নবান ছিলেন। ইমাম শাফি'ঈ বলেন, তাবি'ঈদের মধ্যে 'আতা'র চেয়ে বেশি হাদীছের অনুসারী কেউ ছিলেন না।

নির্জনবাসের প্রতি তাঁর স্বভাবগত ঝোঁক ছিল। মানুষের সাথে বেশী মেলামেশা পছন্দ করতেন না। দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতেন। যখন কেউ ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইতো, জিজ্ঞেস করতেন সে কি উদ্দেশ্যে এসেছে। আগন্তুক যদি বলতো, আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। জবাবে তিনি বলতেন, আমার মত মানুষের সাথে সাক্ষাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তারপর বলতেন, এ যুগটা কেমন নোংরা হয়ে গেছে যে, আমার মত মানুষের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসা হয়। কিন্তু আল্লাহর যিক্র হয় এমন ভালো মজলিস তাঁর প্রিয় ছিল। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিসে বসে যেখানে আল্লাহর যিক্র হয়, আল্লাহ এই মজলিসকে তাঁর দশটি বাতিল মজলিসের কাফ্ফারা বানিয়ে দেন।[৪৬]
যখন কোন মজলিসে বসতেন তখন বেশীরভাগ সময় চুপচাপ থাকতেন। ইসমা'ঈল ইবন উমাইয়্যা বলেন, 'আতা' সাধারণতঃ চুপচাপ থাকতেন। যখন কোন কিছু বলতেন তখন আমাদের মনে হতো তাঁর উপর কোন ইলহাম হচ্ছে।[৪৭]
হযরত 'আতা' (রহ) বলতেন : তোমাদের পূর্ববর্তীরা অহেতুক কথা পছন্দ করতেন না। আল্লাহর কিতাব থেকে যা কিছু পাঠ করা হয়, আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার এবং জীবন জীবিকার প্রয়োজনে যেসব কথা বলা হয়, তা ছাড়া আর সবই তাঁরা অহেতুক কথা বলে মনে করেছেন। তোমাদের ডান ও বাম পাশে যে দুইজন কাতিব ফিরিশতা তোমাদের মুখ থেকে বের হওয়া সব কথা লিখে রাখছেন তা কি তোমরা অস্বীকার কর? তোমাদের কি শরম হয় না, তাতে এমন সব কথা লেখা থাকবে যা তোমাদের দীন ও দুনিয়ার সাথে কোনভাবে সম্পৃক্ত নয়, আর সেই দফতর তোমাদের সামনে মেলে ধরা হবে?[৪৮]

---

৪৩. তাবাকাত-৫/৩৪৬
৪৪. প্রাগুক্ত-৫/৩৪৫
৪৫. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৩৩; ওয়াফাযাতুল আ'য়ান-৩/২৬৩
৪৬. মুখতাসার সিফাতুস সাফওয়া-১৮৫
৪৭. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/৯৮; তাহযীবুল আসমা'-১/৩৩৪
৪৮. সিফাতুস সাফওয়া-২/১২০

'উছমান ইবন 'আতা আল-খুরাসানী বর্ণনা করেছেন। একবার আমি আমার পিতার সাথে খলীফা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা যখন দিমাশ্কের কাছাকাছি তখন একটি কালো গাধার উপর আরোহী এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলাম। তাঁর গায়ে মোটা কাপড়ের জীর্ণশীর্ণ একটি জোব্বা, মাথার সাথে লেপ্টে থাকা একটি টুপি মাথায় এবং তার জিনের পা দানি দু'টি কাঠের। তাঁর এমন বিচিত্র অবস্থা দেখে আমার হাসি পেল। আমি পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম : এই বৃদ্ধ কে? তিনি ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে বললেন : চুপ কর। ইনি হিজাযের ফকীহ্দের নেতা 'আতা' ইবন আবী রাবাহ। তিনি যখন আমাদের কাছাকাছি এলেন তখন আমার পিতা তাঁর খচ্চরের পিঠ থেকে এবং তিনি তাঁর গাধার পিঠ থেকে নামলেন। তারপর উভয়ে কোলাকুলি ও কুশল বিনিময় করলেন। তারপর দু'জন নিজ নিজ বাহনের পিঠে উঠলেন এবং দিমাশ্কে হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকের প্রাসাদের দরজায় উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁরা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পেলেন। তাঁরা বের হয়ে আসার পর আমি আমার পিতার নিকট ভিতরের ঘটনাবলী জানতে চাইলাম। তিনি বললেন : হিশাম যখন জানতে পেলেন, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ দরজায় অপেক্ষা করছেন তখন খুব তাড়াতাড়ি তাঁকে ভিতরে ঢোকার অনুমতি দিলেন। আল্লাহর কসম! আমি তাঁরই কল্যাণে ভিতরে ঢোকার সুযোগ লাভ করেছি। হিশাম 'আতা'কে দেখেই বলতে লাগলেন :

মারহাবান, মারহাবান– এখানে, এখানে আসুন! এখানে, এখানে বসুন! তারপর তাঁকে ধরে নিজের আসনে এমনভাবে বসালেন যে, হিশাম ও 'আতা'র হাঁটু দু'টি একটি অপরটিকে স্পর্শ করছিল। সেই মজলিসে তখন খিলাফতের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কোন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তাঁরা সবাই 'আতা'র উপস্থিতিতে চুপ হয়ে গেলেন।

একটু স্থির হয়ে বসার পর হিশাম 'আতা'কে লক্ষ্য করে বললেন : আবূ মুহাম্মাদ! আপনার প্রয়োজনের কথা একটু বলুন!

'আতা' : হে আমীরুল মু'মিনীন! হারামায়নের (মক্কা-মদীনা) আধাবাসীরা হলো আল্লাহর আহ্ল ও তাঁর রাসূলের প্রতিবেশী। তাঁদের বেতন-ভাতা আপনি বণ্টন করুন! হিশাম বললেন : হাঁ। তারপর তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে মক্কা-মদীনার অধিবাসীদের ভাতা বন্টনের বিষয়টি নোট করে নিতে আদেশ করেন। তারপর তিনি 'আতা'কে লক্ষ্য করে আবার বলেন : আবূ মুহাম্মাদ! আর কোন প্রয়োজন আছে কি?

'আতা' : আমীরুল মু'মিনীন! হিজায ও নাজদের অধিবাসীরা হলো আরবের মূল, ইসলামের নেতা ও পরিচালক। বায়তুল মালে জমা হওয়া তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদ তাদের মধ্যে বণ্টন করা হোক। হিশাম এ প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাঁর সেক্রেটারীকে নোট করে নিতে বললেন। তারপর আবার বললেন : আবূ মুহাম্মাদ! আপনার আর কোন কথা আছে কি?

'আতা' : হাঁ, আছে! আমাদের সীমান্ত রক্ষীরা শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে। তারা সেখান থেকে সরে এলে অথবা ধ্বংস হলে শত্রুরা মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করবে। সুতরাং আপনি তাদের বেতন-ভাতা তাদের নিকট পৌঁছে দিবেন।

খলীফা তাঁর প্রস্তাব মেনে নিয়ে সেক্রেটারীকে বিষয়টি লিখে রাখার নির্দেশ দেন। তারপর খলীফা আবার জানতে চান : আবূ মুহাম্মাদ! আর কোন প্রয়োজনীয় কথা আছে কি?

'আতা' : হাঁ, আছে। আপনার খিলাফতের যিম্মীদের উপর তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাবেন না। তাদের নিকট থেকে যে জিযিয়া আদায় করা হয়, তাই হচ্ছে আপনাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা। খলীফা তাঁর সেক্রেটারীকে বললেন : লিখ, যিম্মীদের উপর তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপানো যাবে না।

খলীফা আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবূ মুহাম্মাদ! আপনার আর কোন কথা আছে কি?

বললেন : হাঁ, আছে। হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার নিজের ব্যাপারে আপনি আল্লাহকে ভয় করুন! জেনে রাখুন, আপনাকে একাকী সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনি একাকী মৃত্যুবরণ করবেন। আপনাকে একাকী উঠানো হবে এবং এককভাবে আপনার হিসাব নেওয়া হবে। আল্লাহর কসম! আপনার প্রিয়জনদের কেউ আপনার সাথে থাকবে না।– একথা শোনার পর হিশাম ডুকরে কেঁদে উঠে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যান।

'আতা' আল-খুরাসানী বলেন : হিশামকে সেই অবস্থায় রেখে 'আতা ইবন আবী রাবাহ উঠে পড়েন এবং আমিও তাঁর সাথে উঠি। যখন আমরা সদর দরজার কাছাকাছি ঠিক সেই সময় একটি লোক একটি থলে হাতে করে পিছন দিক থেকে আমাদের কাছে ছুটে আসে। আমি জানিনে তার মধ্যে কি আছে। লোকটি 'আতা' ইবন আবী রাবাহকে বলে: আমীরুল মু'মিনীন এই থলেটি আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।

তিনি বলেন : অসম্ভব। তারপর এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِىَ الاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

- আমি তোমদের কাছে এর কোন প্রতিদান চাইনা। আমার প্রতিদান দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের।

আল্লাহর কসম! তিনি খলীফার নিকট প্রবেশ করে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে কোন কিছু পানাহার তো দূরের কথা এক ফোঁটা পানিও পান করেননি।[৪৯]

একদিন আল-হাসান আল-বসরী (রহ) তাঁর এক মজলিসে বললেন : মুনাফিকের ব্যাপারে তিনটি জিনিস জেনে নাও। ১. যদি কথা বলে, মিথ্যা বলে। ২. তাঁর নিকট কোন কিছু গচ্ছিত রাখলে আস্থা ভঙ্গ করে। ৩. অঙ্গীকার করলে পালন করে না। একথা হযরত 'আতা'র (রহ) কানে গেলে বললেন : য়া'কূবের (আ) ছেলেদের মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তারা তাঁকে মিথ্যা বলেছে, আমানাতে খিয়ানাত করেছে এবং তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে নুবুওয়াত দিয়েছেন। হযরত আল-হাসান একথা শুনে উচ্চারণ করেন :[৫০]

---

৪৯. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবিঈন-১৮-২১; আল-'ইকদ আছ-ছামীন ফী তারীখ আল- বালাদ আল-আমীন-৬/৮৯-৯০

৫০. সূরা ইউসুফ-৭৬

فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ .

প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপর রয়েছে এক জ্ঞানীজন।[৫১]

ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেন : 'আতা' (রহ) তাঁর দু'আর মধ্যে বলতেন : হে আল্লাহ দুনিয়াতে আমার অজানা অচেনা স্থানে মরণকালে আমার কষ্টের সময় এবং কবরে আমার একাকীত্বের সময় আমার প্রতি দয়া ও করুণা করুন।[৫২]

হযরত 'আতা' (রহ) ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ, এক চক্ষুহীন, শ্বাসকষ্টের রোগী, পক্ষাঘাতগ্রস্ত এক ল্যাংড়া মানুষ। পরবর্তীকালে তিনি একেবারেই অন্ধ হয়ে যান। সুলায়মান ইবন রাফী' বলেন : আমি একবার মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম মানুষ এক ব্যক্তিকে ঘিরে জড়ো হয়ে আছে। পরে দেখতে পেলাম 'আতা' ইবন আবী রাবাহ্ বসে আছেন। একটি কালো কাকের মত তাঁকে দেখাচ্ছে।[৫৩] তাঁর মা বারাকাও ছিলেন একজন কৃষ্ণাঙ্গী।[৫৪]

ইমাম আয-যাহাবী বলেছেন, সঠিক বর্ণনা মতে হিজরী ১১৪ সনের রমাদান মাসে তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করেন। অনেকে হিজরী ১১৫ সনের কথাও বলেছেন।[৫৫] তিনি একশো বছর জীবন লাভ করেন– একথা ইবন আবী লায়লা বলেছেন। তবে ৮৮ বছরের কথাও বলা হয়েছে।[৫৬]

---

৫১. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬২
৫২. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/২২১
৫৩. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬২
৫৪. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/২৩১; ৩/১৬৯
৫৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮
৫৬. সিফাতুস সাফওয়া-২/১২১; ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-৩/২৬২

ইবন শিহাব আয-যুহ্রী (রহ)

ইতিহাসে তিনি ইবন শিহাব আয-যুহ্রী বা ইমাম যুহ্রী নামে খ্যাত। তিনি হিজরী ৫০ সনে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পরিচয় এ রকম : আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন শিহাব ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন হারিছ ইবন যুহ্রাহ্ ইবন কিলাব ইবন মুর্রাহ্ আল-কুরাশী। তাঁর আসল নাম মুহাম্মাদ, ডাক নাম আবূ বকর এবং পিতার নাম মুসলিম ছিল। তবে তিনি তাঁর পিতামহ ইবন শিহাব ও গোত্র বানূ যুহ্রার প্রতি আরোপিত হয়ে ইবন শিহাব আয-যুহ্রী নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। পিতামহ 'আবদুল্লাহ ইবন শিহাব ইসলামের সূচনা পর্বে অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মত হযরত রাসূলে কারীমের কট্টর দুশমন ছিলেন। ঐতিহাসিক বদর ও উহুদ যুদ্ধে মক্কার পৌত্তলিক বাহিনীর সাথে তিনিও ইসলামকে সমূলে উৎপাটনের উদ্দেশ্যে যোগদান করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধের সেই সব অত্যুৎসাহী পৌত্তলিক সৈনিকদের একজন ছিলেন যারা রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যা করার অথবা নিজেরা যুদ্ধ করে নিহত হওয়ার অঙ্গীকার করেছিল।[২] পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তৃতীয় খলীফা হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে মক্কায় ইনতিকাল করেন। যুহরীর পিতা মুসলিম ছিলেন একজন সংগ্রামী মুসলমান। তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) বায়'আত করেন এবং বানূ উমাইয়্যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন।[৩]

ইসলামের এমন কট্টর দুশমনের বংশে মুহাম্মাদ ইবন মুসলিমের জন্ম হয়। ইসলামের জন্য তাঁর যে অবদান ইতিহাস তা কোনদিন ভুলতে পারবে না। তিনি ছিলেন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম পর্বের গুটি কয়েক মনীষীর একজন যাঁরা ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সূচনা করেন। আর যার আলোতে পরবর্তীকালে গোটা মুসলিম জাহান আলোকিত হয়ে ওঠে।

জ্ঞানগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে ইবন শিহাবের সমকালীন অন্য কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তাঁর মধ্যে জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা ছিল স্বভাবগত। তাঁর মেধা, ধীশক্তি ও মুখস্থ শক্তি ছিল অতুলনীয়। এত প্রখর মেধাবী ছিলেন যে, কোন মাসআলা দু'বার বুঝার প্রয়োজন পড়তো না। আর মুখস্থ শক্তি এত প্রবল ছিল যে, একবার যে কথা শুনতেন তা অন্তরে খোদাই হয়ে যেত। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন হতো না।[৪] তাঁর মুখস্থ শক্তির একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত হলো, মাত্র আশি দিনে পুরো কুরআন মুখস্থ করেন।[৫] সারা জীবনে মাত্র একবার একটি হাদীছের ব্যাপারে একটু সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৮
২. ওফায়াতুল আ'য়ান-১/৪৫১
৩. 'আসরুত তাবি'ঈন-১২০; আল-ইসাবা-২/৩২৫
৪. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৯/৪৪৮
৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৮

জিজ্ঞেস করার পর বুঝলেন, যেভাবে সেটি তাঁর মুখস্থ ছিল, তা তেমনই। তিনি নিজেই বলতেন, আমি আমার অন্তর মাঝে কখনো কোন কিছু গচ্ছিত রাখলে তা আর কখনো ভুলিনি।[৬]

এমন অতুলনীয় মেধা ও মুখস্থ ক্ষমতার সাথে তাঁর আগ্রহ, সন্ধান ও জিজ্ঞাসার অবস্থা এমন ছিল যে, জ্ঞান ও শাস্ত্রের এমন কোন খামার ছিল না যার শস্য তিনি আহরণ করেননি। আট বছর যাবত মদীনার ইমাম সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের (রহ) সান্নিধ্যে ছিলেন। এ সময়ে মদীনার প্রতিটি অলি-গলি ছিল জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও শাস্ত্রের কেন্দ্র স্বরূপ। এখানকার প্রত্যেক নারী-পুরুষ ও শিশু-যুবক-বৃদ্ধ ছিল একেকটি স্বতন্ত্র শিক্ষা কেন্দ্র। ইবন শিহাব মদীনার প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে সবার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন। আবুয যানাদ বর্ণনা করেছেন। আমরা যুহ্‌রীর সাথে 'আলিমদের বাড়ী বাড়ী চক্কর মারতাম। যুহ্‌রীর সাথে থাকতো লেখার উপকরণ। তিনি যা কিছু শুনতেন সাথে সাথে লিখে ফেলতেন।[৭] তাঁর এমন কর্মকাণ্ডে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে নিয়ে হাসা-হাসি ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। তিনি তা মোটেই আমলে আনতেন না। ফলে তিনি হিজরী প্রথম শতক শেষ হওয়ার আগেই পূর্বসূরীদের সুন্নাহ্‌র সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিতে পরিণত হন। তাই বলা হয়েছে, তিনি না জন্মালে সুন্নাহ্‌র অনেক কিছুই হারিয়ে যেত। তিনি সাহ্‌ল ইবন সা'দ (রা), আনাস ইবন মালিক (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) মুখ থেকে হাদীছ শুনেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) সূত্রে তিনটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। মক্কায় 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) যখন মারা যান তখন ইবন শিহাবের বয়স মাত্র সতেরো বছর। জ্ঞানের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসার কারণে তিনি তাঁর উস্তাদ ও শায়খদেরকে সীমাহীন ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। মদীনার সাত ফকীহ্‌র অন্যতম 'উরওয়া ইবন যুবায়র ছিলেন তাঁর একজন শিক্ষক। তাঁর সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন : 'আমি 'উরওয়ার বাড়ীর দরজায় এসে বসে থাকতাম। অপেক্ষা করে আবার ফিরে যেতাম। বাড়ীর ভিতরে ঢুকতাম না। আমি ইচ্ছা করলে ঢুকতে পারতাম। তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার কারণে ঢুকিনি। তাঁর আরেকজন শিক্ষক 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ– যিনি মদীনার সাত ফকীহ্‌র অন্যতম, তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান আহ্‌রণের জন্য তাঁর খাদিম হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বলতেন : আমি 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ্‌র সেবা করেছি। আমি তাঁর জন্য মিষ্টি পানি আনতাম। আমি তাঁর দরজায় এসে সংকেত দিলে তিনি দাসীকে জিজ্ঞেস করতেন : দেখ তো দরজায় কে? সে তাঁকে বলতো : আপনার দাস আল-আ'মাশ। দাসী আমাকে তাঁর একজন দাস মনে করতো।[৮]

জ্ঞান চর্চার মজলিসসমূহে তিনি সবার আগে যেতেন। কোন বাছ-বিচার না করে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার নিকট থেকে জ্ঞান আহ্‌রণ করতেন। মসজিদের নির্ধারিত মজলিস থেকে বের হওয়ার পর মদীনার অলি-গলিতে ঘুরে ঘুরে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার কাছে

---

৬. সিয়ারু আ'লাম আল-নুবালা-৫/৩৩
৭. প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৮
৮. 'আসরুত তাবি'ঈন-১২৪

যা কিছু শুনতেন, লিখে নিতেন। সা'দ ইবন ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, যুহ্‌রী বিদ্যায় আপনাদের সবাইকে ডিঙ্গিয়ে গেলেন কিভাবে? জবাবে তিনি বললেন, জ্ঞান চর্চার মজলিসসমূহে তিনি সবার আগে আসতেন। তারপর সেখান থেকে উঠে আনসারদের বাড়ী বাড়ী যেতেন। শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ-নারী ও পুরুষ এমন কেউ বাকী থাকতো না যাদের কাছে থেকে কিছু না কিছু তিনি অর্জন করতেন না। এমনকি পর্দানশীন মহিলাদের নিকটও যেতেন।[৯]

কখনো কোন বিদুষী মহিলার সন্ধান পেলে মোটেই দেরী না করে তাঁর কাছে পৌছে যেতেন। তিনি নিজেই একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন। একবার কাসিম ইবন মুহাম্মাদ আমাকে বললেন, তোমার তো জ্ঞানের প্রতি ভীষণ লোভ আছে। তাই আমি তোমাকে জ্ঞানের একটি ভাণ্ডারের ঠিকানা বলে দিচ্ছি। আমি বললাম, অবশ্যই বলুন। কাসিম বললেন, 'আবদুর রহমানের মেয়ের কাছে যাও। তিনি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়েছেন। অতঃপর আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং সত্যিই তাঁকে জ্ঞানের সাগর দেখতে পেলাম।[১০]

তাঁর জ্ঞানের আগ্রহ ও রুচি ছিল ব্যাপক। বিশেষ কোন জ্ঞান ও শাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তিনি সব ধরনের জ্ঞান সমান আগ্রহ নিয়ে অর্জন করতেন। আর যা কিছু শুনতেন, লিখে রাখতেন। আবুয যানাদ বলেছেন, আমরা শুধু হারাম-হালালের মাসআলাসমূহ লিখতাম, আর তিনি যা কিছু শুনতেন, লিখে নিতেন। পরবর্তী জীবনে যখন প্রয়োজন অনুভব করেছি তখন বুঝেছি, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় 'আলিম।[১১]

জ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও রুচির এমন ব্যাপকতার কারণে তিনি সকল প্রকার জ্ঞানে সমান পারদর্শিতা অর্জন করেন। যে শাস্ত্রের উপর তিনি আলোচনা করতেন, মনে হতো এটাই তার বিশেষ শাস্ত্র। লায়ছ বর্ণনা করেছেন। আমি যুহ্‌রীর চেয়ে বেশী ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিত্বকে দেখিনি। যখন তিনি 'তারগীব' তথা উৎসাহ-উদ্দীপনা বিষয়ের আলোচনা করতেন তখন মনে হতো তিনি এই বিষয়ের বড় 'আলিম। যখন আরব জাতি ও আরবদের বংশ বিদ্যা বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিতেন তখন মনে হতো এটাই তাঁর বিশেষ বিষয়। আর যখন কুরআন ও সুন্নাতের উপর আলোচনা করতেন তখন মনে হতো এটাই তাঁর বিশেষ শাস্ত্র।[১২] মা'মার বলেছেন, যে যে শাস্ত্র তিনি পড়াশুনা করেছেন তাতে অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ হওয়ার সুযোগ রাখেননি।[১৩]

---

৯. তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব-৯/৪৪৯
১০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৯
১১. তাহযীবুত তাহযীব-৯/৪৪৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৩৩
১২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৮
১৩. তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব-৯/৪৪৯

তিনি কুরআনের একজন বড় হাফেজ ছিলেন এবং এই কুরআন হিফজ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও জানার পরিধি এত বিস্তৃত ছিল যে, মনে হতো 'কালামুল্লাহ' বা আল্লাহর কালাম যেন তাঁর বিশেষভাবে অধীত বিষয়। নাফি'– যিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন, তিনিও যুহ্রীকে কুরআন শুনিয়েছিলেন।[১৪]

সকল বিষয় ও শাস্ত্রে যদিও তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল, তবে তাঁর বিশেষ অধীত বিষয় ছিল হাদীছ ও সুন্নাহ্। এ ক্ষেত্রে তাঁর যে প্রবল আগ্রহ ও বিশেষ রুচি ছিল এবং যে পরিমাণ চেষ্টা ও সাধনা তিনি করেছেন তার কিছু বর্ণনা পূর্বে এসে গেছে। তিনি তাঁর যুগের সকল ইমাম ও বড় 'আলিমের সব জ্ঞান আত্মস্থ করে ফেলেন। ইবন মাদীনী বলেছেন, হিজাযে সকল বিশ্বস্ত ব্যক্তির সব জ্ঞান যুহ্রী ও 'আমর ইবন দীনারে মধ্যে বিভক্ত ছিল।[১৫] তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা দু'হাজার দু' শো পর্যন্ত পৌঁছেছে।[১৬] আবূ দাউদ বলেছেন, তাঁর হাদীছের সংখ্যা দু'হাজার দু' শো পঞ্চাশ।[১৭]

সুনানে রাসূল ও সুনানে সাহাবার প্রতি তাঁর অতিরিক্ত আগ্রহ ছিল। মদীনার সকল সুনান তিনি লিখে ফেলেন। সালিহ ইবন কায়সান বলেন, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি যুহ্রীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমাদের সকল সুনান লিখে নেওয়া উচিত। অতএব, আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সকল সুনান লিখে ফেললাম। 'সুনানে রাসূল' লেখার পর তিনি বললেন, এবার সাহাবীদের 'সুনান' লেখা উচিত। কিন্তু সাহাবীদের 'সুনান' আমরা লিখলাম না, আর তিনি লিখে ফেললেন। ফলে তিনি সফলকাম হলেন, আর আমরা সুযোগ নষ্ট করলাম।[১৮] উল্লেখ্য যে, 'সুনান' অর্থ প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, পথ-পন্থা ইত্যাদি।

মদীনার সুনানে রাসূল ও সুনানে সাহাবা ইমাম যুহ্রীর কল্যাণেই সংরক্ষিত হয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (রহ) বলতেন, যদি যুহ্রী না থাকতেন তাহলে মদীনার যাবতীয় সুনান হারিয়ে যেত।[১৯] তিনি তাঁর যুগে সুনানের সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন– এ ব্যাপারে সবাই একমত। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বলতেন, এখন ইবন শিহাবের চেয়ে বেশী অতীতের 'সুন্নাহ্' জানা ব্যক্তি দ্বিতীয় কেউ নেই।[২০]

তিনি এমন মেধা লাভ করেছিলেন যে, যা কিছু অর্জন করেছিলেন সবই সংরক্ষিত ছিল। তিনি নিজে বলতেন, আমি আমার সিনায় যে জ্ঞানই আমানত রেখেছি সেটা ভোলেনি।[২১]

---

১৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৯
১৫. প্রাগুক্ত-১/১১০
১৬. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৯/৪৪৭
১৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১১
১৮. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৯/৪৪৮
১৯. তাহ্যীবুল আসমা'-১/৯১
২০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৮
২১. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৯/৪৪৮

আর স্মৃতি শক্তির এমন অবস্থা ছিল যে, একবারেই শত শত হাদীছ শুনাতেন। তারপর যদি পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন পড়তো, একটি হরফেরও পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতো না।

একবার খলীফা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক তাঁর কোন এক ছেলের দ্বারা যুহ্রীর নিকট থেকে হাদীছ লিখে নেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। যুহ্রী রাজী হন এবং তাঁর ছেলেকে চার শো হাদীছ লিখিয়ে দেন। এক মাস পরে হিশাম পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বললেন, আমার সেই সংগ্রহের কপিটি হারিয়ে গেছে। তিনি আবার লিখিয়ে দেন। পরে দু'টি কপি মিলিয়ে দেখা হয় এবং তাতে একটি হরফেরও গরমিল ছিল না। ঐ হাদীছ ও সুনান ছাড়াও যা কিছু তাঁর সিনায় রক্ষিত থেকে যায় তার সংখ্যাও দু' হাজারের উপরে ছিল।[২২] মোটকথা, হাদীছে তাঁর স্থান ছিল অতি উচ্চে। ইমাম নাওবী লিখেছেন, তাঁর কৃতিত্ব, গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষতা এত যে তা গণনার বাইরে।[২৩]

তিনি খুব বেশী পরিমাণে হাদীছ স্মৃতিতে ধারণ, সংরক্ষণ ও বর্ণনা করেছেন, এটাই সবটুকু নয়; বরং সে সব হাদীছের ধরন, অবস্থা ও গ্রহণের মাপকাঠি ইত্যাদি দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী উৎকর্ষমণ্ডিত ছিল। যুহ্রীর বর্ণনার স্থান ও মর্যাদা সে যুগের বহু রাবীর কথায় অনুমান করা যায়। 'আমর ইবন দীনার, যিনি নিজেই একজন বড় মুহাদ্দিছ ছিলেন, বলতেন, আমি যুহ্রীর চেয়ে ভালো কোন মুহাদ্দিছ দেখিনি।[২৪] ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল এবং ইসহাক ইবন রাহবীয়ার এ রকম মত ছিল যে, যে হাদীছগুলো তিনি সালিম– 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার– রাসূলুল্লাহ (সা)– এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ।[২৫]

ইমাম যুহ্রী যেহেতু ব্যাপকভাবে হাদীছ শুনেছেন এবং সংগ্রহ করেছেন, এজন্য তাঁর শায়খ বা শিক্ষকমণ্ডলীর গণ্ডি অত্যন্ত প্রশস্ত। তাঁদের মধ্যে বহু বিদুষী মহিলাও ছিলেন। তাঁর সময়ের সাহাবীগণ এবং বড় তাবি'ঈদের এমন কেউ ছিলেন না যাঁদের নিকট থেকে তিনি জ্ঞান আহরণ করেননি। সাহাবীদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার (রা), রাবী'আ ইবন 'আব্বাদ (রা), মাসউদ ইবন মাখরামা (রা), আনাস ইবন মালিক (রা), সাহ্ল ইবন সা'দ (রা), সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা), শাবীব (রা), আবূ জামীলা 'আবদুর রহমান ইবন আযহার (রা), মাহমূদ ইবন রাবী' (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন ছা'লাবা (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন রাবী'আ (রা), আবূ উমামা (রা), সা'দ ইবন সাহ্ল (রা), আবুত তুফায়লরা প্রমুখ এবং উঁচু স্তরের তাবি'ঈদের মধ্যে সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহ্ ও আরো অনেকে। যাঁদের তালিকা অনেক দীর্ঘ।[২৬]

---

২২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৮
২৩. তাহ্যীবুল আসমা'-১/৯১
২৪. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৯/৪৪৮
২৫. তাহ্যীবুল আসমা'-১/৯১
২৬. প্রাগুক্ত; তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৯/৪৪৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৯

যুহ্রীর ব্যক্তিসত্তাটি ছিল জ্ঞান পিপাসুদের কেন্দ্র স্বরূপ। তাঁর হালকায়ে দারসে শত মানুষের ভীড় জমতো। এ কারণে তাঁর ছাত্রসংখ্যা হিসাবের ঊর্ধ্বে। হাদীছের কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্র হলেন : 'আতা' ইবন আবী রাবাহ, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, 'আমর ইবন দীনার, সালিহ ইবন কায়সান, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আনসারী, আইউব সুখতিয়ানী, 'আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম যুহ্রী, ইমাম আওযা'ঈ, ইবন জুরায়জ, মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন হুসায়ন, মুহাম্মাদ ইবন মুনকাদির, মানসূর ইবন মু'তামির, মূসা ইবন 'উকবা, হিশাম ইবন 'উরওয়া, ইমাম মালিক, মু'আম্মার আয-যুবায়দী, ইবন আবী যী'ব, লায়ছ, ইসহাক ইবন ইয়াহইয়া কালবী, বাকর ইবন ওয়ায়িল ও আরো অনেকে।[২৭]

ফিকাহ্ বিষয়েও তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। মদীনার বিখ্যাত সাত ফকীহ্র সকল জ্ঞান তাঁর সিনায় সংরক্ষিত ছিল।[২৮] এই সাত ফকীহ্ হলেন : সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, 'উরওয়া ইবন যুবায়র, আবূ বকর ইবন 'আবদির রহমান ইবন আল-হারিছ, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ, খারিজা ইবন যায়িদ ইবন ছাবিত, সুলায়মান ইবন ইয়াসার ও আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ।[২৯] তাছাড়া এ সময়ের সকল ফকীহ্র সকল জ্ঞানের উত্তরাধিকারীও ছিলেন। জা'ফার ইবন রাবী'আ বর্ণনা করেছেন। আমি 'আররাক ইবন মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, মদীনায় সবচেয়ে বড় ফকীহ্ কে? তিনি বললেন : সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, 'উরওয়া ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ। এ নামগুলো উচ্চারণ করার পর বললেন : আমার মতে যুহ্রী তাঁদের সবার চেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন। একথা এজন্য বলছি যে, তিনি তাঁদের সবার জ্ঞান নিজের জ্ঞানের সাথে যোগ করেছিলেন।[৩০]

যুহ্রী ফিকাহ্ বিষয়ে জ্ঞান লাভের ব্যাপারে বলেছেন, 'ছোট বেলায় আমি এমনভাবে বেড়ে উঠি যে, আমার কোন অর্থ-সম্পদ ছিল না এবং আমি কোন দিওয়ানেও ছিলাম না। আমি আমার গোত্রের বংশবিদ্যা শিখতাম 'আবদুল্লাহ ইবন ছা'লাবা ইবন সু'আয়র-এর নিকট। তিনি ছিলেন এ বিষয়ের বড় 'আলিম ও আমার গোত্রের ভাগিনা। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে তালাক সম্পর্কিত একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করে। তিনি অজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁকে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের নিকট যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করেন। আমি মনে মনে বললাম, আমি এই বৃদ্ধের সাথে আর থাকবো না যে কিনা বলে– রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মাথা 'মাসেহ' করেছেন, অথচ সেটা কি তা তিনি জানেন না? অতঃপর আমি প্রশ্নকারীর সাথে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের নিকট গেলাম। ইবন ছা'লাবাকে ছেড়ে দিলাম। তারপর আমি বসেছি 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র, 'উবায়দুল্লাহ ও আবূ বকর আবদুর রহমান প্রমুখের নিকট। তার পরেই না আমি ফকীহ্ হয়েছি।[৩১]

---

২৭. তাহ্যীবুল আসমা'-১/৯১
২৮. ওয়াফাতুল আ'য়ান-১/৪৫১
২৯. 'আসরুত তাবি'ঈন-১২১
৩০. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৯/৪৪৮
৩১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবাসা-৫/৩৩০

ইসলামী ফিকাহ্ শাস্ত্রের ইতিহাস অত্যন্ত গর্বের সাথে যুহ্রীর নামটি স্মরণ করে। হিজরী দ্বিতীয় শতকের অনেক প্রতিভাবান ফকীহ্র জন্ম হয় তাঁরই হাতে। যাঁরা জ্ঞানের প্রসার ঘটান, ইফতার মসনদে আসীন হন এবং অনেক ফিকাহ্ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেন। তাঁর এসব ছাত্র যাঁরা মুসলিম উম্মাহ্র ফকীহ্ হিসেবে পরবর্তীকালে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খ্যাতিমান হলেন : মালিক ইবন আনাস, আন-নু'মান ইবন ছাবিত, 'আবদুর রহমান ইবন 'আমর আল-আওযা'ঈ, আল-লাইছ ইবন সা'দ, 'আবদুল মালিক ইবন জুরায়জ ও সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না।[৩২]

ফিকাহ্ বিষয়ে তাঁর এই সীমাহীন যোগ্যতার কারণে তিনি মদীনার ইফতার মসনদেও সমাসীন হন। তাঁর ফাতওয়ার সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, মুহাম্মাদ ইবন নূহ তা ফিক্হী তারতীব অনুসারে বিশাল তিন খণ্ডে সাজান।[৩৩]

আর মাগাযী শাস্ত্রের তো তিনি ইমাম ছিলেন। তাঁর পূর্বে আর কেউ মাগাযীর প্রতি তেমন বিশেষ গুরুত্ব দেননি। ইসলামের ইতিহাসে তিনি প্রথম ব্যক্তি, যিনি মাগাযীর উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম সুহায়লীর বর্ণনা অনুযায়ী এটা ছিল এই শাস্ত্রের উপর লেখা প্রথম গ্রন্থ। তাঁর দ্বারাই মাগাযী ও সীরাতের প্রতি মানুষের একটা বিশেষ আগ্রহ ও রুচির সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ইয়া'কূব ইবন ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইবন সালিহ, 'আবদুর রহমান ইবন 'আবদিল 'আযীয, মূসা ইবন 'উকবা এবং মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক এই শাস্ত্রকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছেন। বিশেষ করে শেষের দু'জন এ শাস্ত্রে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করে অমর হয়ে আছেন।

সে যুগের সকল জ্ঞানী, গুণী ও বিজ্ঞজনদের নিকট ইবন শিহাব যুহ্রীর একটা স্বীকৃতি, সম্মান ও মর্যাদা ছিল। আইউব সিখতিয়ানী বলতেন, আমি যুহ্রীর চেয়ে বড় 'আলিম দেখিনি। একজন প্রশ্ন করলো, হাসান বসরীকেও না? তিনি সেই একই কথা আবার বললেন : আমি যুহ্রীর চেয়ে বড় কাউকে পাইনি।[৩৪] জ্ঞান অর্জনের জন্য মাকহূল গোটা মুসলিম জাহান চষে বেড়িয়েছিলেন এবং ইসলামী খিলাফতের প্রতিটি অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন। তাঁকে একবার একজন প্রশ্ন করলো : আপনি সবচেয়ে বড় কোন 'আলিমের সান্নিধ্য পেয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন : ইবন শিহাব যুহ্রী। ইমাম মালিক বলতেন, পৃথিবীতে যুহ্রীর কোন দৃষ্টান্ত ছিল না।[৩৫]

সা'দ ইবরাহীম তো এতখানি বাড়িয়ে বলতেন যে, আমার তো মনে হয় রাসূলুল্লাহর (সা) পরে যুহ্রীর মত এত জ্ঞান আর কারো মধ্যে ছিল না।[৩৬] পরবর্তীকালে তিনি যখন মদীনায় আসতেন তখন তথাকার মুহাদ্দিছগণ হাদীছ বর্ণনা এবং মুফতীগণ ফাতওয়া দান

---

৩২. 'আসরুত তাবি'ঈন-১৩৩
৩৩. আ'লাম আল-মুওয়াক্কা'ঈন-১/২৬
৩৪. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৯১
৩৫. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/১০৯
৩৬. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৯২

সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতেন। তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁরা এ কাজ করতেন। তাঁদের অনেকে তাঁর মজলিসে গিয়ে বসতেন এবং তাঁর বয়ান শুনতেন।[৩৭]

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যুহ্‌রীকে যে দয়া ও মহানুভবতার সাথে জ্ঞান দান করেছিলেন, তিনিও তেমনি মহানুভবতার সাথে সেই জ্ঞান বণ্টন এবং প্রচার-প্রসারে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি বলতেন, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কেউ আমার মত এত কষ্ট স্বীকার করেনি, ঠিক তেমনি তার প্রচার-প্রসারেও।[৩৮] তাঁর শিষ্য-শাগরিদদের দীর্ঘ তালিকা দেখলে জ্ঞানের সেবায় তাঁর অবদান কিছুমাত্র অনুমান করা যায়।

তাঁর সারাটি জীবন জ্ঞানের সাগরে নিমজ্জিত ছিল। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ ছাড়া তাঁর আর কোন ধ্যান ও ধান্দা ছিল না। জ্ঞান চর্চায় গভীরভাবে নিমগ্ন থাকায় দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস, এমনকি স্ত্রী থেকেও উদাসীন হয়ে যেতেন। যখন ঘরে ফিরতেন তখনও পুস্তক ও কাগজ-পত্রের স্তূপে হারিয়ে যেতেন। একদিন তাঁর স্ত্রী তো বিরক্ত হয়ে বলেই ফেললেনঃ আল্লাহর কসম! এসব বই পুস্তক আমার জন্য তিন সতীনের চেয়েও বেশী পীড়াদায়ক।[৩৯]

'আবদুল মালিক, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সহ যে ছয়জন উমাইয়্যা খলীফার যুগ তিনি লাভ করেন তাঁদের সকলের সাথে গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাঁর জীবনের শুরু হয় খলীফা 'আবদুল মালিকের সময়। 'আবদুল মালিক প্রথম সাক্ষাতে যুহ্‌রীকে 'উরওয়া ইবন যুবায়রের সাহচর্য অবলম্বনের প্রতি ইঙ্গিত দেন। আর সেখান থেকে তিনি 'উরওয়ার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেননি।[৪০] 'আবদুল মালিক নিজেই একজন বড় জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। প্রকৃত জ্ঞানীর মর্যাদাও দিতেন। যদি খিলাফতের মসনদ তাঁর জীবন ধারাকে পাল্টে না দিত তাহলে তিনিও একজন অতি মর্যাদাবান 'আলিম তাবি'ঈ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতেন। ইমাম শা'বী খলীফা 'আবদুল মালিকের জ্ঞান-গরিমার প্রতি এতখানি মুগ্ধ ছিলেন যে, তাঁকে বলতে শোনা যেত : আমি যত লোকের সংগে মিশেছি একমাত্র 'আবদুল মালিক ছাড়া সবার চেয়ে নিজেকে উত্তম পেয়েছি। 'আবদুল মালিকের উপস্থিতিতে যখনই আমি কোন হাদীছ বর্ণনা অথবা কবিতা আবৃত্তি করতাম, তিনি তাতে আরো কিছু যোগ করে দিতেন।[৪১]

যুহ্‌রী সর্ব প্রথম ৮০ হিজরীতে তিরিশ বছর বয়সে দিমাশকে 'আবদুল মালিকের নিকট যান।[৪২] 'আবদুল মালিক যুহ্‌রীর জ্ঞান-গরিমা দ্বারা দারুণভাবে মুগ্ধ হন। যুহ্‌রী ঋণগ্রস্ত

---

৩৭. 'আসরুত তাবি'ঈন-১২৭, ১২৯
৩৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৯
৩৯. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/৪৫১
৪০. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/১৪৩
৪১. তারীক আল-খুলাফা'লিস সুয়ূতী-২১৬
৪২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/৩৮৫-৩৮৭

ছিলেন। 'আবদুল মালিক তাঁর সকল ঋণ পরিশোধ করে দেন।[৪৩] এই ঋণ পরিশোধ ছাড়াও তাঁর প্রতি আরো বহু ভালো আচরণ করেন। যুহ্‌রীকে তিনি দিমাশকের কাজী হিসেবে নিয়োগ দেন।[৪৪] এই সম্পর্কের মাধ্যমে যুহ্‌রী দিমাশকে স্থায়ীভাবে থেকে যান এবং 'আবদুল মালিকের সাথেই থাকতেন। 'উমাইয়্যা খলীফাদের মধ্যে 'আবদুল মালিকের পরে 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীয আরেকজন জ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞানীদের সত্যিকার মর্যাদা দানকারী। তিনি যুহ্‌রীকে খুবই সম্মান করতেন এবং যুহ্‌রীর বিশ্বাস ও মতের সাথে একমত ছিলেন। তিনি খিলাফতের প্রতিটি অঞ্চলে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, সবাই যেন ইবন শিহাবের অনুসরণ করে। কারণ, অতীত সুন্নাহ্ তথা প্রাচীন রীতি-নীতি ও পন্থা-পদ্ধতি তাঁর চেয়ে বেশী জানা লোক আর কাউকে পাওয়া সম্ভব নয়।[৪৫]

'আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর যুহরী তাঁর ছেলে হিশামের সাথে থাকেন। পরে হিশামের ছেলের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। হিশামের উপরও তাঁর দারুণ প্রভাব ছিল। হিশাম তাঁকে খুব মানতেনও। তিনি যুহ্‌রীর হাজার হাজার দিরহাম ঋণ পরিশোধ করে দেন।[৪৬] হিশামের সাথে তাঁর অনেক দরবারি কথাবার্তা ও তাৎক্ষণিক উত্তর দানের অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

একদিন আবুয যানাদ ও যুহ্‌রী হিশামের দরবারে বসে আছেন। হিশাম যুহ্‌রীকে প্রশ্ন করলেন, মদীনাবাসীদের ভাতা কোন মাসে বণ্টন করা হতো? যুহ্‌রী জানেন না বলে অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। হিশাম এবার আবুয যানাদকে প্রশ্নটি করলেন। আবুয যানাদ বললেন : মুহাররাম মাসে। তাঁর এ জবাব শুনে হিশাম যুহ্‌রীকে লক্ষ্য করে বললেন : এই জ্ঞান আপনার আজ অর্জিত হলো। যুহ্‌রী তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, আমীরুল মু'মিনীনের মজলিস এমনই যে, তার থেকে জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ লাভ করা যায়।[৪৭]

উদারতা ও মহানুভবতা যুহ্‌রীর চরিত্রের এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ছিল। বিত্ত-বৈভবের কোন মূল্য তাঁর কাছে ছিল না। 'আমর ইবন দীনার বলেছেন, যুহ্‌রীর দৃষ্টিতে দিরহাম ও দীনার যতখানি গুরুত্বহীন ছিল ততখানি আর কারো দৃষ্টিতে ছিল না। তিনি দিরহাম-দীনারকে উটের লেদার চেয়ে বেশী কিছু মনে করতেন না। অর্থ-সম্পদের প্রতি তাঁর এমন মানসিকতার কারণে দু'হাতে তা বিলাতেন এবং বার বার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। খলীফা 'আবদুল মালিক ও খলীফা হিশাম বারবার তাঁর ঋণ পরিশোধ করেছেন। কিন্তু তাঁর মাত্রা ছাড়া দানশীলতা তাঁকে সব সময় ঋণগ্রস্ত করে রেখেছে। ওয়ালীদ ইবন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, আমি একবার যুহ্‌রীকে বললাম, আবূ বকর! আপনার মধ্যে ঋণ গ্রহণ করার শুধু একটি দোষ। তিনি জবাব দিলেন, আমার ঋণই বা এমন কি! সব মিলে মোট চল্লিশ

৪৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ১/১০৯
৪৪. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/৪৫২
৪৫. প্রাগুক্ত-১/৪৫১
৪৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৯
৪৭. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/৪৫১

হাজার দিরহামের মত হবে। আমার চারটি দাস আছে, তাদের প্রত্যেকে চল্লিশ হাজারের চেয়ে উত্তম। আর আমার উত্তরাধিকারী আছে শুধু আমার এক পৌত্র। আমার ইচ্ছা তো এই যে, আমার মীরাছ বা উত্তরাধিকারই কিছু না থাকুক।[৪৮]

তাঁর ছাত্র লাইছ ইবন সা'দ বলতেন : 'আমি যাঁদেরকে দেখেছি তাদের মধ্যে ইবন শিহাব সবচেয়ে বেশী দানশীল ব্যক্তি। যে কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি কিছু না কিছু তাকে দিতেন। আর কোন কিছুই দেওয়ার মত না থাকলে চাকর-বাকরদের নিকট থেকে ধার নিতেন। আর এটাকে খারাপ কিছু মনে করতেন না।' লাইছ আরো বলেছেন, দেওয়ার মত কিছু না থাকলে তাঁর চেহারার রং পাল্টে যেত। তিনি সাহায্য প্রার্থীকে বলতেন, 'তোমার জন্য সুসংবাদ! খুব শিগগির আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করবেন।' তিনি মানুষকে আহার ও পান করিয়ে আনন্দ পেতেন। তাঁর রাতের হালকাতে যারা বসতো তাদেরকে তিনি মধুর শরবত পান করাতেন। মধুর শরবত পান চলতো, আর হাদীছ ও মাগাযী শোনা ও বর্ণনা অব্যাহত থাকতো। যখন তিনি দেখতেন, তাঁর মজলিসের কেউ ঘুমাচ্ছে, তাকে বলতেন, তুমি তো কুরাইশদের গল্প বলিয়ে লোকদের মত হতে পারবে না, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন : [৪৯] سَامِرًا تَهْجُرُوْنَ - অহংকার করে এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করে যেতে।[৫০]

তিনি নিজের পোশাক-আশাক ও খাদ্য-খাবারের প্রতি যত্নবান থাকতেন। উঁচু মুকুট সদৃশ হলুদ রংয়ের টুপি মাথায় পরতেন এবং হলুদ রংয়ের একটি উন্নত মানের চাদর গায়ে দিতেন। নরম এবং চমৎকার একটি গদি ও বালিশ ব্যবহার করতেন।[৫১]

শামের তৎকালীন বিখ্যাত ফকীহ্ রাজা' ইবন হায়ওয়া তাঁর এভাবে ঋণ করে দান করা ও মানুষকে খাওয়ানোর ব্যাপারে প্রায়ই বকাবকি করতেন। একবার ইবন শিহাব তাঁর কাছে এমনটি আর করবেন না বলে অঙ্গীকার করেন। একদিন রাজা' ইবন হায়ওয়া তাঁর বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। দেখেন, মানুষের জন্য খাবার তৈরী করা হয়েছে এবং দস্তর খাওয়ানে মধুর ভাণ্ডও রাখা হয়েছে। রাজা তিরস্কারের সুরে বললেন : আমরা কি এর উপর একমত হয়েছিলাম? ইবন শিহাব হাসতে হাসতে বললেন : আসুন, দানশীল ব্যক্তিকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আদব শেখাতে পারে না। তাঁর সঙ্গী-সাথী ও ছাত্র-শিষ্যদের কেউ যদি তাঁর খাবার খেতে অস্বীকার করতো তাহলে তিনি দশ দিন তাঁকে কোন হাদীছ শোনাতেন না। কেউ তাঁর এমন দানশীলতা ও অতিথি সেবার সমালোচনা করলে বলতেন : যে কল্যাণ তালাশ করে সে অকল্যাণ থেকে দূরে থাকে। তিনি তাঁর শিষ্য-শাগরিদ ও আত্মীয়-বন্ধুদেরকে এমন ব্যক্তিত্ব অর্জনের উপদেশ দিতেন যাতে দানশীলতা ও মহানুভবতা বিদ্যমান থাকে। তিনি বলতেন : মানুষের তালাশকৃত জিনিসের মধ্যে

---

৪৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১১
৪৯. সূরা আল-মু'মিনূন-৬৭
৫০. 'আসরুত তাবি'ঈন-১২৮
৫১. প্রাগুক্ত

ব্যক্তিত্বের চেয়ে ভালো কিছু নেই। সে সাহচর্যের মধ্যে ভালো কিছু নেই এবং বুদ্ধি-বিবেকও কোন কিছু লাভ করে না তা পরিহার করা ব্যক্তিত্বেরই অংশ। তার সাথে কথা বলার চেয়ে তাকে পরিহার করাই ভালো।[৫২]

ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রীর অন্যতম ছাত্র ইমাম মালিক। তিনি তাঁর শায়খ ও উস্তাদ সম্পর্কে অনেক কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : এই জ্ঞান হলো দীন, সুতরাং এ দীন কার নিকট থেকে গ্রহণ করছো তা লক্ষ্য রাখবে। আমি মসজিদে (মসজিদে নবাবী) সত্তর (৭০) জন এমন লোক পেয়েছি যাঁরা 'কালা রাসূলুল্লাহ (সা)' বলে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁদের যে কোন একজনকে যদি কোন কোষাগারের দায়িত্ব দেওয়া হতো, তাঁরা বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতেন। আমি তাঁদের থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করিনি। কারণ, তাঁদের থেকে জ্ঞান অর্জনের মত লোক তারা নন। কিন্তু যুহ্‌রী আমাদের এখানে আসতেন এবং তিনি একজন যুবক, তা সত্ত্বেও তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁর দরজায় মানুষের প্রবল ভীড় জমে যেত।[৫৩]

লাইছ ইবন সা'দও তাঁর একজন ছাত্র। তিনি বলেছেন ঃ আমি একবার এক সফরে ইবন শিহাব যুহ্‌রীর সঙ্গে ছিলাম। তিনি 'আশূরার দিন রোযা রাখলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলোঃ আপনি সফরে রামাদান মাসে রোযা ভেঙ্গে ফেলেন, কিন্তু আশূরার দিন রোযা রাখলেন কেন? তিনি বললেন : রামাদান মাসে সফরে ভেঙ্গে ফেলা রোযা অন্য সময় আদায় করার বিধান আছে। কিন্তু আশূরার রোযার তা নেই। এ দিনে না রাখলে তা ছুটে যাবে।

তিনি জ্ঞানী-গুণীদের প্রতি দারুণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধও ছিল প্রখর। একবার মদীনার বিখ্যাত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিছ রাবীআ'তুর রায় মদীনার মসজিদে হাদীছ ও ফিকাহ্‌র দারস দিচ্ছেন। এমন সময় কেউ একজন খবর দিল : ইবন শিহাব যুহ্‌রী এই মাত্র শাম থেকে মদীনায় পৌঁছেছেন। রাবী'আ সঙ্গে সঙ্গে দারসের মজলিস ভেঙ্গে দিয়ে যুহ্‌রীর কাছে ছুটে গেলেন এবং তাঁর হাত মুঠ করে ধরে 'মারহাবান, আহ্‌লান ওয়া সাহ্‌লান' বলে তাঁকে মদীনার অতিথিখানায় নিয়ে গেলেন। তারপর দু'জনের মধ্যে 'আসর পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হলো। 'আসরের সময় তাঁরা যখন বের হবেন তখন একজন আরেকজনের প্রতি যে মন্তব্য করেন তা নিম্নরূপ :

রাবী'আ বলেন : ইবন শিহাব, আমার ধারণা আপনি জ্ঞানের যে স্তরে পৌঁছেছেন সেখানে আর কেউ পৌঁছুতে পারেনি। উত্তরে ইবন শিহাব বললেন : মদীনায় আপনার মত লোক আছে আমি ধারণা করিনি।[৫৪]

যুহ্‌রীর মজলিসের অসাধারণ ছাত্ররাও তাঁদের ভুল ও অমনোযোগিতার জন্য অনেক সময় উস্তাদ যুহ্‌রীর তিরস্কার লাভ করতেন। সে তিরস্কার হতো এ ধরনের 'তোমরা জ্ঞান চর্চা

---

৫২. প্রাগুক্ত-১৩১
৫৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'৫/৩৪৩
৫৪. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৩৪৪

ছেড়ে দিয়ে ফুটো মশকের মত হয়ে গেছো। অর্জন কর, কিন্তু ধরে রাখতে পার না। আল্লাহর কসম! তোমরা কখনো কল্যাণের নাগাল পাবে না।'[৫৫] উস্তাদের এমন তিরস্কারে ছাত্রদের মধ্যে অনেক সময় হাসির রোল পড়ে যেত। উস্তাদও ছাত্রদের বিরক্তি ও অন্যমনস্কতা দূর করার জন্য একটু সহজ ভঙ্গিতে বলতেন : এসো আমরা কিছু কবিতা আবৃত্তি করি ও অন্য কথা বলি। কারণ, কানেরও ক্লান্তি দূর করা উচিত।[৫৬]

'ইল্‌ম, সুন্নাহ্ ও মাগাযীতে পরিপূর্ণ দীর্ঘ জীবন লাভের পর এই মহান জ্ঞান সাধক হিজরী ১২৪ সনে ইহলোক ত্যাগ করে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর (৭০) বছরের উপরে। শাম ও ফিলিস্তীনের সীমান্তবর্তী 'শাগাব' নামক গ্রামে তাঁর মৃত্যু হয়। মানুষ যাতে চলাচলের পথে তাঁর জন্য দু'আ করতে পারে সে জন্য একটি প্রধান সড়কের পাশে দাফন করার জন্য আত্মীয়-বন্ধুদের বলে যান। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

যুহরী থেকে এ রকম একটা কথা বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি কোন বিদেশ-বিভুঁইয়ে যায় এবং সেখানের কিছু মাটি সেখানের পানিতে গুলিয়ে পান করে তাহলে সে তথাকার মহামারী রোগ থেকে সুস্থ থাকবে।[৫৭]

---

৫৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৩৪৪
৫৬. 'আসরুত তাবি'ঈন-১৩৩
৫৭. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৬/২৫১

'আমির ইবন শুরাহীল আশ-শা'বী (রহ)

'আমির-এর ডাক নাম আবূ 'উমার। আর পিতার নাম কোন কোন গ্রন্থে 'শুরাহীল', আবার কিছু গ্রন্থে 'শুরাহাবীল' লেখা হয়েছে। গোত্রের প্রতি সম্পৃক্ত করার জন্য আশ-শা'বী বলা হয়েছে। এ নামে ব্যাপকভাবে পরিচিতির কারণে এটা তাঁর 'লকব' বা উপাধির রূপ ধারণ করেছে। তিনি ইয়ামানের প্রাচীন গোত্র হিময়ার শাখার সন্তান। এই খান্দানে হাস্সান ইবন 'আমর নামে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইয়ামানের 'যূ আশ-শা'বায়ন' নামক একটি পাহাড়ী উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মৃত্যুর পর তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। এ কারণে তিনি নিজে 'যূ আশ-শা'বায়ন' নামে প্রসিদ্ধ হন। তার পর থেকে তাঁর বংশধারার মধ্যে যে শাখাটি কূফায় আবাসন গড়ে তোলে তাদেরকে বলা হয় শা'বী। 'আমির ছিলেন এই শাখার সন্তান। যে শাখাটি শামে বসতি স্থাপন করে তারা 'শা'বানী' নামে পরিচিত লাভ করে। যে শাখাটি ইয়ামানে থেকে যায় তাদেরকে বলা হয় 'যী শা'বায়ন'। আর যে শাখাটি পশ্চিম আফ্রিকায় চলে যায় তাদেরকে 'আল-উশা'উব' বলা হয়। এই সবগুলো শাখার উর্ধ্বতন পুরুষ হলেন হাস্সান ইবন 'আমর।[১]

'আমির আশ-শা'বীর জন্মসন সম্পর্কে একটু মতপার্থক্য আছে। তিনি নিজে দাবী করেছেন যে, তাঁর জন্ম জালূলা' যুদ্ধের বছর। অর্থাৎ হিজরী ১৭ সন।[২] আরেকটি বর্ণনা এ রকম আছে যে, জালূলা' যুদ্ধে তাঁর মা যুদ্ধবন্দী হিসেবে মুসলমানদের অধিকারে আসেন এবং ভাগে তাঁর পিতা শুরাহীলের অংশে পড়েন। এই হিসেবে হিজরী ১৯ সনে তাঁর জন্ম। তখন হযরত 'উমারের খিলাফতের ষষ্ঠ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।[৩]

অতি দুর্বল ও ক্ষুদ্রাকৃতি নিয়ে যমজ সন্তান হিসেবে তাঁর জন্ম। তিনি বলতেন, 'আমি মায়ের পেটেই ঠেলা-ধাক্কার মধ্যে পড়েছি।[৪] এ কারণে স্বাভাবিক বৃদ্ধির সুযোগ পাননি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে বিদ্যা-বুদ্ধি, ধৈর্য, বিচক্ষণতা, স্মৃতিশক্তি, বোধশক্তি ও অন্যান্য প্রতিভায় না তাঁর সেই যমজ ভাই, আর না অন্য কেউ ঠেলা-ধাক্কায় তাঁর সামনে টিকতে পেরেছে। তিনি হন তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ব্যক্তি।

শা'বী কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। তবে তাঁর অন্তরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ও বেশী ভালোবাসা ছিল মদীনা মুনাওয়ারার প্রতি। তাই তিনি সময় ও সুযোগ পেলেই সেখানে অবস্থানকারী রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের সাক্ষাৎ ও তাঁদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সেখানে ছুটে যেতেন। আর সাহাবায়ে কিরামও তখন কূফায় যেতেন। কারণ, তখন কূফা ছিল জিহাদে গমন ও প্রত্যাগমনের কেন্দ্রস্থল স্বরূপ। কূফাতেও তখন বহু সাহাবী বসবাস করতেন। তাই রাসূলুল্লাহর (সা) পাঁচশো

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮০; সিয়ারুত তাবি'ঈন-২১০
২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৪; তাবাকাত-৬/১৮২
৩. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৭২
৪. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/২৩১; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮০

মহান সাহাবীকে দেখার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে আটচল্লিশ জনের নিকট থেকে সরাসরি জ্ঞান অর্জনের সুযোগ লাভ করেন।[৫] 'হাবরুল উম্মাত' (উম্মাতের মহাপণ্ডিত) খ্যাত হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) সান্নিধ্যে একধারে আট-দশ মাস অবস্থান করে তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করেন।[৬] এসব মহান ব্যক্তিদের উদারতায় তিনি তাঁর যুগের ইমামের মর্যাদা লাভ করেন।

বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর এত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল যে তাঁর যুগের মানুষ তাঁকে ইমামের মর্যাদা দান করে। ইমাম যাহ্‌বী তাঁকে ইমাম, হাফেজে হাদীছ, ফকীহ্ ও আস্থাভাজন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ গ্রন্থের শিরোনাম দিয়েছেন– الشعبي علامة التـــابعين – শা'বী তাবি'ঈদের মহাজ্ঞানী বলে।[৭] ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী তাঁকে 'الإِمَامُ الْحَبْرُ الْعَلاَّمَـةُ' - ইমাম, মহাপণ্ডিত, মহাজ্ঞানী, বলেছেন।[৮] সেকালে প্রচলিত সকল শাস্ত্রে তাঁর সমান দখল ছিল। আবু ইসহাক আল-হিবাল বলেছেন, শা'বী সকল শাস্ত্রের জ্ঞানে তাঁর যুগে একক ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[৯] কুরআন, হাদীছ, ফিকাহ, মাগাযী, অংকশাস্ত্র, সাহিত্য ও কবিতা, মোটকথা প্রতিটি অঙ্গনে তাঁর সমান দখল ও বিচরণ ছিল।

আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠ কারী (পাঠক) ছিলেন। তাঁকে কারীদের নেতা বলা হতো।[১০] তাফসীরেও তাঁর পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের কারণে মুফাস্‌সির (কুরআন-ভাষ্যকার) হিসেবে তেমন খ্যাতি লাভ করেননি। তাফসীরুল কুরআনের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। সবার জন্য একাজ বৈধ মনে করতেন না। যাকারিয়া ইবন আবী যায়দ বর্ণনা করেছেন যে, শা'বী যখন আবু সালিহ-এর নিকট যেতেন তখন তাঁর কান ধরে বলতেন, তুমি কুরআন পড়না, আর তার তাফসীর করে থাক?[১১] তিনি তাঁর যুগের একজন বড় মুফাস্‌সির সুদ্দী-এর ভীষণ সমালোচনা করতেন। একবার তাঁকে বলা হলো, সুদ্দীতো কুরআন বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞানে বেশ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। তিনি বললেন : না, বরং সে কুরআন বিষয়ক মূর্খতার বেশ কিছু অংশ অর্জন করেছে।[১২]

তিনি হাদীছের অত্যুচ্চ সম্মানের অধিকারী হাফেজ ছিলেন। শুধু তাই না, সে যুগের হাদীছ শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরাম ও উঁচু স্তরের তাবি'ঈদের বড়রকম একটি সংখ্যার নিকট থেকে হাদীছ শুনেছিলেন। যে সকল সাহাবীর নিকট হাদীছ শুনেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া হলো :

---

৫. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৫/৬৭
৬. তাবাকাত-৬/১৭২
৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৭৯
৮. শাজারাত আয-যাহাব-১/১২৬
৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৫/৬৯
১০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮৫
১১. প্রাগুক্ত-১/৮৩
১২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/২১৯

হযরত 'আলী (রা), সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা), সা'ঈদ ইবন যায়দ (রা), যায়দ ইবন ছাবিত (রা), কায়স ইবন 'উবাদা (রা), কারাজ ইবন কা'ব (রা), 'উবাদা ইবন সামিত (রা), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা), আবূ মাস'উদ আনসারী (রা), আবূ হুরাইরা (রা), মুগীরা ইবন শু'বা (রা), নু'মান ইবন বাশীর (রা), আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা), জারীর ইবন 'আবদিল্লাহ আল-বাজালী (রা), বুরাইদা ইবন হাসীব (রা), বারা' ইবন 'আযিব (রা), মু'আবিয়া (রা), জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা), জাবির ইবন সামুরা (রা), হারিছ ইবন মালিক (রা), হাবশী ইবন জানাদা (রা), হুসাইন ইবন 'আলী (রা), যায়দ ইবন আরকাম (রা), দাহ্হাক ইবন কায়স (রা), সামুরা ইবন জুনদুব (রা), 'আমির ইবন শাহ্র (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন মুতী' (রা), 'আবদুর রহমান ইবন সামুরা (রা), 'আদী ইবন হাতিম (রা), 'উরওয়া ইবন জা'দ আল-জারিকী (রা), 'উরওয়া ইবন মুদাররাস (রা), 'আমর ইবন উমাইয়্যা (রা), 'আমর ইবন হুরায়ছ (রা), 'ইমরান ইবন হুসাইন (রা), 'আওফ ইবন মালিক (রা), 'আয়্যাদ আল-আশ'আরী (রা), কা'ব ইবন 'আজরাহ্ (রা), মুহাম্মাদ ইবন সায়ফী (রা), মিকদাম ইবন মা'দিকারিব (রা), ওয়াবিসা ইবন মা'বাদ (রা), আবূ জুবায়র ইবন দাহ্হাক (রা), আবূ সুরায়হা গিফারী (রা), আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা) এবং মহিলা সাহাবীদের মধ্যে উম্মু সালামা (রা), মাইমূনা বিন্‌ত হারিছ (রা), আসমা' বিন্‌ত উনাইস (রা), ফাতিমা বিন্‌ত কাইস (রা), উম্মু হানী (রা), 'আয়িশা (রা) প্রমুখের নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন। এসব সাহাবী থেকে তাঁর বর্ণিত অনেক হাদীছ 'মুরসাল'। অর্থাৎ সাহাবীর নাম উল্লেখ না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।[১৩]

হাদীছের প্রতি তাঁর এক বিশেষ আগ্রহ ও রুচি ছিল। হাদীছের জ্ঞান অর্জনের জন্য ভীষণ কষ্ট স্বীকার করেছেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে জানতে চাইলো, আচ্ছা, এত জ্ঞান আপনি কোথা থেকে কিভাবে অর্জন করলেন? জবাব দি: আত্মনির্ভরতা দূর করে, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে, জড়বস্তুর ধৈর্যের মত ধৈর্যধারণ করে এবং কাকের মত প্রত্যূষে উঠে।[১৪]

শা'বী ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, সজাগ অন্তকরণ এবং সূক্ষ্ম বোধশক্তির অধিকারী মানুষ। স্মৃতিতে ধারণ ক্ষমতা ও মুখস্থ শক্তিতে তিনি ছিলেন একজন কিংবদন্তীর মানুষ। স্মরণ শক্তি এত প্রখর ছিল যে, কখনো কাগজ, কলম ও দোয়াতের প্রয়োজন হতো না। একবার যে হাদীছ শুনতেন তা বুকের মাঝে সংরক্ষিত হয়ে যেত। তিনি নিজেই দাবী করতেন যে, আমি কখনো সাদা কাগজ লিখে কালো করিনি। অর্থাৎ কখনো লিখিনি। কেউ কোন হাদীছ বর্ণনা করলে আমার স্মৃতিতে তা গেঁথে যায়। কারো

---

১৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৬৬
১৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১

কোন কথা একবার শুনলে তার পুনরাবৃত্তি আমি মোটেই পছন্দ করিনে।[১৫] শা'বী ও যুহ্‌রী বলতেন : আমরা কোন হাদীছ একবার শোনার পর কখনো তা দ্বিতীয়বার বলার জন্য অনুরোধ জানাইনি।[১৬]

তিনি জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানচর্চার প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য সবকিছু উজাড় করে দিতে এবং সব বাধা অতিক্রম করতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। তিনি বলতেন : যদি কেউ শামের এক প্রান্ত থেকে ইয়ামানের অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করে, তারপর তার ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে আসবে এমন একটি মাত্র কথা মুখস্থ করে, তাহলে আমি মনে করি তার এ ভ্রমণ ব্যর্থ হয়নি। তিনি আরো বলতেন, আমি যখনই আমার মত কোন ব্যক্তিকে দেখেছি এবং আমার চেয়ে বেশী জানা কোন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছি, তখনই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছি।[১৭]

তবে অন্যদের থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে বড় সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কেবল তাঁদের নিকট থেকেই হাদীছ গ্রহণ করতেন যাঁরা জ্ঞানের সাথে সাথে বুদ্ধি ও খোদাভীতির অলঙ্কারে সজ্জিত হতেন। এ ব্যাপারে তাঁর নীতি হলো, জ্ঞান সেই ব্যক্তির থেকে অর্জন করা উচিত যার মধ্যে যুহ্‌দ ও 'ইবাদাত এবং বুদ্ধি ও জ্ঞান দু'টোই বিদ্যমান থাকে। শুধু বুদ্ধি অথবা শুধু 'ইবাদাত যার মধ্যে আছে তিনি জ্ঞানের স্বরূপ ও প্রকৃতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। তিনি বলতেন, আজকাল আমি এমন সব লোকের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করতে দেখি যাদের না বুদ্ধি আছে, আর না আছে 'ইবাদাত।[১৮]

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের পরিধি অতি বিস্তৃত ছিল। তিনি তাঁর জীবনের এক পর্যায়ে বলতেন, আমি বিশ বছরের মধ্যে কারো মুখে এমন কোন নতুন হাদীছ শুনিনি যে সম্পর্কে আমি বর্ণনাকারী অপেক্ষা বেশী জ্ঞান রাখিনে।[১৯] হিজায, বসরা ও কূফা ছিল সে সময় হাদীছ চর্চার কেন্দ্রস্থল। 'আসিম আল-আহ্ওয়াল বলেন : আমি কূফা, বসরা ও হিজাযের মুহাদ্দিছদের বর্ণিত হাদীছের শা'বীর চেয়ে বড় কোন হাফিজ কাউকে দেখিনি।[২০] সুনান-এরও তিনি একজন বড় 'আলিম ছিলেন। মাকহূল বলেছেন, আমি শা'বীর চেয়ে সুনান-এর বড় কোন 'আলিম দেখিনি।[২১] ইবন আবী লায়লা বলতেন : শা'বী ছিলেন হাদীছের এবং ইবরাহীম ছিলেন কিয়াসের ধারক-বাহক।[২২]

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর এত ব্যাপক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। বেশী হাদীছ বর্ণনা করা মোটেই পছন্দ করতেন না। বলতেন, আমাদের সত্যনিষ্ঠ পূর্বসূরীরা হাদীছ বর্ণনা করা খারাপ মনে করতেন। যদি একথা

---

১৫. প্রাগুক্ত-১/৮৩
১৬. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/২২২
১৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৪২
১৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮২
১৯. প্রাগুক্ত-১/৮৮
২০. প্রাগুক্ত-১/৮৫
২১. তাবাকাত-৬/১৭৭
২২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮২

আমার আগে জানা থাকতো, যা আমি পরে জেনেছি, তাহলে আমি শুধু মুহাদ্দিছদের সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত হাদীছগুলো বর্ণনা করতাম।[২৩]

তবে তিনি 'রিওয়ায়াত বিল মা'না' (অর্থ ও ভাব বর্ণনা)-কে এ সতর্কতার পরিপন্থী বলে মনে করতেন না। অন্য কথায়, হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে হুবহু শ্রুত শব্দে বর্ণনা করতে হবে, তিনি এমনটি মনে করতেন না। ইবন 'আওন বর্ণনা করেছেন, শা'বী হাদীছ 'রিওয়ায়াত বিল মা'না' করতেন।[২৪]

'মাগাযী' শব্দটি 'গাযওয়া' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ যুদ্ধ-বিগ্রহ। মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিশেষতঃ ইসলামের প্রথম পর্বের যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ক জ্ঞানকে 'মাগাযী' বলে। পরবর্তীকালে এটি একটি বিশেষ শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইমাম শা'বী এ শাস্ত্রেরও একজন শীর্ষ স্থানীয় 'আলিম ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর মক্কা, মদীনা, বসরা, কূফাসহ ইসলামী খিলাফতের কেন্দ্রসমূহে 'মাগাযী' চর্চার বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এসব প্রতিষ্ঠান ছিল মসজিদ ভিত্তিক কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্র করে। কূফার জামে' মসজিদে শা'বীকে কেন্দ্র করে 'মাগাযী' চর্চার একটি 'হালকা' বা বেষ্টনী গড়ে ওঠে। মানুষ তাঁকে ঘিরে বসে যেত এবং তিনি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের (রা) যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলী শুনাতেন। বহু সাহাবী তখন জীবিত ছিলেন। এই 'হালকা'র পাশ দিয়ে তাঁরা আসা-যাওয়াও করতেন। এমনকি অনেক সাহাবী এমন ছিলেন যাঁরা এসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও তাঁর অনুপম বর্ণনা শুনে তাঁর জ্ঞান ও বর্ণনার তারীফ করতেন। একদিন তিনি 'মাগাযী' বর্ণনা করছেন। এমন সময় হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শা'বীর বর্ণনা শুনে মুগ্ধ হন এবং মন্তব্য করেন : সে যেসব মাগাযী'র কথা বর্ণনা করছে তার অনেকগুলোতে আমি অংশগ্রহণ করে নিজ চোখে দেখেছি, নিজ কানে শুনেছি, তা সত্ত্বেও সে আমার চেয়ে ভালো বর্ণনাকারী।[২৫]

শা'বী ছিলেন জাহিলী ও ইসলামী যুগের আরবের বিভিন্ন ঘটনা ও ইতিহাসের একজন পারদর্শী। তাঁর পারদর্শিতার বহু কথা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। একটি ঘটনার কথা তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

একবার দু'জন লোক পরস্পর গর্ব ও গৌরবের দাবী করতে করতে আমার নিকট আসে। তাদের একজন বানু 'আমির ও অন্যজন বানু আসাদ গোত্রের লোক। 'আমির গোত্রের লোকটি তার প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে ফেলে এবং তার কাপড় ধরে টানতে টানতে আমার দিকে নিয়ে আসে। আসাদ গোত্রের লোকটি তখন হেয় ও অপমানিত অবস্থায় অনুনয়-বিনয় করে বলতে থাকে : আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও।

---

২৩. প্রাগুক্ত-১/৮৩
২৪. তাবাকাত-৬/১৭৪
২৫. তাহযীব আত-তাহযীব-৫/৬৬; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৭৪

জবাবে 'আমির গোত্রের লোকটি বলছিল : আল্লাহর কসম! শা'বী আমাদের দু'জনের মধ্যে ফায়সালা না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়বো না। আমি 'আমির গোত্রের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললাম : তুমি তোমার প্রতিপক্ষকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের দু'জনের মধ্যে ফায়সালা করছি। এরপর আমি আসাদ গোত্রের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললাম : কি ব্যাপার, তার সামনে তোমাকে এত দুর্বল ও পরাভূত দেখছি কেন? অথচ তোমাদের রয়েছে এমন ছয়টি গর্ব ও গৌরবের বিষয় যা আরবের আর কোন গোত্রের নেই। যেমন :

১. তোমাদের মধ্যে এমন এক মহিয়ষী মহিলা ছিলেন যাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান সেরা মানব মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ (সা) এবং আল্লাহ তা'আলা সপ্তম আকাশের উপর থেকে তাঁদের দু'জনকে বিয়ে দেন। আর তাঁদের মধ্যে দূত হিসেবে কাজ করেন জিবরীল (আ)। সেই মহিলা হলেন উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা)। এই সম্মান ও গৌরব কেবল তোমার গোত্রের আছে। আরবের অন্য কোন গোত্রের নেই।

২. তোমাদের মধ্যে জান্নাতের অধিবাসী এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি এই মাটির পৃথিবীতে চলাফেরা করতেন। তিনি "উকাশা ইবন মিহ্‌সান'।[২৬] এটাও তোমাদের একটা গৌরবের বিষয়– যা আর কোন মানবগোষ্ঠীর নেই।

৩. ইসলামের প্রথম পতাকা তোমাদের এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যক্তিটি হলেন 'আবদুল্লাহ ইবন জাহ্‌শ (রা)।[২৭]

৪. ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বন্টনকৃত গণীমতের মাল ছিল 'আবদুল্লাহ ইবন জাহ্‌শ কর্তৃক দখলকৃত গণীমত।

৫. 'বাই'আতুর রিদওয়ান'[২৮]– এ প্রথম বাই'আতকারী ব্যক্তিটি ছিলেন তোমাদেরই এক ব্যক্তি। তোমাদের গোত্রের আবূ সিনান ইবন ওয়াহাব (রা) সেদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাতটি একটু বাড়িয়ে দিন বাই'আত করবো। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রশ্ন করলেন : কিসের উপর? তিনি জবাব দিলেন : আপনার মধ্যে যা আছে। রাসূল (সা) আবার প্রশ্ন করলেন : আমার মধ্যে কি আছে? বললেন : বিজয় অথবা শাহাদাত। রাসূল (সা) বললেন : হাঁ, ঠিক বলেছো। তারপর তাঁর বাই'আত গ্রহণ করেন। তারপর লোকেরা আবূ সিনানের (রা) বাই'আতের উপর বাই'আত করতে আরম্ভ করে।

৬. বদরের দিন মুহাজির যোদ্ধাদের এক সপ্তমাংশ ছিল তোমার গোত্র বানু আসাদের লোক।

---

২৬. 'উকাশা ইবন মিহসান (রা) একজন বিশিষ্ট সাহাবী। যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রথম খলীফার সময়কালে সংঘটিত রিদ্দার যুদ্ধে শহীদ হন। (আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮)

২৭. 'আবদুল্লাহ ইবন জাহশ (রা) সামরিক অভিযানে নেতৃত্বদানকারী একজন সাহাবী। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহশের (রা) ভাই।

২৮. হিজরী ৬ষ্ঠ সনে হুদায়বিয়াতে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পূর্বে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে এ বাই'আত অনুষ্ঠিত হয়।

এসব কথা শুনে 'আমির গোত্রের লোকটি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ক্ষেত্রে শা'বীর উদ্দেশ্য ছিল একজন দুর্বল পরাভূত ব্যক্তিকে শক্তিমান বিজয়ীর বিরুদ্ধে সাহায্য করা। সেদিন 'আমির গোত্রের লোকটিকে পরাভূত ও লাঞ্ছিত দেখলে তার গোত্রেরও অনেক গৌরব গাঁথা তিনি শুনাতে পারতেন।[২৯]

সেকালে প্রচলিত সকল প্রকার জ্ঞান ও শাস্ত্রে তাঁর সমান অধিকার থাকলেও ফিকাহ্ ছিল তাঁর বিশেষভাবে অধিত বিষয়। এ শাস্ত্রে তাঁর স্থান এত উঁচুতে ছিল যে, সে যুগে তাঁকে সবচেয়ে বড় ফকীহ্ বলে গণ্য করা হতো। আবূ হুসাইন বলতেন : আমি শা'বীর চেয়ে বড় ফকীহ্ কাউকে দেখিনি। কোন কোন 'আলিম তো তাঁকে তাঁর যুগের সকল ইমামের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করতেন। আবূ মিজলায বলতেন, আমি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, তাউস, 'আতা', হাসান আল-বসরী, ইবন সীরীন- এঁদের কাউকে শা'বীর চেয়ে উঁচু স্তরের ফকীহ্ দেখিনি।[৩০]

ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ, যিনি নিজে একজন খুব বড় ফকীহ্, শা'বীর ফিকাহ্র জ্ঞানের প্রতি এত আস্থাশীল ছিলেন যে, কোন মাসআলার সমাধান তাঁর জানা না থাকলে প্রশ্নকারীকে শা'বীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। তিনি অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। এমন সময় নিকটেই শা'বীকে যেতে দেখলেন। তিনি প্রশ্নকারীকে বললেন, এই যে শায়খ যাচ্ছেন তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। আর তিনি যে জবাব দেন তা আমাকে একটু জানিয়ে যাবে। প্রশ্নকারী লোকটি শা'বীকে মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলো। তিনিও অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। আন-নাখা'ঈ শা'বীর এ জবাব শুনে মন্তব্য করেন, আল্লাহর কসম! এই হচ্ছে ফিক্হ। একেই বলে 'আলিম।[৩১]

ফিকাহ্ শাস্ত্রে শা'বীর পরিপূর্ণতা এতখানি ছিল যে, সাহাবায়ে কিরাম, যাঁরা ছিলেন নবীর (সা) 'ইল্ম ও মা'রিফাতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তাঁদের বর্তমানে তিনি ইফতার মত গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হন। আবূ বকর আল-হুযালী বলেন। ইবন সীরীন আমাকে বললেন, তুমি শা'বীর সাহচর্য অবলম্বন করবে। কারণ, সাহাবীদের বিরাট একটি সংখ্যার বর্তমানে আমি তাঁকে ফাতওয়া দিতে দেখেছি।[৩২]

হাদীছের মত ফিকাহ্তেও তিনি ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আর এ কারণে, সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। সাল্ত ইবন বাহ্রাম বলেন, জ্ঞানে শা'বীর সমকক্ষ এমন কোন ব্যক্তিকে আমি শা'বীর চেয়ে- 'আমি জানিনে'- কথাটি বেশী বলতে দেখিনি।[৩৩] ইবন 'আওন বলেন, শা'বীর নিকট যখন

---

২৯. সওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৭৪-১৭৬
৩০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১, ৮৭
৩১. তাবাকাত-৬/১৭৪; আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/২১৭
৩২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১
৩৩. তাবাকাত-৬/১৭৪;

কোন মাসআলা আসতো, তিনি যথাসম্ভব উত্তর এড়িয়ে যেতেন। আর ইবরাহীম উত্তর দিয়েই চলতেন। তিনি আরো বলেন, শা'বী ছিলেন স্বভাবগতভাবে বহির্মুখী, আর ইবরাহীম ছিলেন অন্তর্মুখী। কিন্তু যখন দু'জনের সামনে কোন ফাতওয়ার বিষয় এসে যেত তখন উভয়ের স্বভাব পাল্টে যেত। শা'বী সংযত হয়ে যেতেন, আর ইবরাহীমের মুখ খুলে যেত।[৩৪]

যাই হোক না কেন, তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট 'আলিম এবং উঁচু স্তরের একজন ফকীহ্। কূফার ইফতা'র পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। অসংখ্য মানুষের কেন্দ্রবিন্দুও ছিলেন তিনি। তাই সব সময় 'জানিনে' বলে পার পেতেন না। অনেক মাসআলার জবাব দিতেই হতো। তবে এতটুকু সতর্কতা সব সময় অবলম্বন করতেন যে, তাঁর জবাবের ভিত্তি হতো কুরআন ও হাদীছ। নিজের মতামতের কোন গুরুত্বই দিতেন না। একবার তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো। আর সেই ব্যাপারে তাঁর কোন হাদীছ জানা ছিল না। তাই জবাব দানে অপারগতা প্রকাশ করলেন। এক ব্যক্তি বললো, আপনি আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। বললেন, আমার মতামত দিয়ে কি করবে? তার উপর প্রস্রাব কর।[৩৫]

তিনি বলতেন, আমরা ফকীহ্ নই। তবে আমরা হাদীছ শুনেছি, তাই বর্ণনা করে থাকি। প্রকৃত ফকীহ্ তো তাঁরা, যাঁরা যাকিছু জানে তা আমল করে।[৩৬] একবার কোন এক ব্যক্তি তাঁকে সম্বোধন করে এভাবে : ওহে ফকীহ্ 'আলিম, আমার প্রশ্নের জবাব দিন। তিনি বলেন : তোমার জন্য দুঃখ হয়। আমি যা নই তা বলে আমাকে ফুলিও না। ফকীহ্ তো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর হারামকৃত বস্তু থেকে দূরে থাকে, আর 'আলিম সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভয় করে। আমি এর কোনটিতে পড়ি?[৩৭]

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। তিনি জবাব দিলেন এভাবে : এ মাসআলায় 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এরকম বলেছেন, 'আলী (রা) এরকম বলেছেন। প্রশ্নকারী বললো : আবূ 'আমর! আপনি কি বলেন? তিনি একটু লাজুকভাবে হেসে দিয়ে বলেন : 'উমার ও 'আলীর (রা) কথা শোনার পর আমার কথা দিয়ে তুমি কী করবে?

শরী'আতের বিষয়সমূহে তিনি মাযহাব ও 'আকীদাগত দিক দিয়েই শুধু কিয়াসকে খারাপ জানতেন না, বরং বুদ্ধি ও যুক্তির ভিত্তিতেও সে কথা বলতেন।

একবার তিনি আবূ বকর আল-হুযালীকে এর রহস্য বুঝানোর জন্য তাঁকে প্রশ্ন করেন : আচ্ছা, যদি আহনাফ ইবন কায়স এবং তাঁর সাথে একটি শিশুকে হত্যা করা হয় তাহলে দু'জনের দিয়াত (রক্তমূল্য) কি সমান হবে, না আহনাফের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য তাঁর দিয়াত বেশী হবে? আবূ বকর জবাব দিলেন : সমান হবে। শা'বী বললেন : তাহলে

---

৩৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৫
৩৫. তাবাকাত-৬/১৭৪
৩৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৫
৩৭. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/২২০

কিয়াসের কোন ভিত্তি নেই। কারণ, কিয়াসের দাবী এটাই ছিল যে, আহ্নাফের দিয়াত বেশী হোক। উল্লেখ্য যে, আহ্নাফ একজন সর্বগুণে গুণান্বিত অতি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান তাবি'ঈ ছিলেন।

এত বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দায়িত্ব অনুভূতি এত প্রবল ছিল যে, তিনি আফসোসের সুরে বলতেন : হায়! যদি আমাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হতো, আমাকে যদি আমার 'ইলমের জবাবদিহী করতে না হতো এবং আমাকে যদি এর কোন বিনিময়ও দেওয়া না হতো![৩৮] দাউদ ইবন ইয়াযীদ বলেন, আমি শা'বীকে বলতে শুনেছি : যদি আমি নিরানব্বইটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিই, আর একটি মাত্র জবাবে ভুল করি, তাহলে মানুষ আমাকে সেই একটিতেই ধরে বসবে।[৩৯]

দীনী-'ইলমের অধিকারী 'আলিমরা সাধারণত অংক শাস্ত্রের মত জ্ঞানের প্রতি তেমন আগ্রহী হননা। তবে শা'বী এ শাস্ত্রেরও একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। এ শাস্ত্রের জ্ঞান তিনি হারিছ আল-আ'ওয়ারের নিকট থেকে অর্জন করেন।[৪০]

অংকে দক্ষতার কারণে ফারায়েজ শাস্ত্রেও তার পূর্ণ অধিকার ছিল। এ শাস্ত্রটি তিনি সম্ভবত 'আলীর (রা) নিকট থেকে শিখেছিলেন। অনেকে মনে করেন, 'আলীর (রা) থেকে সরাসরি নয়, বরং তাঁর বাণী থেকে তিনি এটা বের করেন।[৪১]

শা'বীর মধ্যে কাব্যরুচিও ছিল। প্রাচীন আরবের কবিদের কবিতার হাজার হাজার শ্লোক তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি দাবী করতেন, আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে একাধারে একমাস পর্যন্ত কবিতা শুনাতে পারি এবং কোন কবিতার পুনরাবৃত্তি হবে না। তিনি নিজেও কবিতা রচনা করতেন। কাব্যশাস্ত্রে তাঁর এত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বলতেন, আমি যেসব জ্ঞান অর্জন করেছি, তার মধ্যে কবিতার জ্ঞানই সবচেয়ে কম।[৪২] তিনি মসজিদে কবিতা পাঠের আসর বসাতেন। ইবন আবী লায়লা বলেন : আমি শা'বীকে লাল চাদর ও হলুদ পায়জামা পরে মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে দেখেছি।[৪৩]

সাহাবায়ে কিরামের বর্তমানেই 'হালকায়ে দারস' চালু হয়ে গিয়েছিল। ইবন সীরীন বর্ণনা করেছেন, আমি যখন কূফায় আসি তখন শা'বীর 'হালকায়ে দারস' চালু ছিল এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের বিশাল একটি সংখ্যা তখনও বর্তমান ছিলেন। তাঁর হালকায়ে দারসে বেশী লোকের উপস্থিতি পছন্দ করতেন না। বলতেন : হালকা বেশী বড় হয়ে গেলে কোলাহলের স্থানে পরিণত হয়।

যে সকল মসজিদের হালকায়ে দারসে শোরগোল হতো সেগুলো ছেড়ে দিতেন। সালিহ ইবন কাইসান বলেন, একবার আমি ও শা'বী দু'জন হাত ধরাধরি করে হেলতে দুলতে

---

৩৮. তাবাকাত-৬/১৭৪
৩৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮২
৪০. তাবাকাত-৬/১৭৩
৪১. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৫/৬৭
৪২. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৫/২৭৫; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৭৩
৪৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৮

মসজিদে পৌঁছলাম। সেখানে হাম্মাদের (রহ) মাজমা' ছিল এবং শোরগোল হচ্ছিল। শা'বী সেই শোরগোল শুনে বললেন, আল্লাহর কসম! এই হাটুরে লোকেরা এই মসজিদটিকে বিরক্তিকর করে তুলেছে। একথা বলে তিনি ফিরে চললেন।[৪৪]

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের পরিধি ছিল অনেক বিস্তৃত। যেহেতু তিনি ছিলেন বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী, তাই সকল শাস্ত্রে তাঁর শিষ্য-শাগরিদের সংখ্যাও অনেক। এখানে কেবল হাদীছ শাস্ত্রের কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ, সা'ঈদ ইবন 'আমর ইবন আশওয়া', ইসমা'ঈল ইবন আবী খালিদ, বায়ান ইবন বিশর, হুসাইন ইবন 'আবদির রহমান, দাউদ ইবন আবী হিন্দা, যুবায়দ আল-ইয়ামানী, যাকারিয়া ইবন আবী যায়িদা, সা'ঈদ ইবন মাসরূক, সালামা ইবন কুহায়ল, আবূ ইসহাক শাইবানী, আ'মাশ, মানসূর, মুগীরা, সাম্মাক ইবন হারব, আসিম আল-আহওয়াল, আবুয যানাদ, ইবন 'আওন, 'আবদুল মালিক ইবন সা'ঈদ, 'আওন ইবন 'আবদিল্লাহ, কাতাদা, মুজালিদ ইবন সা'ঈদ, মাতরাব ইবন তুরায়ফ, আবূ হায়্যান আত-তায়মী ও আরো অনেকে।[৪৫]

সে যুগের সকল বড় 'আলিম ও ইমামের নিকট তাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকৃত ছিল। সবাই তাঁকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। হাসান আল-বসরী তাঁকে বহু জ্ঞানের আধার বলতেন।[৪৬] সে যুগের বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী চারজনের একজন ছিলেন তিনি। ইমাম যুহ্‌রী বলতেন: 'আলিম চারজন। মদীনায় সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, কূফায় 'আমির আশ-শা'বী, বসরায় হাসান আল-বসরী এবং শামে মাকহূল। ইবন 'উয়াইনা বলেন, লোকেরা বলতো, ইবন 'আব্বাস, শা'বী ও ছাওরী– এ তিনজনের প্রত্যেকেই তাঁদের আপন আপন যুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'আলিম ছিলেন।[৪৭] আল-জাহিজ শা'বীর নামটি মু'আল্লিমদের (শিক্ষক) নামের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[৪৮]

জীবনের প্রথম দিকে তিনি শি'আ মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাদের কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা এবং তাদের ভারসাম্যহীন কথাবার্তা দেখে-শুনে তাদের মতবাদ থেকে তাওবা করেন। তাদের নিন্দা-মন্দও করতে থাকেন। তবে আহলি সুন্নাতের 'আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করার পরেও সাধারণ মযহাব পরিবর্তনকারীদের মত মধ্যপন্থার বাইরে যাননি। তিনি বলতেন, সত্যনিষ্ঠ মু'মিন এবং সত্যনিষ্ঠ বানূ হাশিমকে বন্ধু বানাবে। তবে শী'আ হবে না। আর যে জিনিস তোমাদের জ্ঞানের মধ্যে নেই, সে ক্ষেত্রে ভালোর আশা রেখ। তবে মুরজিয়া হয়োনা। এই বিশ্বাস রেখ যে, তোমাদের সব ভালো কাজ আল্লাহর পক্ষ

---

৪৪. তাবাকাত-৬/১৭৫, ১৭৭; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮২
৪৫. তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব-৫/৬৬
৪৬. প্রাগুক্ত-৫/৬৭
৪৭. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৪২; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮২
৪৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৫১

থেকে হয়, আর সব খারাপ কাজ তোমাদের কু-প্রবৃত্তি থেকে হয়। তবে কখনো কাদরিয়া হবে না। যাকেই তোমরা ভালো কাজ করতে দেখবে তাকে বন্ধু ভাববে।[৪৯]

ইমাম শা'বীর যুগে কট্টরপন্থী শি'আ রাফিজী[৫০] গ্রুপের উৎপাত ও দৌরাত্ম্য দারুণ বেড়ে গিয়েছিল। তারা আবূ বকর ও 'উমারের (রা) খিলাফত সঠিক নয় বলে তা প্রত্যাখ্যান করতো এবং 'আলীকে (রা) 'উছমানের (রা) উপর প্রাধান্য দিত। শি'আদের অন্যান্য দল ও গোষ্ঠী এই রাফিজীদের মত এত চরমপন্থী ছিল না। ইমাম শা'বী রাফিজীদেরকে ভীষণ ঘৃণা করতেন এবং প্রকাশ্যে তাদের মত ও বিশ্বাসের কঠোর সমালোচনা করতেন। মালিক ইবন মু'আবিয়া বলেন, একবার আমি ও শা'বী রাফিজী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বলেন : হে মালিক! আমি যদি চাই যে, রাফিজীদের সকল সদস্য আমার দাসে পরিণত হোক এবং তারা আমার ঘর-বাড়ী সোনা দিয়ে ভরে দিক, আর তার বিনিময়ে আমি তাদের পক্ষে 'আলীর (রা) প্রতি ছোট্ট একটি মিথ্যা আরোপ করি, তাহলে তারা তাতে রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু আমি, আল্লাহর কসম! কখনো 'আলীর (রা) প্রতি কোন মিথ্যা আরোপ করবো না। মালিক! আমি প্রবৃত্তির অনুসারী সব দল-গোষ্ঠীর চিন্তা-বিশ্বাস অধ্যয়ন করেছি, কিন্তু রাফিজীদের মত নির্বোধ কোন সম্প্রদায়কে দেখিনি। তারা জন্তু-জানোয়ার হলে গাধা হতো, আর পাখী হলে হতো মর্দা শকুন। আমি তোমাকে প্রবৃত্তির অনুসারী সকল পথভ্রষ্টদের থেকে সতর্ক থাকতে বলি। আর এদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে রাফিজী। তারা এই উম্মাতের ইয়াহূদী। তারা ইসলামকে হিংসা করে যেমন ইয়াহূদীরা করে খ্রীষ্ট ধর্মকে। তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অথবা আল্লাহর ভয়ে ইসলামে ঢোকেনি। বরং মুসলমানদের প্রতি ক্রোধ ও শত্রুতাবশত ইসলামে ঢুকেছে। 'আলী ইবন আবী তালিব (রা) তাদের অনেককে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছেন এবং অনেককে বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে তাড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন : 'আবদুল্লাহ ইবন সাবাকে সাবাতে, 'আবদুল্লাহ ইবন সাবাবকে আল-জাযুরে এবং আবুল কারাওয়াসকে অন্যত্র তাড়িয়ে দেন। কারণ, রাফিজীদের কর্মকাণ্ড ইয়াহূদীদের কর্মকাণ্ডের মতই। ইয়াহূদীরা বলে থাকে, রাজত্ব কেবল দাউদের বংশধারার মধ্যেই থাকবে। আর রাফিজীরা বলে, খিলাফত কেবল 'আলী ইবন আবী তালিবের (রা) বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ইয়াহূদীরা বলে, প্রতীক্ষিত আল-মাসীহর আবির্ভাব পর্যন্ত কোন জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ নেই। তখন আসমান থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে। আর রাফিজীরা বলে : ইমাম আল-মাহদীর আগমনের আগ পর্যন্ত কোন জিহাদ নেই। তখনো আসমান থেকে ঘোষণা দেওয়া হবে। ইয়াহূদীরা আকাশের তারকারাজি স্পষ্টভাবে দেখা না যাওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামায দেরী করে। রাফিজীরাও তাই করে। ইয়াহূদীরা তিন তালাককে কিছুই মনে করে না, রাফিজীরাও তাই করে। ইয়াহূদীরা

---

৪৯. তাবাকাত-৬/১৭৩

৫০. 'রাফিজী' শব্দটি আরবী "رفض" শব্দ থেকে নির্গত, যার অর্থ পরিত্যাগ করা, প্রত্যাখ্যান করা। যেহেতু এই দলের লোকেরা আবূ বাক্র (রা) ও 'উমারকে (রা) এবং তাঁদের দু'জনের খিলাফতকে যাঁরা সঠিক বলে মানেন, তাঁদের সকলকে পরিত্যাগ ও প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাই তাদেরকে রাফিজী বলা হয়। (আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/৪০৪)

মহিলাদের জন্য ইদ্দাতের প্রয়োজন মনে করে না। রাফিজীরাও তাদের মত একই রকম বিশ্বাস করে। ইয়াহূদীরা প্রতিটি মুসলমানের রক্ত ঝরানো বৈধ মনে করে। রাফিজীরাও তাই করে। ইয়াহূদীরা তাওরাত জ্বালিয়ে দিয়েছে। রাফিজীরাও কুরআন জ্বালিয়েছে। ইয়াহূদীরা জিবরীলকে (আ) ঘৃণা করে এবং বলে, সে ফিরিশতাদের মধ্যে আমাদের একমাত্র শত্রু। তেমনিভাবে রাফিজীরা বলে : জিবরীল ওহী আলীর নিকট না পৌছিয়ে ভুল করে মুহাম্মাদের নিকট পৌছিয়েছে। ইয়াহূদীরা উটের গোশত খায়না, রাফিজীরাও খায় না। দু'টি বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ইয়াহুদী ও নাসারাদের শ্রেষ্ঠত্ব আছে রাফিজীদের উপর। যেমন ঃ কোন ইয়াহূদীকে যদি প্রশ্ন করা হয় তোমাদের মিল্লাতের সবচেয়ে ভালো মানুষ কারা? উত্তর দিবে : মূসার (আ) সঙ্গী-সাথীরা। আর একই প্রশ্ন কোন নাসারাকে করলে বলবে : 'ঈসার (আ) সঙ্গী-সাথীরা। আর যদি রাফিজীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় : তোমাদের মিল্লাতের সবচেয়ে খারাপ মানুষ কারা? বলবে : মুহাম্মাদের (সা) সাহাবীরা। আল্লাহ্ তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনার আদেশ করেছেন, আর এই রাফিজীরা তাঁদেরকে গালি দেয়। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মাথার উপর তরবারি খোলা থাকবে। তাদের পা কখনো দৃঢ় হবে না, তাদের পতাকাও কোন দিন উড়বে না, তারা কখনো ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না, এবং তারা সব সময় বিভেদ-বিভক্তিতে লিপ্ত থাকবে। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিবে, আল্লাহ্ তা নিভিয়ে দিবেন।[৫১]

তিনি সে যুগের জটিল রাজনৈতিক বিতর্ক, যথা : 'উছমানের (রা) হত্যাকাণ্ড, 'আলী-মু'আবিয়ার (রা) দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং 'আলীর (রা) হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা থেকে বিরত থাকতেন। একবার তাঁর এক সঙ্গী তাঁকে প্রশ্ন করলেন : আবূ 'আমর! এই দু' ব্যক্তির বিষয় নিয়ে মানুষ যেসব কথা বলে সে ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

তিনি প্রশ্ন করলেন : আপনি কোন দু'ব্যক্তির কথা বলছেন? সঙ্গীটি বললেন : 'উছমান ও 'আলী (রা)।

তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! কিয়ামতের দিন আমি 'উছমান অথবা 'আলীর (রা) বিতর্কে জড়াতে চাইনে।

শা'বী এত বড় জ্ঞানী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও অতি সাধারণ কোন মানুষের নিকটে শিক্ষণীয় কিছু থাকলে কখনো উপেক্ষা করতেন না। একজন মরুচারী বেদুঈন নিয়মিতভাবে তাঁর মজলিসে উপস্থিত থাকতো। কিন্তু সে কোন কথা বলতো না। চুপ করে শা'বী ও অন্যদের কথা শুনতো। একদিন শা'বী তাঁকে প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা, তুমি কোন কথা বল না কেন? লোকটি বললো : আমি চুপ থাকি নিরাপদ থাকার জন্য, আর শুনি জানার জন্য।[৫২] একজন মানুষের কানের অংশটি তার নিজের দিকে ফিরে আসে, আর তার জিহ্বার অংশটি অন্যের দিকে চলে যায়। বেদুঈন লোকটির এই উক্তিটি তিনি সারা জীবন আওড়িয়ে গেছেন।[৫৩]

---

৫১. প্রাগুক্ত-২/৪০৯-৪১০
৫২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৯৪
৫৩. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৮১

শা'বী ছিলেন স্বভাবগতভাবে কোমল প্রকৃতির এবং ধৈর্যশীল। হাসান আল-বসরী (রহ) বলতেন, আল্লাহর কসম! শা'বী ছিলেন একজন জ্ঞানী ও ধৈর্যশীল প্রকৃতির মানুষ।[৫৪] তিনি নিজের তিনটি গুণের কথা এভাবে বলেছেন : 'আমি কখনো এমন কোন জিনিস লাভের জন্য নিজের স্থান থেকে উঠিনি যার দিকে মানুষ তাকায়। আমার নিজের কোন দাস বা চাকর-বাকরকে কখনো মারিনি। আমার যে কোন আত্মীয়-বন্ধু ঋণ অবস্থায় মারা গেছে, আমি তার ঋণ পরিশোধ করেছি।[৫৫]

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে খুব খারাপ ও অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে। তিনি কোন প্রত্যুত্তর না করে শুধু এতটুকু বলেন! তোমার কথায় যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন। আর যদি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন।[৫৬] একবার কূফার আমীর 'উমার ইবন হুবাইরা একদল লোককে গ্রেফতার করেন। তিনি নিজে আমীরের সাথে দেখা করে বলেন : আপনি যদি অন্যায় ও অসত্যের ভিত্তিতে তাদেরকে গ্রেফতার করে থাকেন তাহলে সত্য তাদেরকে বের করে আনবে। আর যদি সত্যের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে থাকেন তাহলে আপনার ক্ষমা তাদেরকে বেষ্টন করবে। তাঁর এমন চমৎকার উপস্থাপনায় আমীর দারুণ খুশী হন এবং তাঁর সম্মানে গ্রেফতারকৃত সকলকে মুক্তি দেন।[৫৭]

জ্ঞানের সাগর হওয়া সত্ত্বেও তিনি একজন হাসি-খুশী স্বভাবের দারুণ রসিক ও কৌতুকপ্রিয় মানুষ ছিলেন। ইবন খাল্লিকান তাঁকে 'মায্‌যাহ' বা অতিরিক্ত কৌতুককারী বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৮] হাস্য-রসিকতার উপাদান তাঁর স্বভাবে এত পরিমাণে ছিল যে, কথায় কথায় হাস্য-রসের সৃষ্টি করে মানুষকে হাসাতেন। তাঁর হাস্য-রসের অনেক কথা বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো : আচ্ছা, ইবলীসের স্ত্রীর নাম কি? জবাবে তিনি বললেন, তার বিয়ের অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম না। তাই আমার জানা নেই।[৫৯] একবার এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করলো, ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তান কি তিনজনের মধ্যে (পিতা, মাতা ও সন্তান) সবচেয়ে বেশী খারাপ? জবাবে তিনি বললেন : যদি তাই হতো তাহলে ঐ সন্তান পেটে থাকতেই তার মাকে সংগেসার (প্রস্তারাঘাতে হত্যা) করা হতো। উল্লেখ্য যে, ব্যভিচারিণীর পেটে সন্তান থাকলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তার সকল শাস্তি স্থগিত রাখার বিধান রয়েছে।[৬০] একবার তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে

---

৫৪. তাহ্‌যীবুত তাহযীব-৫/৬৭

৫৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮১

৫৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/২৭৬; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৭৮; 'উয়ূন আল-আখবার-১/৩২৬

৫৭. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/১৮৮

৫৮. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৪৪

৫৯. 'উয়ূন আল-আখবার-১/৩৬৫; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮৭

৬০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮১

বসে কথা বলছেন। এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি সেখানে এসে প্রশ্ন করলো : আপনাদের দু'জনের মধ্যে শা'বী কে? তিনি স্ত্রীর দিকে ইঙ্গিত করেন।[৬১]

'আমর ইবন সা'ঈদ বর্ণনা করেছেন। আমি একবার শা'বীকে বললাম, আপনি আমার নিকট একটি হাদীছ বর্ণনা করেছিলেন। আমি সেটি এখন ভুলতে বসেছি। তিনি বললেন : কিছু অংশ বললে আমি বুঝতে পারবো সেটি কোন হাদীছ। আমি বললাম, কিছুই মনে নেই। শা'বী একটি হাদীছ শুনিয়ে বললেন, এটা না তো? বললাম ঃ না। তিনি আরেকটি হাদীছ শুনিয়ে বললেন, সম্ভবত এটা হবে। আমি বললাম, এটাও না। অবশেষে তিনি একটি প্রেম সংগীতের একটি শ্লোক আবৃত্তি করে বলেন : সম্ভবত এটা হবে।[৬২]

একবার ইরাকের আমীর হাজ্জাজ শা'বীকে প্রশ্ন করলেন : كم عطاءك فى السنة- বছরে আপনার ভাতা কত? এখানে মূলতঃ فى السنة – কথাটি বলা ঠিক নয়। এ কারণে শা'বীও ভুল উত্তর দেন এবং ألفين – বলেন। অর্থাৎ দু'হাজার। অথচ الفين এর স্থলে الفان বলা উচিত ছিল। তাঁর উত্তর শুনে হাজ্জাজ নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং কথাটি ঠিক করে বলেন : كم عطاؤك؟। এবার শা'বী الفان – বলেন। এবার হাজ্জাজ শা'বীকে বলেন, আপনি প্রথমে ভুল আরবীতে উত্তর দিলেন কেন? জবাবে তিনি বলেন, আমীর ভুল করেছিলেন। যখন আমীর ঠিক করে বলেন, তখন আমিও ঠিক করে বলেছি। আমীর ভুল বলবেন আর আমি শুদ্ধ বলবো, এমনটি হওয়ার তো সুযোগ ছিল না। হাজ্জাজ তাঁর কথায় দারুণ খুশী হন এবং তাঁকে পুরস্কৃত করেন।[৬৩]

একবার শা'বী তাঁর মজলিসে বসে শিষ্য-শাগরিদ ও বন্ধুদের সাথে ফিকাহ্ বিষয়ে আলোচনা করছেন। এক বৃদ্ধ শা'বীর পাশে অনেকক্ষণ বসে আছেন। এক সময় একটু ফাঁক পেয়ে শা'বীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন : আমি আমার নিতম্বে একটা ফোঁড়া হয়েছে বলে মনে করছি। এটাতে শিঙ্গা লাগানোর ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন? সাথে সাথে শা'বী বলে ওঠেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ حَوَّلَنَا مِنَ الْفِقْهِ إِلَى الْحِجَامَةِ.

– সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদেরকে ফিকাহ্ থেকে শিঙ্গার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।[৬৪]

একবার তিনি এক দর্জিকে কৌতুক করে বলেন, আমার কাছে ভাঙ্গা প্রেম-প্রীতি আছে আপনি কি সেটা সেলাই করতে পারেন? দর্জিও ছিল তাৎক্ষণিক জবাব দানে পারঙ্গম। সে বলে, যদি আপনার কাছে বাতাসের সূতা থাকে তাহলে সেলাই করা যাবে।[৬৫]

---

৬১. 'উয়ূন আল-আখবার-১৩৬৪
৬২. তাবাকাত-৬/১৭৪
৬৩. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৪৪; আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/১২৫
৬৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৩২২
৬৫. 'উয়ূন আল-আখবার-১/৩৬৪; শাযারাত আয-যাহাব-১/১২৭

একবার তিনি এক খ্রীস্টানকে ইসলামী কায়দায় السلام عليكم ورحمة الله – বলে সালাম দেন। এক ব্যক্তি তাঁর এমন কাজের প্রতিবাদ জানায়। তিনি জবাব দেন এই বলে : যদি তার উপর আল্লাহর রহমত না হতো তাহলে সে ধ্বংস হয়ে যেত। তাহলে আমার رحمة الله বলাতে ভুল কোথায়?

তাঁর সমকালীনদের মধ্যে যাঁদের সাথে বেশী খোলামেলা ও অন্তরঙ্গতা ছিল হাস্য-রসিকতা করে তাদেরকে অস্থির করে তুলতেন। এ কারণে বন্ধুদের অনেকে তাঁর কাছে যেতেই ভয় করতেন। হাফস ইবন গিয়াছ একবার একটি মাসআলায় নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারে আল-আ'মাশকে বললেন, আপনি শা'বীর নিকট যাচ্ছেন না কেন? বললেন, আমি তাঁর কাছে কিভাবে যাব। তিনি আমাকে দেখা মাত্র ঠাট্টা করা আরম্ভ করেন। আমাকে বলবেন, তোমার যে চেহারা, এ কি কোন 'আলিমের চেহারা? এতো কোন তাঁতীর চেহারা, কিন্তু আমি যদি ইবরাহীমের নিকট যাই, তিনি আমাকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করেন।[৬৬]

উমাইয়্যা শাসনকালে শা'বীকে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত এবং জাতীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেবায় নিয়োজিত দেখা যায়। হাজ্জাজ তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। তাঁর বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করেন, তাঁকে তাঁর গোত্রের নেতা বানান এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে খলীফা আবদুল মালিকের দরবারে পাঠান। একবার সিজিস্তানের ওয়ালী রাতবীলের নিকট দূত হিসেবে পাঠান। সেখানে তিনি প্রচুর সম্মান ও উপহার-উপঢৌকন লাভ করেন।[৬৭]

'আবদুল মলিক ইবন মারওয়ান মুসলিম খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফকে লিখলেন : 'দীন ও দুনিয়ার জন্য উপযুক্ত এমন একজন লোক আমার কাছে পাঠান যাকে আমি আমার সঙ্গী ও কথা বলার লোক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।' হাজ্জাজ শা'বীকে পাঠালেন। আস্তে আস্তে তিনি খলীফার ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে পরিগণিত হন। জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে খলীফা তাঁর জ্ঞান ও মতামত থেকে উপকৃত হতে থাকেন। বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাদের নিকট তাঁর দূত হিসেবেও পাঠাতে থাকেন। একবার খলীফা তাঁকে দূত হিসেবে রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ানের নিকট পাঠান। তিনি রোমান সম্রাটের দরবারে পৌঁছে খলীফার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সম্রাট তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তা দেখে অভিভূত হন এবং তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতা, জোরালো বাকপটুতা ও তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর ক্ষমতা তাঁকে বিস্মিত করে। শা'বীর দূতিয়ালী শেষ হওয়ার পর সম্রাট বিদেশী দূতদের সাথে তাঁর স্বাভাবিক আচরণের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তাঁকে আরো কিছু দিন নিজের কাছে রেখে দেন। কিছু দিন সম্রাটের সাথে কাটানোর পর তিনি দিমাশকে ফেরার অনুমতি দানের জন্য সম্রাটকে বার বার অনুরোধ জানাতে থাকেন। একদিন রোমান সম্রাট তাঁকে প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি

---

৬৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮২
৬৭. তাবাকাত-৬/১৭৩

আপনাদের দেশের রাজপরিবারের একজন সদস্য? জবাবে তিনি বললেন : না। আমি আমার দেশের সাধারণ মুসলমান নাগরিকদের একজন। একদিন সম্রাট তাঁকে দেশে ফেরার অনুমতি দিলেন। যাত্রাকালে তাঁকে বললেন : দেশে ফিরে আপনি যখন আপনার বন্ধুকে (আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান) আপনার দূতিয়ালীর সব কথা জানাবেন তখন তাঁকে এই চিঠিটি দিবেন।

শা'বী দিমাশ্‌কে ফিরে এসে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং জাস্টিনিয়ানের দরবারে যা কিছু শুনেছেন ও দেখেছেন তার বর্ণনা দিলেন। খলীফা তাঁকে যেসব প্রশ্ন করলেন তারও জবাব দিলেন। তারপর উঠার সময় খলীফাকে বললেন : আমীরুল মু'মিনীন, রোমান সম্রাট আপনাকে এই চিঠিটি দিয়েছেন। একথা বলে চিঠিটি খলীফার হাতে দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

খলীফা চিঠিটি পড়ার পর চাকরদের বললেন : শা'বীকে ফিরিয়ে আন। তারা তাঁকে ফিরিয়ে খলীফার কাছে নিয়ে গেল। তিনি শা'বীকে বললেন : আচ্ছা, এই চিঠির বিষয়বস্তু কি আপনার জানা আছে? শা'বী বললেন : আমীরুল মু'মিনীন, আমার জানা নেই। খলীফা বললেন : রোমান সম্রাট আমাকে লিখেছেন : আমি আরবদের ব্যাপারে বিস্মিত হয়েছি যে, তারা এই যুবক ছাড়া অন্য এক ব্যক্তিকে তাদের রাজা বানালো কিভাবে?

শা'বী খুব দ্রুত বললেন : আপনাকে দেখেননি, তাই একথা বলেছেন। দেখলে আর এমন কথা বলতেন না। আর আমি এই চিঠির মর্ম আগে জানতে পারলে নিয়ে আসতাম না। খলীফা শা'বীকে লক্ষ্য করে বললেন : রোমান সম্রাট চিঠিতে একথা লিখলেন কেন, তাকি জানেন? শা'বী জবাব দিলেন, আমীরুল মু'মিনীন, আমি জানিনে। খলীফা বললেন : তিনি এই লেখার দ্বারা আপনার প্রতি আমাকে ঈর্ষান্বিত করে তুলতে চেয়েছেন। ফলে আমি আপনাকে হত্যা করে আপনার থেকে মুক্ত হই, তাই বুঝাতে চেয়েছেন। একথা রোমান সম্রাটের কাছে পৌঁছলে তিনি মন্তব্য করেন : তাঁর পিতার সর্বনাশ হোক! আমি এছাড়া আর কিছুই বুঝাতে চাইনি।[৬৮]

উমাইয়্যা শাসকদের সাথে তাঁর এ সম্পর্ক বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। হাজ্জাজ ও 'আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে ইবনুল আশ'আছের বিদ্রোহের সময় তিনি ইবনুল আশ'আছকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেন। এই ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন যে, হাজ্জাজ আমাকে আমার গোত্রের, তথা গোটা হামাদান এলাকার দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন। আমার বেতনও নির্ধারণ করে দেন। ইবনুল আশ'আছের বিদ্রোহ ও সংঘাত-সংঘর্ষ পর্যন্ত তাঁর নিকট আমার একটা স্থান ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল। ইবনুল আশ'আছের বিদ্রোহ ও বিপ্লবের এক পর্যায়ে কূফার কারীদের (কুরআনের পাঠ বিশেষজ্ঞ) পক্ষ থেকে কিছু লোক আমার কাছে এসে বলেন : আপনি হলেন কারীদের নেতা। আপনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁরা এত পীড়াপীড়ি করলেন যে, আমি তাঁদের পাশে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম।

---

৬৮. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৪৪; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮৫

রণক্ষেত্রে সৈন্যদের সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে হাজ্জাজের দোষ-ত্রুটি ও অপকর্মের বর্ণনা করে সৈন্যদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ক্ষেপিয়ে তুলতাম।[৬৯]

'দিয়ারে জামাজিম' যুদ্ধে ইবনুল আশ'আছের শোচনীয় পরাজয় হয় এবং তাঁর বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এ সময় শা'বী আত্মগোপন করেন। একটি বর্ণনা এমন আছে যে, তিনি হাজ্জাজের ঘাতক বাহিনীর ভয়ে একাধারে নয় মাস ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন। নয় মাস পরে কুতাইবা ইবন মুসলিম খুরাসানে সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন এবং মানুষকে তাঁর বাহিনীতে যোগদানে উৎসাহিত করার জন্য ঘোষণা দেন যে, কোন ব্যক্তি এই বাহিনীতে ভর্তি হলে তার অতীতের সকল অপরাধ ক্ষমা করা হবে। এই ঘোষণার পর শা'বী কুতাইবার এই বাহিনীতে যোগ দেন। তিনি ফারগানা পৌঁছলেন। কুতাইবা তাঁকে চিনতেন না। একদিন কুতাইবা সৈনিকদের একটি সাধারণ মজলিসে বসে আছেন। তখন শা'বী তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে জ্ঞান চর্চার সাথে নিজের সম্পৃক্ততার কথা জানিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে আমি আপনার সেবায় লাগতে পারি। কুতাইবা প্রশ্ন করলেন, আপনি কে? কুতাইবা শা'বীকে চাক্ষুস না দেখলেও নামে চিনতেন। এ কারণে, শা'বী তাঁর প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান। কুতাইবাও আর তা জানার জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না। তাঁর অগ্রাভিযানের বিস্তারিত খবর মাঝে মাঝে লিখে হাজ্জাজকে জানাতে হতো। তখন তিনি শা'বীকে তার একটা খসড়া তৈরীর নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, খসড়া তৈরীর প্রয়োজন নেই। তিনি সেখানে বসেই মৌখিক ডিকটেশন দিয়ে সুন্দর একটা রিপোর্ট লিখিয়ে দেন। এই রিপোর্ট কুতাইবার খুব পছন্দ হয়। বিনিময়ে তিনি শা'বীকে একটি খচ্চর ও দামী চাদর উপহার দেন। এরপর থেকে খুব সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাঁর দিনগুলো কাটতে থাকে। কুতাইবা তাঁকে সাথে নিয়ে একই দস্তরখানায় বসে রাতের খাবার খেতেন।

শা'বীর রচনা-রীতির সাথে হাজ্জাজ পরিচিত ছিলেন। কুতাইবার পাঠানো রিপোর্টটি দেখে তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন যে, এর লেখক শা'বী ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। তাই তিনি সেই মুহূর্তে কুতাইবাকে লিখলেন যে, তোমার এই রিপোর্টের লেখক শা'বী। তাঁকে এখনই গ্রেফতার কর। যদি তিনি পালিয়ে যান তাহলে তোমাকে পদচ্যুত করে তোমার হাত-পা বিচ্ছিন্ন করে দিব। হাজ্জাজের এ আদেশ পাঠ করে কুতাইবা শা'বীকে বললেন, আপনি এখনো আমার কাছে অপরিচিত। আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আপনি যেখানে যেতে চান, চলে যান। আমি হাজ্জাজের সামনে যত রকমের কসম খাওয়ার প্রয়োজন হয়, কসম খাব। শা'বী বললেন, আমি যেখানেই চলে যাই না কেন, আমার মত মানুষ গোপন থাকতে পারে না। কুতাইবা বললেন, কি করলে ভালো হবে সেটা আপনিই ভালো বুঝবেন। মোটকথা, শা'বীর আত্মগোপনের অস্বীকৃতির প্রেক্ষিতে কুতাইবা তাঁকে হাজ্জাজের নিকট পাঠিয়ে দেন। ওয়াসিত নগরের কাছাকাছি পৌঁছে তাঁর হাত-পায়ে বেড়ী

---

৬৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪

লাগানো হয়। কূফা পৌঁছার পর ইয়াযীদ ইবন আবূ মুসলিম তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি তাঁকে বলেন, আবূ 'আমর! যখন আপনাকে হাজ্জাজের সামনে উপস্থাপন করা হবে তখন আপনি তাঁর সাথে এভাবে আচরণ করবেন এবং এই এই কথা বলবেন আশা করা যায় আপনার জীবন বেঁচে যাবে। অতঃপর বেড়ী বাঁধা অবস্থায় তাঁকে হাজ্জাজের সামনে হাজির করা হয়।[৭০]

অপর একটি বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে এসেছে : 'দিয়ারে জামাজিম' যুদ্ধের পর শা'বী দীর্ঘদিন যাবত আত্মগোপন করে থাকেন। এ অবস্থায় তিনি ইয়াযীদ ইবন আবূ মুসলিমকে লেখেন যে, আপনি হাজ্জাজের সাথে আমার একটা আপোসরফার ব্যবস্থা করুন। জবাবে তিনি বলেন, আমার এত দুঃসাহস নেই। আমার পরামর্শ হলো, আপনি নিজেই চলে আসুন এবং সাধারণ মানুষের সাথে বৈঠকের সময় হঠাৎ আমীরের সামনে উপস্থিত হয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আমি এতটুকু অঙ্গীকার করছি যে, আপনি যে কোন বিষয় ও ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী মানলে আপনাকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য দিব।

শা'বী এই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। একদিন হঠাৎ হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত হন। হাজ্জাজ দেখেই বলে ওঠেন– ভাই শা'বী যে! তারপর হাজ্জাজ তাঁর সামনে তাঁর প্রতি কৃত অতীতের সকল অনুগ্রহ ও অনুকম্পার কথা একটি একটি করে গুনতে থাকেন। আর শা'বীও সব কথা স্বীকার করে চলেন। শেষে হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করেন, আপনি 'আদুওউর রহমান অর্থাৎ রহমানের শত্রু (আবদুর রহমান ইবন আশ'আছ)-এর সংগে গেলেন কেন? শা'বী নিজের ভুল স্বীকার করে অনুশোচনা প্রকাশ করেন। হাজ্জাজ তাঁকে ক্ষমা করে দেন।[৭১]

হযরত 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীযের (রা) খিলাফতকালে কূফার ওয়ালী ইবন হুবাইরা শা'বীকে কাজী নিয়োগ করেন। ইবন হুবাইরা তাঁকে নৈশ আলাপের সঙ্গী করতে চান। শা'বী বলেন : আমাকে হয় বিচার কাজ অথবা নৈশ আলাপ– যে কোন একটির দায়িত্ব দিন।[৭২]

হিজরী ১০৩, মতান্তরে ১০৪ সনে তিনি আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। অনেকের মতে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাত্তর (৭৭) বছর। তবে সাতাত্তর বছরের এ মতটি সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ, তিনি নিজেই বলতেন, আমি হিজরী ১৭ সনে সংঘটিত জালূলা' যুদ্ধের বছর জন্মগ্রহণ করি।[৭৩] হিজরী ১০৩ অথবা ১০৪ সনে মৃত্যুবরণ করলে তিনি আশি বছরের ঊর্ধ্বে জীবন লাভ করেছিলেন। আর একথাই বলেছেন, ডক্টর আবদুর

---

৭০. প্রাগুক্ত-১/৮৪-৮৫
৭১. আল-'ইকদ আল ফারীদ-২/১৭৭, ৫/৩২, ৫৫; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/৩৪৪
৭২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৮
৭৩. প্রাগুক্ত-১/৮৪

রহমান রা'ফাত আল-বাশা।[৭৪] তাঁর মৃত্যুর খবর হযরত হাসান আল-বসরীর (রহ) নিকট পৌঁছলে তিনি মন্তব্য করেন : 'আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন! তিনি ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী এবং সীমাহীন ধৈর্যশীল এক মানুষ ছিলেন। তিনি ইসলামের এক বিশেষ মর্যাদার স্থানে অবস্থান করছেন।

শা'বী যখন কাজী তখন একদিন তাঁর দরবারে একজন পুরুষ ও তার স্ত্রী তাদের ঝগড়া-কলহের নিষ্পত্তির জন্য এলো। স্ত্রী ছিল পরমা সুন্দরী। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলো। স্ত্রী তার বক্তব্যের সপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করলো। শা'বী স্বামীকে বললেন : তোমার স্ত্রীর যুক্তি-প্রমাণ খণ্ডন করার মত তোমার কোন কিছু আছে কি? লোকটি তখন নিম্নের শ্লোকগুলো আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলো :[৭৫]

فُتِنَ الشَّعْبِيُّ لَمَّا	رَفَعَ الطَّرْفَ إِلَيْهَا
فَتَنَتْهُ بِدَلَالٍ	بِخَطَّيْ حَاجِبَيْهَا
قَالَ لِلْجِلْوَازِ قَرِّبْ	بها وَاحْضُرْ شَاهِدَيْهَا
فَقَضَى جَوْرًا على الخصم	وَلم يَقْضِ عَلَيْهَا
كَيْفَ لَو أَبْصَرَ مِنْهَا	نَحْرَهَا أَوْسَاعِدَيْهَا
لَصَبَا حَتى تَرَاهُ	سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهَا.

– শা'বী যখন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে, মুগ্ধ হয়ে গেছে।
– সে তাকে আকৃষ্ট করেছে তার দু'ভুরুর দু'টি রেখার মন-ভোলানো সঞ্চালন দ্বারা।
– তিনি পুলিশকে বলেন, মহিলাকে নিকটে নিয়ে এসো এবং তার দু' সাক্ষীকে উপস্থিত কর।
– তিনি মহিলার বিরুদ্ধে রায় না দিয়ে তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিলেন।
– তিনি যদি তার বুক ও বাহু দু'খানি দেখতেন তাহলে কি করতেন?
– তিনি তার প্রতি এত প্রেমাসক্ত হয়ে পড়তেন যে, তুমি তাঁকে মহিলার সামনে সিজদাবনত অবস্থায় দেখতে পেতে।

শা'বী বলেছেন, এ ঘটনার পর একবার আমি খলীফা আবদুল মালিকের নিকট গেলাম। তিনি আমাকে দেখা মাত্র একটু হেসে দিয়ে এই কবিতার প্রথম শ্লোকটি আবৃত্তি করে আমাকে প্রশ্ন করেন : এই শ্লোকগুলোর আবৃত্তিকারীর সাথে আপনি কেমন আচরণ করেছিলেন। আমি বললাম : হে আমীরুল মু'মিনীন! এজলাসের মধ্যে আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন

---

৭৪. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৮২
৭৫. ইমাম আছ-ছা'আলিবী এই ঘটনাটি তাঁর 'আত-তামছীল ওয়াল মুহাদারা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং কবিতাটি আল-মুতাওয়াককিল আল-লায়ছীর প্রতি আরোপ করেছেন। (আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-১/৯১, টীকা-৯)

করা এবং আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কারণে আমি তাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিয়েছি। খলীফা মন্তব্য করলেন : আপনি ঠিক কাজটি করেছেন।[৭৬]

শা'বীর বহু উপদেশমূলক বাণী বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে থাকতে দেয়া যায়। যেমন তিনি বলতেন : দুনিয়াও আমাদের দৃষ্টান্ত আমি এই ছাড়া আর কিছু দেখি না, যেমন কবি কুছায়্যির ইবন 'আয্যাহ্ বলেছেন :

أَسِيئِىْ بِنَا أَوْ أَحْسِنِى لاَمَلُوْمَةً + لَدَيْنَا وَلاَمَقْلِيَّةً إِنْ تَقَلَّتِ.

– আমাদের সাথে খারাপ অথবা ভালো আচরণ যাই কর না কেন, আমরা তিরস্কার করবো না। আর তুমি ঘৃণা করলেও আমরা ঘৃণা করবো না।[৭৭]

তিনি বলতেন, সত্য ও সততাকে সব সময় ধারণ করবে। যেখানে দেখবে এতে তোমার ক্ষতি হচ্ছে, আসলে তাতে তোমার লাভ হবে। আর মিথ্যাকে সব সময় পরিহার করবে। কোথাও হয়তো দেখবে মিথ্যা বলাতে তোমার লাভ হচ্ছে, আসলে তা তোমার ক্ষতি করবে।[৭৮]

আশ-শা'বী অনেক উপদেশমূলক প্রতীকী গল্প-কাহিনীও বলতেন। ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেন : শা'বী বলতেন, বনী ইসরাইলে একজন মূর্খ 'আবিদ ব্যক্তি ছিল। সে দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে একটি গির্জায় বৈরাগ্য জীবন যাপন করতো। তার একটি গাধা ছিল। গাধাটি গির্জার চত্বরে চরতো, আর সে গির্জায় বসে বসে পাহারা দিত। একদিন দেখে গাধাটি চরছে, তখন সে আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বলতে থাকে : হে আমার প্রতিপালক! তোমার যদি একটা গাধা থাকতো তাহলে আমি আমার গাধার সাথে সেটি চরাতে পারতাম। তাতে আমার কোন কষ্ট হতোনা। একথা সে যুগে তাদের সম্প্রদায়ে যে নবী ছিলেন তাঁর কানে গেল। তিনি 'আবিদের প্রতি খুব বিরক্ত হলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন নবীকে ওহীর মাধ্যমে বললেন, তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। প্রত্যেকটি মানুষকে তার বুদ্ধি অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে।[৭৯]

---

৭৬. প্রাগুক্ত-১/৯১-৯২
৭৭. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৭৬; 'উয়ূন আল-আখবার-২/৭০৪
৭৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/১৯৯
৭৯. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৬/১৬৪

কাজী শুরায়হ ইবন আল-হারিছ (রহ)

আবূ উমাইয়্যা শুরায়হ-এর পিতার নাম আল-হারিছ ইবন কায়স। তাঁর বংশের উর্ধ্বতন পুরুষ মারতা' ইবন কিন্দাহ্। তাই তিনি কিন্দী হিসেবে পরিচিত। তবে তাঁর নসবনামার উপরের দিকের কিছু নামের ব্যাপারে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। একটি বর্ণনা এমনও আছে যে, শুরায়হ আরব বংশজাত ছিলেন না। বরং তিনি ঐসব অনারব খান্দানের লোক ছিলেন যারা কিন্দাহ্র সাথে মৈত্রীচুক্তি করে ইয়ামনে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে।[১]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় হযরত শুরায়হ-এর জন্ম হয়। কোন কোন বর্ণনা মতে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কিন্তু এসব বর্ণনা সঠিক নয়। সেই সময়ে তিনি মুসলমান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তবে হযরত রাসূলে পাকের দীদার লাভের পরম সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত থেকে যান। আল্লামা ইবন হাজার আল-'আসকালানী একথাই বলেছেন। তিনি লিখেছেন, চার খলীফার যুগে শুরায়হ-এর জীবনের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কোন ঘটনা দেখা যায় না যা দ্বারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়।[২] ইবন সা'দ, ইবন 'আবদিল বার সহ আরো অনেক সীরাত বিশেষজ্ঞ এমন কথাই বলেছেন। তাঁরা শুরায়হকে তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য করেছেন। তবে তাবি'ঈদের মধ্যে তিনি ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে একজন বিখ্যাত কাজী।

হযরত শুরায়হ (রহ) রাসূলুল্লাহর (সা) বহু সাহাবীর সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভ করেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন স্বভাবগতভাবে তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।[৩] এ কারণে জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি তাঁর সমকালীনদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার স্থান লাভ করেন। ইমাম নাওবী বলেন : শুরায়হর মেধা, বিশ্বস্ততা, দীনদারী, মহত্ত্ব ও মর্যাদা এবং তাঁর বর্ণনাকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে সবাই একমত।[৪] হাফেজ সাফি'উদ্দীন খাযরাজী লিখেছেন যে, তিনি ছিলেন অতি মর্যাদাবান ও তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন 'আলিমদের একজন।[৫]

সেকালে বসরায় বহু খ্যাতিমান হাফেজে হাদীছ ছিলেন। তিনিও ছিলেন তাঁদের একজন। হযরত 'উমার, 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, যায়দ ইবন ছাবিত (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। ইমাম শা'বী, আবূ ওয়ায়িল কায়স

---

১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৬১, টীকা-১; সিফাতুস সাফওয়া-৩/২০
২. আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা-২/২০২
৩. আল-ইসতী'আব-২/৬৭
৪. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/২৪৪
৫. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-৬/৬৫

Contents

ইবন আবী হাযিম, ইবন সীরীন, 'আবদুল 'আযীয ইবন রাফী', মুজাহিদ ইবন জুবায়র, 'আতা' ইবন সায়িব, আনাস ইবন সীরীন, ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ (রহ)-এর মত ইমামগণ ছিলেন তাঁর হাদীছের ছাত্র।[৬]

হযরত শুরায়হ যদিও হাদীছের হাফেজ ছিলেন তথাপি তাঁর পঠন-পাঠনের বিশেষ শাস্ত্র ছিল ফিকাহ্। ইমাম যাহাবী, ইবন হাজার ও অন্যরা ফিকাহ্কে তাঁর বিশেষ শাস্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর নামের সাথে 'ফকীহ্' উপাধিটি লিখেছেন।[৭] তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রের কেন্দ্রস্থল কূফার ইফতা পরিষদের সদস্য ছিলেন।[৮]

হাদীছ ও ফিকাহ্ শাস্ত্র ছাড়াও তৎকালীন আরবে বহুল প্রচলিত ইলমে কিয়াফা (হস্তরেখা বিদ্যা) ও কাব্য শাস্ত্রে তাঁর বুৎপত্তি ছিল।[৯] কাব্য শাস্ত্রে তাঁর বুৎপত্তি এত পরিমাণ ছিল যে, একবার তিনি তাঁর একটি বিচারের রায় কবিতায় দান করেন। ঘটনাটি এই রকম। এক মহিলার স্বামী একটি পুত্র সন্তান রেখে মারা যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর সে দ্বিতীয় বিয়ে করে। সে ছেলেকে নিজের কাছে আটকে রাখে এবং তার অভিভাবকত্বের দাবীতে অটল থাকে। আর মহিলার শ্বাশুড়ী অর্থাৎ ছেলেটির দাদীর দাবী ছিল, যেহেতু ছেলের মা দ্বিতীয় বিয়ে করেছে, তাই ছেলের অভিভাবকত্ব সে পেতে পারে না। দাদী তার দাবী একটি কবিতায় এভাবে উপস্থাপন করে :

يا أبا أمية أتيناك — وأنت المرأ نأتيه
اتاك ابنى وأماه — وكلتا نا نفديه
تزوجت فها تيه — ولايذهب بك التيه
فلو كنت تايمت — مما نازعتنى فيه
ألا يا ايها القاضى — هذه قصتى فيه

– আবূ উমাইয়্যা! আমরা ন্যায়বিচার লাভের উদ্দেশ্যে আপনার নিকট এসেছি। আপনি এমন এক ব্যক্তি যাঁর নিকট আমরা এসে থাকি।

– আমার পুত্র (পৌত্র) ও তার মা আপনার নিকট এসেছে এবং আমরা উভয়ে তার জন্য উৎসর্গকৃত।

– (পুত্রবধূকে লক্ষ্য করে) যখন তুমি দ্বিতীয় বিয়ে করেছো তখন ছেলেকে আমার নিকট দিয়ে দাও। বাড়াবাড়ি করো না।

– দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের পর তুমি তার ব্যাপারে আমার সাথে বিবাদ করছো কেন?

– (কাজী সাহেবকে লক্ষ্য করে) ওহে কাজী, ছেলের ব্যাপারে আমাদের দুইজনের কাহিনী এটাই।

---

৬. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/২৪৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৯
৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫১
৮. আ'লাম আল-মুওয়াক্কা'ঈন-১/২৭
৯. তাবাকাত-৬/৯০; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১৫

পুত্রবধূ শ্বাশুড়ীর দাবীর প্রেক্ষিতে নিম্নের এ জবাব দেয় :

يا ايها القاضى قد قالت لك الجده
وقولا فاسمتع منى ولاتبطرنى رده
اعزى لنفسى عن ابنى وكبدى حملت كبده
فلما كان فى حجرى يتيما ضائعًا وحده
تزوجت رجاء والخير من يكفينى فقده
ومن يظهرلى وده ومن يكفل لى رفده.

– ওহে কাজী! দাদী অর্থাৎ আমার শ্বাশুড়ী আপনাকে তাঁর কথা বলেছেন। এখন আমার কিছু কথাও আপনি শুনুন এবং তা প্রত্যাখ্যান করবেন না। আমি আমার ছেলের দ্বারা নিজের অন্তরকে সান্ত্বনা দেই। আমি সব সময় তার কলিজার সাথে আমার কলিজা লাগিয়ে রাখি। বৈধব্য জীবনে আমার কোলে একাকীত্বের কারণে তার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল, এ কারণে তার কল্যাণ এবং তার তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে আমি এমন এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেছি যে তাকে ধ্বংস হতে দেবে না এবং তার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

যেহেতু শ্বাশুড়ী ও পুত্রবধু দু'জনই কবিতায় তাদের দাবী ও বক্তব্য উপস্থাপন করে। এ কারণে কাজী শুরায়হও কবিতায় তাঁর রায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন :

قد فهم القاضى ما قلتما وقضى بينكما ثم فصل
بقضاء بين بينكما وعلى القاضى جهد أن عقل
قال لجده بينى بالصبى وخذى ابنك من ذات العلل
انها لوصبرت كان لها قبل دعواها تبغيها البدل

– তোমরা দু'জন যা কিছু বলেছো কাজী তা বুঝতে পেরেছেন এবং তোমাদের দু'জনের মধ্যে একটি স্পষ্ট ফায়সালা দান করেছেন। যদি কাজী বুদ্ধিমান হন তাহলে সত্য উদঘাটনের জন্য তাঁর চেষ্টা করা ফরজ। তিনি দাদীকে বলছেন, ছেলেকে এই বাহানার আশ্রয় গ্রহণকারী মার নিকট থেকে নিয়ে পৃথক হয়ে যাও। যদি সে দ্বিতীয় বিয়ে না করতো, ছেলে তার কাছেই থাকতো।[১০]

বর্ণিত হয়েছে, কাজী শুরায়হর দশ বছর বয়সী একটি ছেলে খেলাধুলার প্রতি ভীষণ আসক্ত ছিল। ফলে পড়া-লেখার প্রতি ছিল দারুণ অমনোযোগী। একদিন সে স্কুল থেকে পালিয়ে কুকুর নিয়ে খেলতে শুরু করে। বাড়ীতে ফিরে এলে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কি

---

১০. তাবাকাত-৬/৯৪

Contents

নামায পড়েছো? সে জবাব দেয় : না। তখন কাজী সাহেব কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসে যান। ছেলেকে কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে সে কথা কবিতায় সুন্দর করে তুলে ধরেন।[১১]

একজন কাজীর জন্য যেসব গুণ ও যোগ্যতার প্রয়োজন হয় তার সবই শুরায়হর সত্তায় পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী, বিচক্ষণ, চালাক ও ভীষণ সমঝ-বুঝের অধিকারী মানুষ।[১২] জটিল থেকে জটিলতর এবং মারাত্মক প্রতারণামূলক বিষয়েরও একেবারে গভীরে গিয়ে সত্য বের করে আনতেন। এসব গুণ তাঁর মধ্যে বিচার-ফায়সালার চূড়ান্ত যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যে 'আলীর (রা) প্রশংসায় বলেছেন : أَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ – তাদের মধ্যে 'আলী সবচেয়ে বড় কাজী। সেই 'আলী (রা) শুরায়হর সম্পর্কে বলেছেন– أَقْضى الْعَرَبِ – তিনি আরবের সবচেয়ে বড় কাজী।[১৩]

কাজী হিসেবে নিয়োগ লাভের পূর্বেই তিনি বিচার কার্যের যোগ্যতা ও দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করে ফেলেছিলেন। মানুষ তাদের বিভিন্ন বিবদমান বিষয়ে তাকে সালিশ নিয়োগ করতো। আর এরই প্রেক্ষিতে হযরত 'উমার (রা) তাঁর রায় দেখে তাঁকে কূফার কাজী নিয়োগ করেন। ঘটনাটি এ রকম : হযরত 'উমার (রা) এক ব্যক্তির নিকট থেকে এই শর্তে একটি ঘোড়া ক্রয় করলেন যে, ঘোড়ার চলন ও আচরণ পরীক্ষা করে পছন্দ হলে নিবেন, অন্যথায় ফেরত দিবেন। তারপর পরীক্ষার জন্য তিনি ঘোড়াটিকে একজন দক্ষ সোয়ারীর হাতে দেন। সোয়ারী চালানোর সময় হোঁচট খেয়ে ঘোড়াটি দাগী হয়ে যায়। হযরত 'উমার (রা) ঘোড়াটি ফেরত দিতে চান, কিন্তু ঘোড়ার মালিক তা ফেরত নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে উভয়ের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। অবশেষে শুরায়হকে সালিশ মানা হয়। তিনি এই রায় দেন যে, যদি ঘোড়ার মালিকের অনুমতি নিয়ে সোয়ারী করা হয়ে থাকে তাহলে ঘোড়া ফেরত দেওয়া যেতে পারে, অন্যথায় নয়।[১৪]

অপর একটি বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে এসেছে যে, পরীক্ষামূলক চালনার সময় ঘোড়াটি মারা যায়। এ অবস্থায় হযরত 'উমার (রা) মৃত ঘোড়টি মালিককে ফেরত দিতে চান। এতে বিবাদ দেখা দেয়। মীমাংসার জন্য শুরায়হ সালিশ মনোনীত হন। তিনি রায় দেন এভাবে : যা ক্রয় করা হয়েছে তা নিতে হবে, অথবা যে অবস্থায় গ্রহণ করা হয়েছে সেই অবস্থায় ফেরত দিতে হবে। এই রায়ের পর 'উমার (রা) মন্তব্য করেন : 'বিচার তো একেই বলে। সঠিক সিদ্ধান্ত, যার মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তি নেই।' এই বিচারের পর হযরত 'উমার (রা) তাঁকে কূফার কাজী নিয়োগ করেন।[১৫]

---

১১. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১২১-১২২
১২. আল-ইসতী'আব-২/৬৭
১৩. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/২৪৩
১৪. কিতাব আওয়ায়িল, আল-বাব আস-সাবি'–যিক্‌রুল কুজাত।
১৫. তাবাকাত-৬/৯১; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১১২

ইমাম শা'বী বলেন : 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) নিয়োগকৃত ইরাকের প্রথম কাজী ছিলেন সালমান ইবন রাব'আ আল-বাহিলী। তিনি কাদিসিয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং তথাকার কাজী হন। তারপর তাঁকে মাদায়েনের কাজী নিয়োগ করা হয়। কিছু দিন পর 'উমার (রা) তাঁকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে আবূ কুররা আল-কিন্দীকে নিয়োগ করেন। তারপর কূফা শহরের পত্তন হলে আবূ কুররা হন তথাকার কাজী। তারপর 'উমার (রা) শুরায়হ ইবন আল-হারিছ আল-কিন্দীকে আবূ কুররার স্থলে কাজী হিসেবে নিয়োগ দেন। তারপর ষাট বছর যাবত সেখানে তিনি কাজীর দায়িত্ব পালন করেন। মাঝখানে এক বছরের জন্য যিয়াদ তাঁকে বসরায় পাঠান এবং তাঁর স্থলে মাসরূক ইবন আল-আজদা' কাজীর দায়িত্ব পালন করেন। শুরায়হ ফিরে এলে আবার তাঁকে কূফার কাজী নিয়োগ করা হয় এবং 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) সংঘাত-সংঘর্ষ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কূফা আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার সময় তিনি স্বেচ্ছায় কাজীর দায়িত্ব হতে অব্যাহতি নেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) অন্য এক ব্যক্তিকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করেন এবং তিনি তিন বছর কূফার বিচার কাজ পরিচালনা করেন। ইবন যুবায়র (রা) নিহত হওয়ার পর শুরায়হ আবার কূফার কাজী হন। তিনি কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এ সময় একদিন এক ব্যক্তি পথে কাজী শুরায়হর সঙ্গে দেখা করে বললো : আল্লাহর কসম! আবূ উমাইয়্যা, আপনি অন্যায়ভাবে বিচার করছেন। তিনি জানতে চাইলেন : কিভাবে? লোকটি বললো : আপনার বয়স অনেক হয়েছে, আপনার বুদ্ধি-জ্ঞানে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে এবং আপনার ছেলে ঘুষ খায়। সুরায়হ বললেন : ঠিক আছে, তোমার পরে আমাকে আর কেউ একথা বলতে পারবে না। এপর হাজ্জাজের নিকট আসেন এবং বলেন : আল্লাহর কসম! আমি আর বিচারকের দায়িত্ব পালন করবো না। হাজ্জাজ বললেন : আপনার স্থলে অন্য এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করে না দেওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে অব্যাহতি দেব না। শুরায়হ বললেন : আপনি আবূ বুরদা ইবন আবী মূসাকে নিয়োগ করুন। তিনি একজন ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন মানুষ। হাজ্জাজ তাঁকে শুরায়হর স্থলে নিয়োগ করেন এবং তাঁর সহযোগী ও সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োগ করেন সা'ঈদ ইবন যুবায়রকে।[১৬]

কাজী শুরায়হ এমন যোগ্যতা, দক্ষতা, চমৎকার পদ্ধতি ও আমানতাদীর সাথে তাঁর এ দায়িত্ব পালন করেন যে, হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকাল থেকে নিয়ে উমাইয়্যা খলীফা 'আবদুল মালিকের সময়কাল পর্যন্ত একাধারে প্রায় ষাট বছর যাবত কাজীর পদে বহাল থাকেন। এ দীর্ঘ সময়ে অনেক বড় বড় বিপ্লব ও ঘটনাবলী সংঘটিত হয়, খিলাফতে রাশেদার সোনালী যুগের সমাপ্তির পর উমাইয়্যা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, উমাইয়্যা শাসক ও 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। মোটকথা, গোটা ইসলামী দুনিয়ায় এক বিপ্লব ঘটে যায়। এত কিছু সত্ত্বেও শুরায়হ যথারীতি কাজীর পদে বহাল থাকেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) ও 'আবদুল

---

১৬. 'উয়ূন আল-আখবার-১/১০১

মালিকের মধ্যে যুদ্ধের সময় মাত্র কয়েকটি বছরের জন্য নিজেকে বিচার কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।[১৭]

খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি কাজী শুরায়হকে একটি দিকনির্দেশনামূলক চিঠি লেখেন। তাতে তিনি বলেন : 'বিচার কাজ চলাকালে কারো প্রতি ইঙ্গিত করবে না, কারো প্রতি ভ্রুকুটি করবে না, কারো ক্ষতি করবে না, কোন কিছু ক্রয়-বিক্রয় করবে না, এবং উত্তেজিত অবস্থায় বিচার কাজে বসবে না।[১৮]

একজন কাজীর সবচেয়ে বড় কর্তব্য এবং সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি বিচারের ক্ষেত্রে বাইরের ও ভিতরের কোন প্রকার প্রভাবে প্রভাবিত হবেন না এবং কোন অবস্থাতেই সত্য ও ন্যায় বিচার থেকে দূরে ছিটকে পড়বেন না। শুরায়হর মধ্যে এ গুণ এত পরিমাণ ছিল যে, তিনি আইন, সত্য ও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কারো পরোয়া করতেন না– তা সে যত বড় ক্ষমতাধর ব্যক্তিই হোক না কেন। একজন অতি সাধারণ মানুষের সাথে আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) বিবাদে তিনি যে ঐতিহাসিক রায়টি দান করেছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তাঁর ছেলেও আইনের আওতায় পড়ে যেত, তাকেও কোন রকম রেহাই দিতেন না। একবার তাঁর এক ছেলে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিনদার হয়। উক্ত ব্যক্তি জামিন পেয়ে ফেরার হয়ে যায়। কাজী শুরায়হ তার জামিনদার নিজের ছেলেকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেন। একবার তাঁর আর্দালী এক ব্যক্তিকে চাবুক মারে। বিচারে তিনি প্রহৃত ব্যক্তির দ্বারা তাকে সমপরিমাণ চাবুক মারান।[১৯]

একবার তাঁর খান্দানের এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির উপর একটু নির্যাতন চালায়। তিনি তাঁকে গ্রেফতার করে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন। যখন তিনি বিচার কাজ শেষ করে উঠতে যাচ্ছেন তখন সেই অভিযুক্ত লোকটি তাঁকে কিছু কথা বলতে চায়। জবাবে তিনি বলেন, আমাকে কিছু বলার এবং তোমার কথা শোনার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, আমি তোমাকে গ্রেফতার করিনি, বরং সত্য ও ন্যায়বিচার তোমাকে গ্রেফতার করেছে।[২০]

হযরত শুরায়হ-এর এই 'আদল ও ইনসাফ কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। তাঁর জীবনের এমন বহু ঘটনা আছে যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। তাঁর এক ছেলে এবং অন্য এক ব্যক্তির মধ্যে কোন একটি অধিকারের ব্যাপারে বিবাদ ছিল। ছেলে পিতাকে বিষয়টি অবহিত করে বলে, আপনি যদি মনে করেন রায় আমার পক্ষে আসবে তাহলে আমি মামলা দায়ের করি, অন্যথায় চুপ থাকি। শুরায়হ মামলাটির গুণগত দিক নিয়ে গভীরভাবে ভাবার পর ছেলেকে মামলা দায়েরের পরামর্শ দেন। কিন্তু তাঁর এজলাসে

---

১৭. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২২৪
১৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/১৫০
১৯. তাবাকাত-৬/৯২, ৯৫
২০. প্রাগুক্ত-৬/৯৩

যখন মামলাটি উঠেলো, তিনি ছেলের বিপক্ষে রায় দিলেন। আদালত থেকে ঘরে ফেরার পর ছেলে পিতাকে বললো, যদি আমি পূর্বেই আপনার সাথে পরামর্শ না করতাম তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ থাকতো না। কিন্তু মামলা দায়েরের পরামর্শ দিয়ে আপনি আমাকে অপমান করেছেন। শুরায়হ বললেন, আমার ছেলে! দুনিয়ার সব মানুষের চেয়ে তুমি আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয়। কিন্তু তোমার চেয়ে মহান আল্লাহ আমার অধিক প্রিয়। যখন তুমি আমার সাথে পরামর্শ করলে তখন মামলার ধরন দেখে বুঝলাম রায় তোমার বিপক্ষে যাবে। যদি আমি তখন তা তোমার কাছে প্রকাশ করে দিতাম তাহলে তুমি তাদের সাথে আপোষ-মীমাংসা করে নিতে। আর এতে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হতো।[২১]

তিনি বাদী-বিবাদীকে একই দৃষ্টিতে দেখতেন। কাউকে কারো উপর কোন রকম প্রাধান্য দিতেন না। একবার আল-আশ'আছ ইবন কায়স গেলেন কাজী শুরায়হ-এর এজলাসে। কাজী সাহেব তাঁকে আমাদের শায়খ, আমাদের দীক্ষাগুরু, আমাদের নেতা ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করে মারহাবান, আহ্লান ও সাহ্লান বলে অত্যন্ত তা'জীমের সাথে ডেকে নিজের পাশে বসালেন। তাঁরা দু'জন পাশাপাশি বসে কথা বলছেন, এমন সময় একজন সাধারণ মানুষ উপস্থিত হলো এবং আল-আশ'আছের বিরুদ্ধে তার উপর অত্যাচারের অভিযোগ এনে কাজীর নিকট বিচার চাইলো। কাজী সাহেব একটু আগেই যাঁকে পরম সম্মানের সাথে কাছে বসিয়ে হাসি মুখে আলাপ করছিলেন, তিনি এখন ভিন্ন রূপ ধারণ করলেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আল-আশ'আছকে নির্দেশ দিলেন : এখান থেকে উঠুন। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর আসনের পাশাপাশি বসুন এবং তাঁর সাথে কথা বলুন। আল-আশ'আছ বললেন : আমি বরং এখানে বসেই তার সাথে কথা বলি। এবার কাজী সাহেব আরো কঠিন হলেন। বললেন : আপনি অবশ্যই উঠবেন, নয়তো আপনাকে উঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিব। আল-আশ'আছ বললেন : আপনি নিজেকে যে পরিমাণ বড় মনে করছেন তা খুব দুঃখজনক। শুরায়হ বললেন : সেটাকে কি আপনি আপনার সতীন বলে ভাবছেন? আল-আশ'আছ : না। শুরায়হ : আমি দেখছি, আপনি অন্যের উপর আল্লাহর অনুগ্রহকে দেখতে পান, কিন্তু আপনার নিজের প্রতি তাঁর অনুগ্রহকে দেখতে পান না।[২২]

মানব ইতিহাসের কোন যুগেই মিথ্যা সাক্ষ্যদান সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। আর বন্ধ হওয়া সম্ভবও নয়। তবে কাজী শুরায়হ মানুষকে নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করে মিথ্যা সাক্ষ্যদান বন্ধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। সাক্ষীদেরকে বুঝিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যদান থেকে বিরত রাখতেন। যদি বুঝাতে ব্যর্থ হতেন তাহলে মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রায় দিতেন। কারণ, সাক্ষ্যের বিপরীতে কাজীর ব্যক্তিগত জানার কোন গুরুত্ব নেই।

---

২১. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১১৭/১১৮
২২. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-১/৯০; ৪/২৬, ৪৮

ইবন সীরীন বর্ণনা করেছেন। ঘটনার সাক্ষীর ব্যাপারে যখন শুরায়র-এর সন্দেহ হতো, কিন্তু তার বাহ্যিক সত্যবাদিতার ব্যাপারে কোন রকম প্রশ্ন তোলা যেতনা, তখন তিনি প্রথমে সাক্ষীদেরকে বলতেন, আমি তোমাদেরকে ডেকে আনিনি। তোমরা ইচ্ছা করলে ফিরে যেতে পার। আমি বাধা দিব না। তোমাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই এই মামলার রায় হবে। তোমাদের সাক্ষ্যের দরুন আমি দায়মুক্ত হয়ে যাই। তবে তোমরাও নিজেদেরকে বাঁচাও। কিন্তু বুঝানোর পরেও যদি সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্যদানে বিরত না হতো তাহলে তিনি তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দিতেন। কারণ, কোন কাজী কোন সাক্ষীকে সাক্ষ্যদানে বিরত রাখতে পারেন না। তবে তিনি বিবাদী পক্ষকে বলে দিতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই বিবদমান বিষয় বা ঘটনায় তোমরা হচ্ছো উৎপীড়ক। কিন্তু আমি আমার বিশ্বাস ও ধারণার উপর ভিত্তি করে বিচার-ফায়সালা করতে পারিনে। বরং সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমি ফায়সালা করতে বাধ্য। তবে এ সত্য অটুট থাকবে যে, যে জিনিস আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, আমার ফায়সালা তা হালাল করতে পারে না।[২৩]

হাদীছে নিকট আত্মীয়ের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে কোন রকম নিষেধাজ্ঞা নেই। এ কারণে আত্মীয়ের মোকাদ্দামায় অন্য কোন বিশ্বস্ত আত্মীয়ের সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে কোন আইনগত বাধা নেই। ইবন আবী শায়বা বলেন, কাজী শুরায়হ কোন ব্যক্তির জন্য তার নিকট আত্মীয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে ঘোষণা দেন। তিনি এ আইন তৈরী করেন যে, পিতার জন্যে পুত্রের, পুত্রের জন্য পিতার, স্বামীর জন্য স্ত্রীর, স্ত্রীর জন্য স্বামীর, দাসের জন্য মনিবের, মনিবের জন্য দাসের এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগকৃত ব্যক্তির সাক্ষ্য নিয়োগকারীর জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই মৌল নীতির উপর তিনি এত অটল ছিলেন যে, একটি মামলায় তিনি হযরত 'আলীর (রা) পক্ষে হযরত ইমাম হাসানের সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যান করেন। একবার হযরত 'আলীর (রা) একটি ঢাল কোথাও হারিয়ে যায় এবং একজন জিম্মী তা খুঁজে পায়। হযরত 'আলী (রা) শুরায়হ-এর আদালতে মামলা দায়ের করেন। কাজী সাহেব জিম্মীকে বললেন, ঢালটির ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি? সে বললো, ঢালটি যে আমার তার প্রমাণ এই যে, সেটি আমার হাতে বিদ্যমান। কাজী শুরায়হ 'আলীকে (রা) বললেন, ঢালটি যে পড়ে গিয়েছিল তার কোন সাক্ষী কি আছে? তিনি সাক্ষী হিসেবে পুত্র হাসান (রা) ও দাস কানবারকে উপস্থাপন করেন। শুরায়হ বললেন, কানবারের সাক্ষ্য তো আমি গ্রহণ করছি, তবে হাসানের (রা) সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করছি। হযরত 'আলী (রা) তখন বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী শোনেননি :

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

– আল-হাসান ও আল-হুসায়ন জান্নাতের অধিবাসী যুবকদের নেতা।

---

২৩. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১১৯

শুরায়হ বললেন : শুনেছি। তবে পিতার জন্য পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য মনে করিনে। এই রায়কে 'আলী (রা) মেনে নেন। ঢালটি ইয়াহুদী জিম্মীকে দেওয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত ইয়াহুদীকে এত মুগ্ধ করে যে, সে নিজেই স্বীকার করে ঢালটি 'আলীর (রা)। সে আরো বলে, আপনাদের দীন সত্য। মুসলমানদের কাজী তাদের আমীরুল মু'মিনীনের বিরুদ্ধে রায় দেন, আর তিনি বিনাবাক্যে মাথা নত করে তা মেনে নেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর সত্য রাসূল ছিলেন। ইয়াহুদীর এভাবে ইসলাম গ্রহণে হযরত 'আলী (রা) এত খুশী হন যে, ঢালটি তাকে উপহার স্বরূপ দান করেন।[২৪] এর কিছুদিন পরেই খারিজীদের সাথে হযরত 'আলীর (রা) যুদ্ধ হয়। নাহ্‌রাওয়ানের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধে এই নওমুসলিম লোকটি 'আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন।[২৫]

কাজী শুরায়হ-এর পূর্বে ইসলামী 'আদালতে গোপন তদন্তের রীতি চালু ছিল না। তিনিই সর্বপ্রথম তা চালু করেন। যেহেতু এটা ছিল একটি নতুন পদ্ধতি, এ কারণে লোকেরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলে, আপনি এ বিদ'আত চালু করলেন কেন? অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বাকর ও 'উমারের (রা) খিলাফতকালে যা চালু ছিল না, এমন নতুন জিনিস চালু করলেন কেন? জবাবে তিনি বললেন : মানুষ যখন নতুন নতুন কথা চালু করেছে তখন আমিও নতুন রীতি চালু করেছি। অর্থাৎ যখন নতুন অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, তখন আমাকেও নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে।

কাজী শুরায়হ প্রমাণকে শপথের চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। শুধু শপথকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। বরং সাক্ষ্য-প্রমাণের সাথে সাথে শপথও নিতেন। একটি মোকাদ্দামায় একজন বাদী তার প্রতিপক্ষের শপথ নেওয়ায়, তারপর তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে। শুরায়হ বললেন, ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী মিথ্যা শপথের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।[২৬]

বাদীকে প্রমাণ উপস্থাপনের এবং বিবাদীর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান করা প্রতিটি আদালতের অপরিহার্য কর্তব্য। কাজী শুরায়হ এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি এত বেশী যত্নবান ছিলেন যে, মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণার পরও যদি উভয় পক্ষ কিছু বলতে চাইতো, তিনি তাদের বলার সুযোগ দিতেন। আহনাফ ইবন কায়স বলেন, একবার আমি শুরায়হ-এর 'আদালতে যাই। দেখলাম, তিনি এক ব্যক্তির বিপক্ষে রায় ঘোষণা করলেন। সাথে সাথে সে বলে উঠলো, এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিবেন না। আমার আরো কিছু বক্তব্য আছে। শুরায়হ তাকে বলার সুযোগ দিলেন। তার বক্তব্য শেষ হলে তিনি বললেন, তুমি অনেক অহেতুক কথা বলেছো। তুমি যা কিছু বলেছো তার সপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন কর।

---

২৪. শাযারাত আয-যাহাব-১/৮৫
২৫. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১১৪-১১৭
২৬. তাবাকাত-৬/৯৪

তিনি নিজের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শোনার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। তিনি বলতেন, কেউ আমার কোন রায়ের বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন করলে, আমার সে রায় ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকবে যতক্ষণ না সে তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে। মোটকথা, সত্য আমার সিদ্ধান্তের বিপরীতে হলেও সেটাই সত্য।

অত্যন্ত নির্ভীকভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করতেন। বাদী-বিবাদী কোন পক্ষকেই কিছুমাত্র প্রাধান্য দিতেন না। কোন পক্ষকেই প্রশ্নবানে ক্ষত-বিক্ষত করতে মোটেই কার্পণ্য করতেন না এবং কোন পক্ষকেই বিশেষ কোন পয়েন্ট স্মরণ করিয়ে দিতেন না।

বিচার কাজে তিনি দারুণ গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন। কোন কার্য-বিবরণী কারো কাছে প্রকাশ করতেন না। একবার তার ছেলে তার একটি মামলার ব্যাপারে তাঁকে কিছু প্রশ্ন করে। জবাবে তিনি বলেন, তুমি কি চাও, আমি তোমাকে তোমার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলি?

বিচার কাজে বংশীয় প্রথা-পদ্ধতির কোন গুরুত্ব দিতেন না। একবার একটি মোকাদ্দামায় এক পক্ষ বললো যে, আমাদের বংশীয় রীতি এটা। তিনি বললেন, তোমাদের বংশীয় রীতি-পদ্ধতি তোমাদের বাড়ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। মোকাদ্দমায় দালাল নিয়োগের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এমন দালালদের তিনি 'আদালত থেকে বের করে দিতেন। মানুষকে তাদের থেকে দূরে থাকার জন্য পরামর্শ দিতেন।

সভ্য যুগে ঘুষ উপহার-উপঢৌকনের রূপ ধারণ করে থাকে। আর এর থেকে মুক্ত থাকা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। এ কারণে, শুরায়হ উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করলেও ঘুষ থেকে মুক্ত থাকার জন্য সাথে সাথে পাল্টা উপহারও দিয়ে দিতেন।

ঘর থেকে 'আদালতে যাওয়ার সময় এই কথাগুলো উচ্চারণ করতেন : 'অতি শীঘ্র অত্যাচারী সেই অংশকে জেনে যাবে যা সে কম করেছে। অত্যাচারীর শাস্তির এবং অত্যাচারিতের সাহায্যের প্রতীক্ষা করা উচিত।' ক্ষুধা ও রাগের অবস্থায় বিচার কাজ পরিচালনা করতেন না। এমন অবস্থায় এজলাস থেকে উঠে যেতেন।

সাধারণতঃ 'আদালতের বিচারকগণ সব মানুষকে খুশী রাখতে পারেন না। সাধারণভাবে তাদের রায়ের বিরুদ্ধে কোন না কোন পক্ষের অভিযোগ অবশ্যই থাকে। কিন্তু কাজী শুরায়হ-এর বিচার-ফায়সালায় জনগণ নিশ্চিন্ত থাকতো। জাবির ইবন যিয়াদ বর্ণনা করেছেন, শুরায়হ আমাদের এখানে বসরায় প্রায় এক বছর কাজী ছিলেন। এই অল্প সময়ে তিনি এমন তুলনাহীন বিচার-ফায়সালা করেন যে, তাঁর পূর্বের ও পরের ইতিহাসে যার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

তাঁর সকল বিচার-ফায়সালা এত জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হতো যে, তাঁর 'আদালত ফকীহ্‌দের দারসগাহ্‌ বা শিক্ষায়তনে পরিণত হয়। অনেক বড় বড় 'আলিম ফিকাহ্‌ বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর ফায়সালা শোনা ও দেখার জন্য 'আদালতে আসতেন। সেকালে মাকহূল (রহ) ছিলেন একজন অতি বড় 'আলিম। তিনি

বলেছেন, আমি ছয় মাস যাবত শুরায়হ-এর 'আদালতে গিয়েছি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে। তাঁর কাছে অনেক প্রশ্ন করতাম। তাঁর বিচার-ফায়সালা আমার জন্য অনেক শিক্ষণীয় হতো।[২৭]

যেহেতু তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও মেধাবী, তাই বাদী-বিবাদীর বাহ্যিক অবস্থা দেখে ধোঁকায় পড়তেন না। একবার একজন মহিলা তাঁর এজলাসে একজন পুরুষের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করলো। 'আদালতে সে গলা সপ্তমে চড়িয়ে কান্না শুরু করে দেয়। ইমাম শা'বীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শুরায়হকে লক্ষ্য করে বলেন, মনে হচ্ছে, মহিলাটি অত্যাচারিত। শুরায়হ বললেন, কান্না অত্যাচারিত হওয়ার প্রমাণ নয়। ইউসুফ (আ)-এর ভায়েরাও কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এসেছিলেন।[২৮]

জ্ঞানগত পূর্ণতার সাথে সাথে তিনি উন্নতমানের নৈতিক গুণাবলীতে বিভূষিত ছিলেন। বড় দীনদার এবং 'আবিদ ব্যক্তি ছিলেন।[২৯] বিচার-ফায়সালার কঠিন দায়িত্ব ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও যথেষ্ট সময় তাঁর 'ইবাদাতে অতিবাহিত হতো। তাঁর দাস আবূ তালহা বর্ণনা করেছেন, সকালে ফজরের নামায পড়ে ঘরে ফেরার পর দরজা বন্ধ করে প্রায় অর্ধেক দিন নফল 'ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন।

তিনি ছিলেন খুব হাসিখুশী মেজাজের ও বিনীত স্বভাবের। সবাইকে তিনি প্রথমে সালাম দিতেন। কাসিম বর্ণনা করেছেন, সালাম দানের ব্যাপারে কেউ শুরায়হ-এর অগ্রগামী হতে পারেনি। 'ঈসা ইবন হারিছ বলেন, আমি সবসময় তাঁর আগেই সালাম দেওয়ার চেষ্টা করতাম, কিন্তু কখনো কামিয়াব হতে পারিনি। অধিকাংশ সময় পথে আমরা মুখোমুখি হতাম। আমি অপেক্ষায় থাকতাম, এখনই সালাম করবো, কিন্তু আমার আগেই তিনি 'আস-সালামু 'আলাইকুম' বলে দিতেন।

তিনি ফিতনা-ফাসাদ ও ঝগড়া-বিবাদ মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর জীবনে অনেক বড় বড় রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, বছরের পর বছর 'আবদুল মালিক ও 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাঁর সামনেই বিদ্যমান ছিল– যার শিখা থেকে খুব কম মানুষই নিরাপদ থাকতে পেরেছে, কিন্তু তিনি এর সবকিছু থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হন। এই বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার সময় কয়েক বছরের জন্য কাজীর পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। এতে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে তিনি এতখানি সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, এই বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামার অবস্থা সম্পর্কে কারো কাছে কিছু জানতেও চাইতেন না। মানুষও এসব বিষয়ের প্রতি তাঁর অনীহার ভাব দেখে তাঁর সাথে এ নিয়ে কোন রকম আলোচনাও করতো না।[৩০]

---

২৭. প্রাগুক্ত-৬/৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৭

২৮. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-১/৮৯; 'উয়ূন আল-আখবার-১/৬৬

২৯. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/২২৪

৩০. তাবাকাত-৬/৯৭, ৯৮; ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২২৪

তিনি সবসময় অন্যের আরাম ও সুখ-শান্তির প্রতি যত্নবান থাকতেন। নিজের জন্য অন্য কাউকে সামান্য কষ্ট দেওয়াও পছন্দ করতেন না। নিজের বাড়ীর সব নর্দমা ও পয়ঃপ্রণালী বাড়ীর সীমানার ভিতর দিয়েই দিতেন, যাতে তাঁর পানিতে অন্যের কষ্ট না হয়। অন্যের আরাম-আয়েশের প্রতি এত বাড়াবাড়ি রকমের সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, তাঁর বাড়ীর কোন সদস্যের মৃত্যু হলেও অন্যের শান্তি ভঙ্গ হতে পারে এই ধারণায় কাউকে কোন খবর না দিয়েই রাতের মধ্যে দাফন করে দিতেন। নিজের এক সন্তানের মৃত্যুর পর কাউকে না জানিয়ে দাফন করে দেন।[৩১]

তিনি ছিলেন একজন কৌতুকপ্রিয় ও প্রফুল্লচিত্তের মানুষ।[৩২] মাঝে মধ্যে গুরুগম্ভীর পরিবেশেও তাঁর কৌতুক ও রসিকতার ফল্গুধারা বয়ে যেত। একবার 'আদী ইবন আরতাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁর নিকট আসলেন। উভয়ের মধ্যে যে সংলাপটি হয় তা নিম্নরূপ :

'আদী– আমি আপনার সামনে কিছু কথা উপস্থাপন করতে চাই।

শুরায়হ– বলুন, আমি শোনার জন্য প্রস্তুত।

'আদী– আমি শামে অবস্থানকারী।

শুরায়হ– এত দূরের মানুষ!

'আদী– আমি আপনাদের এখানে বিয়ে করেছি।

শুরায়হ– আপনার বিয়ে কল্যাণময় হোক!

'আদী– আমি আমার স্ত্রীকে সংগে নিয়ে যেতে চাই।

শুরায়হ– স্বামী তাঁর স্ত্রীর অধিকারী এবং তাঁর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে স্বাধীন।

'আদী– কিন্তু সে তার নিজের বাড়ীতে থাকার শর্ত করেছিল।

শুরায়হ– তাহলে শর্ত পূরণ করা উচিত।

'আদী– আপনি আমাদের এ সমস্যার একটা ফায়সালা করে দিন।

শুরায়হ– ফায়সালা করে দিয়েছি।

'আদী– কার বিরুদ্ধে?

শুরায়হ– তোমার মার ছেলের বিপক্ষে (অর্থাৎ তোমার)।

'আদী– কার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে?

শুরায়হ– তোমার মামার বোনের ছেলের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে (অর্থাৎ তোমার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে)। কারণ, 'আদী তো নিজেই স্বীকার করেছিল যে, স্ত্রীর সাথে তার বাড়ীতেই বসবাস করার শর্তে বিয়ে করেছে।[৩৩]

একবার এক বেদুঈন তাঁকে প্রশ্ন করলো : আপনি কোন খান্দানের লোক? জবাবে তিনি

---

৩১. 'উয়ূন আল-আখবার-২/৫৯৭

৩২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৯

৩৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৪/৯৮; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-১/৯০; ৩/১০; 'উয়ূন আল-আখবার-১/৩৬৬

বললেন : আমি সেই সব লোকদের একজন, আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে ইসলামের পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। এ জবাব শোনার পর বেদুঈন তাঁর নিকট থেকে উঠে চলে গেল এবং লোকদের বলতে লাগলো যে, তোমাদের এ কাজী তাঁর নিজের খান্দানের নামটি পর্যন্ত বলতে পারেন না। অন্য একটি বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, বেদুঈন লোকদের বলতে লাগলো, তোমরা তো আমাকে একজন দাসের নিকট পাঠিয়েছিলে। সাধারণতঃ দাস শ্রেণী ও তাদের মত যাদের উল্লেখ করার মত বংশ-গৌরব নেই তারা ইসলামের প্রতি নিজেদেরকে সম্বন্ধ ও সম্পৃক্ত করতো।

কাজী শুরায়হ ও ইবন যিয়াদের মধ্যে দারুণ মত বিরোধ ছিল। ইবন যিয়াদ একবার 'তা'উন' রোগে আক্রান্ত হন। ডান হাতে রোগটির প্রকোপ বেশী দেখা দেয় এবং পচন ধরে। চিকিৎসকগণ তাঁর হাতটি কেটে ফেলার পরামর্শ দেয়। তিনি শুরায়হ-এর সাথে পরামর্শ করলেন। শুরায়হ চিকিৎসকদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে হাত কাটতে নিষেধ করলেন। যাই হোক, কিছুটা তাঁর পরামর্শে এবং কিছুটা ভয়ে হাত কাটা থেকে বিরত থাকলেন। ফলে তার বিষক্রিয়া সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি মারা যান। লোকে কাজী শুরায়হকে এই বলে তিরস্কার করতে লাগে যে, তাঁর সাথে আপনার দুশমনীর কারণেই আপনি তাঁর হাতটি কাটতে বারণ করেন। আর এ কারণেই তিনি মারা গেলেন। তিনি তাদেরকে জবাব দিলেন এই বলে : একজন পরামর্শক সব সময় আস্থাভাজনই হয়ে থাকেন। আমি যদি তাঁর কল্যাণকামী না হতাম তাহলে এটাই চাইতাম যে, একদিন তাঁর হাত কাটা যাক, একদিন পা কাটা যাক। এভাবে প্রতিদিন তাঁর দেহের একটি না একটি অঙ্গ কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হতো।[৩৪]

যিয়াদ ইবন আবীহ্ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কাজী শুরায়হ তাঁকে দেখতে গেলেন। ফিরে এলে মাসরূক ইবন আল-আজদা' তাঁর কাছে একটি লোক পাঠালেন যিয়াদের অবস্থা জানার জন্য। লোকটি জিজ্ঞেস করলো : আপনি আমীরকে কেমন দেখে এলেন? শুরায়হ বললেন : দেখে এলাম, তিনি আদেশ করছেন ও নিষেধ করছেন। মাসরূক একথা শুনে বললেন : শুরায়হ সব সময় বাঁকা কথা বলেন। তিনি আবারও লোকদের তাঁর কাছে পাঠালেন। তখন শুরায়হ বললেন : আমি দেখে এলাম, তিনি অন্তিম উপদেশ লেখার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং কাঁদতে নিষেধ করছেন।[৩৫]

সুফইয়ান আছ-ছাওরী বলেন : এক ব্যক্তি একবার কাজী শুরায়হ-র এজলাসে এসে একটি বিড়ালের মালিকানার ব্যাপারে ফায়সালা চাইলো। বিড়ালটি যে তার সে ব্যাপারে কাজী প্রমাণ পেশ করতে বললেন। লোকটি বললো : যে বিড়ালটি আমার বাড়ীতে জন্মেছে তার কোন প্রমাণ আমি দিতে পারবো না। কাজী বললেন : বেশ তাহলে তুমি বিড়ালটি নিয়ে তার মার কাছে ছেড়ে দাও। যদি সেটা সেখানে থাকে এবং তার মা দুধ পান করায় তাহলে তোমার বিড়াল। আর যদি সেটা জোরে ডাকতে থাকে, লোম

---

৩৪. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২২৪

৩৫. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/৪৬৭; 'উয়ূন আল-আখবার-২/৫৯৭

ফোলাতে থাকে তাহলে সেটা তোমার বিড়াল নয়।[৩৬]

তাকদীরে তাঁর ছিল প্রবল বিশ্বাস। একবার কূফায় 'তা'উন'-এর মহামারি দেখা দেয়। তাঁর বন্ধু ভয়ে কূফা ছেড়ে নাজফে চলে যান। শুরায়হ তাকে লেখেন : যে স্থান আপনি ছেড়ে গেছেন তা আপনার মৃত্যুকে নিকটবর্তী করতো না এবং আপনার জীবনের দিনগুলিও ছিনিয়ে নিত না। আর যে স্থানে আপনি আশ্রয় নিয়েছেন তা এমন এক সত্তার মুঠোর মধ্যে রয়েছে যাঁকে কোন কামনা-বাসনা অক্ষম ও অপারগ করতে পারে না এবং কোন পলায়নই তার থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয় না। আপনি ও আমরা সবাই একই বাদশার বিছানায় অবস্থান করছি। নাজফও এক মহাক্ষমতাশালীর অধিকারে আছে যা খুব শীঘ্র প্রকাশ পাবে।[৩৭]

তিনি সবসময় মানুষকে সৎ উপদেশ দিতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর কাছে ছোট-বড় ও আপন-পর কোন ভেদাভেদ ছিল না। জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, একদিন শুরায়হ আমার কিছু দুঃখের কথা আমার এক বন্ধুর নিকট বর্ণনা করতে শুনতে পেলেন। তিনি আমার একটি হাত ধরে এক পাশে নিয়ে গেলেন এবং বললেন : ভাতিজা, এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে নিজের দুঃখের কথা বলবে না। কারণ, তুমি যার কাছে তোমার দুঃখ-কষ্টের কথা বলছো সে হয় তোমার বন্ধু হবে, না হয় শত্রু। বন্ধু হলে সে তোমার দুঃখের কথা শুনে ব্যথিত হবে, আর শত্রু হলে উৎফুল্ল হবে। তারপর বললেন : তুমি আমার এই চোখটির দিকে তাকাও। আঙ্গুল দিয়ে তাঁর একটি চোখের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : আল্লাহর কসম, পনেরো বছর যাবত আমি এ চোখটি দ্বারা না কোন মানুষকে দেখতে পাই, আর না কোন পথ-ঘাট। কিন্তু এই মুহূর্তে কেবল তুমি ছাড়া এ পর্যন্ত আর কাউকে এ কথাটি বলিনি। তুমি কি আল্লাহর সেই সত্যনিষ্ঠ বান্দাটির কথা শোননি :

إنما أشكوبثى وحزنى إلى الله[৩৮]

– আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সামনেই পেশ করছি। সুতরাং একমাত্র আল্লাহকেই তুমি তোমার যাবতীয় শেকায়েত ও অভিযোগের কেন্দ্র বানাও।[৩৯]

একবার তাঁর 'আদালতে এক ব্যক্তি এক সাক্ষীকে ডাক দেয়– যার নাম ছিল রাবী'আ। সে উত্তর দিল না। লোকটি উত্তেজিত হয়ে জোরগলায় তাকে কাফির' বলে ডাক দিল। এবার সে সাড়া দিল। কাজী শুরায়হ দৃশ্যটি উপভোগ করছিলেন। তিনি এবার কৌতুক করে সাক্ষীর প্রতি এই দোষ আরোপ করলেন যে, তুমি নিজেই 'কুফর' (আল্লাহকে না মানা) স্বীকার করে নিয়েছো। এ কারণে তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না।

শেষ জীবনে বার্ধক্যের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েন এবং কাজীর পদ থেকে অবসর গ্রহণ

---

৩৬. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-১/৯১
৩৭. প্রাগুক্ত-৩/১৯৩; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/২০৩
৩৮. সূরা ইউসুফ-৮৬
৩৯. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১১৯-১২০

করেন। অবসর গ্রহণের অল্প কিছুদিন পর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। বাঁচার আর আশা থাকলো না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আত্মীয়-পরিজনদেরকে এই অসীয়াতগুলো করেন :

১. ঝুলন্ত কবর খুঁড়বে। ২. মৃত্যু ও জানাযার খবর কাউকে দিবে না। ৩. বিলাপ করবে না। ৪. লাশ ধীরে ধীরে বহন করবে। ৫. কবর চাদর দিয়ে ঢাকবে না। এ কথাগুলো বলার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স এক শো বছর অতিক্রম করেছিল। মৃত্যু সন নিয়ে মতপার্থক্য আছে। হিজরী ৭৬ সন থেকে ৭৯ সনের মধ্যে তাঁর ইনতিকাল হয়।[৪০]

তিনি মাকুন্দা ছিলেন। পাঁচ শো দিরহাম মাসিক ভাতা পেতেন।[৪১]

ইমাম আয-যাহাবীর মতে তিনি এক শো বিশ বছর জীবিত ছিলেন এবং হিজরী ৭৮, মতান্তরে ৮০ সনে মৃত্যুবরণ করেন।[৪২]

কাজী শুরায়হ-এর আংটিতে (সীল) খোদাই করা ছিল এই কথাটি- 'الخاتم خير من الظن' – সীল-মোহর সন্দেহের চেয়ে ভালো।[৪৩]

৪০. তাবাকাত-৬/৯৯

৪১. প্রাগুক্ত-৬/৯৫; ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২২৪

৪২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৯

৪৩. 'উয়ূন আল-আখবার-১/৩৪৯

'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ (রহ)

'আমির ইবন 'আবদিল্লাহর দু'টি ডাক নাম পাওয়া যায়। আবূ 'আবদিল্লাহ ও 'আবূ 'আমর। আরবের বিখ্যাত বানূ তামীম গোত্রের সন্তান। বসরার অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন অতি বিশ্বস্ত 'আবিদ তাবি'ঈ। কা'ব আল-আহবার তাঁকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন : ইনি এই উম্মাতের রাহিব বা সন্যাসী।[১] তৎকালীন আরবের একজন বিখ্যাত কারী। মানুষকে কুরআন পাঠ শিক্ষা দিতেন। তাঁর পিতার নাম 'আবদুল্লাহ। কোন কোন বর্ণনায় 'আবদু কায়সও এসেছে।

তিনি বসরায় বেড়ে ওঠেন। বসরা ছিল একটি নতুন অভিজাত শহর। বিত্ত-বৈভবে যেমন শহরটি ঝলমল করতো তেমনি জ্ঞানী-গুণীদের পদচারণায় মুখর থাকতো। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ছিলেন তখন বসরার ওয়ালী, ইমাম ও সেনাধ্যক্ষ। এই আবূ মূসার (রা) কাছেই 'আমির শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছায়ার মত আবূ মূসাকে (রা) অনুসরণ করেন। তাঁর নিকট থেকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা) সুন্নাহ্র জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর সূত্রে হাদীছও বর্ণনা করেন। হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরীর (রা) কল্যাণে তিনি ফকীহ্র মর্যাদা লাভ করেন।

মহান তাবি'ঈদের উজ্জ্বল ও সাধারণ গুণ-বৈশিষ্ট্য বলতে যা বুঝায় তাহলো তাঁদের 'ইলম ও 'আমল এবং খিদমতে 'ইলম ও দীন। অন্য কথায়, গোটা তাবি'ঈ প্রজন্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞান অর্জন করা, অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করা, জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটানো এবং স্বধর্মের সেবা করা। এসব গুণ তাবি'ঈদের প্রত্যেকের মধ্যে কমবেশী দেখা যায়। তবে তাঁদের মধ্যে ছোট্ট একটি দল এমনও ছিলেন যাঁরা কেবল দুনিয়ার যাবতীয় ঝক্কি-ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকেননি, বরং জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার পর শুধু 'ইবাদাত-বন্দেগী ও তাযকিয়ায়ে রূহ বা আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধিকে নিজেদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নেন। 'আমিরও এই পবিত্র দলটির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। এ রূপটি তাঁর মধ্যে এত প্রবল ছিল যে, তাঁর প্রতিটি কর্ম ও আচরণে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর কোন কর্মই এই চেতনা থেকে মুক্ত ছিল না। তাঁর জীবনের অন্যান্য অবস্থাকে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ও নির্লোভ ভাব ও খোদাভীতি থেকে পৃথক করে দেখানো খুবই কঠিন। বলা হয়েছে যে, তিনি নিজের উপর প্রত্যেকটি দিন ও রাতে এক হাজার রাক'আত নামায ফরজ করে নিয়েছিলেন।[২]

আল-জাহিজ তাপস ও পার্থিব ভোগ-বিলাস বিমুখ মানুষদের যে তালিকা দিয়েছেন তার প্রথমে এই 'আমিরের নামটি স্থান পেয়েছে।[৩]

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/১০৫; আল ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাবারা-৩/৮৫

২. আল-ইসাবা-৩/৮৫

৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৬৩, ৩/১৯৪

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত 'উমার ফারূকের (রা) পরামর্শ ও নির্দেশে মহান সাহাবায়ে কিরাম ও উঁচু স্তরের তাবি'ঈগণ হিজরী ১৪ সনে 'বসরা' নগরী পত্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই নতুন শহরে তাঁরা পার্শ্ববর্তী পারস্যে যুদ্ধ-বিজয়ী মুসলিম সৈনিকদের জন্য সেনানিবাস, দা'ওয়াত ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে আহ্বান) ও আল্লাহর বাণীকে পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। নতুন শহরের পত্তন হলো। আরব উপ-দ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল– নাজ্‌দ, হিজায, ইয়ামন থেকে মানুষ এই শহরে এসে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করলো, যাতে এটি মুসলমানদের অন্যতম দুর্গে পরিণত হতে পারে। নাজদের বানূ তামীমের যুবক 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ আত-তামীমী আল-আনসারীও সেই বসতি স্থাপনকারীদের একজন। 'আমির তখন একজন প্রাণ-চঞ্চল, পরিচ্ছন্ন অন্তঃকরণ ও দীপ্তিমান মুখমণ্ডলের এক নব্য যুবক। বসরা একটি নতুন শহর হলেও মুসলমানদের অন্যান্য শহরের তুলনায় বেশী অর্থ-বিত্তের ছড়াছড়ি ছিল। কারণ, বিজয়ী সৈন্যদের মাধ্যমে এখানে প্রচুর গনীমতের মাল ও স্বর্ণ-রৌপ্যের সরবরাহ হতো।

কিন্তু তামীম গোত্রের এই যুবক 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এসব কিছু ছিল না। মানুষের হাতে যা কিছু আছে তার প্রতি তিনি নির্মোহ ও নিস্কাম স্বভাবের এবং আল্লাহর হাতে যা কিছু আছে তা পেতে দারুণ আগ্রহী। দুনিয়া ও তার চাকচিক্য ও জৌলুসের প্রতি একেবারেই উদাসীন এবং আল্লাহ ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের প্রতি সীমাহীন প্রত্যাশী।

এ সময় বসরার প্রধান পুরুষ ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) অন্যতম মহান সাহাবী হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)। তিনি এই শহর ও এই অঞ্চলের ওয়ালী, এখান থেকে বিভিন্ন দিকে প্রেরিত মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি, শহরবাসীর ইমাম, শিক্ষক এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী প্রধান দা'ঈ। 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ আবূ মূসা আল-আশ'আরীর (রা) যুদ্ধ ও শান্তি এবং ভ্রমণ ও বাড়ীতে অবস্থান সর্ব অবস্থায় তাঁর সুহবত বা সাহচর্য অবলম্বন করেন। তিনি তাঁর নিকট কিতাবুল্লাহর পাঠ ও জ্ঞান তেমনভাবে লাভ করেন যেমন নবী মুহাম্মাদের (সা) উপর নাযিল হয়েছিল। তাঁর নিকট থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) বহু হাদীছ লাভ করেন এবং যা তিনি তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছেই তিনি আল্লাহর দীনের গভীর তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করে ফকীহ্‌র মর্যাদা অর্জন করেন। যতটুকু সম্ভব জ্ঞান অর্জনের দ্বারা নিজেকে উৎকর্ষমণ্ডিত করার পর তিনি তাঁর জীবনকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন : ১. একাংশ শিক্ষা মজলিসে অতিবাহিত করতেন। তাতে তিনি বসরার জামে' মসজিদে মানুষকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। ২. একটি অংশ জিহাদের ময়দানে কাটাতেন। প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিজয়ীদের বেশে গাজী হিসেবে ফিরে এসেছেন। ৩. আরেকটি অংশ তিনি কাটিয়েছেন লোক-চক্ষুর অন্তরালে 'ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে। নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা দু'টি ফুলে গেছে। এ তিনটি বিষয় ছাড়া আর কোন কিছু তাঁর জীবনকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। তাই মানুষ তাঁকে বলতো 'বসরার 'আবিদ ও জাহিদ' অর্থাৎ বসরার তাপস ও সন্ন্যাসী।

বস্‌রার জনৈক ব্যক্তি 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহর জীবনের একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন। একবার আমি একটি কাফেলার সাথে, যার মধ্যে 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহও ছিলেন, ভ্রমণ করছিলাম। সারা দিন চলার পর যখন রাত হয়ে গেল তখন একটি জলাশয়ের পাশে জঙ্গলের মধ্যে যাত্রাবিরতি করলাম। 'আমির তাঁর জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘোড়াটিকে লম্বা করে একটি গাছে বাঁধলেন। তারপর ঘোড়াটার পেট ভরার মত কিছু ঘাস ও লতাপাতা ছিঁড়ে-কেটে এনে তার সামনে ছড়িয়ে দিলেন। তারপর সবার দৃষ্টির আড়ালে গভীর জঙ্গলে চলে গেলেন। আমি মনে মনে বললাম : আল্লাহর কসম! আমাকে অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করতে হবে এবং দেখতে হবে এই রাতের অন্ধকারে গভীর জঙ্গলে তিনি কি করেন। যেতে যেতে তিনি মানুষের দৃষ্টির আড়ালে বৃক্ষ-বেষ্টিত একটি টিলায় গিয়ে থামলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি আমার জীবনে এত সুন্দর, পরিপূর্ণ ও বিনীত ভাবের নামায আর দেখিনি। আল্লাহ্ যতক্ষণ চাইলেন, তিনি নামায পড়লেন। তারপর একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দরবারে দু'আ ও মুনাজাত করতে লাগলেন। সেই মুনাজাতে তিনি যেসব কথা বলেছিলেন তার কিছু এ রকম : 'ইয়া ইলাহী! আপনি আপনার আদেশ দ্বারা আমাকে সৃষ্টি করেছেন, এই পৃথিবীর বিপদ-মুসীবতে আপনার ইচ্ছায় আমাকে রেখে দিয়েছেন। তারপর আমাকে বলেছেন : নিজেকে শক্ত রাখ। হে মহাশক্তিশালী! আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে শক্ত না করেন, আমি শক্ত হবো কি করে? ইয়া ইলাহী! আপনি জানেন, যাবতীয় সুখ-ঐশ্বর্যসহ যদি গোটা দুনিয়া আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়, তারপর আপনার সন্তুষ্টির বিনিময়ে কেউ যদি তা চায়, আমি তাকে তা দিয়ে দিব।

ইয়া ইলাহী আমি আপনাকে এত গভীরভাবে ভালোবাসি যা আমার উপর আপতিত বালা-মুসীবতকে সহজ করে দিয়েছে এবং আমার জন্য যা আপনি নির্ধারণ করেছেন তাই আমাকে সন্তুষ্টি দান করেছে। আপনার প্রতি আমার এ ভালোবাসা বিদ্যমান থাকলে আমার সকাল-সন্ধ্যা কেমন কাটলো তাতে আমার কোন পরোয়া নেই।'

বসরার লোকটি বলেছেন : তারপর আমার একটু তন্দ্রা ভাব এলো এবং এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর আমি জাগলাম। দেখলাম, 'আমির সেই একই অবস্থায় নামায, দু'আ ও মুনাজাতের মধ্যে আছেন। এভাবে সুবহে সাদিক হয়ে গেল। ফজরের ফরজ নামায আদায় করলেন। তারপর এভাবে দু'আ করতে লাগলেন : 'হে আল্লাহ! এখন প্রভাত হয়েছে। মানুষের চলাচল শুরু হবে, তারা আপনার অনুগ্রহ ও রুযি-রেযেকের সন্ধান করবে। তাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু প্রয়োজন আছে। আপনার নিকট 'আমিরের প্রয়োজন হলো, আপনি তার যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দিন। ইয়া আকরামাল আকরামীন! আপনি আমার ও তাদের সবার প্রয়োজনসমূহ পূরণ করে দিন। হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমি তিনটি জিনিস চেয়েছি। দু'টি দিয়েছেন, একটি দেননি। হে আল্লাহ! আপনি সেটা আমাকে দিন। যাতে আমি আপনার 'ইবাদাত করতে পারি, যেমন আমি ভালোবাসি ও আমি চাই।'

তারপর তিনি বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ান এবং আমার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে। তিনি বুঝতে পারেন, আমি সারা রাত বসে বসে তাকে পর্যবেক্ষণ করেছি। তিনি ভীষণ ভীত-কম্পিত হয়ে পড়লেন। অত্যন্ত দু:খ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন : ওহে বসরী ভাই! মনে হচ্ছে আপনি সারা রাত আমাকে পাহারা দিয়েছেন।

বললাম : হাঁ।

বললেন : আপনি আমার যা কিছু দেখেছেন, গোপন রাখুন, আল্লাহ্ আপনার কাজ ও কথা গোপন রাখবেন।

আমি বললাম : আপনি যে তিনটি জিনিস আপনার পরোয়ারদিগারের নিকট চেয়েছিলেন, সেই তিনটি জিনিস কি, তা হয় আপনি আমাকে বলবেন, নয়তো আমি আপনার যে আমল প্রত্যক্ষ করেছি তা মানুষের মধ্যে প্রচার করে দিব।

বললেন : আল্লাহ্ আপনার প্রতি করুণা করুন! আপনি একাজ করবেন না।

বললাম : আমি আপনাকে যা বলেছি, যদি তা করেন তাহলে বলবো না।

আমার অনমনীয়তা দেখে তিনি বললেন : যদি আপনি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে এই অঙ্গীকার করেন যে, অন্য কারো নিকট আপনি প্রকাশ করবেন না তাহলে আমি আপনাকে বলতে পারি।

বললাম : আমি আল্লাহর নামে দৃঢ় অঙ্গীকার করছি যে, আপনার জীবদ্দশায় কারো কাছে আপনার এ গোপন কথা প্রকাশ করবো না।

তিনি বললেন : আমার দীনের ব্যাপারে নারীর চেয়ে বেশী ভীতি ও আশঙ্কাজনক আমার কাছে আর কিছু নেই। তাই আমি আমার পরোয়ারদিগারের নিকট প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন আমার অন্তর থেকে নারীর প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা দূর করে দেন। তিনি আমার এ দু'আ কবুল করেছেন। ফলে আমি এখন এমন হয়ে গেছি যে, কোন নারীকে দেখলাম না কোন প্রাচীর, তাতে আমার কোন পরোয়া নেই।

বললাম : এতো একটি গেল। দ্বিতীয়টি কি?

বললেন : দ্বিতীয়টি হলো, আমি আমার পরোয়ারদিগারের নিকট চেয়েছি যে, আমি যেন একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কাকেও ভয় না করি। আমার এ চাওয়া আল্লাহ্ কবুল করেছেন। এখন আমি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আসমান-যমীনের আর কোন কিছুকেই ভয় করিনে।

বললাম : তৃতীয়টি কি?

বললেন : আমার পরোয়ারদিগারের নিকট আমার তৃতীয় চাওয়া ছিল, তিনি যেন আমার চোখের ঘুম দূর করে দেন। তাহলে আমি রাত-দিন আমার ইচ্ছা মত তাঁর 'ইবাদাত করতে পারবো। কিন্তু তিনি আমার এ চাওয়া পূরণ করেননি।

তাঁর একথা শুনে আমি বললাম : আপনার নিজের প্রতি একটু দয়া করুন। আপনার রাত কাটে নামাযে দাঁড়িয়ে আর দিন কাটে রোযা রেখে। আপনি যা করছেন তার থেকে

অনেক কম করেও জান্নাত পাওয়া যাবে। আর আপনি যতখানি সতর্কতা অবলম্বন করছেন তার থেকে অনেক কম সতর্ক হয়েও জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে।

আমার একথা শুনে বললেন : আমার ভয় হয়, আমি সেখানে লজ্জিত হই কিনা। যেখানে লজ্জা ও অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই 'ইবাদাতের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবো। যদি আমি নাজাত ও মুক্তি পাই, তাহলে সেটা হবে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে। আর যদি আমি জাহান্নামে যাই, তাহলে সেটা হবে আমারই ত্রুটির কারণে।

তারপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। লোকটি বললো : হে আমার ইসলামী ভাই! আপনি কাঁদছেন কেন? বললেন : আমি তোমাদের দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণের কারণে কাঁদছিনে। আমি কাঁদছি, প্রচণ্ড গরমের দিনে দুপুরের পিপাসা ও শীতের রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার স্বল্পতার জন্য।[৪]

এ ঘটনার পর 'আমির তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন। একদিন ভাতা বন্টন ও বাইতুল মাল দফতরের একজন কর্মচারী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। 'আমিরের জন্য নির্ধারিত সরকারী ভাতা ছিল। ইসলামী রাষ্ট্র 'উলামা ও ফকীহ্‌দের যে ভাতা দিত, এ ছিল সেই ভাতা। সরকারী কর্মচারীটি বললো : ওহে 'আমির, আপনি দফতরে চলুন এবং ভাতা গ্রহণ করুন। 'আমির গেলেন এবং ভাতার অর্থ গ্রহণ করে তাঁর গায়ের চাদরের এক কোণে ঢেলে বাড়ীর পথে বের হলেন। পথে গরিব, মিসকীন, অভাবী, সায়িল যাকেই পেলেন কাপড়ের মধ্যে হাত দিয়ে মুঠ ভরে উঠিয়ে তাকে দিলেন। এভাবে দিতে দিতে বাড়ী পৌঁছলেন। পরিবারের লোকদের সামনে সব মুদ্রা ঢেলে দিলেন। তাঁরা একটি একটি করে গুণে দেখলেন, ভাতা দফতর থেকে যে পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করেছিলেন তা ঠিকই আছে। একটি মুদ্রাও কম নেই।[৫]

'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ কেবল একজন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ এবং রাতের অন্ধকারে নির্জনে-নিরিবিলিতে আল্লাহর 'ইবাদাতকারী ব্যক্তিই ছিলেন না, বরং দিনের বেলায় একজন দক্ষ অশ্বারোহী যোদ্ধাও ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় যখনই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ডাক দেওয়া হয়েছে, সেই ডাকে প্রথম সাড়া দানকারী সব সময় তিনি থেকেছেন। তিনি যখন কোন মুজাহিদ বাহিনীর সাথে জিহাদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন তখন ব্যতিক্রমধর্মী একটি কাজ করতেন। মুজাহিদদের মধ্য থেকে বেছে বেছে একটি দলকে নির্বাচন করতেন নিজের সহযোদ্ধা হিসেবে। তারপর তাঁরা যখন একসঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য একমত হতেন তখন তিনি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন : ওহে ভায়েরা আমার! আমি আপনাদের সঙ্গী হতে ইচ্ছুক, যদি আপনারা আমাকে তিনটি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁরা জানতে চাইতেন, সেই তিনটি বিষয় কি কি? তিনি বলতেন :

---

৪. তাবাকাত-৭/৭৫; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-২৪-২৮
৫. তারীখু ইবন 'আসাকির-৩/২০৭; 'আসরুত তাবি'ঈন-২২৬

প্রথমত: আমি হবো আপনাদের সেবক। এই সেবার কাজে আপনাদের কেউ কখনো আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবেন না।

দ্বিতীয়তঃ আমি হবো আপনাদের মুআয্যিন। এ ব্যাপারে কেউ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবেন না।

তৃতীয়তঃ আমার সাধ্যমত আপনাদের জন্য আমাকে খরচ করার অধিকার দিতে হবে।

যদি তাঁরা তাঁকে এ তিনটি ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতেন তাহলে তিনি তাঁদের দলে থাকতেন। কেউ দ্বিমত পোষণ করলে তিনি অন্য দল খুঁজে তাদের সাথে বের হতেন।[৬]

'আমির ইবন 'আবদিল্লাহর জিহাদ ছিল নির্ভেজাল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আসমা' ইবন 'উবায়দ বর্ণনা করেছেন। 'আমির একবার একটি যুদ্ধে গেলেন। সেই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের এক বড় নেতার একটি মেয়ে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হলো। তখনকার রীতি অনুযায়ী শত্রু পক্ষের বন্দী মেয়েদেরকে বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হতো। সৈনিক 'আমিরকে এই বন্দী মেয়েটিকে দেওয়ার জন্য তার একটি বর্ণনা তাঁর কাছে দেওয়া হলো। 'আমির সেই বর্ণনা শুনে বললেন, আমিও তো একজন পুরুষ, এ মেয়েটি আমাকে দেওয়া হোক। তাঁর এমন অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে বাহিনীর সদস্যরা সানন্দে দাসীটিকে তাঁর হাতে অর্পণ করলো। তিনি যখন মেয়েটির মনিব হয়ে গেলেন তখন তাকে বললেন : আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাকে এ বন্দী দশা ও দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলাম। তুমি এখন মুক্ত, স্বাধীন। তাঁর সঙ্গী-সাথীরা বললেন, আপনি তাকে মুক্ত না করে অন্য কোন দাসীকে মুক্তি দিতে পারতেন। বললেন : আমি আমার পরোয়ারদিগারের নিকট ভালো প্রতিদান চাই। 'আমিরের অভ্যাস ছিল, জিহাদের পথে চলাকালে পালাক্রমে অন্য মুজাহিদদেরকে নিজের বাহনের পিঠে চড়ানো।[৭]

'আমির ছিলেন সেই সব মুজাহিদের একজন যাঁরা যুদ্ধের ভীতিপ্রদ মারাত্মক পর্যায়ে দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন এবং লোভ-লালসার পর্যায়ে নিজেদেরকে একেবারে গুটিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যান। অন্য কথায়, তিনি নির্ভিকভাবে নিজের জীবনের পরোয়া না করে শত্রু-সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন; কিন্তু গনীমত সংগ্রহ, বণ্টন ও গ্রহণের ব্যাপারে একেবারেই নিস্পৃহ ও উদাসীন থাকেন, যা তাঁর সঙ্গীদের অনেকেই পারেন না। সেনাপতি সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) ঐতিহাসিক কাদেসিয়া যুদ্ধের পর মাদায়েন দখল করে শাহান শাহ্ ইরানের প্রাসাদে প্রবেশ করেন। তিনি 'আমর ইবন মুকাররিনকে (রা) নির্দেশ দেন গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ শত্রু-সম্পদ একত্র করার জন্য। যাতে তার এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে পাঠিয়ে অবশিষ্টগুলো মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করতে পারেন। নির্দেশ মত জমা করা হলো অঢেল সম্পদ এবং এতসব মূল্যবান জিনিসপত্র যার বর্ণনা দুঃসাধ্য। এখানে অসংখ্য ঝুড়ি ভর্তি পারস্য সম্রাটদের ব্যবহার্য সোনা-রূপোর থালা-

---

৬. তাবাকাত-৭/৭৮

৭. প্রাগুক্ত

বাসন, ওখানে মূল্যবান কাঠের অসংখ্য বাক্স ভর্তি রাজ-পরিবারের সদস্যদের কাপড়-চোপড় এবং সোনা ও মণি-মুক্তার অলঙ্কারাদি। আবার এখানে রয়েছে মহিলাদের সাজ-সজ্জার জিনিস ও মূল্যবান সুগন্ধিতে ভরা অসংখ্য পাত্র, আবার ওদিকে আছে অসংখ্য বাক্স ভর্তি পারস্য সম্রাট, তাঁদের বীর যোদ্ধা ও সৈনিকদের ব্যবহার্য অগণিত মূল্যবান যুদ্ধাস্ত্র।

সেনাপতি সা'দ (রা) নির্বাচিত সৈনিকরা যখন উন্মুক্ত স্থানে সকল সৈনিকের সামনে এসব গনীমতের মাল বিভিন্নভাবে হিসাব-নিকাশ করছেন ঠিক সে সময় উস্‌কে-খুসকো ও ধুলিমলিন চেহারার একটি লোক খুব বড় আকারের ও ভারী ওজনের একটি পাত্র দু'হাতে উঁচু করে এনে হাজির করলো। সবাই সেটা নেড়ে চেড়ে ভালো করে দেখলো। তারা বুঝলো এমন পাত্র তারা আর পায়নি। খোলার পর দেখতে পেল সেটি মণি-মুক্তা ও হীরা-জহরতে ঠাসা। উপস্থিত সবাই এবার লোকটিকে প্রশ্ন করলো : এই মহা মূল্যবান সম্পদ তুমি কোথায় পেলে? লোকটি বললো : অমুক যুদ্ধে অমুক স্থানে। তারা আবার প্রশ্ন করলো : এর থেকে কি কিছু নিয়েছো? সে বললো : আল্লাহ আপনাদেরকে হিদায়াত করুন। আল্লাহর কসম! এই পাত্রটি এবং এর ভিতরের যা কিছু পারস্য সম্রাটদের, সবই আমার নিকট আমার একটি নখের আগার সমমানের নয়। এটি যদি মুসলমানদের বাইয়তুল মালে জমা না হতো তাহলে আমি এটি মাটি থেকে উঠিয়ে এভাবে আপনাদের কাছে আসতাম না।

এবার লোকেরা প্রশ্ন করলো : আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করুন! আপনি কে? লোকটি বললো : আল্লাহর কসম! আমি আপনাদের বা অন্য কারো নিকট আমার পরিচয় দিব না। যাতে আপনারা বা অন্য কেউ আমার কোন রকম প্রশংসা করতে না পারেন। একথা বলে লোকটি চলে গেল। তখন সেখানে উপস্থিত লোকেরা তাদের একজনকে বললো তাকে অনুসরণ করে তথ্য নিয়ে আসার জন্য। এই লোকটি তার অজান্তে অনুসরণ করে তার অন্য সাথীদের নিকট উপস্থিত হলো এবং তাদের নিকট এর পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। তারা বললো : তুমি চেন না? ইনি তো বসরার 'আবিদ 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ।[৮]

খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে সর্বপ্রথম তাঁকে মাদায়িন অভিযানে দেখা যায়। অন্য কোন অভিযানে তাঁর অংশগ্রহণের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি অধিকাংশ অভিযানে অংশগ্রহণ করতেন। কাতাদা বলেছেন, 'আমির যখন যুদ্ধে যেতেন এবং পথে কোন জঙ্গল পড়তো, আর তাঁকে যদি বলা হতো এখানে বাঘের ভয় আছে, জবাবে তিনি বলতেন, আল্লাহকে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা হয় যে, আমি তাঁকে ছাড়াও অন্য কাউকে ভয় করি।[৯]

খলীফা হযরত 'উছমানের (রা) বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তার বড় কেন্দ্র

---

৮. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-২৮/৩১
৯. আল-কামিল ফিত-তারীখ-৪/১১৭; আল-ইসাবা-৩/৮৬

ছিল তিনটি– বসরা, কূফা ও মিসর। এই বিপ্লব-বিদ্রোহের অগ্নিশিখার বেষ্টনীতে কিছু উঁচু স্তরের সাহাবীও এসে যান। 'আমিরের আবাসস্থল ছিল বসরা। এই ফিতনা-ফাসাদে তিনি যুক্ত না থাকলেও নিজেকে তিনি এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে পারেননি। এক পর্যায়ে তিনি 'উছমান (রা) বিরোধীদের ফাঁদে আটকে যান এবং তাদের সঙ্গী হয়ে পড়েন। একবার বসরাবাসীরা তাদের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হিসেবে তাঁকে খলীফা 'উছমানের (রা) নিকট পাঠায়। তিনি মদীনায় যেয়ে খলীফার সামনে খোলামেলাভাবে নিজের চিন্তা-ভাবনার কথা প্রকাশ করেন। যেমন তিনি বলেন, 'মুসলমানদের একটি দল আপনার কর্মচারীদের পর্যবেক্ষণ করেছে। তারা জেনেছে, করণীয় নয় এমন কিছু কাজ আপনার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। এ কারণে আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং ভবিষ্যতের জন্য তাওবা করুন।' সে সময় পর্যন্ত হযরত 'উছমান (রা) 'আমিরের প্রকৃত অবস্থা ও পরিচয় জ্ঞাত ছিলেন না।

এ কারণে তিনি তাঁর কথা শুনে বলেন, 'ওহে লোকেরা! তোমরা এ লোকটিকে দেখ। অতি সামান্য বিষয়ে কথা বলার জন্য তিনি এসেছেন। লোকেরা তাঁকে একজন 'কারী' (কুরআন পাঠক) মনে করে। অথচ তিনি জানেন না যে, আল্লাহ্ কোথায়?' 'আমির খলীফার এ কথা শুনে কুরআনের এ আয়াতটি উচ্চারণ করেন : إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ – নিশ্চয় তোমার পরোয়ারদিগার অপেক্ষায় আছেন।' তারপর বলেন, আল্লাহর কসম! আমি ভালো করেই জানি, তিনি অবাধ্যদের অপেক্ষায় আছেন।[১০] খলীফার সাথে এ উত্তপ্ত সংলাপের পর 'আমির বসরায় ফিরে আসেন।

তৎকালীন খলীফার সাথে 'আমিরের এই রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছাড়াও কিছু দীনী অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে ছিল। অথবা বলা চলে, তাঁর প্রতি আরোপ করা হতো। যেমন : তিনি বিয়ে করেন না, গোশ্ত খান না, নিজকে হযরত ইবরাহীমের (আ) চেয়ে ভালো অথবা সমান মনে করেন, ওয়ালী বা শাসনকর্তার বাড়ীর দরজা মাড়ান না ইত্যাদি। সরকারের সাথে তাঁর রাজনৈতিক বিরোধ আগেই হয়েছিল। এ কারণে তাঁর কিছু বিরোধী লোক তাঁর এ সব আচরণ বসরার তৎকালীন ওয়ালীর গোচরীভূত করে। তিনি আবার বিষয়টি হযরত 'উছমানকে (রা) অবহিত করেন। খলীফার দফতর থেকে তদন্তের নির্দেশ আসে এবং সত্য প্রমাণিত হলে তাঁকে শামে পাঠিয়ে দেওয়ার আদেশ দেয়।

খলীফার দফতর থেকে এ নির্দেশ আসার পর বসরার ওয়ালী 'আমিরকে ডেকে পাঠান। তিনি উপস্থিত হলে ওয়ালী তাঁকে বলেন, আপনার প্রতি যেসব অভিযোগ আরোপ করা হয়, তা তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন আমীরুল মু'মিনীন 'উছমান (রা)।

'আমির বললেন : আমার প্রতি কি কি অভিযোগ আরোপ করা হয়?

ওয়ালী তাঁকে অভিযোগগুলো শোনান। 'আমির তখন একটি একটি করে জবাব দিতে

---

১০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৩৬-২৩৭; ৩/১৪২-১৪৩

থাকেন। তিনি বলেন, আমি বিয়ে এ জন্য করিনে যে, স্ত্রী হলে সন্তান হবে। আর তাতে দুনিয়া আমার অন্তরে গেড়ে বসবে। আর তা আল্লাহর যিক্‌র থেকে আমাকে বিরত রাখবে। তবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই। আর গোশ্‌ত এজন্য খাই না যে, আমি যে এলাকায় বসবাস করি সেখানে মাজূসীদের (আগুন ও সূর্যের উপাসক) বাস। বাজারে যে গোশ্‌ত বিক্রি হয় তা আল্লাহর নামে যবেহ হয় কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারিনে। তাই গোশ্‌ত খাইনে। তবে হালাল গোশ্‌ত পেলে খাই। আর হযরত ইবরাহীমের (আ) চেয়ে ভালো বলে মনে করার যে অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে, তার জবাব এই ছাড়া আর কিছু দেব না যে, আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি যদি তাঁর পায়ের ধুলো হতে পারতাম, আর পায়ের সাথে লেগে জান্নাতে চলে যেতাম! আর ওয়ালী ও শাসন কর্তৃত্বের অধিকারীদের বাড়ীর দরজা মাড়াই না বলে যে অভিযোগ, তার জবাব এই যে, তাঁদের দরজায় সব সময় অভাবী ও সাহায্য প্রার্থীদের ভীড় থাকে। আমি তাদের কেউ নই। তাই আমি তাঁদের সুযোগ নষ্ট করতে চাইনে। আপনারা তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনুন এবং তা পূরণ করুন। আর আপনাদের নিকট যাদের কোন প্রয়োজন নেই তাদেরকে তাদের অবস্থায় থাকতে দিন।[১১]

'আমিরের বক্তব্য খলীফা হযরত 'উছমানকে (রা) জানানো হলো। তিনি তাতে আনুগত্যের পরিপন্থী, অথবা সুন্নাহ্ ও ঐক্য বিরোধী কোন কিছু পেলেন না। কিন্তু প্রচারকারীদের অপপ্রচার এতে থামলো না। তারা 'আমিরকে ঘিরে অনেক কথা প্রচার ও বলাবলি করতে লাগলো। ফলে তাঁর সমর্থক ও বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষের উপক্রম হলো। ফলে 'উছমান (রা) তাঁকে শামে পাঠিয়ে দেওয়ার এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার আদেশ দেন। অন্যদিকে তথাকার ওয়ালী মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ানকে (রা) নির্দেশ দেন তাঁকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করার ও তাঁর প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হওয়ার জন্য। পরবর্তীকালে 'উছমানের (রা) হত্যাকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করে তার মধ্যে বসরা থেকে 'আমিরের বহিষ্কারের অভিযোগটিও ছিল।[১২]

যে দিন 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ্ বসরা ত্যাগ করে শামের দিকে যাত্রার জন্য ঘর থেকে বের হলেন সেদিন তাঁর অসংখ্য ছাত্র, আত্মীয়-বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তি তাঁকে বিদায় দেওয়ার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে আসে। তারা তাঁকে বসরার উপকণ্ঠে 'মিবরাদ' পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। তাদের থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বক্ষণে 'আমির বলেন : আমি হাত তুলে দু'আ করছি, আপনারা আমার দু'আর উপর আমীন বলবেন।

উপস্থিত সবাই ঘাড় উঁচু করে তাঁকে দেখতে লাগলো। সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। তিনি দু'হাত উঠিয়ে নিম্নের দু'আটি করেন।[১৩]

---

১১. তাবাকাত-৭/১০৩-১০৭; তারীখুল ইবন 'আসাকির-৩/৩৬৮-৩৭০

১২. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৪/২৮৩

১৩. তারীখু ইবন 'আসাকির-৩/৩৬৮-৩৬৯; সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা'-৪/১৮-১৯

Contents

اَللّٰهُمَّ مَنْ وَشٰى بِىْ، وَكَذَّبَ عَلَىَّ وَأَخْرَجَنِىْ مِنْ مِصْرِىْ (بَلَدِىْ) وَمَزَّقَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ إِخْوَانِىْ، فَأَكْثِرْ مَالَهُ، وَأَصِحَّ جِسْمَهُ وَأَطِلْ عُمْرَهُ.

– 'হে আল্লাহ! যে আমার নামে কুৎসা রটনা করেছে, আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, আমাকে আমার শহর থেকে বের করে দিয়েছে এবং আমাকে ও আমার আত্মীয়-বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছে, তুমি তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে দাও, তার শরীর সুস্থ করে দাও এবং তার জীবনকাল দীর্ঘ করে দাও।' এ দু'আ পাঠের পর তিনি বাহনের মুখ শামের দিক করে চালিত করেন। শামে পৌঁছার পর হযরত মু'আবিয়া (রা) অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে গ্রহণ করেন এবং তাঁর থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করেন। সেবার জন্য একজন দাসী নিয়োগ করে তাকে নির্দেশ দেন, তাঁর রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টার অবস্থা ও ব্যস্ততা সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। শামে আসার পরও 'আমিরের অভ্যাস ও কাজের কোন পরিবর্তন হলো না। তিনি নিয়মিতভাবে প্রতিদিন প্রত্যুষে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন এবং ফিরতেন রাতের অন্ধকারে। আমীর মু'আবিয়া তাঁর জন্য খাবার পাঠাতেন, কিন্তু তিনি তা স্পর্শও করতেন না। কোথা থেকে রুটির একটি টুকরো নিয়ে আসতেন। তাই কিছু পানিতে গুলিয়ে উপর থেকে সেই পানি পান করে 'ইবাদাতে নিমগ্ন হয়ে যেতেন।[১৪] সারাটি রাত 'ইবাদাতে কাটিয়ে দিতেন। দাসী আমীর মু'আবিয়াকে (রা) সবকথা জানালেন। আর তিনি খলীফা 'উছমানকে (রা) সবকথা লিখে পাঠালেন। খলীফা 'আমিরের আসল রূপ অবগত হয়ে তাঁর সাথে সম্পর্ক ভালো করার এবং দশটি দাস ও দশটি বাহনের পশু দেওয়ার জন্য আমীর মু'আবিয়াকে (রা) নির্দেশ দিলেন। আমীর মু'আবিয়া (রা) খলীফার নির্দেশের কথা 'আমিরকে জানালেন। জবাবে 'আমির বললেন : এক শয়তান আগে থেকেই ঘাড়ে চেপে বসে আছে। তার বোঝা এত কম নয় যে দশটি দাসের বোঝা বহন করবো। একটি খচ্চর আমার আছে, বাহনের জন্য তাই যথেষ্ট। অতিরিক্ত বাহনের জন্য কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয় করি। আর আমীরের সম্মান ও নৈকট্য লাভ, তা এতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।[১৫]

'আমিরের প্রকৃত অবস্থা জানার পর হযরত মু'আবিয়া (রা) একদিন তাঁকে বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে বসরায় ফিরে যেতে পারেন। তিনি বললেন, আমি এমন শহরে আর ফিরে যাব না যার অধিবাসীরা আমার সাথে এমন আচরণ করেছে। 'আমির শামে থেকে যান এবং বাকী জীবন সেখানে কাটিয়ে দেন। তবে তাঁর গতিবিধির উপর থেকে সরকারি বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করা হলে তিনি উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে চলে যান। মাঝে মাঝে হযরত মু'আবিয়ার (রা) সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্য আসতেন। হযরত মু'আবিয়া (রা)

---

১৪. আল-ইসাবা-৩/৮৫
১৫. তাবাকাত-৭/৭৭-৭৮

সব সময় তাঁর প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করতেন, আর তিনি জবাব দিতেন, আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। তবে হযরত মু'আবিয়া (রা) যখন বেশী পীড়াপীড়ি শুরু করলেন তখন তিনি আবদারের সুরে বললেন : শামের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে রোযার তীব্রতা ও পিপাসার মাধুর্য যেতে বসেছে। আপনি পারলে এই স্থানকে বসরার মত গরম করে দিন।[১৬]

'আমিরের মত মুক্ত, স্বাধীন ও বেপরোয়া মানুষের জন্য স্বদেশ ও বিদেশ সবই সমান। স্বদেশ বসরার জন্য তাঁর বিশেষ কোন টান ও বন্ধন ছিল না। তারপর শামের মত পবিত্র ও নবী-রাসূলদের বিচরণভূমি তিনি লাভ করেন। এ কারণে স্বদেশের সাথে যতটুকু সম্পর্ক ছিল তাও ছিন্ন করে ফেলেন। প্রথমে যখন শামে যান তখন বসরা ও তথাকার জ্ঞানী-গুণী ও 'ইলমী-মজলিসের প্রতি একটা টান অনুভব করতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, আপনি তো বসরায় ফিরে যেতে পারেন। বললেন : আল্লাহর কসম! সেটা আমার শহর। সেই শহর যেখানে আমি হিজরাত করেছিলাম, সেখানে আমি কুরআন শিখেছিলাম।[১৭] কিন্তু পরবর্তীকালে বসরা ও বসরার অধিবাসী, সব পিছুটান ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একাগ্রচিত্তে 'ইবাদাতে নিমগ্ন হয়ে যান। বসরা থেকে কোন ব্যক্তি শামে এলে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি খুব একটা উৎফুল্ল হতেন না। কাজী 'উবায়দুল্লাহ ইবন হাসান বর্ণনা করেছেন। একবার আমি শামে গেলাম। 'আমিরের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর খোঁজ করলাম। জানতে পেলাম যে, তিনি এক বৃদ্ধার সাথে দেখা করার জন্য মাঝে মাঝে তার ওখানে আসেন। আমি সেই বৃদ্ধার কাছে গেলাম। তিনি একটি পাহাড় দেখিয়ে বললেন, 'আমির এই পাহাড়ের নীচে রাত-দিন নামায-রোযায় মশগুল থাকেন। তুমি দেখা করতে চাইলে ইফতারের সময় যেও। তখন তিনি দেখা দেবেন। বৃদ্ধার কথা মত আমি ইফতারের সময় সেই পাহাড়ের নীচে গেলাম। 'আমির সেখানে ছিলেন। আমি সালাম করলাম। তিনি শুধু এমন এক ব্যক্তির কথা জিজ্ঞেস করলেন যার সাথে মাত্র একদিন আগে এই শামে আমার দেখা হয়েছে। নিজের দেশ ও দেশের কোন মানুষের কথা কিছুই জানতে চাইলেন না। এটাও জানতে চাইলেন না যে, কে বেঁচে আছে, আর কে মারা গেছে? তাঁর সাথে কিছু খেতে বলার সৌজন্যও দেখালেন না। এমন অপ্রত্যাশিত আচরণ দেখে আমি তাঁকে বললাম : আপনার মধ্যে অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করছি। বললেন : কি? বললাম : দীর্ঘদিন হলো আপনি আমাদের থেকে দূরে আছেন। কিন্তু আপনি আমাদের কারো সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলেন না। আর যাও জানতে চাইলেন, তা এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে যার সাথে মাত্র একদিন আগে আমার দেখা হয়েছে। বললেন : আমি তোমাকে সুস্থ দেখেছি। তাই তোমার সম্পর্কে প্রশ্ন করা প্রয়োজন মনে করিনি। বললাম : আমি সদ্য দেশ থেকে এসেছি। আপনি একথা জানতে চাননি, কে মারা গেছে, আর কে বেঁচে আছে?

---

১৬. আল-কামিল ফিত-তারীখ-৪/১১৫
১৭. 'আসরুত তাবি'ঈন-২৩২

বললেন : এমন লোকের সম্পর্কে কী জিজ্ঞেস করবো যারা মারা গেছে। তারা শেষ হয়ে গেছে। আর যারা মারা যায়নি তারা খুব শিগগিরই মারা যাবে। বললাম : আপনি আমাকে আপনার সাথে খেতে বলার সৌজন্যও দেখালেন না। বললেন : আমি জানতাম, তুমি খুব ভালো খাবার খেয়ে থাক। এ কারণে, এই শুকনো রুটি তোমাকে কিভাবে খেতে বলি?[১৮]

'আমির 'ইবাদাত, আধ্যাত্মিক সাধনা, দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা, খোদাভীতি এবং প্রবৃত্তি দমনের সাধনায় এমন স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন যেখানে পার্থিব মন-ভোলানো এবং আরাম-আয়েশের কোন কিছুর অবকাশ ছিল না। তিনি প্রবৃত্তির দমন ও আধ্যাত্মিক সাধনাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন। এক সময় তিনি বলতেন, যদি সম্ভব হয় তাহলে আমি জীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবো। তিনি তাঁর এই ইচ্ছাকে এমন সফলভাবে পূর্ণ করেন যে দুনিয়ার যাবতীয় সুখ-সম্পদ ও আনন্দ-ফূর্তি যা তাঁর এই ইচ্ছা পূরণে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারতো, সবই পরিহার করেন। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন, 'আমার অন্তর থেকে নারীর ইচ্ছা ও লোভ দূর করে দিন। এ জিনিস আমার জীবনের জন্য সবচেয়ে বেশী মারাত্মক। একমাত্র আপনার ভয় ছাড়া আর কারো ভয়-ভীতি থেকে আমার অন্তরকে পরিষ্কার করে দিন। আমার চোখ থেকে ঘুম দূর করে দিন, যাতে রাত-দিন সব সময় আমার ইচ্ছা মত আপনার 'ইবাদাত করতে পারি।' আল্লাহ তাঁর প্রথম দু'টি দু'আ কবুল করেন কিন্তু দীর্ঘ দিন যাবত ঘুমকে আয়ত্তে আনতে পারেননি।[১৯]

তিনি ঘুম ও ক্ষুধাকে আয়ত্তে আনতে না পারলেও আজীবন এ দু'টিকে পরাভূত করে রাখার জন্য চেষ্টা করে গেছেন। তিনি ঘুম দূর করার এবং ক্ষুধা ভুলে থাকার এই পন্থা বের করেন যে, রাত জেগে আল্লাহর 'ইবাদাত করতেন, আর দিনে রোযা রেখে ঘুমোতেন। শামে অবস্থানকালে সারা দিন রোযা রেখে এবং সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন। আহার ছিল শুকনো রুটি যা পানিতে ভিজিয়ে খেয়ে নিতেন।[২০] এই চূড়ান্ত রকমের চেষ্টা-সাধনা ও অনুশীলন তাঁর দেহকে এত ক্ষীণ ও দুর্বল করে ফেলেছিল যে, তাঁকে দেখে মানুষের দয়া হতো।

এভাবে তাঁর প্রবৃত্তি দমনের চূড়ান্ত সীমা 'রাহ্বানিয়াত' বা বৈরাগ্যবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়। তাঁর যুগের লোকেরাও তাঁর এসব কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছিল। সরকারী তদন্তের মুখোমুখিও তাঁকে হতে হয়েছিল। তখন তিনি যেসব উত্তর দিয়েছিলেন তা দ্বারা তাঁর প্রতি মানুষের যেসব সন্দেহ-সংশয় দেখা দিয়েছিল তা অনেকখানি দূর হয়ে যায়। একবার এক ব্যক্তি তাঁর এমন কৌমার্য ব্রতের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে তাঁকে এ আয়াতটি শোনান :

---

১৮. তাবাকাত-৭/৭৮-৭৯
১৯. প্রাগুক্ত-৭/৭৫-৭৬
২০. প্রাগুক্ত-৭/৭৭, ৮০

قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وذُرِّيَّةً.[২১]

– 'আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করেছি।'

অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ, যাঁরা ছিলেন আল্লাহর সবচেয়ে বেশী 'ইবাদাতকারী বান্দা-তাঁরা যদি স্ত্রী ও সন্তান পরিহার না করে থাকেন তাহলে একজন সাধারণ মানুষের জন্য তা কিভাবে বৈধ হতে পারে? 'আমির কুরআনের নিম্নের আয়াতটি দ্বারাই তার জবাব দেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ.[২২]

– 'আমি মানুষ ও জিনকে কেবল আমার 'ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।'

আরেকবার এক ব্যক্তি তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করলো : আপনি বিয়ে-শাদী করেন না কেন? তিনি এর একটা মনস্তাত্ত্বিক জবাব দেন। বলেন : আমার মধ্যে না কামাগ্নি ও ভোগ স্পৃহা আছে, আর না আছে আমার ধন-সম্পদ। এমতাবস্থায় আমি কেন একজন মুসলিম মহিলাকে ধোঁকা দিব?[২৩]

একবার বসরার আমীর 'আমিরকে বললেন, আমীরুল মু'মিনীন 'উছমান (রা) আমাকে বলেছেন, আমি যেন আপনাকে বিয়ে করতে বলি, আর আপনি বিয়ে করলে বাইতুল মাল থেকে আপনার মাহ্‌র আদায় করে দিই। অতএব, আপনি আপনার পছন্দমত কাউকে বিয়ে করুন। 'বাইতুল মাল' থেকে মাহ্‌র আদায় করা হবে।

'আমির একটু হেসে বললেন : আমি পয়গাম দিয়েই রেখেছি। ওয়ালী বললেন : কাকে? 'আমির বললেন : যে আমার সামান্য ছেঁড়া-ফাটা কাপড় ও সামান্য শুকনো খেজুর গ্রহণ করতে রাজী হয়। তারপর তিনি পাশে বসা লোকদের দিকে ফিরে বলেন : আমি আপনাদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করছি, আপনারা উত্তর দিন। আপনাদের প্রত্যেকের অন্তরে তার পরিবারের জন্য একটি অংশ আছে না? তারা বললেন : হাঁ, আছে। তিনি প্রশ্ন করলেন : সন্তানদের জন্য ভালোবাসা আছে না? তাঁরা বললেন : হাঁ, আছে। এবার 'আমির বললেন : যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! পরিবার ও সন্তান আমাকে আল্লাহর যিক্‌র থেকে বিরত রাখুক, তার চেয়ে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে আমার পাঁজর ক্ষত-বিক্ষত করা হোক, আমার বেশী পছন্দনীয়। আল্লাহর কসম! আমি আমার জীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য রাখবো।[২৪]

'আমিরের বসরায় অবস্থানকালে তাঁর অত্যধিক ও অস্বাভাবিক 'ইবাদাত-বন্দেগীর অবস্থা দেখে একদিন কিছু লোক তাঁকে বললো : আপনার দেহেরও আপনার উপর হক বা অধিকার আছে। একথা শুনে 'আমির নিজের 'নফ্‌স'-কে সম্বোধন করে বলেন : আল্লাহর

---

২১. সূরা আর-রা'দ-৩৮

২২. সূরা আয-যারিয়াত-৫২

২৩. তাবাকাত-৭/৭৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/১৭

২৪. 'আসরুত তাবি'ঈন-২৩২

কসম! 'তোমাকে শুধু আল্লাহর 'ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি তোমার দ্বারা এত বেশী 'আমল করাবো যে শয্যার আরাম তোমাকে স্পর্শ করার সুযোগ পাবে না।' তারপর তিনি শহর থেকে বেরিয়ে 'ওয়াদী আস-সিবা' (হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের উপত্যকা) চলে যান। সেখানে তিনি 'হামামা' নামক একজন হাবশী 'আবিদকে দেখতে পেলেন। এখানে উপত্যকার একটি স্থানে তিনি নামায পড়তেন, আর অন্য প্রান্তে 'ইবাদাতে মশগুল থাকতেন হামামা। একাধারে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত পূর্ণ হওয়ার আগে কেউ তাঁর নিজের স্থান থেকে সরতেন না। চল্লিশ দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর 'আমির গেলেন হামামার কাছে। তাঁকে প্রশ্ন করলেন : আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন! আপনি কে?

হামামা : আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দিন।

'আমিরের বার বার পীড়াপীড়িতে তিনি বলেন : আমি হামামা। 'আমির বললেন : যে হামামার কথা আমি শুনেছি, তিনি যদি আপনি হন তাহলে এ পৃথিবীতে এখন আপনার চেয়ে বড় 'ইবাদাতকারী দ্বিতীয় কেউ নেই। আচ্ছা, আমাকে একটু বলুন তো সবচেয়ে ভালো অভ্যাস কি?

হামামা : আমার 'আমল খুবই সীমিত। যদি না ফরজ নামায থাকতো– যাতে কিয়াম ও সিজদা আছে, তাহলে আমি আমার গোটা জীবনই রুকুতে এবং চেহারা মাটিতে ঠেকিয়ে কাটিয়ে দিতাম।

হামামা এবার জানতে চাইলেন : তা ভাই আপনার পরিচয়টা কি?

'আমির : আমি 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ।

হামামা : আপনি যদি সেই 'আমির হন যার কথা আমাকে বলা হয়েছে, তাহলে আপনি ধরাপৃষ্ঠে সবচেয়ে বেশী 'ইবাদাতকারী ব্যক্তি। আচ্ছা, আপনি বলুন সবচেয়ে ভালো অভ্যাস কি?

'আমির বললেন : আমার 'আমলও সীমিত এবং ত্রুটিপূর্ণ। তবে একটি জিনিস আমার অন্তরে আল্লাহর ভীতিকে বড় করে দিয়েছে। ফলে আমি এখন তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করিনে।

হামামা : সেই জিনিসটা কি?

'আমির তখন এ আয়াতটি পাঠ করেন :

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوْعٌ لَهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُوْدٌ.[২৫]

– 'তা এমন এক দিন, যেদিন সব মানুষই সমবেত হবে এবং সে দিনটি যে হাজিরার দিন।'

এ সময় হঠাৎ একটি হিংস্র জন্তু তাদেরকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে খেয়ে ফেলার উপক্রম করলো।

---

২৫. সূরা হূদ-১০৩

'আমির জন্তুর তর্জন-গর্জনকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে উপরোক্ত আয়াতটি বার বার আওড়াতে লাগলেন। হামামা বললেন : ওহে 'আমির! এই মারাত্মক বিপদ কি আপনি লক্ষ্য করছেন না?

'আমির : মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনকে ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় করতে আমার লজ্জা হয়। আমি আল্লাহকে এত গভীরভাবে ভালোবাসি যে তা আমার সব বালা-মুসীবতকে সহজ করে দিয়েছে। আমার মধ্যে তাঁর ভালোবাসা থাকতে আমার সকাল-সন্ধ্যা কেমন কাটলো সে ব্যাপারে আমার কোন পরোয়া নেই।[২৬]

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার বা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে তাঁর জিহ্বার তরবারি সব সময় কোষমুক্ত থাকতো। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিধি-বিধান লংঘিত হতে দেখলে তিনি ক্রোধে, উত্তেজনায় ফেটে পড়তেন। একবার তিনি আল্লাহর তাসবীহ্ ও তাহমীদ পাঠ ও শুকরিয়া আদায় করতে করতে রাস্তা দিয়ে চলছেন। এমন সময় দেখতে পেলেন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একজন সদস্য পুলিশ অন্য এক ব্যক্তির গলা এমনভাবে চেপে ধরে রেখেছে যে, লোকটির দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এর মধ্যে আরেকজন পুলিশ তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। দু'জনে মিলে জোর-জবরদস্তী লোকটিকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। 'আমির লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে শুনতে পেল, সে চিৎকার করে বলছে : ওহে মুসলিমগণ, আমাকে বাঁচান! আমি একজন অমুসলিম যিম্মী, আমাকে বাঁচান! 'আমির তাঁর কাছে গিয়ে বললেন : ওহে, আপনার কাছে কি জিযিয়া পাওনা আছে? লোকটি বললো : না। আমি সব পরিশোধ করেছি। আপনি আমাকে এই পুলিশের হাত থেকে বাঁচান। এবার 'আমির পুলিশের প্রতি তাকিয়ে বললেন : তাকে ছেড়ে দিন। পুলিশ তাঁর কথায় কান না দিয়ে বললো : আমরা তাকে ছাড়বো না। তাকে বসরায় পুলিশ বাহিনীর প্রধানের উদ্যানে যেতে হবে এবং পরিচ্ছন্ন করতে হবে। 'আমির যিম্মী লোকটিকে বললেন : তুমি তাদের সাথে গিয়ে তারা যা বলছে তা শুনছো না কেন? লোকটি বললো : আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার কাঁধে অনেকগুলো শিশু সন্তানের দায়িত্ব রয়েছে। তাদের জীবিকার জন্য আমাকে কাজ করতে হয়। এ কাজ করলে আমি আমার সন্তানদের জীবিকার জন্য কাজ করতে পারিনে। কারণ, এদের কাজে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এবার 'আমির পুলিশের লোকটিকে নির্দেশ দিলেন : তাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু পুলিশ সে নির্দেশ মানলো না। 'আমির এবার পুলিশকে লক্ষ্য করে বললেন : ওহে, তুমি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের (সা) অঙ্গীকার ভঙ্গ করছো? আল্লাহর কসম! আমি জীবিত থাকতে তুমি মুহাম্মাদের (সা) অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারবে না। তারপর 'আমির পুলিশটির হাত থেকে জোর করে লোকটি ছিনিয়ে নেন এবং তাকে ছেড়ে দিয়ে বলেন : তোমার পরিবারের লোকদের জীবিকার অন্বেষণে চলে যাও।[২৭]

---

২৬. হিলয়াতুল আওলিয়া-২/৮৯; 'আসরুত তাবি'ঈন-২২৩-২২৪

২৭. তাবাকাত-৭/৭৪; তারীখু ইবন 'আসাকির-৩/৩৬৮-৩৭১

বসরার ওয়ালী, যিনি পুলিশ বাহিনীর প্রধান ছিলেন, তাঁর কাছে এ সংবাদ পৌছানো হয়। 'আমিরের একাজকে সরকার-বিরোধী কর্মতৎপরতা হিসেবে চিহ্ি ত করা হয়।

আমীর-উমারা ও রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর উদাসীন ও বেপরোয়া ভাব অসন্তুষ্টির পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। তিনি ঐসব লোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলামেশাও পছন্দ করতেন না। তাঁর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছিল তার মধ্যে আমীর-উমারা ও শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা না করার অভিযোগও ছিল। তার জবাবে তিনি একথা বলেছিলেন যে, আপনাদের কাছে সব সময় অভাবী ও প্রয়োজনীয় কাজের লোকদের ভীড় জমে থাকে। আপনারা তাদের প্রয়োজন পূরণ করুন। আর আপনাদের কাছে যাদের কোন প্রয়োজন নেই তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থায় থাকতে দিন।[২৮] তিনি খলীফা ও আমীর-উমারা কাউকে ভয় ও পরোয়া করতেন না।

হযরত 'উছমানের (রা) সামনে তিনি যে সাহস ও নির্ভিকতার সাথে অকপটে নিজের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার কথা প্রকাশ করেন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালে বসরার কারীদের একটি প্রতিনিধিদল শামে পাঠানো হয়। তাতে 'আমিরও ছিলেন। মুদারিব ইবন হায্ন, যিনি প্রতিনিধিদলটি পাঠিয়েছিলেন, একদিন আমীর মু'আবিয়াকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন : আমরা কারীদের যে দলটি পাঠিয়েছিলাম তাদের কেমন দেখলেন? তিনি জবাব দিলেন : একজন ছাড়া বাকী সবাই মিথ্যা প্রশংসা করে ও বেশী কথা বলে। মিথ্যা নিয়ে আসে এবং আস্থাহীনতা নিয়ে ফিরে যায়। শুধু এক ব্যক্তি স্বাভাবিক মানুষ ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আমীরুল মু'মিনীন! সেই লোকটি কে? বললেন : 'আমির।[২৯]

যদি কোন আমীর অথবা সরকারী পদস্থ কর্মকর্তা কখনো নিজেই তাঁর কাছে আসতেন তখন তাঁর সাথেও তিনি একই রকম আচরণ করতেন। একবার কোন এক যুদ্ধে গেছেন। পথে যাত্রাবিরতি দেওয়া হয়। 'আমির একটি গীর্জার সীমানায় ঢুকে পড়েন এবং একজন লোককে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নির্দেশ দেন, কেউ যেন ভিতরে প্রবেশ না করে। কিছুক্ষণ পর সেই লোকটি এসে বলেন, আমীর ভিতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। আমীরকে তিনি ভিতরে ডেকে নেন এবং তাঁকে বলেন : আমি আপনাকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে দুনিয়ার প্রতি প্রলুব্ধ করবেন না এবং আখিরাতকে অমাার কাছে ছোট করে দেখাবেন না।[৩০]

প্রকৃত বাস্তবতা এই যে, 'আমিরের অবস্থান যে জগতে ছিল সেখানে পার্থিব কোন প্রকার বন্ধন, সম্পর্ক ও রীতি-পদ্ধতির কোন বালাই ছিল না। এ কারণে, শুধু আমীর-উমারা কেন কারো সাথে কোন রকম বন্ধন ও সম্পর্ক তাঁর ছিল না। দুনিয়ায় তাঁর কেবল

---

২৮. তাবাকাত-৭/৭৪
২৯. প্রাগুক্ত-৭/৭৮
৩০. প্রাগুক্ত-৭/৭৭

মুতাররিফ বসরীর সাথে অন্তরের সম্পর্ক ছিল। আর মহিলাদের মধ্যে একজন অতি সাধারণ ছাগলের রাখাল মহিলার প্রতি তাঁর অন্তরে দয়া ও সমবেদনার উদ্রেক হয়। কিন্তু তাঁর সাথে কোন রকম সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই মহিলাটি মারা যায়। মুতাররিফের সাথে তাঁর অপ্রকৃতিস্থ বা দিওয়ানা ধরনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। তাই তিনি বসরা ত্যাগের সময় তাঁর নিকট থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য এক রাতে কয়েকবার মুতাররিফের গৃহে যান। প্রত্যেক বারই তিনি মুতাররিফকে বলেন : 'আমার বাবা-মা তোমার জন্য কোরবান হোক! আল্লাহর কসম! তোমার ভালোবাসা আমাকে বার বার তোমার কাছে নিয়ে আসছে।[৩১]

আর মহিলাটির ঘটনা এই রকম। একজন অতি গরিব ও 'আবিদা মহিলা কয়েকজন বেদুইন লোকের ছাগল চরাতো। সে তাদের সব রকমের নির্যাতন সহ্য করতো। 'আমিরের সাথে তাঁর গুণের দিক দিয়ে অনেক মিল থাকায় লোকেরা 'আমিরকে বলতো, অমুক মহিলা আপনার স্ত্রী এবং সে একজন জান্নাতী মহিলা। 'আমির তার সন্ধানে বের হলেন। সে মহিলার জীবন ছিল এই রকম যে, সারাদিন অসভ্য ও বর্বর বেদুইনদের ছাগল চরাতো। দিন শেষে যখন ছাগলের পাল নিয়ে বাড়ী ফিরতো তখন বেদুইনরা গালাগালির মাধ্যমে তাকে স্বাগতম জানাতো। আর সামনে শুকনো রুটির দু'টি টুকরো ছুড়ে মারতো। সে তা কুড়িয়ে নিয়ে একটি টুকরো বাড়ীর লোকদের দিত। সারাদিন সে রোযা রাখতো। তাই দ্বিতীয় টুকরোটি দিয়ে সে সন্ধ্যায় ইফতার করতো। 'আমির তাকে খুঁজে বের করেন। যখন সে ছাগল চরানোর জন্য বেরিয়ে যায় তখন 'আমিরও সংগে যান। এক স্থানে পৌঁছে সেই মহিলা ছাগলগুলো ছেড়ে দিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যায়। 'আমির তাকে বললেন, তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে বলতে পার। সে বললো : আমার কোন প্রয়োজনই নেই। 'আমির যখন বেশী পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন তখন সে বললো, আমার শুধু এতটুকু ইচ্ছা যে, আমি যদি দুই টুকরো সাদা কাপড় পেতাম যা আমার কাফনের কাজে আসতো। 'আমির তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই বেদুইনরা তোমাকে গালি দেয় কেন? সে উত্তর দিল : এতে আমি আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করি। এই সংলাপের পর 'আমির তার মনিবদের নিকট যান এবং তাদেরকে প্রশ্ন করেন : তোমরা এই মহিলাকে গালি দাও কেন? তারা উত্তর দিল : আমরা যদি এমনটি না করি তাহলে সে আমাদের কাজের উপযুক্ত থাকবে না। 'আমির বললেন : তোমরা ওকে আমাদের কাছে বিক্রী করে দাও। তারা বললো : যত মূল্যই দাও না কেন আমরা তাকে আমাদের থেকে পৃথক করবো না। এ উত্তর শুনে 'আমির ফিরে যান এবং মহিলার ইচ্ছা অনুযায়ী দুই প্রস্থ কাপড় সংগ্রহ করে তার কাছে যান। কিন্তু কী অবাক ব্যাপার! সেই মহিলা তখন এই দুনিয়া ছেড়ে পরলোকে যাত্রা করেছে। 'আমির তার মনিবদের অনুমতি নিয়ে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেন।[৩২] এভাবে এ

---

৩১. প্রাগুক্ত-৭/৮০
৩২. প্রাগুক্ত-৭/৭৪

Contents

দুনিয়ায় 'আমিরের একজন মহিলার সাথে সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তা শেষ হয়।

'আমির একজন বড় মাপের দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। মুজাহিদদেরকে আর্থিক সাহায্য দানের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। দু'হাজার দিরহাম ভাতা পেতেন। সেই ভাতা যখনই পেতেন তখন গরিব-মিসকীন যাকে পথে পেতেন তাদের মধ্যে বিলাতে বিলাতে ঘরে ফিরতেন।

বসরা ত্যাগের পর 'আমির আর কোন দিন বসরায় ফিরে আসেননি। মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের প্রথম কিবলা 'বাইতুল মাকদিস'কে কেন্দ্র করে তার আশে-পাশে বসবাস করতে থাকেন। আমীর মু'আবিয়া (রা), যিনি ছিলেন তৎকালীন শামের ওয়ালী এবং পরবর্তীকালে মুসলিম জাহানের খলীফা, তাঁর প্রতি সীমাহীন সম্মান প্রদর্শন করতেন। সব সময় তাঁর খোঁজ-খবর রাখতেন। দিনের পর দিন পেরিয়ে বহু বছর গড়িয়ে গেল। 'আমিরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে চললো। অবশেষে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যা নিলেন। রোগের তীব্রতা বেড়ে গেল। তাঁর শুভানুধ্যায়ী ও গুণমুগ্ধরা বুঝতে পারলেন এ তাঁর অন্তিম রোগ। তাঁরা তাঁকে দেখার জন্য গেলেন। তাঁদেরকে দেখে তিনি কান্না শুরু করলেন। অশ্রু গড়িয়ে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। একজন বললেন : 'আমির! আপনি তো একজন নেক্কার, দুনিয়া বিরাগী, খোদাভীরু 'আবিদ মানুষ ছিলেন। আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন? 'আমির বললেন : আল্লাহর কসম! আমি দুনিয়ার প্রতি লোভের বশবর্তী হয়ে অথবা মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছিনে। আমি কাঁদছি দীর্ঘ ভ্রমণ ও স্বল্প পাথেয়-এর কথা চিন্তা করে। ঊর্ধ্বে আরোহণ ও নিম্নে পতনের মাঝ দিয়ে আমার জীবন কেটেছে। এরপর আছে জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আমি জানিনে কোথায় হবে আমার ঠিকানা।[৩৩] একথা বলতে বলতে তাঁর রূহটি তাঁর সর্বোচ্চ বান্ধবের নিকট পৌঁছে গেল। তখন হযরত মু'আবিয়ার (রা) শাসনকাল। বাইতুল মাকদিসে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩৪]

'আমির-এর সম্পর্কে এক ব্যক্তির একটি স্বপ্ন উল্লেখ করার মত। এ স্বপ্নের দ্বারা তাঁর আধ্যাত্মিকতা কোন স্তরের ছিল তা অনুমান করা যায়। সা'ঈদ নামের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। একবার এক ব্যক্তি স্বপ্নে নবীর (সা) অপরূপ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করেন। সেই ব্যক্তি আবেদন জানায় : হুজুর! আমার গুনাহ্ মাফের জন্য দু'আ করুন। তিনি বলেন : তোমাদের জন্য 'আমির দু'আ করছেন। সেই ব্যক্তি 'আমিরের নিকট এই স্বপ্ন বর্ণনা করলে তিনি প্রবল আবেগে এত বিগলিত হয়ে যান যে, তাঁর কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হয়।[৩৫]

হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ছিলেন 'আমিরের অতি শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক।

---

৩৩. সিফাতুস সাফওয়া-৩/২১১
৩৪. আল-ইসাবা-৩/৮৬; 'আসরুত তাবি'ঈন-২৩৩
৩৫. তাবাকাত-৭/৮০

শিক্ষক তাঁর প্রিয় ছাত্রের সব গতিবিধি ও কাজকর্মের প্রতি সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। মাঝে মধ্যে প্রয়োজন হলে জরুরী নির্দেশনাও দিতেন। একবার তিনি একটি চিঠিতে 'আমিরকে লেখেন : অতঃপর এই যে, আমি একটি বিষয়ে তোমার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, এখন আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি তা পরিবর্তন করে ফেলেছো। যদি তুমি সেই অঙ্গীকারের উপর থেকে থাক তাহলে আল্লাহকে ভয় কর এবং তার উপর অটল থাক। আর তাই যদি সত্য হয় যা আমি শুনেছি, তাহলে আল্লাহকে ভয় কর এবং সেই অঙ্গীকারে ফিরে আস।[৩৬]

'উতবী বলেছেন, আমাদের শিক্ষকরা বলতেন : যুহ্দ ও 'ইবাদাত আটজন তাবি'ঈর মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সেই আটজনের একজন হলেন 'আমির।[৩৭]

একবার 'আমিরকে বলা হলো, আপনি একটু দুনিয়ার পরিচয় দিন। বললেন : দুনিয়া হলো মৃত্যুর মা, সুদৃঢ়ের ভঙ্গকারী, দান ও অনুগ্রহ ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশী এবং তার মধ্যে যা আছে সবই এক অজানার দিকে ধাবমান।[৩৮]

'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ বলতেন : 'কথা যখন অন্তর থেকে বের হয় তখন তা অন্তরে পড়ে। আর যখন জিহ্বা থেকে বের হয় তখন তা কানের ছিদ্র অতিক্রম করে না।'[৩৯]

'আমির ইবন 'আবদিল্লাহকে একবার বলা হলো : মানুষ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? বললেন : আমি তার সম্পর্কে কি বলবো যে ক্ষুধার্ত হলে বিনয়ী ও বাধ্য হয়, আর পেট ভরলে বিদ্রোহী হয়।[৪০]

---

৩৬. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/১৫১
৩৭. প্রাগুক্ত-৩/১৭১
৩৮. প্রাগুক্ত-৩/১৭২
৩৯. কিতাবুল হায়ওয়ান-৪/২১০; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৮৩; ৪/২৯
৪০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/১৬৯

'আলকামা ইবন কায়স (রহ)

আবূ শিব্ল 'আলকামা ছিলেন বিখ্যাত তাবি'ঈ মুহাদ্দিছ ইবরাহীম আন-নাখা'ঈর মামা এবং আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদের চাচা। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন।[১] জ্ঞান, চারিত্রিক উৎকর্ষ, পার্থিব ভোগ-বিলাস বিমুখতা ও খোদাভীতির দিক দিয়ে বিশিষ্ট তাবি'ঈদের অন্তর্গত ছিলেন। ইমাম আয-যাহ্বী তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে : তিনি কূফার বড় ফকীহ্, 'আলিম, কারী, ইমাম, হাফেজ, মুজাবিবদ ও মুজতাহিদ।[২]

তিনি এমন এক যুগ লাভ করেন যেখানে বহু বড় সাহাবীর সান্নিধ্যে থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। হযরত 'উমার (রা), 'আলী মুরতাদা (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা), হুযায়ফা ইবন আল-ইয়ামান (রা), সালমান আল-ফারেসী (রা), আবূ মাসঊদ আল-বাদরী (রা), আবুদ্ দারদা' (রা) প্রমুখ উঁচু স্তরের সাহাবায়ে কিরাম তখন বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং বর্ণনাও করেছেন। তবে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদের (রা) জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে বিশেষভাবে উপকার লাভ করেন। তিনি 'আলকামাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দেন। আসওয়াদ বলেন : 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা) 'আলকামাকে যেভাবে কুরআন শিক্ষা দিতেন, ঠিক সেইভাবে তাশাহ্হুদও শিক্ষা দিতেন।[৩] তাঁর এমন বিশেষ মনোযোগ ও অনুগ্রহে 'আলকামা দ্বিতীয় ইবন মাস'ঊদে (রা) পরিণত হন। ইবন মাস'ঊদ (রা) নিজেই বলতেন, আমি যত কিছু পড়েছি ও জেনেছি, তা সবই 'আলকামা পড়েছে ও জেনেছে।[৪] তাঁর জ্ঞানগত যোগ্যতা ও উৎকর্ষের ব্যাপারে সকল 'আলিম ও মুহাদ্দিছ একমত। ইমাম যাহাবী লিখেছেন : তিনি একজন ফকীহ্ ও শ্রেষ্ঠ ইমাম। ইমাম নাওবী বলেছেন : 'আলকামা একজন উঁচু স্তরের, সুমহান মর্যাদার এবং সম্পূর্ণতার অধিকারী ফকীহ্ ছিলেন।[৫]

কুরআন, হাদীছ, ফিকাহ্ তথা সকল জ্ঞানে 'আলকামার সমান দক্ষতা ছিল। কুরআনের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন হযরত ইবন মাস'ঊদের (রা) নিকট। ইমাম যাহ্বী লিখেছেন:[৬] وَجَوَّدَ الْقُرْآنَ عَلَى إِبْنِ مَسْعُوْدٍ، - বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করা শিখেছিলেন ইবন মাস'ঊদের নিকট।' ইবন মাস'ঊদ (রা) নিজে মাঝে মাঝে নিজের পাঠের শুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য 'আলকামাকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। 'আলকামা বর্ণনা করেছেন। একবার ইবন মাস'ঊদ আমাকে বললেন, তুমি সূরা আল বাকারায় আমার ভুল ধরবে। একথা বলে তিনি আমাকে সূরা আল বাকারা পাঠ করে শুনিয়ে জানতে চাইলেন : আমার

---

১. তাহযীবুত তাহযীব-৭/২৭৬
২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৫৩
৩. তাবাকাত-৬/৫৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৫৮
৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪১
৫. তাহযীবুল আসমা'-১/৩৪২
৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৮

কিছু ছুটে যায়নি তো? আমি বললাম : একটি হরফ ছুটে গেছে। তিনি নিজেই বললেন : অমুক হরফ। আমি বললাম : হাঁ।[৭]

তিনি চমৎকার কণ্ঠ ও মিষ্টি আওয়াজের মানুষ ছিলেন। এ কারণে ইবন মাস'ঊদ (রা) 'তারতীল' (স্পষ্ট ও সুমধুর সুর) করে কুরআন পাঠ করার জন্য তাঁকে বলতেন। তিনি নিজেই বলতেন, আল্লাহ আমাকে মিষ্টি গলা দিয়েছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা) আমার দ্বারা কুরআন পাঠ করিয়ে শুনতেন, আর বলতেন, আমার মা-বাবা তোমার প্রতি কুরবান হোক! একটু মিষ্টি সুরে পাঠ কর। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) একথা বলতে শুনেছি যে, মিষ্টি ধ্বনি কুরআনের ভূষণ।[৮]

তিনি একজন শ্রেষ্ঠ হাফেজে হাদীছ ছিলেন। ইমাম যাহ্বী তাঁকে হাদীছের হাফেজ ও লেখকদের দ্বিতীয় স্তরে স্থান দিয়েছেন।[৯] স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। কোন জিনিস একবার মুখস্থ করে নিলে তা যেন বইয়ের মত সংরক্ষিত হয়ে যেত। তিনি নিজে বলতেন : যে জিনিস আমি আমার যৌবনে মুখস্থ করেছি তা এখন এমনভাবে পাঠ করি যেন কাগজে লেখা কোন জিনিস দেখে দেখে পাঠ করছি।[১০] এমন এক অসাধারণ স্মৃতি শক্তি নিয়ে তিনি হযরত 'উমার (রা), 'উছমান (রা), 'আলী (রা), সা'দ (রা), হুযায়ফা ইবন আল-ইয়ামান (রা), আবুদ দারদা' (রা), আবূ মাস'ঊদ (রা), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা), খাব্বাব ইবন আল-আরাত (রা), খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদ (রা), মা'কাল ইবন সিনান (রা), উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা) প্রমুখের মত শ্রেষ্ঠ 'আলিম সাহাবীদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন।[১১] এই মহান ব্যক্তিবর্গের বদান্যতায় তিনি হাদীছের একজন অতি বড় হাফেজে পরিণত হন। ইবন সা'দ তাঁকে বহু হাদীছের ধারক এবং ইমাম যাহ্বী শ্রেষ্ঠ ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।[১২] ইয়াহইয়া ইবন আল-ইয়ামান তাঁর ছেলেকে বলতেন, হাদীছের ইমাম চারজন। তাঁরা হলেন যথাক্রমে : 'আবদুল্লাহ, 'আলকামা, ইবরাহীম এবং তুমি দাঊদ।[১৩]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদের (রা) হাদীছের বেশীর ভাগ অংশ, বরং বলা চলে প্রায় সবই 'আলকামা তাঁর বুকের মধ্যে ধারণ করেন।

এত বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মুহাদ্দিছ হিসেবে পরিচিত হওয়া এবং সেই সূত্রে মান-মর্যাদার উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া তাঁর পছন্দনীয় ছিল না। হযরত ইবন

---

৭. তাবাকাত-৬/৬০
৮. প্রাগুক্ত
৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৮
১০. তাবাকাত-৬/৫৮
১১. তাহ্যীবুত তাহযীব-৭/২৭৬
১২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৮
১৩. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/৪৭৭

মাস'উদের ইনতিকালের পর লোকেরা তাঁর নিকট আবেদন জানালো যে, এখন আপনি তাঁর স্থলে মানুষকে সুন্নাহ্র তা'লীম দিতে বসুন। তিনি জবাবে বললেন : তোমরা কি চাও মানুষ আমার পিছে পিছে চলুক?[১৪]

হাদীছে তাঁর শিষ্য-শাগরিদের পরিধি অনেক বিস্তৃত। 'আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ, ইবরাহীম ইবন সা'দ, ইমাম শা'বী, আবূ কাতাদা নাখা'ঈ, শাকীক ইবন সালামা ইবন কুহায়ল, কায়স ইবন রূমী, কাসিম ইবন মুখায়মারা, আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ, ইয়াহইয়া ইবন ওয়াছ্ছাব, আবুদ দুহা মুসলিম প্রমুখ খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ছিলেন তাঁর ছাত্র। ছাত্রদের মধ্যে তাঁর ভাগিনা ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ এবং ভাতিজা আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৫]

ফিকাহ্র জ্ঞানও তিনি অর্জন করেন ফকীহুল উম্মাত হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) নিকট। এ কারণে এ শাস্ত্রেও তিনি ইমামাত ও ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখতেন। আল্লামা যাহ্বী লিখেছেন : 'كَانَ فَقِيْهًا إِمَامًا بَارِعًا' তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ইমাম, ফকীহ।[১৬] ইমাম নাওবী তাঁকে পূর্ণতার অধিকারী ফকীহ বলেছেন।[১৭]

জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও প্রশস্ততার দিক দিয়ে 'আলকামা ছিলেন হযরত ইবন মাস'উদের (রা) বিশিষ্ট ছাত্রদের একজন। ইবন মাদায়িনী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের (রা) জ্ঞানের সবচেয়ে বড় ধারক-বাহক ছিলেন 'আলকামা, আসওয়াদ, 'উবায়দা ও হারিছ।[১৮] তাঁদের মধ্যে 'আলকামা ছিলেন সবার চেয়ে অগ্রগামী। ইবরাহীম বর্ণনা করেছেন, ইবন মাস'উদের ছয়জন ছাত্র মানুষকে সুন্নাতের তা'লীম দিতেন। তাঁদের মধ্যে 'আলকামা ও আসওয়াদ– এ দু'জনও ছিলেন। আবুল হুযায়ল জিজ্ঞেস করলেন, তা এ দু'জনের মধ্যে ভালো কে ছিলেন? তিনি 'আলকামার নামটি উচ্চারণ করলেন।[১৯] 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) নিজেই তো এ সনদ দান করেন যে, আমি যা কিছু পড়েছি, জেনেছি, তা সবকিছু 'আলকামা পড়ে ও জানে।[২০] এটাইতো 'আলকামার জ্ঞানের প্রশস্ততার সবচেয়ে বড় সনদ।

'আলকামার জ্ঞানগত পূর্ণতা এত স্বীকৃত ছিল যে, রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের অনেকে তাঁর থেকে জ্ঞান লাভ করতেন। আর এটা একজন তাবি'ঈর জন্য অতি বড় সম্মান ও গৌরবের বিষয়। আবূ জাবয়ান বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) একাধিক সাহাবীকে 'আলকামার নিকট বিভিন্ন মাস'আলা জিজ্ঞেস করতে দেখেছি। তাঁরা তাঁর নিকট ফাতওয়াও জিজ্ঞেস করতেন।[২১]

---

১৪. তাবাকাত-৬/৬০
১৫. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৭/২৭৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৮
১৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৮
১৭. তাহ্যীবুল আসমা'-১/৩৪২
১৮. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৭/২৭৭
১৯. প্রাগুক্ত
২০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪১
২১. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৭/২৭৭; হিলয়াতুল আওলিয়া-২/৩৮

অভ্যাস, স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতায় তিনি ছিলেন হযরত রাসূলে পাকের সত্তার অনুরূপ। ইবরাহীম বলেছেন, ‘আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ (রা) চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্রে নবী কারীমের (সা) মত ছিলেন। আর ‘আলকামা ছিলেন ইবন মাস‘উদের (রা) মত। এভাবে ‘আলকামা যেন রাসূলুল্লাহর (সা) অনুরূপ ছিলেন। অভ্যাস ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে ‘আলকামা ও ইবন মাস‘উদের এত পরিমাণ মিল যে, যারা ইবন মাস‘উদকে (রা) দেখেনি তারা ‘আলকামার জীবন ও কর্মকে দেখে ইবন মাস‘উদকে (রা) মনের আয়নায় কল্পনা করতে পারতো। এই মিল কেবল ‘ইলম ও বাহ্যিক চাল-চলন ও স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে সীমিত ছিল না, বরং ‘আমলেও তাঁর ইবন মাস‘উদের (রা) সাথে পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল। এ কারণে তিনি “‘উলামা’ রাব্বানিয়্যীন’ বা আল্লাহ ওয়ালা ‘আলিমদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইমাম যাহ্বী লিখেছেন, তিনি সৎকর্মশীল ও খোদাভীরু লোক ছিলেন।[২২]

আল-কুরআনের সাথে তাঁর এক অস্বাভাবিক সম্পর্ক ও হৃদ্যতা ছিল। সাধারণতঃ পাঁচ দিনে তিনি একবার সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ শেষ করতেন।[২৩] কখনো কখনো এক রাতেই সম্পূর্ণ কুরআন পড়ে ফেলতেন। ইবরাহীম বলেছেন, ‘আলকামা একবার মক্কায় গেলেন। রাতে তিনি তাওয়াফ শুরু করলেন। প্রথম সাত চক্করে ‘তিওয়াল’ সূরা পাঠ শেষ করেন। দ্বিতীয় সাত চক্করে ‘মি’ইন’, তৃতীয় সাত চক্করে ‘মাছানী’ এবং চতুর্থ সাত চক্করে বাকী সূরা পাঠ শেষ করেন। এভাবে এক রাতে তাওয়াফ অবস্থায় সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত শেষ করেন।[২৪]

কুরআনের সাথে তাঁর এত গভীর সম্পর্কের কারণে সব সময় তাঁর মুখ থেকে কুরআনের আয়াত বহমান থাকতো। প্রতিটি কাজ শুরু করার সময় যেখানে যে আয়াতটি প্রযোজ্য সেটি পাঠ করতেন। যেমন খাওয়ার সময় হলে স্ত্রীর নিকট খাবার চাইতেন এ আয়াত পাঠ করে :

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَرِيْئًا[২৫]

– “তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।”

ঘোড়ায় চড়ার সময় জিনে পা রাখার মুহূর্তে তাঁর জিহ্বা থেকে বের হতো এ আয়াত :[২৬]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.[২৭]

---

২২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৮
২৩. তাবাকাত-৬/৬০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৫৭
২৪. তাবাকাত-৬/৫৯
২৫. সূরা আন-নিসা'-৪
২৬. তাবাকাত-৬/৫৭, ৫৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/৫৩
২৭. সূরা আয-যুখরুফ-১৩

"সকল প্রশংসা আল্লাহর। 'পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব।"

জ্ঞান চর্চার সাথে সাথে জিহাদের প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনাও তাঁর মধ্যে ছিল। হিজরী ৩২ সনে আমীর মু'আবিয়ার (রা) সাথে তিনি কনস্টান্টিনোপল অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এই কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ব্যাপারে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এ বাহিনীর সবাই সে বিজয়ের অংশীদার ও সাক্ষী হওয়ার জন্য শাহাদাতের প্রবল প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিলেন। মু'দিদ নামক একজন মুজাহিদ একটি কিল্লার উপর আক্রমণ করার সময় মাথায় বাঁধার জন্য 'আলকামার একটি চাদর চেয়ে নেন। এ মুজাহিদ শহীদ হন এবং 'আলকামার চাদরটি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়।

'আলকামা এ চাদরটিকে অত্যন্ত মঙ্গলময় বলে মনে করতেন। সেটি কাঁধে ঝুলিয়ে জুম'আর নামাযে যেতেন এবং বলতেন, আমি এটি এজন্য কাঁধে ঝুলাই যে, এতে মু'দিদের খুনের স্পর্শ আছে।[২৮]

তিনি খ্যাতি ও প্রচারকে খুব ভয় করতেন। এর থেকে দূরে থাকার জন্য পঠন-পাঠন কার্যক্রমের বিশেষ স্থানে বসা মোটেই পছন্দ করতেন না। 'আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন যে, আমরা 'আলকামাকে অনুরোধ করলাম, আপনি মসজিদে নামায পড়ুন এবং নামাযের পর একটু বসুন। তাহলে আপনার কাছে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করতে পারতাম। বললেন, এটা আমি পছন্দ করি না যে, মানুষ ইশারা করে বলুক– ইনি 'আলকামা।[২৯] একদিন জুম'আর নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গেলেন। ইমাম তখন খুতবা দিচ্ছেন। লোকেরা তাঁকে মসজিদের ভিতরে প্রবেশের জন্য অনুরোধ করলো। কিন্তু তিনি সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে দরজায় বসে পড়লেন।[৩০]

আমীর-উমারা এবং রাষ্ট্রের উঁচু পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের প্রতি শুধু বেপরোয়া এবং তাঁদের থেকে দূরেই থাকতেন না, বরং তাঁদের সাথে মেলামেশা, উঠাবসা এবং তাঁদের নিকট যাতায়াত করাকেও নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন। একবার লোকেরা বললো, আপনি আমীর-উমারার দরবারে যাতায়াত করুন। তাহলে তাঁরা আপনার প্রকৃত অবস্থা অবগত হবে এবং মর্যাদা বুঝবে। বললেন, আমি তাঁদের থেকে যত কথা দূর করবো এবং যত জিনিসের স্বল্পতা ঘটাবো তাঁরা তার চেয়ে বেশী জিনিস আমার মধ্য থেকে কম করে দেবে।[৩১] অর্থাৎ আমি তাঁদের থেকে যে পরিমাণ দোষ-ত্রুটি দূর করবো, তার চেয়ে বেশী ভালো জিনিস আমার থেকে তাঁরা দূর করে দেবে। তিনি কেবল নিজে আমীর-উমারার সাথে মেলামেশা করতেন না, বরং অন্যদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতেন।

---

২৮. ইবনুল আছীর : আল-কামিল ফিত তারীখ-৩/১০৩

২৯. তাবাকাত-৬/৫৯

৩০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৫৮

৩১. তাবাকাত-৬/৫৯

আবূ ওয়ায়িল বর্ণনা করেছেন। যখন বসরা ও কূফা দু'টি অঞ্চলই ইবন যিয়াদের শাসনাধীনে দেওয়া হয় তখন একবার তিনি আমাকে বললেন, তুমিও আমার সাথে একটু চলো। আমি গেলাম এবং 'আলকামার কাছে আমীর-উমারা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ঐ লোকদের থেকে তোমার যা অর্জন হবে তার চেয়ে বেশী জিনিস তারা তোমার থেকে নিয়ে নিবে। কোন প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবেও তিনি আমীরদের দরবারে যাওয়া পছন্দ করতেন না। একবার হযরত আমীর মু'আবিয়ার (রা) দরবারে যাবে, এমন একটি প্রতিনিধিদলের তালিকায় তাঁর নামটিও লিখে দেওয়া হয়। তিনি তা জানার সাথে সাথে আবূ বুরদাকে লেখেন, আমার নামটি তালিকা থেকে বাদ দিন।[৩২]

'আলকামা হিজরী ৬২ সনে কূফায় ইনতিকাল করেন। অন্তিম রোগ শয্যায় অসীয়াত করেন যে, আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে কালেমা তায়্যিবার তালকীন করবে যাতে আমার জিহ্বার শেষ উচ্চারণ হয়- لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ – এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, যাঁর কোন শরীক নেই। আমার মৃত্যুর খবর কাকেও পৌঁছাবে না। যাতে জাহিলী যুগের মত প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি না হয়। দ্রুত দাফন করবে। বিলাপকারিণী মহিলারা যেন লাশের অনুগামী না হয়।[৩৩]

---

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. প্রাগুক্ত-৬/৬০; হিলয়াতুল আওলিয়া'-২/১০১

মাসরূক ইবন আল-আজদা' (রহ)

হযরত মাসরূকের ডাক নাম আবূ 'আয়িশা। তাঁর পিতার নাম আল-আজদা'। এটা ছিল তাঁর জন্মের পর পিতা-মাতা প্রদত্ত নাম। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর পিতার নাম হয় 'আবদুর রহমান। তিনি ছিলেন ইয়ামনের বিখ্যাত খান্দান হামাদানের একজন নেতা এবং আরবের অন্যতম খ্যাতিমান পুরুষ 'আমর ইবন মা'দিকারিব-এর প্রীতিভাজন ব্যক্তি। ইমাম যুহরী মাসরূককে 'আমরের ভাগ্নে বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

মাসরূক জাহিলী ও ইসলামী দু'যুগই পেয়েছিলেন। মুহাম্মাদ (সা)-এর রিসালাতের সময়কালেও তিনি বর্তমান ছিলেন। তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যরা সে সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। এমনকি তাঁর অতি আপনজন 'আমর ইবন মা'দিকারিব (রা) মদীনায় এসে হযরত রাসূলের কারীমের (সা) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু মাসরূকের দুর্ভাগ্য যে, এ সময় ইসলাম গ্রহণ থেকে তিনি বঞ্চিত থেকে যান। তিনি কখন ইসলাম গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফাতকালে তিনি মুসলমান হন বলে কিছু কিছু বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়। ইবন সা'দের তাবাকাতে মাসরূকের নিজের এ রকম একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, 'আমি আবূ বকরের (রা) পিছনে নামায পড়েছি।'[২]

হযরত 'উমার ফারূকের (রা) খিলাফতকালে মাসরূককে দৃশ্যপটে দেখা যায়। সে সময় একবার ইয়ামনী প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনায় আসেন। হযরত 'উমার (রা) তাঁর পরিচয় জানতে চান। তিনি বলেন : আমি মাসরূক ইবন আল-আজদা'। 'উমার (রা) বলেন : আল-আজদা' তো শয়তানের নাম।[৩] এখন থেকে আপনি হবেন মাসরূক ইবন 'আবদির রহমান। আর এখান থেকেই তাঁর পিতার নাম পরিবর্তন হয়ে যায়। এ রকম একটি বর্ণনাও আছে যে, হযরত 'উমার (রা) তাঁকে নয়, বরং তাঁর পিতাকে নাম জিজ্ঞেস করে আজদা'-এর স্থলে 'আবদুর রহমান নামটি প্রস্তাব করেন।[৪] যাই হোক না কেন, এ দু'টি বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে পিতা-পুত্র দু'জনই মদীনায় এসেছিলেন। এ রকম একটি বর্ণনাও আছে যে, শিশু অবস্থায় তিনি চুরি হয়ে গিয়েছিলেন এবং পরে পাওয়া যায়। তাই তাঁর নাম হয় 'মাসরূক'। যার অর্থ চুরি হয়ে যাওয়া।[৫]

মাসরূক ছিলেন ইয়ামনের বিখ্যাত অশ্বারোহীদের অন্যতম ব্যক্তি। হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি তাঁর তিন ভাই– 'আবদুল্লাহ, আবূ বকর ও মুনতাশার-এর সাথে

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৯
২. তাবাকাত-৫/৩৮২
৩. আবূ দাঊদ-৪৯৫৭; মুসনাদে আহমাদ-১/৩১; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/৩০১
৪. তাবাকাত-৬/৫০
৫. 'আসরুত তাবি'ঈন-২৬২·

বিখ্যাত কাদেসিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তাঁর তিন ভাই শাহাদাত লাভ করেন। আর অস্ত্র চালাতে চালাতে মাসরূকের হাত অবশ হয়ে যায় এবং মাথায় মারাত্মক আঘাত পান। এ আঘাতের চিহ্ন সারা জীবন বিদ্যমান ছিল। যেহেতু এই চিহ্ন টি ছিল তাঁর সাহস, বীরত্ব ও জীবন বাজি রাখার একটি সনদ, তাই এটাকে তিনি ভীষণ পছন্দ করতেন এবং এটা মুছে যাওয়া মোটেই আশা করতেন না।[৬]

তবে তাঁর এ বীরত্ব ও বাহাদুরী ছিল ইসলামের সেবায় এবং ইসলাম বিরোধী শক্তির মুকাবিলায়। মুসলমানদের গৃহযুদ্ধে তাঁর তরবারি সবসময় কোষবদ্ধই ছিল। হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালের কোন বিদ্রোহ ও বিশৃংখলায় কোনভাবেই অংশগ্রহণ করেননি। ইসলামের একজন শুভানুধ্যায়ী হিসেবে তিনি নিজের শহর কূফার অধিবাসীদের মদীনাবাসীদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য সব সময় উৎসাহিত করতেন।[৭]

হযরত 'উছমানের (রা) শাহাদাতের পর যখন উটের যুদ্ধের তোড়াজোড় শুরু হয়ে যায় এবং সমর্থন ও সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে হযরত 'আলী (রা) যখন হযরত হাসান (রা) ও 'আম্মার ইবন ইয়াসিরকে (রা) কূফায় পাঠান তখন এই মাসরূক সর্বপ্রথম তাঁদের সাথে মিলিত হন। তিনি 'আম্মার ইবন ইয়াসিরকে (রা) জিজ্ঞেস করেন : 'আবুল ইয়াকজান! আপনারা 'উছমানকে (রা) কোন কারণে শহীদ করেন? তিনি বলেন : আমার ইজ্জত আবরু নিয়ে টানাটানি ও আমাকে পিটুনির কারণে।

মাসরূক বলেন : আল্লাহর কসম! আপনারা যতখানি ভোগান্তির শিকার হয়েছিলেন তার চেয়ে বেশী বদলা নিয়ে ফেলেছেন। যদি আপনারা ধৈর্য ধরতেন, তাহলে সেটাই আপনাদের জন্য ভালো ছিল।[৮]

উটের যুদ্ধের মাধ্যমে যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়, সিফ্ফীন যুদ্ধ পর্যন্ত তা চলমান ছিল। মাসরূক এর একটিতেও অংশগ্রহণ করেননি। হযরত 'আলীর (রা) সমর্থকদের বড় কেন্দ্র ছিল কূফা। এখানে অবস্থান করে নিজেকে নিরপেক্ষ রাখা ভীষণ কঠিন ব্যাপার ছিল। এ কারণে এ সময় তিনি কূফা ছেড়ে কাযবীন চলে যান।[৯]

শা'বী বর্ণনা করেছেন, কোন একটি যুদ্ধেও মাসরূক 'আলীর (রা) সাথে ছিলেন না। পরবর্তীকালে যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো যে, আপনি 'আলীর (রা) সাথে ছিলেন না কেন? তিনি বলতেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, ধরে নাও আমরা একে অপরের মুখোমুখি সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এবং উভয় পক্ষ অস্ত্র হাতে একে অপরকে হত্যা করে চলেছি, আর সেই সময় তোমাদের চোখের সামনে আসমানের কোন দরজা খুলে গেল এবং সেখান থেকে কোন ফেরেশতা বেরিয়ে এসে মুখোমুখি দু'টি সারির

---

৬. তাবাকাত-৬/৫২
৭. আল-কামিল ফিত তারীখ-৩/১২৭
৮. প্রাগুক্ত-৩/১৮৫
৯. প্রাগুক্ত-৩/২৩০

মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللهَ بِكُمْ رَحِيْمًا.[১০]

'ওহে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের অর্থ-সম্পদ খেয়ো না। তবে তোমাদের পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য হলে খেতে পার। আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়াশীল।'

– তাহলে তার এ বলা উভয় পক্ষকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখবে কিনা? লোকেরা জবাব দিত : নিশ্চয় বিরত রাখবে। তখন তিনি বলতেন, আল্লাহ্র কসম! তোমাদের জানা উচিত যে, আসমানের দরজা খোলা হয়েছে এবং সেখান থেকে একজন ফিরিশতা এসে তোমাদের নবীকে এ নির্দেশ শুনিয়ে গেছেন। আর তা মাসহাফে বিদ্যমান আছে এবং তা অন্য কিছু দ্বারা রহিত করা হয়নি।[১১]

'আমির থেকে অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। মাসরূক আমাকে বললেন, যখন মু'মিনদের দু'টি দল পরস্পরের সাথে লড়াই করার জন্য মুখোমুখি সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, আর তখন আসমান থেকে কোন ফিরিশতা আত্মপ্রকাশ করে চিৎকার করে বলে :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ الخ

তখন তোমার কি ধারণা? তারা যুদ্ধ করবে, না যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে? আমি বললাম: তারা যদি অনুভূতিহীন জড় পাথর না হয় তাহলে অবশ্যই রণেভঙ্গ দেবে। আমার এ জবাব শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ্র এক আসমানী বন্ধু উপরোক্ত নির্দেশ নিয়ে ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহ্র আর এক বন্ধুর নিকট অবতরণ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ যুদ্ধ থেকে বিরত হয়নি। অথচ না দেখে ঈমান আনা দেখার পর ঈমান আনার চেয়ে ভালো। আরেকটি বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি শুধু নিজেই এ গৃহযুদ্ধ থেকে দূরে ছিলেন না, বরং মুসলিম জনগণকে বিরত রাখার জন্য সিফ্ফীনের যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্তও গিয়েছিলেন। তিনি বিবাদমান দু'টি দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উপরোক্ত উপদেশমূলক কথা শুনিয়ে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সঠিক কথা এটাই যে, তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এবং কোনভাবেই সিফ্ফীনের রণক্ষেত্রে যাননি।

উমাইয়্যা খিলাফতকালে তিনি কিছুদিনের জন্য কাযী ছিলেন।[১২] হিজরী ৬৩ সনে তিনি 'ওয়াসিত' নামক স্থানে অন্তিম রোগে আক্রান্ত হন। আল্লাহ্র প্রতি অকৃত্রিম তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সারাটি জীবন তিনি এই নির্ভরতাকে

---

১০. সূরা আন-নিসা'-২৯

১১. তাবাকাত-৬/৫১-৫২

১২. প্রাগুক্ত-৬/৫৫

আঁকড়ে থাকেন। পার্থিব ধন-সম্পদ তাঁর জীবনকে কখনো কলুষিত করতে পারেনি। বিচারকের দায়িত্ব পালনের সময়ও তিনি কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। এ জন্য কাফনের কাপড় পর্যন্ত কেনার পয়সা তাঁর ঘরে ছিল না। শা'বী বলেছেন, মাসরূক মৃত্যুর সময় কাফনের কাপড় কেনার মত অর্থও রেখে যাননি। তার জন্য তিনি ঋণ করার অসীয়াত করে যান। তবে একথাও বলে যান যে, কৃষি পেশার লোক এবং রাখালদের থেকে নিবে না। বরং যারা গৃহপালিত প্রাণী পালন করে, অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদের থেকে নিবে। একেবারে শেষ নিঃশ্বাসের আগে তিনি আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে এভাবে দু'আ করেন : 'হে আল্লাহ! আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এবং আবূ বকর (রা) ও 'উমারের (রা) সুন্নাতের পরিপন্থী কোন পথ ও পদ্ধতির উপর মরছি না। আল্লাহ, তোমার কসম! আমি আমার তরবারিটি ছাড়া কোন মানুষের নিকট কোন সোনা-রূপো রেখে যাচ্ছি না। এর দ্বারাই আমার কাফন-দাফন করবে।' এ কথা দ্বারা সম্ভবতঃ তিনি তরবারিটি বিক্রি করে কাফনের অর্থ সংগ্রহের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন।

এসব অসীয়াত তথা অন্তিম উপদেশবাণী দান করার পর তিনি ওয়াসিত-এ হিজরী ৬৩ সনে ইনতিকাল করেন। সেখানেই দাফন করা হয়।[১৩]

তাঁকে তাবি'ঈ 'আলিমদের মধ্যে গণ্য করা হয়। ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তাঁর মধ্যে জ্ঞান অর্জনের তীব্র বাসনা দেখা যায়। শা'বী বর্ণনা করেছেন, মাসরূকের চেয়ে জ্ঞান অন্বেষণকারী আর কেউ ছিল না।[১৪] সৌভাগ্যবশতঃ তিনি হযরত 'আয়িশার (রা) মত স্নেহময়ী বিদুষী মা লাভ করেছিলেন। তিনি মাসরূককে ছেলের মত দেখতেন এবং ছেলের মত স্নেহ করতেন। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি তাঁকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।[১৫] কিন্তু এসব বর্ণনা ঠিক নয়। তবে তিনি মাসরূককে অতি বেশী স্নেহ করতেন এবং তাঁকে 'আমার ছেলে' বলে ডাকতেন। মাসরূক যখন হযরত 'আয়িশার (রা) দরবারে উপস্থিত হতেন তখন তিনি তাঁকে মধুর শরবত পান করাতেন। একবার মাসরূক কয়েকজন লোক সংগে করে হযরত 'আয়িশার (রা) কাছে আসেন। তিনি বাড়ীর লোকদের নির্দেশ দেন, আমার ছেলেদের জন্য মধুর শরবত বানাও।[১৬] হযরত 'আয়িশা (রা) ছাড়াও মাসরূক হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি ইবন মাস'উদের (রা) যোগ্যতম ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন। ইবন মাদাইনী বলেছেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) ছাত্র-সঙ্গীদের মধ্যে মাসরূকের উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিই না।[১৭]

মাসরূকের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও সাধনা এবং উপরে উল্লেখিত মহান দু'ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ

---

১৩. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৪৯
১৪. তাহযীবুল আসমা'-১/৮৮
১৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ/১৪৯; তারীখু ইবন 'আসাকির-৬/২১০
১৬. তাবাকাত-৬/৫২
১৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৪২

সাহচর্য তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ 'আলিমে পরিণত করে। ইমাম যাহ্বী তাঁকে একজন ফকীহ্ ও শ্রেষ্ঠ 'আলিম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৮] ইমাম নাওবী লিখেছেন, তাঁর মহত্ব, বিশ্বস্ততা, মর্যাদা এবং ইমাম হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে সবাই একমত।[১৯] মুররা তো বলতেন, 'হামাদান গোত্রের কোন নারী মাসরূকের মত দ্বিতীয় কোন সন্তান জন্ম দিতে পারেনি।[২০]

হাদীছ ও সুন্নাহ্তে মাসরূকের জ্ঞান অনেক গভীর ও ব্যাপক ছিল। এ জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন সরাসরি বহু উঁচু স্তরের সাহাবীর নিকট থেকে। যেমন : হযরত 'আয়িশা (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা), আবূ বকর (রা), 'উমার (রা), 'উছমান (রা), 'আলী (রা), মু'আয ইবন জাবাল (রা), উবাই ইবন কা'ব (রা), যায়েদ ইবন ছাবিত (রা), খাব্বাব ইবন আরাত (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা), মুগীরা ইবন শু'বা (রা) ও আরো অনেকে। হাদীছের সাথে সাথে তিনি সুন্নাহ্রও শিক্ষা দিতেন।[২১]

ফিকাহ্ ছিল তাঁর বিশেষ অধীত বিষয়। এ শাস্ত্রে তিনি ইমাম ও ইজতিহাদের মর্যাদা ও যোগ্যতা লাভ করেন। তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদের (রা) সেইসব শিষ্য-শাগরিদদের মধ্যে ছিলেন যাঁদের কাজই ছিল দারস ও ইফতা (শিক্ষা ও ফাতওয়া দান)।[২২] বিচার কাজে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাযী শুরায়হ অনেক সময় তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। শা'বীর মতে ফাতওয়ার ক্ষেত্রে মাসরূক কাযী শুরায়হ-এরও উপরে ছিলেন। কাযী শুরায়হ তাঁর পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করতেন। কিন্তু মাসরূকের তাঁর পরামর্শের প্রয়োজন পড়তো না।[২৩]

ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর এই বিশেষ যোগ্যতার কারণে বিচার-ফায়সালায় ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক ও রুচি। এ কাজ তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি যে একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তার প্রমাণ হলো কাযী শুরায়হ তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন।[২৪] উমাইয়্যা খিলাফতকালে তিনি কিছুদিনের জন্য কাযীর দায়িত্ব পালনও করেন। বিচার-ফায়সালায় তাঁর এত বেশী আগ্রহ ছিল যে, তিনি বলতেন, আমার কাছে একটি বিবাদে সত্য-সঠিক ফায়সালা করা এক বছর 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' (আল্লাহর পথে জিহাদ) থেকে বেশী পছন্দ।[২৫]

'ইলমের সাথে সাথে মাসরূকের মধ্যে 'আমলও ছিল। তিনি উন্নত নৈতিক গুণাবলীর

---

১৮. প্রাগুক্ত
১৯. তাহযীবুল আসমা'-১/৮৮
২০. তাবাকাত-৬/৫২
২১. তাহ্যীবতু তাহ্যীব-১০/১১০
২২. প্রাগুক্ত-১০/১১১
২৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৩
২৪. প্রাগুক্ত-১/৪৯
২৫. তাবাকাত-৬/৫৫

অধিকারী ছিলেন। যাবতীয় নৈতিক গুণের উৎস হলো খোদাভীতি। তিনি খাওফে খোদা বা খোদাভীতিকে প্রকৃত জ্ঞান বলে বিশ্বাস করতেন। আর তার বিপরীতে 'আমল বা কর্মের অহঙ্কারকে মূর্খতা জ্ঞান করতেন। তিনি বলতেন : 'মানুষের জন্য এই জ্ঞান যথেষ্ট যে, সে আল্লাহকে ভয় করে। আর নিজের জ্ঞান নিয়ে গর্ব করাটাই মূর্খতা।'[২৬]

তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জ্ঞান আহরণের প্রতি তীব্র আগ্রহ ও আবেগ পোষণ করতেন। ইমাম শা'বী তাঁর এমন একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করেছেন যা দ্বারা তাঁর আগ্রহের তীব্রতা অনুমান করা যায়। তিনি বলেছেন : মাসরূক একবার বসরায় এক ব্যক্তির কাছে গেলেন একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। কিন্তু তাঁর কাছে তেমন কোন জ্ঞান লাভ করতে পারলেন না। সেখান থেকে তাঁকে বলা হলো, আমাদের এখানে শামের এক ব্যক্তি আসেন তাঁর কাছে এ সম্পর্কিত জ্ঞান আছে। সেখান থেকে মাসরূক সেই ব্যক্তির খোঁজে শামের পথ ধরেন।[২৭] প্রিয় পাঠক! বসরা থেকে শাম নিকটের কোন দূরত্ব ছিল না। এ ছিল বহু দিন ও বহু কষ্টের পথ। একটি মাত্র আয়াত সম্পর্কে জানার জন্য তিনি এ পথ পাড়ি দিয়েছেন। জ্ঞান অর্জনের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ ও শক্ত অঙ্গীকার ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়।

তিনি একজন বড় 'আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। ইবাদাতের কঠিন অনুশীলন করতেন। ক্রমাগতভাবে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা দু'টি ফুলে যেত।[২৮] বছরের বিশেষ বিশেষ সময় তাঁর ইবাদাত অত্যধিক বেড়ে যেত। কোথাও 'তাউন'-এর মহামারী দেখা দিলে তিনি নির্জন স্থানে গিয়ে 'ইবাদাতে মশগুল হয়ে যেতেন। অনেকে সন্দেহ করতো তিনি হয়তো তা'উন-এর ভয়ে লোকালয় ছেড়ে নির্জন স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। আসলে তা নয়। তাঁর উদ্দেশ্য হতো একাগ্র চিত্তে 'ইবাদাতে নিমগ্ন থাকা। আনাস ইবন সীরীন বর্ণনা করেছেন, আমরা জানতে পেলাম যে, মাসরূক তা'উন থেকে পালাতেন। কিন্তু মুহাম্মাদ একথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি বললেন, বিষয়টি তাঁর স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞেস করা উচিত। আমরা একদিন তাঁর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! ব্যাপারটি তা নয়। তিনি কখনো 'তা'উন' থেকে পালাতেন না। তবে যখন তা'উন-এর মহামারি দেখা দিত, তিনি বলতেন, এই যিক্‌র ও আমলের দিনগুলোতে আমি চাই নিরিবিলিতে 'ইবাদাত করতে। তারপর তিনি শুধুমাত্র 'ইবাদাতের জন্য নির্জনতা অবলম্বন করতেন। মাঝে মাঝে তিনি নিজের উপর এত কঠিন কাজ চাপিয়ে দিতেন যে, অনেক সময় আমি তা দেখে তাঁর পিছনে বসে কাঁদতে শুরু করতাম।[২৯] হজ্জের সময় যতদিন মক্কায় থাকতেন, সিজদার মধ্যেই ঘুমের কাজ সেরে নিতেন।[৩০] মাসরূকের স্ত্রীর নাম ছিল ফায়রূয। একবার তিনি যখন দেখলেন মাসরূক

---

২৬. 'আসরুত তাবি'ঈন-২৬৪
২৭. হিলয়াতুল আওলিয়া-২/৯৫
২৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৬৩
২৯. তাবাকাত-৬/৫৪
৩০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৯

একাধারে রোযা রেখেই চলেছেন তখন তিরস্কারের সুরে বললেন : মাসরূক! আপনি ছাড়া আর কেউ কি আল্লাহর 'ইবাদাত করে না? জাহান্নাম কি কেবল আপনার জন্য তৈরী করা হয়েছে? জবাবে মাসরূক বললেন : ফায়রূয! জান্নাতের সন্ধানকারী ব্যক্তি ক্লান্ত হয় না, আর জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী ঘুমায় না।[৩১]

তিনি নিজের নফসের মুহাসাবা বা আত্ম সমালোচনা এবং পাপ স্মরণ করে তার জন্য ইসতিগফার করা অত্যন্ত জরুরী মনে করতেন। তিনি বলতেন, মানুষের জন্য এমনসব মজলিস থাকা উচিত যেখানে বসে তারা নিজেদের পাপকে স্মরণ করে আল্লাহর নিকট ইসতিগফার করতে পারে। তাঁর দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোন মূল্যই ছিল না। তিনি দুনিয়াকে ময়লা-আবর্জনার চেয়ে বেশী কিছু মনে করতেন না। একদিন তিনি তাঁর এক ভাতিজার হাত ধরে একটি ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানে নিয়ে যান। তাকে বলেন, আমি তোমাকে দুনিয়া কি তা দেখাচ্ছি। দেখ, এই হচ্ছে দুনিয়া। এসব কিছু খেয়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে, পরে পুরানো ও ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, এর পিঠে আরোহণ করে দুর্বল করে ফেলা হয়েছে। আর এর জন্য কত না রক্ত ঝরিয়েছে, আল্লাহর হারামকে হালাল করেছে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।[৩২]

আর এ কারণে দুনিয়ার প্রতি তাঁর অন্তর কখনো ঝোঁকেনি এবং পার্থিব কোন জিনিসের প্রতিও তাঁর কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি। হযরত সা'ঈদ ইবন জুবায়র ছিলেন তাঁর সম-চিন্তা ও সম-মতের মানুষ। তাঁদের মধ্যে অনেক রহস্যময় ও গূঢ় কথাবার্তা হতো। ইবন যুবায়র বলেছেন, মাসরূক একদিন আমাকে বললেন, সা'ঈদ! এখন এমন আর কোন জিনিস নেই যার প্রতি অন্তরের আকর্ষণ থাকতে পারে। শুধু এটাই আছে যে, নিজের চেহারাকে ধুলি মলিন করি।[৩৩]

দুনিয়ার প্রতি তাঁর এমন বীতস্পৃহ ভাবের কারণে দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব থেকে সব সময় নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন। বহু মানুষ তাঁর প্রয়োজন পূরণ করতে এবং তাঁর সেবায় নিয়োজিত হতে চাইতো, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না। একবার খালিদ ইবন উসায়দ তাঁর নিকট তিরিশ হাজার দিরহাম পাঠালেন। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফেরত দিলেন। তাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁকে এ কথা বুঝানোর চেষ্টা করলেন যে, আপনি গ্রহণ করে তা সাদাকা করে দিন। আত্মীয়-বন্ধুদের দান করুন এবং অন্য সব ভালো কাজে লাগান। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে রাজী করাতে পারলেন না।[৩৪]

এই তীব্র আত্ম-নির্ভরতা ও অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষীহীনতা কখনো কখনো তাঁকে পরিবারসহ অভুক্ত অবস্থার মধ্যে ফেলে দিত। এমতাবস্থায়ও তাঁর প্রগাঢ় আল্লাহ-নির্ভরতায় কোন রকম ফাটল ধরতো না। একদিন ঘরে খাবার মত কিছুই ছিল না। স্ত্রী

---

৩১. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/১৬৮

৩২. তাবাকাত-৬/৫৫

৩৩. প্রাগুক্ত-৬/৫৩, ৫৪

৩৪. প্রাগুক্ত-৬/৫৩

জানান দিলেন, 'আয়িশার বাপ, আজ আপনার ছেলে-মেয়েদের খাবার মত ঘরে কিছু নেই। একথা শুনে মাসরূক একটু হেসে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! তিনি অবশ্যই তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।[৩৫]

এত অল্পে তুষ্টি ও আল্লাহ নির্ভরতার ভিতর দিয়েও তিনি ছিলেন একজন দরাজদিল দানশীল ব্যক্তি। কোন সময় কোনভাবে হাতে কিছু পয়সা-কড়ি এলেই সাথে সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে বিলিয়ে দিতেন। সায়িব ইবন আকরা'র সাথে এক মেয়ের বিয়ে দেন। সায়িব শ্বশুরের হাতে দশ হাজার দিরহামের মত মোটা একটি অংক তুলে দেন। তিনি তার সবই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, গরিব-দু:খী মানুষ ও দাসমুক্তি প্রভৃতি খাতে ব্যয় করেন।

তিনি সব রকম কথা ও কাজে ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। নৌকা বা জাহাজে যদি উঠার প্রয়োজন হতো তাহলে উঠার সময় একটি ইট হাতে নিয়ে উঠতেন। নামাযের সময় তার উপর সিজদা করতেন। কারো কোন কাজ যদি তাঁর কথায় বা সুপারিশে হতো তিনি তার কাছ থেকে কোন উপহার-উপঢৌকনও গ্রহণ করতেন না। একবার একটি ব্যাপারে কোন এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেন। লোকটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ তাঁকে একটি দাসী দান করতে চান। তিনি ভীষণ ক্ষেপে যান। লোকটিকে তিনি বলেন, তোমার মন-মানসিকতা এমন তা যদি আগে আমি জানতাম তাহলে তোমার জন্য কখনো সুপারিশ করতাম না। যতটুকু সুপারিশ করেছি, তাতো করেই ফেলেছি। এখন যতটুকু প্রয়োজন বাকী আছে আমি তার জন্য আর কোন কিছুই বলবো না। আমি 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) মুখ থেকে শুনেছি। যে ব্যক্তি কারো হক আদায় করে দেওয়া, অথবা যুলুম-অত্যাচার বন্ধ করার জন্য কারো কাছে সুপারিশ করে, আর তার বিনিময়ে যদি তাকে উপহার-উপঢৌকন দেওয়া হয় এবং সুপারিশকারী তা গ্রহণ করে তাহলে সেই উপহার-উপঢৌকন তার জন্য হারাম হবে।[৩৬]

'উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ একবার কূফায় এসে জিজ্ঞেস করলেন : সবচেয়ে ভালো মানুষ কে? লোকেরা বললো : মাসরূক ইবন আল-আজদা'।[৩৭]

ইমাম আল-আসমা'ঈ ইবন 'আওনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবন 'আওনের শিক্ষকরা বলাবলি করতেন যে, তাবি'ঈদের আট ব্যক্তি পর্যন্ত এসে যুহ্দ তথা খোদাভীতি ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ভাব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাঁরা হলেন : 'আমির ইবন 'আবদিল কায়স, আল-হাসান ইবন আবিল হাসান আল-বসরী, হারিম ইবন হায়্যান, আবু মুসলিম আল-খাওলানী, উওয়ায়িস আল-কারানী, আর-রাবী' ইবন খুছায়ম, মাসরূক ইবন আল-আজদা' ও আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ।[৩৮]

---

৩৫. প্রাগুক্ত-৬/৫৩
৩৬. প্রাগুক্ত-৬/৫৪
৩৭. 'আসরুত তাবি'ঈন-২৭০
৩৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৭১

মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (রহ)

বিখ্যাত তাবি'ঈ মুহাম্মাদ ইবন সীরীনের ডাকনাম আবূ বকর। পিতা সীরীন ছিলেন ইরাকের 'জারজারায়া'র অধিবাসী[১], তামা-পিতলের একজন দক্ষ কারিগর। হাড়ি-পাতিল তৈরীর পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। 'আইনুত্ তামার-এ তাঁর দোকান ছিল। 'আইনুত তামার-এর যুদ্ধে আরো অনেক অনারবের সাথে সীরীনও মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন এবং ভাগের সময় কোন এক মুজাহিদের অংশে পড়েন। পরে তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিকের (রা) দাসে পরিণত হন। অনেকে ধারণা করেছেন, তিনি ভাগের সময় আনাসের (রা) অংশে পড়ে থাকবেন, অথবা আনাস পরে অন্য কোন মুজাহিদের নিকট থেকে তাঁকে কিনে নেন। যাই হোক, সীরীন হযরত আনাসের একজন দাস ছিলেন। সেহেতু তিনি একজন দক্ষ ধাতব কারিগর ছিলেন, তাই প্রচুর অর্থ রোজগার করতেন। মনিব আনাসের (রা) সাথে মুকাতাবা বা মুক্তির চুক্তি করেন। আনাসকে (রা)। তিনি বিশ অথবা চল্লিশ হাজার দিরহাম দেন এবং বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন।[২]

সীরীন দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের পর তামা-পিতল শিল্পের কাজে আরো মনোযোগী হন। আয়-রোগজার আরো বেড়ে যায়। অল্প দিনের মধ্যে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে যান। এবার তিনি দীনের বাকী অংশ পূরণ করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) 'সাফিয়্যা' নাম্নী একদাসী ছিল। সাফিয়্যা ছিলেন সুন্দরী, বুদ্ধিমতি, চালাক- চতুর ও চমৎকার গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারিনী এক যুবতী। তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও মার্জিত ভদ্র আচরণ তাঁকে মদীনার সব শ্রেণীর মহিলার প্রিয়পাত্রী করে তোলে। মদীনার যে মহিলাই তাঁর সাথে পরিচিত হতো, তাঁকে ভালোবাসতো। তখন পর্যন্ত জীবিত উম্মাহাতুল মু'মিনীন তথা রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমগণ, বিশেষতঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) অতি আদরের পাত্রী ছিলেন। সীরীন তাঁর জীবন-সঙ্গীনী হিসাবে এই সাফিয়্যাকে নির্বাচন করেন।

সীরীনের পক্ষ থেকে হযরত আবূ বকরের (রা) পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব গেল। সাফিয়্যা এ পরিবারের দাসী হলেও তাঁকে তাঁরা মেয়ের মত করে মানুষ করেছেন। তাঁরা পাত্রের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা সীরীনের আগের মনিব আনাস ইবন মালিকের নিকট আসলেন। তাঁর কাছে সীরীনের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আনাস (রা) সাফিয়্যার মনিব পরিবারকে বললেন, আপনারা সাফিয়্যাকে সীরীনের হাতে তুলে দিতে ভয় করবেন না। আমি তাঁকে সঠিক দীনদার, অতি চরিত্রবান এবং যথেষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী দেখেছি। খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদ তাঁকে 'আইনুত তামার যুদ্ধে বন্দী করার পর সে চল্লিশ জন বন্দীর সাথে মদীনায় আসে। আর তখন থেকেই

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৭৯
২. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান- ১/৪৫৩

সে আমার সাথে ছিল। সাফিয়্যার পরিবার রাজী হয়ে গেল। এমন একটি চমৎকার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয় যে, মদীনার খুব কম মেয়ের বিয়েতে তেমন হতে দেখা গেছে। বিরাট সংখ্যক সাহাবী (রা) এই বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বদরী সাহাবী ছিলেন আঠারো জন। তাঁদের শুভ ও কল্যাণ কামনা করে দু'আ করেন কাতিবে ওহী হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা)। কনেকে সাজ-গোজ করিয়ে স্বামী-গৃহে পাঠান তিন জন উম্মাহাতুল মু'মিনীন। এই শুভ ও মঙ্গলময় বিয়ের মাধ্যমে যে পরিবারটি গড়ে ওঠে সেখানে খলীফা হযরত উছমানের খিলাফতের শেষের দিকে হিজরী ৩৩ সনে মুহাম্মাদ ইবন সীরীন জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি হন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম তাবি'ঈ।[৩]

হযরত আনাস ইবন মালিকের (রা) ব্যক্তিত্বটি এমনই ছিল যে, যে কেউ তাঁর কাছে সামান্য কিছু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পেয়েছে সে 'ইলম ও 'আমলের একজন বড় উত্তরাধিকারী হয়ে গেছে। ইবন সীরীনের সৌভাগ্য যে, এই মহান সাহাবীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ দিন থাকার সুযোগ লাভ করেন।[৪] আনাস ইবন মালিক ছাড়াও তিনি হযরত আবূ হুরাইরার (রা) সুহবতের সুযোগও বেশীমাত্রায় গ্রহণ করেন। তাঁকে আবূ হুরাইরার (রা) শিষ্য-সাগরিদদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি তাবি'ঈ শিরোমণি হযরত হাসান বসরীর (রা) সাহচর্যেও দীর্ঘদিন কাটান।[৫] এই সব মহান ব্যক্তির সাহচর্যের কল্যাণে তিনি 'ইলম ও 'আমলের এক বাস্তব প্রতিকৃতিতে পরিণত হন। ইবন সা'দ লিখেছেন :[৬]

كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا .

- তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন, অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইমাম, ফকীহ্, বহু জ্ঞানের আধার ও খোদাভীরু মানুষ।

ইমাম যাহবী লিখেছেন :[৭]

كان فقيهًا إمامًا غزير العلم ثقةً ثبتًا علامة التفسير رأسا فى الورع .

- তিনি ছিলেন একজন ফকীহ্, ইমাম, বহু জ্ঞানের ভাণ্ডার, বিশ্বস্ত, সুদৃঢ়, তাফসীর শাস্ত্রের মহাজ্ঞানী ও খোদাভীরুতার প্রধান।

সে যুগের প্রায় সকল শাস্ত্রে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। ইমাম নাওবী লিখেছেন, তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফিকাহ্, স্বপ্নের তা'বীর ইত্যাদি শাস্ত্রসমূহের ইমাম ছিলেন।[৮]

ইবন সীরীন ছিলেন হযরত আনাসের (রা) নিকট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, হযরত আবূ হুরাইরার (রা)

---

৩. তাবাকাত- ৭/১৪০; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন- ১২৬
৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৭৯
৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/২১৫; ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/৪৫১
৬. তাবাকাত- ৭/১৪০
৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৭৮
৮. তাহ্যীব আল- আসমা'- ১/৮২

বিশেষ শাগরিদ এবং হযরত হাসান আল বসরীর (রহ) মজলিসে বসা মানুষ। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন 'ইলমে হাদীছের এক একজন দিকপাল। তাছাড়া আরো বহু সাহাবীর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁদের কয়েকজন হলেন : যায়িদ ইবন ছাবিত (রা), হুযাইফা ইবন ইয়ামান (রা), ইবন 'উমার, ইবন 'আব্বাস, হাসান ইবন 'আলী (রা), জুনদুব ইবন 'আবদিল্লাহ (রা), রাফি' ইবন খাদীজ (রা), সুলাইমান ইবন 'আমির (রা), সামুরা ইবন জুনদুব (রা), 'উছমান ইবন আবিল 'আস (রা), 'ইমরান ইবন হুসাইন (রা), কা'ব ইবন 'আজরাহ্ (রা), মু'আবিয়া (রা), আবূ দারদা' (রা), আবু সা'ঈদ খুদরী (রা), আবূ কাতাদা আনসারী (রা), আবূ বাকর ছাকাফী (রা), উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা), ও আরো অনেকে।

তাবি'ঈদের বড় একটি দলের নিকট থেকেও তিনি জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁদের বিশিষ্ট কয়েকজন হলেন : 'আকরামা, শুরাইহ, হুমাইদ ইবন 'আবদির রহমান হিময়ারী, 'আবদুল্লাহ ইবন শাকীক, 'আবদুর রহমান ইবন আবী বাকরাহ্, কায়স ইবন 'আব্বাদ, মুসলিম ইবন ইয়াসার, ইউনুস ইবন জুবায়র, 'আমর ইবন ওয়াহাব, ইয়াহইয়া ইবন আবী ইসহাক হাদরামী, খালিদ আল-হাযরা' প্রমুখ। এ সব ব্যক্তির সূত্রে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৯] আর তাঁদের কল্যাণে তিনি হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞানের সাগরে পরিণত হন। ইবন সা'দ, ইমাম যাহ্বী, ইমাম নাওবী ও ইবন হাজার তাঁকে 'ইমামুল হাদীছ' বলে উল্লেখ করেছেন।

এত ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি হাদীছ শোনা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত রকমের সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি সাধারণ স্তরের মানুষের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন ও হাদীছ শোনা ও গ্রহণ করা এই সতর্কতা পরিপন্থী কাজ বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন, জ্ঞান হচ্ছে দীন। এ কারণে তা গ্রহণের পূর্বে ভালো রকম পরখ করে নাও যে, তা কার নিকট থেকে গ্রহণ করছো।[১০]

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে এত সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, তিনি যে শব্দ শায়খের নিকট থেকে শুনেছেন হুবহু সেই শব্দে বর্ণনা করতেন। শুধু ভাব ও অর্থ বর্ণনা যথেষ্ট মনে করতেন না। এত সাবধানতার সাথে হাদীছ বর্ণনা করতেন যে, মনে হতো কোন জিনিস তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করছেন। অথবা কোন কিছুর ভয় করছেন। আর এই সাবধানতার কারণে তিনি হাদীছ লেখাও পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, বই থেকে দূরে থাক। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা বই এর কারণেই পথ ভ্রষ্ট হয়েছে। আমি যদি কোন জিনিসকে বই বানাতাম, তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) পত্রাবলীকে বানাতাম।

তবে হাদীছ মুখস্থ করার জন্য, এই শর্তে লেখা বৈধ মনে করতেন যে, মুখস্থ করার পরে আবার নষ্ট করে ফেলা হবে। বর্ণনা ও হাদীছ লেখা প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান কথা তিনি বলতেন যে, কথা বলছে এমন কোন ব্যক্তি যদি জানে যে, জবাবদিহিতার জন্য তার সবকথা

---

৯. তাহযীব আত-তাহযীব- ৯/২১৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৭৮
১০. তাবাকাত- ৭/১৪১

লেখা হচ্ছে, তাহলে সে কথা বলা কম করে দেবে।[১১] তাঁর একথার অর্থ হলো, সাধারণ কথাবার্তার ক্ষেত্রে একজন কথা বলতে থাকা মানুষ যদি জবাবদিহিতার ভয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে, তাহলে হাদীছের লেখালেখির ক্ষেত্রে তো অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত্। কারণ, এর ভুল-ক্রটিতে আরো বেশী ধর-পাকড় করা হবে। আর লেখালেখির ভুল-ক্রটি চিরস্থায়ী রূপ লাভ করে।

হাদীছ বর্ণনায় তাঁর এই সাবধানতার কারণে হাদীছ বিশেষজ্ঞদের নিকট তিনি একজন অতি বড় সত্যবাদী এবং তাঁর বর্ণিত হাদীছ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত। হিশাম ইবন হাসসান বলতেন, আমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী ইবন সীরীনকে পেয়েছি।[১২] হাদীছের অনেক বড় বড় ইমাম এ শাস্ত্রের উৎসাহী ছাত্রদেরকে ইবন সীরীনের সাথে সংযুক্ত থাকতে উপদেশ দিতেন। শু'আয়ব ইবন হাবহাব বলতেন, শা'বী আমাদেরকে ইবন সীরীনের আঁচল ধরে থাকতে উপদেশ দিতেন।[১৩]

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর ছাত্র-শাগরিদের সংখ্যা বিপুল। ইমাম শা'বী, ছাবিত, খলিদ আল-খাদ্দাদ, দাউদ ইবন আবী হিন্দা, ইবন 'আওন, জারীর ইবন হাযিম, 'আসিম আল আহওয়াল, কাতাদা, সুলাইমান আত-তাইমী, মালিক ইবন দীনার, ইমাম আওযা'ঈ, কুররাহ্ ইবন খালিদ, হিশাম ইবন হাস্সান, আবূ হিলাল আর-রাসিবী প্রমুখ তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ।[১৪]

ফিকাহ্ শাস্ত্রেও তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। তিনি যে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ্দের একজন ছিলেন এ ব্যাপারে সবাই একমত। ইবন সা'দ, হাফেজ যাহ্বী, ইমাম নাওবী, ইবন হাজার প্রমুখ পণ্ডিতগণ ফিকাহ্ শাস্ত্রে তিনি যে ইমাম ছিলেন তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইবন হিব্বান বলেন, ইবন সীরীন ছিলেন একজন ফকীহ্, মর্যাদাবান হাফেজ ও দক্ষ ব্যক্তিত্ব।[১৫]

ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর উৎকর্ষতার ভিত্তিতে বিচার-ফায়সালায়ও তিনি দক্ষ ছিলেন। 'উছমান আল-বাত্তি বলেন, এ অঞ্চলে ইবন সীরীনের চেয়ে বড় কোন বিচার-ফায়সালার 'আলিম ছিলেন না।[১৬] বিচার-ফায়সালায় তার দক্ষতার কারণে তাঁকে কাজীর পদটি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। এই পদে তাঁকে জোর করে নিয়োগ দেওয়া হবে ভেবে ভয়ে শামে পালিয়ে যান। অনেক দিন পালিয়ে থাকার পর আবার মদীনায় ফিরে আসেন।[১৭]

বিভিন্ন মাসআলার জবাব ও ফাতওয়া দান কালে তিনি অতিরিক্ত সাবধানতা অথবা ভয়ের কারণে হতবুদ্ধি হয়ে পড়তেন। তখন তাঁর অবস্থা একেবারে পাল্টে যেত। আশ'আছ বলেছেন, আমরা যখন ইবন সীরীনের কাছে বসতাম, তিনি কথাও বলতেন, হাসতেনও,

---

১১. প্রাগুক্ত- ৭/১৪১,১৪৩; সিয়ারুল তাবি'ঈন- ৪৩৬
১২. তাহ্যীব আত- তাহ্যীব- ৯/২১৪
১৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৭৮
১৪. তাহযীব আত-তাহ্যীব- ৯/২১৪
১৫. প্রাগুক্ত- ৯/২১৬
১৬. তাবাকাত- ৭/১৪৩
১৭. শাযারাত আয-যাহাব- ১/১৩৯

কুশলও জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু যেই না তাঁর কাছে ফিকাহ্র কোন মাসআলা, অথবা হারাম-হালাল বিষয়ক কোন কথা জানতে চাওয়া হতো অমনি তাঁর রূপ পাল্টে যেত। আর এটা বুঝাই যেত না যে, একটু আগে এই ব্যক্তি হাসিমুখে কথা বলছিলেন। ইবন 'আওন বলেছেন, একবার আমি একটি মাসআলায় ইবন সীরীনের শরণাপন্ন হলাম। জবাবে তিনি বললেন : আমি একথা বলছি যে, এতে কোন অসুবিধে নেই; বরং আমি এতে কোন অসুবিধে বুঝতে পারছিনে।[১৮]

তাঁর যুগের অনেক বড় বড় 'আলিম ও বিশেষজ্ঞ তাঁকেই তাদের সময়ের শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী মনে করতেন। ইবন 'আওন বলতেন, গোটা পৃথিবীতে তিন ব্যক্তির জুড়ি মেলা কষ্টসাধ্য। ইরাকে ইবন সীরীনের, হিজাযে কাসিম ইবন মুহাম্মাদের এবং শামে রাজা' ইবন হায়ওয়ার। আর এই তিনজনের মধ্যে ইবন সীরীন ছিলেন বসরার সবচেয়ে বড় খোদাভীরু ফকীহ্, জ্ঞানী, দক্ষ হাফিজ এবং স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যাকার।[১৯] ইবন 'আওন আরো বলতেন : আমার দু'চোখ ইবন সীরীন, আল কাসিম ও রাজা' ইবন হায়ওয়ার সমকক্ষ কাউকে দেখেনি।[২০]

ইবন সীরীনের জাত বা সত্তাটি ছিল 'ইলম ও 'আমলের সন্ধিস্থল। তাঁর মধ্যে যে পরিমাণ 'ইলম ছিল, ঠিক সেই পরিমাণ 'আমলও ছিল। তিনি তাঁর যুগের একজন বড় 'আবিদ ও খোদাভীরু বুযর্গ ছিলেন। ইবন সা'দ লিখেছেন, তিনি বহু জ্ঞানের ভাণ্ডার ও খোদাভীরু ব্যক্তি ছিলেন।[২১] ইমাম আয-যাহ্বী লিখেছেন, তিনি খোদাভীরুদের নেতা ছিলেন। খতীব আল-বাগদাদী বলেছেন, তিনি ছিলেন খোদাভীরু ফকীহ্দের একজন।[২২] আল-'ইজলী বলেছেন, আমি কাউকে খোদাভীরুতায় তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ্ এবং ফিকায় তাঁর চেয়ে বড় খোদাভীরু দেখিনি।[২৩] ইবন সীরীন বলতেন, খোদাভীরুতা খুবই সহজ জিনিস। একব্যক্তি একবার প্রশ্ন করলো, সেটা কেমন করে? বললেন, যে জিনিসে সন্দেহ হবে তা পরিহার করবে।[২৪]

একদিন এক যুবক ইবন সীরীনের ঘরে বসে আছে। এক সময় সে ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে বলে : জনাব, এই যে একটি ইট আরেকটি ইটের চেয়ে উঁচু- এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? ইবন সীরীন বললেন : ভাতিজা! বেশী দেখা বেশী কথার জন্ম দেয়। ইবন সীরীনের তাকওয়া-খোদাভীতি সেকালে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। লোকেরা দৃষ্টান্ত হিসেবে তা উল্লেখ করতো। যেমন একজন কবি বলেছেন :[২৫]

---

১৮. তাবাকাত- ৭/১৪২
১৯. তাহযীব আত-তাহ্যীব- ৯/২১৬
২০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৭৮
২১. তাবাকাত- ৭/১৪০
২২. তাহ্যীব আল আসমা'- ১/৮৩
২৩. তাবাকাত- ৭/১৪২
২৪. শাযারাত আয-যাহাব- ১/১৩৯
২৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন- ১/১৯২; ৩/১৭৩

فأنت بالليل ذئب لاحريم له + وبالنهار على سَمْتِ ابن سِيْرِيْنَ .

- রাতের বেলা তুমি একজন নেকড়ে- যার কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। আর দিনের বেলা ইবন সীরীনের মত খোদাভীরু।

ইবন সীরীন বলতেন, আমি কখনো কোন কিছুর জন্য কারো প্রতি হিংসা করিনি।[২৬]

স্বভাবগতভাবে তিনি প্রফুল্লমুখ ও হাসি-খুশী মেজাজের ছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তর খোদাভীতিতে পূর্ণ ছিল। ইউনুস বর্ণনা করেছেন, ইবন সীরীন হাসিমুখ ও ঠাট্টা-কৌতুক প্রিয় মানুষ ছিলেন।[২৭] কিন্তু অন্তরের কোমলতা ও খোদাভীতির এমন অবস্থা ছিল যে, প্রকাশ্যে তাঁর ঠোঁট দু'টি তো হাসতো; কিন্তু নির্জন ও একাকীত্বের সময় তাঁর চোখ দু'টো অশ্রু-ভেজা থাকতো।

হিশাম ইবন হাস্‌সান বলেছেন, একবার আমরা কিছু লোক ইবন সীরীনের গৃহে অবস্থান করছিলাম। দিনের বেলায় তাঁকে হাসি-খুশী দেখতাম এবং রাতের অন্ধকারে তাঁর কান্নার আওয়ায শুনতে পেতাম।[২৮] মৃত্যুর আলোচনার সময় তাঁর উপর মৃত্যুর মত অবস্থার সৃষ্টি হতো। যুহাইর আল-আকতা 'বর্ণনা করেছেন। ইবন সীরীন যখন মৃত্যুর কথা আলোচনা করতেন তখন তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন মারা যেত।[২৯] সেকালে একথা বলা হতো যে, 'ফিকাহ্‌তে হাসান আল বসরী, তাকওয়া-খোদাভীতিতে ইবন সীরীন, বুদ্ধি-জ্ঞানে মুতার্‌রিফ ও মুখস্থ শক্তিতে কাতাদা।'[৩০]

'আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সরল-সোজা ও কলুষমুক্ত 'আকীদার অনুসারী। এ ক্ষেত্রে যুক্তির চুলচেরা বিশ্লেষণ ও নতুনত্ব মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর যুগের 'কদর' তথা নিয়তিবাদের চর্চা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি এটাকে খুবই অপছন্দ করতেন। তিনি এর কোন আলোচনা বা কথা শোনা সহ্য করতে পারতেন না। ইবন 'আওন বলেছেন, একবার এক ব্যক্তি ইবন সীরীনের নিকট এসে 'কদর' সম্পর্কিত কিছু কথা বলে। তিনি তার জবাবে এ আয়াতটি পাঠ করেন :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ .

- আল্লাহ্‌ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন- যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।[৩১]

---

২৬. প্রাগুক্ত- ৩/১২৫
২৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ- ১/৭৮
২৮. তাহযীব আল- আসমা'- ১/৮৪
২৯. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ- ১/৭৮
৩০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন- ১/২৪২
৩১. সূরা আন-নাহল- ৯০

এ আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে তিনি নিজের কানে আংগুল ঢুকিয়ে বন্ধ করে লোকটিকে বলেন, হয় তুমি আমার নিকট থেকে উঠে চলে যাও, নয়তো আমি চলে যাচ্ছি। তাঁর এমন চরম বিতৃষ্ণ ভাব দেখে লোকটি উঠে চলে যায়। তার যাওয়ার পরে ইবন সীরীন বলেন, আমার অন্তর আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। আমার ভয় হচ্ছিল, সে আমার অন্তরে এমন কোন ধারণা ঢুকিয়ে না দেয় যা দূর করার ক্ষমতা আমার হবে না। আর তাই আমার জন্য এটাই সঙ্গত ছিল যে, আমি তার কোন কথাই শুনবো না।[৩২]

আরেকবার তাঁর নিকট এক বেদুইন আসে এবং বিভিন্ন মত ও পথ বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করতে থাকে। তিনি তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন। কোন এক ব্যক্তি তাকে বললো, 'কদর' বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস কর না। সে বললো : আবু বকর! কদর বিষয়ে আপনার মত কি? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন : এ প্রশ্ন তোমাকে কে শিখিয়ে দিয়েছে? তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, কারো উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই। তবে যদি কোন ব্যক্তি নিজে তার আনুগত্য মেনে নেয় সে তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে।[৩৩]

ইবন সীরীনের সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল 'ইবাদাত। তিনি বড় কঠিন 'ইবাদাত করতেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন তিনি 'ইলম ও 'ইবাদাত উভয় ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ অর্জন করেছিলেন।[৩৪] প্রতি রাতে সাত পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যদি কোন রাতে কিছু পড়তে বাকী থেকে যেত তাহলে তা দিনে পড়ে নিতেন। একাকী থাকার সময় তাসবীহ পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। ঘুমানোর পূর্বে নিজের অন্তরকে আল্লাহর যিক্‌র-এর দিকে ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে সারাটি রাত যেন তাঁর 'ইবাদতে কাটতো। ইবন সীরীনের বাড়ীর সীমানার মধ্যে একটি মসজিদ ছিল। সেখানে শিশুদেরও যাওয়ার অনুমতি ছিল না। একদিন পর পর রোযা রাখতেন। আর এ ব্যাপারে এত কঠোরতা অবলম্বন করতেন যে, রোযার দিনটি ইয়াওমুশ শাক বা সন্দেহের দিন হলেও সন্দেহের কারণে রোযা ছাড়তেন না। ছোটখাট 'ইবাদাতের ক্ষেত্রেও তাঁর আচরণ ছিল একটু বাড়াবাড়ি মাত্রার। ওজু করার সময় পায়ের গোছা পর্যন্ত ধুতেন। যাকাত আদায়ের ব্যাপারে এত গুরুত্ব দিতেন যে, যাকাতের অর্থ বণ্টন না করে 'ঈদের নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হতেন না। ইবন 'আওন বর্ণনা করেছেন, আমাদের এমন কখনো হয়নি যে, আমরা 'ঈদের দিন ইবন সীরীনের বাড়ী গিয়েছি, আর তিনি আমাদেরকে খুবাইস (এক প্রকার খাবার) অথবা ফালুদা খাওয়াননি। তিনি যাকাত আদায় ব্যতীত 'ঈদের নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হতেন না। প্রথমে যাকাতের অর্থ পৃথক করে মহল্লার জামে মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন। তারপর 'ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হতেন।[৩৫]

তিনি আল্লাহর নিদর্শন ও প্রতীকসমূহের খুব সম্মান করতেন। কুরআন তিলাওয়াতের

---

৩২. তাবাকাত- ৭/১৪৩
৩৩. প্রাগুক্ত- ৭/১৪৪
৩৪. শাযারাত আয-যাহাব- ১/১৩৯
৩৫. তাবাকাত- ৭/১৪৫,১৪৬,১৪৮

মাঝখানে কথা বলা মোটেই পছন্দ করতেন না। নিজের কাপড় দিয়ে মসজিদ সাফ করতেন।

আল্লাহর আদেশ তো তিনি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। আর নিষেধ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে ছিলেন আরো কঠোর। সন্দেহযুক্ত বিষয়ও এত পরিমাণ পরিহার করে চলতেন যে, তার জন্য বড় রকমের আর্থিক ক্ষতিও মেনে নিতেন। তাঁর ছেলে বাক্কার ইবন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা এক খণ্ড ভূমি খরিদ করেন এবং তার খাজনাও আদায় করেন। সেই ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর ছিল। কিছু লোক আঙ্গুরের রস বের করতে চাইলো। ইবন সীরীন তাদেরকে নিষেধ করলেন এবং তা এমনি বিক্রি করতে বললেন। লোকেরা বললো : এ আঙ্গুর এভাবে বিক্রি করা যায় না। তিনি বললেন, তাহলে শুকিয়ে মনাক্কা বানিয়ে বিক্রি কর। লোকেরা বললো : এ জাতীয় আঙ্গুরের মানাক্কা হয় না। তিনি বললেন : যখন কোনভাবে বিক্রি করা যায় না তখন রস বানানোর চেয়ে এগুলো নষ্ট করে ফেলাই ভালো। এরপর তিনি সব আঙ্গুর পানিতে ফেলে দেন।[৩৬]

ব্যবসা-বাণিজ্য এমন এক পেশা যাতে হারাম-হালালের ব্যাপারে বেশী সতর্কতা অবলম্বন অনেক সময় বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন করে তোলে। ইবন সীরীন জীবিকার জন্য পেশা হিসেবে ব্যবসাকে বেছে নেন। জীবনের প্রথম পর্বে জ্ঞান অর্জন শেষ করে দ্বিতীয় পর্ব যখন আরম্ভ করেন তখন প্রত্যেকটি দিনকে সমান দু'ভাগে ভাগ করেন। এক ভাগ জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান বিতরণ ও 'ইবাদাত, আর এক ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্য তথা জীবিকা অর্জন। প্রত্যুষে তিনি বসরার জামে মসজিদে চলে যেতেন। ফজরের নামায আদায়ের পর দুপুরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত সেখানে নিজে শিখতেন ও অন্যদেরকে শেখাতেন। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে বেচাকেনার জন্য বাজারে চলে যেতেন। আর রাতের আঁধারে বিশ্বচরাচর যখন ঢেকে যেত তিনি তখন নিজের ইবাদাতখানায় ঢুকে যেতেন। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কুরআনের নির্ধারিত অংশ পাঠে নিমগ্ন হতেন। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ভয়ে সারা রাত অস্থিরভাবে কাঁদতেন। তাঁর এ কান্না শুনে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের তাঁর প্রতি দয়া হতো এবং তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে যেত। বেচাকেনার উদ্দেশ্যে তিনি যখন বাজারে ঘুরতেন তখন মানুষকে উপদেশ দিতে ভুলতেন না। অন্যদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। কিসে আল্লাহর সন্তুষ্টি তাও বলে দিতেন। ছোট-খাট ঝগড়া-বিবাদও ফায়সালা করতেন।[৩৭]

তিনি জীবিকার জন্য ব্যবসাকে বেছে নেন এবং হালাল-হারামের ব্যাপারে অতিরিক্ত সাবধানতার কারণে মাঝে মধ্যে বিরাট ক্ষতির মধ্যে পড়েন। কিন্তু তিনি হাসিমুখে তা মেনে নেন। তবুও সন্দেহযুক্ত জিনিস স্পর্শ করেননি। একবার তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে কিছু পণ্য খরিদ করেন। সেই পণ্য বিক্রি করে আশি হাজার দিরহাম লাভ হয়। কিন্তু কোন কারণে

---

৩৬. প্রাগুক্ত- ৭/১৪৪. ১৪৭
৩৭. সুওয়ারুন্ মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন- ১২৮

তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, এই বেচাকেনায় সুদের মিশ্রণ ঘটলো কিনা। মূলতঃ এই বেচাকেনায় কোনভাবেই সুদের মিশ্রণ ঘটেনি। তা সত্ত্বেও তিনি কেবল সন্দেহের কারণে লাভের একটি দিরহামও গ্রহণ করেননি।[৩৮]

কোন কোন সময় তো এই অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য কারাদণ্ডের শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছে। তবুও তিনি সন্দেহযুক্ত অর্থ গ্রহণ করেননি। একবার তিনি চল্লিশ হাজার দিরহামের পণ্য খরিদ করেন, পরে তিনি এই পণ্যের ব্যাপারে এমন কিছু কথা জানতে পারেন যা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। এ কারণে তিনি পণ্যের গোটা চালানটাই দান করে দেন। ফলে মহাজনকে মূল্য পরিশোধ করতে না পারায় তাঁকে কারাদন্ড ভোগ করতে হয়।[৩৯]

ঘটনাটি এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনি বাকীতে চল্লিশহাজার দিরহামের যয়তুন তেল খরিদ করেন। একটি পিপা খোলার পরে তাতে একটি পঁচা বিগলিত ইঁদুর দেখতে পান। তিনি আপন মনে বললেন : সব তেল তো একই গুদামে এক স্থানে ছিল। এই অপবিত্র বস্তুটির নাপাক করা তেল তো অন্য পিপাতেও ভরা হতে পারে। আর আমি যদি এ নাপাক তেল বিক্রেতাকে ফেরত দিই তাহলে সে হয়তো আবার বাজারে বিক্রি করবে। তাই তিনি নিজের দীনদারীকে প্রাধান্য দেন। সব পিপার তেল মাটিতে ঢেলে নষ্ট করে ফেলেন। এ কাজ তাঁর জন্য এক বিরাট আর্থিক ক্ষতি ছিল। মহাজন পণ্যের মূল্য অথবা পণ্য ফেরত চাইলো। কিন্তু তিনি পণ্যের মূল্য বাবদ এত অর্থ দিবেন কোথা থেকে। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত কাজীর আদালত পর্যন্ত গড়ালো। কাজী তাঁকে অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ দেন। দীর্ঘদিন যাবত কারাগারে বন্দী জীবনযাপন করেন।[৪০]

তিনি যে স্তরের 'আলিম ছিলেন তাতে সামান্য একটু চেষ্টা করলে কারাগারে না গিয়েও পারতেন। তিনি বিত্তশালী কোন ব্যক্তির অথবা শাসকের দ্বারস্থ হতে পারতেন এবং তাদের দ্বারা নিজের এই ঋণের বোঝা হালকা করাতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজেকে ছোট না করে নিজের আদর্শের উপর অটল থাকেন।

তিনি যখন কোন পণ্য বিক্রি করতেন তখন ক্রেতাকে তা ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাতেন। ক্রেতা রাজী হয়ে গেলে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর মানুষকে সাক্ষী বানাতেন। তাঁর বেচাকেনার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর সমকালীন এক ব্যক্তি মাইমূন ইবনে মাহ্‌রান। তিনি বলেছেন, আমি কিছু কাপড় কেনার জন্য কূফায় গেলাম। সেখানে ইবন সীরীনের দোকানে পৌঁছলাম। যখন আমি কোন কাপড় পছন্দ করতাম এবং দরদাম করে কেনার সিদ্ধান্ত নিতাম তখন তিনি আমাকে তিন বার জিজ্ঞেস করতেন : আপনি কি এটা কিনতে রাজি হয়েছেন? আমি বলতাম : হাঁ, রাজি। এতেও তিনি সন্তুষ্ট হতেন না। বরং দু'জন মানুষকে ডেকে সাক্ষী বানাতেন। এসব পর্যায় অতিক্রম করার পর বলতেন : এখন পণ্য নিয়ে যান। তিনি হিজাযী দিরহামে কেনা-বেচা করতেন না। আমি তাঁর এমন তাকওয়া ও সাবধানতা

---

৩৮. তাবাকাত- ৭/১৪৫
৩৯. প্রাগুক্ত- ৭/১৪৪
৪০. তাহযীব আল-আসমা' ১/৮৪; হিলয়াতুল আওলিয়া- ২/২৬৯-২৭১

দেখে আমার যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস সব সময় তাঁর দোকান থেকেই কিনতাম। এমন কি কাপড় বাঁধার সামান্য জিনিসও তাঁর কাছ থেকেই নিতাম।[৪১]

সে যুগে পরিমাপের পাত্র ও বাটখারার পরিমাণে কমবেশী থাকতো। তাই তিনি যখন কারো নিকট থেকে কোনকিছু ধার-কর্জ নিতেন তখন প্রচলিত পরিমাপ পাত্র ও বাটখারার পরিবর্তে অন্য কোন জিনিস দিয়ে মেপে নিতেন। তারপর যে জিনিস দিয়ে মাপতেন সেটি সীল-মোহর করে সংরক্ষণ করতেন। তারপর সেই জিনিস ফেরত দানের সময় সেই সীল করা নির্দিষ্ট জিনিস দিয়ে মেপে ফেরত দিতেন। আর বলতেন, ওজন কম-বেশী হয়ে থাকে।[৪২]

ব্যবসায়িক লেন-দেনের ধারাবাহিকতায় অধিকাংশ সময় তাঁর হাতে জাল মুদ্রা এসে যেত। জাল মুদ্রায় যে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই তিনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। জাল মুদ্রা তাঁর হাতে এলে তা অন্য কারো হাতে পৌঁছার সুযোগ দিতেন না। সবই নষ্ট করে ফেলতেন। ইবন 'আওন বলেছেন, যখন ইবন সীরীনের নিকট জাল মুদ্রা আসতো, তিনি তা দিয়ে কোন কিছু কিনতেন না। তাই তাঁর মৃত্যুর সময় দেখা গেল এ জাতীয় পাঁচশো অকেজো মুদ্রা তাঁর নিকট জমা হয়ে আছে।[৪৩]

তিনি মানুষকে হালাল উপার্জনের কথা বলতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য হালাল রুযি নির্ধারিত হয়ে আছে, তোমরা তাই তালাশ কর। তোমরা হারাম উপায়ে অর্জন করলেও যা তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে তার চেয়ে বেশী পাবে না।[৪৪] অন্যকে হারাম অর্থ থেকে বাঁচানোর জন্য এতখানি করতেন যে, যদি কেউ তাঁর নিকট থেকে অবৈধভাবে কিছু পাওয়ার চেষ্টা করতো তিনি তাকে হারাম অর্থ থেকে বাঁচানোর জন্য কসম পর্যন্ত খেয়ে বসতেন।

দীনের হাকীকত ও গূঢ় রহস্যের সূক্ষ্ম বুঝ ও হারাম-হালালের ব্যাপারে তাঁর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি মাঝে মাঝে তাঁকে এমন সব অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করাতো, যা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত। যেমন, একবার এক ব্যক্তি এসে দাবী করলো যে, সে তাঁর কাছে দু'টি দিরহাম পায়। দাবীটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল। এ কারণে তিনি লোকটির দাবী মানতে অস্বীকার করেন। লোকটি তখন বললো, তাহলে আপনি হলফ করে বলুন। সে ধারণা করেছিল যে, মাত্র দু'টি দিরহামের জন্য তাঁর মত মানুষ হলফ করবেন না। ইবন সীরীন বললেন : হাঁ, আমি হলফ করবো। এ কথা বলে তিনি হলফ করেন। তখন লোকেরা তাঁকে বললো : হে আবু বকর! আপনি মাত্র দু'টি দিরহামের জন্য হলফ করছেন? অথচ সামান্য সন্দেহের কারণে গতকাল আপনি চল্লিশ হাজারের দাবী ত্যাগ করলেন। আর সে ক্ষেত্রে কেবল আপনি ছাড়া আর কেউই সন্দেহ পোষণ করছিল না। তিনি বললেন : হাঁ, আমি হলফ করবো। কারণ, আমি তাকে হারাম খাওয়াতে চাই না। আর আমি জানি এটা তার সম্পূর্ণ হারাম

---

৪১. তাবাকাত- ৭/১৪৬; ৭/২০২
৪২. প্রাগুক্ত- ৭/১৪৭
৪৩. 'আসরুত তাবি'ঈন- ১৫৫
৪৪. তাবাকাত- ৭/১৪৬

উপার্জন হবে। আমি জেনে- বুঝে তাকে হারাম খাওয়াতে পারিনে।[৪৫]

হারাম থেকে সাবধানতার কারণে সম্ভবতঃ তিনি শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী আমীর-উমরাদের উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। একবার হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রা) মত মহান ব্যক্তি হাসান বসরী (রহ) ও তাঁর নিকট কিছু উপহার পাঠান। হাসান বসরী গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি গ্রহণ করেননি।[৪৬]

খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা থেকে এত পরিমাণ দূরে থাকতেন যে, যে সব বৈধ সুবিধার মধ্যে বিন্দুমাত্র খিয়ানতের ধারণা হতে পারে, শুধু সতর্কতা বশতঃ সে সব সুবিধা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতেন। যেমন, যখন তিনি দীর্ঘদিন জেলখানায় বন্দী ছিলেন তখন তাঁর দীনদারী, খোদাভীতি ও 'ইবাদত-বন্দেগীর অবস্থা দেখে জেলার তাঁর একজন ভক্তে পরিণত হন। একদিন তিনি ইবন সীরীনকে বললেন : শায়খ! রাতে গোপনে আপনি বাড়ী চলে যান, পরিবারের লোকদের সাথে রাত কাটান, তারপর সকাল হওয়ার সাথে সাথে আমার কাছে ফিরে আসুন। আপনার মুক্তি পর্যন্ত এভাবে করতে থাকুন। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! এ কাজ আমি করতে পারবো না। জেলার বললেন : আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত করুন। কেন পারবেন না? তিনি বললেন: শাসন কর্তৃত্বের অধিকারীর সাথে খিয়ানতে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো না।[৪৭]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) মৃত্যু শয্যায় ওসীয়াত করে গিয়েছিলেন যে, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন যেন তাঁকে গোসল দেন, কাফন পরান এবং জানাযার নামায পড়ান। হযরত আনাস (রা) মারা গেলেন। ঘটনাক্রমে ইবন সীরীন তখন জেলখানায় বন্দী। লোকেরা শহরের শাসকের নিকট ছুটে গেল এবং তাঁকে হযরত আনাসের (রা) অন্তিম ইচ্ছার কথা জানিয়ে ইবন সীরীনের মুক্তির অনুরোধ জানালো। যাতে তিনি হযরত আনাসের অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন। শাসক অনুমতি দিলেন। কিন্তু ইবন সীরীন জেল থেকে বের হতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন : আমি একজন পাওনাদারের পাওনা অর্থ পরিশোধ করতে না পারার কারণে জেলে বন্দী আছি। তাঁর অনুমতি না আনা পর্যন্ত আমি জেল থেকে বের হবো না। লোকেরা পাওনাদারের কাছে ছুটে গেল এবং তার অনুমতি নিয়ে এলো। এবার তিনি জেল থেকে বের হলেন। হযরত আনাসকে (রা) গোসল দিলেন, কাফন পরালেন এবং তাঁর জানাযার নামায পড়ালেন। তারপর আবার জেলে ফিরে গেলেন। পরিবারের কারো সাথে দেখা করলেন না।[৪৮]

তিনি খ্যাতি ও প্রচার-বিমুখ মানুষ ছিলেন। আর এই খ্যাতির বিড়ম্বনা থেকে বাঁচার জন্য কোন সাধারণ মজলিস-মাহফিলেও যোগদান করতেন না। তিনি বলতেন : আমি শুধু খ্যাতির ভয়ে আপনাদের জলসাগুলোতে আসিনে। মানুষের দৃষ্টিকাড়ে এমন সব কর্ম ও

---

৪৫. তাহযীব আল- আসমা'- ১/৮৪
৪৬. তাবাকাত- ৭/১৪৭
৪৭. তাহযীব আল- আসমা'- ১/৮৪
৪৮. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান- ১/৪৫৩

বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি সযত্নে নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন। অধিকাংশ সময় নামাযের ইমামতির জন্য নিজের চেয়ে কম মর্যাদার লোককে সামনে এগিয়ে দিতেন। ইবন 'আওন বলেন, ইবন হুবাইরার বিদ্রোহের সময় আমিও ইবন সীরীনের সাথে বের হই। নামাযের সময় হলে তিনি আমাকে নামায পড়ানোর নির্দেশ দিলেন। আমি তাঁর আদেশ পালন করলাম। তবে নামায পড়ানোর পর আমি তাঁকে বললাম, আপনি তো বলে থাকেন যে, নামায সেই ব্যক্তির পড়ানো উচিত যার কুরআন বেশী মুখস্থ আছে। তিনি বললেন, আমার এটা ভালো মনে হয় না যে, আমি নামায পড়ানোর জন্য সামনে এগিয়ে যাই, আর মানুষ এটা বলুক যে, মুহাম্মদ মানুষের নামাযের ইমামতি করেন।[৪৯]

ইবন সীরীন তাঁর মায়ের বড় অনুগত ছিলেন। মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা করতেন। মা কিসে খুশী হন, সব সময় সে দিকে লক্ষ্য রাখতেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর উপর অক্ষরে অক্ষরে 'আমল করতেন।

وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْكِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا.

- তোমার পালনকর্তা আদেশ করছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলোনা এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বলো তাদেরকে শিষ্টচারপূর্ণ কথা।[৫০]

মাকে তিনি কী পরিমাণ ভালোবাসতেন এবং মায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কতটুকু যত্নবান ছিলেন তার একটা চিত্র পাওয়া যায় তাঁর বোন হাফসা বিনত সীরীনের একটি বর্ণনায়। তিনি বলেন, আমার মা ছিলেন হিজাযের মেয়ে। তিনি রঙ্গীন ও উৎকৃষ্টমানের মিহি কাপড় পছন্দ করতেন। ইবন সীরীন মায়ের এ পছন্দকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। যখনই তাঁর জন্য কাপড় কিনতেন তখন কেবল কাপড়ের মসৃণতার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, কতখানি টেকসই সে দিকে মোটেও খেয়াল করতেন না। 'ঈদের জন্য ইবন সীরীন নিজে মায়ের কাপড় রং করতেন। আমি কখনো তাকে মার সামনে জোর গলায় কথা বলতে শুনিনি। যখন কথা বলতেন, এত আস্তে বলতেন যেন কোন গোপন কথা বলছেন। ইবন 'আওন বলেছেন, ইবন সীরীন যখন তাঁর মার সামনে থাকতেন তখন তাঁর গলার আওয়ায এত ক্ষীণ হতো যে, কোন অপরিচিত লোক সে সময় তাকে দেখলে রোগাক্রান্ত বলে মনে করতো।[৫১]

তিনি নিজেকে খুবই তুচ্ছ মনে করতেন। নিজের ব্যক্তিসত্তার জন্য বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য পছন্দ করতেন না। সুতরাং কাউকে তাঁর সাথে সাথে চলার অনুমতি দিতেন না। যদি কেউ

---

৪৯. তাবাকাত-৭/১৪৮
৫০. সূরা বানী ইসরাইল- ২৩
৫১. তারীখু ইবন 'আসাকির- ৫/২২৩

তাঁর সাথে চলতে চাইতো, তাকে তিনি বলতেন, যদি তুমি বিনা প্রয়োজনে চলতে থাক, তাহলে ফিরে যাও। তিনি বলতেন, পাপাচারে যদি দুর্গন্ধ থাকতো তাহলে আমার পাপের দুর্গন্ধের কারণে কোন মানুষ আমার কাছে ঘেঁষতে পারতো না।[৫২]

এত বিনয় ও নম্রতা সত্ত্বেও তিনি একজন দুঃসাহসী ব্যক্তি ছিলেন। অনেক বড় বড় বিপদ ও ভীতিকে কোন পাত্তাই দিতেন না। আবূ কিলাবা বলতেন, মুহাম্মাদের সমান শক্তি ও সাহস রাখে কে? তিনি নিযার ফলার উপরও উঠে পড়তেন। বড় সাফ দিলের মানুষ ছিলেন। কখনো কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, আমি ভালো-মন্দ কারো প্রতি হিংসা করিনে।[৫৩] মোটকথা, ধর্ম ও নীতি-নৈতিকতার তিনি এক পূর্ণ মডেল ছিলেন। আবূ 'আওয়ানা বলেছেন, ইবন সীরীনকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হতো।[৫৪]

ইবন সীরীনের এসব চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্য বড় বড় সাহাবী ও তাবি'ঈদেরকে এত পরিমাণ মুগ্ধ করেছিল যে তাঁদের অনেকে তাঁর দ্বারা নিজেদের জানাযার নামায পড়ানোকে বড় বরকতের কাজ বলে মনে করেছিলেন। তাই তাঁদের মৃত্যুর আগে তাঁকে দিয়ে কাফন-দাফন ও জানাযার জন্য অসীয়ত করে গিয়েছিলেন। যেমন হযরত আনাস ইবন মালিকের (রা) কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন 'আওন বর্ণনা করেছেন, হযরত হাসান আল বসরীর আত্মগোপনকালে তাঁর এক মেয়ের ইনতিকাল হয়। আমি গোপনে তাকে সংবাদ পৌঁছালাম। আমার ধারণা ছিল তিনি আমাকে জানাযার নামায পড়ানোর নির্দেশ দিবেন। কিন্তু তিনি আমাকে করণীয় অনেক কাজের কথা বলার পর ইবন সীরীন দ্বারা জানাযার নামায পড়ানোর আদেশ দেন।[৫৫]

হিজরী ১১০ সনে তিনি অন্তিম রোগে আক্রান্ত হন। শেষ জীবনে চল্লিশ হাজার দিরহাম ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এ জন্য বড় চিন্তিত ছিলেন। ছেলে 'আবদুল্লাহ তাঁর সব ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিয়ে তাকে চিন্তামুক্ত করেন। তিনি ছেলের কল্যাণ কামনা করে দু'আ করেন। মৃত্যুর পূর্বে উপদেশ দেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে, পরস্পর মিলেমিশে থাকবে। যদি ঈমানদার হওয়ার দাবী কর তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি দীন নির্বাচন করেছেন, তার উপরেই মরবে। তোমরা দীনের ক্ষেত্রে আনসারদের ভাই ও তাদের মাওলা (আযাদকৃত দাস) হিসেবে থাকবে। সততা ও পবিত্রতা ব্যভিচার ও মিথ্যা থেকে ভালো। এ সব অসীয়াত করার পর জুম'আর দিন ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স আশি বছরের উপর ছিল। অনেকে সাতাত্তর বছরের কথা বলেছেন। ইমাম যাহবী বলেছেন, তিনি হাসান আল-বসরীর মৃত্যুর ১০০ দিন পর

---

৫২. মুখতাসার সিফাতুস সাফওয়া- ১৫০
৫৩. তাবাকাত- ৭/১৪৩,১৪৪
৫৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৭৮
৫৫. তাবাকাত- ৭/১৪৮

মৃত্যুবরণ করেন।[৫৬] তিনি তিরিশজন সন্তানের জনক ছিলেন। তবে মৃত্যুর সময় একমাত্র ছেলে আবদুল্লাহ ছাড়া আর কেউ জীবিত ছিলেন না। তিনি ভালো পোশাক পরতেন, চুলে মেহেদীর খেজাব লাগাতেন। গোঁফ হালকা করে ছাঁটতেন।

সে যুগের একজন বিখ্যাত মহিলা 'আবিদ হাফসা বিনত রাশিদ। তিনি বলেছেন, মারওয়ান আল-মাহমালী নামে আমাদের একজন প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি আল্লাহ-রাসূলের বড় অনুগত এবং একজন বড় 'আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মারা গেলেন। আমরা বড় শোকাভিভূত হয়ে পড়লাম। এ অবস্থায় আমি একদিন তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি প্রশ্ন করলাম আবূ আবদিল্লাহ! আপনার রব আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললেন : আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। বললাম, তারপর আর কি করেছেন? বললেন : আমাকে ডান পাশের লোকদের কাছে উঠানো হয়েছে। বললাম : তারপর? বললেন : আমাকে পূর্ববর্তী লোকদের কাছে নেওয়া হয়েছে। বললাম : সেখানে আর কাকে দেখেছেন? বললেন : হাসান আল-বসরী ও মুহাম্মাদ ইবন সীরীনকে দেখেছি।[৫৭]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবন সীরীন একজন বড় ধরনের স্বপ্নের ব্যাখ্যাকার ছিলেন। ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে তাঁর ব্যাখ্যা সম্বলিত অনেক স্বপ্নের কথা জানা যায়। এখানে তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

একদিন এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম একটি কবুতর একটি মুক্তা গিলে ফেললো। তারপর মুক্তাটি আগের চেয়ে বড় হয়ে বেরিয়ে এলো। আরেকটি কবুতর একটি মুক্তা গিলে ফেললো। তারপর সেটি পূর্বের চেয়ে ছোট হয়ে বেরিয়ে এলো। তৃতীয় আরেকটি কবুতর একটি মুক্তা গিললো এবং সেটি পূর্বের মত একই আকারে বেরিয়ে এলো।

ইবন সীরীন বললেন : প্রথম কবুতরটি হলেন হাসান আল বসরী, তিনি হাদীছ শোনেন। তারপর সুন্দর করে বর্ণনা করেন এবং ওয়াজের মধ্যে ব্যাখ্যা করেন। আর যে কবুতরটির মধ্যে মুক্তা ছোট হয়ে যায়, সে আমি, আমি হাদীছ শুনি, কিন্তু কিছু বাদ দিই। আর তৃতীয়টি হলো কাতাদা, তিনি হাদীছ যাঁরা সবচেয়ে বেশী মুখস্থ রাখতে পারেন তাঁদের একজন।[৫৮]

একবার এক ব্যক্তি এসে বললো : আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার মাথার উপরে যেন একটি স্বর্ণের মুকুট শোভা পাচ্ছে।

ইবনে সীরীন বললেন : আপনি আল্লাহকে ভয় করুন! আপনার পিতা প্রবাসে আছেন। সেখানে তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। তিনি চাচ্ছেন আপনি তাঁকে নিয়ে আসুন। লোকটি তখন একটি চিঠি বের করে বলে, এই যে আমার পিতার চিঠি। এতে লিখেছেন, তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন, বিদেশ-বিভূঁইয়ে আছেন এবং তাঁকে নিয়ে আসার জন্য বলেছেন।

---

৫৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ- ১/৭৮; 'আসরুত তাবি'ঈন- ১৬১; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত- তাবি'ঈন- ১৩৩
৫৭. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত- তাবিঈন-১৩৪
৫৮. তারীখু ইবন 'আসাকির- ৫/২২৭

একদিন এক ব্যক্তি এসে বললো : আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি রক্ত প্রস্রাব করছি। ব্যাখ্যায় ইবন সীরীন বললেন : তুমি তোমার স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় উপগত হয়ে থাক। সে বললো : ঠিক বলেছেন। তিনি বললেন : আল্লাহকে ভয় কর। আরেকবার এক ব্যক্তি এসে বললো : আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন কোন ক্ষেত চাষ করছি; কিন্তু তাতে কোন চারা গজাচ্ছে না। বললেন : তুমি স্ত্রী উপগত অবস্থায় 'আযল করে থাক। লোকটি বললো : ঠিক। একদিন এক ব্যক্তি এসে বললো : আমি দেখলাম, জাওয়া নক্ষত্র ছুরাইয়্যা নক্ষত্রের আগে চলে গেছে। তিনি বললেন : এই হাসান আল বসরী আমার আগে মারা যাবেন। তারপর আমি তাঁর অনুসরণ করবো। তিনি আমার চেয়ে উঁচু মর্যাদার। [৫৯]

একবার এক ব্যক্তি এসে বললো : আমি যেন দেখলাম, আমার হাতে পানি ভর্তি একটি কাঁচের পেয়ালা। পেয়ালাটি পড়ে ভেঙ্গে গেল; কিন্তু পানি থেকে গেল। তিনি লোকটিকে বললেন : আল্লাহকে ভয় কর। আসলে তুমি কিছুই দেখনি। লোকটি বললো, সুবহানাল্লাহ! আমি যা বলেছি তাই দেখেছি। তিনি বললেন : কেউ মিথ্যা বললে তার দায়িত্ব আমার নয়। তোমার স্ত্রী খুব শিগগীর সন্তান প্রসব করে মারা যাবে। কিন্তু তার সদ্য প্রসূত ছেলেটি বেঁচে থাকবে। লোকটি বেরিয়ে গিয়ে বললো : আল্লাহর কসম! আমি কিছুই দেখিনি। অল্প কিছু দিনের মধ্যে তার স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে মারা যায়।[৬০]

'আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম আল-মূরুযী ছিলেন ইবন সীরীনের সমকালীন বসরার একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি বলেন, আমি ইবন সীরীনের মজলিসে উঠা-বসা করতাম। এক সময় তা ছেড়ে দিয়ে গোপনে খারিজীদের 'ইবাদিয়্যা' সম্প্রদায়ের সাথে উঠা-বসা শুরু করি। একদিন আমি স্বপ্নে দেখি, আমি এমন সব লোকদের সাথে আছি যারা রাসূলুল্লাহর (সা) মরদেহ বহন করছে। আমি ইবন সীরীনের নিকট আসলাম এবং আমার স্বপ্নের কথা তাঁকে বললাম। তিনি বললেন : আপনার কি হয়েছে যে, আপনি এসব লোকদের সাথে বসেন যাঁরা নবী (সা) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা দাফন করতে চায়? [৬১]

এভাবে বহু স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার কথা পাওয়া যায়। ইমাম যাহবী বলেছেন, ইবন সীরীন থেকে স্বপ্নের তা'বীরের ব্যাপারে অনেক আশ্চর্যজনক কথা বর্ণিত হয়েছে, যা অনেক দীর্ঘ। এ ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর সাহায্য লাভ করেছিলেন।[৬২]

এতবড় জ্ঞানী ও 'আবিদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি একজন রসিক মানুষ ছিলেন। তবে তাঁর সে রসিকতা সীমা লংঘন করতো না।

হিশাম ইবন হাস্সান বলেন, একবার এক ব্যক্তি ইবন সীরীনের নিকট এসে বললো : আমি যে স্বপ্নটি দেখেছি সে সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেন : স্বপ্নটি কি?

---

৫৯. হিলয়াতুল আওলিয়া- ২/২৭৭, ২৭৮

৬০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'- ৪/৬১৭

৬১. 'আসরুত তাবি'ঈন- ১৫৬

৬২. সিয়ারু আ'লাম আন- নুবালা'- ৪/৬১৮

লোকটি বললো, আমি দেখলাম, আমি একটি ছাগল পেয়েছি এবং তা বিক্রি করে আট দিরহাম পাচ্ছি। বিক্রির সময় আমি জেগে গেলাম। দু'চোখ খুলে কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি আবার চোখ বন্ধ করে আমার দু'হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং বললাম : চার দিরহামই দাও। কিন্তু কিছুই দিল না। তার কথা শুনে ইবন সীরীন বললেন : সম্ভবত: ক্রেতারা তোমার ছাগলের কোন দোষের কথা জেনে সরে পড়েছে। লোকটি বললো ঃ আপনি যা বললেন সম্ভবতঃ তাই হবে।[৬৩] আসলে লোকটি ছিল একটু নির্বোধ ধরনের, তাই ইবন সীরীনও তাকে সেই রকম জবাব দিয়েছিলেন।

একবার গালিব নামক এক ব্যক্তি ইবন সীরীনের নিকট হিশাম ইবনে হাস্‌সান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন : তিনি তো গতকাল মারা গেছেন। আপনি জানেন না? কথাটি শুনে গালিব দুঃখের সাথে "ইন্না লিল্লাহ" পাঠ করলেন। ইবন সীরীন তাঁর ব্যথিত চেহারা দেখে পাঠ করলেন :[৬৪]

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها .

- আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে।[৬৫]

ইবন সীরীনের মজলিসটি হতো সব সময় শুভ, কল্যাণ ও উপদেশের মজলিস। সেখানে তাঁর উপস্থিতিতে কেউ কারো সম্পর্কে কোন খারাপ কথা বললে তিনি খুব দ্রুত সেই ব্যক্তির কোন ভালো কিছু জানা থাকলে তা আলোচনা করে সবাইকে শুনিয়ে দিতেন। উমাইয়্যা যুগের অত্যন্ত প্রতাপশালী স্বৈরাচারী গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মৃত্যুর পর তিনি একদিন শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি তাঁকে গালি দিচ্ছে। তিনি লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন : ভাতিজা, চুপ কর। হাজ্জাজ তাঁর পরোয়ারদিগারের নিকট চলে গেছেন। তুমি যখন আল্লাহ রাব্বুল 'ইজ্জাতের সামনে উপস্থিত হবে তখন দেখবে, এ দুনিয়াতে যে সব ছোট ছোট পাপ করেছো তা হাজ্জাজের বড় বড় পাপের চেয়েও মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। তোমাদের দু'জনের অবস্থাই হবে সেদিন ভিন্ন- যা নিয়ে প্রত্যেকেই ব্যস্ত থাকবে। ভাতিজা! জেনে রাখ, মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হাজ্জাজ যাদের উপর জুলুম করেছেন তাদের পক্ষ থেকে হাজ্জাজের নিকট থেকে বদলা নিবেন। ঠিক তেমনিভাবে হাজ্জাজের প্রতি যারা জুলুম করেছে, আল্লাহ হাজ্জাজের জন্য তাদের থেকে বদলা নিবেন। সুতরাং আজকের পর থেকে কারো গালি দেওয়ার কাজে নিজেকে কখনো জড়িত করোনা। আরেকবার এক ব্যক্তি সফরে রওয়ানা হওয়ার আগে তাঁর সাথে দেখা করতে এলো। তিনি তাকে বললেন : ভাতিজা সব সময় আল্লাহকে ভয় করবে। যতদূর সম্ভব হালাল পথে রোজগার করবে। আর জানবে যে, হারাম পথে তুমি যতই চেষ্টা কর, তোমার জন্য নির্ধারিত অংশের বেশী তুমি লাভ করতে পারবে না।[৬৬]

---

৬৩. আল 'ইক্দ আল ফারীদ- ৬/১৬৪
৬৪. 'উয়ূন আল-আখবার- ১/৩৬৫
৬৫. সূরা আয-যুমার-৪২
৬৬. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৩০; 'আসরুত তাবি'ঈন-১৫৯

বানূ উমাইয়্যার অনেক আঞ্চলিক গভর্নর ও শাসকদের সাথে ইবন সীরীনের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। মাঝে মাঝে তাঁদের দরবারে যেতেন এবং সুযোগমত তাঁদেরকে আল্লাহ্-রাসূলের কথা শুনিয়ে উপদেশ দিতেন। একবার বানূ উমাইয়্যার একজন উঁচুস্তরের গভর্নর 'উমার ইবন হুবায়রা আল-ফাযারী লোক মারফত ইবন সীরীনকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য ডেকে পাঠালেন। তিনি এক ভাতিজাকে সংগে নিয়ে ইবন হুবায়রার দরবারে গেলেন। ইবন হুবায়রা তাঁকে গভীর সম্মান ও আন্তরিকতার সাথে স্বাগতম জানিয়ে নিজের আসনের পাশে বসালেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ তাঁর সাথে দীন ও দুনিয়ার নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। এক পর্যায়ে ইবন হুবায়রা তাঁকে প্রশ্ন করলেন : ওহে আবূ বকর! আপনি আপনার শহরবাসীদেরকে কেমন রেখে এসেছেন? বললেন : আমি যখন তাদেরকে ছেড়ে এসেছি তখন জুলুম-অত্যাচার তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আর আপনি তাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। পাশে বসা তাঁর ভাতিজা তাঁর কাঁধে টোকা দিয়ে তাঁকে একটু সংযত করতে চাইলেন। এতে তিনি আরো বেপরোয়া হয়ে গেলেন। তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি তুমি নও, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি আমি। নিশ্চয় এ আমার একটি সাক্ষ্য।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন :

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ .

আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করোনা। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে।[৬৭]

মজলিস যথারীতি শেষ হলো। 'উমার ইবন হুবায়রা যেভাবে সম্মান ও আবেগের সাথে ইবন সীরীনকে স্বাগতম জানিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে বিদায় দিলেন। তারপর তিন হাজার দীনার ভর্তি একটি থলে লোক মারফত ইবন সীরীনের কাছে পাঠালেন। কিন্তু তিনি গ্রহণ করলেন না। তাঁর ভাতিজা প্রশ্ন করলেন : আমীরের উপহার আপনি গ্রহণ করলেন না কেন? বললেন : আমার প্রতি একটি ভাল ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি এ উপহার আমাকে দিয়েছেন। তাঁর ধারণা মত আমি যদি ভালো মানুষ হই তাহলে আমার তা গ্রহণ করা উচিত নয়। আর যদি আমি তাঁর ধারণার অনুরূপ মানুষ না হই, তাহলে তো তা গ্রহণ করা কোনভাবেই সঙ্গত নয়।[৬৮]

---

৬৭. সূরা- আল বাকারা- ২৮৩
৬৮. সুওয়ারুন মিন হায়াত তাবি'ঈন- ১৩১; 'আসরুত তাবি'ঈন- ১৫২-১৫৩

আল-আহনাফ ইবন কায়স (রহ)

আল-আহনাফের ভালো নাম সাখর, মতান্তরে দাহহাক। উপনাম আবূ বাহর। আরবের বিখ্যাত তামীম গোত্রের একটি শাখা-গোত্রের নাম বানূ সা'দ। হিজরাতের তিন বছর পূর্বে ৬১৯ খ্রীস্টাব্দে এই গোত্রে তাঁর জন্ম।[১] পিতার নাম কায়স ইবন মু'আবিয়া। আবূ বাহর সাখরের দু'টি পা জন্মগতভাবেই খোঁড়া ছিল। এ কারণে 'আল-আহনাফ' উপাধিটি কপালে জুটে যায়। যার অর্থ খঞ্জ, ল্যাংড়া, খোঁড়া ইত্যাদি। তাছাড়া তাঁর দেহে আরো অনেক অস্বাভাবিকতা ছিল।[২] এত কুশ্রী ও কদাকার ছিলেন যে, মানুষ প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁকে তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করতো। তবে নেতৃত্ব ও আভিজাত্যের যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ সমাবেশ তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। যেমন : প্রখর বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, মত প্রকাশের সৎসাহস, প্রবল বাগ্মিতা ও বাকপটুতা ইত্যাদি।[৩] তাঁর পিতা কায়স যেমন তাঁর গোত্রের প্রথম স্তরের কোন লোক ছিলেন না তেমনি একেবারে শেষ স্তরেরও ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন মধ্যম স্তরের মানুষ। বর্তমান সৌদি আরবের 'নাজদ' প্রদেশের 'আল-য়ামামা'-এর পশ্চিমাঞ্চলে ছিল তাঁর গোত্রের আদি বাসস্থান। আর সেখানেই আল-আহনাফের জন্ম হয়। মতান্তরে বসরায় তাঁর জন্ম এবং সেখানেই এতিম অবস্থায় তিনি বেড়ে ওঠেন। তিনি খুব অল্প বয়সে পিতৃহারা হন। বানূ মাযিন তাঁর পিতাকে হত্যা করে।[৪]

আহনাফ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকাল লাভ করেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলীর বর্ণনা মতে রিসালাতের যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁরই চেষ্টায় তাঁর গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে।[৫] তবে অন্য রিজাল শাস্ত্রবিদদের বর্ণনা এর বিপরীতে দেখা যায়। ইবন সা'দ তাঁর জীবনী 'তাবি'ঈন'-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইবন 'আবদিল বার সতর্কতামূলকভাবে সাহাবীদের মধ্যে তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছেন। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকাল পেয়েছিলেন। তবে রাসূলে পাকের দীদারের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকেন। তাই তাঁকে তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য করেন।[৬] হাফেজ ইবন হাজার লিখেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) যুগ লাভ করেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেননি।[৭]

যে বর্ণনার ভিত্তিতে বলা হয় যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেন

---

১. ড: 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী-১/৩৪৪; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৪৫৯
২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৫৬
৩. ড: শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-২/৪৩১
৪. ড: 'উমার ফাররূখ-১/৩৪৪
৫. শাযারাত আয-যাহাব-১/৭৮
৬. আল-ইসতী'আব-১/৫৫
৭. তাহযীব আত-তাহযীব-১/১৯১

তা হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) জীবনের শেষ ভাগে ইসলামী দা'ওয়াত প্রসারের লক্ষ্যে আল-আহনাফের গোত্র বানূ সা'দে একজন সাহাবীকে পাঠান। তিনি বানূ সা'দের লোকদের সমবেত করে তাদের সামনে ইসলামের বাণী তুলে ধরেন এবং তাদেরকে ঈমান আনার আহ্বান জানান। লোকেরা চুপ থাকলো এবং একজন আরেকজনের দিকে তাকাতে লাগলো। কিশোর আহনাফও সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর গোত্রের নেতা ও সাধারণ লোকদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভাব লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে যান এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন : হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আমি আপনাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভাব লক্ষ্য করছি কেন? আপনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে এক পা এগোচ্ছেন তো আরেক পা পিছাচ্ছেন কেন? আল্লাহর কসম! এই আগন্তুক আপনাদের জন্য শুভ ও কল্যাণের বাণী বহন করে নিয়ে এসেছেন। তিনি আপনাদেরকে উত্তম মূল্যবোধ ও নৈতিকতার দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং ক্ষতিকর উপাদান থেকে বিরত থাকতে বলছেন। আল্লাহর কসম! আমরা ভালো কথা ছাড়া তাঁর মুখ থেকে আর কিছু শুনিনি। সুতরাং আপনারা এই সত্যের আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিন। আপনারা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করে সফলকাম হবেন। তাঁর কথার পর তাঁর গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর তাঁর গোত্রের প্রবীণরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু বয়স কম হওয়ার কারণে আল-আহনাফকে নেওয়া হয়নি। ফলে তিনি সাহাবী হওয়ার মর্যাদা ও গৌরব থেকে বঞ্চিত থেকে যান।[৮]

আল-আহনাফ বলেন : আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতকালে একদিন কা'বা তাওয়াফ করছি। তখন আমার পূর্ব পরিচিত এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো। তিনি আমার একটি হাত মুট করে ধরে বললেন : আমি কি আপনাকে একটা সুসংবাদ দিব? বললাম : হাঁ, দিন। বললেন : আপনার কি সেই কথা স্মরণ আছে, যেদিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের গোত্রে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর জন্য গিয়েছিলাম এবং সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য তুলে ধরার পর আপনি কি বলেছিলেন? বললাম : হাঁ, স্মরণ আছে। তিনি বললেন : সেদিন আমি আপনাদের ওখান থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ফিরে তাঁকে আপনার ভূমিকা ও বক্তব্যের কথা বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন : 'হে আল্লাহ, তুমি আল-আহনাফের সকল পাপ ক্ষমা করে দাও।' এরপর আল-আহনাফ আজীবন বলতেন : 'কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) এই দু'আর চেয়ে বড় আশাব্যাঞ্জক কোন 'আমল আমার নেই।'[৯]

কিন্তু প্রথমতঃ এ বর্ণনাটি সত্য কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। আর সত্য বলে মেনে নিলেও এতে তাঁর ইসলাম গ্রহণ প্রমাণিত হয় না। শুধু এতটুক জানা যায় যে, তিনি একজন সত্যের অনুসারী জ্ঞানী লোক ছিলেন এবং অন্তরে সত্য গ্রহণ করার শক্তি ও সাহস ছিল। আর রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আ তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ নয়। তাঁর এ দু'আ

---

৮. ড: 'উমার ফাররূখ-১/৩৪৪

৯. ইবন সা'দ, তাবাকাত-৭/৬৬; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৪৬০-৪৬১

ছিল আহ্নাফের সত্যকে চেনা ও জানার জন্য। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, তিনি সে সময় ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহকে দেখা, তাঁর সাহচর্য লাভ করা এ বর্ণনা দ্বারা মোটেই প্রমাণ হয় না। আর সাহাবী হওয়ার জন্য দেখা ও সাক্ষাৎ অপরিহার্য। তবে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই সত্যকে চেনা এবং তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আ করা এ মোটেই কম মর্যাদার ব্যাপার নয়। বিভিন্ন তথ্য দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রথম খলীফার খিলাফতকালের কোন এক সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। নিম্নের এ ঘটনা দ্বারা সে কথা প্রমাণিত হয়।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর জাযীরাতুল আরবে ভণ্ড নবী মুসায়লামা আল-কাজ্জাবের উৎপাত শুরু হয়। সে নিজেকে একজন নবী বলে দাবী করে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অনেকে তার সাথে যোগ দেয়। ফলে তার কর্মকাণ্ড ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য একটি মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি করে। একদিন আল-আহ্নাফ তাঁর চাচা আল-মুতাশাম্মাসকে সংগে করে মুসায়লামার সাথে সাক্ষাৎ ও তার কথা শোনার জন্য যান। আল-আহ্নাফ তখন একজন তরুণ। মুসায়লামার সাথে দেখা করে ফেরার পথে চাচা আল-মুতাশাম্মাস তাঁকে প্রশ্ন করলেন :

— আহ্নাফ, লোকটিকে কেমন দেখলে?

আল-আহ্নাফ : লোকটিকে অসত্যের অনুসারী বলে মনে হলো। সে আল্লাহ ও মানুষের প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে।

চাচা একটু কৌতুক করে তাঁকে বললেন : তুমি তাকে মিথ্যাবাদী বলছো, একথা আমি যদি তাকে বলে দিই, তুমি ভয় পাবে না?

বললেন : সে সময় আমি তার সামনেই একথার ব্যাপারে আপনার শপথ নিব যে, আপনিও কি আমার মত তাকে মিথ্যাবাদী বলেন না? অতঃপর চাচা-ভাতিজা দু'জনই হেসে দেন। দু'জন ইসলামের উপর অটল থাকেন।[১০]

এ সময় (হিঃ ১১/খ্রীঃ ৬৩৩) তাঁর গোত্র ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়, কিন্তু তিনি তাঁর গোত্রকে অনুসরণ করেননি। তাঁর গোত্রের সাথে মিলে মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধও করেননি।[১১] হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি প্রথম মদীনায় আসেন। তখন তাঁর বয়স বিশ বছর। বানূ তামীম সম্পর্কে হযরত 'উমারের (রা) একটা খারাপ ধারণা ছিল। এজন্য প্রায়ই তিনি নিন্দামন্দ করতেন। একবার আহ্নাফের উপস্থিতিতে বানূ তামীমের কোন প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলো। 'উমার (রা) তাঁর অভ্যাস মত তাদের নিন্দামন্দ করলেন। সাথে সাথে আহ্নাফ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কিছু বলার জন্য অনুমতি চাইলেন। খলীফা অনুমতি দিলেন। আহ্নাফ বললেন : আপনি কোন ব্যতিক্রম ছাড়া গোটা বানূ তামীমের নিন্দা করেছেন। অথচ তারাও সাধারণ মানুষের মত। তাদের

---

১০. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৪৬২
১১. ড: 'উমার ফাররুখ-১/৩৪৪

মধ্যেও ভালো-মন্দ সব ধরনের মানুষ আছে। হযরত 'উমার (রা) এমন সত্য উচ্চারণ শুনে বলেন : তুমি সত্য বলেছো। তারপর তিনি বানূ তামীমের কিছু গুণের কথা বলে পূর্বের উচ্চারিত তাদের নিন্দার ক্ষতিপূরণ করেন। আহনাফের পরে তাঁরই গোত্রের 'হাত্তাত' নামের আরেক ব্যক্তি কিছু বলতে চায়। কিন্তু 'উমার (রা) তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তোমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের নেতা তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

যদিও হযরত 'উমার (রা) আহনাফের নীতিগত কথার কারণে তাঁর বক্তব্য মেনে নেন, তবে তাঁর গোত্রের প্রতি 'উমারের (রা) খারাপ ধারণা বিদ্যমান ছিল। এ কারণে সতর্কতামূলকভাবে আহনাফের জীবন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে খলীফা এক বছরের জন্য মদীনায় নিজের সাথে রেখে দেন। পরীক্ষার পর তিনি আহনাফকে বলেন, আমি এক বছর যাবত তোমাকে পরীক্ষা করেছি। আমি তোমার মধ্যে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু দেখিনি। তোমার বাহ্যিক আচরণ ভালো। আমি আশা করি তোমার ভিতরটাও ভালো হবে। আমি তোমার সাথে এমন আচরণ এজন্য করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে একথা বলে সতর্ক করে গেছেন যে, এই উম্মাতের ধ্বংস বাকপটু মুনাফিকদের হাতেই হবে।[১২]

এই পরীক্ষার পর হযরত 'উমারের (রা) যখন আহনাফের উপর দৃঢ় আস্থা সৃষ্টি হলো তখন তাঁকে তাঁর জন্মভূমি বসরায় ফেরত পাঠালেন। আর সেই সাথে বসরার তৎকালীন ওয়ালী আবূ মূসা আল-আশ'আরীকে (রা) তাঁকে সংগে রাখার, তাঁর সাথে পরামর্শ করার এবং তাঁর পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য বলে পাঠান। আহনাফ বসরার একজন নেতা ছিলেন। হযরত 'উমারের (রা) এই নির্দেশের পরে প্রতিদিন তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১৩]

সেই সময় পারস্য অভিযান চলছিল। বসরায় ফিরে যাওয়ার পর আহনাফ এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং হিজরী ১৭ সনে পারস্য অভিযানে তাঁকে দেখা যায়।[১৪]

আহনাফ ছিলেন একজন বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল মানুষ। এ কারণে গোত্রীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতিনিধিত্বের সময় তাঁর নামটি তালিকার প্রথমে দেখা যেত এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গোত্রীয় প্রতিনিধির দায়িত্ব তাঁরই উপর অর্পিত হতো। আর তাই এই সময় বসরার একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মদীনায় খলীফার দরবারে আসেন। খলীফা হযরত 'উমার (রা) বসরাবাসীদের বিভিন্ন অভিযোগ ও প্রয়োজনসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, আহনাফ তাদের প্রয়োজন ও অভিযোগসমূহ তুলে ধরে চমৎকার একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর এ বক্তৃতায় হযরত 'উমার খুবই মুগ্ধ হন এবং মন্তব্য করেন : আল্লাহর কসম! ইনি একজন নেতা। কথাটি দু'বার বলেন। সেখানে উপস্থিত যায়দ ইবন জাবালার সহ্য হলো না। তিনি বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! সে তেমন নয়। তার মা

---

১২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/২৫৪

১৩. প্রাগুক্ত-১/২৩৭; তাবাকাত-৭/৬৬; উসুদুল গাবা-১/৫৫

১৪. আল-কামিল ফিত-তারীখ-২/৪২

তো বাহিলী গোত্রের। 'উমার (রা) বললেন : সে যদি সত্য বলে থাকে তাহলে সে তোমার চেয়ে ভালো।[১৫] তারপর খলীফা তাঁকে পারস্যের কিসরা সাম্রাজ্যের কিছু বিজিত অঞ্চলের কর্তৃত্ব দান করেন। তিনি বসরার ওয়ালীকে লেখেন : শাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে আহনাফের সাথে পরামর্শ করবে এবং সেই মত কাজ করবে। আহ্ওয়ায বিজয়ের পর বিখ্যাত ইরানী জেনারেল হুরমুযান– যিনি খুযিস্তান যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁকে মদীনায় নিয়ে আসেন আহনাফ।[১৬]

সে সময় ইরাক বিজয় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। তবে ইরানের উপর ব্যাপক সামরিক অভিযান তখনো চালানো হয়নি। ইরানের বিজিত অঞ্চল বার বার বিদ্রোহ ঘোষণা করতো। সেই সময় ইরানে যুদ্ধরত সৈনিকদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় খলীফার দরবারে আসে। হযরত 'উমার (রা) তাদের কাছে জানতে চাইলেন, এই ইরানীরা বার বার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে কেন? মনে হয় মুসলমানরা তাদের উপর উৎপীড়ন চালায়। প্রতিনিধি দল খলীফার কথার প্রতিবাদ করলো। কিন্তু কেউ হযরত 'উমারের (রা) প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলো না। আহনাফের মেধা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তিনি এই প্রশ্নের গভীরে চলে যান এবং বলেন : 'আমীরুল মু'মিনীন, ইরানের মধ্যভাগে সামরিক অভিযান বন্ধ করে দিয়েছেন এবং ইরানী সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মুকুট ও সিংহাসনসহ বিদ্যমান আছেন। যতদিন তিনি এভাবে বিদ্যমান থাকবেন, ইরানীরা তাঁর সহযোগিতায় বার বার বিদ্রোহ করতে থাকবে। কারণ, একই দেশে দুইটি সরকার এক সাথে চলতে পারে না। ইরানের শাহানশাহ সবসময় ইরানীদেরকে বিদ্রোহের উস্কানি দেয়। এ কারণে যতদিন পর্যন্ত আমরা ইরানের অভ্যন্তর ভাগে সামরিক অভিযান চালিয়ে তাঁকে শেষ করে দিতে না পারবো ততদিন ইরানীদের এরূপ আচরণ অব্যাহত থাকবে। যখন তারা নিজেদের সরকারের ব্যাপারে একেবারে হতাশ হয়ে যাবে তখন শান্ত হবে।' হযরত 'উমার (রা) আহনাফের বক্তব্য শুনে মন্তব্য করেন : তুমি সত্য বলেছো। তারপর তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ইরানের বিরুদ্ধে ব্যাপক সামরিক অভিযান চালানোর জন্য তৎপরতা শুরু করেন এবং প্রতিটি প্রদেশের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী পাঠান।[১৭] শাহানশাহে ইরান ইয়াযদিগিরদ তখন খুরাসানে অবস্থান করছিলেন। যেহেতু আহনাফ খলীফাকে তাঁর মূলোৎপাটনের পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং মেধা ও বুদ্ধির দিক দিয়ে তিনি এ কাজের জন্য সবচেয়ে বেশী যোগ্য ছিলেন, তাই খুরাসান অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব খলীফা তাঁরই উপর ন্যস্ত করেন। হিজরী ২১ সনে তিনি খুরাসানের দিকে অগ্রসর হন এবং তাবসীন হয়ে হিরাতে পৌঁছেন। এর বিজয় সম্পন্ন করে মারবে শাহজাহান– যেখানে ইয়াযদিগিরদ অবস্থান করছিলেন– এর দিকে যাত্রা করেন। তাঁর অগ্রাভিযানের সংবাদ শুনে ইয়াযদিগিরদ মারব আর-রোয চলে যান এবং সেখানে পৌঁছে তিনি চীনের খাকান বংশীয়

---

১৫. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/৬২

১৬. সিয়ারুত তাবি'ঈন-১৫১

১৭. আল-কামিল ফিত-তারীখ-২/৪৩০-৪৪০

শাসক ও অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চলীয় শাসকদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানিয়ে পত্র লেখেন। ইয়াযদিগিরদের মারব আর-রোয যাবার পর আহনাফ মারবে শাহজাহানে হারিছা ইবন নু'মান আল-বাহিলীকে রেখে মারবের দিকে অগ্রসর হন। তাঁর অগ্রযাত্রার সংবাদ পেয়ে ইয়াযদিগিরদ সেখান থেকে পালিয়ে বলখে পৌঁছেন। এই আবর্তনমূলক দৌড়-ঝাঁপের মধ্যে কূফা থেকে সেনা-সাহায্য এসে পৌঁছে। আহনাফ তাদেরকে সাথে নিয়ে বলখের উপর আক্রমণ করেন। ইয়াযদিগিরদ পরাজিত হয়ে পালিয়ে নদী অতিক্রম করে সীমান্তবর্তী খাকান শাসনাধীন অঞ্চলে চলে যান। তারপর আহনাফ খুরাসানের সকল অঞ্চলে তাঁর সৈন্য ছড়িয়ে দেন। খুরাসানবাসীরা তাদেরকে কোনভাবেই বাধা দিতে পারেনি। এভাবে নিশাপুর থেকে তুখারিস্তান পর্যন্ত গোটা অঞ্চল বিনা যুদ্ধে বিজিত হয়। আহনাফ মারব আর-রোয ফিরে আসেন এবং খলীফা হযরত 'উমারকে (রা) বিজয়ের সুসংবাদ জানিয়ে পত্র পাঠান। খলীফা ইরানের বাইরে বিজিত অঞ্চলের পরিধি বাড়াতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাই তাঁকে সামনে অগ্রসর হতে বারণ করেন।

এদিকে ইয়াযদিগিরদের চীনের সীমান্ত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণের পর চীন সম্রাট খাকান তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে খুরাসান পৌঁছেন। তারপর সেখান থেকে সোজা বলখের দিকে যাত্রা করেন। বলখের ইসলামী বাহিনী আহনাফের সাথে মারব আর-রোয প্রত্যাবর্তন করেছিল। এ কারণে ইয়াযদিগিরদ ও খাকান উভয়ে বলখ হয়ে মারবের দিকে অগ্রসর হন। ইয়াযদিগিরদ মারবে শাহজাহান– যেখানে তাঁর কোষাগার ছিল, চলে যান। আহনাফের সাথে সেখানে তাঁর সংঘর্ষ হয়। আহনাফ পাহাড়ের পাদদেশে সৈন্য সমাবেশ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত সকাল-সন্ধ্যা খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে। একদিন আহনাফ নিজেই ময়দানে আসেন। খাকানের বাহিনী থেকে একজন তুর্কি বীর সৈনিক হাতে তবলা ও ঢোল পিটাতে পিটাতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে আহনাফ আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করেন। তারপর দু'জন বীর সৈনিক একের পর এক আহনাফের সাথে লড়বার জন্যে এগিয়ে আসে। আহনাফের তরবারির আঘাতে তাদের দু'জনেরই বীরত্বের নেশা চিরদিনের জন্য মিটে যায়। এরপর গোটা তুর্কি বাহিনী মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। খাকান তাঁর বাহিনীর অগণিত লাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তাঁর বোধোদয় হয়। তিনি সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেন। ইয়াযদিগিদরকে সাহায্য করার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত কোন লাভ ছিল না। তাছাড়া তিনি বুঝতে পারেন, মুসলমানদেরকে পরাভূত করাও কোন সহজ কাজ নয়। তাই তিনি ইয়াযদিগিরদকে বলেন, অনেক দিন হয় আমরা দেশ ছেড়ে এসেছি, এ যুদ্ধে আমাদের অনেক বীর সৈনিকও প্রাণ হারিয়েছে, আর এই সংঘাত-সংঘর্ষে আমাদের বিশেষ কোন লাভও নেই, তাই আমরা দেশে ফিরে যেতে চাই। এরপর তিনি তাঁর বাহিনীকে সবকিছু গুটিয়ে দেশের দিকে যাত্রার নির্দেশ দেন।

ইয়াযদিগিরদ মারবে শাহ্জাহানে ছিলেন। খাকানের ফিরে যাবার সংবাদ পেয়ে তিনি সাহস হারিয়ে ফেলেন এবং কোষাগারের যাবতীয় ধন-সম্পদ তুর্কিস্তান সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। ইরানীরা তা জানতে পেরে তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখে। তারা ইয়াযদিগিরদকে বলে, তুর্কীদের কোন দীন-ধর্ম নেই। তাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার পালনের কোন জ্ঞান-অভিজ্ঞতাও আমাদের নেই। আর যাই হোক, মুসলমানদের একটি ধর্ম আছে। তারা অঙ্গীকার পালনকারীও বটে। তাই, যদি আপনাকে দেশই ছাড়তে হয় তাহলে মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তি করে নিন। কিন্তু ইয়াযদিগিরদ এই পরামর্শ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। ইরানীরা যখন দেখলো তাদের দেশের ধন-সম্পদ অন্য দেশে পাচার হতে যাচ্ছে তখন তারা মরণপণ যুদ্ধ করে তা ছিনিয়ে নেয়। ইয়াযদিগিরদ তাঁর নিজ প্রজাদের নিকট পরাজিত হয়ে তুর্কিস্তানে পালিয়ে যান। হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালের শেষ পর্যন্ত খাকানের অতিথি হিসেবে সেখানে বসবাস করেন।

ইয়াযদিগিরদের তুর্কিস্তানে চলে যাবার পর ইরানীদের শেষ অবলম্বন ভেঙ্গে পড়ে। তারা হতাশ হয়ে আহ্নাফের সাথে সন্ধি করে এবং ইয়াযদিগিরদের যাবতীয় ধন-ভাণ্ডার আহ্নাফের হাতে তুলে দেয়। আহ্নাফ তাদের সাথে এমন ভদ্রোচিত আচরণ করেন যে, এতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের শাসন থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে।

ইরানীদের সাথে এই সন্ধিচুক্তির পর আহ্নাফ খলীফা 'উমারকে (রা) বিজয়ের সংবাদ পাঠান এবং সেখানে উপস্থিত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে উদ্দীপনাময় এক ভাষণ দেন। আজও মুসলমানদের জন্য সেই ভাষণটি শিক্ষণীয় হতে পারে। ভাষণটি ছিল নিম্নরূপ :

'মুসলিম ভাইয়েরা! আজ মাজূসী (অগ্নিউপাসক)-দের সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাদের অধিকারে তাদের সাম্রাজ্যের এক খণ্ড ভূমিও আজ আর নেই। আজ তারা কোনভাবেই আর মুসলমানদের কোন রকম ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। আজ আল্লাহ তাদের ভূমি, তাদের সাম্রাজ্য এবং তাদের দেশবাসী জনগণের অধিকারী তোমাদেরকে করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষার জন্য। যদি তোমরা পাল্টে যাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এনে বসাবেন। আমার ভয় হয়, মুসলমানরা নিজেদের হাতেই নিজেরা ধ্বংস না হয়।'[১৮]

হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফাতকালে ইরানে ফের যখন বিদ্রোহ হয় এবং খুরাসান মুসলিম শাসন কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে যায় তখন এই আহ্নাফই সামরিক অভিযান চালিয়ে আবার তা মুসলিম শাসনের অধীনে ফিরিয়ে আনেন।[১৯]

মোটকথা, তিনি খলীফা 'উমারের (রা) ইনতিকালের পূর্বে হিজরী ২১ সনে (খ্রী. ৬২৪) একটি বিজয়ী বাহিনীর সাথে পারস্যে যান। হিজরী ২১ সনে নিহাওয়ান্দ, অতঃপর কুম ও

---

১৮. প্রাগুক্ত-৩/২৬-২৯
১৯. প্রাগুক্ত-৩/৯৬-৯৯

কাশান বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমিরের অগ্রবর্তী বাহিনীর সদস্য হিসেবে খুরাসান তথা হিরাত, মার্ব, মারব আর-রোয, বল্‌খ প্রভৃতি অঞ্চল বিজয়ে অবদান রাখেন। তারপর জায়হূন-সায়হূন নদী অতিক্রম করে মধ্য এশীয় অঞ্চলে ঢুকে পড়েন। খলীফা হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে সামারকান্‌দ বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। এই অভিযানে তিনি একটি চোখ হারান।[২০]

হযরত 'উছমান (রা)-এর শাহাদাতের পর আহনাফ হযরত 'আলীকে (রা) খলীফা মেনে নিয়ে তাঁর হাতে বাই'আত করেন। কিন্তু উটের যুদ্ধে কোন পক্ষে যোগদান করেননি। এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে তিনি নিজেই বলেছেন :

'সে সময় আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে সফরে ছিলাম। মদীনায় এসে তালহা ও যুবায়রের (রা) সাথে দেখা করে বললাম : এই ব্যক্তিকে ('উছমান) আমি তো নিহত ব্যক্তি রূপে দেখতে পাচ্ছি। এঁর পরে আপনাদের দু'জনের পছন্দনীয় এমন এক ব্যক্তির নাম বলুন যাঁর হাতে আমি বাই'আত করবো। তাঁরা বললেন : আমরা 'আলীর কথা বলবো। বললাম : যাঁর কথা আপনারা বলছেন তাঁর প্রতি কি আপনারা সন্তুষ্ট? তাঁরা বললেন : হাঁ। আহনাফ বলেন : এরপর আমি মক্কায় গেলাম। আমরা সেখানে থাকতেই 'উছমানের (রা) হত্যার সংবাদ পেলাম। সে সময় মক্কাতে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাও (রা) ছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম : আপনি এখন কার হাতে আমাকে বাই'আত করতে বলছেন? বললেন : 'আলী ইবন আবী তালিবের (রা) হাতে। বললাম : যাঁর হাতে আমাকে বাই'আত করতে আদেশ করছেন তাঁর প্রতি কি আপনি সন্তুষ্ট? বললেন : হাঁ। আহনাফ বলেন : তারপর আমি মদীনায় যাই এবং 'আলীর (রা) হাতে বাই'আত করি। অতঃপর আমি বসরায় ফিরে যাই। আমি দেখলাম, ব্যাপারটি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এরপর আমরা দেখলাম, 'আয়িশা, তালহা ও যুবায়র (রা) তাঁদের বাহিনী নিয়ে আসলেন এবং বসরার উপকণ্ঠ 'আল-খুরায়বা' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন।

আহনাফ বলেন : আমি মানুষের কাছে তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলাম। বললো : তাঁরা বলছেন, 'উছমান অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন। তাই তাঁর রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য তাঁরা আপনার সাহায্য চেয়েছেন। আমি এমন একটি মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হলাম যা আর কখনো হইনি। কারণ, এ তিন ব্যক্তি– যাঁদের মধ্যে একজন উম্মুল মু'মিনীন ও আরেকজন রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী– তাঁদেরকে অপমান করা খুবই কঠিন কাজ। অন্যদিকে তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) যে চাচাতো ভাইয়ের হাতে আমাকে বাই'আত করার আদেশ করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে তাঁদেরই সাথে যুদ্ধ করা আরো কঠিন কাজ। আমি তাঁদের কাছে গেলাম। তাঁরা বললেন : 'উছমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং আপনি তাঁর রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য উচ্চকণ্ঠ হোন। আমি তখন উম্মুল মু'মিনীনকে বললাম : আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি

---

২০. দ্রঃ 'উমার ফারূখ-১/৩৪৫

আমাকে 'আলীর হাতে বাই'আত করতে বলেননি? বললেন : হাঁ, বলেছি। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তারপর আমি তালহা ও যুবায়রকেও একই কথা বললাম এবং তারা একই জবাব দিলেন। আমি তাঁদেরকে বললাম : আল্লাহর কসম! যতক্ষণ উম্মুল মু'মিনীন আপনাদের সাথে আছেন, আমি আপনাদের বিরুদ্ধে লড়বো না। ঠিক তেমনি রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই 'আলীর (রা) বিরুদ্ধেও লড়বো না। আমাকে আপনারা তিনটি পন্থার যে কোন একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিন। (১) আমাকে অনারব কোন দেশে যাওয়ার সুযোগ দিন। সেখানে আল্লাহ্ আমার জন্য যা ফয়সালা করেন তাই হবে। (২) আমাকে মক্কায় যেতে দিন। আমি সেখানে চুপচাপ অবস্থান করবো। (৩) অথবা মক্কার আশেপাশে কোথাও থাকার অনুমতি দিন। তাঁরা বললেন : আমরা ভেবে দেখে আপনাকে জানাবো। তাঁরা পরামর্শ করলেন। তাঁরা ভাবলেন, 'আমাকে অনারব ভূমিতে যেতে দিলে আরো অনেকে আমার সাথে মিলিত হবে। মক্কায় যেতে দিলে কুরায়শদের মধ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবো এবং তাঁদের সব খবর কুরায়শদেরকে জানিয়ে দিব। তার চেয়ে বরং বসরা থেকে দু' ফারসাখ দূরে 'আল-জালহা' নামক স্থানে নজরবন্দী অবস্থায় রেখে দেওয়া সমীচীন হবে। তাঁর সাথে বানূ তামীমের ছয় হাজার যোদ্ধাও সেখানে চলে যাবে।' এভাবে উটের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন।[২১]

হযরত 'আলী ও হযরত মু'আবিয়ার (রা) মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ আরম্ভ হলে আহনাফের সত্যের সন্ধান লাভকারী তরবারি কোষবদ্ধ থাকতে পারেনি। তিনি 'আলীর (রা) সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং বসরাবাসীদেরকে 'আলীর (রা) সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। সিফ্‌ফীনে তিনি 'আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করেন। এ কথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি এক পর্যায়ে 'আলীর (রা) দল ত্যাগকারী খারেজীদের দলেও ছিলেন।[২২] কিন্তু একথা সঠিক নয় বলে বিভিন্ন তথ্যে প্রমাণিত হয়।

সিফ্‌ফীন যুদ্ধের সমাপ্তির পর দ্বন্দ্ব নিসরনের জন্য যখন তাহকীম বা শালিসীর বিষয়টি সামনে এলো এবং 'আলীর (রা) পক্ষে আবূ মূসা আল-আশ'আরীর (রা) নামটি প্রস্তাব করা হলো তখন আহনাফ এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি 'আলীকে (রা) বলেন, আপনাকে 'আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনীতিকের ('আমর ইবন আল-'আস) সাথে বোঝাপড়া করতে হচ্ছে। আমি আবূ মূসাকে (রা) ভালো করেই জানি। তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য মোটেই উপযুক্ত ব্যক্তি নন। এ কাজের জন্য অত্যন্ত চালাক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রয়োজন। সম্ভব হলে আপনি আমাকে আপনার পক্ষের প্রতিনিধি নিয়োগ করুন। আর এ কাজের জন্য সাহাবী হওয়া একান্ত জরুরী হলে আপনি অন্য কোন সাহাবীকে নির্বাচন করুন এবং আমাকে তাঁর উপদেষ্টা নিয়োগ করুন।

কিন্তু ইরাকীদের সিদ্ধান্ত আবূ মূসার (রা) পক্ষে ছিল। এ কারণে হযরত 'আলী (রা)

---

২১. আল'ইক্দ আল-ফারীদ-৪/৩১৯-৩২০
২২. ড: 'উমার ফাররুখ-১/৩৪৫

আহনাফের সৎ ও মূল্যবান পরামর্শ কাজে লাগাতে পারেননি। সিফ্‌ফীন যুদ্ধের পরে খারিজীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনার সময়েও তিনি হযরত 'আলী (রা) সাথে ছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি কয়েক হাজার বসরাবাসী যোদ্ধাকে সংগে নিয়ে যান।[২৩]

হযরত 'আলীর (রা) শাহাদাতের পরে হযরত মু'আবিয়াকে (রা) খলীফা হিসেবে তিনি মেনে নেন। তবে তখনো স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও সত্য উচ্চারণের উপর অটল থাকেন। আমীর মু'আবিয়ার (রা) যৌক্তিক ও অযৌক্তিক সব ইচ্ছার সামনে মাথানত করেননি। বরং তাঁর কাছে মু'আবিয়ার (রা) যেসব কাজ যৌক্তিক বলে মনে হয়নি, সে ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাহসের সাথে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন।[২৪] মু'আবিয়া (রা) যখন তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দানের সিদ্ধান্ত নেন তখন পরামর্শের জন্য গোটা খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের রাজধানীতে তলব করেন। বসরার প্রতিনিধি দলের সাথে আহনাফও দিমাশকে যান। মু'আবিয়া (রা) ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করার ব্যাপারে আহনাফের মতামত জানতে চান। খলীফার দরবারে সমবেত বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে খলীফার দরবারে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এক পর্যায়ে মু'আবিয়া (রা) বলে ওঠেন : আহনাফ কোথায়? তিনি সাড়া দিলে মু'আবিয়া বলেন : আপনি কোন কথা বলছেন না যে? আহনাফ উঠলেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বললেন : আল্লাহ্ আমীরুল মু'মিনীনের মঙ্গল করুন! আমি যদি আপনাকে সত্য কথা বলি আপনি অসন্তুষ্ট হবেন, আর যদি মিথ্যা বলি তাহলে অসন্তুষ্ট হবেন আল্লাহ। আল্লাহর অসন্তুষ্টির চেয়ে আমীরুল মু'মিনীনের অসন্তুষ্টি আমাদের জন্য অতি সহজ ও সহনীয়। মু'আবিয়া বলেন : আপনি সত্য বলেছেন। তারপর আহনাফ বলেন :[২৫] জনগণ নিকট অতীতে একটি খারাপ সময় অতিবাহিত করে একটি ভালো সময় অতিক্রম করছে। আমীরুল মু'মিনীনের ছেলে ইয়াযীদ উত্তম উত্তরাধিকারী। আপনি তাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে চাচ্ছেন। কিন্তু আপনি এমন বার্দ্ধক্যে পৌঁছেননি যে এখনই মারা যাবেন, অথবা এমন রোগে আক্রান্ত হননি যে বাঁচার আশা নেই। আপনি উটরূপী কালের দুধ দোহন করেছেন, বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আপনিই ভেবে দেখুন, কার উপর আপনি খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে যেতে চান, কাকে খলীফা হিসেবে মনোনীত করতে চান। যারা আপনাকে নির্দেশ দেয়, কিন্তু পথ বাতলে দেয় না, পরামর্শ দেয়, কিন্তু আপনার দিকে লক্ষ্য করে না, আপনি এমন লোকদের কথায় কান দিবেন না। জনগণ কি চায়, আপনি সে বিষয়ে অধিক সচেতন এবং তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে আপনি অধিক জ্ঞানী। তবে হিজায ও ইরাকের অধিবাসীরা এটা মানবে না। তারা হাসান ইবন 'আলীর (রা) জীবদ্দশায় ইয়াযীদের হাতে বাই'আত করবে না।

---

২৩. আল-কামিল ফিত-তারীখ-৩/২৮৪

২৪. ডঃ 'উমার ফাররূখ-১/৩৪৫

২৫. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-১/৫৯; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২৪২

আহ্নাফের এ সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর দাহ্হাক ইবন কায়স উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে যান। আহ্নাফের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন এবং ইরাকবাসীদেরকে আমীরুল মু'মিনীনের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তারপর আহ্নাফ আবার উঠে দাঁড়ান এবং আল্লাহর হামদ ও ছানা পেশের পর বলেন : 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা আপনাকে কুরায়শদের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি। আপনাকে আমরা সবচেয়ে বেশী তীক্ষ্ণধী, শক্ত অঙ্গীকারকারী ও অঙ্গীকার পালনকারী পেয়েছি। আপনি জানেন, ইরাক আপনি জোরপূর্বক জয় করেননি এবং মারপিট করেও তার উপর প্রভুত্ব অর্জন করেননি। আপনার একথা জানা আছে, হাসান ইবন 'আলীকে (রা) আল্লাহর একটি অঙ্গীকার আপনি দান করেছেন। আর তা হলো, আপনার পরে তিনিই লাভ করবেন খিলাফতের দায়িত্বভার। সে অঙ্গীকার পূরণ করলে আপনি হবেন অঙ্গীকার পূরণকারী। আর যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন, জেনে রাখবেন, হাসানের পিছনে আছে, বহুসংখ্যক উন্নতমানের অশ্ব, সবল ও শক্ত বাহু ও তীক্ষ্ণ তরবারি। যদি আপনি প্রতারণার হাত এক বিঘত তাঁর দিকে বাড়িয়ে দেন তাহলে তাঁর পিছনে আপনি দেখতে পাবেন দু' বাহু পরিমাণ সাহায্য। আপনি নিশ্চয় জানেন, ইরাকবাসীরা আপনাকে ঘৃণা করার পর থেকে আর কখনো ভালোবাসেনি, তেমনিভাবে 'আলী ও হাসানকে (রা) ভালোবাসার পর থেকে আর কখনো ঘৃণা করেনি। আর এ ব্যাপারে আসমান থেকে বাণীও তাদের কাছে আসেনি। যে তরবারিগুলো সিফফীনের দিন তারা আপনার বিরুদ্ধে উত্তোলন করেছিল তা তাদের ঘাড়েই আছে, তেমনিভাবে যে অন্তরগুলো সেদিন আপনাকে ঘৃণা করেছিল তা তাদের পাঁজরের মধ্যেই আছে। আল্লাহর কসম! ইরাকীদের নিকট 'আলী (রা) অপেক্ষা হাসান (রা) অধিকতর প্রিয়।'[২৬]

আহ্নাফের বক্তব্য শেষ হলে যথাক্রমে 'আবদুর রহমান ইবন 'উছমান আছ-ছাকাফী, মু'আবিয়া ও ইয়াযীদ ইবন আল-মুকান্নি' উঠে দাঁড়ান ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। তারপর আহ্নাফ আবার উঠে দাঁড়ান এবং নিম্নের ভাষণটি দান করেন :[২৭]

يا أمير المؤمنين : أنت أعلمنا بيزيد في ليله ونهاره، وسره وعلانيته، ومدخله ومخرجه، فإن كنت تعلمه لله رضًا ولهذه الأمة، فلا تشاور الناس فيه، وإن كنت تعلم منه غير ذلك، فلا تزوِّدْه الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة، فإنه ليس لك من الآخرة إلا ماطاب، واعلم أنه لاحجة لك عند الله إن قدّمت يزيد على الحسن والحسين، وأنت تعلم من "هما" وإلى ماهما، وإنما علينا أن نقول : سَمِعْنَا وأطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإلَيْكَ المصير.

---

২৬. জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২৪৩; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৪৫৮
২৭. 'উয়ূন আল-আখবার-২/৬০৮; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৪/৩৭০; আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা-১/১২১

– হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ইয়াযীদের দিন-রাত্রির, গোপন-প্রকাশ্যের ও ভিতর-বাইরের খবর আমাদের চেয়ে বেশী রাখেন। যদি আপনি তাঁকে আল্লাহ ও এই উম্মাতের জন্য বেশী পছন্দনীয় মনে করেন তাহলে এ ব্যাপারে কোন মানুষের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন নেই। আর যদি আপনি এর বিপরীত কিছু জানেন তাহলে তার ঘাড়ে দুনিয়ার বোঝা চাপিয়ে আখিরাতের দিকে পাড়ি জমাবেন না। কারণ, আখিরাতে ভালো ছাড়া কোন কিছুই আপনার কাজে আসবে না। আর আপনি জেনে রাখুন, হাসান ও হুসায়নের (রা) উপর ইয়াযীদকে প্রাধান্য দিলে আল্লাহর কাছে আপনি কোন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবেননা। আপনি জানেন, তাঁরা দু'জন কে এবং তাঁদের পরিণতিই বা কী হতে যাচ্ছে। আমরা শুধু এতটুকুই বলতে পারি : 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। হে আমাদের পরোয়ারদিগার আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনিই আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।'

"আল-'ইকদ আল-ফারীদ" গ্রন্থকার ইবন 'আবদি রাব্বিহি বলেন : আহনাফের বক্তব্যের পর মানুষ সমাবেশ থেকে উঠে এদিক সেদিক চলে যায়। তারা তখন আহনাফের কথাই আলোচনা করছিল।। অতঃপর মানুষ ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার খলীফা হবার বিষয়ে বাই'আত গ্রহণ করে। সে সময় এক ব্যক্তিকে যখন বাই'আতের জন্য ডাকা হলো, সে বললো :

اللهمَّ أعوذ بك من شرِّ معاوية.

– 'হে আল্লাহ! আমি মু'আবিয়ার অনিষ্ট থেকে পানাহ্ চাই।'

সাথে সাথে মু'আবিয়া (রা) বলে ওঠেন :

تَعَوَّذْ من شَرِّ نَفْسِكَ، فإنه أشَرُّ عليكَ وَبايِعْ.

– 'তুমি তোমার অন্তরের অনিষ্ট থেকে পানাহ্ চাও। কারণ, তা তোমার জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। আর তুমি বাই'আত কর।'

লোকটি তখন বললো : 'আমি বাই'আত করছি। তবে আমি এ বাই'আতকে পছন্দ করিনে।' মু'আবিয়া (রা) তখন এ আয়াতটি পাঠ করেন :[২৮]

فَعَسى أنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

– 'হতে পারে তোমরা কোন জিনিস অপছন্দ কর, আর আল্লাহ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রাখেন।'[২৯]

তবে ইবন কুতায়বা বলেন, একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আহনাফ ও অন্যদের এসব

---

২৮. সূরা আন-নিসা'-১৯
২৯. জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২৪৬

বক্তৃতা-ভাষণের পর মু'আবিয়া (রা) তাঁর পুত্র ইয়াযীদের বাই'আতের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে ইসতিখারা করেন। অতঃপর বিষয়টি কিছু দিনের জন্য সম্পূর্ণ স্থগিত রাখেন। তারপর হিজরী ৫০ সনে তিনি মক্কায় এলে মক্কাবাসীরা তাঁর সাথে দেখা করতে আসে। তিনি তাঁর বাসভবনে একটু সুস্থির হয়ে বসার পর 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর ইবন আবী তালিব, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রকে (রা) ডেকে পাঠান। তাঁরা উপস্থিত হলে মু'আবিয়া (রা) দারোয়ানকে নির্দেশ দেন, এই লোকগুলো ভিতর থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে না। অতঃপর রুদ্ধদ্বার গৃহে মু'আবিয়া (রা) তাঁদের সাথে মতবিনিময় করেন। তারপর তিনি মক্কা ত্যাগ করেন এবং হিজরী ৫১ সন পর্যন্ত ইয়াযীদের বাই'আতের বিষয়টি নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি। ইবন কুতায়বা বলেন, হিজরী ৫১ সনে হযরত হাসানের (রা) ওফাতের অল্প কিছুদিন পর মু'আবিয়া (রা) ইয়াযীদের জন্য শামবাসীদের বাই'আত গ্রহণ করেন এবং খিলাফতের সকল অঞ্চলে তাঁর বাই'আত গ্রহণের নির্দেশ দেন।[৩০]

আহনাফের সত্যপ্রীতি ও স্পষ্টভাষিতার কারণে হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করতেন। অনেক বড় বড় আঞ্চলিক শাসক ও কর্মকর্তাকে তাঁর ইঙ্গিতে বরখাস্ত করতেন। 'উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ ছিলেন হযরত মু'আবিয়ার (রা) একজন অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি। উমাইয়্যা শাসনকে যাঁরা একটি মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। কিন্তু তাঁর কর্মপদ্ধতি আহনাফের পছন্দ ছিল না। হিজরী ৫৯ সনে 'উবায়দুল্লাহ আহনাফসহ কূফার একদল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সংগে করে শামে হযরত মু'আবিয়ার (রা) দরবারে আসেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) যথারীতি গভীর আবেগ ও আন্তরিকতার সাথে আহনাফকে স্বাগতম জানান এবং তাঁকে নিজের সাথে শাহী আসনে নিয়ে বসেন। বসরার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা 'উবায়দুল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মু'আবিয়ার (রা) সামনে তাঁর খুবই প্রশংসা করে। আহনাফের মত ছিল তাঁদের সবার বিপরীত। এ কারণে তিনি সম্পূর্ণ চুপ করে বসে থাকলেন।

হযরত মু'আবিয়া (রা) প্রশ্ন করলেন : আবূ বাহর! আপনি কিছু বলছেন না কেন? তিনি জবাব দিলেন : আমি বললে এই প্রতিনিধি দলের সবার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে। তাঁর একথা শুনে হযরত মু'আবিয়া (রা) তখনই 'উবায়দুল্লাহকে বরখাস্ত করেন। তিনি আগত বসরাবাসীদেরকে তাদের পছন্দমত একজন ওয়ালীর নাম প্রস্তাব করতে আহ্বান জানান। তারা প্রত্যেকেই হযরত মু'আবিয়াকে (রা) খুশী করার উদ্দেশ্যে উমাইয়্যা খান্দান ও শামীদের মধ্য থেকে কারো নাম প্রস্তাব করে। আহনাফ তখনও চুপ ছিলেন। কারো নাম প্রস্তাব করলেন না। হযরত মু'আবিয়া (রা) প্রস্তাবকারীদের নিকট জানতে চান, আপনারা কাকে নির্বাচন করলেন? যেহেতু তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী প্রস্তাব করেছিল, তাই কোন এক ব্যক্তির ব্যাপারে একমত হতে পারেনি। আহনাফ একেবারেই

---

৩০. প্রাগুক্ত-২/২৪৬-২৪৯

চুপ ছিলেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) বললেন, আপনি কিছু বলুন। তিনি এই প্রস্তাবকারীদের রূপ-প্রকৃতি দেখছিলেন। তাই তিনি মু'আবিয়াকে (রা) বললেন, যদি আপনি আপনার খান্দানের মধ্য থেকে কাউকে ওয়ালী বানাতে চান তাহলে আমি বরখাস্তকৃত 'উবায়দুল্লাহকেই অগ্রাধিকার দিব। আর যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে বানাতে চান তাহলে সেটা আপনার ইচ্ছা ও মর্জি। তাঁর একথা শুনে মু'আবিয়া (রা) 'উবায়দুল্লাহকে তাঁর স্বপদে বহাল করেন। তারপর আহনাফকে উপেক্ষা করার জন্য তিনি 'উবায়দুল্লাহকে ভীষণ তিরস্কার করেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর সাথে ভালো আচরণ করার প্রতি তাকিদ দেন।[৩১]

আল-আহনাফ একবার খলীফা হযরত মু'আবিয়ার (রা) দরবারে গেলেন। খলীফা তাঁকে নিজের পাশে বিছানার উপর বসতে ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু তিনি সেখানে না বসে মাটিতে বসলেন। খলীফা তখন প্রশ্ন করলেন : আহনাফ, আপনি বিছানায় বসলেন না কেন? আহনাফ বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! কায়স ইবন 'আসিম আল-মিনকারী তাঁর ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, আমি মূলতঃ তাই পালন করি। তিনি বলেছিলেন : 'রাজা-বাদশাদের নিকট এমন কিছু লুকোবে না যাতে পরে তোমাকে পস্তাতে হয়। তোমাকে ভুলে যায় এমন ভাবেও তাদেরকে ছেড়ে আসবে না। তাঁদের পাশে একই বিছানায় বা একই গদীর উপর বসবে না। এমন দূরত্বে বসবে যাতে তাঁদের ও তোমার মাঝে এক অথবা দু'জন মানুষ বসার জায়গা থাকে। কারণ, হতে পারে তোমাদের এ বৈঠক চলাকালে এমন কোন বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এসে গেল এবং তার জন্য তোমাকে স্থান ছেড়ে দিতে হলো। আর তেমন হলে আগন্তুক ব্যক্তিটির মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, আর তোমার হবে মর্যাদাহানি।' অতএব, হে আমীরুল মু'মিনীন, বসার জন্য এ স্থানই আমার উপযোগী। হতে পারে আমাদের এ বৈঠকে আপনার পাশে বসার বেশী উপযুক্ত লোক এসে যেতে পারেন। খলীফা তখন মন্তব্য করেন : 'বানূ তামীমকে জ্ঞান ও বিজ্ঞতা দান করা হয়েছে। আর সেই সাথে দান করা হয়েছে অলঙ্কারমণ্ডিত কথামালা।'[৩২]

একবার আহনাফ বসরার একটি প্রতিনিধি দলের সাথে মু'আবিয়ার (রা) দরবারে গেলেন। তাঁর সাথে নামির ইবন কুতবাও ছিলেন। নামিরের গায়ে ছিল কূফার কাতওয়ান নামক স্থানের 'আবা', আর আহনাফের গায়ে ছিল পশমের মোটা পোশাক। তাঁরা দু'জন মু'আবিয়ার (রা) সামনে দাঁড়ালে তিনি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকালেন। নামির তা বুঝতে পেরে বললেন : ওহে আমীরুল মু'মিনীন! 'আবা' আপনার সাথে কথা বলবে না। 'আবা'র মধ্যের মানুষটি আপনার সাথে কথা বলবেন। মু'আবিয়া (রা) ইশারায় তাঁকে বসতে বললেন। তারপর আহনাফের দিকে তাকিয়ে তাঁর বক্তব্য জানতে চাইলেন। আহনাফ বললেন :[৩৩]

---

৩১. আল-কামিল ফিত-তারীখ-৩/৪৩১

৩২. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৫৪; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/৪২৯

৩৩. আহমাদ আল-হাশিমী, যাহরুল আদাব-১/৫৭; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/৩৬৩-৩৬৪

يا أمير المؤمنين، أهل البصرة عدد يسير وعظم كسير مع تتابع من المحول، واتصال من الذحول، فالمكثر فيها قد أطرق، والمقل قد أملق، وبلغ منه المخنق، فإن رأى أمير المؤمنين أن يُنْعِشَ الفقير، ويُجْبرُ الكسِيْرَ ويسهِّلُ العسير ويصفح عن الذحول ويراوى المحول ويأمر بالعطاء ليكشف البلاء ويزيل اللأواء، وإن السيِّد من يَعُمَّ ولايَخُصَّ ومن يدعو الجفلي ولايدعو النقرى، إن أُحسن إليه شكر وإن أسئ إليه غفر، ثم يكون من وراء ذلك لرعيته عمادًا، يدفع عنهم الململت ويكشف عنه المعضلات. فقال له معاوية : هاهنا يا أبا بحر، ثم تَلاَ : "وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ."

– হে আমীরুল মু'মিনীন! বসরাবাসী সংখ্যায় অল্প এবং ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ ও ধারাবাহিক রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে ভগ্ন অস্থিবিশিষ্ট হয়ে গেছে। সেখানকার বিত্তশালীদের দৃষ্টি নত হয়ে গেছে এবং বিত্তহীনরা একেবারেই হত-দরিদ্র হয়ে পড়েছে। তারা কণ্ঠরোধ হবার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন চাইলে এই দরিদ্রদের প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনতে, ভাঙ্গা হাঁড়ের জোড়া লাগাতে, কঠিনকে সহজ, অভাব-দারিদ্রকে দূরীভূত, রক্ত-বদলার চিকিৎসা ও দানের নির্দেশ দিতে পারেন। তাহলে এই দুর্যোগ ও এই কঠিন সময় দূর হবে। নিশ্চয় নেতা তিনিই হন যার দান-অনুগ্রহ হয় সবার জন্য, বিশেষ কারো জন্য নয়। যাঁর আহ্বান হয় সবার জন্য, বিশেষ কারো জন্য নয়। যদি তাঁর প্রতি কোন অনুগ্রহ করা হয়, তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, আর যদি কোন খারাপ কিছু করা হয়, তিনি ক্ষমা করে দেন। তাছাড়া তিনি তাঁর অধীনস্তদের জন্য হন স্তম্ভস্বরূপ। তাদের বিপদ-মুসীবত প্রতিহত করেন এবং যাবতীয় জটিলতা দূর করেন। অতঃপর মু'আবিয়া (রা) আহনাফকে বলেন : আবূ বাহর, এখানে। তারপর তিনি সূরা মুহাম্মাদ-এর ৩০নং আয়াতটি পাঠ করেন।

– 'আপনি অবশ্যই তাদেরকে কথার ভঙ্গিতে চিনতে পারবেন।' তিনি আরো বলেন : ওহে আবূ বাহর, যথেষ্ট হয়েছে। আপনি উপস্থিত ও অনুপস্থিত সবার জন্য একাই যথেষ্ট।[৩৪]

একদিন মু'আবিয়া (রা) বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে বসে আছেন। আহনাফও তাঁদের মধ্যে একজন। এমন সময় শামের এক ব্যক্তি সেখানে এলো এবং দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলো। তাঁর বক্তৃতার শেষ কথাটি ছিল "'আলীর (রা) প্রতি লা'নাত বা অভিশাপ"। উপস্থিত লোকেরা চোখ তুলে লোকটির প্রতি তাকালো। কিন্তু আহনাফ উঠে দাঁড়িয়ে

৩৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৮৮

বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! লোকটি এই মাত্র কী বললো? নিশ্চয় 'আলীকে (রা) অভিশাপ দানের প্রতি আপনার সম্মতি আছে তাই সে অভিশাপ দিয়েছে। আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। 'আলীকে ছেড়ে দিন। তিনি তো আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। তিনি তাঁর কর্ম নিয়ে একাকী কবরে চলে গেছেন। আল্লাহর কসম! যতটুকু আমরা জানি, তিনি তাঁর সঙ্গীদের অতিক্রম করে গেছেন। তিনি ছিলেন পুতঃপবিত্র চরিত্রের, স্বচ্ছ অন্তঃকরণের ও বিরাট মুসীবতগ্রস্ত মানুষ।'

এতটুকু বলার পর মু'আবিয়া (রা) বলে উঠলেন : হে আহনাফ! আপনি ধুলোবালি থেকে বাঁচার জন্য চোখ বন্ধ করে রেখেছেন। তাই আপনি যা দেখেননি তাই বলছেন। আল্লাহর কসম! আপনি অবশ্যই মিম্বরের উপর উঠবেন এবং ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, অবশ্যই তাঁকে অভিশাপ দিবেন। আহনাফ বললেন : যদি আপনি ক্ষমা করেন তাহলে তো ভালো, আর যদি অভিশাপ দেওয়ার জন্য আমাকে জোর-জবরদস্তি করেন, তাহলে আল্লাহর কসম! আমার ঠোঁট দিয়ে তা বের হবে না। মু'আবিয়া বললেন : উঠুন, মিম্বরের উপর যান। আহনাফ বললেন : আল্লাহর কসম! আমি কথা ও কাজে আপনার প্রতি ন্যায়বিচার করবো। মু'আবিয়া বললেন : আমার প্রতি ন্যায়বিচার করলে আপনি কথা বলতে পারবেন না। আহনাফ বললেন : আমি মিম্বরে উঠে আল্লাহর হামদ ও ছানা ও রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করবো। তারপর বলবো : ওহে জনগণ! মু'আবিয়া আমাকে 'আলীর প্রতি অভিশাপ দানের নির্দেশ দিয়েছেন। আপনারা জেনে রাখুন, 'আলী ও মু'আবিয়া দু'জন মতবিরোধ সৃষ্টি করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই দাবী করেছেন, প্রতিপক্ষ তাঁর ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আমি যখন দু'আ করি, আপনারা সবাই আমীন বলবেন। আল্লাহ আপনাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন। তারপর আমি বলবো :

হে আল্লাহ! আপনি, আপনার ফেরেশতা মণ্ডলী, নবীগণ ও সমস্ত সৃষ্টি জগত এঁদের দু'জনের মধ্যে যে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন তাঁর প্রতি ও তার দলের প্রতি অভিশাপ দিন। আপনারা সবাই আমীন বলুন। আল্লাহ আপনাদের প্রতি করুণা করুন। হে মু'আবিয়া, আমি এর একটি হরফও কম-বেশী করবো না। তাতে যদি আমার জীবনও চলে যায়। মু'আবিয়া বললেন : ওহে আবূ বাহর! তাহলে আমি আপনাকে ক্ষমা করছি।[৩৫]

আহনাফ সিফফীন যুদ্ধে 'আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করেন। 'আলীর (রা) পরে মু'আবিয়া (রা) যখন খলীফা হলেন তখন একদিন আহনাফ তাঁর কাছে গেলেন। মু'আবিয়া (রা) আহনাফকে লক্ষ্য করে বললেন : আহনাফ! আল্লাহর কসম, আমি সিফফীনের দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে চাইনে। তবে কিয়ামত পর্যন্ত সেই ব্যথা আমার অন্তরে বিদ্যমান থাকবে।

---

৩৫. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৪/২৮-২৯; নিহায়াতুল আরিব-৭/২৩৭

জবাবে আহনাফ বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সব বিষয় পিছনের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চান কেন? আল্লাহর কসম! যে অন্তঃকরণগুলো দ্বারা আমরা আপনাকে ঘৃণা করেছিলাম তা আমাদের পাঁজরের মধ্যে এবং যে তরবারিগুলো দ্বারা আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম, সেগুলো আমাদের কাঁধে বিদ্যমান আছে। আপনি ধোঁকা ও প্রতারণার এক বিঘত লম্বা করলে আমরা দু'বাহু পরিমাণ তার চেয়ে খারাপ জিনিস লম্বা করবো। আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের অন্তরের এই পঙ্কিলতা আপনার ধৈর্য ও বিচক্ষণতার স্বচ্ছতার দ্বারা পরিচ্ছন্ন করতে পারেন। মু'আবিয়া বললেন : আমি তাই করবো। তারপর আহনাফ উঠে বের হয়ে গেলেন। মু'আবিয়ার (রা) বোন উম্মুল হাকাম পর্দার পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! এই লোকটি কে, যে আপনাকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে গেল? বললেন : এ সেই ব্যক্তি যে রেগে গেলে বানূ তামীমের এক লাখ মানুষ রেগে যায়– অথচ তাঁরা জানে না কী জন্য তারা রেগে যাচ্ছে। এ হচ্ছে আল-আহনাফ ইবন কায়স– বানূ তামীমের নেতা এবং আরবের একজন বিজয়ী বীর।[৩৬]

একবার হযরত মু'আবিয়া (রা) লোক পাঠিয়ে আনহাফকে দরবারে ডেকে আনলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : ওহে আবূ বাহর, সন্তানের ব্যাপারে আপনি কি বলেন? বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! তারা আমাদের হৃদয়ের ভালোবাসা ও পিছনে ঠেস দেওয়ার স্তম্ভ। আমরা তাদের জন্য সমতল ভূমি ও ছায়াদানকারী আকাশ। তারা যদি চায়, দিয়ে দিন, আর যদি রেগে যায়, খুশী করুন। তাহলে তারা তাদের ভালোবাসা আপনাকে দিবে। তাদের প্রতি কঠোর হবেন না। যদি কঠোর হন, তাহলে তারা আপনার জীবনকে নিরানন্দ করে ছাড়বে এবং আপনার মৃত্যুকে ভালোবাসবে। মু'আবিয়া বললেন : আল্লাহর কসম, হে আহনাফ! আপনি আমার অন্তরের কথা বলছেন। ইয়াযীদের উপর রাগে আমার অন্তর ভরে আছে। আপনি তা দূর করে দিয়েছেন। অতঃপর আহনাফ চলে গেলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে দেওয়ার জন্য দু'লাখ দিরহাম ও দু'শো কাপড় ইয়াযীদের কাছে পাঠালেন। ইয়াযীদ সেখান থেকে অর্ধেক নিজের জন্য রেখে দিয়ে অবশিষ্ট অর্ধেক আহনাফের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।[৩৭]

হযরম মু'আবিয়ার (রা) ওফাতের পর আহনাফ ইয়াযীদের খিলাফত মেনে নেন। হযরত ইমাম হুসায়ন (রা) যখন খিলাফতের দাবী নিয়ে ইয়াযীদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়ান তখন তিনি আহনাফের সাহায্য চেয়ে চিঠি লেখেন। তবে যতটুকু জানা যায় তাতে মনে হয় তিনি ইমামের আহ্বানে সাড়া দেননি। তিনি ইয়াযীদের বাই'আতের উপর অটল ছিলেন।

ইয়াযীদের মৃত্যুর পর যখন উমাইয়্যা খিলাফতের অভ্যন্তরে বিপ্লব ঘটে যায় এবং ইরাক থেকে উমাইয়্যা শাসন এক রকম উঠে যায়, তখন আহনাফ বসরাবাসীদের নেতৃত্ব দিতে

---

৩৬. ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-১/২৩০; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/১১৮
৩৭. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/৪৩৭

থাকেন। এরই প্রেক্ষিতে তাঁর গোত্র বানূ তামীম ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে কিছু ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং কিছুটা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের রূপ নেয়। আহনাফের চেষ্টায় তার নিষ্পত্তি হয়।[৩৮] তারপর ইরাক যখন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) অধীনে চলে যায় তখন আহনাফ তাঁর সহযোগী হয়ে যান। তাঁর সময়েও আহনাফের পূর্বের সম্মান ও মর্যাদা বহাল থাকে। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) ওয়ালীরা সবসময় তাঁর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শ করতেন এবং সেই মত কাজ করতেন। ইরাকে যখন খারিজীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং তা বসরা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে তখন আহনাফেরই উৎসাহে বিখ্যাত সেনানায়ক মহাব ইবন আবী সুফরাকে খারিজীদেরকে দমনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) খিলাফতকালে মুখতার আছ-ছাকাফী যখন ইরাক দখলের চেষ্টা চালায় তখন আহনাফ ইবন যুবায়রকে (রা) সাহায্যের অংশ হিসেবে মুখতারের প্রতিনিধি মুছান্নাকে ইরাক থেকে বের করে দেন।[৩৯] তারপরও ধীরে ধীরে যখন ইরাকে মুখতারের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তিনি ইবন যুবায়রের (রা) ভাই মুস'আব ইবন যুবায়রের (রা) সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুখতারের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

এ সময় 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) মূল প্রতিদ্বন্দ্বী উমাইয়্যা খলীফা আবদুল মালিক আহনাফকে তাঁর পক্ষে ভেড়ানোর জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি উমাইয়্যাদের ঘোরতর বিরোধী হয়ে গিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাঁর জবাব দেন। তিনি বলেন, ইবন যারকা' আমাকে শামীদের সাথে বন্ধুত্বের আহ্বান জানাচ্ছে। আল্লাহর কসম! আমি চাই আমার ও তাঁর মধ্যে আগুনের পাথর প্রতিবন্ধক হয়ে যাক। যাতে তাদের মানুষ এদিকে না আসতে পারে, আর আমার লোক সেদিকে না যেতে পারে।[৪০]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) ভাই কূফার ওয়ালী মুস'আব ইবন যুবায়রের সাথে আহনাফের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি মুস'আবের সাথে সাক্ষাৎ করতে কূফায় যান এবং সেখানে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলীর বর্ণনা মতে হিজরী ৭২ সনে তাঁর মৃত্যু হয়।[৪১] অনেকে বলেছেন, হিজরী প্রথম শতকের সাত-এর দশকের শেষ দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।[৪২]

শিক্ষা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে আহনাফ তাঁর যুগে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। তবে বিশিষ্ট সাহাবীদের সাহচর্যের সুযোগ লাভে ধন্য হয়েছিলেন। এ কারণে জ্ঞানের

---

৩৮. তারীখ আত-তাবারী-৮/৩১; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৬৮
৩৯. আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/২০৩
৪০. তাবাকাত-৭/৬৮
৪১. প্রাগুক্ত-৭/৬৯; শাযারাত আয-যাহাব-১/৭৮
৪২. ড: শাওকী দায়ফ-২/৪৩৩

জগতের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না এ কথা বলা যাবে না। 'উমার (রা), 'আলী (রা), 'উছমান (রা), সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (রা), আবূ যার (রা) প্রমুখ মহান সাহাবীর মুখ থেকে তিনি হাদীছ শোনেন এবং তাঁদের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাবি'ঈদের মধ্যে যাঁরা তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শুনে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে হাসান বসরী, আবুল 'আলা' ইবন শিখ্‌খীর, তালাক ইবন হাবীব প্রমুখ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। আরবী কবিতায়ও তাঁর ভীষণ দখল ছিল। মু'আবিয়া (রা) মাঝে মাঝে কবিতা নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করতেন।[৪৩]

জ্ঞান ও শিক্ষার জগতের তিনি তেমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি না হলেও তাঁর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্র ছিল কণ্টকাকীর্ণ রাজনীতির ময়দান। তিনি তাঁর সময়ের বড় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, চিন্তাশীল ও মহাজ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল, কোন মানব গোষ্ঠীতে আহনাফের চেয়ে ভদ্র মানুষ দেখা যায় না। তাঁর মৃত্যুর পর মুস'আব ইবন যুবায়র (রা) মন্তব্য করেন, আজ বিচক্ষণতা ও সঠিক সিদ্ধান্তের সমাপ্তি ঘটলো।[৪৪] বিভিন্ন উক্তি ও বাণীর মধ্যে তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এসব উক্তি ও বাণীর কিছু কিছু প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। তাঁর হিল্‌ম (প্রজ্ঞা) মু'আবিয়ার (রা) 'হিলম-এর সাথে তুলনা করা হতো এবং তা প্রবাদতুল্য ছিল। এ কারণেই 'আহলাম মিন আল-আহনাফ' উক্তিটির প্রচলন হয়।[৪৫]

সাধারণভাবে দেখা যায়, অসাধারণ বুদ্ধি, জ্ঞান ও চিন্তা-অনুধ্যানের সাথে যুহ্‌দ ও তাকওয়া এবং 'ইবাদত-বন্দেগীর সহ-অবস্থান খুব কম হয়। কিন্তু আহনাফ সে স্তরের চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন, ঠিক একই রকম যুহ্‌দ ও তাকওয়াও তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর 'ইবাদত-বন্দেগীর বিশেষ সময় ছিল রাতের অন্ধকার। পৃথিবীর সব মানুষ যখন ভোগ-বিলাস ও সুখ-স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেত তখন তিনি রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে বিনয়াবনত হয়ে দাসত্বের ঘোষণা দিতেন। রাতের অন্ধকারে মুহাসাবায়ে নফ্‌স বা আত্মসমালোচনা করতেন। নিজের কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করতেন।

আল-আহনাফ ছিলেন একজন বড় ধরনের 'আবিদ ব্যক্তি। খুব বেশী বেশী সালাত আদায়কারী ও সাওম পালনকারী। দুনিয়ায় মানুষের হাতে যা আছে তেমন সবকিছুর প্রতি তিনি ছিলেন নির্মোহ ও নিরাসক্ত। রাতের অন্ধকার নেমে এলে বাতি জ্বালিয়ে পাশেই রাখতেন। তারপর নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আল্লাহর গজব ও আজাবের ভয়ে রোগগ্রস্ত মানুষের মত প্রলাপ বকতেন এবং পুত্রহারা পিতার মত হাউমাউ করে কাঁদতেন। যখনই তিনি নিজের কোন পাপের কথা, অথবা নিজের কোন দোষের কথা বুঝতে পারতেন তখনই নিজের একটি আঙ্গুল বাতির আগুনের একেবারে কাছে নিয়ে বলতেন : হে

---

৪৩. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/৪৬২; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১/১৯১

৪৪. তাবাকাত-৭/৬৭; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১/১৯১

৪৫. আল-জাহিজ, কিতাব আল-হায়ওয়ান-২/৭২; আল-মায়দানী, মাজমা' আল-আমছাল-১/২২৯-২৩০; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৪/৭৯

আহনাফ! আগুনের পোড়ার এ কষ্ট অনুভব কর। অমুক দিন অমুক কাজটি করতে কে তোমাকে উৎসাহিত করেছিল? ওহে আহ্নাফ! তোমার ধ্বংস হোক! আজ এই বাতির শিখার গরম যদি তুমি সহ্য করতে না পার তাহলে আগামীকাল জাহান্নামের অগ্নিশিখার তাপ সহ্য করবে কিভাবে? আর কিভাবেই বা তখন ধৈর্য ধারণ করবে? হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কারণ, তুমি তার উপযুক্ত। আর যদি আমাকে শাস্তি দাও তাহলে আমি তারই উপযুক্ত।[৪৬]

বার্দ্ধক্যের দুর্বলতার সময় যখন সিয়াম পালনের শক্তি যেতে বসেছিল তখন একদিন যায়দ নামের এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে বলেন, আপনি খুবই শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন এবং রোযা আপনাকে আরো দুর্বল করে ফেলবে। জবাবে তিনি বলেন, আমি আমার এই দেহকে একটি দীর্ঘ সফরের জন্য প্রস্তুত করছি।

কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণ। কখনো একাকী হলেই কুরআন খুলে বসে যেতেন। এত সব 'ইবাদত-বন্দেগীর উপরও তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল না। তাই তিনি আল্লাহর কাছে আরজ করতেন এই বলে : হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও তাহলে সেটা হবে তোমার করুণা। আর যদি আমাকে শাস্তি দাও, তাহলে আমি তা লাভ করার যোগ্য।

তাহারাত বা পাক-পবিত্রতার ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, তীব্র থেকে তীব্রতর ঠাণ্ডার মওসুমেও তায়াম্মুম করতেন না। বরফ জমা ঠাণ্ডা পানিও ব্যবহার করতেন। খুরাসান অভিযানকালে এক রাতে গোসলের প্রয়োজন দেখা দেয়। ঠাণ্ডার মওসুম ছিল, খুরাসানের সেই রাতটি ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডার। আহনাফ কোন চাকর-বাকর বা সৈনিকের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালেন না। তিনি তখনই একাকী নির্জন রাতে পানির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তায় ছিল কাঁটা ওয়ালা ঝোপ-ঝাড়। তিনি সেগুলো পায়ে মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যান। কাঁটার খোঁচায় তার পা দু'টো রক্তে ভিজে যায়। শেষমেষ, একটি বরফপিণ্ডের গোঁড়ায় পৌঁছেন এবং সেখান থেকে বরফ ভেঙ্গে বরফ মিশ্রিত পানি দিয়ে সেখানে গোসল করেন।

তিনি অত্যন্ত সত্যভাষী ও সত্যপ্রিয় মানুষ ছিলেন। শাসক ও আমীর-উমারার সামনেও তাঁর জিহ্বা সত্য প্রকাশে বিরত থাকতো না। ইয়াযীদের বাই'আতের বিষয়ে তাঁর স্পষ্টবাদিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকবার কোন এক বিতর্কিত বিষয়ে তাঁকে চুপ থাকতে দেখে হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বলেন : আবূ বাহর! আপনিও কিছু বলুন। তিনি মুখ খুললেন। বললেন : আমি আর কী বলবো। যদি মিথ্যা বলি তাহলে আল্লাহর ভয়। আর যদি সত্য উচ্চারণ করি তাহলে আপনাদের ভয়।[৪৭]

ধৈর্য ও সহনশীলতা ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'আল্লামা ইবন হাজার লিখেছেন, তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য অনেক। তাঁর বিচক্ষণতা ছিল প্রবাদতুল্য। কিন্তু তিনি সব সময় বিনয়ের

---

৪৬. তাবাকাত-৭/৬৭
৪৭. প্রাগুক্ত-৭/৬৭, ৬৮

সাথে বলতেন, প্রকৃতপক্ষে আমি কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি নই। বরং বিচক্ষণতার ভান করি।[৪৮]

আহ্নাফের এমন কিছু মূলনীতি ছিল যা প্রত্যেক মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য। তিনি বলতেন, আমি তিনটি কাজ করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে থাকি। সময় হয়ে গেলে নামায আদায়ে, মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনে এবং পাত্র পাওয়া গেলে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে।

আল-আহ্নাফ একজন দক্ষ ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, তাঁর দক্ষতা ও সাহসিকতার অনেক কাহিনী ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়। মুহাম্মাদ ইবন সীরীন বর্ণনা করেছেন। খলীফা 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) আল-আহ্নাফ ইবন কায়সকে একটি বাহিনী সহকারে খুরাসানে পাঠালেন। একদিন রাতে শত্রু বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ করে আল-আহ্নাফের বাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। তারপর শত্রু বাহিনী রণ দামামা বাজাতে বাজাতে তাঁর বাহিনীর উপর হামলা চালায়। মুসলিম বাহিনী ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়লো। এ অবস্থায় আল-আহ্নাফ কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে ঘোড়ার উপর চড়ে বসলেন এবং দামামার শব্দ যেদিক থেকে আসছিল, কবিতার একটি শ্লোক গুন গুন করে আওড়াতে আওড়াতে সেদিকে চললেন। তারপর যে সৈনিকটি দামামা বাজাচ্ছিল হঠাৎ তার উপর আক্রমণ চালিয়ে তাকে হত্যা করেন। দামামার শব্দ থেমে যাওয়ায় শত্রু বাহিনী প্রমাদ গোনে এবং ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এদিক সেদিক পালাতে আরম্ভ করে। তারপর অন্য একটি অশ্বারোহী বাহিনীর উপর হামলা চালিয়ে ধরাশায়ী করে ফেলেন। এসবই কিন্তু আল-আহ্নাফ একা করেন। তারপর তাঁর সৈন্যরা এগিয়ে আসে এবং শত্রু বাহিনী পালাতে থাকে। তখন আল-আহ্নাফের বাহিনী তাদেরকে ধাওয়া করে হত্যা করতে থাকে। এ অভিযানে তিনি যে শহরটি জয় করেন তার নাম 'মারব আর-রোয'।[৪৯]

আল-আহ্নাফ ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল মানুষ। তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা তৎকালীন আরবে প্রবাদে পরিণত হয়। তাঁর ধৈর্যের অনেক গল্প-কাহিনী আরব ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। যেমন একবার 'আমর ইবন আল-আহ্তাম তাঁকে অশ্লীল ভাষায় অশালীন গালিগালাজ করার জন্য এক ব্যক্তিকে উৎসাহিত করলো। লোকটি তাঁকে তাঁর মান-সম্মানের উপর আঘাত করে নোংরা ভাষায় লাগি দিতে থাকলো। কিন্তু আহ্নাফ নীরবে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে গালি শুনতে লাগলেন। একটি কথারও জবাব দিলেন না। লোকটি যখন দেখলো, তিনি তার কথায় কোন রকম বাধা দিচ্ছেন না এবং কোন প্রত্যুত্তরও করছেন না তখন সে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়াতে কামড়াতে বলতে লাগলো : হায়রে দুঃখ! আল্লাহর কসম! আমি তাঁর কাছে এত তুচ্ছ ও হেয় যে, আমার এ অশালীন গালির কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছেন না।[৫০]

---

৪৮. তাবাকাত-৭/৬৭; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/২৭৭

৪৯. 'উয়ুন আল-আখবার-১/২০৯

৫০. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৪৬৫

আরেকবার তিনি বসরার একটি নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। এমন সময় একটি লোক কোথা থেকে এসে তাঁর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তাঁকে অশালীন ভাষায় গালাগালি করতে লাগলো। তিনি চুপ করে পথ চলতে লাগলেন। যখন তারা মানুষের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন তখন তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন : ভাতিজা, তোমার গালির যদি আরো কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি বলে ফেল। তা না হলে আমার গোত্রের লোকেরা শুনে ফেললে তোমার পরিণতি মোটেই ভালো হবে না।[৫১]

একবার জনৈক ব্যক্তি আহনাফকে প্রশ্ন করলো : আপনি এমন ধৈর্য ও সহনশীলতা কার কাছ থেকে শিখলেন? বললেন : কায়স ইবন 'আসিম আল-মিনকারীর কাছ থেকে। একদিন আমি তাঁকে দেখলাম, তাঁর বাড়ীর আঙ্গিনায় তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে গোত্রের লোকদের সাথে কথা বলছেন। এমন সময় হাত পিছন দিক থেকে বাঁধা এক ব্যক্তি ও একজন নিহত ব্যক্তির লাশ আনা হলো। তাঁকে বলা হলো : আপনার এই ভাতিজা আপনার এই ছেলেকে হত্যা করেছে। আল্লাহর কসম! তিনি তাঁর স্থান থেকে একটুও নড়লেন না এবং কথা বলাও বন্ধ করলেন না। এক সময় কথা শেষ করে ভাতিজার দিকে তাকিয়ে বললেন : ভাজিতা! পাপ করেছো এবং তোমার নিজের ধনুক দিয়ে নিজের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেছো। তোমার চাচাতো ভাইকে তুমি হত্যা করেছো। তারপর তিনি নিজের আরেক ছেলেকে বললেন : যাও, তোমার ভাইকে কবর দাও, তোমার চাচাতো ভাইয়ের বাঁধন খুলে দাও এবং নিহত ছেলের রক্তমূল্য হিসেবে তার মাকে এক শো উট দিয়ে দাও।[৫২]

একবার এক ব্যক্তি আহনাফকে প্রশ্ন করলো : আপনার গোত্রের নেতৃত্ব আপনি লাভ করলেন কিভাবে– আপনি তো তাদের সবচেয়ে মর্যাদাবান ঘরের লোক নন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুদর্শন নন এবং আচার-আচরণ ও নৈতিকতায় তাদের মধ্যে উত্তমও নন? উত্তরে আহনাফ বললেন : ভাতিজা! তোমার মধ্যে যা আছে তার বিপরীত জিনিস দ্বারা। লোকটি প্রশ্ন করলো : সেটা কি? বললেন : তোমার এমন সব বিষয় যা আমার কোন প্রয়োজন নেই তা পরিহার দ্বারা। যেমন আমার যে বিষয় তোমার কোন প্রয়োজন নেই তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছো।[৫৩]

ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন, তিনি নেতৃস্থানীয় তাবি'ঈদের মধ্যে ছিলেন। তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধির উপমা দেওয়া হতো। হাসান বসরী (রহ) বলতেন, আমি কোন সম্প্রদায়ের সবচেয়ে ভদ্র লোকটিকে আহনাফের চেয়ে বেশী ভালো পাইনি। তিনি একাধিক খলীফার শাসনকাল পেয়েছেন। তাঁদের কোন একজন খলীফা জনৈক ব্যক্তির কাছে আহনাফের গুণাবলী জানতে চান। জবাবে লোকটি বলে, যদি আপনি একটি গুণ শুনতে চান, আমি

---

৫১. 'উয়ূন আল-আখবার-১/৩৩১
৫২. প্রাগুক্ত-১/৩৩০
৫৩. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/২৮৬

তাই বলবো। আর দু'টি শুনতে চাইলে দু'টি এবং তিনটি চাইলে তিনটি গুণ বলবো। খলীফা বললেন, তুমি দু'টি বলো। তখন লোকটি বললো, তিনি ভালো করতেন, ভালোকে পছন্দ করতেন। মন্দ থেকে দূরে থাকতেন এবং মন্দকে ঘৃণা করতেন। খলীফা বললেন, আচ্ছা তুমি তাঁর তিনটি গুণ বলো। লোকটি বললো, তিনি কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। কারো উপর বাড়াবাড়ি ও যুলুম করতেন না এবং কাউকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতেন না। খলীফা বললেন, তাঁর একটি গুণের কথা বলো। সে বললো, তিনি তাঁর নিজের উপর সবচেয়ে বড় শাসক ছিলেন।[৫৪]

আহনাফ বলতেন : যখনই কোন বিষয়ে কেউ আমার সাথে পাল্লা দিয়েছে, আমি তিনটি পদ্ধতিতে তাকে হারিয়ে দিয়েছি। (১) সে যদি আমার চেয়ে উপরের স্তরের হয় তাহলে আমি তার মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। (২) আমার চেয়ে নীচের স্তরের হলে আমি আমার নিজকে সম্মান করেছি। (৩) আর আমার সমকক্ষ হলে নিজেকে তার উপর প্রাধান্য দিয়েছি।[৫৫]

খালিদ ইবন সাফওয়ান বলেছেন : আল-আহনাফ মর্যাদা থেকে পালাতেন, আর মর্যাদা তাঁর পিছু ধাওয়া করতো। আল-আসমা'ঈ বলেছেন, একবার আল-আহনাফ ও আল-মুনযির ইবন আল-জারূদ মু'আবিয়ার (রা) দরবারে যান। আল-মুনযির ভিতরে যাওয়া-আসা করতেন লাগলো; কিন্তু আহনাফ দরবারের শেষ প্রান্তে মোটা পশমের চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে থাকেন। যখনই আল-মুনযির এদিক ওদিক যাচ্ছিল, লোকেরা বলাবলি করছিল যে, ইনিই আল-আহনাফ। এক সময় আল-মুনযির বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলো : মনে হচ্ছে আমি যেন এই শায়খ (আল-আহনাফ)-এর অলঙ্কারে পরিণত হয়েছি।[৫৬]

তাঁর গোত্রের ফারগানা বিন্‌ত আওস ইবন হাজার নাম্মী এক মহিলা একবার আল-আহনাফের করবের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, কবরের কাছাকাছি তাঁর বাহনটি দাঁড় করিয়ে মৃত আহনাফকে লক্ষ্য করে যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন তাতে আল-আহনাফের সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন : 'নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। কাফনে জড়িয়ে কবরে রক্ষিত আবূ বাহরের প্রতি আল্লাহ দয়া ও করুণা করুন! সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনার বিচ্ছেদ দ্বারা আমাদেরকে পরীক্ষা করেছেন এবং আপনার মৃত্যুর দিনে আমাদেরকে তা জানিয়েছেন। আপনি জীবনকালে প্রশংসিত হয়েছেন এবং মৃত্যুর পরেও আপনি মানুষের স্মরণে আছেন। আপনি ছিলেন দারুণ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান, মহান শান্তিপ্রিয়, উঁচু স্তম্ভ, হিংসার আগুন নির্বাপনকারী ও নারীর সম্ভ্রম রক্ষাকারী ব্যক্তি। আপনি সভা-সমাবেশে অত্যন্ত ভদ্র, বিধবা ও অসহায় লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল, মানুষের অতি নিকটবর্তী,

---

৫৪. প্রাগুক্ত-২/২৭৮; শাযারাত আয-যাহাব-১/৭৮

৫৫. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-২/২৮৩

৫৬. 'উয়ূন আল-আখবার-১/২৬১-২৬২

তাদের মধ্যে অতি সাধারণ– যদিও আপনি তাঁদের নেতা। খলীফা ও আমীর-উমারাদের দরবারে আপনি প্রতিনিধি দলের নেতা। তাঁরা আপনার কথার শ্রোতা ও আপনার সিদ্ধান্তের অনুসরণকারী; এরপর তিনি চলে যান।[৫৭]

তিনি বলতেন : কারো মধ্যে চারটি গুণ থাকলে সে পূর্ণ মানুষে পরিণত হয়। আর যার মধ্যে চারটির একটি থাকে সে তার কাওম বা সম্প্রদায়ের অন্যতম কর্মশীল ব্যক্তিতে পরিণত হয়। (১) দীন– যা তাকে পরিচালিত করে। (২) বুদ্ধিমত্তা– যা তাকে ঠিক পথে চালায়। (৩) বংশ মর্যাদা– যা তাকে পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করে। (৪) লজ্জা-শরম– যা সে সব সময় অবলম্বন করে।

তিনি আরো বলতেন : একজন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি চারটি অবস্থার মধ্যে থাকে। (১) আরেকজন ঈমানদার তাকে হিংসা করে। (২) একজন মুনাফিক (কপট ধার্মিক) তার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। (৩) কাফির তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। (৪) শয়তান তাকে বিপথে চালিত করার চেষ্টা করে।

তিনি বলতেন : মিথ্যাবাদীর কোন ব্যক্তিত্ব নেই। কৃপণের কোন নেতৃত্ব নেই এবং অসচ্চরিত্র ব্যক্তির কোন খোদাভীতি নেই।[৫৮]

তিনি আরো বলতেন : নিরানন্দ ব্যক্তির কোন বন্ধু নেই, মিথ্যাবাদীর কোন কথার ঠিক নেই, হিংসুকের কোন শান্তি নেই।[৫৯]

তিনি বলতেন : আমি ধৈর্যকে বহু মানুষের চেয়ে বেশী সাহায্যকারী পেয়েছি।[৬০]

খুরাসানে অবস্থানকালে একবার আল-আহনাফ বানূ তামীমকে উদ্দেশ্য করে একটি ভাষণ দেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ :

'ওহে বানূ তামীম, তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাস তাহলে তোমাদের নেতৃত্ব অটুট থাকবে, তোমাদের অর্থ-বিত্ত একে অপরের জন্য ব্যয় কর, তাহলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে, তোমরা তোমাদের পেট ও যৌনাঙ্গের বিরুদ্ধে জিহাদের দ্বারা জিহাদের সূচনা কর, তাহলে তোমাদের দীন ঠিক থাকবে, আর কোন কিছু অত্মসাৎ করবে না। তাহলে তোমাদের জিহাদ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকবে।[৬১]

একবার আহনাফকে প্রশ্ন করা হলো : সবচেয়ে ভালো পানীয় কী? বললেন : মদ। প্রশ্ন করা হলো : কিভাবে জানলেন? বললেন : আমি দেখেছি, যাদের জন্য এটা হালাল আছে তারা এটা ছেড়ে অন্যটার দিকে যায় না। আর যাদের জন্য এটা হারাম, তারা এর চারপাশে শুধু ঘুর ঘুর করে।[৬২]

---

৫৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৩০২
৫৮. প্রাগুক্ত-২/১৯৬, ১৯৭, ১৯৯
৫৯. প্রাগুক্ত-২/৬৩; 'উয়ূন আল-আখবার-২/১০
৬০. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/২৮৩
৬১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৯৩
৬২. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৬/৩৩৫

তিনি বলতেন : আরবরা ততদিন পর্যন্ত আরব থাকবে যতদিন তারা পাগড়ী পরবে, তরবারি কাঁধে ঝোলাবে, সহনশীলতাকে অপমান বলে গণ্য করবে না এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানকে হেয় কাজ বলে মনে করবে না।[৬৩]

আল-আহনাফ ছিলেন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী কঠোর মানুষ।[৬৪] তিনি বলতেন, যার একটি কথা শুনে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে সে বহু কথা শোনে। একবার এক ব্যক্তি তাঁর সামনে 'হায়া' বা লজ্জার বেশ প্রশংসা করে। তার কথা শেষ হলে আল-আহনাফ বললেন : এটা শেষ পর্যন্ত দুর্বলতার রূপ নেয়। আর একটা ভালো কখনো একটা মন্দের কারণ হতে পারে না। আমরা বরং বলি : একটি নির্ধারিত পরিমাণের নাম 'হায়া'। আর পরিমাণের বেশী হয়ে গেলে তাকে তুমি যা ইচ্ছা নাম দিতে পার। এমনিভাবে দানশীলতা, বিচক্ষণতা, ভীরুতা, বীরত্ব, কৃপণতা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য।[৬৫]

হযরত 'উমার (রা) একবার আল-আহনাফকে লক্ষ্য করে বলেন : যার হাসি বেশী হয় তার গাম্ভীর্য কমে যায়। কেউ কোন কিছু বেশী করলে সে নামে সে পরিচিত হয়। যার মধ্যে কৌতুক ও হাস্য-রসিকতা বেশী হয়ে গেছে তার পতন ঘটেছে। যার বেশী পতন ঘটেছে তার তকাওয়া বা খোদাভীরুতা কমে গেছে। যার খোদাভীরুতা কমে গেছে তার লজ্জা-শরম চলে গেছে। আর যারা লজ্জা-শরম চলে গেছে তার 'কলব' বা অন্তঃকরণের মৃত্যু ঘটেছে।[৬৬]

---

৬৩. 'উমার ফারূক-১/৩৪৬
৬৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৯৮
৬৫. প্রাগুক্ত-১/২০২, ২/৭৬; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/২৭৯, ৪/৪১৫
৬৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/১৮৮

উওয়াইস ইবন 'আমির আল-কারানী (রহ)

হযরত উওয়াইস ইবন 'আমির আল-কারানীর জন্মস্থান ইয়ামন। তিনি তথাকার মুরাদ গোত্রের সন্তান ছিলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে না দেখেই 'খায়রুত তাবিঈন'[১] (তাবিঈদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো) বলে উল্লেখ করেন। তাঁর পিতার নাম 'আমির ইবন জাযআ।[২] রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় তিনি একজন পূর্ণ বয়স্ক ও ঈমানদার মানুষ হিসেবে বিদ্যমান থাকলেও নবী কারীমের (সা) সাথে মুখোমুখি সাক্ষাতের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত থেকে যান। চোখের দেখা না হলেও তিনি রাসূলে খোদার 'ইশ্‌ক ও মুহাব্বতে একেবারে বিভোর হয়ে পড়েন। তাঁর এ 'ইশ্‌ক ও মুহাব্বত প্রবাদতুল্য হয়ে যায় এবং তিনি জগতের সকল রাসূল-প্রেমীদের নেতায় পরিণত হন। আসলে জাহিরী জগত ও বাতিনী জগত দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। জাহিরী জগতের নিয়ম-কানুন বাতিনী জগতের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। 'ইশ্‌ক ও মুহাব্বত সম্পূর্ণ বাতিনী বিষয়। এর জন্য চাক্ষুস দেখা-সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন পড়ে না। দূরত্ব ও প্রতিবন্ধকতা এ ক্ষেত্রে কোন বিষয় নয়। বাতিনী বন্ধন হাজার মাইলের দূরত্বকেও নৈকট্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলার ক্ষমতা ও আকর্ষণের শক্তিই হলো মূল বিষয়। যেমন, সূর্য কোটি কোটি মাইল দূর থেকেও এ পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুকে আলোড়িত ও আলোকিত করে, শিশির বিন্দু উড়ে এসে সূর্যের তাপে নিজেকে বিলীন করে দেয় এবং বাগিচার ফুল বহু দূর থেকে বিভিন্ন পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকাকে সুরভিত করে তোলে। একই নিয়মে হযরত উওয়াইসও মাদানী সূর্যের কিরণে আলোকিত হয়ে ওঠেন এবং মদীনার বসন্ত ফুলের সৌরভে সুরভিত হয়ে পড়েন। এ কারণে তিনি ইয়ামনে অবস্থান করলেও তাঁর প্রেম-প্রবাহ মদীনা পর্যন্ত বহমান ছিল।

এ কোন কবিত্ব নয়; বরং বাস্তব সত্য। তাই হযরত রাসূলে কারীম (সা) এই না দেখা 'ইশ্‌ক ও মুহাব্বতের পতঙ্গের আলামত ও চিহ্ন একটি একটি করে হযরত 'উমারকে (রা) বলে যান। সাহীহ মুসলিমে এসেছে : 'সর্বোত্তম তাবিঈ মুরাদ গোত্রের এক ব্যক্তি। তাঁর নাম উওয়াইস। সে ইয়ামনে তোমাদের সাহায্যে আসবে। তার শরীরে শ্বেতীর দাগ আছে। এ দাগ সবটুকু মুছে গিয়ে এক দিরহাম পরিমাণ অবশিষ্ট আছে। তার মাও জীবিত আছে। সে তার সেবা করে। যখন সে আল্লাহর নামে কসম করে তখন তা পূর্ণ করে। যদি তুমি তার দু'আয়ে মাগফিরাত (ক্ষমার জন্য দু'আ) অর্জন করতে পার তাহলে তা করবে।[৩]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) এ বর্ণনার পর থেকে হযরত 'উমার (রা) সব সময় উওয়াইসের সন্ধানে ছিলেন। অতঃপর তাঁর খিলাফতকালে যখন ইয়ামন থেকে একটি

---

১. হায়াতুস সাহাবা- ৩/৩৩৩-৩৩৪
২. আল ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা- ১/১১৫
৩. সাহীহ মুসলিম : কিতাবু ফাদাইল আস-সাহাবা- (২৫৪২); মুসনাদে আহমাদ- ১/৩৮; হায়াতুস সাহাবা- ৩/৩৩৩-৩৩৪

প্রতিনিধিদল এলো, তিনি তার অভ্যাস অনুযায়ী তাদেরকে প্রশ্ন করলেন : আপনাদের মধ্যে কি উওয়াইস ইবন 'আমির আছেন? তারা বললো : হ্যাঁ, আছেন। তারপর উমার (রা) খুঁজতে খুঁজতে ইয়ামনে উওয়াইসের কাছে পৌছেন। তাঁকে প্রশ্ন করেন : আচ্ছা, আপনি উওয়াইস ইবন 'আমির? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

'উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন : আপনার মা কি বেঁচে আছেন? বললেন : হ্যাঁ। এই পরিচয়টুকু জানার পর হযরত 'উমার (রা) তাঁকে বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলে গেছেন, তোমার নিকট ইয়ামনীদের সাহায্যের সাথে মুরাদ ও কারন গোত্রদ্বয়ের এক ব্যক্তি উওয়াইস ইবন 'আমির আসবে, যার শরীরে শ্বেতীর দাগ থাকবে। তবে এক দিরহাম পরিমাণ ছাড়া সবটুকু মুছে যাবে। তার মা থাকবে এবং তার সাথে সে সদাচরণ করবে। যখন সে আল্লাহর নামে কসম খায় তখন সে তা পূর্ণ করে। যদি তুমি তার দু'আয়ে মাগফিরাত নিতে পার তবে তা নিবে। আপনি আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন।

উওয়াইস বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার মত মানুষ আপনার মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করবে? 'উমার আবার তাঁকে দু'আ করার অনুরোধ করেন। উওয়াইস বলেন : হে আল্লাহ, আপনি 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে ক্ষমা করে দিন। 'উমার বলেন : আজ থেকে আপনি আমার ভাই। আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না। তারপর 'উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : আপনি কোথায় যেতে চান? বললেন : কূফায়। 'উমার (রা) বললেন! আমি কূফার ওয়ালীকে আপনার ব্যাপারে লিখে জানিয়ে দিচ্ছি। উওয়াইস বললেন : তার কোন প্রয়োজন নেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকা আমার বেশী প্রিয়।

এ ঘটনার এক বছর পর কূফার একজন সম্মানিত ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসলেন। হযরত 'উমার (রা) তাঁর নিকট উওয়াইসের বিষয়ে জানতে চাইলেন। তিনি জানালেন, উওয়াইস নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় একটি ঝুপড়ি ঘরে বসবাস করেন। হযরত 'উমার (রা) তখন সেই ব্যক্তির নিকট উওয়াইস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী বর্ণনা করলেন। এই ব্যক্তি কূফায় ফিরে গেলেন এবং উওয়াইসের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর নিকট দু'আয়ে মাগফিরাত প্রার্থনা করেন। জবাবে তিনি বললেন, আপনি একটি পবিত্র সফর থেকে সবেমাত্র ফিরে এসেছেন, তাই আপনিই আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'উমারের (রা) সাথে কি আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে? লোকটি বললেন : হ্যাঁ। এই সংলাপের পর উওয়াইস সেই লোকটির জন্য দু'আ করেন।[৪]

হযরত উওয়াইস (রহ) নিজেকে দুনিয়াবাসীর চোখ থেকে লুকোবার জন্য খুবই দীন-হীনভাবে থাকতেন। অধিকাংশ সময় সম্পূর্ণ শরীর ঢাকার জন্য সবটুকু কাপড় তাঁর গায়ে থাকতো না। নগ্নদেহ দেখে মানুষ তাঁর দেহ কাপড় দিয়ে ঢেকে দিত। স্থূল দৃষ্টির সাধারণ মানুষ তাঁর বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাঁকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতো এবং তাঁকে নানাভাবে

---

৪. প্রাগুক্ত; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ৪/২২-২৩; 'আসরুত তাবি'ঈন- ৪৪৫; আল-'ইক্দ আল ফারীদ- ৩/৩৯৮

বিরক্ত করতো।[৫]

তবে সূক্ষ্মদৃষ্টির মানুষের দৃষ্টি থেকে তিনি লুকোতে পারেননি। তাঁর রূহানিয়্যাতের সুরভিতে মোহিত হয়ে মানুষ পাগলের মত তাঁর নিকট ছুটে এসেছে। হারাম ইবন হায়্যান (রহ) ছিলেন তাঁরই সমকালীন একজন সত্যিকার অন্তরবিশিষ্ট তাবি'ঈ। তাঁর ও উওয়াইসের মাঝে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা খোদ হারামই বর্ণনা করেছেন, যা সত্যিই শোনার উপযুক্ত।

তিনি বলেন, আমি উওয়াইস কারানীর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কূফা গেলাম। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে ফুরাতের তীরে পৌছলাম। সেখানে দেখলাম একটি লোক দুপুরের সময় একাকী বসে ওজু করছে এবং কাপড় ধুচ্ছে। আমি উওয়াইসের গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা শুনেছিলাম। এ কারণে খুব তাড়াতাড়ি তাকে চিনে ফেললাম। তিনি ছিলেন স্থূলদেহী ও গৌর বর্ণের। লোমশ শরীর, মাথা মুড়ানো, ঘন দাড়ি বিশিষ্ট মানুষ। পশমের একটি মোটা পায়জামা ও একটি চাদর শরীরে শোভা পেত। চেহারা ছিল একটু বড় ও ভীতিপ্রদ। নিকটে পৌছে আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমি মুসাফাহা (করমর্দন) করার জন্য হাত বাড়ালাম। তিনি মুসাফাহা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আল্লাহ্ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন— তিনি আবার একথাটি উচ্চারণ করলেন। আমি বললাম, উওয়াইস! আল্লাহ্ আপনার প্রতি করুণা করুন এবং আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনার এ কি অবস্থা হয়েছে। 'ইশ্ক ও মুহাব্বতের চূড়ান্ত পরিণতিতে তাঁর বাহ্যিক অবস্থা দেখে আমার চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে আসে। আমাকে কাঁদতে দেখে তিনিও কাঁদতে লাগলেন। তারপর আমাকে বললেন, হারাম ইবন হায়্যান! আল্লাহ্ আপনার প্রতি করুণা করুন! আমার ভাই, আপনি কেমন আছেন? আপনাকে আমার ঠিকানা কে বলেছেন? আমি বললাম : আল্লাহ্। আমার এ জবাব শুনে তিনি বললেন :

لا إله إلا الله سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا حين سماني.

- এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই। আমাদের প্রভু কতনা পবিত্র। আমাদের প্রভু যদি অঙ্গীকার করেন তা অবশ্যই পূর্ণ করেন।

হারাম ইবন হায়্যান বলেন যে, এর পূর্বে আর কখনো আমি তাঁকে দেখিনি এবং তিনিও আমাকে দেখেননি। এ কারণে আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম : আপনি আমার ও আমার পিতার নাম কিভাবে জানলেন? আল্লাহর কসম! আজকের পূর্বে আমি আর কোথাও কখনো আপনাকে দেখিনি। বললেন : মহাজ্ঞানী সত্তা আমাকে জানিয়েছেন। যখন আপনার অন্তর আমার অন্তরের সাথে কথা বলেছে তখনই আমার রূহ আপনার রূহকে চিনে ফেলেছে। চলাফেরাকারী জীবিতদের মত রূহদেরও জীবন থাকে। মু'মিনরা কখনো একসাথে মেলামেশা না করলেও, পরস্পর পরিচিত না হলেও এবং একজন আরেকজনের সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ না হলেও সবাই একজন আরেকজনকে চেনে-জানে। আল্লাহর এই

---

৫. তাবাকাত- ৬/১১২-১১৪

রূহের মাধ্যমে একে অপরের সাথে কথা বলে— তা সে একজন আরেকজনের থেকে যত দূরেই থাকুক না কেন।

আমি আরজ করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে কোন হাদীছ শুনেছেন? শুনে থাকলে একটু বর্ণনা করুন, আমি আপনার কাছ থেকে শুনে তা মুখস্থ করে নিই। বললেন- আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) পেয়েছি। তবে তাঁকে দেখা ও সাহচর্যের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি। হাঁ, যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, আমি তাদেরকে দেখেছি এবং আপনাদের মত আমার কাছেও তাঁর হাদীছ পৌঁছেছে। কিন্তু আমি মুহাদ্দিছ, কাজী অথবা মুফতী হবো— এ উদ্দেশ্যে নিজের জন্য এ দ্বার উন্মুক্ত করতে চাইনে। আমার নিজের নফসের অনেক কাজ আছে। তাঁর এ জবাব শুনে আমি আবার আরজ করলাম, তাহলে আমাকে কুরআনের কিছু আয়াত শুনিয়ে দিন। আপনার মুখ থেকে কুরআন শোনার বড় ইচ্ছা আমার। আমি আল্লাহর জন্যই আপনাকে ভালোবাসি। আমার জন্য দু'আ করুন এবং কিছু উপদেশ দিন, যা আমি চিরদিন মনে রাখবো। আমার এ আবেদন শুনে তিনি আমার হাত মুঠ করে ধরেন এবং أعوذ بالله من الشيطان الرجيم - পাঠ করে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করেন। তারপর বলতে লাগলেন : আমার প্রভুর স্মরণ অতি উঁচু, তাঁর বাণী সবচেয়ে বেশী সত্য, সবচেয়ে বেশী সত্যকথা তাঁর কথা, সবচেয়ে বেশী ভালো কথা তাঁর কথা। এই কথাগুলো বলে তিনি- "وما خلقنا السماوات والأرض" - থেকে - "وهو العزيز الرحيم" -৬ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে জোরে চিৎকার দিয়ে উঠে একেবারে চুপ হয়ে যান। আমি মনে করলাম তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমাকে বললেন, হারাম ইবন হায়্যান : তোমার পিতা মারা গেছেন, খুব শিগগীর তোমাকেও মরতে হবে। আবূ হায়্যান মারা গেছেন, তার জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম। ইবন হায়্যান! নূহ ও ইবরাহীম খলীলুর রহমান (আ) মারা গেছেন। ইবন হায়্যান! মূসা নাজিয়্যুর রহমান মারা গেছেন। ইবন হায়্যান! দাউদ খলীফাতুর রহমান মারা গেছেন। ইবন হায়্যান! মুহাম্মাদ রাসূলুর রহমান মারা গেছেন। ইবন হায়্যান! আবূ বকর খলীফাতুল মুসলিমীন মারা গেছেন! ইবন হায়্যান! আমার ভাই 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মারা গেছেন! একথা বলার পর তিনি 'হায় 'উমার! বলে চিৎকার দিয়ে ওঠেন এবং তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত কামনা করে দু'আ করেন। হযরত 'উমার ফারূক (রা) তখন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আর তখন ছিল তার খিলাফাতের শেষ দিক। এ কারণে আমি তাঁকে বললাম, আল্লাহ আপনার প্রতি করুণা করুন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব তো জীবিত আছেন। বললেন, হ্যাঁ! আমি যা কিছু বলেছি তা যদি ঠিক মত বুঝে থাক তাহলে তুমি জেনে যাবে যে আমরা মৃতদের মধ্যেই পরিগণিত। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করলেন এবং সংক্ষিপ্ত দু'আ করার পর বললেন : হারাম ইবনে হায়্যান, আল্লাহর কিতাব, উম্মাতের সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ এবং নবীর (সা) উপর দরূদ ও সালাম— এগুলোর ব্যাপারে আমার অসীয়াত থাকলো। আমি আমার মৃত্যু সংবাদ দিয়েছি, তোমারও মৃত্যু সংবাদ দিয়েছি। আগামীতে সব সময়

---

৬. সূরা আদ-দুখান- ৩৮-৪২

মৃত্যুকে স্মরণ রাখবে। একটি মুহূর্তও মৃত্যু থেকে উদাসীন হবে না। ফিরে গিয়ে তোমার গোত্রের লোকদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভয় দেখাবে। সব সময় নিজ দীনের লোকদেরকে উপদেশ দেবে এবং নিজের জন্য চেষ্টা করবে। সাবধান! জামা'আত বা দলছুট হবে না। এমন না হয় যে তোমার অজান্তে তোমার দীন ছুটে যায় এবং কিয়ামতে তোমাকে জাহান্নামের আগুনের মুখোমুখি হতে হয়। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! এ ব্যক্তির ধারণা যে, সে তোমার জন্যই আমাকে ভালোবাসে, তোমার জন্যই আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে। হে আল্লাহ! তাই তুমি জান্নাতে তার চেহারাটা আমাকে চিনিয়ে দিও এবং দারুস সালামে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিও, সে দুনিয়াতে যেখানেই থাকুক না কেন তোমার হিফাজতে রেখ, তার ঘর-বাড়ী, ক্ষেত-খামার তাঁর কর্তৃত্বে রেখ। দুনিয়ার এ সংক্ষিপ্ত জীবনে তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রেখ এবং দুনিয়ার যতটুকু তার জন্য নির্ধারিত আছে সেটুকু তার জন্য সহজলভ্য করে দাও। তোমার দান ও অনুগ্রহের ব্যাপারে তাকে কৃতজ্ঞ বানিয়ে দাও এবং তাকে ভালো প্রতিদান দাও। এই দু'আ করার পর তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হারাম ইবন হায়্যান, এখন আমি তোমাকে আল্লাহর জিম্মায় সুপর্দ করছি। আস-সালামু আলায়কুম। আজকের পর আর যেন তোমাকে না দেখি। আমি প্রচার পছন্দ করিনে। নির্জনতা ও একাকীত্বই আমার বন্ধু। যতদিন আমি দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে জীবিত থাকবো চূড়ান্ত রকমের ব্যথা ও বেদনাগ্রস্ত অবস্থায় থাকবো। এ কারণে আগামীতে তুমি আর কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করবে না। এবং আমাকে খোঁজও করবে না। তোমার স্মৃতি আমার অন্তরে সব সময় থাকবে। কিন্তু এরপর না আমি তোমাকে দেখবো, আর না তুমি আমাকে দেখতে পাবে। আমাকে মনে রাখবে, আমার জন্য দু'আ করবে। আমিও ইনশা'আল্লাহ তোমাকে স্মরণে রাখবো এবং তোমার কল্যাণ কামনা করে দু'আ করবো। এরপর তিনি একদিকে চলতে শুরু করেন। আমিও তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। কিন্তু তিনি এতে রাজী হলেন না। এরপর আমরা দু'জনই কাঁদতে কাঁদতে একজন আরেকজন থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। আমি এক দৃষ্টিতে তার চলার পানে তাকিয়ে থাকলাম। এক সময় তিনি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। এরপর আমি তাঁকে অনেক খুঁজেছি, বহু মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু কোন ভাবেই তার সন্ধান পাইনি। আল্লাহ তাঁর প্রতি করুণা বর্ষণ করুন এবং তাঁকে ক্ষমা করুন। এই সাক্ষাতের পর থেকে এমন কোন সপ্তাহ যায় না যাতে এক দু'বার আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখিনি।[৭]

উওয়াইস আল কারানীকে দুনিয়া যতদিন চিনতে পারেনি ততদিন পর্যন্ত তাঁকে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে দেখা যেত। কিন্তু যখনই তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন থেকে তিনি মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে এমনভাবে চলে যান যে কেউ আর তাঁর সাক্ষাৎ পায়নি। এরপর সিফ্ফীন যুদ্ধে তাঁর শহীদ হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার বড় বাসনা তার ছিল। আর এর জন্য সব সময় আল্লাহর দরবারে দু'আ করতেন। সিফ্ফীন যুদ্ধে আল্লাহ পাক তাঁর সে বাসনা পূর্ণ করেন। এ যুদ্ধে তিনি হযরত আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করেন।

---

৭. হায়াতুল আওলিয়া- ২/৮৭; 'আসরুত তাবি'ঈন- ২৪১-২৪৩

তিনি জীবনকালে সব সময় দুআ করতেন :[৮]

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً تُوجِبُ لِي الْجَنَّةَ وَالرِّزْقَ .

হে আল্লাহ তুমি আমাকে এমন শাহাদাত দান কর যা আমার জন্য জান্নাত ও রিযিক ওয়াজিব করে দিবে।

হযরত উওয়াইস (রহ) যদিও একজন তাবি'ঈ ছিলেন এবং সব রকম মহত্ত্ব, মর্যাদা ও পূর্ণতার সমাবেশ তাঁর মধ্যে ঘটেছিল, তথাপি বাহ্যিক জ্ঞানে শীর্ষ জ্ঞানীদের তালিকায় কোথাও তাঁর নামটি পাওয়া যায় না। এমন কি একটি হাদীছের বর্ণনাও করেছেন বলে কোথাও দেখা যায় না। তাই বলে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছা ঠিক হবে না যে, জাহিরী 'ইলমের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। মূলতঃ তাঁর সত্তায় বাতিনী ও জাহিরী 'ইলমের সমাবেশ ঘটেছিল। জাহিরী 'ইলমের প্রচার ও প্রসারে তাঁর কোন অবদান না থাকার দু'টি কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ অন্তর পরিশুদ্ধ করণ ও আধ্যাত্মিক সাধনা ও অনুশীলনে নিজেকে নিয়োজিত রাখার পর 'ইলমে জাহিরীর চর্চায় সময় ব্যয় করা তাঁর পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তিনি ছিলেন ভীষণ প্রচার-বিমুখ মানুষ। নাম-কাম ও খ্যাতির প্রতি ছিলেন নিরাসক্ত। কাজী, মুফতী, মুহাদ্দিছ ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হওয়া তিনি দারুণ অপছন্দ করতেন। একবার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, আমার কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ ঠিক সেভাবে পৌঁছেছে যে ভাবে পৌঁছেছে আপনাদের নিকট। কিন্তু আমি নিজের উপর তার দ্বার উন্মুক্ত করে মুহাদ্দিছ, কাজী ও মুফতী হওয়া মোটেই পছন্দ করিনে। অন্তরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার বহু কাজ আমার আছে। তিনি বলতেন, আমি খ্যাতি ও প্রচার মোটেই পছন্দ করিনে। একাকীত্ব ও নির্জনতা আমার অতি প্রিয়। জাহিরী 'ইলমের পদ ও পদবী গ্রহণ করলে খ্যাতি থেকে তিনি বাঁচতে পারতেন না, তেমনিভাবে একাকীত্বও বজায় থাকতো না। আর এ কারণে তিনি নিজের জন্য 'ইলমের এ শাখার দ্বার একেবারেই রুদ্ধ করে দেন।

তাঁর কামালাতের উৎস ও ঝর্নাধারা কাগজের পাতার পরিবর্তে ছিল অন্তরের পাতা। তাঁর মহান সত্তাই ছিল 'ইলমে বাতিনের উৎস ধারা। তাবি'ঈদের মধ্যে হযরত হাসান বসরীর (রহ) পরে তিনিই হলেন তাসাউফের একক কেন্দ্র। পরবর্তীকালের সূফী-সাধকদের অনেকের সিলসিলা বা সূত্রের ধারাবাহিকতা তাঁর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতেন। নিয়ম ছিল, একরাত নামাযে দাঁড়িয়ে, দ্বিতীয় রাত রুকু অবস্থায় এবং তৃতীয় রাত সিজদা অবস্থায় কাটিয়ে দিতেন। বেশীর ভাগ সময় রাতের সাথে দিনও ইবাদাতে কেটে যেত। রাবী' ইবন খায়ছাম বর্ণনা করেছেন। তিনি একদিন ওয়াইসের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন, তিনি ফজরের নামাযে মশগুল আছেন। নামাযের পর তাসবীহ-তাহলীল থেকে ফারেগ হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকলেন। প্রতীক্ষার সময় বাড়তে বাড়তে জুহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। তারপর জুহর থেকে 'আসর এবং 'আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত একই অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন।

৮. আল ইসাবা- ১/১১৭

রাবী' ধারণা করলেন, মাগরিবের পরে হয়তো তিনি আহার করার জন্য বের হবেন। কিন্তু ঈশা পর্যন্ত তাসবীহ-তাহলীলে নিমগ্ন থাকলেন। তারপর আবার ঈশা থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত একই অবস্থা বিদ্যমান থাকলো। দ্বিতীয় দিন ফজরের নামাযের পর তার একটু ঘুমের ভাব হলো। কিন্তু তিনি সাথে সাথে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমি নিদ্রাকাতর চোখ এবং অতৃপ্ত পেট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাঁর এ অবস্থা দেখে রাবী বললেন, আমি, যতটুকু দেখেছি, তাই আমার জন্য যথেষ্ট।[৯]

সবসময় তিনি রোযা রাখতেন। অনেক সময় এমন হতো যে, ইফতার করার মত কিছুই থাকতো না। তখন খেজুরের বিচি খুঁটে সংগ্রহ করে বিক্রি করতেন এবং তাই দিয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য সামান্য কিছু কিনে আহার করতেন। যদি দু'একটি শুকনো খেজুর পেতেন, তাও ইফতারির জন্য রেখে দিতেন। খেজুর যদি কিছু বেশী পরিমাণে পেতেন তখন বিচি বিক্রি করার অর্থ গরীব-মিসকীনদেরকে দান করে দিতেন।[১০] প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁর নিকট যা কিছু খাদ্য-খাবার ও কাপড়-চোপড় থাকতো সবই দান করে দিতেন। তারপর এই বলে দু'আ করতেন– হে আল্লাহ! যারা অনাহারে মারা গেছে এবং যারা বস্ত্রহীন অবস্থায় মারা গেছে তাদের ব্যাপারে আমাকে পাকড়াও করবেন না।[১১] সতর ঢাকার মত কাপড় না থাকায় মাঝে মাঝে জুমআর নামাযেও যেতে পারতেন না।[১২]

কূফায় যিক্‌র আযকারের একটি 'হালকা' ছিল। সেই হালকায় বহু 'সালিক' তথা আধ্যাত্মিক পন্থীরা সমবেত হতেন। উওয়াইসও সেখানে অংশগ্রহণ করতেন। উসাইদ ইবন জাবির বর্ণনা করেছেন। আমরা কিছু লোক কূফায় যিক্‌র ও আমলের একটি হালকায় সমবেত হতাম। উওয়াইসও আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতেন। এই হালকায় উওয়াইসের যিকর সবার অন্তরের উপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলতো। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এই যিক্‌র ও 'আমল ছিল নামায ও কুরআন তিলাওয়াত।[১৩]

তাঁর দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ও নির্মোহ ভাব এমন পর্যায়ের ছিল যে, বাড়ী-ঘর, লেবাস-পোশাক, পানাহার, তথা পার্থিব যাবতীয় প্রয়োজন ও দাবী থেকে সব সময় মুক্ত ছিলেন। অতি সাধারণ একটি ভাঙ্গাচোরা ঘরে থাকতেন।[১৪] পানাহারের অবস্থা এমন ছিল যে, কখনো উট চরিয়ে, আবার কখনো খেজুরের বিচি খুঁটে বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে বেঁচে থাকার মত খাবার সংগ্রহ করতেন। হযরত উমারও এমন যুহ্‌দ অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু করেননি। পোশাকের মধ্যে থাকতো পশমের একটি মোটা চাদর ও লুঙ্গি।[১৫] অনেক সময় চাদরও থাকতো না। নগ্নদেহ দেখে মানুষ তাঁকে চাদর দিত। তিনি

---

৯. তারীখু ইবন 'আসাকির- ৩/১৭৩
১০. তাযকিরাতুল আওলিয়া'- ৪৩
১১. হুলয়াতুল আওলিয়া'- ২/৮৭
১২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ৪/৩০
১৩. মুসতাদরিকে হাকিম- ৩/৪০৪,৪০৮
১৪. তাবাকাত- ৬/১১৩
১৫. মুসতাদরিক- ৩/৪০৬

এই বলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতেন : 'হে আল্লাহ! আমি আমার ক্ষুধার্ত পেট ও নগ্ন দেহের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার দেহে যে পোশাক আছে এবং আমার পেটে যে খাদ্য আছে তাছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই।[১৬]

তাঁর এমন মজযুব বা ঐশী প্রেমে বেহুঁশ অবস্থা দেখে লোকেরা তাঁকে ভুল বুঝতো এবং পথ চলার সময় তাঁকে নানাভাবে বিরক্ত করতো। একবার কাপড় সংগ্রহ করতে না পারার কারণে হালকায়ে যিকর থেকে অনুপস্থিত থাকলেন। তাঁর হালকার সাথী উসাইদ ইবন জাবির ভাবলেন, হয়তো তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বললেন, আপনি আমাদেরকে ছেড়ে দিলেন কেন? তিনি জবাব দিলেন : আমার গায়ে দেওয়ার মত চাদর ছিল না। তাই আমি যেতে পারিনি। উসাইদ বর্ণনা করেছেন, তাঁর একথা শোনার পর আমি আমার চাদরটি তাঁকে দিই। কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন : আমি যদি এই চাদর গায়ে জড়িয়ে বাইরে যাই তাহলে আমার গোত্রের লোকেরা বলবে, এই কপট ধার্মিক লোকটিকে তোমরা দেখ, সে একজন লোকের পিছু নিয়ে তাকে ধোঁকা দিয়ে তার চাদরটি হাতিয়ে নিয়েছে। তাঁর এত সব কথা ও আপত্তি সত্ত্বেও আমি প্রায় জোর করে আমার চাদরটি তাঁকে দিয়ে দিই। তাঁকে বলি এটি গায়ে দিয়ে আমার সাথে চলুন দেখি কে কি বলে। আমার এমন পীড়াপীড়িতে তিনি চাদরটি গায়ে জড়িয়ে আমার সাথে বের হলেন। যেই না আমরা একটি জন-সমাবেশ অতিক্রম করছি, অমনি তারা বলে উঠলো, তোমরা এই কপট ধার্মিককে দেখ, সে একটি লোকের পিছু নিয়ে তার চাদরটি বাগিয়ে নিয়েছে। আমি কথাটি শোনামাত্র তাদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, তোমাদের এমন কথা বলতে লজ্জা হয় না? আল্লাহর কসম! আমি যখন তাঁকে এ চাদর দিতে চেয়েছি, তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।[১৭] মোটকথা, তিনি তাঁর বাহ্যিক অবস্থার কারণে মানুষের ঠাট্টা-বিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতেন। আর হাসিমুখে তা সহ্য করতেন।

আধ্যাত্মিক সাধনার একটি স্তরের নাম 'ফানা'। 'ফানা' অর্থ পরম সত্তায় বিলীন হওয়া। তিনি এই 'ফানা'র এমন পর্যায়ে ছিলেন যেখানে বিন্দুমাত্র খ্যাতি, প্রচার ও দুনিয়াদার লোকদের সাথে মেলামেশার কোন সুযোগ নেই। এ কারণে খ্যাতি ও প্রচার থেকে পালিয়ে বেড়াতেন। খলীফা হযরত 'উমার (রা) একবার ইচ্ছা করলেন, কূফার ওয়ালীকে চিঠি লিখে তাঁর পরিচয় জানিয়ে দিয়ে তাঁর সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেন। কিন্তু উওয়াইস তাতে রাজী হননি। তিনি উমারকে (রা) বলেন- আমি অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকতেই পছন্দ করি। মানুষের সাথে মেলামেশাতে ভয় পেতেন। কিন্তু তার এ আত্মগোপন অবস্থা বেশি দিন বজায় থাকেনি। তাঁর রূহানিয়াতের খোশবু আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। দিন দিন মানুষের আগ্রহ তাঁর প্রতি বাড়তে থাকে। উসাইদ ইবন জাবির বর্ণনা করেছেন। আমার এক সাথী আমাকে উওয়াইসের নিকট নিয়ে যায়। তিনি দু'রাকআত নামায শেষ করে আমাদের প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি বলেন, আমার সাথে আপনাদের

---

১৬. প্রাগুক্ত- ৩/৪০৫

১৭. প্রাগুক্ত- ৩/৪০৪

আচরণও বেশ আজব ধরনের। আপনারা সবসময় আমার পিছনে লেগে থাকেন কেন? আমি একজন দুর্বল মানুষ। আমার অনেক প্রয়োজনীয় কাজ আছে, যা আমি আপনাদের কারণে সম্পন্ন করতে পারিনে। আপনারা এমন করবেন না। আল্লাহ আপনাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন। আপনাদের কারো কোন প্রয়োজন আমার কাছে যদি হয় তাহলে ঈশার নামাযের সময় সাক্ষাৎ করবেন। এই মজলিসে তিন ধরনের মানুষ এসে থাকে। বুদ্ধিমান ঈমানদার, নির্বোধ ঈমানদার ও কপট ধার্মিক (মুনাফিক)। এই তিন ধরনের মানুষের দৃষ্টান্ত হলো বৃক্ষ ও বৃষ্টির মত। যদি সবুজ-শ্যামল তরতাজা ও ফলবান বৃক্ষের উপর বৃষ্টি হয় তাহলে তার সজীবতা ও সৌন্দর্য আরো বেড়ে যায়। কিন্তু সজীব অথচ ফলহীন, এমন বৃক্ষের উপর বৃষ্টি হলে তার শাখা ও পাতায় সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় এবং তা ফল দিতে আরম্ভ করে। আর যদি শুকনো ঘাস ও দুর্বল শাখার উপর বৃষ্টি হয় তাহলে তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই উপমাটি দিয়ে তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :[১৮]

وننزل من القرآن ماهو شفاء للناس ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين إلا خسارا.

- আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। যালিমদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

খলীফা হযরত 'উমার (রা) উওয়াইস আল কারানীকে খুব বেশী বেশী স্মরণ করতেন। একবার তিনি মিনায় মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলেন : হে কারানবাসী, আপনাদের মধ্যে কি উওয়াইস আছেন? একজন বয়স্ক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি তো একজন পাগল। নির্জনস্থানে একাকী বাস করেন। তিনি কারো সাথে মিশতে চান না, আর কেউ তার সাথে মিশতে চায় না। 'উমার (রা) বললেন : আমি তাঁর কথাই বলছি। আপনারা ফিরে গিয়ে তাঁকে খুঁজে বের করবেন এবং তাঁকে আমার এবং রাসূলুল্লাহর সালাম পৌঁছে দিবেন।

আমীরুল মু'মিনীনের একথা উওয়াইসের কানে পৌঁছালে তিনি বলেন : আমীরুল মু'মিনীন আমাকে পরিচিত করে দিয়েছেন, আমার নামটি ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদ, ওয়া 'আলা আলিহি। আস্-সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ। তারপর তিনি মুখ নীচু করে দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন।[১৯]

তাঁর সীমাহীন একাকীত্ব ও নির্জনতা-প্রিয়তা তাঁকে আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ)-এর দায়িত্ব থেকে কখনো উদাসীন ও অমনোযোগী করতে পারেনি। এ দায়িত্ব পালনের কারণে তিনি অনেক সময় অনেকের শত্রুতে পরিণত হতেন। আবুল আহওয়াস নামক জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। তার এক বন্ধু তাকে বলেছেন, মুরাদ গোত্রের এক ব্যক্তি উওয়াইসের নিকট যায় এবং সালাম বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করে, উওয়াইস, কেমন আছেন? তিনি বলেন, আল-হামদু লিল্লাহ।

---

১৮. আল ইসাবা- ১/১১৭
১৯. সূরা আল-ইসরা'- ৮২

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করে, আপনার সাথে কালচক্রের আচরণ কেমন?

তিনি বলেন, এই প্রশ্ন এমন ব্যক্তিকে করছো যার সন্ধ্যার পর সকাল লাভ করার বিশ্বাস নেই এবং সকালের পর সন্ধ্যা পাওয়ার কোন আশা নেই। আমার মুরাদ গোত্রের ভাই! মৃত্যু কোন ব্যক্তির জন্য আনন্দের কোন স্থান অবশিষ্ট রাখেনি। আমার মুরাদ গোত্রের ভাই! আল্লাহর পরিচয় মু'মিনের জন্য সোনা-রূপোর কোন মূল্যই অবশিষ্ট রাখেনি। আমার মুরাদ গোত্রের ভাই! মু'মিন ব্যক্তির আল্লাহর ফরজ আদায়ের কারণে কোন বন্ধু থাকে না। আল্লাহর কসম! যেহেতু আমরা মানুষকে ভালো কাজের শিক্ষা দিই এবং খারাপ করতে বারণ করি, তাই তারা আমাদেরকে শত্রু ভেবে বসেছে। আর এতে তাদের পাপাচারী সহযোগী জুটে গেছে। যারা আমাদের প্রতি নানা রকম বানোয়াট দোষারোপ করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের এ আচরণ আমাকে সত্য বলা থেকে বিরত রাখতে পারবে না।[২০]

তিনি অখ্যাত ও অপরিচিত থাকার উদ্দেশ্যে খুব কমই জনসমক্ষে বের হতেন। তবে জিহাদের সম্মান ও মর্যাদা অর্জনের উদ্দেশ্যে কখনো কখনো নির্জনতা থেকে বেরিয়ে আসতেন। যদিও সহীহ মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণ নেই, তবে অনুমান তথা দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, হযরত 'উমারের (রা) সাথে ইয়ামনের সাহায্যের ব্যাপারে তাঁর যে সাক্ষাৎ হয়, তা নিশ্চিতভাবে এই যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় হয়ে থাকবে। তাছাড়া আল-ইসাবার একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি আযারবাইজানের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২১]

আবদুল্লাহ ইবনে সালামা ছিলেন আযারবাইজান যুদ্ধের সৈনিক। তিনি বলেছেন ঃ 'উমার ইবনুল খাত্তাবের সময়ে আমরা আযারবাইজান যুদ্ধ করি। আমাদের সাথে উওয়াইস আল কারানীও ছিলেন। যুদ্ধ শেষে ফেরার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক চিকিৎসা করার পরও তাকে আর বাঁচানো গেল না। তিনি মারা গেলেন। আমরা তাঁকে কবর দিলাম। কিন্তু পরে আর তার কবরের কোন চিহ্ন থাকলো না। কোন কোন বর্ণনায় জানা যায়, তিনি আলীর (রা) খিলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং সিফ্‌ফীন যুদ্ধে আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করে শহীদ হন।[২২]

পার্থিব আত্মীয়-সম্পর্কের মধ্যে উওয়াইসের শুধু এক মা ছিলেন। তাঁর সেবাকে তিনি সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য ও ইবাদাত মনে করতেন। তিনি একা হয়ে যাবেন, এই চিন্তায় হজ্জ আদায় করেননি। তাঁরই কারণে হযরত রাসূলে পাকের দীদার থেকে মাহরূম থেকে যান। মায়ের ইনতিকালের পর হজ্জ আদায় করার সুযোগ আসে কিন্তু তখন তিনি একজন কপর্দকশূন্য মানুষ। তাঁর কিছু শুভানুধ্যায়ী হজ্জের সফরের যাবতীয় ব্যবস্থা করায় তিনি হজ্জ আদায় করেন।[২৩]

তিনি বলতেন, আল্লাহর কাজে এমনভাবে থাকবে যেন তুমি সব মানুষকে হত্যা করে

---

২০. আসরুত তাবি'ঈন- ২৪৬

২১. প্রাগুক্ত- ২৪৩-২৪৪; মুসতাদরিক- ৩/৪০৬

২২. আল-ইসাবা- ১/১১৭

২৩. আল- বায়ান ওয়াত তাবয়ীন- ৩/১৯৩, টীকা-১০; 'আসরুত তাবি'ঈন- ২৪৭

ফেলেছো। অসাক্ষাতে কারো জন্য দু'আ করা তার সাথে সাক্ষাৎ করার চেয়ে ভালো। কারণ, সাক্ষাতের মধ্যে লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হতে পারে।[২৪]

তাবি'ঈদের মধ্যে উওয়াইস আল কারানীর এমন বিশেষ কিছু ফযীলত ও মর্যাদা আছে যা অন্য কারো নেই। তাঁর সবচেয়ে বড় সম্মান ও মর্যাদা হলো হযরত হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে 'খায়রুত তাবি'ঈন' (তাবি'ঈদের মধ্যে উত্তম) বলে অভিহিত করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন, আমার উম্মাতের এক ব্যক্তির সুপারিশে বানু তামীমের বিপুল সংখ্যক মানুষ জান্নাতে যাবে। হাসান মনে করেন, সেই ব্যক্তিটি হলেন উওয়াইস আল কারানী।[২৫] যদিও এই বর্ণনাটি তেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও এ দ্বারা হযরত উওয়াইসের মর্যাদা অনুমান করা যায়।

'খায়রুত তাবি'ঈন'-এর এত সব মহত্ত্ব, মর্যাদা, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতার বর্ণনা সত্ত্বেও এমন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যা দ্বারা তাঁর অস্তিত্বটাই সন্দেহজনক হয়ে যায়। এই সব গুণাবলীতে ভূষিত উওয়াইস নামের কোন তাবি'ঈ আদৌ ছিলেন? যেমন: ইবন 'আদী বর্ণনা করেছেন, ইমাম মালিক তাঁর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতেন। সাম'আনী বর্ণনা করেছেন, ইবন হিব্বান বলতেন, আমাদের কোন কোন বন্ধু তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন। সাম'আনী এ রকম কথাও বর্ণনা করেছেন যে, ইবন হিব্বান বলতেন, আমাদের বুখারীর নিকট তাঁর সম্পর্কের বর্ণনাগুলোর সনদ সন্দেহযুক্ত।

কিন্তু অন্যসব মুহাদ্দিছ মনে করেন, হাদীছ ও তাবাকাত গ্রন্থাবলীর এত সব বর্ণনার বিপরীতে এই মুষ্টিমেয় কিছু দুর্বল বর্ণনার কোন স্থান ও মর্যাদাই থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় ভেবে দেখার মত আছে। প্রথমত: যে সব বর্ণনা দ্বারা উওয়াইস কারানীর অস্তিত্বই সন্দেহজনক হয়ে উঠে, সেগুলোর মান ও মূল্য কি? দ্বিতীয়তঃ সেগুলো যদি বিশুদ্ধও হয় তাহলে তদ্দ্বারা তাঁর বিদ্যমান না থাকার সিদ্ধান্তে পৌঁছা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? তৃতীয়তঃ এর বিপরীতের উলামা, মুহাদ্দিছ ও তাবাকাতের বর্ণনাসমূহের জবাব কি হবে?

বর্ণনার মূল্যমানের দিক দিয়ে এ জাতীয় সকল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। হাফেজ ইবন হাজার ও সাম'আনী যদিও এ বর্ণনাগুলো সংকলন করেছেন, তবে তার কোন সনদ তারা দেননি। তাই হাদীছ পর্যালোচনার রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী তা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। আর যদি বিশুদ্ধ ধরেও নেওয়া যায় তাহলেও সেগুলো দ্বারা উওয়াইস আল কারানীর অস্তিত্বহীনতার সিদ্ধান্তে পৌঁছা ঠিক নয়। কারণ, যাঁরা তাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন তা এই ভিত্তিতে করেছেন যে, তাঁরা সেই যুগে তাঁর নাম শোনেননি, অথবা তাঁর জীবনের কোন অবস্থার কথা জানতে পারেননি। কিন্তু তাঁরা জানেননি বা জানতে পারেননি, একথা দ্বারা তিনি ছিলেন না একথা প্রমাণিত হয় না।

নীতিগতভাবে সেইসব মানুষের অবস্থার কথা লোকে জানতে পারে যাঁরা বিশেষ কোন

---

২৪. মুসতাদরিক- ৩/৪০৭
২৫. সিফাতুস সাফওয়া- ১/২৩৭

অবস্থানে থাকেন। যাঁরা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে একেবারে নীরবে জীবন কাটিয়ে দেন তাদের কথা মানুষ জানতে পারে না। এমন কি সাহাবীদের সম্পর্কে এ দাবী করা যায় না যে, প্রত্যেকটি সাহাবী সম্পর্কে সেই যুগের লোকেরা জানতো, অথবা তাঁদের জীবনী সেই যুগে লেখা হয়েছিল। সাধারণত সেই সব সাহাবীর জীবন কথা জানা যায় যাঁরা শিক্ষা অথবা সরকারী কাজে কিছু অবদান রেখেছেন, অথবা হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে কোথাও তাঁর নামটি এসে গেছে। কোন কোন সাহাবীর তো শুধু নামই জানা যায়- জীবনের কোন কথাই জানা যায় না। তাই যদি হয় সাহাবীদের অবস্থা, তাহলে একজন অখ্যাত তাবি'ঈর অবস্থা কি হতে পারে?

এই নীতির ভিত্তিতে উওয়াইস আল কারানীর জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। তাঁর জীবনী থেকে যেমন জানা যায় যে, তিনি দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে নিজেকে সব সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখেন। কেউ তাঁকে মুফতী, মুহাদ্দিছ, কাজী বলবে এবং মানুষ তাঁর প্রতি মনোযোগী হবে, এই ভয়ে তিনি এমনভাবে নিজেকে গড়ে তোলেন যে, বিশেষ কিছু লোক ছাড়া তাঁর অঞ্চলের লোকেরাও তাঁকে জানতো না। আর যাঁরা তাঁকে চিনতো-জানতো তাঁরাও তাঁকে এক ভিন্ন স্বভাব-প্রকৃতির মানুষ বলে জানতো। শিক্ষা ও গুরুত্বপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাজের সাথে যেহেতু তিনি কোনভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন না, একারণে 'আলিম-উলামা তাঁর সম্পর্কে জানতেন না বা জানার কোন প্রয়োজন বোধ করেননি।

যাই হোক, তাঁর ব্যক্তিত্ব একেবারে গোপন থাকার মত ছিল না। এ কারণে অনেক বিশেষ ব্যক্তির নিকট তাঁর জীবনের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। পূর্বে আমরা তা আলোচনা করেছি। আমরা যখন তাবাকাত ও হাদীছের গ্রন্থসমূহে দৃষ্টিপাত করি তখন 'সাহীহ মুসলিম'-এর মত গ্রন্থেও তাঁর ফযীলত ও মর্যাদার কথা পাই। তাবাকাত ও রিজাল (চরিত অভিধান) শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহের চেয়ে হাদীছের গ্রন্থাবলীতে তার কথা বেশী এসেছে। মুসনাদে আহমাদ, সাহীহ মুসলিম, দালাইলে বায়হাকী, হিলয়াতুল আওলিয়া (আবু নু'আয়ম), মুসতাদরিকে হাকিম ইত্যাদি হাদীছের গ্রন্থে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে। হাফেজ ইবন হাজার-এর বেশীরভাগ সূত্রের উল্লেখ করেছেন তাঁর আল-ইসাবা গ্রন্থে।[২৬] সম্ভবত এর বাইরে আরো বহু গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা এসে থাকবে। তবে তাবাকাত ও রিজালের গ্রন্থাবলীতে তাঁর আলোচনা কম হওয়ার কারণ হলো, সাধারণতঃ এসব গ্রন্থে এমন সব ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত স্থান পায় যাঁরা শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাবাকাতে ইবন সা'দ, আল-ইসাবা, উসুদুল গাবা, হিলয়াতুল আওলিয়া, তারীখে ইবন 'আসাকির, তাহযীব, মীয়ানুল ই'তিদাল এবং এ জাতীয় আরো অনেক গ্রন্থে তাঁর জীবনকথা কম-বেশী এসেছে। আর যে সকল 'আলিম তাঁর অস্তিত্বের অস্বীকারমূলক বর্ণনা নকল করেছেন তাঁদের নিজেদেরই সেইসব বর্ণনার উপর

---

২৬. আল-ইসাবা- ১/১১৭; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/৩৯৮

২৭. আল ইসাবা- ১/১১৫-১১৭

আস্থা ও বিশ্বাস ছিল না। তারাও উওয়াইস আল কারানীর ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করতেন। যেমন ইবন হাজার ইমাম মালিকের অস্বীকৃতিমূলক বর্ণনা নকল করার পর লিখেছেন যে, তাঁর পরিচিতি এবং বিবরণ এত যে তাঁর অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।[২৮]

আল 'উতবী বলেছেন, আমি আমার শায়খদের বলতে শুনেছি : তাবি'ঈদের আটজনের কাছে 'যুহ্দ' (আল্লাহ্ ভীতি ও দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি) চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাঁরা হলেন : 'আমির ইবন 'আবদিল কুদ্দুস, আল- হাসান আল বসরী, হারাম ইবন হায়্যান, আবূ মুসলিম আল খাওলানী, উওয়াইস আল কারানী, রাবী' ইবন খুছায়ম, মাসরূক ইবন আল-আজদা' ও আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ।[২৯]

২৮. সিয়ারুত তাবি'ঈন- ৪৮

২৯. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ- ৩/১৭১

সালামা ইবন দীনার (রহ)

হযরত সালামার (রহ) ডাক নাম ছিল আবূ হাযিম। বংশগতভাবে তিনি ছিলেন অনারব। পিতা দীনার ছিলেন ইরানী এবং মাতা ছিলেন রোমান। আল-আসওয়াদ ইবন সুফইয়ান আল-মাখযূমীর দাস ছিলেন। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে তাঁকে মাখযূমী বলা হতো। ইতিহাসে তিনি আবূ হাযিম আল-আ'রাজ নামেও পরিচিত।[১]

পিতা-মাতা উভয়ের দিক থেকে যদিও তিনি অনারব বংশোদ্ভূত ছিলেন, তবুও ইসলামের সাম্য ও সমতার কল্যাণে মদীনার শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং একজন তাপস ও ভোগ-বিলাস বিমুখ 'আলিমে পরিগণিত হন। ইমাম আয-যাহাবী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন : "الواعظ الزاهد عالم المدينة وشيخها"[২] - তিনি একজন দুনিয়া-বিরাগী উপদেশদানকারী,ড় মদীনার 'আলিম ও শায়খ। ইমাম নাওবী বলেছেন : তাঁর বিশ্বস্ততা, মহত্ত্ব ও প্রশংসায় সকলে একমত।[৩]

তিনি হাদীছের একজন বড় হাফিজ ছিলেন। ইবন সা'দ লিখেছেন : "كان ثقة كثير الحديث" – তিনি ছিলেন বহু হাদীছ স্মৃতিতে ধারণকারী বিশ্বস্ত ব্যক্তি।[৪] সাহল ইবন সা'দ আস-সা'ইদী, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস (রা) প্রমুখ সাহাবীর নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনেন। তবে বহু মুহাদ্দিছ মনে করেন শেষোক্ত দুই সাহাবীর নিকট থেকে তাঁর সরাসরি হাদীছ শোনা প্রমাণিত নয়। বিপুল সংখ্যক বিখ্যাত তাবি'ঈর নিকট থেকেও তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এখানে তাঁর কয়েকজন তাবি'ঈ শিক্ষকের নাম উল্লেখ করা হলো :

উমামা ইবন সাহ্‌ল ইবন হুনায়ফ, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন যুবায়র, 'আবদুল্লাহ ইবন আবী কাতাদা, নু'মান ইবন আবী 'আয়্যাশ, ইয়াযীদ ইবন রূমান, 'উবায়দুল্লাহ ইবন মুকাস্‌সিম, আবূ ইবরাহীম ইবন 'আবদির রহমান, না'জা ইবন 'আবদিল্লাহ, আবূ সালিহ আল-সাম্মান, আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান, ইবন মুনকাদির ও আরো অনেকে।

তাঁর ছাত্র ও শাগরিদদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো : যুহ্‌রী, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন ইসহাক, ইবন 'আজলান, ইবন আবী জি'ব, মালিক, হাম্মাদ, সুফইয়ান, সুলায়মান ইবন হিলাল, সা'ঈদ ইবন আবী হিলাল, 'আমর ইবন 'আলী, আবূ গাসসান আল-মাদানী, হিশাম ইবন সা'ঈদ, উহায়ব ইবন খালিদ, আবূ সাখর হুমায়দ ইবন যিয়াদ আল-খাররাত, উসামা ইবন যায়দ

---

১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৩৬৪
২. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/১১৯
৩. তাহ্‌যীবুল আসমা/-২/২০৮
৪. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৪/১৪৪

লায়ছী, মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার ইবন আবী কাছীর, আফলাহ্ ইবন সুলায়মান আন-নামিরী প্রমুখ।[৫]

ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর পূর্ণ দখল ছিল। তিনি ছিলেন মদীনার একজন বিখ্যাত ফকীহ্। ইমাম যাহাবী, ইমাম নাওবী ও অন্যরা তাঁকে ফকীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।[৬] ইমাম যাহাবী লিখেছেন, তিনি স্বভাবগত ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য অনেক। তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়পদ ফকীহ্ ও উঁচু মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি।[৭] ফিকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞানের প্রমাণ এই যে, তিনি মদীনাতুর রাসূলের একজন কাজী ছিলেন।[৮]

মদীনায় তিনি মানুষকে ও'য়াজ-নসীহতের দায়িত্বও পালন করতেন। 'ইবাদাত-বন্দেগীর দিক দিয়ে তিনি মদীনার বড় বড় 'আবিদ ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি মদীনার 'আবিদ ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ব্যক্তিদের একজন ছিলেন।[৯] ইমাম যাহাবী, ইমাম নাওবী, ইবন হাজার ও আরো অনেকে তাঁর নামের সাথে 'যাহিদ' (দুনিয়া-বিরাগী) শব্দটি লিখেছেন। মোটকথা, সব দিক দিয়ে মহান তাবি'ঈ স্তরের মধ্যে তিনি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন।

আল-জাহিজ (মৃ. হি. ২৫৫) তাঁর 'আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন' গ্রন্থে বিখ্যাত তাপস ও দুনিয়া-বিরাগী মানুষ যাঁরা বয়ান ও বাগ্মিতায়ও পারদর্শী ছিলেন, তাঁদের নামের সাথে তাঁর নামটিও উল্লেখ করেছেন।[১০]

আমীর-উমারা ও শাসক শ্রেণী থেকে সবসময় দূরে থাকতেন। কখনো কোন প্রয়োজনে তাঁদের কাছে ঘেঁষতেন না। একবার খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক ইমাম যুহ্রীর মাধ্যমে তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠান। তিনি যুহ্রীকে বলেন, যদি সুলায়মানের আমার কাছে কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে তাঁকেই আমার কাছে আসা উচিত। আমার তো তাঁর কাছে কোন প্রয়োজন নেই।[১১]

ধর্মীয় ও নৈতিক গুণাবলীর পূর্ণতা ও উৎকর্ষতার সাথে সাথে যথেষ্ট জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। আবদুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলাম বলেন, আমি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিনি যার কথা আবূ হাযিমের কথার চেয়ে বেশী বিজ্ঞতাপূর্ণ। ইবন খুযায়মা বলেন, উপদেশমূলক কথাবার্তায় তাঁর সময়ে আর কেউ তাঁর মত ছিলেন না।[১২]

তাঁর এমন অনেক জ্ঞানগর্ভ বাণী পাওয়া যায় যা দ্বারা তাঁর বিজ্ঞতার অনুমান করা যায়।

---

৫. প্রাগুক্ত-৪/১৪৩; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৩
৬. তাহ্যীব আল-আসমা'-২/২০৮
৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৩
৮. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৪/১৪৪
৯. প্রাগুক্ত
১০. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৩৬৩
১১. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৪/১৪৪
১২. শাযারাত আয-যাহাব-১/২০৮; তাহ্যীব আল-আসমা'-২/২০৮

তিনি বলতেন, এমন সব কাজ যার কারণে মরণই শ্রেয় মনে হয় তা পরিহার কর। তারপর যখনই মৃত্যু আসুক তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যে বান্দা তার নিজের ও তার প্রভুর মাঝের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করে এবং সম্পর্কসমূহ ভালোমত বজায় রাখে আল্লাহ অন্য বান্দাদের সাথে তার সব সম্পর্ক ঠিক রাখেন। আর যে বান্দা তার ও আল্লাহর মাঝের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালনে অবহেলা করে আল্লাহ অন্য বান্দাদের সাথে তার পারস্পরিক দায়িত্বসমূহ পালনের ব্যাপারে অবহেলার ভাব সৃষ্টি করে দেন। এক সত্তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা একাধিক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার চেয়ে অনেক সহজ কাজ। অর্থাৎ এক আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারলে গোটা পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক ভালো হয়ে যাবে। একবার খলীফা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা থেকে কিভাবে মুক্তি পেতে পারি? বললেন : এটা খুবই সহজ কাজ। প্রত্যেকটি জিনিস বৈধ পন্থায় গ্রহণ করুন এবং বৈধ খাতসমূহে তা ব্যয় করুন। হিশাম বললেন, এ কাজ সেই ব্যক্তিই করতে পারেন যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে বাঁচার ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য লাভ করেছেন। তিনি বললেন : আর এ কারণে জিন ও মানুষে জাহান্নাম ভরে যাবে।[১৩] তিনি বলতেন :

যে আমলের কারণে তুমি মৃত্যুকে অপছন্দ কর সে আমল ছেড়ে দাও। তারপর তোমার মৃত্যু যখনই আসুক তোমার কোন ক্ষতি হবে না।[১৪]

তিনি বলতেন : আমরা সবাই তাওবা না করা পর্যন্ত মরতে চাই না। আর আমরা না মরা পর্যন্ত তাওবা করি না। খলীফা আবদুল মালিকের অন্তিম সময় যখন উপস্থিত, তখন দেখলেন একজন ধোপা হাত দিয়ে কাপড় কচলাচ্ছে। খলীফার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো : 'হায়! আমি যদি একজন ধোপা হতাম এবং প্রতিদিন যা উপার্জন করতাম তাই দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতাম।' একথা আবূ হাযিমকে শোনানো হলে তিনি বলে ওঠেন : সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁদেরকে মরণকালে সেই আশা-আরজু দান করেছেন যার মধ্যে আমরা সবসময় আছি। মরণকালে আমরা জীবনকালে তারা যে অবস্থায় আছে তা কামনা করবো না।[১৫]

তিনি বললেন : দুনিয়া বহু জাতি-গোষ্ঠীকে ধোঁকা দিয়েছে। তারা এ দুনিয়াতে অন্যায় ও অপকর্ম করেছে। যখন মৃত্যু এসে গেছে তখন তারা তাদের সবকিছু এমন লোকদের জন্যে ছেড়ে গেছে যারা তাদের কোন প্রশংসা করেনি এবং এমন সত্তার কাছে চলে গেছে যিনি তাদের কোন ওজর-কৈফিয়াত শুনবেন না। আমরা তাদের উত্তরাধিকারী হয়েছি। সুতরাং আমাদের উচিত হবে, তাদের যে জিনিসগুলো আমরা অপছন্দ করি তা থেকে দূরে থাকা এবং যা পছন্দ করি তা 'আমল করা।[১৬]

---

১৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/১৩৯; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৯
১৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৯
১৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৬৪, ১৯১
১৬. প্রাগুক্ত-৩/১২৮

একবার তিনি কোন এক প্রয়োজনে তৎকালীন শাসকের নিকট যান এবং এভাবে নিজের কথা তুলে ধরেন : একটি প্রয়োজনে আমি আপনার নিকট এসেছি এবং সেই প্রয়োজনের কথাটি পূর্বেই আল্লাহকে জানিয়েছি। এখন আল্লাহ যদি তা পূরণের জন্য আপনাকে অনুমতি দেন তাহলে আপনি পূরণ করুন। আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। আর তিনি যদি পূরণের অনুমতি না দেন, আপনি পূরণ করবেন না এবং সে ক্ষেত্রে আমরা আপনাকে মাজুর বা অপারগ মনে করবো।[১৭]

একবার তিনি ফলের বাজার দিয়ে যাচ্ছেন। ফল দেখে তিনি বললেন : তোমার সাথে আমার দেখা হবে জান্নাতে। আরেকবার তিনি গোশতের বাজার দিয়ে যাচ্ছেন। কসাইরা বললো : আবূ হাযিম, ভালো গোশত আছে, কিছু খরিদ করুন। বললেন : আমার কাছে কেনার মত পয়সা নেই। তারা বললো : পয়সা আপনি পরে দিবেন। তিনি বললেন : গোশত আমি পরেই খাব।[১৮]

হিজরী ৯৭ সনে উমাইয়্যা খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক মদীনার মসজিদে নববীতে নামায আদায় এবং রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি সালাম পেশের উদ্দেশ্যে দিমাশক থেকে মদীনার দিকে যাত্রা শুরু করেন। বহু কারী, মুহাদ্দিছ, ফকীহ্, 'আলিম, আমীর-উমারা ও সেনাকর্মকর্তা তাঁর সফরসঙ্গী হন। মদীনায় পৌঁছে একটু স্থির হবার পর সেখানকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ জনগণ তাঁকে সালাম ও স্বাগতম জানানোর জন্যে উপস্থিত হলো। কিন্তু সালামা ইবন দীনার, যিনি হলেন মদীনার কাজী, সর্বজনমান্য 'আলিম, ও নির্ভরযোগ্য ইমাম, গেলেন না। সুলায়মান ইবন 'আবিদল মালিক তাঁর নিকট আগত লোকদের সাথে সাক্ষাৎ দান ও কুশল বিনিময় শেষ করলেন। তারপর তিনি তাঁর কিছু সঙ্গী-সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : খনিজ পদার্থে যেমন মরিচা পড়ে তেমনি মানুষের অন্তরেও মরিচা পড়ে– যদি না তাকে কেউ উপদেশ দিয়ে তার মরিচা সাফ করে। তারা বললো : আমীরুল মু'মিনীন ঠিক কথাই বলেছেন।

সুলায়মান বললেন : মদীনাতে কি এমন কোন লোক নেই, যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) বেশ কিছু সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, আমাদেরকে উপদেশ দান করতে পারেন? লোকেরা বললো : হাঁ, আমীরুল মু'মিনীন, আবূ হাযিম আল-আ'রাজ আছেন। তিনি জানতে চাইলেন আবূ হাযিম আল-আ'রাজ কে?

তারা বললো : সালামা ইবন দীনার– মদীনার 'আলিম ও ইমাম এবং যেসব তাবি'ঈ বিপুল সংখ্যক সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন তাঁদেরই একজন। সুলায়মান বললেন : তাহলে তাঁকেই আমার কাছে নিয়ে এসো। তবে খুব সম্মানের সাথে আনবে। লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে খলীফার নিকট যাওয়ার জন্য বললো। তিনি রাজী হলেন।

---

১৭. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-১/২৪৩
১৮. প্রাগুক্ত-৩/১৮৬

সালামা খলীফার দরবারে উপস্থিত হলে খলীফা তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে নিজের কাছে বসালেন। তখন সেখানে ইবন শিহাব যুহ্‌রীও (রহ) বসা ছিলেন। তারপর খলীফা একটি অভিযোগের সুরে তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন :

– আবূ হাযিম! এ কেমন উপেক্ষা?

– আমীরুল মু'মিনীন! আমার মধ্যে আপনি কি ধরনের উপেক্ষা লক্ষ্য করলেন?

– বহু মানুষ আমার সাথে দেখা করতে এসেছে, অথচ আপনি আসলেন না!

– উপেক্ষা তো হয় পরিচয়ের পর। আপনি তো এর আগে আমাকে চিনতেন না, আর আমিও এর পূর্বে আপনাকে কখনো দেখিনি। তাহলে আমার দিক থেকে উপেক্ষা হলো কিভাবে?

খলীফা তখন তাঁর সঙ্গী-সাথীদের লক্ষ্য করে বললেন : শায়খ তাঁর কৈফিয়াত দানে ঠিক করেছেন, আর খলীফা তাঁর প্রতি অভিযোগ করে ভুল করেছে। তারপর তিনি আবূ হাযিমের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন :

– ওহে আবূ হাযিম, আমার অন্তর মাঝে কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জমা হয়ে আছে, আমি তা আপনার নিকট ব্যক্ত করতে চাই।

– আমীরুল মু'মিনীন, বলুন। আল্লাহ সাহায্যকারী।

– ওহে আবূ হাযিম, আমরা মৃত্যুকে অপছন্দ করি কেন?

– এ জন্য যে, আমরা দুনিয়াকে আবাসস্থল বানিয়েছি এবং আখিরাতকে বিধ্বস্ত করেছি। তাই আবাসস্থল ছেড়ে বিধ্বস্ত ভূমিতে যেতে অপছন্দ করি।

– আপনি সত্য বলেছেন। তারপর তিনি বললেন : আবূ হাযিম, আমি যদি জানতাম, আগামীকাল আল্লাহর কাছে আমার কি পাওনা আছে?

– আপনি আপনার কর্মকে আল্লাহর কিতাবের কাছে উপস্থাপন করুন, জানতে পারবেন।

– আল্লাহর কিতাব কোথায় পাব?

– আপনি তা পাবেন আল্লাহর এই বাণীর মধ্যে :

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ.[১৯]

– সৎকর্মশীলরা থাকবে জান্নাতে এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে।

খলীফা বললেন : তাহলে আল্লাহর যে রহমতের কথা বলা হয় তা কোথায়?

আবূ হাযিম বললেন :

إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ.[২০]

– নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

---

১৯. সূরা আল-ইনফিতার-১৩-১৪
২০. সূরা আল-আ'রাফ-৫৬

খলীফা– হায়, আমি যদি জানতে পারতাম, আগামীকাল আল্লাহর কাছে আমার আগমন কেমন হবে?

আবূ হাযিম– সৎকর্মশীলদের আগমন হবে একজন প্রবাসীর তার পরিবারে ফিরে আসার মত। আর একজন অসৎকর্মশীলের আগমন হবে একজন পালিয়ে যাওয়া দাসের মত যাকে ধরে টেনে-হেঁচড়ে আবার তার মনিবের কাছে আনা হয়।

এরপর খলীফা কেঁদে দিলেন। সে কান্নার আওয়াজ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠলো। তারপর একটু সুস্থির হয়ে বললেন : আবূ হাযিম, এর থেকে আমাদের পরিত্রাণের উপায় কি?

আবূ হাযিম– আপনারা আপনাদের ভিতরের গর্ব-অহঙ্কারের মলিনতা দূর করে আত্মমর্যাদাবোধের পরিচ্ছদ ধারণ করুন।

খলীফা– আর এই যে অর্থ-বিত্ত এ ক্ষেত্রে খোদাভীতির পথ কি?

আবূ হাযিম– যদি তা সঠিকভাবে অর্জন করেন, সঠিকভাবে রক্ষা করেন, সমভাবে বণ্টন করেন এবং এ ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে সেটাই হবে খোদাভীতি।

খলীফা– আবূ হাযিম, আমাকে বলুন তো, সবচেয়ে ভালো মানুষ কে?

আবূ হাযিম– আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী খোদাভীরু মানুষ।

খলীফা– আবূ হাযিম, বলুন তো সবচেয়ে ভালো কথা কোনটি?

আবূ হাযিম– যদি কোন ব্যক্তি কাউকে ভয় করে অথবা কারো নিকট কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করে এবং তার মুখের উপর যদি সত্য কথাটি বলে দেয় তাহলে সেটাই হবে সবচেয়ে ভালো কথা।

খলীফা– আবূ হাযিম, কোন দু'আ সবচেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি কবুল হয়?

আবূ হাযিম– সৎকর্মশীলদের দু'আ সৎকর্মশীলদের জন্য।

খলীফা– সবচেয়ে ভালো সাদাকা (দান) কোনটি?

আবূ হাযিম– একজন স্বল্পবিত্তের মানুষ একজন হত-দরিদ্র মানুষের হাতে যা কিছু তুলে দেয়, সেটাই সবচেয়ে ভালো দান। যদি না তার পেছনে খোঁটা অথবা কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য হয়।

খলীফা– সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান কে?

আবূ হাযিম– যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের সুযোগ পেয়ে তা বাস্তবায়ন করে এবং মানুষকে তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে, সেই সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান।

খলীফা– তাহলে সবচেয়ে বেশী নির্বোধ কে?

আবূ হাযিম– যে ব্যক্তি তার বন্ধুর ইচ্ছা অনুযায়ী চলে এবং সেই বন্ধুটিও একজন অত্যাচারী। তখন সে মূলতঃ তার আখিরাতকে অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়।

খলীফা– আবূ হাযিম, আপনি কি আমাদেরকে সঙ্গ দিতে পারেন? আপনি আমাদের থেকে কিছু গ্রহণ করবেন এবং আমরা আপনার থেকে কিছু গ্রহণ করবো।

আবূ হাযিম– আমীরুল মু'মিনীন, তা সম্ভব নয়।

খলীফা– কেন?

আবূ হাযিম– আমার ভয় হয়, আমি আপনাদের উপর একটু নির্ভরশীল হয়ে পড়ি কিনা। আর তাহলে আল্লাহ আমাকে বেশী করে দুনিয়ার কষ্ট ও আখিরাতের শাস্তি দিবেন।

খলীফা– আবূ হাযিম, আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা আমার কাছে একটু ব্যক্ত করুন।

এবার আবূ হাযিম কোন জবাব না দিয়ে চুপ থাকলেন। তারপর বললেন : আপনার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান সত্তার নিকট আমি তা পেশ করেছি। তিনি সেই প্রয়োজনের যতটুকু আমাকে দেন হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করি। আর যতটুকু না দেন, আমি খুশী থাকি। খলীফা আবার বললেন : আবূ হাযিম, আমার কাছে আপনি আপনার প্রয়োজনের কথা একটু বলুন, যেভাবেই হোক আমি তা পূরণ করবো।

আবূ হাযিম– আমার প্রয়োজন এই যে, আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচান এবং জান্নাতে প্রবেশ করান।

খলীফা– আবূ হাযিম, সেটাতো আমার কাজ নয়।

আবূ হাযিম– আমীরুল মু'মিনীন, এছাড়া আমার তো আর কোন প্রয়োজন নেই।

খলীফা– আবূ হাযিম, আমার জন্য দু'আ করুন।

আবূ হাযিম– হে আল্লাহ, সুলায়মান যদি আপনার প্রিয় বান্দাদের একজন হয়ে থাকেন তাহলে আপনি তার দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথকে সহজ করে দিন। আর যদি তিনি আপনার শত্রুদের একজন হন তাহলে তাঁকে সংশোধন করে দিন এবং আপনি যা ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন সেদিকে চলার পথ তাঁকে দেখিয়ে দিন।

এ দু'আ শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো : আপনি আমীরুল মু'মিনীনের দরবারে ঢোকার পর থেকে যা কিছু বলেছেন তার মধ্যে এ দু'আটি হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আপনি মুসলমানদের খলীফাকে আল্লাহর দুশমনদের মধ্যে গণ্য করে তাঁকে কষ্ট দিয়েছেন। জবাবে আবূ হাযিম বললেন : আপনার কথা ঠিক নয়। বরং আপনি যা বললেন সেটাই নিকৃষ্ট কথা। আল্লাহ তা'আলা 'আলিমদের নিকট থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তারা যেন সত্য কথা বলেন।

আল্লাহ বলেন : لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ.

– অবশ্যই তোমরা তা মানুষের কাছে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না।

একথা বলার পর তিনি আমীরুল মু'মিনীনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন, আমাদের পূর্বে পৃথিবীর যে সব জাতি-গোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে তারা ততদিন শুভ ও কল্যাণের মধ্যে থেকেছে যতদিন তাদের শাসকগণ তাঁদের 'আলিমদের জ্ঞানের

প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের নিকট গিয়েছেন। তারপর এমন এক নির্বোধ শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হয় যারা জ্ঞান অর্জন করে। অতঃপর তার বিনিময়ে পার্থিব কিছু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তা নিয়ে শাসকদের দরবারে উপস্থিত হয়। ফলে শাসকরা 'আলিমদের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হারিয়ে ফেলে। সুতরাং তারা বিফল ও ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহর কাছেও হেয় ও অপমানিত হয়েছে। 'আলিমরা যদি শাসকদের নিকট যা আছে তার প্রতি অনাসক্তি ও বীতস্পৃহা দেখায় তাহলে শাসকরা তাদের জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হয়। কিন্তু 'আলিমরা যখনই শাসকদের নিকট যা কিছু আছে তার প্রতি আসক্ত হয়েছে, তখনই তাঁরা 'আলিমদের জ্ঞানের প্রতি নিরাসক্ত হয়েছে এবং তাঁদেরকে হেয় ও অপমান করেছে।

খলীফা– আপনি সত্য বলেছেন। আমাকে আরো একটু উপদেশ বাণী শোনান। আমি এমন কাউকে দেখিনি, আপনার চেয়ে জ্ঞান ও বিজ্ঞতা যার মুখের অধিক নিকটবর্তী।

আবূ হাযিম বললেন, যদি আপনি বাস্তবায়নকারী লোক হন তাহলে এ পর্যন্ত আমি যা কিছু বলেছি তাই আপনার জন্য যথেষ্ট। আর যদি তা না হন তাহলে এমন ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করা আমার উচিত হবে না যাতে ছিলা নেই।

খলীফা বললেন : আবূ হাযিম, আমি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছি, আপনি আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন।

আবূ হাযিম বললেন : হাঁ, আপনাকে খুব সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উপদেশমূলক কথা বলছি : – আপনার মহামহিম প্রভুকে অতি বড় করে দেখুন। আর যেখানে আপনাকে তিনি যেতে নিষেধ করেছেন সেখানে তিনি আপনাকে দেখতে পান এবং যেখানে যেতে আদেশ করেছেন সেখানে তিনি আপনাকে দেখতে না পান– এ ব্যাপারে তাঁকে আপনি পবিত্র ঘোষণা করুন। আর একথা জেনে রাখুন, এই শাসন কর্তৃত্ব আপনার পূর্ববর্তী একজনের মৃত্যুর পরেই কেবল আপনার হাতে এসেছে। সুতরাং আপনার হাত থেকে সেভাবেই চলে যাবে যেভাবে আপনি লাভ করেছেন।

একথা বলার পর তিনি সালাম দিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যত হন। খলীফা তখন বললেন :

– আল্লাহ আপনার মত উপদেশ দানকারী 'আলিমকে ভালো প্রতিদান দিন।

আবূ হাযিম খলীফার নিকট থেকে উঠে বাড়ীতে পৌঁছার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে দীনার ভর্তি একটি থলে নিয়ে খলীফার লোক হাজির হলো। সাথে একটি ছোট্ট চিঠিও নিয়ে এসেছে। তাতে লেখা আছে : 'এগুলো আপনি খরচ করুন। এ রকম আরো অনেক কিছুই আপনি আমার কাছ থেকে পাবেন।'

আবূ হাযিম দীনার ভর্তি থলেটি ফেরত পাঠালেন একথা বলে : হে আমীরুল মু'মিনীন, আমার কাছে আপনার প্রত্যাশা হাসি-তামাশা এবং আপনার কাছে আমার এই ফিরিয়ে দেওয়া অহেতুক ও অসার হওয়ার ব্যাপারে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই। হে আমীরুল মু'মিনীন, যে জিনিস আমি আপনার কাছে থাকা পছন্দ করিনে তা আমার কাছে থাকবে, সেটা আমি কিভাবে পছন্দ করতে পারি? হে আমীরুল মু'মিনীন, এই দীনার যদি আপনার

সাথে সাক্ষাতের সময় যেসব কথা আমি আপনাকে বলেছি তার বিনিময়ে হয় তাহলে আমার অসহায় অবস্থায় আমার জন্য মৃত জীব-জন্তু ও শূকরের গোশত এর চেয়ে বেশী হালাল হবে। আর এগুলো যদি বায়তুল মালে আমার অধিকারের অংশ হয় তাহলে এ অধিকারে কি আমার ও অন্যসব লোকদের মধ্যে সমতা বিধান করা হয়েছে?[২১]

আবূ হাযিম সালামার বাড়ীটি ছিল জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী, সৎকর্ম ও কল্যাণের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য একটি সুস্বাদু পানির ঝর্নাস্বরূপ। আত্মীয়, বন্ধু, ভক্ত ও শিক্ষার্থী সবাই সমানভাবে সেখানে ভীড় জমাতো। একবার 'আবদুর রহমান ইবন জারীর তাঁর ছেলেকে সংগে করে আবূ হাযিমের বাড়ীতে গেলেন এবং দু'জনই তাঁর পাশে বসলেন। তারপর তাঁরা তাঁকে সালাম দিয়ে তাঁর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে দু'আ করলেন। আবূ হাযিম তাঁদের সালামের জবাব দিয়ে তাঁদেরকে স্বাগত জানালেন। তারপর তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা আরম্ভ হলো। 'আবদুর রহমান ইবন জারীর বললেন : আবূ হাযিম, আমরা অন্তরের জাগরণ দ্বারা কিভাবে উপকৃত হই?

আবূ হাযিম : অন্তর পরিশুদ্ধির সময় সকল কবীরা গুনাহ মাফ করা হয়। বান্দা যখন পাপ কাজ ছেড়ে দেওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয় তখন সে বিজয়ী হয়। 'আবদুর রহমান, একথা ভুলে যেও না যে, দুনিয়ার অতি সামান্য জিনিস আমাদেরকে আখিরাতের অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত রাখে। আর যেসব অর্থ-সম্পদ আমাদেরকে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকটবর্তী করে না তা সবই আল্লাহর শাস্তি ও ক্রোধ বলে জানবে। ছেলে বললো : আমাদের শায়খ তথা মাননীয় ব্যক্তি অনেক। আমরা কার অনুসরণ করবো?

আবূ হাযিম : আমার প্রিয় ছেলে, তুমি সেই ব্যক্তির অনুসরণ করবে যে গোপন বিষয় প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, সকল প্রকার দোষ-ক্রটি ও পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে, জীবনের শুরুতেই নিজেকে সংশোধন করে এবং সংশোধনের কাজটি বার্দ্ধক্যে করবে বলে অপেক্ষা করে না। ছেলে, তুমি জেনে রাখ, সূর্য উদিত হয় এমন প্রত্যেকটি দিনে একজন তালিবে 'ইলম (জ্ঞান অন্বেষণকারী)-এর অন্তর মাঝে তার প্রবৃত্তি ও জ্ঞান মুখোমুখি হয় এবং দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির মত পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যদি তার জ্ঞান তার প্রবৃত্তিকে পরাজিত করতে পারে তাহলে সেদিনটি তার বড় লাভের দিন হয়ে থাকে। আর যদি তার প্রবৃত্তি তার জ্ঞানকে পরাজিত করে তাহলে সেটি তার বড় ক্ষতির দিন হয়ে থাকে।

'আবদুর রহমান ইবন জারীর বললেন : আবূ হাযিম, আপনি প্রায়ই আমাদেরকে শোকর (কৃতজ্ঞতা)-এর ব্যাপারে উৎহাসিত করে থাকেন। এই শোকর-এর প্রকৃতি ও গূঢ় রহস্য কি?

---

২১. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৩/১৬৩; 'উয়ূন আল-আখবার-২/৩৭০; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৪২; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবিয়ীন-১৮২-১৯২; 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৪৩-৩৪৭

আবূ হাযিম– আমাদের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর শোকর-এর একটি হক বা অধিকার আছে। আবদুর রহমান প্রশ্ন করলেন : দু' চোখের শোকর কি?

আবূ হাযিম– যদি আপনি তাদের দ্বারা ভালো কিছু দেখেন, প্রকাশ করবেন। আর খারাপ কিছু দেখলে গোপন করবেন।

আবদুর রহমান– দু'কানের শোকর কি?

আবূ হাযিম– তাদের দ্বারা ভালো কিছু শুনলে মনে রাখবেন। আর খারাপ কিছু শুনলে ভুলে যাবেন।

আবদুর রহমান– দু'হাতের শোকর কি?

আবূ হাযিম– আপনার যা নয়, তাদের দ্বারা তা ধরবেন না। আর তাদের দ্বারা আল্লাহর কোন হক বা অধিকারে বাধা দিবেন না। ওহে আবদুর রহমান, একথা স্মরণ রাখবেন যে, যে ব্যক্তি তার শোকর বা কৃতজ্ঞতা কেবল জিহ্বার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে এবং তার সাথে তার সকল অঙ্গ-প্রত্যক্ষ ও অন্তরের সবটুকু অংশীদার করে না, তার দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মত যার একটি চাদর আছে, কিন্তু তার সবটুকু গায়ে না জড়িয়ে শুধু একটি পাশ গায়ে জড়ায়। ফলে সেটি তাকে গরম ও ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাতে পারে না।[২২]

একবার সালামা ইবন দীনার আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মুসলিম মুজাহিদদের সাথে বের হলেন। মুজাহিদদের এ বাহিনীটি রোমান বাহিনীর সাথে যুদ্ধের জন্য যাচ্ছিল। তারা তাদের গন্তব্য স্থলের কাছাকাছি পৌঁছে শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হওয়া ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আগে একটু বিশ্রাম করে নিতে চাইলো। এই বাহিনীতে বানূ উমাইয়্যার একজন আমীর বা শাসক ছিলেন। এই বিশ্রামকালীন সময়ে তিনি আবূ হাযিমের কাছে একজন লোক পাঠালেন। তিনি লোকটিকে বলে দিলেন, তুমি আবূ হাযিমের নিকট গিয়ে এই কথাটি বলবে : হাদীছ ও ফিকাহ্‌র মাসলা-মাসায়িল বলার জন্য আমীর আপনাকে একটু ডেকে পাঠিয়েছেন।

একথা শোনার সাথে সাথে আবূ হাযিম লিখলেন : 'হে আমীর, আমি এমন সব জ্ঞানী ব্যক্তির সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভ করেছি যাঁরা কখনো দীনকে দুনিয়াদার ব্যক্তির কাছে বয়ে নিয়ে যাননি। আমি মনে করি না যে, যারা এমন কাজ করবে তাদের প্রথম ব্যক্তি আপনি আমাকে বানাতে চান। আমার কাছে কোন প্রয়োজন থাকলে আপনি নিজেই আসুন। ওয়াস্ সালামু 'আলায়কা ওয়া 'আলা মান মা'আকা– আপনার প্রতি ও আপনার সাথে যারা আছে তাদের সবার প্রতি সালাম।'

আমীর চিঠিটি পড়ে তাঁর কাছে গেলেন, কুশল বিনিময় করলেন এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির দু'আ করে বললেন : আবূ হাযিম, আপনি যা লিখেছেন তার সাথে আমি একমত। এ চিঠির মাধ্যমে আপনি আমাদের মধ্যে আপনার সম্মান ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে

---

২২. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৯২-১৯৪; 'আসরুত তাবিয়ীন-৩৪৩

ফেলেছেন। এখন আপনি আমাদেরকে কিছু উপদেশ দান করুন। আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ আপনাকে ভালো প্রতিদান দিন।

আবূ হাযিম তাঁকে অনেক উপদেশ দিলেন। তিনি যেসব কথা বলেছিলেন তার কিছু এ রকম : শুনুন! যা আখিরাতে আপনার সাথে থাকুক বলে আপনি চান, দুনিয়াতে তা পেতে লোভ করুন। আর সেখানে যা আপনার সাথে থাকা আপনি অপছন্দ করেন, এখানেই তার প্রতি নিরাসক্ত হোন। ওহে আমীর, জেনে রাখুন, মিথ্যা ও অসত্য যদি আপনার প্রিয় হয় এবং আপনার দ্বারা প্রচলিত হয় তাহলে কপট লোকেরা ও বাতিলপন্থীরা আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং আপনার পাশে ভীড় করবে। আর যদি সত্য আপনার প্রিয় হয় এবং আপনি তা প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে সৎকর্মশীলরা আপনার পাশে সমবেত হবে এবং আপনাকে সত্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে। সুতরাং আপনি এ দু'টির যেটি আপনার ভালো লাগে, বেছে নিন।[২৩]

হিজরী ১৪০ সনে অথবা তার পরে আবূ হাযিমের মৃত্যু হয়।[২৪] তাঁর জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে প্রশ্ন করলো : আবূ হাযিম, আপনি নিজেকে কেমন দেখতে পাচ্ছেন? বললেন : দুনিয়ার যা কিছু আমি লাভ করেছি তার মন্দ থেকে যদি আমি মুক্তি পাই তাহলে যা কিছু সরিয়ে ও গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে তা আমাকে ক্ষতি করবে না। তারপর তিনি নিম্নের এ আয়াতটি বার বার আবৃত্তি করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন :[২৫]

إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًّا ٠

– যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ্ ভালবাসা দেবেন।[২৬]

---

২৩. সিফাতুস সাফওয়া-২/৮৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৪

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. সূরা মারয়াম-৯৬

২৬. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৯৬

রাবী' ইবন খুছায়ম (রহ)

আবূ ইয়াযীদ রাবী' ইবন খুছায়ম বংশগত দিক দিয়ে আরবের ছা'লাবা গোত্রের একটি শাখা গোত্র ছাওর-এর সন্তান। পিতার নাম খুছায়ম ইবন 'আ'ইশ। যে সকল তাবি'ঈ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকাল পেয়েছিলেন, কিন্তু সাহাবীর মর্যাদা লাভ থেকে বঞ্চিত থেকে যান, রাবী' তাঁদের একজন। তিনি সাহাবী হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে গেলেও সে যুগের বহুবিধ কল্যাণ লাভে ধন্য হন। জ্ঞান ও কর্ম এবং দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা ও খোদাভীতির দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট তাবি'ঈ। ইমাম যাহ্বী বলেছেন, যে আটজন দুনিয়া বিরাগী তাপস রাসূলুল্লাহর (সা) যুগ লাভ করেন রাবী' তাঁদের একজন।[১]

তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান তাবি'ঈ। তবে তাঁর জ্ঞানের আলোকে নিস্প্রভ করে দেয় তার দুনিয়া বিমুখতা ও খোদাভীতির জ্যোতি। এ কারণে তিনি 'ইলমের চেয়ে তাকওয়ার মাধ্যমে বেশী প্রসিদ্ধ। জ্ঞানগত উৎকর্ষ তিনি যতটুকু অর্জন করেছিলেন তাতে তাঁর সমকালীনদের মধ্যে বিশেষ স্থানের অধিকারীই ছিলেন। এমন একটা সময় তিনি লাভ করেন যখন 'আলিম সাহাবীদের বড় একটি দল বিদ্যমান ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে বিশেষভাবে 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) ও আবূ আইউব আল-আনসারীর নিকট জ্ঞান অর্জন করেন।[২] এ দু'জনের মধ্যে আবার 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) নিকট থেকে বেশী ফায়দা লাভ করেন। তাঁর সাথে রাবী'র এত গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে, যতক্ষণ তিনি 'আবদুল্লাহর (রা) নিকট থাকতেন এবং দু'জনের একান্ত আলোচনা শেষ না হতো ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেত না। ইবন মাস'উদ (রা) তাঁর গুণাবলী ও আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষে এত মুগ্ধ ছিলেন যে, তিনি প্রায়ই বলতেন, আবূ ইয়াযীদ! রাসূলুল্লাহ (সা) যদি তোমাকে দেখতেন, দারুণ ভালোবাসতেন। আমি যখন তোমাকে দেখি তখন আমার বিনয়ী লোকদের কথা স্মরণ হয়।[৩] 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) সাহচর্য এমন ছিল যে, অতি সাধারণ মানুষকেও একজন বড় 'আলিমে পরিণত করে দিয়েছে। রাবী' ছিলেন স্বভাবগতভাবে একজন সত্যনিষ্ঠ এবং অসম্ভব যোগ্য ব্যক্তি। এ কারণে তিনি ইবন মাস'উদের (রা) জ্ঞান ভাণ্ডার দ্বারা বেশী উপকার লাভ করেন।

কুরআন, হাদীছ, ফিকাহ্ তথা সব ধরনের জ্ঞানে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। বাস্তব দিক দিয়ে কুরআনের সাথে তাঁর সবচেয়ে বেশী সম্পর্ক ছিল। কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং কুরআনের আয়াত দ্বারা যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। সকল ওয়াজ-নসীহত ও বক্তৃতা-ভাষণে অত্যন্ত সার্থকভাবে কুরআনের আয়াত উপস্থাপন করতেন।

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/২৫৮
২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/২৪২
৩. তাবাকাত-৬/১২৭

তিনি সবসময় কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি হয়তো মাসহাফ হাতে কুরআন তিলাওয়াত করছেন, তখন হঠাৎ কোন লোক এসে গেল। তিনি মাসহাফটি তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলতেন যাতে আগন্তুক লোকটি তা না দেখতে পারে।[৪]

সাধারণতঃ তাঁর ও'য়াজ-নসীহত হতো কুরআনের উদ্ধৃতি সহকারে নিম্নরূপ :

হে আল্লাহর বান্দারা! সবসময় ভালো কথা বলবে, ভালো কাজ করবে, ভালো স্বভাবের উপর থাকবে, নিজের জীবনকালকে বেশী বলে মনে করবে না, নিজের অন্তরকে কঠিন করে তুলবে না এবং সেইসব লোকের মত হবে না যারা বলে আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনে না।

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَيَسْمَعُوْنَ.[৫]

– তোমরা সেইসব লোকের মত হয়ো না যারা বলে আমরা শুনেছি, অথচ তারা শোনে না।

হে আল্লাহর বান্দারা! যদি তোমরা ভালো কাজ কর, তাহলে তা ক্রমাগতভাবে করতে থাকবে। কারণ সেদিন খুব শিগগির এসে যাবে যখন তোমরা এ অনুশোচনা করতে থাকবে যে, হায় আফসোস! এই ভালো কাজ যদি আরো বেশী করতাম! যদি তোমার দ্বারা খারাপ কিছু ঘটে যায় তাহলেও ভালো কাজ করবে। আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ـ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ.[৬]

– ভালো কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। আর এ হলো উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।

হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ তাঁর কিতাবের মাধ্যমে যে জ্ঞান তোমাদেরকে দান করেছেন, সে জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যে জ্ঞান তোমাদেরকে দেননি; বরং নিজের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন, সেই জ্ঞানে পারদর্শীদের জন্য তা ছেড়ে দাও। কোন কৃত্রিমতার আশ্রয় নিও না। আল্লাহ বলেছেন :

قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ، إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِيْنَ، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيْنٍ.[৭]

– হে নবী! আপনি বলে দিন, আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। আর আমি কোন কৃতিত্রমতাশ্রয়ীদের অন্তর্গত লোক নই। আর এই কুরআন বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ। আর এমন এক সময় আসবে যখন তার প্রকৃত অবস্থা অবশ্যই তোমরা জানবে।[৮]

---

৪. 'আসরুত তাবি'ঈন, ২১১; সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন, ৬২
৫. সূরা আল-আনফাল-৩
৬. সূরা হূদ-৯
৭. সূরা সাদ-৫
৮. তাবাকাত-৬/১২৮

হাদীছের ক্ষেত্রে ইমাম যাহ্বী তাঁকে ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।[৯] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা), আবূ আইউব আল-আনসারী (রা), 'আমর ইবন মায়মূন (রা), 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা (রা) প্রমুখ সাহাবীর নিকট থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। আর ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ, ইমাম শা'বী, মুনযির ছাওরী, হিলাল ইবন ইয়াসাফ, বাকর ইবন মা'ইয প্রমুখের মত বিখ্যাত তাবি'ঈগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন।[১০] গ্রহণযোগ্যতার দিক দিয়ে তাঁর বর্ণনার কি স্থান ছিল তা এই শাস্ত্রের বিভিন্ন মনীষীর মন্তব্য দ্বারা অনুমান করা যায়। যেমন, ইমাম শা'বী বলতেন : রাবী' সত্যবাদিতার খনি।[১১] আর ইবন মু'ঈন বলতেন, রাবী'র মত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু ঘাঁটাঘাঁটির কোন প্রয়োজন নেই।[১২]

ফকীহ্ হিসেবে রাবী' যদিও তেমন খ্যাতি অর্জন করেননি, তবে তাঁর ফিকাহ্ বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য এ সনদ যথেষ্ট যে, তিনি ছিলেন সেই ফকীহুল উম্মাত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) নিকট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র, যাঁর ফাতওয়ার উপর ইরাকী ফিকাহ্ ভিত্তিশীল। তবে পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, তাঁর সীমাহীন যুহ্দ ও তাকওয়া তথা দুনিয়াত্যাগী মনোভাব ও খোদাভীতি তাঁর সব যোগ্যতাকে ম্লান করে দিয়েছে।

সাধারণতঃ দেখা যায় প্রতিটি খান্দানের এমন কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকে যা কম-বেশী তার সদস্যদের মধ্যে পাওয়া যায়। কোন খান্দান জ্ঞান ও বিভিন্ন শাস্ত্রে এবং কোন খান্দান যুহ্দ ও তাকওয়া এবং অন্য কোন বিশেষ গুণের জন্য বিশিষ্ট হয়ে থাকে। রাবী'র খান্দান বানূ ছাওর ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শাবরামা বলেন, আমি কূফায় বানূ ছাওরের চেয়ে বেশী ফকীহ্ ও 'ইবাদাত-বন্দেগী করা বুযর্গ মানুষ আর কোন খান্দানে দেখিনি। আবূ বকর আয-যুবায়দী তাঁর পিতার কথা বর্ণনা করতেন যে, 'আমি ছাওরী ও 'আরানী গোত্রদ্বয়ের চেয়ে বেশী মসজিদে অবস্থানকারী মানুষ অন্য কোন খান্দানে দেখিনি।[১৩]

রাবী' ছিলেন এমন একটি 'ইবাদাত-বন্দেগী করা খান্দানের সদস্য, যে খান্দান দীনী ও রূহানী সম্পূর্ণতায় অন্য সবার চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি কেবল তাঁর খান্দানের মধ্যে নন, বরং গোটা তাবি'ঈ জামা'আতের সবচেয়ে বেশী 'ইবাদাতকারী ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। তিনি ছিলেন সেই মুষ্টিমেয় তাবি'ঈদের অন্যতম যাঁরা যুহ্দ ও তাকওয়ার দিক দিয়ে গোটা তাবি'ঈ সমাজের শীর্ষে ছিলেন।[১৪] তাঁর যুহ্দ ও তাকওয়া এবং 'ইবাদাত-বন্দেগীর ব্যাপারে সকল 'আলেম ও লেখক একমত। ইমাম শা'বী বলেন, রাবী' তাঁর দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খোদাভীরু ছিলেন।[১৫] আবূ 'উবায়দা বলেন, আমি রাবী'র

---

৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৭
১০. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৩/২৪২; 'আসরুত তাবি'ঈন, ২০৮
১১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৭
১২. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৩/২৪২
১৩. তাবাকাত-৬/১৩৩
১৪. তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৩/২৪২
১৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৮

Contents

চেয়ে বেশী ভালো 'ইবাদাতকারী আর কাউকে দেখিনি।[১৬] ইবন হাজার আল-'আসকালানী লিখেছেন, রাবী'র যুহ্দ এবং তাঁর 'ইবাদাত এত প্রসিদ্ধ যে, সে বিষয়ে কিছু লেখার কোন প্রয়োজন নেই।[১৭]

সকল ভালো কাজের মূল উৎস হলো আল্লাহর ভয়। রাবী'র মধ্যে আল্লাহর ভয় এত প্রবল ছিল যে, কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। দোযখের 'আযাবের অতি সাধারণ পার্থিব নমুনা দেখেও তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। আ'মাশ বর্ণনা করেছেন : একবার রাবী' কামারের ভাটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভাটিতে জ্বলন্ত লোহা দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।[১৮]

আরেকবারের একটি ঘটনা তাঁর বন্ধুদের একটি দল বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, একদিন আমরা 'আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদের (রা) সাথে বের হলাম। আমাদের সাথে রাবী' ইবন খুছায়মও ছিলেন। আমরা ফুরাত নদীর তীরে পৌঁছলাম। সেখানে চুন বানানোর একটি ভাটির পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। তখন চুন বানানোর জন্য সেই ভাটিতে পাথর ফেলা হচ্ছিল। তাতে দাউ দাউ করে প্রচণ্ড গর্জন সহকারে আগুন জ্বলছিল এবং তার লেলিহান শিখা বহু উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে রাবী' থমকে দাঁড়িয়ে যান এবং ভীষণ কাঁপতে শুরু করেন। এ অবস্থায় তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে থাকেন :[১৯]

إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوْا لَـهَا تَغَيُّظًـا وَزَفِـيْرًا، وَإِذَا أُلْقُوْا مِنْـهَا مَكَانًـا ضَيِّقًا مُقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هنالك ثُبُوْرًا.[২০]

— আগুন যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। যখন এক শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে মৃত্যুকে ডাকবে।

তারপর তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। আমরা তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং দীর্ঘক্ষণ সেবার পর তিনি হুঁশ ফিরে পান। আমরা তাঁকে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে পৌঁছে দিই।

'ইবাদাত-বন্দেগী ও তাকওয়া-পরহেযগারীর ভিতর দিয়েই রাবী' তাঁর জীবন শুরু করেন। শৈশব-কৈশোরেও সীমাহীন খোদাভীতি তাঁর মধ্যে বিরাজমান ছিল। এত অল্প-বয়সেও 'ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে রাত কাটিয়ে দিতেন। আল্লাহর আযাবের ভয়ে কেঁদে-কেটে অস্থির হয়ে পড়তেন। তাঁর সম্মানিতা মা ঘুমিয়ে পড়তেন। এক ঘুম পর গভীর রাতে জেগে দেখতেন তাঁর কিশোর ছেলেটি তখনো জায়নামাযে দাঁড়িয়ে অথবা

---

১৬. তাবাকাত-৬/১২৭
১৭. তাহযীবুত তাহযীব-৩/২৪২
১৮. তাবাকাত-৬/১৩১
১৯. সিফাতুস সাফওয়া-৩/৬২; হিলয়াতুল আওলিয়া-২/১১২
২০. সূরা আল-ফুরকান-১২-১৩

একাগ্রচিত্তে মুনাজাতে নিমগ্ন। মা ডেকে বলতেন : রাবী' তুমি এখনো ঘুমাওনি? তিনি বলতেন : মা, সেই ব্যক্তি কেমন করে রাতের অন্ধকারে ঘুমাতে পারে যে জবাবদিহিতার ভয় করে? ছেলের জবাব শুনে বৃদ্ধ মায়ের চোখের পানিতে দু'গাল ভিজে যেত। তিনি প্রাণ ভরে ছেলের কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর দরবারে দু'আ করতেন।

রাবী' যুবক হলেন। আর সাথে সাথে তাঁর তাকওয়া-পরহেযগারী এবং আল্লাহভীতিও যৌবন পেল। মানুষ যখন রাতের অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকতো, আল্লাহর ভয়ে রাবী'র কান্না-কাটিও তীব্রতা লাভ করতো। তাঁর এমন বিচলিত ও অস্থির অবস্থা দেখে মায়ের অন্তর ব্যথায় ভরে যেত। ছেলে সম্পর্কে নানা রকম দুশ্চিন্তা তাঁর মনে ভর করতো। এক সময় তিনি ছেলেকে ডেকে বলতেন :

– বেটা তোমার কি হয়েছে? মনে হচ্ছে তুমি কোন অপরাধ করে বসেছো? কোন মানুষকে খুন করেছো?

বলতেন : হাঁ, মা আমি মানুষ খুন করেছি। অস্থিরভাবে মা জানতে চাইতেন : বেটা, কাকে খুন করেছো? আমাকে বল। তাহলে আমরা নিহত ব্যক্তির পরিবারের লোকদেরকে খুশী করে ক্ষমা করিয়ে নিতে পারবো। আল্লাহর কসম! নিহতের পরিবারের লোকেরা যদি তোমার এ কান্নাকাটি ও রাত জাগার কথা জানতে পারে তাহলে অবশ্যই তারা তোমার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ দেখাবে।

তিনি বলতেন : আপনি কাকেও কিছু বলবেন না। আমি আমার নিজকে হত্যা করেছি। আমার নিজকে আমি পাপের দ্বারা হত্যা করেছি।[২১]

পরবর্তীকালে রাবী'র ছেলে বড় হয়ে যখন দেখতো, বাবা সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেন তখন সে মাঝে মাঝে বাবার ঘরে ঢুকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলতো : আব্বা! যথেষ্ট হয়েছে। এখন কি একটু ঘুমোবেন? তিনি জবাব দিতেন : আমার ছেলে! সেই ব্যক্তি কেমন করে ঘুমোতে পারে যে তার প্রভুর শাস্তির ভয় করে।[২২]

রাবী'র 'ইবাদাত-বন্দেগীর বিশেষ সময় ছিল রাতের অন্ধকার। সারা রাত 'ইবাদাতে কাটিয়ে দিতেন। উপদেশমূলক আয়াত পাঠ করতেন। তা দ্বারা এত বেশী প্রভাবিত হয়ে পড়তেন যে একই আয়াত বার বার পাঠ করতে করতে সকাল হয়ে যেত। তাঁর দাস নুসায়র ইবান যা'লূক বর্ণনা করেছেন। রাবী' রাতের অন্ধকারে তাহাজ্জুদ নামায পড়ার সময় যখন নিম্নের এ আয়াতে পৌঁছতেন তখন তা বার বার তিলাওয়াত করতে করতে সকাল হয়ে যেত।[২৩]

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السَّيِّاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَايَحْكُمُوْنَ.[২৪]

---

২১. সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন, ৬০-৬১
২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/২৬০
২৩. তাবাকাত-৬/১৩০
২৪. সূরা আল-জাছিয়া-২

– যারা খারাপ কাজ করেছে তারা কি এ ধারণা করে যে, আমরা তাদেরকে সেই লোকদের সমান করে দেব যারা ভালো কাজ করেছে? যাদের জীবন ও মরণ সমান। তারা কতই না খারাপ সিদ্ধান্ত নেয়।

'আবদুর রহমান ইবন 'আজলান বলেছেন। একদিন আমি রাবী'র ঘরে রাত্রি যাপন করি। তিনি যখন মনে করলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযের মধ্যে উপরের আয়াতটি তিনি বার বার তিলাওয়াত করেন। আর তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে।[২৫] জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক ছিলেন। কখনো জামা'আত ছাড়তেন না। শেষ জীবনে চলতে ফিরতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। তখনো জামা'আত তরক হতো না। অন্যের সাহায্যে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মসজিদে পৌছতেন। আবূ হায়্যান তাঁর পিতার কথা বর্ণনা করেছেন। রাবী' পঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়ে চলৎশক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলেন। তবে নামাযের জন্য হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে অথবা অন্যের সাহায্যে মসজিদে যেতেন। লোকেরা বলতো, আবূ ইয়াযীদ! আপনি তো এখন মা'জূর। এ অবস্থায় ঘরে নামায আদায়েরও অনুমতি আছে। জবাব দিতেন : حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ শোনার পর যতদূর সম্ভব সাড়া দেওয়া উচিত। তা সে হামাগুড়ি দিয়েই হোক না কেন।[২৬]

রাবী' একজন নির্জন-নিরিবিলির 'আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। আর এ কারণে খিলাফতে রাশেদার সময়ে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোথাও তাঁর উপস্থিতি দেখা যায় না। তবে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য নির্জন-নিরিবিলি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেন। তাঁর এই জিহাদ এমন নির্ভেজাল আল্লাহর জন্য হতো যে, মালে গনীমত মোটেই স্পর্শ করতেন না। ভাগে যা কিছু পেতেন তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে ফেলতেন। 'আবদি খায়র নামক এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আমি একবার একটি যুদ্ধে রাবী'র সঙ্গী ছিলাম। এ যুদ্ধে গনীমতের অংশে তিনি বহু দাস এবং গৃহপালিত জন্তু লাভ করেন। কিছুদিন পর কোন কারণে আমাকে আবার তাঁর কাছে যেতে হয়। তখন তাঁর কাছে সেই গনীমতের মালের কোন কিছুই দেখতে না পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম : সেই দাস ও জীবজন্তুগুলোর কি হয়েছে? তিনি কোন জবাব দিলেন না। আমি যখন আবার জিজ্ঞেস করলাম তখন বললেন :

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ.

– তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা যা কিছু ভালোবাস তা থেকে খরচ কর।[২৭]

ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে খরচ করা ছিল তাঁর বিশেষ গুণ। মিষ্টি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এ কারণে কোন সায়িল এলে তিনি তার হাতে একটি চিনির দলা তুলে

---

২৫. সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন, ৬২
২৬. তাবাকাত-৬/১৩২
২৭. প্রাগুক্ত-৬/১৩৩

দিতেন। লোকেরা যখন বলতো, এর চেয়ে তো তার রুটির প্রয়োজন বেশী। জবাবে তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন :[২৮]

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَأَسِيْرًا.[২৯]

– তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে।

তিনি বলতেন : 'মানুষকে ভালো খাবার খাওয়াবে, নতুন কাপড় পরাবে এবং সুস্থ-সবল দাস মুক্ত করবে।'[৩০]

অভাবী-প্রতিবেশীদেরকে তিনি ভালো ভালো খাবার পাকিয়ে খাওয়াতেন। মুনযির ছাওরী বর্ণনা করেছেন। একবার রাবী' তাঁর বাড়ীর লোকদেরকে 'খুবায়স' নামক এক প্রকার খাবার তৈরী করতে বলেন। যেহেতু তিনি কখনো নিজের জন্য কোন কিছুর আবদার করতেন না। এ কারণে তাঁর বেগম সাহেবা অতি যত্ন সহকারে 'খুবায়স' তৈরী করেন। তাঁর প্রতিবেশীদের মধ্যে এক উন্মাদ ব্যক্তিও ছিল। তিনি সেই 'খুবায়স' নিয়ে গিয়ে নিজ হাতে তুলে তাকে খাওয়ান। উন্মাদ লোকটির মুখ থেকে সব সময় লালা ঝরতো। তিনি যখন তাকে খাইয়ে ঘরে ফিরে আসেন তখন বেগম সাহেবা বললেন, আমি এত কষ্ট করে এবং এত যত্ন সহকারে খাবারগুলো তৈরী করলাম, আর আপনি এমন এক লোককে খাইয়ে এলেন যে এটাও বুঝতে অক্ষম যে, সে কি খেয়েছে। তিনি জবাব দিলেন : আল্লাহ তো জানেন।[৩১] তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ، وَمَاتُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ.[৩২]

– তোমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা যা কিছু ভালোবাস তা থেকে খরচ কর। আর তোমরা যা কিছু খরচ করবে, আল্লাহ্ তা জানেন।

রাবী'র জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল 'আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার' বা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। যদিও তিনি একজন নীরব ও নির্জনতা প্রিয় মানুষ ছিলেন, তবে আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার-এর জন্য নির্জনতা ছেড়ে বেরিয়ে এসে নীরবতা ঝেড়ে ফেলতেন। তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন তাদের তিনি বলতেন, তোমরা ভালো কথা বলবে এবং নিজেরা ভালো কথার উপর 'আমল করবে, সবসময় ভালোর উপর থাকবে। আর যতদূর সম্ভব বেশী বেশী নেক কাজ করবে এবং খারাপ কাজ কমিয়ে দেবে। নিজের অন্তরকে কঠোর করবে না। তোমার জীবনকাল এত দীর্ঘ নয়। সেইসব লোকের মত হবে না যারা মুখে তো বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শুনে না।

---

২৮. প্রাগুক্ত-৬/১৩১
২৯. সূরা আদ-দাহ্র-৮
৩০. আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়ীন-৩/১৫৮
৩১. তাবাকাত-৬/১৩১
৩২. সূরা আলে 'ইমরান-৯২

কেউ যদি তাঁকে কিছু উপদেশ শোনাতে বলতো, তিনি তাঁকে কুরআনের কিছু হুকুম-আহকাম লিখে দিতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে কিছু উপদেশ দিতে বলে। তিনি কিছু কাগজ চেয়ে নিয়ে সূরা আল-আন'আমের এ আয়াতটি লিখে দেন :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ... عَلَيْكُمْ. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. [৩৩]

লোকটি বললো, আমি আপনার নিকট এজন্য এসেছিলাম যে, আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দেবেন। বললেন : হাঁ, এর উপর 'আমল কর।[৩৪]

তাকওয়া-পরহিযগারীর গর্ব ও ঔদ্ধত্য থেকে রাবী' সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করা সত্ত্বেও কখনো পাপীদের সম্পর্কে তাঁর জিহ্বা থেকে কোন খারাপ কথা বের হতো না। নাসর ইবন যা'লূক বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি রাবী'র নিকট জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোন মানুষকে খারাপ বলেন না কেন? বললেন : আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত নই। অন্যকে খারাপ বলবো কেমন করে? মানুষের এ বিস্ময়কর অবস্থা যে, সে অন্যের পাপের ব্যাপারে তো আল্লাহকে ভয় করে; কিন্তু নিজের পাপের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না।[৩৫]

রাবী' আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অনুসরণের ব্যাপারে ভীষণ গুরুত্ব দিতেন। ছোট ছোট ও অতি সাধারণ কথা ও কাজে তিনি এত সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, কোন মানুষের চিন্তা ও কল্পনাও সেদিকে যেত না। বাকর ইবন মা'ইয বর্ণনা করেছেন। একবার রাবী'র ছোট্ট একটি মেয়ে বললো, আব্বা! আমি খেলতে যাচ্ছি। তিনি বললেন : যাও, ভালো কথা বলো। ছোট্ট বাচ্চা। তাঁর এ কথার অর্থ কেমন করে বুঝবে? লোকেরা রাবী'কে বললো : আপনি এই শিশুকে খেলতে যেতে দেন না কে? বললেন : আমি এটা চাই না, আমার আজকের আমলনামায় এ কথা লেখা হোক যে, আমি খেলার নির্দেশ দিয়েছি।[৩৬]

তিনি সকল কাজ নিজ হাতে করতেন। বাড়ীর পায়খানাও নিজ হাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেন। একবার এক ব্যক্তি বললো, এ কাজের জন্য তো অন্য মানুষ আছে। বললেন, আমি বাড়ীর কাজ-কর্মেও অংশীদার হতে চাই। তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়ীভাব দেখে তাঁর শিক্ষক হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলতেন, তোমাকে দেখে আমার বিনয়ী লোকদের কথা স্মরণ হয়।[৩৭] কখনো কোন অবস্থাতেই তাঁর মুখ থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী কোন কথা উচ্চারিত হতো না। কারো দ্বারা কষ্ট পেলেও তার জন্য দু'আ করতেন। একদিন মসজিদে মুসল্লীদের ভীষণ ভীড় ছিল। যখন জামা'আত আরম্ভ হতে যাচ্ছিল এবং ধীরে ধীরে লোকেরা সামনে এগুচ্ছিল, ঠিক সে সময় রাবী'র পিছনের

---

৩৩. সূরা আল-আন'আম-১৫১
৩৪. তাবাকাত-৬/১৩০
৩৫. প্রাগুক্ত-৬/১২৯
৩৬. প্রাগুক্ত-৬/১২৭
৩৭. প্রাগুক্ত-৬/১৩০

লোকটি তাঁকে বলে, সামনে এগোন। কিন্তু অত্যধিক ভীড়ের কারণে তিনি সামনে এগুতে পারছিলেন না। লোকটি রেগে গিয়ে পিছন থেকে রাবী'র ঘাড়ে খোঁচা দেয়। তিনি ব্যথা পান এবং একথা বলতে থাকেন : আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন। লোকটি চোখ উঁচু করে রাবী'কে দেখতে পেয়ে এত লজ্জিত হয় যে, কাঁদতে শুরু করে।

তিনি সব সময় একাকী থাকা পছন্দ করতেন। কোথাও আসা-যাওয়া করতেন না। কোন অনুষ্ঠান ও সমাবেশে বসাও পছন্দ করতেন না। ইমাম শা'বী বলেন, রাবী' বিবেক-বুদ্ধি হওয়ার পর না কোন মজলিসে বসেছেন, আর না কোন প্রধান সড়কে গেছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি বলতেন, আমি এটা পছন্দ করতাম না যে, কোন স্থানে যাই, আর সেখানে এমন কিছু দেখি যাতে আমাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়, আর আমি সাক্ষ্য দিতে না পারি, কোন অভাবী মানুষকে দেখি, আর তার কোন সাহায্য করতে না পারি, অথবা কোন মজলুমকে দেখি ও তার কোন উপকারে আসতে না পারি।

বাড়ীতেও তিনি সব সময় চুপচাপ থাকতেন। খুব কম কথা বলতেন। কোন বাজে কথা তার মুখে কখনো উচ্চারিত হতো না। এক ব্যক্তি, যিনি রাবী'র সাহচর্যে বিশ বছর কাটান, বর্ণনা করেছেন যে, আমি তাঁর সাহচর্যে বিশ বছরের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি, এ সময়ে আমি তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত এমন কোন কথা শুনিনি যার সমালোচনা হতে পারে। একই ব্যক্তি আরো বলেছেন, আমি বিশ বছরে রাবী'র মুখ থেকে ভালো কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বের হতে শুনিনি। তামীম গোত্রের আরেক ব্যক্তি বলেছেন, আমি দু'বছর যাবত রাবী'র সাথে বসেছি। এর মধ্যে তিনি আমার কাছে মানুষের পার্থিব অবস্থা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেননি। একবার শুধু জিজ্ঞেস করেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন, তোমাদের মহল্লায় কয়টি মসজিদ আছে?[৩৮] অন্যদেরকেও তিনি বাজে কথা বলতে বারণ করতেন। তিনি বলতেন, তোমরা কম কথা বলবে। তবে এই নয়টি ক্ষেত্রে বেশী বলতে দোষ নেই :

১. তাহ্লীল : لا إله إلا الله
২. তাকবীর : الله اكبر
৩. তাস্বীহ : سبحان الله
৪. তাহ্মীদ : الحمد لله
৫. কল্যাণ কামনা করে আল্লাহর কাছে দু'আ করা
৬. খারাপ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা
৭. আমর বিল মা'রূফ
৮. নাহি 'আনিল মুনকার
৯. কুরআন তিলাওয়াত।[৩৯]

---

৩৮. প্রাগুক্ত-৬/১২৯; আল-বায়ান-৩/১৪৬
৩৯. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৩/১৫০

তিনি আরো বলতেন : মানুষকে ভালো কথা বলা শেখাবে, খারাপ কথা বলা থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে। কুরআন তিলাওয়াত করবে, আল্লাহর কাছে কল্যাণের জন্য দু'আ করবে এবং অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাহায্য চাইবে।[৪০]

রাবী' যদিও চুপচাপ ও একাকী থাকতেন, তবুও ফুলের সুবাস ও সূর্যের আলো যেমন আবদ্ধ করে রাখা যায় না, তেমনিভাবে তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকেনি। তাঁর চরিত্রের সুবাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর চরিত্র-মাধুর্য দ্বারা মানুষ দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। শাফীক বর্ণনা করেছেন, একবার আমি 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) কয়েকজন ছাত্রের সাথে রাবী'র সংগে সাক্ষাতের জন্য গেলাম। পথে এক ব্যক্তি আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করলো, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? আমরা বললাম : রাবী'র সংগে দেখা করার জন্য। লোকটি বললো : আপনারা এমন এক ব্যক্তির কাছে যাচ্ছেন, যিনি কোন কথা বললে মিথ্যা বলেন না, অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করেন না এবং তাঁর কাছে কোন কিছু আমানত রাখলে খিয়ানত করেন না।

কোন মানুষের সমকালীনদের স্বীকৃতিই হলো তার মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। রাবী'র সমকালীন লোকেরা তাঁর প্রতি এত মুগ্ধ ছিলেন যে, কেউ কোনভাবে তাঁর চেয়ে নিজেকে বড় ভাবা পছন্দ করতো না। একবার এক ব্যক্তি আবূ ওয়াইলকে প্রশ্ন করে : আপনি বড় না রাবী'? জবাবে তিনি বলেন : আমি বয়সে তাঁর চেয়ে বড়, তবে তিনি বুদ্ধি ও প্রজ্ঞায় আমার চেয়ে বড়।[৪১]

তিনি যেমন কম কথা বলতেন, তেমনি কোন বিতর্কেও জড়ানো পছন্দ করতেন না। একবার তাঁর এক আত্মীয় দেখা করতে এলো। কথার ফাঁকে এক সময় লোকটি বললো : আবূ ইয়াযীদ! হুসায়ন ইবন ফাতিমা (রা) নিহত হয়েছেন। তিনি বললেন : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন- নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই কাছে আমরা ফিরে যাব। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন :

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَاكَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ.[৪২]

– বলুন, হে আল্লাহ, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী! আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতো।

রাবী'র এ কথায় লোকটি সন্তুষ্ট হতে পারলো না। সে প্রশ্ন করলো : তাঁর হত্যার ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

বললেন : আমি বলি তাঁদেরকে আল্লাহরই কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তাঁদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহই করবেন। আল-জাহিজ বলেন : 'ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কে রাবী' কোন

---

৪০. তাবাকাত-৬/১২৯

৪১. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-২/৪২৪

৪২. সূরা আয-যুমার-৪৬

Contents

কথা বলতেন না এবং কোন কথা শুনতেন্ও না।'[৪৩]

একবার এক ব্যক্তি বললেন : আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন, আল্লাহ আপনাকে ভালো প্রতিদান দেবেন। বললেন : তোমার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে যা কিছু আছে, সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আর যা কিছু জ্ঞান তোমার নেই, তা যিনি জানেন সেই সত্তার নিকট তা সোপর্দ কর। তোমাদের কেউ যেন না বলে : 'হে আল্লাহ, আমি তোমার দিকে ফিরে এসেছি।' তারপর যদি সে ফিরে না আসে তাহলে সেটা হবে মিথ্যা, তাই সে যেন বলে : 'হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রতি ফিরে আসুন!' তাহলে এটা হবে দু'আ।

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বললো : আমি দীর্ঘ দিন যাবত আপনার সাথে আছি, এর মধ্যে একদিনও আপনাকে কবিতার কোন উদ্ধৃতি দিতে শুনলাম না। অথচ আপনার সঙ্গী-সাথীদের অনেককে আমি কবিতার উদ্ধৃতি দিতে শুনেছি। বললেন : যা কিছু তোমরা এখানে বলবে তা সবই লেখা হবে এবং সেখানে তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হবে।

তারপর উপস্থিত সবার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন : তোমরা বেশী করে মৃত্যুকে স্মরণ কর। কারণ, সে তোমাদের থেকে অনুপস্থিত পর্যবেক্ষণকারী। আর অনুপস্থিত ব্যক্তির দূরে অবস্থানের মেয়াদ দীর্ঘ হয়ে গেলে তার ফেরার সময়ও নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। তারপর কিছুক্ষণ অঝোরে কাঁদলেন। কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে বললেন : সেই সময় তুমি কি করবে যখন এ অবস্থা হবে :

إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجِـيْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَـهَنَّمَ. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى.[৪৪]

– যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন। সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে। সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে?[৪৫]

তিনি বলতেন, আমার যদি দু'টি মন থাকতো তাহলে একটা কোথাও আটকে গেলে অন্যটি তাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতো। কিন্তু আমার তো একটি মাত্র মন। সেটা যদি আমি অন্য কোথাও আটকে ফেলি তাহলে তাকে ছাড়াবে কে?[৪৬]

কেউ যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করতো : রাবী'! আজ আপনার সকালটি কি অবস্থায় হলো? বলতেন : দুর্বল পাপী অবস্থার মধ্যে আমার সকাল হয়েছে। এরপর নির্ধারিত রিযিক খাবো এবং মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকবো।[৪৭]

---

৪৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/১০৫
৪৪. সূরা আল-ফাজর-২১-২৩
৪৫. সুওয়ারুন মিন হায়াতিত তাবি'ঈন, ৫৭-৫৯
৪৬. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৩/১৭৯
৪৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/১৭৪

তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর নির্ভরতার প্রকৃত রহস্য এই যে, কোন কাজে আপ্রাণ চেষ্টা করে তার সফলতা ও ব্যর্থতা আল্লাহর হাওয়ালা করে দেওয়া। কিন্তু তাওয়াক্কুলের আরো একটা উঁচু ধাপ আছে। যার অধিকারী কেবল আল্লহার একান্ত বিশেষ ব্যক্তিরা হয়ে থাকেন। আর তা হলো, কোন কাজ সম্পন্ন করার জন্য দুনিয়ার উপায়-উপকরণের কোন রকম সাহায্য-সহায়তা না নিয়ে সবকিছু আল্লাহর হাওয়ালা করে দেওয়া। রাবী' তাওয়াক্কুলের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জীবন-মরণের মুখোমুখি অবস্থায়ও তিনি পার্থিব উপায়-উপকরণ অবলম্বন করতেন না। প্যারালাইসিসের মত কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু কোন রকম চিকিৎসা গ্রহণ করতেন না। লোকেরা বলতো : ইস! আপনি যদি চিকিৎসা করাতেন! বলতেন : 'আদ, ছামূদ ও আসহাবে রাস– সব জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা অতিক্রান্ত হয়েছে। তাদের মধ্যবর্তী সময়ে আরো জাতি-গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল। তাদের মধ্যে চিকিৎসকও ছিল। কিন্তু আজ না সেই চিকিৎসক বেঁচে আছে, আর না যাদেরকে চিকিৎসা করা হয়েছে, তারা।[৪৮]

এই চরম আল্লাহ নির্ভরতার ফল এই দাঁড়ালো যে, তাঁর প্যারালাইসিস রোগ শেষ পর্যন্ত অন্তিম রোগে পরিণত হলো। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি সবার সামনে এ স্বীকৃতি দান করেন যে, আমি আমার নিজের উপর আল্লাহকে সাক্ষী মানছি, তিনি তাঁর নেক বান্দাদের সাক্ষ্য, তাদের প্রতিদান ও বদলা দানের জন্য যথেষ্ট। আমি আল্লাহর রুবুবিয়্যাত, দীনে ইসলাম, মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়াত, রিসালাত এবং কুরআনের ইমামতের ব্যাপারে রাজি। আমি নিজের সত্তা, আর ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে আমার অনুসরণ করে, একথার উপর রাজি যে, আমরা সকলে 'আবিদীনের দলের মধ্যে থেকে আল্লাহর 'ইবাদাত করবো, আল্লাহর হামদকারীদের মধ্যে তাঁর হামদ করবো। মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করবো।[৪৯] স্বীকৃতি দানের পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে যখন তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে তখন পাশে বসা মেয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন : মেয়ে, তুমি কাঁদছো কেন? কল্যাণ তোমার পিতার সামনে উপস্থিত।

তাঁর মৃত্যুসন নিয়ে একটু মতপার্থক্য আছে। হিজরী ৬১, ৬৩ ও ৬৪ সনের কথা বলা হয়েছে। 'উবায়দুল্লাহ ইবন যিয়াদ তখন কূফার ওয়ালী এবং ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়া (রা) মুসলিম জাহানের খলীফা।[৫০]

---

৪৮. তাবাকাত-৬/১৩০

৪৯. প্রাগুক্ত-৬/১৩৪

৫০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৮; সিফাতুষ সাফওয়া-৩/৩১; 'আসরুত তাবি'ঈন, ২১৯

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-ইমাম আয-যাহাবী :

(ক) সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, (বৈরূত : আল-মুআস্-সাসাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯০)

(খ) তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, (বৈরূত : দারু ইহ্ইয়া আত-তুরাছ আল-ইসলামী)

(গ) তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম, (কায়রো : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭ হি.)

(ঘ) মীযান আল-ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল, (বৈরূত : দারুল মা'রিফা, সংস্করণ-১, ১৯৬৩)

২. ইবন হাজার আল-'আসকালানী :

(ক) তাকরীব আত-তাহ্যীব, (বৈরূত : দারুল মা'রিফা, সংস্করণ-২, ১৯৭৫)

(খ) তাহ্যীব আত-তাহ্যীব, (হায়দ্রাবাদ : দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৩২৫ হি.)

(গ) আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা, (বৈরূত : দার আল-ফিক্র, ১৯৭৮)

(ঘ) লিসান আল-মীযান, (হায়দ্রাবাদ, ১৩৩১ হি.)

৩. ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী, শাযারাত আয্-যাহাব, (বৈরূত : আল-মাকতাব আত-তিজারী)

৪. ইবন আল-জাওযী :

(ক) সিফাতুস সাফওয়া, (হায়দ্রাবাদ : দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৩৫৭ হি.)

(খ) আল-হাসান আল-বাসরী, (কায়রো : দারুল ফিক্র আল-'আরাবী)

৫. ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরূত : মাকতাবতুল মা'আরিফ)

৬. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, (বৈরূত : দারু সাদির)

৭. ইবন 'আসাকির, আত-তারীখ আল-কাবীর, (আশ-শাম : মাতবা'আতুশ শাম, ১৩২৯ হি.)

৮. ইবন খাল্লিকান, ওফায়াতুল আ'য়ান, (মিসর : মাকতাবাতু আন-নাহ্দা আল-মিসরিয়্যা, ১৯৪৮)

৯. ইবন হাযাম, জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব, (মক্কা : দারুল মা'আরিফ, ১৯৬২)

১০. ইবন আল-আছীর :

(ক) উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, (বৈরূত : দারু ইহ্ইয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী)

(খ) আল-কামিল ফিত তারীখ, (বৈরূত : দারুল বৈরূত)

১১. ইবন কুতায়বা :

(ক) 'উয়ূন আল-আখবার, (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-'আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৭)

(খ) আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা, (মিসর : মাতবা'আতুল বাবী আল-হালাবী, সংস্করণ-১, ১৯৩৭)

১২. আল-জাহিজ :
(ক) আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, সম্পাদনা : 'আবদুস সালাম হারূন, (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, সংস্করণ-৪)
(খ) কিতাবুল হায়ওয়ান, সম্পাদনা : 'আবদুস সালাম হারূন, (কায়রো : আল-মাতবা'আতুল হুমায়দিয়্যা; ১৯৪৮)
১৩. ইবন 'আবদি রাব্বিহি আল-আন্দালুসী, আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ, (কায়রো : মাতবা'আতু লুজনাতিত তা'লীফ ওয়াত তারজামা, সংস্করণ-৩, ১৯৬৯)
১৪. আহমাদ আল-হাশিমী, জাওয়াহিরুল আদাব, (মিসর : মাতবা'আতুস সা'আদা, ১৯৬৪)
১৫. আল-বাকিল্লানী, ই'জায আল-কুরআন, (বৈরূত : মুআস্‌সাতুল কুতুব আছ-ছাকাফিয়্যা, সংস্করণ-১, ১৯৯১)
১৬. মুহিউদ্দীন ইবন শারফ আন-নাওবী, তাহ্‌যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত, (মিসর : আত-তিবা'আ আল-মুগীরিয়্যা)
১৭. আয-যিরিক্‌লী, আল-আ'লাম, (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, সংস্করণ-৪, ১৯৭৯)
১৮. আহমাদ যাকী সাফওয়াত, জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব, (বৈরূত : আল-মাকতাবা আল-'ইলমিয়্যা)
১৯. 'আবদুল কাহির আল-বাগদাদী, আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক, (কায়রো, ১৯১০)
২০. ইহসান 'আব্বাস, আল-হাসান আল-বাসরী, সীরাতুহু, শাখসিয়্যাতুহু, তা'আলীমুহু ওয়া আরাউহু, (কায়রো : দারুল ফিক্‌র আল-'আরাবী, ১৯৫৭)
২১. ইবন আল-মুরতাদা, আল-মানিয়্যাতু ওয়াল আমাল, (হায়দ্রাবাদ)
২২. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, সংস্করণ-৭, ১৯৬৭)
২৩. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী, (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৮৫)
২৪. ইউসুফ আল-মুযী, তাহ্‌যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর রিজাল, (বৈরূত : মুআস্‌-সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-২, ১৯৮৪)
২৫. ইবন তায়মিয়্যা, আর-রিসালা আত-তাদমুরিয়্যা, (কায়রো : ১৩৯৭)
২৬. মুহাম্মাদ আল-খাদারী বেক, তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা, (মিসর : আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়্যা আল-কুবরা, ১৯৬৯)
২৭. মাহমুদ শুকরী আল আলূসী, বুলূগ আল-আরিব ফী মা'রিফাতি আহওয়ালিল 'আরাব, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা)
২৮. ড. 'আবদুর রহমান আল-বাশা, সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন, (কায়রো : দারুল আদাব আল-ইসলামী, সংস্করণ-১৫, ১৯৯৭)
২৯. 'আবদুল মুন'ঈম আল-হাশিমী, 'আসরুত তাবি'ঈন (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, সংস্করণ-৩, ২০০০ইং)

৩০. আবুল হাসান 'আলী আন-নাদাবী, রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়া ফিল ইসলাম, (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, সংস্করণ-১, ১৯৯৯)
৩১. মু'ঈন উদ্দীন আহমাদ নাদবী, তাবি'ঈন, (ভারত : মাতবা' মা'আরিফ, ১৯৫৬)
৩২. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২)
৩৩. কোরআনুল কারীম, মূল : তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মহীউদ্দীন খান, (মদীনা : বাদশাহ্ ফাহ্দ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.)
৩৪. ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখ আল-ইসলাম, (বৈরূত : দারুল আন্দালুস, সংস্করণ-৭, ১৯৬৪)
৩৫. হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থ।

Contents
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

তাবি'ঈদের জীবনকথা [দ্বিতীয় খণ্ড]
'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ)
ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

Contents

তাবি'ঈদের জীবনকথা [২য় খণ্ড]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ)

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

Contents

প্রকাশক
ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-842-014-2 set

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৬

দ্বিতীয় প্রকাশ : জুমাদাল আখিরাহ ১৪৩৫
বৈশাখ ১৪২১
এপ্রিল ২০১৪

মুদ্রণে

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা

Tabieeder Jiban Katha (Vol. II) : Umar Ibn Abdil Aziz
Written by Dr Muhammad Abdul Mabud and Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Acting Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition June 2006 2nd Edition April 2014 Price Taka 250.00 only.

সূচীপত্র

Contents

‘উমার ইবন ‘আবদিল ‘আযীয (রহ) পর্যন্ত খিলাফতের পরম্পরা

১. আবূ বাক্‌র (রা)
(হি. ১১-১৩ / খ্রী. ৬৩২-৬৩৪)
↓
২. ‘উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা)
(হি. ১৩-২৩ / খ্রী. ৬৩৪-৬৪৪)
↓
৩. ‘উছমান ইবন ‘আফ্‌ফান (রা)
(হি. ২৩-৩৫ / খ্রী. ৬৪৪-৬৫৬)
↓
৪. ‘আলী ইবন আবী তালিব (রা)
(হি. ৩৫-৪০ / খ্রী. ৬৫৬-৬৬১)
↓
৫. মু‘আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান (রা)
(হি. ৪০-৬০ / খ্রী. ৬৬১-৬৮০)
↓
৬. ইয়াযীদ ইবন মু‘আবিয়া (রা)
(হি. ৬০-৬৩ / খ্রী. ৬৮০-৬৮৪)
↓
৭. দ্বিতীয় মু‘আবিয়া
(হি. ৬৩ / খ্রী. ৬৮৪)
↓
৮. মারওয়ান ইবন আল-হাকাম
(হি. ৬৪-৬৫ / খ্রী. ৬৮৪-৬৮৫)
↓
৯. ‘আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান
(হি. ৬৫-৮৬ / খ্রী. ৬৮৫-৭০৫)
↓
১০. আল-ওয়ালীদ ইবন ‘আবদিল মালিক
(হি. ৮৬-৯৬ / খ্রী. ৭০৫-৭১৫)
↓
১১. সুলায়মান ইবন ‘আবদিল মালিক
(হি. ৯৬-৯৯ / খ্রী. ৭১৫-৭১৭)
↓
১২. ‘উমার ইবন ‘আবদিল ‘আযীয (রহ)
(হি. ৯৯-১০১ / খ্রী. ৭১৭-৭২০)

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

এ পৃথিবীতে যে সকল মানুষ কোন বিপ্লব ঘটিয়েছেন তাদের উজ্জ্বলতম কর্মকাণ্ড শুধু এটাই বিবেচনা করা হয় যে, তাঁরা পৃথিবীকে আরো কতটা এগিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে যখন আমরা মুসলিম শাসকদের ইতিহাস পাঠ করি তখন তাঁদের মহৎ কার্যাবলীর মধ্যে আমাদের দৃষ্টি কেবল সেদিকেই নিবদ্ধ থাকে যে, তাঁর পূর্বে পৃথিবীর অবস্থান কোন কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এবং তিনি তা কোন কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

তবে এক্ষেত্রে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথিবীর অন্যসব জাতি-গোষ্ঠী থেকে ভিন্ন। তাদের দৃষ্টিতে ইসলামের আলোকময় যুগ কেবল সেটাই যা হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আবির্ভাব থেকে শুরু হয়েছে এবং খিলাফতে রাশেদায় পৌঁছে শেষ হয়েছে। এ কারণে তারা মনে করে মুসলিম খলীফাদের গৌরবময় কর্মকাণ্ড এ নয় যে তাঁরা পৃথিবীকে এ জ্যোতির্ময় বিন্দু থেকে কিছুটা সামনের দিকে নিয়ে যাবে। বরং তাঁদের প্রকৃত মর্যাদা এতেই যে, তারা যুগকে এতটুকু পরিমাণ পিছনে নিয়ে যাবেন যাতে তা সাহাবায়ে কিরামের যুগের সাথে যুক্ত হয়।

খিলাফতে রাশেদার পর বানূ উমাইয়্যার শাসনকাল শুরু হয়। এদের মধ্যে অনেক খ্যাতিমান শাসক ছিলেন। 'আবদুল মালিক একুশ বছর শাসন করেন এবং উমাইয়্যা খান্দানের শাসনকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করান। আল-ওয়ালীদ এত বেশী দেশ জয় করেন এবং এত বেশী দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মাণ করেন যে, গোটা ইসলামী দুনিয়া যেন রঙ্গশালায় পরিণত হয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেবল 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) এমন এক ব্যক্তি যিনি যুগের লাগাম টেনে ধরে সাহাবায়ে কিরামের (রা) যুগের সাথে মিলিয়ে দেন। এ কারণে ইসলামী পণ্ডিত-মনীষীগণ তাঁকে ইসলামের একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) গণ্য করেছেন এবং তাঁর জীবনী, মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বর্ণনা করে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

একবার আব্বাসীয় খলীফা মামূন আর-রাশীদের সামনে আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের প্রসঙ্গ ওঠে। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলে ওঠেন, এই একটি মাত্র ব্যক্তির কারণে বানূ উমাইয়্যারা আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। খলীফা মামূন একটি অতি সত্য কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কারণে বানূ উমাইয়্যা তাদের প্রতিপক্ষ আব্বাসীয়দেরকে ডিঙ্গিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল বানূ উমাইয়্যারা লাভ করেনি, বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এর অংশীদার হয়েছে। আর এ কারণে ঐতিহাসিকগণ যখনই খুলাফায়ে

রাশেদীনের আলোচনা করেন তখন অবশ্যই 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নামটি উচ্চারণ করেন। তারা তাঁর শাসনকালকে খুলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগের সমতুল্য বলে সিদ্ধান্ত দান করেন এবং তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে খুলাফায়ে রাশেদীনের ব্যক্তিসত্তার অনুরূপ বলে স্বীকার করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) পিছনে সালাত আদায় করলেন। তারপর তাঁর মুখ থেকে অবলীলাক্রমে উচ্চারিত হলো :

ما صليت خلف أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلواة لصلواة رسول الله عليه وسلم من هذا الفتى.

'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) পরে এই নওজোয়ান ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির পিছনে রাসূলুল্লাহর (সা) সালাতের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ সালাত আর আদায় করিনি।'

উল্লেখ্য যে, হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) যখন তাঁর এই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন তখন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতের মসনদে আসীন হননি। তিনি তখন খলীফা আল-ওয়ালীদের নিয়োগকৃত মদীনার গভর্ণর এবং তাঁর বয়স তখন বিশ-একুশ বছরের বেশী ছিল না।

যাঁরা হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময়কাল পেয়েছেন, তাঁর রাত-দিনের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন, যাঁরা তাঁর জনসেবা ও 'আদল-ইনসাফ দেখেছেন, তাঁদের প্রত্যেকে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মত সত্যনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল ও যোগ্য এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোন বাদশাহ ছিলেন না। তিনি রাজতন্ত্রকে খিলাফত পদ্ধতিতে পরিবর্তন করে দেন এবং চার খলীফা আবূ বকর, 'উমার, 'উছমান ও 'আলীর (রা) পাশেই নিজের স্থান করে নেন।

যদিও তাঁর তাকওয়া-পরহেযগারী ও সত্যনিষ্ঠার কারণে তাঁর খান্দান তাঁর সাথে শত্রুতা করে, যদিও তাঁর খাস খাদেমের বর্ণনা মতে তিনি খিলাফতের পদ গ্রহণ করে নিজেকে বড় ধরনের বিপদে জড়িয়ে ফেলেছিলেন, যদিও তিনি নিজের পরিবার-পরিজনের ভোগ-বিলাসের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তবে তিনি এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যে, কোন শাসক যদি ইচ্ছা করেন তাহলে নিজের আরাম-আয়েশ ও সুখ-সুবিধার উপর জনগণের প্রয়োজন ও সুখ-সুবিধাকে প্রাধান্য দিতে পারেন।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) একজন ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসক ছিলেন, তাঁর নির্বাচন সঠিক ইসলামী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়নি। তাঁর পূর্বের একজন ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসক তাঁকে মনোনয়ন দেন। তবে তাঁর এই মনোনয়ন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের সমঅর্থবোধক হয়ে যায়।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) নিজের কর্মের দ্বারা নিজেকে খুলাফায়ে রাশেদীনের

নিকটবর্তী করে নেন। তিনি জনগণকে তেমনই সুখ-শান্তি দান করেন যেমন করেছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীন। তিনি জনগণের প্রয়োজনের দিকে তেমনই দৃষ্টি দেন, যেমন দিয়েছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীন।

ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। ভালো ও মন্দ উভয় শ্রেণীর রাজা-বাদশার কর্মকাণ্ডের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও তীক্ষ্ণ পর্যালোচনা করে ইতিহাস। এই সূক্ষ্ম সমালোচক ইতিহাস 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের যে জীবন চিত্র উপস্থাপন করেছে তাতে তাঁকে খুলাফায়ে রাশেদীনের সারিতে এনে দাঁড় করিয়েছে। অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তা তাঁর খিলাফতকালকে খিলাফতে রাশেদার মধ্যে গণ্য করেছেন।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। দু'বছর পাঁচ মাস একটি জাতির ইতিহাসে অতি নগণ্য সময়। কিন্তু এই সময়ে এই মহান ব্যক্তি সকল প্রকার বাড়াবাড়ি, জুলুম-অত্যাচার এবং সব ধরনের অন্যায়-অবিচার একেবারে দূর করেন। আর এমন নিয়ম-পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেন যার মাধ্যমে অতি দুর্বল লোকটিও তার অধিকার নির্বিঘ্নে লাভ করতে পারতো। তিনি উমাইয়্যা খলীফা 'আবদুল মালিকের ভাতিজা ও মারওয়ান ইবন আল-হাকামের পৌত্র হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণকে সীমাহীন সুযোগ-সুবিধা দান করেন। তিনি যখন খলীফা ছিলেন না তখন ভালো খেতেন, ভালো পরতেন, আলীশান ভবনে বসবাস করতেন, উৎকৃষ্ট জাতের বাহন ব্যবহার করতেন। কিন্তু যখন খলীফা হলেন তখন সব ধরনের বিলাসদ্রব্য পরিহার করলেন। জীবন-জীবিকা অতি সাধারণ মানুষের স্তরে নামিয়ে আনলেন। তিনি তাই আহার করতেন যা একজন নীচু স্তরের মানুষ জোটাতে পারতো। তেমন পোশাকই পরতেন যা একজন অতি সাধারণ মানুষ পরতো।

ব্যক্তিগতভাবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) সে সময়ের একজন উঁচু স্তরের আমীর ছিলেন। তাঁর পিতা 'আবদুল 'আযীয ছিলেন মহাপ্রতাপশালী উমাইয়্যা খলীফা 'আবদুল মালিকের ভাই। একাধারে তিনি বিশ বছর মিসরের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ওয়ালী ছিলেন। নিজের ছেলের জন্য অনেক কিছুই তিনি রেখে যান। কিন্তু সেই ছেলে খলীফা হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু বায়তুল মালে জমা দেন। এমনকি স্ত্রীর সকল অলঙ্কারও সেই জমাকৃত সম্পদ থেকে বাদ পড়েনি।

আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগে ধারণাও করা যাবে না যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, যিনি একজন ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসক ছিলেন, জনগণের সুখ ও আরাম-আয়েশের জন্য নিজেকে কি ধরনের দুশ্চিন্তা ও সমস্যার মধ্যে নিক্ষেপ করেন। আজকের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়কের নিকট 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এই কর্মপন্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার মৌলিক শর্তাবলীর অন্তর্গত বলে বিবেচিত নয়। কিন্তু ইসলাম যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছে, তার মৌলিক শর্তসমূহের মধ্যেই আছে যে, জনগণ অভুক্ত ও দরিদ্র থাকলে তাদের শাসকও অভুক্ত থাকবে। জনগণ কাপড়ের অভাবে উলঙ্গ থাকলে

শাসকও উলঙ্গ থাকবে। আমরা দেখতে পাই যে, খলীফা হিসাবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মানসিক প্রস্তুতি এমনটিই ছিল।

তিনি যে ভোগ-বিলাস বিমুখ জীবন অবলম্বন করেন, খলীফা হওয়ার পর যে সহজ-সরল জীবন প্রণালী বেছে নেন তা ছিল সেই সময়ের জনগণের প্রত্যাশা। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) সেই প্রত্যাশা পূরণ করেন। ইতিহাস সাক্ষী, যে সততার সাথে 'উমার জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করেন তার কোন দৃষ্টান্ত আর কোন রাষ্ট্রনায়ক উপস্থাপন করতে পারেনি।

কোন সন্দেহ নেই যে, যুগের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আজকের জনগণ তারা নয় যারা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময় ছিল। সে যুগে মোটর গাড়ী ছিল না, হাওয়াই জাহাজ ও রেল গাড়ীও ছিল না, জীবনের জন্য সেই প্রয়োজন ছিল না যা আজকের দিনে আছে। তা সত্ত্বেও এ সত্য প্রত্যক্ষ করা যায় যে, বর্তমান পৃথিবীর সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ এশিয়া মহাদেশে জীবন ধারণের মান আগের মতই আছে। তাদের না আছে মোটর গাড়ী, আর না আছে হাওয়াই জাহাজে চড়ার সামর্থ্য। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্য-খাবারও অতি সাধারণ মানের। কোন কোন দেশ তো এমনও আছে যেখানে মানুষ অভুক্ত ও ন্যাংটা থাকে। দু'বেলা দু'মুঠো ভাত বা দুটো শুকনো রুটিও জোটাতে পারে না।

এ সকল দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালকদের সাধারণ মানুষের কাতারে আসার জন্য নিজেদেরই পরিবর্তন ঘটানো উচিত। যেমন পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) নিজে। বিশেষতঃ সেই সকল সরকার প্রধানদের জীবনধারার পরিবর্তন একান্ত অপরিহার্য যাঁরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসরণের দাবী করেন।

অবশ্য অধিক কাজের জন্য, সময় বাঁচানোর জন্য তারা মোটর গাড়ী, হাওয়াই জাহাজ ব্যবহার করবেন। তবে তাঁদের জীবনধারা, খাদ্য-খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ তেমনই হওয়া উচিত যেমন দেশের সাধারণ মানুষের হয়ে থাকে। যতদিন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত না হবে, যতদিন জনগণের খাদ্য-বাসস্থান মানসম্পন্ন না হবে ততদিন শাসকদেরও জনগণের জীবনধারা অবলম্বন করা নৈতিক কর্তব্য।

যদিও তাঁর সময়ে অনেকের ব্যক্তিগত সচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ, জীবন ধারণের মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। তারা ভালো খেত, ভালো পরতো ও ভালো বাসস্থানে বসবাস করতো। অসংখ্য মানুষ উন্নত জাতের সোয়ারী ব্যবহার করতো এবং জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করতো। খোদ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হওয়ার পূর্বে অত্যন্ত বিলাসী জীবন যাপন করতেন। কিন্তু খিলাফতের মসনদে আসীন হতেই তাঁর জীবনধারা পাল্টে যায়। একজন ব্যক্তি হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ ভোগ করার পূর্ণ অধিকার তাঁর ছিল। তবে মুসলমানদের শাসক নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি আর ব্যক্তি 'উমার ছিলেন না, তিনি হয়ে যান সমষ্টি। জনগণের তত্ত্বাবধান, প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ ও তাদের সার্বিক

স্বাচ্ছন্দ ও সচ্ছলতার দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ে। একজন ব্যক্তি হিসাবে তাঁর যে স্বাধীনতা ছিল, খলীফা হওয়ার পর ইসলাম তা ছিনিয়ে নেয়।

ঠিক একই অবস্থা বর্তমানেও বিদ্যমান। একজন ব্যক্তি তার বৈধ বিষয়-সম্পত্তি থেকে পরিপূর্ণ উপকার লাভ করতে পারে। ভালো পোশাক, ভালো খাবার খাওয়ার অধিকার তার আছে। কিন্তু কোন দলের নেতা বা জনগণের শাসক হওয়ার সাথে সাথে তাঁর জীবনধারা পাল্টে যাবে। ব্যক্তি হিসাবে যে সকল স্বাধীনতা ভোগ করতেন, তা আর থাকবে না। তিনি আর নিজের ইচ্ছামত উপাদেয় খাবার খেতে পারবেন না, ভালো পোশাকও পরতে পারবেন না। তাঁকে আম জনতার কাতারে নেমে আসতে হবে। তাঁকে তেমন জীবনই যাপন করতে হবে যা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তিনি যদি তেমন করতে পারেন তাহলে নিজেকে একজন মুসলমান শাসক বলে দাবী করতে পারবেন। অন্যথায় সে যুগেও তো 'আবদুল মালিক, ইয়াযীদ, মারওয়ান, সুলায়মান ও হিশাম প্রমুখ শাসক ছিলেন। তাঁরা শাসক ছিলেন, ব্যক্তি হিসেবে মুসলমান বলে দাবীও করতেন; কিন্তু অবস্থান করতেন প্রাসাদে, থাকতেন ভোগ-বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এ কারণে মুসলিম উম্মাহ্ তাঁদের শাসনকালকে খিলাফতে রাশেদা এবং তাঁদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীন বলে স্বীকার করেনি, যেমনটি করেছে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে।

ইসলাম যে সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর সংক্ষিপ্ত শাসনকালে মোটামুটি সেগুলো পূর্ণ করেন। সেই উদ্দেশ্যগুলো আল-কুরআনে বিধৃত হয়েছে এভাবে :

اَلَّذِيْنَ اِن مَّكَّنَّاهُمْ فِــى الْأَرْضِ أَقَـامُوا الصَّلٰـوةَ وَاٰتَـوا الزَّكٰـوةَ وَأَمَـرُوْا بِـالْمَعْرُوْفِ وَنَـهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. (الحج : ٤١)

'আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ নিষেধ করবে।'

আমাদের মহানবীর (সা) পরে পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবেন না। তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তবে দীনকে বিদ'আত থেকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য এ পৃথিবীতে মাঝে মাঝে মুজাদ্দিদ আসবেন। সে কথা হযরত রাসূলে কারীম (সা) এভাবে বলেছেন :

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة من يجدد لها دينها.

'প্রত্যেক শতকের শিরোভাগে আল্লাহ এই উম্মাতের জন্য এমন লোক পাঠাবেন যিনি তাদের জন্য তাদের দীনকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করে নতুনভাবে উপস্থাপন করবেন।' হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) পর থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকল যুগের ইসলামী পণ্ডিতগণ এক বাক্যে বলেছেন যে, তিনি হিজরী প্রথম শতকের মুজাদ্দিদ ছিলেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি ছিলেন একজন কামিল বা পূর্ণ মুজাদ্দিদ।

আরবী-উর্দূসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই মহান সংস্কারকের জীবন ও কর্মের উপর গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী বহু গ্রন্থ রচিত হলেও বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। মরহুম মাওলানা আবদুর রহীমের একটি ক্ষুদ্রাকৃতির বই আছে, তবে তাতে ইতিহাসের এই মহান নায়কের জীবন ও কর্মের সবকথা তুলে ধরা হয়নি। আমরা যারা ইসলামের আলোকে আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়ার স্বপ্ন দেখি তাদের সামনে এই মহান মুজাদ্দিদের মত ব্যক্তিবর্গের জীবনচিত্র স্পষ্ট থাকা উচিত। তাহলে আমরা তাঁদের কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারবো। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) জীবন ও কর্মের উপর এই গ্রন্থটি রচনা করেছি।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক নাজির আহমদ গবেষণা ও লেখালেখির ব্যাপারে সবসময় আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এ গ্রন্থটি রচনার ব্যাপারেও তিনি সবসময় খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদির-এর নিকট থেকেও আমি দারুণ উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি। তিনি সাক্ষাতে ও টেলিফোনে সবসময় খোঁজ-খবর নিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আরবী ও উর্দূ ভাষার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তাঁর এই বদান্যতার প্রতিদান দিন, এই কামনা করবো।

তাবি'ঈদের জীবনকথা সিরিজের এটি দ্বিতীয় খণ্ড। একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ও তাবি'ঈদের জীবনকথা লিখে যাচ্ছি। এর দ্বারা পাঠকবর্গ সামান্য উপকৃত হলেও আমার শ্রম সার্থক হবে। শব্দ প্রয়োগে, তথ্য উপস্থাপনে ও ভাব প্রকাশে কোন রকম অসঙ্গতি লক্ষ্য করলে তা আমাকে জানানোর জন্য আমি পাঠকবর্গের প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সকলকে তাঁর মর্জিমত কাজ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

জুলাই ২৩, ২০০৬
শ্রাবণ ০৮, ১৪১৩

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ)

বংশ পরিচয়

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) চতুর্থ উর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন 'আবদু মান্নাফ, তাঁর চার মতান্তরে ছয় পুত্রের মধ্যে হাশিম, মুত্তালিব ও 'আবদুশ শাম্স ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাশিমের সন্তানদের হাশিমী এবং মুত্তালিবের সন্তানদের মুত্তালিবী বলে আখ্যায়িত করা হয়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) ছিলেন হাশিমী। জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগে মুত্তালিবী ও হাশিমীরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ছিল। 'আবদুশ শামসের সন্তানরা আবশামী বলে আখ্যায়িত হয়। 'আবদুশ শামসের এক পুত্রের নাম উমাইয়্যা। তাঁর সন্তানরাই বানূ উমাইয়্যা বলে পরিচিতি লাভ করে।

হাশিম তাঁর বদান্যতা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য কুরায়শদের নেতা হিসেবে বরিত হন। কিন্তু তাঁর ভাতিজা উমাইয়্যা তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেয় না। ফলে তাঁদের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে জাহিলী যুগে হাশিমী ও উমাইয়্যাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ইসলামের সূচনা পর্বেও কতিপয় পবিত্রাত্মা ব্যক্তি ছাড়া বানূ উমাইয়্যার সকলেই ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নবীর (সা) বিরোধিতায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে। বদর যুদ্ধের পর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত মক্কাবাসীদের সংগে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে উমাইয়্যা বংশের আবূ সুফইয়ান তার নেতৃত্ব দেন। কারণ, তিনি ইসলামের সমৃদ্ধিকে হাশিমীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি বলে মনে করতেন। মক্কা বিজয়ের পর নবীর (সা) পবিত্র সত্তার কারণে এই বংশগত শত্রুতা তিরোহিত হয়। কিন্তু খলীফায়ে রাশিদ হযরত 'উছমানের শাহাদাতের পর হাশিমী বংশোদ্ভূত খলীফায়ে রাশিদ হযরত 'আলীর (রা) খিলাফতের প্রতি উমাইয়্যাদের সেই পূর্বের ঘৃণা-বিদ্বেষ পুনরায় জেগে ওঠে যা হযরত 'আলীর (রা) খিলাফতের পরিসমাপ্তির পর ৪১ হিজরীতে উমাইয়্যা শাসনের ভিত্তি রচনা করে।

ইসলামের ইতিহাসে বানূ উমাইয়্যার তিনজন ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন :

১. হযরত 'উছমান (রা) ইবন 'আফ্ফান ইবন আবিল 'আস ইবন উমাইয়্যা, তিনি ছিলেন তৃতীয় খলীফায়ে রাশিদ।

২. বানূ উমাইয়্যা শাসনের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মু'আবিয়া (রা) ইবন আবী সুফইয়ান ইবন হারব ইবন উমাইয়্যা।

৩. মারওয়ান ইবন আল-হাকাম ইবন আবিল 'আস ইবন উমাইয়্যা।

মু'আবিয়া (রা) বংশের শাসনের পরিসমাপ্তির পর মারওয়ান বংশের শাসন কায়েম হয়। গোটা ইসলামী বিশ্ব ১৩২ হিজরী পর্যন্ত এই খান্দানের শাসনাধীনে ছিল।[১]

---

১. 'আমীমুল ইহসান, তারীখুল ইসলাম (বাংলা অনুবাদ)-১৩৭-১৩৮

বানূ উমাইয়্যা খিলাফত

ইসলাম-পূর্ব যুগে গোটা আরবের শক্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিল মক্কার কুরায়শ গোত্র। এ গোত্রটিও আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে বানূ হাশিম ও বানূ উমাইয়্যা ছিল সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাবের কারণে বানূ উমাইয়্যাদের তুলনায় বানূ হাশিমের গুরুত্ব বেড়ে যায়। তবে জাহিলী যুগে জনবল এবং ক্ষমতা-প্রতিপত্তির দিক দিয়ে বানূ উমাইয়্যাদের পাল্লা ভারী ছিল।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর যখন খিলাফতের প্রশ্ন দেখা দিল তখন খিলাফতের দাবী নিয়ে কেবল বানূ হাশিম উঠে দাঁড়ালো। বানূ উমাইয়্যা সম্পূর্ণ দূরে থাকলো। হযরত 'উমারের (রা) পর হযরত 'উছমান (রা)– যিনি একজন উমাইয়্যা বংশীয় ছিলেন, খলীফা নির্বাচিত হন। কিন্তু এটা বানূ উমাইয়্যাদের চেষ্টার ফলে হয়নি, বরং হযরত 'উমার (রা) মৃত্যুর পূর্বে যে ছয় ব্যক্তিকে খিলাফতের জন্য মনোনীত করে যান তাঁদের মধ্যে 'উছমানও (রা) ছিলেন। আর বিষয়টি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফকে (রা) দায়িত্ব দিয়ে যান। তিনি হযরত 'উছমানকে (রা) খলীফা নির্বাচিত করেন। এ নির্বাচন 'আলীও (রা) মেনে নেন।

বানূ উমাইয়্যা খান্দানের মধ্যে হযরত 'মু'আবিয়া (রা) প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজের বাহুবলে (বৃহত্তর) সিরিয়ায় একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে পুত্র ইয়াযীদকে স্থলাভিষিক্ত করে সমগ্র আরববাসীর নিকট থেকে তার জন্য বাই'আত গ্রহণ করে যান। এ কারণে বানূ উমাইয়্যা খান্দানের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে মু'আবিয়ার (রা) আমল থেকেই শুরু হয়। তবে হযরত মু'আবিয়া যে রাষ্ট্র গঠন করেন তা খুব অল্প বয়স লাভ করে। ইয়াযীদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবায়র (রা) স্বতন্ত্রভাবে খিলাফতের দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ান।

সিরিয়া ও মিসর ছাড়া তৎকালীন গোটা ইসলামী বিশ্ব তাঁর ক্ষমতার বলয়ে চলে আসে। সিরিয়া ও মিসরের জনগণ ইয়াযীদের পুত্র মু'আবিয়ার হাতে বাই'আত করেছিল। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যে মু'আবিয়ার মৃত্যু হয়। সৎ-স্বভাবের কারণে তিনি মৃত্যুর পূর্বে কাউকে স্থলাভিষিক্ত করা থেকে বিরত থাকেন। এখন এ দু'টি রাষ্ট্রই যেন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের অধীনে চলে আসে এবং বানূ উমাইয়্যাদের নাম পৃথিবী থেকে মুছে যেতে বসে। হঠাৎ করে এ সময় বানূ উমাইয়্যাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়, যা প্রথম পর্যায় থেকে অত্যন্ত গৌরবময়, বেশী আড়ম্বরপূর্ণ এবং পরিধি আরো অধিক বিস্তৃত ছিল। বস্তুতঃ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) সময় থেকেই বানূ উমাইয়্যা খান্দানের মারওয়ানী শাখা খিলাফত লাভের জন্য দ্বিতীয়বার প্রচেষ্টা চালায় এবং মারওয়ান ইবন হাকাম বিদ্রোহ করে মিসর ও সিরিয়া অধিকার করে নেয়। কিন্তু মারওয়ান এত অল্প সময় লাভ করেন যে, তাঁর সময়ে এই খান্দান রাজনৈতিক দৃঢ়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

মারওয়ানের পরে তাঁর পুত্র 'আবদুল মালিক মারওয়ানী শাসন ও সরকার ব্যবস্থার প্রকৃত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেন এবং একাধারে একুশ বছর যাবত অত্যন্ত দাপটের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। এর মধ্যে যদিও সাত/আট বছর হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) সাথে গৃহ-যুদ্ধে অতিবাহিত হয়, তবুও তের/চৌদ্দ বছর অত্যন্ত প্রশান্তভাবে এককভাবে গোটা মুসলিম জাহান শাসন করেন।

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, যাঁর জীবনকথা আমরা আলোচনা করছি, এই 'আবদুল মালিকের ভাতিজা। তাঁর সময় পর্যন্ত খিলাফতের দায়িত্ব লাভের যে ধারাবাহিকতা চলে আসছিল তাতে কোনভাবেই তিনি তা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন না। তবে তিনি স্বীয় কর্ম-পদ্ধতি দ্বারা নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। মাস'উদী বলেছেন :[২]

أخذ عمر بن عبد العزيز الخلافة بغير حقـها ولابالاستحقاق ثـم استحقها بـالعدل حين أخذها.

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতে তাঁর কোন রকম অধিকার ছাড়াই খিলাফত লাভ করেন। তবে খলীফা হওয়ার পর 'আদল ও ইনসাফের দ্বারা তিনি তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।"

ইসলামের ইতিহাসে তাঁর শাসনকাল এই দিক দিয়ে বিশেষভাবে বৈশিষ্টমণ্ডিত যে, তিনি খিলাফতে রাশেদার নিয়ম-পদ্ধতি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর আমলে সমগ্র বিশ্ব আরেকবার সাহাবায়ে কিরামের আমলের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করে। 'আল্লামা ইবন খালদুন লিখেছেন :[৩]

"وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فترع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة جهده."

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মারওয়ানী ধারার মধ্যবর্তী সদস্য। তিনি চার খলীফা ও সাহাবায়ে কিরামের রীতি-পদ্ধতির প্রতি তাঁর সবটুকু দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।"

ইসলামের ইতিহাসে বানূ উমাইয়্যা ও বানূ 'আব্বাসিয়্যা পরস্পর বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তবে বানূ উমাইয়্যাদের কেবল 'আব্বাসিয়্যাদের উপরই নয়, বরং ইসলামের সকল শাসকগোষ্ঠীর উপর এ শ্রেষ্ঠত্ব রয়ে গেছে যে, তারা নিজেদের বাহু বলে ইসলামী রাষ্ট্রসীমা এত বিস্তৃত করেন যার দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দেখা যায় না। খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত কেবল আরব, শাম, মিসর ও ইরান ইসলামের রাষ্ট্রসীমার মধ্যে ছিল। কিন্তু বানূ উমাইয়্যা খলীফাগণ তাঁদের শাসনকালে এই বিন্দুকে বৃত্তে এবং বুদ্বুদকে এক সাগরে পরিণত করেন। তাঁরা একদিকে তো আফ্রিকা ও মাগরিবের সকল শহর জয় করে স্পেনকে ইসলামী স্মৃতি ও নিদর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত করেন। অন্যদিকে পূর্বে সিন্ধু, কাবুল ও ফারগানা জয় করে চীনা ভূখণ্ডে ইসলামী পতাকা উড্ডীন করেন। রোমান সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে কনস্টান্টিনোপলের নগর প্রাচীর পর্যন্ত

---

২. 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-৫
৩. প্রাগুক্ত

গিয়ে থামেন। দ্বীপমালার মধ্যে সাইপ্রাস, ক্রীট, রোডেশিয়া প্রভৃতি জয় করেন। মোটকথা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, আরব, আজম, তুর্কী, তাতারী, চীনা, ভারতীয় সকল জাতি-গোষ্ঠী তাঁদের সামনে মাথানত করে এবং এই বিশাল ভূখণ্ড তাদের সাম্রাজ্যের অধীনে আসে।

বানূ উমাইয়্যাদের রাষ্ট্রসীমা স্পেনের পশ্চিম সীমান্ত থেকে নিয়ে সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর এদিকে রোমান ভূখণ্ড থেকে আরম্ভ করে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছিল। এভাবে দিমাশ্কের খিলাফতের কেন্দ্রটি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) যদিও বিজয়ী হিসেবে উমাইয়্যা খিলাফতের সীমা-পরিধির বিস্তার ঘটাননি, তবে এ বিশাল রাষ্ট্রটিকে আদল ও ইনসাফ দ্বারা পূর্ণ করে দেন। একজন শাসকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এটাই।

'উমার-এর দাদা মারওয়ান

এখানে 'উমারের দাদা মারওয়ানের কিছু পরিচয় তুলে ধরা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বংশের দিক থেকে মারওয়ান ছিলেন কুরায়শী এবং আবদুশ শামসের পুত্র উমাইয়্যার প্রপৌত্র। কুষ্ঠিবিদ্যা বিশারদগণ দাবী করেছেন যে, 'আবদু মান্নাফের দু'পুত্র হাশিম ও উমাইয়্যা সৎ ভাই ছিলেন। তাঁদের দু'জনের পরস্পরের মধ্যে একটা বিদ্বেষ ছিল। বিশেষ করে উমাইয়্যা তো হাশিমকে ভীষণ হিংসা করতেন। তাঁকে মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। এই হিংসা ও শত্রুতা সামনে এগুতে থাকে। হাশিমের ও বানূ উমাইয়্যার সন্তানেরা জীবনের দৌড় ও প্রতিযোগিতায় একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টায় সেই বিদ্বেষ ও হিংসা ভুলতে পারেনি, যা উমাইয়্যা ও হাশিমের সৎ ভাই হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে জন্মেছিল।

এক দাদার সন্তান হওয়ার কারণে হোক অথবা হারব ও আবুল 'আস উভয়ে চিন্তা-ভাবনার দিক দিয়ে পরস্পরের কাছাকাছি হওয়ার কারণে হোক তাদের মধ্যে তেমন মতপার্থক্য ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়নি যেমন উমাইয়্যা ও হাশিমের মধ্যে হয়েছিল। হারব ও আবুল 'আস জীবনের দৌড় প্রতিযোগিতায় সব সময় একে অপরের পাশাপাশি থেকেছে। এরই প্রায় কাছাকাছি ঐক্য হারব ও আবুল 'আসের পুত্রগণ– আবূ সুফইয়ান, আল-হাকাম ও আফ্ফানের মধ্যেও ছিল। বিশেষতঃ 'আফ্ফান ও আল-হাকাম তো পরস্পরের খুবই কাছাকাছি ছিল। এত কাছাকাছি যে উভয়ের কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাও এক হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের সন্তানদের তাদেরই চিন্তা-চেতনায় গড়ে তুলেছিল। যদিও আফ্ফানের পুত্র 'উছমান (রা) ও আল-হাকামের পুত্র মারওয়ান চিন্তা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে পরস্পরের থেকে বহু দূরে ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা একে অপরকে এত ভালোবাসতেন যেন দু'জন বন্ধু ছিলেন।

হযরত 'উছমান (রা) সেই সকল মহান সাহাবীর অন্তর্গত ছিলেন যাঁরা ইসলামের আদি পর্বে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর বাবা-চাচা উভয়ে তাঁকে ভীষণ শাস্তি দিতেন। প্রাণভরে তাঁকে মারতেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, চাচা

আল-হাকাম যখন মদীনায় আশ্রয় নেন তখন 'উছমান (রা) স্বভাবগত ভদ্রতা অথবা পৈত্রিক সম্পর্কের কারণে তাঁকে কেবল নিজের ঘরেই আশ্রয় দেননি বরং নিজের ধন-সম্পদে ও ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাঁর পুত্র মারওয়ানসহ তাকে অংশীদার করে নেন। ইবন সা'দ হযরত 'উছমান (রা) ও মারওয়ানের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে :[৪]

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومروان بن الحكم ابن ثماني سنين، فلـم يزهـو وأبوه في الـمدينة حتى مات أبوه الحكم في خلافة عثمان فلم يزل مـروان مـع ابـن عمه عثمان. وكان كاتبًا له، وأمر له عثمان بأموال.

"রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাত হলো। তখন মারওয়ান ইবন আল-হাকাম আট বছরের বালক। তিনি পিতা আল-হাকামের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে মদীনায় ছিলেন। আল-হাকামের মৃত্যু হয় হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে। মারওয়ান সব সময় তাঁর চাচাতো ভাই 'উছমানের (রা) সঙ্গেই ছিলেন। তিনি তাঁর "কাতিব" বা সেক্রেটারীও ছিলেন। 'উছমান তাঁকে বহু অর্থ-সম্পদ দান করেছিলেন।"

মারওয়ানের পিতা আল-হাকাম ইবন আবিল 'আস, হযরত 'উছমানের (রা) চাচা, মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে মদীনায় গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর কিছু কর্মতৎপরতার দরুন রাসূল (সা) তাঁকে মদীনা থেকে বের করে দেন এবং তাঁকে তায়িফ গিয়ে বসবাস করতে বলেন। ইবন 'আবদিল বার আল-ইসতী'আব গ্রন্থে তার একটি কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলে কারীম (সা) উঁচু পর্যায়ের সাহাবীদের সাথে যে সকল গোপন শলা-পরামর্শ করতেন আল-হাকাম তা কোন না কোনভাবে জেনে প্রচার করে দিতেন। দ্বিতীয় আরেকটি কারণও বর্ণনা করেছেন। তা হলো তিনি অভিনয়ের আঙ্গিকে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুকরণ করতেন। একবার রাসূল (সা) নিজেই তাঁর এমন ভাঁড়ামিপূর্ণ অনুকরণ অবস্থায় দেখে ফেলেন।[৫] যাই হোক না কেন, নিশ্চয় এমন কোন মারাত্মক কাজ তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল যার প্রেক্ষিতে রাসূল (সা) তাঁকে মদীনা থেকে বের করে দেন। মারওয়ান তখন সাত/আট বছরের বালক। তিনিও পিতার সাথে তায়িফ চলে যান। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর আবূ বকর (রা) খলীফা হলেন। আল-হাকামের মদীনায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি চেয়ে আবেদন জানানো হলো। আবূ বকর (রা) সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। 'উমার (রা) খলীফা হলেন। আবারো আবেদন জানানো হলো। তিনিও তাঁকে মদীনায় আসার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। 'উছমান (রা) খলীফা হলেন। তিনি তাঁর খিলাফতকালে আল-হাকাম ও মারওয়ানকে মদীনায় ফিরিয়ে আনেন। একটি বর্ণনা মতে তিনি তাঁর এই কাজের সপক্ষে কারণ হিসেবে বলেন যে, আমি তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট

---

৪. তাবাকাত ইবন সা'দ (লাইডেন)-৫/২৪
৫. আল-ইসতী'আব-১/১১৮-১১৯

Contents

সুপারিশ করেছিলাম এবং তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁকে মদীনায় ফিরে আসার অনুমতি দান করা হবে। এভাবে এই পিতা-পুত্র উভয়ে তায়িফ থেকে মদীনায় ফিরে আসেন।[৬]

এই আল-হাকামের পুত্র মারওয়ানকে খলীফা হযরত 'উছমান (রা) তার সেক্রেটারী নিয়োগ করেন। যেহেতু হযরত 'উছমান (রা) তাঁদের পিতা-পুত্রকে মদীনায় ফিরিয়ে আনার রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মতি লাভ করেছিলেন তাই সাহাবায়ে কিরামের সে ব্যাপারে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। কিন্তু এহেন বিতর্কিত ব্যক্তির সন্তান মারওয়ানকে খলীফার সেক্রেটারী নিয়োগ করা, আর তা সেই সময় যখন উঁচু পর্যায়ের অসংখ্য যোগ্য সাহাবী জীবিত ছিলেন, সাহাবায়ে কিরাম সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারেননি। বিশেষতঃ যখন এই মারওয়ানের পিতা জীবিত ছিলেন এবং তিনি তাঁর পুত্রের মাধ্যমে খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। উল্লেখ্য যে এই আল-হাকাম হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতের শেষ দিকে হিজরী ৩৩ সনে ইনতিকাল করেন।[৭]

খলীফার সেক্রেটারীর পদ ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ। সেই পদে আসীন হয়ে মারওয়ান খিলাফত ও খলীফাকে মারাত্মক সঙ্কটে ফেলে দেন। হযরত 'উছমানের (রা) কোমল ও পূতঃপবিত্র স্বভাব ও তাঁর আস্থার সুযোগ নিয়ে সেক্রেটারী মারওয়ান এমন অনেক কাজ করেন যার দায়িত্ব অনিবার্যভাবে হযরত 'উছমানের (রা) উপর গিয়ে পড়ছিল। অথচ খলীফার অনুমতি তো দূরের কথা, তাঁর অজ্ঞাতসারেই মারওয়ান তা করে চলছিলেন। তাছাড়া তিনি হযরত 'উছমান (রা) ও উঁচু পর্যায়ের সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক বিনষ্ট করার সূক্ষ্ম চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন যাতে সত্যনিষ্ঠ খলীফা তাঁর পুরানো ও পরীক্ষিত বন্ধুদের পরিবর্তে তাঁকেই নিজের বেশী হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সহযোগী মনে করেন।[৮] শুধু এতটুকুই নয়, একাধিকবার তিনি সাহাবায়ে কিরামের সমাবেশে ভীতি প্রদর্শনমূলক ভাষায় ভাষণ দেন যা তাঁর মত "তুলাকা" (মক্কা বিজয়ের দিন ক্ষমাপ্রাপ্ত)-দের নিকট থেকে প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীগণ শুনে সহ্য করা সহজ ছিল না। এসব কারণে অন্যরা দূরে থাক, খোদ হযরত 'উছমানের (রা) বেগম সাহেবা হযরত নায়িলাও এমন ধারণা পোষণ করতেন যে, হযরত 'উছমানের (রা) জন্য অনেক সমস্যা ও সঙ্কট সৃষ্টি করার বড় একটি দায়িত্ব মারওয়ানের কাঁধে গিয়ে পড়ে। আর এ কারণে একবার তিনি স্বামী খলীফা 'উছমানকে (রা) পরিষ্কারভাবে বলেন : "যদি আপনি মারওয়ানের কথা মতো চলেন তাহলে সে আপনাকে হত্যা করিয়ে ছাড়বে। এ ব্যক্তির মধ্যে না আল্লাহর প্রতি সম্মানবোধ আছে, আর না আছে ভয় ও ভালোবাসা।"[৯]

শেষ পর্যন্ত যে পত্রটি হযরত 'উছমান (রা) হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় খলীফার অজ্ঞাতে তার লেখকও ছিলেন এই মারওয়ান। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, উটের যুদ্ধে 'আশারা

---

৬. আর-রিয়াদ আন-নাদিরা-২/১৪৩; আল-ইসাবা-১/৩৪৪, ৩৪৫

৭. খিলাফত ও মুলুকিয়াত-১১১

৮. তাবাকাত-৫/৩৬; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/২৫৯

৯. তারীখ আত-তাবারী-৩/৩৯৬-৩৯৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৭/১৭২-১৭৩

মুবাশ্‌শারার অন্যতম সদস্য হযরত তালহা (রা) যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে রণক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে নেওয়ার চিন্তা করছিলেন তখন এই মারওয়ান তাঁকে তীর নিক্ষেপ করে শহীদ করেন।[১০] পরবর্তীতে তিনি হযরত মু'আবিয়ার (রা) ডান হাতে পরিণত হন। তিনি তাঁকে মদীনার ওয়ালী নিয়োগ করেন। ওয়ালী থাকাকালে তাঁর অনেক কুকীর্তির মধ্যে এটাও যে, 'ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা দানের রীতি চালু করেন এবং তা তাঁর খান্দানের জন্য স্থায়ী রীতিতে পরিণত হয়।[১১] জুম'আর নামায দেরীতে আদায় করা তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়। একবার তো প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রেগে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেন এ ভাষায় :[১২]

أتظل عند ابنة فلان تروّحك بالمراوح وتسقيك الماء البارد وأبناء المهاجرين والأنصار يُصْهرون من الحرّ؟

"আপনি অমুকের মেয়ের নিকট অবস্থান করবেন, সে আপনাকে পাখার বাতাস করে, ঠাণ্ডা পানি পান করিয়ে আরাম দিবে, আর এ দিকে মুহাজির ও আনসারদের সন্তানরা কি গরমে বিগলিত হতে থাকবে?'

হিজরী ৪৯ সনে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দৌহিত্র, হযরত ফাতিমার (রা) কলিজার টুকরা হযরত হাসান (রা) ইনতিকাল করেন। তাঁকে হযরত 'আয়িশার (রা) ঘরে তাঁর নানার পাশে কবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়; কিন্তু এই মারওয়ানের বাধার কারণে তা সম্ভব হয়নি। তাঁকে বাকী' গোরস্তানে দাফন করা হয়।[১৩]

যেভাবে মারওয়ান খিলাফত লাভ করলেন

মু'আবিয়া ইবন ইয়াযীদের মৃত্যুর পর উমাইয়্যা খান্দানের শাসনের যখন অবসান হতে চলছিল তখন দিমাশকে দাহ্‌হাক ইবন কায়স ছিলেন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) সমর্থক ও সহযোগী। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তখন মক্কায় পৃথক খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছেন। দাহ্‌হাকের মতো শামের আরো কিছু আমীর 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের সহযোগী ছিলেন। এ অবস্থা দেখে মারওয়ান এবং তার মতো আরো কিছু উমাইয়্যা নেতৃবৃন্দ দিমাশ্‌ক থেকে হিজাযের উদ্দেশ্যে বের হন। এ খবর পেয়ে 'আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ পথিমধ্যে তাঁদের সাথে দেখা করেন। তিনি মারওয়ানের নিকট জানতে চান, তাঁর গন্তব্য কোন দিকে? মারওয়ান বলেন, তিনি মক্কায় যাচ্ছেন 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের হাতে বাই'আতের উদ্দেশ্যে। 'আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ তাঁকে তিরস্কার করেন এই ভাষায় :[১৪]

---

১০. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৪/২৮৭, ২৯২, ৩২১
১১. তাবারী, তারীখ-৬/২৬; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/২৫৮, ১০/৩০-৩১
১২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-১/৫৫
১৩. প্রাগুক্ত-/৪/৩৬১
১৪. তাবাকাত-৫/২৬

سبحان الله أرضيت لنفسك بهذا تبايع لأبى خبيب وأنت سيّد بنى عبد مناف والله لأنت أولى بها منه.

"সুবহানাল্লাহ! আপনি আবূ খুবায়বের হাতে বাই'আত করার জন্য রাজি হয়ে গেলেন? অথচ আপনিই তো 'আবদু মান্নাফের বংশধরদের নেতা। তাঁর চেয়ে খিলাফতের অধিকার আপনারই বেশী।"

'আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ সেই ব্যক্তি যে ইয়াযীদের সন্তুষ্টির জন্য হযরত হুসাইনকে (রা) শহীদ করেছিল, রাসূলুল্লাহর (সা) বংশধরদের বুক ঝাঝরা করেছিল এবং তাদের গলা কেটেছিল। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) সম্পর্কে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে যে কথা উচ্চারণ করেছিল তাতে তার কুৎসিত মানসিকতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। যে মারওয়ান ছিল সাহাবায়ে কিরাম তথা সত্যনিষ্ঠ মানুষদের দুশমন তাকেই সে খিলাফতের অধিকতর আহল ও যোগ্য মনে করলো। অথচ 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) স্থান ছিল ইমাম হুসাইন ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) পরে তাকওয়া-পরহেযগারী, উন্নত নৈতিকতা ও কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে সকল মানুষের উপরে। তিনি ছিলেন 'আশারা-ই-মুবাশ্শারার অন্যতম সদস্য হযরত যুবায়রের (রা) পুত্র, উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) ভাগ্নে এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) দৌহিত্র। হযরত আসমা' বিনত আবী বকর (রা) তাঁর মা।

যাই হোক, মারওয়ান তার কথায় গুরুত্ব দেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করেন : আপনি কি করতে বলেন?

'আবদুল্লাহ বললো : দিমাশ্কে ফিরে চলুন এবং মানুষকে আপনার খিলাফতের দাবীর কথা বলুন। আমি সাহায্য করবো।

এমন কথা 'আমর ইবন সা'ঈদও বললো। এই 'আমর ছিল ইয়ামনী আরবগোষ্ঠীর নেতা। সে মারওয়ানকে পরামর্শ দিল ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার বিধবা স্ত্রী, তরুণ যুবক খালিদের মাকে বিয়ে করার জন্য যাতে খালিদ বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।[১৫]

এই তিনজনের মধ্যে একটি চুক্তি হলো। তিনজন আবার ফিরে গেলেন। ইবন যিয়াদ দিমাশকের "বাবুল ফারাবীস" নামক স্থানে অবস্থান নিয়ে দাহ্হাক ইবন কায়সের সাথে সাক্ষাৎ করলো। তাঁর হাতে চুমু খেয়ে তাঁর বংশ-আভিজাত্য ও কৌলিন্যের প্রশংসা করলো। নানা কথার পর চলে গেল। দ্বিতীয় দিন আবার সে দাহ্হাকের নিকট গেল এবং আগের দিনের মত তোষামোদীমূলক কথা বলে ফিরে গেল। তৃতীয় দিন আবার গেল এবং দাহ্হাকের সাথে একান্তে মিলিত হলো। সে বিস্ময় প্রকাশ করে দাহ্হাককে বললো, আপনি যে কুরায়শ নেতা 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের সমর্থক ও সহযোগী, তাঁর চেয়ে তো আপনি নিজে এই পদের বেশী উপযুক্ত এবং জনগণের নিকট তাঁর চেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য।

---

১৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৩৯৭

ইবন যিয়াদ ছিল ভীষণ কৌশলী ও মিষ্টভাষী মানুষ। সে দাহ্‌হাক ইবন কায়সের মতো একজন সরল ও সাদাসিধে সৈনিককে সহজে নিজের প্রতারণার ফাঁদে আটকে ফেললো। সে দাহ্‌হাককে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) পরিবর্তে নিজের জন্য মানুষের নিকট থেকে বাই'আত গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করলো। কিছু লোক তাঁর হাতে বাই'আত করলো। কিন্তু জনগণের অধিকাংশ যাঁরা 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) সমর্থক ছিল তারা দাহ্‌হাকের উপর ক্ষেপে গেল।

ইবন যিয়াদের চাতুর্য দাহ্‌হাকের মতো এত বড় সামরিক শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে দিল। সে তাঁকে আবার দিমাশ্‌ক ছেড়ে বাইরে কোথাও শিবির স্থাপনের এবং সেখানে পৌছে সাধারণ সৈনিক ও শহরের জনসাধারণকে নিজের দিকে আহ্বান জানাতে পরামর্শ দিল। দাহ্‌হাক তার এ পরামর্শও মেনে নিলেন। তিনি দিমাশক থেকে বেরিয়ে 'মার্‌জ"-এ শিবির স্থাপন করলেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ কিন্তু শহর ছাড়লো না। সে সেখানে অবস্থান করে শহরের উঁচু স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে মারওয়ানের দলে ভিড়ানোর কাজটি সমাধা করলো।

সেই সময় মারওয়ান ও উমাইয়্যা খান্দানের লোকেরা তাদমীরে ছিলেন। ইয়াযীদের পুত্র খালিদ ও তার মা ছিলেন আল-জাবিয়াতে। 'আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ দূত মারফত মারওয়ানকে লিখলেন তিনি যেন উমাইয়্যা খান্দানের লোকদের সমবেত করে দ্রুত নিজের খিলাফতের জন্য বাই'আত গ্রহণ করেন এবং আল-জাবিয়াতে পৌছে খালিদের মাকে বিয়ে করেন।

ইবন যিয়াদের নির্দেশ মতো মারওয়ান কাজ করলেন। প্রথমে তিনি বানূ উমাইয়্যাদের নিকট থেকে বাই'আত গ্রহণ করেন। তারপর আল-জাবিয়াতে আসেন। সেখানে খালিদ তাঁর একজন বড় হিতাকাঙ্খী খালু হাস্‌সান ইবন মালিকের নিকট থাকতেন। মারওয়ান আল-জাবিয়াতে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত হাস্‌সান মানুষকে খালিদ ইবন ইয়াযীদের হাতে বাই'আতের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু মারওয়ান বানূ উমাইয়্যাদের বড় একটি দলকে সঙ্গে করে আল-জাবিয়াতে পৌছালে হাস্‌সানের সিদ্ধান্ত বদলে যায়। তিনি মারওয়ানের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর বাই'আত গ্রহণ করেন। তাঁর বাই'আত গ্রহণের পরই জনগণ মারওয়ানকে খলীফা হিসেবে মেনে নেয়। আর এভাবে আল-হাকাম ইবন আবিল 'আসের পুত্রের জন্য খিলাফতের পথ সহজ হয়ে যায়। তিনি আল-জাবিয়াতে জনগণের নিকট থেকে নিজের জন্য বাই'আত গ্রহণের পরই খালিদের মাকে বিয়ে করেন।

এদিকে আল-জাবিয়াতে জনগণ মারওয়ানের হাতে বাই'আত করছে, আর ওদিকে সেই দিন ইবন যিয়াদ দিমাশকবাসীদের নিকট থেকে মারওয়ানের জন্য বাই'আত গ্রহণ করে। তারপর সে মারওয়ানকে লিখে জানায় যে, তিনি যেন 'মারজে রাহিত"-এ অবস্থানরত দাহ্‌হাকের দিকে অগ্রসর হন।

মারওয়ান ও ইবন যিয়াদ বিভিন্নভাবে শক্তি সঞ্চয় করে দাহ্‌হাকের মুকাবিলার জন্য "মারজে রাহিত" এ উপস্থিত হন। একাধারে বিশ দিন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর দাহ্‌হাক ও তাঁর

সাহসী সঙ্গীদের নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে তা শেষ হয়। দাহ্হাকের জীবিত সৈনিকরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। ইয়াযীদের মৃত্যুর পর উমাইয়্যা শাসনের যে পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছিল তা "মারজে রাহিত"-এর যুদ্ধের মাধ্যমে আবার তাদের হাতে ফিরে আসে।

বিজয়ীর বেশে মারওয়ান দিমাশকে প্রবেশ করলেন এবং মু'আবিয়ার (রা) সিংহাসনে বসলেন। তিনি মু'আবিয়ার (রা) পদাঙ্ক অনুসরণ করে বায়তুল মালের দরজা খুলে দেন এবং অর্থের বিনিময়ে মানুষের সমর্থন ও আনুগত্য ক্রয় করেন।[১৬]

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ সেই মারওয়ান যাকে হযরত 'উছমান (রা), আমীর মু'আবিয়া (রা) ও ইয়াযীদের সময়ে সৃষ্টি জগতের অভিশপ্ত মনে করা হতো, যাকে মদীনার লোকেরা ফিতনা বা ঝগড়া-বিবাদের দ্বার বলতো, তিনি "খলীফাতুল্লাহ 'আলা আল-আরদ" বা পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি নিজেই জর্দানে পৌছে বিস্ময়ের সাথে বলেন : মনে হয় আল্লাহ তা'আলা খিলাফত আমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন।[১৭]

সত্যি, আল্লাহ খিলাফত তাঁর জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ, 'আমর ইবন সা'ঈদ এবং হাস্সান ইবন মালিকের মতো চতুর, বিচক্ষণ ও উচ্চাভিলাষী রাজনীতিবিদগণ তাঁর পাশে সমবেত হয়ে তাঁর ভাগ্যকে আরো উজ্জ্বল ও সহজ করে তোলেন। মারওয়ানকে আর যাঁরা সাহায্য করেন তাঁদের মধ্যে তাঁর দুই পুত্র আবদুল মালিক ও 'আবদুল 'আযীযও ছিলেন।

মারওয়ানের জন্ম মক্কায় এবং মৃত্যু শামে ৬৩ বছর বয়সে হিজরী ৬৫ সনের রমাদান মাসে। মোট নয় মাস আঠারো দিন খিলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন।[১৮] মৃত্যুর পূর্বে তিনি দুই পুত্র 'আবদুল মালিক ও 'আবদুল আযীযকে যথাক্রমে খলীফা মনোনীত করে যান। 'আবদুল মালিক বড় ছিলেন। এ কারণে তাঁকে প্রথম এবং ছোট 'আবদুল আযীযকে দ্বিতীয় স্থানে রাখেন। মৃত্যুর সময় আবদুল মালিক পিতার কাছে ছিলেন, আর 'আবদুল আযীয ছিলেন সুদূর মিসরে।

এই মারওয়ানের পুত্র আবদুল আযীয এবং তাঁর পুত্র 'উমার– ইতিহাসে যিনি 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয নামে প্রসিদ্ধ।

'আবদুল 'আযীযের পরিচয়

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পিতা 'আবদুল 'আযীয ইবন মারওয়ান উমাইয়্যা খান্দানের একজন বিশিষ্ট ভাগ্যবান ব্যক্তি। তাঁর নিজের বর্ণনা : "মাসলামা ইবনে মাখলাদ মিসরের ওয়ালী থাকাকালীন আমি সেখানে যাই। আমার অন্তরে তখন কয়েকটি বাসনা জাগে। পরবর্তীকালে তা সবই পূর্ণ হয়। সেই বাসনাগুলো হলো : ১. আমি যেন

---

১৬. তাবাকাত-৫/২৬

১৭. তাবাকাত-৫/২৭

১৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৩৯৮

মিসরের ওয়ালী হই, ২. মাসলামার দুই স্ত্রীই যেন আমার স্ত্রী হয়, ৩. কায়স ইবন কুলাইব যেন আমার হাজিব বা নিরাপত্তা রক্ষী হয়।"[২৯] আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করেছেন। মাসলামার দুই স্ত্রীই তাঁর স্ত্রী হয়েছে, কায়স ইবন কুলাইব তাঁর হাজিব হয়েছে এবং বিশ বছর দশ মাস একাধারে মিসরের ওয়ালী থেকেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে ইসলামের ইতিহাসে আর কোন ব্যক্তি কোথাও এত দীর্ঘ সময় ওয়ালীর দায়িত্ব পালন করেননি।

হিজরী ৬৫ সনে তিনি মিসরে ওয়ালীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ব্যাপারটি ঘটে এভাবে : 'আবদুর রহমান ইবন জাহদাম, যিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) পক্ষ থেকে মিসরের ওয়ালী ছিলেন, মিসরের ঐ সকল খারিজীদেরকে যাঁরা মক্কায় 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিল, তাদের ঐক্যবদ্ধ করে "তাহকীম" বা সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির দাবী জানায়। আর সে সময় মিসরে বানূ উমাইয়্যাদের সমর্থক লোকেরা তাঁর হাতে বাই'আত করে। এরপর হিজরী ৬৪ সনের যুলকা'দা মাসে 'আবদুল 'আযীযের পিতা মারওয়ান ইবন হাকাম সিরিয়ায় জনগণের নিকট থেকে নিজের হাতে বাই'আত নেন। মিসরের মানুষ প্রকাশ্যে ইবন জাহদামের পক্ষে ছিল, তবে গোপনে তাঁদের সমর্থন ছিল মারওয়ানের প্রতি। এ কারণে মিসরবাসী তাঁকে মিসরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। মারওয়ান তাঁর উঁচু পর্যায়ের আমলা ও সহযোগীদের একটি বড় দল নিয়ে মিসরের দিকে যাত্রা করেন। অন্যদিকে পুত্র 'আবদুল 'আযীযকে একটি বাহিনীসহ আয়লায় পাঠান। ইবন জাহদাম মুকাবিলার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আকদার ইবন হাম্মাম আল-লাখমীর নেতৃত্বে কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ সমুদ্র পথে শামের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেন। স্থল পথে যুদ্ধের জন্যও দু'টি বাহিনী পাঠান। তাঁর একটি উদ্দেশ্য ছিল 'আবদুল 'আযীযকে আয়লায় ঢুকতে না দেওয়া। এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন যুহাইর ইবন কায়স। তিনি বুসাক নামক স্থানে 'আবদুল 'আযীযের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং পরাজয় বরণ করেন। ইবন জাহদাম নিজে "আইনু শামস" নামক স্থানে মারওয়ানের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। দুই দিনের প্রচণ্ড যুদ্ধে দু'পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়। অবশেষে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ইবন জাহদাম ও মারওয়ানের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়। আপোষের পর হিজরী ৬৫ সনের জুমাদা আল-উলা মাসে মারওয়ান মিসরে প্রবেশ করেন এবং ফিলফিল নামক স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ এমনভাবে অবস্থান মেনে নিতে পারলো না। তাই তিনি বললেন, খলীফা এমন শহরে অবস্থান করতে পারেন না যেখানে কোন প্রাসাদ নেই। অতঃপর তাঁর নির্দেশে 'কাসরুল বায়দা' নির্মাণ করা হয়। তিনি জনগণের ভাতা চালু করেন। একমাত্র মু'আফির গোত্র ছাড়া সমগ্র মিসরবাসী তাঁর খিলাফত মেনে নিয়ে তাঁর হাতে বাই'আত করে। তিনি সর্বমোট দুই মাস মিসরে অবস্থান করেন। হিজরী ৬৫ সনের রজব মাসে তিনি পুত্র 'আবদুল 'আযীযকে মিসরের ওয়ালীর দায়িত্ব দিয়ে দিমাশ্‌কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বিদায় বেলায় 'আবদুল 'আযীয বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! এমন

---

২৯. 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-৯

একটি দেশ যেখানে আমার কোন আত্মীয়-বন্ধু নেই, আমি থাকবো কেমন করে? তখন মারওয়ান পুত্রকে উদ্দেশ্য করে নিম্নের উপদেশগুলো দান করেন :[৩০]

أى بُنَيَّ، انظر إلى عُمَّالك، فإن كان لهم عندك حق غُدْوةً فلا تُؤخِّرْهُ عشيَّةً، وإن كان لهم عشِيَّةً فلا تُؤخِّرْه إلى غدوة، وأعطهم حقوقهم عند محلها، تستوجب بذلك الطاعة منهم. وإياك أن يظهر لرعيَّتك منك كذب، فإنهم إن ظهر لهم منك كذب لم يصدِّقوك فى الحق، واستشر جلساءك وأهل العلم، فإن لم يَسْتَبْن لك فاكتب إليَّ يأتك رأيي فيه إن شاء الله تعالى. وإن كان بك غضب على أحد من رعيتك فلا تؤاخذه به عند سورة الغضب، واحبس عنه عقوبتك حتى يَسْكُنَ غَضَبُكَ، ثم يكون منك مايكون وأنت ساكن الغضب منطفئ الْجَمْرَةِ، فإن من جعل السجن كان حليما ذا أناةٍ. ثم انظر إلى اهل الحسب والدين والمروءة، فليكونوا أصحابَك وجلساءَك، ثم أعرف منازلهم منك على غير استر سال ولا انقباض، أقول هذا وأستخلف الله عليك.

"আমার প্রিয় ছেলে! তুমি তোমার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। সকাল বেলায় তোমার নিকট তাদের যদি কোন দাবী থাকে তা পূরণ করতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেরী করবে না। তেমনিভাবে সন্ধ্যায় যদি কোন দাবী থাকে, সকাল পর্যন্ত তা দেরী করবে না। তাদের অধিকার যথাসময়ে প্রদান করবে। এতে তাদের আনুগত্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। তোমার প্রজাদের নিকট তোমার কোন মিথ্যা যেন প্রকাশ না পায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। তোমার কোন মিথ্যা যদি তাদের নিকট প্রকাশ পায় তাহলে তারা তোমার সত্যকেও বিশ্বাস করবে না। তোমার পারিষদবর্গ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবে। তারপরেও যদি কোন বিষয় তোমার নিকট স্পষ্ট না হয় তাহলে আমাকে লিখবে। ইনশাআল্লাহ আমার মতামত যথাসময়ে তোমার নিকট পৌঁছে যাবে। তোমার প্রজাদের কারো প্রতি যদি তোমার রাগ হয় তাহলে সেই রাগের মুহূর্তে তাকে পাকড়াও করবে না। তোমার রাগ শান্ত হওয়া পর্যন্ত তার শাস্তি স্থগিত রাখবে। তারপর তুমি ঠাণ্ডা মেজাজে প্রশান্ত অবস্থায় তাকে তোমার যা ইচ্ছা শাস্তি দিবে। কারণ, যে ব্যক্তি প্রথম কারাগার বানিয়েছেন তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও ধৈর্যশীল। তারপর তুমি দৃষ্টি দিবে অভিজাত বংশীয়, দীনদার ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রতি। তাঁরা অবশ্যই তোমার সংগী-সাথী ও পারিষদবর্গ হবে। সব রকম উদারতা ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে তাদের মর্যাদা ও স্থান নিরূপণ করবে। আমার বক্তব্য এতটুকু। তোমার উপর আমি আল্লাহকে প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যাচ্ছি।" এছাড়া তিনি 'আবদুল 'আযীযকে আরো কিছু উপদেশ

---

৩০. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-১/৪২; আহমাদ-যাকী সাফওয়াত, জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/১৯১

দান করেন। মিসর ত্যাগের পূর্বে বিশরকে 'আবদুল 'আযীযের সহকারী এবং মূসা ইবন নুসাইরকে তাঁর মন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিয়োগের ঘোষণা দেন।

মারওয়ান মিসর থেকে দিমাশ্কে ফিরে মাত্র দু'মাস জীবিত ছিলেন। অতঃপর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র 'আবদুল মালিক খলীফা হন। তিনি 'আবদুল 'আযীযকে তাঁর ওয়ালীর পদে বহাল রাখেন। 'আবদুল 'আযীয তাঁর শাসন আমলে মিসরে অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। হিজরী ৬৭ সনে একটি দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ নির্মাণ করেন। হিজরী ৭০ সনে মিসরে "তা'উন" (প্লেগ) মহামারী আকারে দেখা দিলে তিনি হুলওয়ানে চলে যান এবং সেখানে স্থায়ী হন। সেখানে একাধিক প্রাসাদ ও মসজিদসহ আঙ্গুর ও খেজুরের বহু বাগান তৈরি করেন। হিজরী ৭৭ সনে কায়রোর পুরাতন মসজিদটি ভেঙ্গে চতুর্দিকে আরো সম্প্রসারণ করে পুনঃনির্মাণ করেন। হিজরী ৬৯ সনে সেখানে দু'টি পুল তৈরি করে তার উপর নিজের নামটি খোদাই করেন।[৩১] কবি 'উবায়দুল্লাহ ইবন কায়স আর রুকায়্যাত (মৃ. ৭৫ হি.)-এর একটি কবিতায় 'আবদুল 'আযীযের কর্মকাণ্ডের একটি চমৎকার চিত্র বিধৃত হয়েছে।[৩২]

"তা'রীফ" নামক এক প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান চালু করেন। আর তা হলো 'আরাফার দিন 'আসরের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা। তিনি জ্ঞানী-গুণীদের অধিকার প্রদান এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে অত্যন্ত উদারতার সাথে বহাল রাখেন। মিসরের কাজী 'আবদুর রহমান ইবন হুজায়রা আল-খাওলানীর ভাতা নির্ধারণ করেন বার্ষিক এক হাজার দীনার। আবুল খায়র মারছাদ আল-ইয়াযনীকে তিনি নিজে ডেকে তাঁর নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া নিতেন।[৩৩] মিসরের 'আলিম-'উলামা, জ্ঞানী-গুণী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন আহার করতেন। এক হাজার খাঞ্চা খাবার নিজের বাসস্থানের পাশে এবং অন্যত্র আরো এক শো খাঞ্চা খাবার প্রতিদিন সাধারণ মানুষকে খাওয়ানো হতো।[৩৪] প্রতি বছর গ্রীষ্ম ও শীত মওসুমের শুরুতে কম আয়ের মানুষ ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে ঠাণ্ডা-গরমের কাপড় বিতরণ করতেন। বিধবা, ইয়াতীম ও দুঃস্থদের জন্য প্রতিদিনের ভাতা চালু করেন। মোটকথা অভাবীদের অভাব দূরীকরণের জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা চালান।

কবিগণের সান্নিধ্য তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এত উদার হস্তে কবিদের দান করতেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর কোন কোন কবি কবিতা চর্চা ছেড়ে দেন। বিশেষ করে কবি কুছায়্যির ও নুসাইবকে এত অর্থ দান করেন যে কেউ কখনো কোন কবিকে সে পরিমাণ অর্থ দেয়নি। কবি কুছায়্যিরকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি এখন কবিতা বলেন না কেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন : 'আবদুল 'আযীযের পরে আর কার নিকট তেমন প্রতিদানের আশা করা যায়?[৩৫]

---

৩১. সুয়ূতী, হুসনুল মুহাদারা-২/২০৪; আল-কিন্দী, কিতাবু উলাতি মিসর (বৈরূত)-১৮৫
৩২. মু'জাম আল-বুলদান-২/২৯৩, ২৯৪; 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১৪
৩৩. হুস্ন আল-মুহাদারা-১/১১৮
৩৪. 'আবদুস সালাম, নাদবী-৯
৩৫. হুস্ন আল-মুহাদারা-২/২৪০

তিনি কেবল একজন উদার দানশীল ব্যক্তিই ছিলেন না, বরং জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে মিসরের কৃষি ব্যবস্থারও সংস্কার করেন। সরকারী উদ্যোগে অনেক ফলের বাগান করেন এবং পতিত জমি আবাদ করার জন্য কৃষকদের মধ্যে বন্টন করেন। মিসরের সরকারী পতিত ভূমি আবাদ করার জন্য মূল আরব থেকে কৃষিজীবী লোকদের এনে তাদেরকে ভূমি পত্তন দেন।

তিনি 'আলিম-'উলামার ভাতা নির্ধারণ করেন। জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বহু বিদ্যালয় ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি নিজের প্রাসাদেও একটি মাদরাসা চালু করেন। ইবন কাছীর 'আবদুল 'আযীযের মৃত্যু প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে নিম্নের মন্তব্যটি করেন :[৩৬]

وقد كان عبد العزيز بن مروان من خيار الأمراء كريمًا جوادا ممدحًا.

"'আবদুল 'আযীয ইবন মারওয়ান ছিলেন উদার, দানশীল, প্রশংসিত সৎ আমীরদের একজন।"

হিজরী ৮৬ সনে ১৪ই জুমাদা আল-উলা সোমবার 'আবদুল 'আযীয হুলওয়ানে ইনতিকাল করেন এবং ফুসতাতে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় এই কথাগুলো : "হায়! আমি যদি উল্লেখযোগ্য কিছু না হতাম! হায়! আমি যদি হতাম ধূলিকণা অথবা হতাম হিজাযের কোন অখ্যাত রাখাল!" আরবের বহু কবি তাঁর মৃত্যুর পর মরছিয়া লিখেছেন।[৩৭]

'আবদুল 'আযীয একাধিক বিয়ে করেন। অনেকগুলো সন্তান রেখে যান। তবে যে সন্তানের কারণে তাঁর নাম উজ্জ্বল হয়েছে, তিনি এই 'উমার। অনেকে মনে করেছেন, 'উমারের মধ্যে যে সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছিল তার পিছনে তাঁর পিতার বড় অবদান রয়েছে। কথাটি যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, তিনি যে মায়ের দুধ পান করেন তিনিও ছিলেন একজন উঁচু মাপের মা।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের জন্ম ও পরিচয়

'উমারের ডাকনাম আবূ হাফ্স। পিতা 'আবদুল 'আযীয ইবন মারওয়ান। মায়ের নাম উম্মু 'আসিম, দ্বিতীয় খলীফা-ই রাশিদ হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) পুত্র হযরত 'আসিমের (রা) কন্যা।

এখানে পূর্বের একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা) ঘোষণা দিয়েছিলেন যেন দুধে পানি মিশানো না হয়। একদিন রাত্রিবেলা টহল দানের সময় তিনি শুনতে পেলেন, জনৈকা মা তার মেয়েকে বলছে; মেয়ে! ভোর হয়ে যাচ্ছে, দুধে পানি মিশিয়ে দাও। মেয়েটি বলছে, মা! আপনি জানেন না, আমীরুল মু'মিনীন দুধে পানি মিশাতে নিষেধ করেছেন? মা বললো : এ সময় আমীরুল মু'মিনীন কোথায়? তিনি কিভাবে জানবেন? মেয়ে বললো : আমীরুল মু'মিনীন না জানলেও আল্লাহ তো দেখছেন। হযরত 'উমার (রা) ঘরটি চিনে রাখলেন। পরদিন পুত্র 'আসিমকে বললেন : তুমি এই

---

৩৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/৫৮
৩৭. কিতাবু উলাতি মিসর-১৫৮

মেয়েকে বিয়ের পয়গাম পাঠাও। আমি আশা করছি এর পেটে এমন সন্তানের জন্ম হবে যে সমগ্র আরবের শাসক হবে। 'আসিম মেয়েটিকে বিয়ে করেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এই দম্পতিরই দৌহিত্র।[৩৮]

এভাবে তাঁর ধমনীতে 'উমার ফারূকের (রা) রক্ত বহমান ছিল। সম্ভবতঃ এ কারণে মারওয়ানের মতো একজন বিতর্কিত মানুষের বংশে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মতো মহান সংস্কারকের জন্ম হয়। যিনি ছিলেন সততায় আবূ বকর (রা), ন্যায়পরায়ণতায় 'উমার (রা), লজ্জা-শরমে 'উছমান (রা) এবং যুহ্দ ও তাকওয়ায় 'আলীর (রা) সমকক্ষ। উমাইয়্যারা ইসলামী উম্মাহ্র প্রাণসত্তাকে যেভাবে হত্যা করেছিল তিনি সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা পুনর্জীবিত করেন। তিনি তৎকালীন খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের চাচাতো ভাই ছিলেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী খলীফা আল-ওয়ালীদ ও সুলায়মানের খিলাফতকালে মদীনার ওয়ালীর দায়িত্ব পালন করেন।

হাফেজ জালাল উদ্দীন সুয়ূতী লিখেছেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মিসরের নীল নদের তীরে একটি গ্রাম হুলওয়ানে, যার আমীর ছিলেন তাঁর পিতা, হিজরী ৬১ অথবা ৬৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন।[৩৯] তবে আল্লামা যাহাবী 'তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইয়াযীদের খিলাফতকালে মদীনায় তাঁর জন্ম হয় এবং মিসরে পিতার ওয়ালী থাকাকালে সেখানে বেড়ে ওঠেন।[৪০] এটাই সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, হিজরী ৬৫ সনে 'আবদুল 'আযীয মিসরে ওয়ালীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর তাই হিজরী ৬১ অথবা ৬৩ সনে হুলওয়ানে তাঁর জন্মগ্রহণ কোনভাবেই বোধগম্য নয়।

'উমারের শিক্ষা-দীক্ষা

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং একটু বড় হলে তাঁর পিতা মিসরের ওয়ালী নিযুক্ত হন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তিনি স্ত্রী-সন্তান মদীনায় রেখেই মিসরে যান। সেখান থেকে তিনি স্ত্রী উম্মু 'আসিমকে ছেলে 'উমারসহ মিসর যাওয়ার জন্য লেখেন। স্বামীর চিঠি পেয়ে উম্মু 'আসিম চাচা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট যান এবং তাঁকে সব কিছু খুলে বলে পরামর্শ চান। উল্লেখ্য যে, উম্মু 'আসিমের পিতা হযরত 'আসিম (রহ) এর আগেই ইনতিকাল করেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন, তুমি তোমার স্বামীর কাছে চলে যাও। তবে এই ছেলেকে আমাদের কাছে রেখে যাও। কারণ, তোমাদের সবার চেয়ে আমাদের সাথে এ ছেলের মিল সবচেয়ে বেশী। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলতেন : 'উমার ইবনুল খাত্তাবের বংশের মধ্যে তার মতো আর কার চেহারায় এমন চিহ্ন আছে যে, 'আদল-ইনসাফে পৃথিবী ভরে তুলবে?[৪১] অতঃপর হযরত উম্মু 'আসিম

---

৩৮. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-৯৭-৯৮

৩৯. 'আলী-ফা'উর, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১৩

৪০. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/১১৮

৪১. আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৬৫

ছেলে 'উমারকে তার নানা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) তত্ত্বাবধানে রেখে মিসর চলে যান।

উম্মু 'আসিম মিসরে পৌঁছলে সঙ্গে ছেলেকে না দেখে 'আবদুল 'আযীয জিজ্ঞেস করেন : 'উমার কোথায়? স্ত্রীর কাছে সব কথা শোনার পর ভীষণ খুশী হন। সাথে সাথে তিনি দিমাশ্‌কে বড় ভাই খলীফা 'আবদুল মালিককে বিষয়টি জানিয়ে দেন। খলীফা এই শিশু-'উমারের জন্য এক হাজার দীনার মাসিক ভাতা নির্ধারণ করে দেন।

মায়ের সাথে মদীনায় থাকা অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা মা ও নানা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট শুরু হয়। যেমন ইবন 'আবদিল হাকাম বর্ণনা করেছেন :[৪২]

كان يأتي إلى عبد الله بن عمر كثير المكان أمه منه، ثم يرجع إلى أمه فيقول يا أمه أنا أحب أن أكون مثل خالي ـ يريد عبد الله بن عمر فترفق به ثم تقول له اعزب أنت تكون مثل ذلك.

'শিশু 'উমার 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) সাথে তাঁর মায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে প্রায়ই তাঁর নিকট যেতেন। ফিরে এসে মাকে বলতেন, মা! আমি আমার মামার মতো হতে চাই। মামা বলতে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারকে বুঝাতেন। মা আদর করতেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, চিন্তা করোনা, তুমি তাঁর মতই হবে।'

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট এ শিক্ষা হয়তো কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। যেহেতু মা ও ছেলে উভয়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তাই এ শিক্ষা ছিল একান্তই পারিবারিক। আর যেহেতু উম্মু 'আসিমের পিতা 'আসিম জীবিত ছিলেন না, তাই উম্মু 'আসিম সব সময় সকল বিষয়ে চাচার পরামর্শ মেনে চলতেন।

কিছুকাল পরে 'উমার তাঁর পিতা 'আবদুল 'আযীযের নিকট চলে যান। সেখানে পিতার তত্ত্বাবধানে অবস্থান করতে থাকেন। এর মধ্যে হঠাৎ একটি দুর্ঘটনা ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে পিতা-মাতা মনে করলেন তাঁর শিক্ষা মদীনাতে হওয়াই সঙ্গত। অতঃপর তাঁরা তাঁকে আবার মদীনায় পাঠিয়ে দেন।[৪৩] যে ঘটনার প্রেক্ষিতে 'উমারকে মদীনায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয় তা হলো, একদিন শিশু 'উমার সকলের অগোচরে একাই গাধার পিঠে চড়তে যান এবং পড়ে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এ অবস্থায় মায়ের নিকট আনা হলে মা সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে মুখের ক্ষত থেকে রক্ত মুছতে মুছতে সংগে কোন প্রহরী না দেওয়ায় পিতাকে ভীষণ তিরস্কার করেন।[৪৪] পিতা ধৈর্যের সাথে জবাব দেন : উম্মু 'আসিম! তুমি একটু চুপ কর। সে যদি বানূ উমাইয়্যার মারাত্মক ক্ষতচিহ্নের অধিকারী হয়ে যায় তাহলে তোমার জন্য খুশীর খবর।[৪৫] অপর একটি বর্ণনা মতে, গাধার পিঠ

---

৪২. ইবন 'আবদিল হাকাম, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১৯; রশীদ আখতার নাদবী, সীরাতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-৪৬

৪৩. সীরাতে ইবন 'আবদিল হাকাম-১৯-২০

৪৪. তাবারী, তারীখ-৫/৩১৯

৪৫. কিতাবুল আগানী-৮/১৪৯; আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৫৯

থেকে পড়ে আহত হলে 'উমারের এক ভাই আসবাগ ইবন 'আবদিল 'আযীয সে কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়ে। পিতা তাকে ধমক দিয়ে বলেন, তোমার ভাই পড়ে আহত হয়েছে, আর এই কষ্টের কথা শুনে তুমি হাসছো? আসবাগ বললো : হে মাননীয় আমীর! ভাই কষ্ট পেয়েছে সে জন্য আমি হাসছি না, এজন্যও হাসছি না যে, তার পড়ে যাওয়াতে আমি খুশী হয়েছি। সে পড়ে গিয়ে বানূ উমাইয়্যার অধিকতর ক্ষতচিহ্নের অধিকারী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে, তাই আমি খুশী হয়েছি। সে অবশ্যই ভাগ্যবান।[৪৬]

আসলে এই কথারও একটা প্রেক্ষাপট আছে। বানূ উমাইয়্যাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে একথা প্রচলিত ছিল যে, খুরাসানের জনৈক সূফী সাধক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন যে, এক মহান ব্যক্তি তাঁকে বলছেন :[৪৭]

إذا ولى الأشجّ من بنى أمية يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا.

"যখন বানূ উমাইয়্যার ললাটে ক্ষতচিহ্ন ব্যক্তিটি খিলাফতের অধিকারী হবে তখন পৃথিবী আদল-ইনসাফে ভরে দেবে, যেমন ভরে গেছে যুলুম-অত্যাচারে।"

আরো বর্ণিত হয়েছে, স্বপ্নে উক্ত ব্যক্তি আরো বলেন :

إذا قام أشجّ بنى مروان فانطلق فبايعه فإنه إمام عدل.

"যখন বানূ মারওয়ানের ক্ষতচিহ্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হবে তখন তুমি তার বাই'আত করবে। কারণ, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক।"

অতঃপর স্বপ্নে আদিষ্ট লোকটি বলেন, তারপর থেকে আমি খোঁজ নিতে থাকি কখন সেই লোকটি খিলাফতের মসনদে আসীন হবেন। অবশেষে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হলেন। তারপর তিনবার তাঁকে স্বপ্নের মধ্যে আমাকে দেখানো হয় এবং গিয়ে তাঁর হাতে বাই'আত করি।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত 'উমার ইবন আল খাত্তাবের (রা) বলেও কোন কোন বর্ণনায় এসেছে। বর্ণিত হয়েছে একদিন তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন। ঘুম থেকে জেগে চোখ-মুখ কচলাতে কচলাতে বললেন :

من هذا الذى يكون أشجّ من ولدى ويسير بسيرتى؟

'আমার সন্তানদের মধ্যে ললাটে আঘাতের চিহ্ন বিশিষ্ট এই লোকটি কে? সে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।"

তিনি আরো বলেন :

إن من ولدى رجلا بوجهه أثر يملأ الأرض عدلاً.

"আমার সন্তানদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি হবে যার চেহারায় আঘাতের চিহ্ন থাকবে– সে 'আদল ও ইনসাফে পৃথিবী ভরে দেবে।"

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) তাঁর পিতার কথাটির পুনরাবৃত্তি করে প্রায়ই বলতেন :

---

৪৬. 'আবদুল 'আযীয সায়্যিদুল আহ্ল, আল-খলীফাতু আয-যাহিদ (বৈরূত)-২১
৪৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/১৯০

ليت شعرى! من هذا الذى من ولد عمر في وجهه علامة، يملأ الأرض عدلاً.

"হায়! আমি যদি 'উমারের বংশধরদের মধ্যে সেই সন্তানটিকে চিনতে পারতাম যার চেহারায় চিহ্ন রয়েছে এবং সে পৃথিবী 'আদল-ইনসাফে পূর্ণ করে দেবে।"[৪৮]

বানূ উমাইয়্যার ছোট-বড় সকলের এ ভবিষ্যদ্বাণীটি জানা ছিল। আর তাই পিতা 'আবদুল 'আযীয তাঁর ক্ষত স্থানের রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন :[৪৯]

إن كنت أشجَّ بنى أمية أنك إذًا سعيد.

"তুমি যদি বানূ উমাইয়্যার মারাত্মক আঘাত-চিহ্নিত ব্যক্তি হও তাহলে তো একজন ভাগ্যবান মানুষ।" পরবর্তীতে তাঁকে যে– أَشَجُّ بَنِى أُمَيَّةَ – (আশাজ্জু বানী উমাইয়্যা) বলা হতো তার উৎপত্তি এখান থেকেই। সত্যি সত্যি 'আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এত প্রসিদ্ধ হন যে, বলা হয়ে থাকে – الأشج والناقص أعدلا بنى مروان – "আল-আশাজ্জ ও আন-নাকিস (আঘাতের চিহ্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও হ্রাসকারী), এ দু'জন বানূ মারওয়ানের অধিক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।" উল্লেখ্য যে, আন-নাকিস হলেন ইয়াযীদ ইবন আল-ওয়ালীদ। তাঁর এমন নাম হওয়ার কারণ হলো, খলীফা ওয়ালীদ হিজাযবাসীদের যে ভাতা নির্ধারণ করেন তিনি তা কমিয়ে দেন।

উপরোক্ত বর্ণনা ও ঘটনার কারণে 'উমার বানূ উমাইয়্যার সকলের ঈর্ষণীয় প্রিয় পাত্রে পরিণত হন। চাচা খলীফা 'আবদুল মালিক তো তাঁকে নিজের সন্তানদের চাইতেও বেশী ভালোবাসতেন। সকলের উপর তাঁকে প্রাধান্য দিতেন। এজন্য তাঁর এক পুত্র তাঁকে একবার তিরস্কার করলে তিনি বলেন, কি কারণে আমি তাঁকে এত ভালোবাসী তা কি তুমি জান? সে বললো : না। 'আবদুল মালিক বললেন :[৫০]

إنه سيلى الخلافة يومًا، وهو أشج بنى مروان الذى يملأ الأرض عـدلاً بعـد أن تملأ جورا. فمالى لا أحبه ولا أدينه.

"সে একদিন খিলাফতের অধিকারী হবে, সে বানূ মারওয়ানের ললাটে আঘাতের চিহ্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যে পৃথিবী জুলুম-অত্যাচারে ভরে যাওয়ার পর আবার 'আদল-ইনসাফে পূর্ণ করে দেবে। সুতরাং কেন আমি তাঁকে ভালোবাসবো না, আর কেন আমি তাঁকে কাছে রাখবো না?"

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয দ্বিতীয়বার মদীনায় আসলেন এবং প্রখ্যাত তাবি'ঈ সালিহ ইবন কায়সানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে তাঁর তা'লীম ও তারবিয়্যাত (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) চলতে থাকে। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে তাঁকে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও নৈতিক আচরণ শিক্ষা দেন। তিনি যে 'উমারকে কঠোর পর্যবেক্ষণে রাখেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনা

৪৮. প্রাগুক্ত-২০; সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-১৮; সুয়ূতী, তারীখ আল-খুলাফা-২২৯
৪৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/১৯২
৫০. আল-খলীফাতু আয-যাহিদ-২৩

দ্বারা। একবার নামাযের জামা'আতে শরীক হতে 'উমারের একটু দেরী হলো। সম্মানীত শিক্ষক সালিহ্ ইবন কায়সান এর কারণ জানতে চাইলে 'উমার বলেন, মাথার কেশ বিন্যাস করতে গিয়ে দেরী হয়ে গেছে। সালিহ্ বললেন, কেশ বিন্যাসের প্রতি এতই আসক্ত হয়েছো যে তা নামাযের উপরও প্রাধান্য পেতে আরম্ভ করেছে? বিষয়টি তিনি মিসরে অবস্থানরত 'উমারের পিতা 'আবদুল 'আযীযকে পত্র দিয়ে জানালেন। পত্র পেয়ে বিলম্ব না করে তিনি এক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠালেন। লোকটি মদীনায় পৌঁছে প্রথমে 'উমারের মাথা ন্যাড়া করে, তারপর অন্যদের সাথে কথা বলে।[৫১]

শৈশবের এই ঘটনা তাঁকে এত প্রভাবিত করে যে, পরবর্তীতে তিনি নিজের সন্তানদেরও গৃহ-শিক্ষক নিয়োগ করেন এই সালিহ্ ইবন কায়সানকে।[৫২]

'আবদুল 'আযীয যে তাঁর সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন তা তাঁর সন্তানের শিক্ষককে লেখা একটি চিঠিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :[৫৩]

أما بعد فإني اخترتك على علم منى لتأديب ولدى فصرفتهم إليك عن غيرك من موالِ وذوى الخاصة بى، فحدثهم بالجفاء، فهو أمعن لإقدامهم، واترك الصحبة فإن عادتها تكسب الغفلة، قلّل الضحك فان كثرته تميت القلب،وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهى التى بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. فإنه بلغنى من الثقات من أهل العلم أن حضور المعازف واستماع الأغانى واللهج بها ينبت النفاق فى القلب كما ينبت العشب الماءُ. وليفتح كل غلام منهم بجزء من القرآن يتثبت فى قراءته، فإذا فرغ تناول قوسه ونبله وخرج إلى الغرض حافيا فرمى سبعة أرشاق ثم انصرف إلى القائلة.

"অতঃপর এই যে, আমি আমার সন্তানের শিক্ষার জন্য আপনাকে মনোনীত করেছি। আমার অন্য সব মাওয়ালী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে আপনার কাছে তাকে দিয়েছি। আপনি তাঁকে কঠোরভাবে আদেশ করুন যা তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আড্ডা থেকে বিরত রাখুন। কারণ, তা অমনোযোগিতা জন্ম দেয়। হাসিকে কমান। বেশী হাসিতে অন্তর মরে যায়। আপনার শিক্ষার সূচনাতেই তার যেন খেল-তামাশার প্রতি বিরূপ ধারণা গড়ে ওঠে। খেল-তামাশার উৎস হলো শয়তান, আর তার পরিণতি পরম করুণাময়ের অসন্তুষ্টি। বিশ্বস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট থেকে আমি জেনেছি, বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি, গান শোনা ও এসবের প্রতি নিবেদিত হওয়া অন্তরে নিফাক বা কপটতা জন্ম

---

৫১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/১৯২; আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৬৫

৫২. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/৩৩৩

৫৩. 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার-১৬

দেয়, যেমন পানি জন্ম দেয় তৃণলতা। প্রত্যেক শিশু প্রতিদিন কুরআনের কিছু অংশ সঠিকভাবে পাঠ করবে। পাঠ শেষে তারা ঢাল, বর্শা ও তীর নিয়ে খালি পায়ে বেরিয়ে যাবে এবং সাতটি তীর-বর্শা নিক্ষেপ করবে। তারপর ফিরে এসে বিশ্রাম নিবে।"

'আবদুল 'আযীয যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে আসতেন তখন মদীনায় পুত্র 'উমার এবং তার শিক্ষক ও প্রশিক্ষক সালিহ ইবন কায়সানের সাথে দেখা করতেন। নিজের সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতেন।[৫৪]

সাধারণ বানূ উমাইয়্যাদের মতো 'উমারও তাঁর শিক্ষা জীবনে হযরত 'আলীর (রা) সমালোচনা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতেন। একথা তাঁর অপর একজন মহান শিক্ষক 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উতবার কানে গেলে তিনি ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন হলেন। একদিন যথারীতি 'উমার তাঁর কাছে গেলেন, কিন্তু তিনি কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। 'উমার তার সাথে এমন আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। 'উবায়দুল্লাহ রাগতঃ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

"তুমি কিভাবে জানলে যে, বদরী যোদ্ধাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হওয়ার পর আবার অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন?" 'উমার তাঁর মহান শিক্ষকের কথার মর্ম বুঝে ফেলেন। সাথে সাথে তিনি তাওবা করেন এবং অঙ্গীকার করেন যে, ভবিষ্যতে আর কখনো 'আলীর (রা) সমালোচনা করবেন না। তিনি আজীবন এ অঙ্গীকার পালন করেছেন।

এখানে উল্লেখিত দু'টি ঘটনার আলোকে বুঝা যায় তাঁর মহান শিক্ষকগণ তাঁকে কেবল বাহ্যিক শিক্ষাই দেননি, বরং নৈতিক ও মানসিক উভয় শিক্ষা সমানভাবে দিয়ে তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য যোগ্য করে তোলেন।

এমন কঠোর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তিনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন। জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহও ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি মদীনায় অন্য সব সাধারণ ছেলেদের মতই একজন ছিলাম। পরে আমার মধ্যে আরবী ভাষা ও কবিতার আগ্রহ সৃষ্টি হয়'। সুতরাং প্রবল আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে তিনি জ্ঞানার্জন করেন। এটা ছিল তাঁর শিক্ষার প্রথম পর্যায়। আর যে পর্যায়ের জ্ঞানার্জন তাঁকে ইমামের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে সেটা ছিল তাঁর মদীনার গভর্ণর থাকাকালীন সময়। এ সময় তিনি বড় বড় 'আলিমদের সাহচার্য লাভ করেন এবং জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনা-পর্যালোচনার সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, আমি যখন মদীনা ছাড়লাম তখন আমার চেয়ে বড় কোন 'আলিম ছিলেন না।[৫৫]

বিয়ে

'উমার মদীনায় অবস্থানকালে তাঁর পিতা 'আবদুল 'আযীয মিসরে ইনতিকাল করেন। চাচা খলীফা 'আবদুল মালিক তাঁকে দিমাশ্‌কে ডেকে নেন এবং নিজ কন্যা ফাতিমাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয় এভাবে :

---

৫৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/১৯২
৫৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৩

'আবদুল মালিক 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে লক্ষ্য করে বলেন :

قد زوجك أمير المؤمنين ابنته فاطمة.

"আমীরুল মু'মিনীন তাঁর কন্যা ফাতিমাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করছেন।"

জবাবে 'উমার বলেন :

جزاك الله يا أمير المؤمنين خيرا. فقد أجزلت العطية وكفيت المسألة.

"হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আপনি প্রচুর দান করেছেন এবং প্রত্যাশা পূরণ করেছেন।"[৫৬]

ফাতিমা অত্যন্ত ভাগ্যবতী ও বুদ্ধিমতী শাহযাদী ছিলেন। একজন আরব কবি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন :[৫৭]

بنت الخليفة والخليفة جدها + أخت الخلائف والخليفة زوجها.

"তিনি খলীফার কন্যা, তাঁর দাদাও খলীফা ছিলেন। বহুজন খলীফার ভগ্নী তিনি, তাঁর স্বামীও খলীফা।

ক্ষমতার মসনদে

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয শিক্ষা জগতের সাথেই বেশী মানানসই ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু শাহী খান্দানের সদস্য হওয়ার কারণে খুব দ্রুত ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে চলে যান। সর্বপ্রথম খলীফা 'আবদুল মালিক তাঁকে খুনাসিরা (خُنَاصِرَة)-এর ওয়ালী নিয়োগ করেন।[৫৮] হিজরী ৮৬ সনে 'আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক খিলাফতের মসনদে আসীন হন। তিনি 'উমারের সততা ও যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি হিজরী ৮৭ সনের ২৩ রাবী'উল আওয়াল হিশাম ইবন ইসমা'ঈলকে মদীনার ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করে তদস্থলে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে নিয়োগ দান করেন।

এই নিয়োগ গ্রহণের ব্যাপারে তিনি ইতস্ততঃ করতে থাকেন। ফলে মদীনা গমনে বিলম্ব হতে থাকে। ওয়ালীদ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন : 'উমার যাচ্ছো না কেন? বললেন : কিছু শর্ত সাপেক্ষে আমি সেখানে যেতে পারি। ওয়ালীদ শর্তগুলো জানতে চান। তিনি বললেন : তথাকার পূর্বের ওয়ালীগণের মতো আমাকে জুলুম-নির্যাতনে বাধ্য করতে পারবেন না। ওয়ালীদ তাঁর শর্ত মেনে নেন এবং বলেন : তুমি সত্য ও সঠিকভাবে কাজ করবে, তাতে যদি বায়তুল মালে একটি দিরহামও জমা না হয় তাতে কোন পরোয়া করবে না।[৫৯] অতঃপর এই শর্তের ভিত্তিতে তিনি মদীনা রওয়ানা হন। সেই সময়ের 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয পরবর্তীকালের দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ দরবেশ

---

৫৬. তারীখ আল-খুলাফা-৬৩০; আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৪/১৫২
৫৭. ইসলামী বিশ্বকোষ (বাংলা)-৬/২
৫৮. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-২৪২
৫৯. প্রাগুক্ত-৩২, ৩৩

'উমার ছিলেন না। তিনি তখন ক্ষমতা ও প্রাচুর্যের অধিকারী শাহী খান্দানের একজন সদস্য এবং আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয। তাই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্রের বোঝা তিরিশটি উটের পিঠে চাপিয়ে তিনি মদীনায় উপস্থিত হন।[৬০] মদীনায় মারওয়ান ভবনে ওঠেন। যুহরের নামাযের পর মদীনার তৎকালীন দশজন বিখ্যাত ফকীহ ও 'আলিমকে ডেকে পাঠান। তাঁরা হলেন : 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র, আবূ বকর ইবন সুলায়মান ইবন আবী খায়ছামা, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'উদ, আবূ বকর ইবন 'আবদির রহমান ইবন আল-হারিছ, সুলায়মান ইবন ইয়াসার, আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উবায়দিল্লাহ ইবন 'আমর, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন রাবী'আ ও খারিজা ইবন যায়দ (রা)। তাঁরা উপস্থিত হলে 'উমার তাঁদের উদ্দেশ্যে নিম্নের কথাগুলো বলেন :[৬১]

إني إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه، وتكونون فيه أعوانا علـى الحـق، مـا أريـد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأى من حضرمنكم، فإن رأيتم أحدا يتعـدى أو بلغكـم عـن عامل لى ظُلامة فأحرِّج الله على من بلغه ذلك إلا بلغنى.

"আমি আপনাদেরকে এমন এক কাজের জন্য ডেকেছি যাতে আপনারা প্রতিদান পাবেন এবং সত্যের সহযোগী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবেন। আমি আপনাদের পরামর্শ ছাড়া কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই না। এ কারণে আপনারা কাউকে কারো উপর জুলুম-অত্যাচার করতে দেখলে অথবা আমার কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী কারো উপর জুলুম করছে এমন খবর পেলে আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে অবশ্যই অবহিত করবেন।" তাঁর এ কথাগুলো শোনার পর উপস্থিত ফকীহ-'আলিমগণ তাঁর মঙ্গল কামনা করতে করতে ফিরে যান। ইমাম আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ 'উমারের বক্তব্য শেষে মন্তব্য করেন :[৬২]

اليوم ينطق من كان لا ينطق.

"যারা কথা বলতে পারতো না এখন তারা কথা বলতে পারবে।"

আসলে ভোগ-বিলাসী জীবন যাপন করলেও তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি ছিল সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন। তাই সেই তরুণ বয়সে ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়ে এমন পরিচ্ছন্ন কথা বলতে সক্ষম হন।

'উমার উল্লেখিত 'আলিমগণের মধ্যে কিছু অনুকরণীয় আদর্শ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবার মধ্যে দেখেছিলেন একজন দয়ালু উটের রাখালের আদর্শ, যে তার উটকে সব সময় বিপজ্জনক স্থান থেকে দূরে রাখার জন্য

---

৬০. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩৩৫
৬১. আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/৫২৬; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২১০
৬২. মুফতী 'আমীমুল ইহসান, তারীখুল ইসলাম (বাংলা অনু.)-২০৭

কঠোরতা করে। আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদকে দেখেছিলেন সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ এবং খিলাফতের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিরূপে। আর 'আলী ইবন আল-হুসায়ন যাইনুল 'আবিদীনকে দেখেছিলেন সবচেয়ে ভালো মানুষ এবং বিশ্ববাসীর নেতারূপে। সুতরাং 'উমার তাঁদেরকে ডেকে পাঠান যাতে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ মতো দায়িত্ব পালন করতে পারেন।[৬৩]

আমীরুল হজ্জের দায়িত্ব পালন

খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে এ রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে, খলীফা নিজে আমীরুল হজ্জ হতেন এবং জনগণকে তাঁর সাথে হজ্জ আদায়ে নেতৃত্ব দিতেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মদীনার ওয়ালী থাকাকালে বেশ কয়েকবার এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করেন। হিজরী ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯২ ও ৯৩ সনে তাঁর নেতৃত্বে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়।[৬৪] হিজরী ৯৭ সনে খলীফা সুলায়মান হজ্জ আদায় করেন। মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার সময় 'উমার তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন। কাফেলা রাবিগে অবস্থানকালে আকাশে প্রবল মেঘ, বিদ্যুতের ঝলকানি ও প্রচণ্ড বজ্রের শব্দে সুলায়মান ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তখন 'উমার তাঁকে বলেন : هذه الرحمة، فكيف العذاب؟ – এই যদি হয় রহমত (করুণা, দয়া) তাহলে আযাব (শাস্তি) কেমন?[৬৫]

মসজিদে নববীর নির্মাণ

মদীনার ওয়ালী থাকাকালে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যে অক্ষয় কীর্তিগুলো সম্পাদন করেন তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মসজিদে নববীর নির্মাণ। যদিও হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালেই মসজিদে নববীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন শুরু হয়ে গিয়েছিল, বিশেষতঃ হযরত 'উছমান (রা) এটিকে খুবই জাঁকজমকপূর্ণ করে তুলেছিলেন। তাঁর পরে হযরত 'আলীর (রা) সময় থেকে খলীফা 'আবদুল মালিকের সময় পর্যন্ত কোন খলীফা এই মসজিদের ব্যাপারে কোন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। অবশ্য খলীফা 'আবদুল মালিক একবার সম্প্রসারণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মদীনাবাসীদের অস্বীকৃতির কারণে সম্ভব হয়নি। খলীফা ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং তিনি মসজিদটিকে সম্পূর্ণ নতুন কাঠামো ও শৈলীতে নির্মাণ করতে চান। দিমাশ্‌কের জামি' মসজিদ নির্মাণ শেষ করে তিনি হিজরী ৮৮ সনে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে লিখলেন, মসজিদে নববী নতুন করে নির্মাণ করতে হবে এবং এর আশে পাশে আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত অর্থাৎ হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পূতঃপবিত্র বেগমদের যে সকল হুজরা ও অন্যান্য বাড়ী-ঘর আছে অর্থের বিনিময়ে সেগুলো অধিগ্রহণ করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খলীফার এ আদেশ বাস্তবায়ন করেন।

---

৬৩. 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার-২৪

৬৪. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/২৯১

৬৫. প্রাগুক্ত-২/২৯৮

খলীফা ওয়ালীদ মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ বিষয়ে 'উমারকে যে দিক নির্দেশনামূলক পত্র দেন তার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :[৬৬]

قدِّم القبلة إن قدرت، وأنت تقدر لمكان أخوالك، وإنهم لايخالفونك، فمن أبى منهم فقوِّموا ملكه قيمة عدل واهْدِمْ عليهم وادفع الأثمان إليهم،فإن لك في عمر وعثمان أسوة.

"সম্ভব হলে কিবলাকে (মিহরাবকে) সামনে এগিয়ে নিবে। তোমার মামাদের অবস্থানের কারণে তুমি তা পারবে। তারা তোমার বিরোধিতা করবে না। আর কেউ বাধ সাধলে ন্যায্য মূল্য দিয়ে রাজি করাবে এবং ভেঙ্গে তাদের মূল্য দিয়ে দিবে। এ ব্যাপারে তোমার জন্য 'উমার ও 'উছমানের (রা) মধ্যে দৃষ্টান্ত রয়েছে।"

পত্র পেয়ে 'উমার মসজিদের আশে-পাশের বাড়ী-ঘরের মালিকদের ডেকে খলীফার পত্রটি পাঠ করে শোনান। তারা অর্থের বিনিময়ে নিজেদের মালিকানা ছেড়ে দিতে রাজি হয়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয পুরাতন মসজিদ, উম্মাহাতুল মু'মিনীনের হুজরাসমূহ ও আশে-পাশের বাড়ী-ঘর ভাংতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁর সংগে ছিলেন কাসিম, সালিম, আবূ বকর ইবন 'আবদির রহমান (রহ) প্রমুখ মদীনার বিশিষ্ট ফকীহগণ। তাঁরা সকলে 'উম্মাহাতুল মু'মিনীনের হুজরাসমূহ মসজিদের মধ্যে ঢুকিয়ে নতুন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

হিজরী ৮৮ সনে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং তখনই খলীফা ওয়ালীদ রোমান সম্রাটকে একটি পত্রে এই বলে অনুরোধ করেন যে, আমরা আমাদের নবীর মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করেছি, আপনারা আমাদের সাহায্য করুন। পত্র পেয়ে রোমান সম্রাট এক লাখ মিছকাল স্বর্ণ, এক শো কারিগর ও চল্লিশটি উট বোঝাই মার্বেল পাথর পাঠান।[৬৭] ওয়ালীদ মাদায়েনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মার্বেল পাথর খোঁজারও নির্দেশ দেন। এভাবে যখন সকল উপকরণ সংগ্রহ শেষ হয় তখন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এত গুরুত্বের সাথে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন যে, কারুকার্যের এক একজন কারিগরকে ৩০ দিরহাম পর্যন্ত তার একটি কাজের জন্য পুরস্কার দিতেন।

ইতোপূর্বে যদিও মসজিদে নববীর বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয়েছিল, কিন্তু গম্বুজ ও মিহরাবের দিকে তখনও কেউ দৃষ্টি দেননি। এটা উদ্ভাবনের গৌরব 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অর্জন করেন। তিনি মসজিদের চার কোণে মিহরাব তৈরি করান এবং পানির নালাগুলো তৈরি করান কাঁচ দ্বারা। ফলে তা এক দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যে পরিণত হয়।[৬৮]

---

৬৬. আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/৫৩২

৬৭. প্রাগুক্ত-৫/৫৩২; তাবারী, তারীখ-৫/২২৩

৬৮. ইবন তুগরী বারদী, আন-নুজূম আয-যাহিরা-১/৬৭, ২১৫; খুলাসাতুল ওয়াফা-১৩৯-১৪০

হিজরী ৮৮ সনে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং তা শেষ হয় হিজরী ৯০ সনে। হিজরী ৯১ সনে খলীফা ওয়ালীদ হজ্জ আদায় এবং সেই সাথে নবনির্মিত মদীনার মসজিদ পরিদর্শনের পরিকল্পনা করেন। তিনি মদীনার কাছাকাছি পৌছলে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে তাঁকে স্বাগতম জানান।[৬৯] খলীফা ওয়ালীদ মসজিদে প্রবেশ করে ঘুরে ঘুরে দেখতে আরম্ভ করেন। মূল মসজিদের ছাদের দিকে দৃষ্টি পড়তেই 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে বলেন, গোটা মসজিদের ছাদ এমনভাবে করলেন না কেন?

বললেন : খরচ অনেক বেশী পড়তো। কেবল কিবলার দিকের দেওয়াল এবং দুই ছাদের মধ্যবর্তী স্থানের জন্য পঁয়তাল্লিশ হাজার (৪৫০০০) দীনার ব্যয় হয়েছে।[৭০]

ফোয়ারা

ওয়ালীদের নির্দেশে তিনি মসজিদের সাথে একটি ফোয়ারাও নির্মাণ করেন। হজ্জের সময় মসজিদ পরিদর্শনকালে ওয়ালীদ এই ফোয়ারা ও পানির সংরক্ষণাগার দেখে দারুণ খুশী হন। এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি অনেক কর্মচারী নিয়োগ দেন এবং মসজিদের মুসল্লীদের এখান থেকে পানি পান করানোর নির্দেশও দেন।[৭১]

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আর তা হলো, প্রখ্যাত তাবি'ঈ হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) মধ্যে ছিল স্বৈরাচারী উমাইয়্যা খলীফা ও আমীর-উমারাদের প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব। তিনি একাধিক উমাইয়্যা খলীফার যুগ লাভ করেন। তাঁদের কারো সামনে মাথা নোয়াননি। শুধু তাই নয়, বরং তাঁদের কাউকে সাক্ষাৎ দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করেননি। খলীফা 'আবদুল মালিকের সাথে তাঁর এ রকম কয়েকটি ঘটনার কথাই ইতিহাসে পাওয়া যায়। 'আবদুল মালিকের পরে তাঁর পুত্র আল-ওয়ালীদের সাথেও হযরত সা'ঈদের (রহ) কর্মধারা একই রকম ছিল।

মসজিদে নববীর পুনঃনির্মাণ ও প্রশস্তকরণের পর যখন ওয়ালীদ পরিদর্শনে এলেন তখন মসজিদের অভ্যন্তরের সব মানুষকে বের করে দেওয়া হয়। সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। তাঁকে উঠানোর হিম্মত কারো হলো না। এক ব্যক্তি শুধু এতটুকু বলেন যে, এ সময় যদি আপনি একটু সরে যেতেন। তিনি জবাব দিলেন, আমার ওঠার যে সময় আছে তার আগে আমি উঠবো না। তারপর আবার আবেদন জানানো হলো, ঠিক আছে উঠবেন না, তবে অন্ততঃ এতটুকু করুন যে, যখন আমীরুল মু'মিনীন এদিক দিয়ে যাবেন তখন সালাম দেওয়ার জন্য একটু উঠে দাঁড়াবেন। বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতে পারি না। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খলীফা ওয়ালীদকে মসজিদ ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। তিনি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবের (রহ) মর্যাদা এবং তাঁর বেয়াড়া স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

---

৬৯. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩৪০
৭০. খুলাসাতুল ওয়াফা-১৪০
৭১. আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/৫৩৩

এ কারণে তিনি কোন রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে সা'ঈদকে ওয়ালীদের দৃষ্টির আড়ালে রাখার জন্য এদিক ওদিক ঘোরাতে থাকেন। এক সময় ওয়ালীদ কিবলার দিকে তাকাতেই সা'ঈদের উপর দৃষ্টি পড়ে। ওয়ালীদ জিজ্ঞেস করেন : এই বৃদ্ধ কে? সা'ঈদ তো নয়? 'উমার জবাব দিলেন : হাঁ, তিনিই। তারপর 'উমার তাঁর পক্ষ থেকে কৈফিয়াত দিতে গিয়ে তাঁর বিভিন্ন অসুবিধার কথা বলতে আরম্ভ করেন। তিনি বললেন : এখন তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং চোখেও কম দেখেন। যদি তিনি আপনাকে চিনতে পারতেন তাহলে সালাম দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেন। ওয়ালীদ বললেন! হাঁ, আমি তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অবগত। আমি নিজেই তাঁর নিকট যাচ্ছি। এরপর ওয়ালীদ এদিক সেদিক ঘুরে তাঁর নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : শায়খ, আপনার শরীর কেমন আছে? সা'ঈদ (রহ) নিজের জায়গায় বসে বসেই জবাব দিলেন : আল-হামদু লিল্লাহ! ভালো আছি। তবে এতটুকু সৌজন্য বজায় রাখলেন যে, ওয়ালীদের কুশলও জিজ্ঞেস করলেন। এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের পর ওয়ালীদ এ কথা বলতে বলতে ফিরে যান যে, এ হলো পুরাতন স্মৃতি।[৭২]

এই মসজিদ নির্মাণে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। এ কারণে গভীর মনোযোগ সহকারে নিজস্ব তদারকিতে অত্যন্ত রুচিসম্মতভাবে নির্মাণ করেন। সম্পূর্ণ ইমারতটি তৈরি করা হয় মূল্যবান পাথর দিয়ে। দেওয়াল এবং ছাদ ছিল নকশা করা। ঝাড়বাতির একেকটি কারুকাজের জন্য কারিগরকে তিরিশ দিরহাম করে বখশিশ দিতেন। এমন তোড়জোড় ও তত্ত্বাবধানে তিন বছরে মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কর্ম দক্ষতায় খলীফা ওয়ালীদ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।[৭৩]

ওয়ালীর দায়িত্ব পালনকালে মসজিদে নববী ছাড়াও তিনি মদীনার আশে-পাশের আরো বহু মসজিদ নির্মাণ করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় যেখানে যেখানে নামায আদায় করেছিলেন স্মৃতির নিদর্শন হিসেবে মুসলমানগণ পরবর্তীকালে সেখানে মামুলী ধরনের মসজিদ তৈরি করেছিল। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এ ধরনের সকল মসজিদ কারুকাজ করা মূল্যবান পাথর দিয়ে পুনঃনির্মাণ করেন।[৭৪]

জনকল্যাণমূলক কাজের ধারাবাহিকতায় খলীফা আল-ওয়ালীদের নির্দেশে তিনি মদীনায় বহু কূপ খনন করেন এবং অনেক দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা সংস্কার করে চলাচলের জন্য সুগম করেন।[৭৫] 'উমারের কর্ম দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে খলীফা ওয়ালীদ তাঁকে মদীনার সাথে মক্কা ও তায়িফেরও ওয়ালীর দায়িত্ব দান করেন। অতঃপর হিজরী ৯০ সনে সমগ্র হিজাযের শাসন কর্তৃত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করেন।[৭৬]

---

৭২. প্রাগুক্ত-৪/৫৫৪-৫৫৫; আন-নুজূম আয-যাহিরা-১/২২৩; ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, তাবি'ঈদের জীবন কথা-১/৯৭-৯৮
৭৩. তাবি'ঈন-৩২০
৭৪. ফাতহুল বারী-১/৪৭২
৭৫. আল-কামিল ফিত-তারীখ-৪/৫৩৩
৭৬. তাবারী, তারীখ-৫/২৩০

ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) হিজরী ৮৭ সন থেকে ৯৩ সন পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মদীনা, মক্কা ও তায়িফের ওয়ালীর দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে হিজরী ৯৩ সনে এ পদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন।

ওয়ালীর পদ থেকে তাঁকে অপসারণ বা স্বেচ্ছায় পদত্যাগের বিভিন্ন কারণ বিভিন্ন জনে উল্লেখ করেছেন। সে রকম তিনটি কারণ এখানে উল্লেখ করা হলো। হতে পারে এর যে কোন একটি অথবা সবগুলো কারণে তাঁকে এ পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়।

১. 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) ওয়ালী হিসেবে তাঁর নিয়োগের সময় শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, পূর্বসূরীদের মতো জনগণের উপর জুলুম-নির্যাতনের জন্য তাঁর উপর কোন রকম চাপ প্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু বানূ উমাইয়্যাদের পক্ষে এ শর্ত পূরণ করা মোটেই সম্ভব ছিল না। ইবনুল জাওযী (রহ) তাঁর "সীরাতু 'উমার ইব্ন 'আবদিল 'আযীয" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) পুত্র হযরত খুবায়ব (রহ) ছিলেন বানূ উমাইয়্যাদের একজন প্রবল প্রতিপক্ষ। হিজরী ৯৩ সনে খলীফা ওয়ালীদ 'উমারকে নির্দেশ দেন খুবায়বকে বন্দী করে তাঁর উপর নির্যাতন চালানোর জন্য। খলীফার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তাঁকে বন্দী করে এক শো, মতান্তরে পঞ্চাশটি চাবুক মারা হয়, প্রবল শীতের মধ্যে তাঁর মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালা হয় এবং একাধারে দুই দিন তাঁকে মসজিদে নববীর দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এমন কঠোর শাস্তি ভোগ করার পর তাঁর আপনজনেরা তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে যায় এবং তিনি মারা যান। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তার অবস্থা জানার জন্য মাজেশূনকে খুবায়বের বাড়ীতে পাঠান। লোকেরা তাঁর মুখমণ্ডলের উপর থেকে চাদর উল্টিয়ে দেয় এবং তিনি তাঁকে মৃত দেখতে পান। মাজেশূন বলেন, ফিরে এসে দেখি, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এত অস্থির হয়ে পড়েছেন যে একবার উঠেন তো আবার দাঁড়িয়ে যান। খুবায়বের মৃত্যুর কথা শোনানো হলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তারপর انا لله وانا اليه راجعون উচ্চারণ করতে করতে উঠে দাঁড়ান এবং ওয়ালীর পদ থেকে ইস্তেফা দেন। মূলতঃ এ ছিল একটা বাড়াবাড়ি রকমের জুলুম এবং স্পষ্টতঃই শরী'আত পরিপন্থী শাস্তি। ওয়ালী হিসেবে যা তিনি করতে বাধ্য হন। এ অপরাধমূলক কাজের জন্য তিনি ভীষণ অনুতপ্ত হন এবং তাঁর মধ্যে আল্লাহভীতি প্রবলভাবে শিকড় গেড়ে বসে।[৭৭]

খুবায়বের মৃত্যুকে তিনি নিজের বড় ধরনের অপরাধমূলক কাজ বলে সারা জীবন বিশ্বাস করতেন। এ জন্য পরবর্তীকালে তিনি যখন কোন ভালো কাজ করতেন এবং সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে বড় প্রতিদানের কথা বলতেন তখন তাঁর জবাব ছিল এ রকম :[৭৮]

---

৭৭. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-৩৪-৩৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া-৯/৮৭; খিলাফত ও মুলূকিয়াত-১৮৭
৭৮. 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার-৩১

وكيف بخبيب على الطريق.

"তা কিভাবে সম্ভব, যখন খুবায়ব পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে?"

২. খলীফা ওয়ালীদ তাঁর ভাই সুলায়মানকে বাদ দিয়ে তাঁর ছেলেকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করতে চাইলেন। অথচ তাঁদের পিতা খলীফা 'আবদুল মালিক পর্যায়ক্রমে তাঁর ছেলেদেরকে খলীফা মনোনীত করে জনগণের থেকে বাই'আত নিয়ে যান। ওয়ালীদের এই অন্যায় সিদ্ধান্তে খিলাফতের অধিকাংশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, রাজ পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও দেশের সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ কেউ ইচ্ছায় কেউ অনিচ্ছায় ও ভয়ে সায় দেয়। কিন্তু 'উমার বেঁকে বসলেন। তিনি এমন ব্যক্তিকে ত্যাগ করতে অস্বীকার করলেন যার প্রতি বাই'আত করা হয়েছে। তিনি কারো সমালোচনা, খলীফার ক্রোধ, শাস্তি অথবা মৃত্যুর ভয় না করে খলীফার উদ্দেশ্যে বললেন :

"في أعناقنا بيعة"

"আমাদের ঘাড়ে তো বাই'আতের বেড়ী রয়েছে।" এতেই তিনি খলীফার ক্রোধের পাত্রে পরিণত হন এবং তাঁর জীবনের আশঙ্কা দেখা দেয়। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে একটি কক্ষে ঢুকিয়ে কাঁদা-মাটি দিয়ে তার সকল দরজা-জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়, যাতে দম বন্ধ হয়ে মারা যান। রাজ পরিবারের কিছু ব্যক্তির সুপারিশে সেবার প্রাণে রক্ষা পান। তবে ওয়ালীদ তাঁকে মদীনার ওয়ালীর পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দূরে সরিয়ে দেন।[৭৯]

৩. হিজরী ৯৩ সনে ওয়ালীদ 'উমারকে হিজায ও মদীনার ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করেন। এর কারণ হলো, 'উমার ইরাকের ওয়ালী হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের ইরাকীদের উপর মাত্রা ছাড়া জুলুম-অত্যাচার ও নির্যাতন-নিষ্পেষণের কথা জানিয়ে খলীফা ওয়ালীদকে চিঠি লেখেন। একথা হাজ্জাজ জানতে পেয়ে খলীফাকে লেখেন : 'আমার এখানকার রক্ত প্রবাহিতকারী ও বিভেদ সৃষ্টিকারীগণ, যারা ইরাক থেকে পালিয়েছে তারা মক্কা ও মদীনায় আশ্রয় লাভ করেছে। এ একটা দুর্বলতা।' ওয়ালীদ মক্কা ও মদীনায় কাকে ওয়ালীর দায়িত্ব দেওয়া যায় সে ব্যাপারে হাজ্জাজের পরামর্শ চাইলেন। হাজ্জাজ খালিদ ইবন 'আবদিল্লাহ ও 'উছমান ইবন হায়্যানের নাম প্রস্তাব করে পাঠালেন। এ প্রস্তাব অনুসারে ওয়ালীদ 'উমারকে অপসারণ করে খালিদকে মক্কায় এবং 'উছমানকে মদীনায় নিয়োগ দান করেন। দায়িত্ব বুঝে দিয়ে 'উমার (রহ) মদীনা ত্যাগ করেন। মদীনা ত্যাগ করার সময় তিনি একথাগুলো বলেন :

إني أخاف أن أكون ممن نفته المدينة، يعني بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : تنفي خبثها.

"আমার ভয় হচ্ছে, মদীনা যাদেরকে বিতাড়িত করেছে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হই

৭৯. সুয়ূতী, তারীখ আল-খুলাফা-২৩০

কিনা। একথা দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন : মদীনা তার মন্দ ও অনিষ্টকে দূর করে দেবে।"

'উমারের এ অপসারণ হয় শা'বান মাসে। খালিদ মক্কার দায়িত্বভার গ্রহণ করে জোর করে ইরাকীদের মক্কা থেকে বের করে দেন। ইরাকীদের নিকট কোন ঘর-বাড়ী ভাড়া না দেওয়ার জন্য মক্কার বাড়ী ঘরের মালিকদের নির্দেশ দেন এবং কেউ এ নির্দেশ ভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তির হুমকি দেন। মদীনাতেও ঠিক একই কাজ করা হয়। অথচ 'উমারের সময় মক্কা-মদীনায় মানুষ নির্বিঘ্নে ও নিঃশঙ্কচিত্তে আশ্রয় নিত।

তিনি মদীনায় ওয়ালী হিসেবে সাত বছর অতিবাহিত করেন। এ সময় সেখানে তিনি সততা, নিষ্ঠা ও খোদাভীতির একটি দৃষ্টান্তে পরিণত হন। তাই প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) তাঁর সম্পর্কে বলেন :[৮০]

ما صليت وراء إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى.

"এই যুবক অর্থাৎ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের চেয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ নামায রাসূলুল্লাহর (সা) পরে আর কোন ইমামের পিছনে আমি আদায় করিনি।"

ইবনুল আছীর ও ইবনুল জাওযীর বর্ণনা মতে 'উমারের বিদায়ক্ষণে মদীনার জনগণের চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়েছিল, এমনকি সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (র) পর্যন্ত অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি।

মধ্যবর্তী সময়

মদীনা হতে দিমাশ্‌কে চলে আসার পর দীর্ঘ চার বছর (৯৩-৯৬ হি.) 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (র)-এর কিভাবে এবং কি কাজে অতিবাহিত হয় কোন ঐতিহাসিক তা উল্লেখ করেননি। আল্লামা ইবন কাছীর 'আল-বিদায়া' গ্রন্থে শুধু এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দিমাশ্‌কে তাঁর চাচাতো ভাইদের নিকট চলে আসেন। তবে বিভিন্ন ঘটনা হতে জানা যায় যে, খলীফা ওয়ালীদ ও সুলায়মান শাসনকার্য সংক্রান্ত বিষয়ে ও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী, ন্যায়সঙ্গত কথা বলতে কখনো কুণ্ঠিত হননি। একবার খলীফা ওয়ালীদ তাঁকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, যে ব্যক্তি খলীফাকে গালাগালি করে তাকে কি হত্যা করা যায়? তিনি চুপ থাকলেন। প্রশ্নটির তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, সে কি হত্যাও করেছে? ওয়ালীদ বললেন, না, শুধু গালি দিয়েছে। তিনি বললেন, তাকে শুধু অনুরূপ গালি দেওয়া যেতে পারে। একবার খলীফা সুলায়মান বিতর্কের এক পর্যায়ে তাঁকে বললেন, আপনি মিথ্যা বলেছেন। জবাবে 'উমার বললেন, আপনি বলছেন আমি মিথ্যা বলেছি, অথচ আমি যেদিন হতে কাপড় পরতে শুরু করেছি সেই দিন হতে কখনো মিথ্যা

৮০. ড: হাসান ইবরাহীম, তারীখ আল-ইসলাম-১/৩২১

কথা বলিনি। আপনি জেনে রাখুন, আপনার এই মজলিসের তুলনায় পৃথিবী অনেক বিশাল ও প্রশস্ত।

এই বলে তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে যান এবং মিসর যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। এ খবর পেয়ে খলীফা সুলায়মান বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং তাঁকে বললেন, আপনি মিসর যাওয়ার সংকল্প করে আমাকে যতটা কাতর করে ফেলেছেন, আমি জীবনে কখনো অতটা কাতর হইনি।[৮১] ইবনুল জাওযীর একটি বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, কেবল খলীফাগণই নন, উমাইয়্যা বংশের প্রায় সব লোকই সর্ব প্রকার সমস্যা ও জটিলতায় 'উমারের নিকট পরামর্শ চাইতেন ও প্রায়ই তদনুরূপ কাজ করা হতো। 'উমার এসব কাজ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সম্পন্ন করতেন।

খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের মৃত্যু ও 'উমারের খলীফা হিসেবে মনোনয়ন লাভ

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) স্বীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য ও সৎ স্বভাবের জন্য তাঁর খান্দানের সকল সদস্যের অত্যন্ত প্রীতিভাজন ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষতঃ খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের তাঁর উপর এত আস্থা ও নির্ভরতা ছিল যে, তিনি তাঁকে মন্ত্রী ও উপদেষ্টার মর্যাদা দান করেন। তিনি সকল ভালো কাজ 'উমারের পরামর্শ মতো করতেন। মূলতঃ তাঁর সকল জনকল্যাণ ও সংস্কারমূলক কাজ 'উমারের পরামর্শ ও প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হয়।[৮২] এমনকি হিজরী ৯৬ সনে সুলায়মান খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণকালে 'উমার তাঁর পক্ষে দিমাশ্‌কবাসীর বাই'আত গ্রহণ করেন।[৮৩] খলীফা 'আবদুল মালিক যখন সুলায়মানকে খিলাফতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছিলেন তখন 'উমারই নির্ভীকচিত্তে তার প্রতিবাদ করেন। তাই সবকিছু মিলিয়ে খলীফা সুলায়মানের ছিল তাঁর উপর দৃঢ় আস্থা ও নির্ভরতা। এ কারণে তাঁর পরে যাঁরা খলীফাপদের অধিকারী ও যোগ্য বিবেচিত হতে পারতেন তাঁদের মধ্যে 'উমারও ছিলেন অন্যতম। তাই সীল-মোহরকৃত সম্পূর্ণ অজ্ঞাতনামা পরবর্তী খলীফার অঙ্গীকার পত্রের উপর খলীফা সুলায়মান যখন সকলের বাই'আত গ্রহণ করেন তখন 'উমারের সন্দেহ হয় যে, এই অঙ্গীকার পত্রের মধ্যে তার নিজের নামটি নেই তো? অবশেষে তাঁর সেই সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়।

খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের বয়স্ক সন্তানদের মধ্যে ছিলেন কেবল আয়্যূব নামে এক পুত্র। অন্যরা সকলে ছিল ছোট। সুলায়মান পরবর্তী খলীফা হিসেবে তাঁকেই মনোনীত করেন। কিন্তু সুলায়মানের পূর্বেই তিনি মারা যান। অতঃপর তাঁর সন্তানদের অন্য কেউই খিলাফতের দায়িত্ব লাভের উপযুক্ত ছিল না। হিজরী ৯৯ সনের সফর মাসের প্রথম জুম'আর দিন খলীফা সুলায়মান 'দাবিক' নামক স্থানে ছিলেন। দাবিক হলো

---

৮১. আবদুর রহীম, 'উমার ইবনে 'আবদুল 'আযীয (র)-২১

৮২. তারীখ আল-খুলাফা-৩৬৬; ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-৪২

৮৩. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/২৯৩

হলবের নিকটবর্তী একটি সেনা ছাউনী, রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময় বানূ উমাইয়্যারা সেখানে অবস্থান করতো। এ সময় সুলায়মান তাঁর ভাই মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিকের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী কনস্টান্টিনোপল অভিযানে পাঠান। সংগে তাঁর খান্দানের বিপুল সংখ্যক সদস্যও ছিলেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। জীবন সম্পর্কে যখন হতাশ হয়ে পড়েন তখন পরবর্তী খলীফা মনোনীত করার ইরাদা করেন। কিন্তু কাকে করবেন? পুত্র সন্তানদের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক তো কেউ নেই। অগত্যা জীবিত সন্তানদের মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে খলীফা মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় প্রখ্যাত তাবি'ঈ রাজা' ইবন হায়ওয়া ও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। উল্লেখ্য যে, হযরত রাজা' ছিলেন খলীফা সুলায়মানের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও উপদেষ্টা। তাই তিনি রাজা'কে বলেন : আমার ছেলেটিকে খিলাফতের পোশাক 'আবা ও চাদর পরিয়ে আমার সামনে হাজির করুন। তাকে আনুষ্ঠানিক পোশাক পরিয়ে উপস্থিত করা হলো। দেখলেন, সে একেবারেই ছোট। যে পোশাক সে পরেছে তা বইতে পারছে না, মাটিতে টেনে চলছে। তিনি রাজা'কে আবার বললেন : তাঁর কাধে তরবারি ঝুলিয়ে আমার সামনে হাজির করুন। তাই করা হলো। দেখলেন, সে তা বহনের উযুক্ত নয়। তখন তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় নিম্নের চরণটি :

إن بني صبية صغار أفلح من كان له كبار.

"আমার সন্তানরা সকলে ছোট্ট শিশু। সেই ব্যক্তিই সফলকাম যার বড় সন্তান-সন্তুতি রয়েছে।"

পাশেই বসা 'উমার বলে উঠলেন :[৮৪]

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে।"[৮৫]

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, খলীফা সুলায়মানের পুত্র আয়্যুব জীবিত ছিল। তবে তখনো খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের মতো বয়স তাঁর হয়নি। এ প্রসঙ্গে রাজা' ইবন হায়ওয়া বলেছেন, দাবিকে সুলায়মান যখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী তখন একদিন আমি তাঁর নিকট গেলাম। দেখলাম, তিনি কি যেন লিখছেন। বললাম : আমীরুল মু'মিনীন! কি করছেন? জবাব দিলেন : আমি আমার পুত্র আয়্যুবকে খলীফা মনোনীত করার অঙ্গীকার পত্র লিখছি। আমি তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করে বললাম : আমীরুল মু'মিনীন! পরবর্তী খলীফা এমন একজন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে বানিয়ে যান যার কারণে আপনি কবরেও নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে থাকতে পারবেন। সুলায়মান বললেন : এ আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়, বিষয়টি আমি আরো একটু ভেবে দেখবো। এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট ইসতিখারা

---

৮৪. সূরা আল-আ'লা-১৪

৮৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩০; আবুল হাসান 'আলী আন-নাদবী, রিজালুল ফিক্র ওয়াদ-দা'ওয়াহ্-১/৪০

বা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাওফীক কামান করবো। এরপর তিনি দু'দিন গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তার পর পূর্বের লেখা অঙ্গীকার পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। তারপর রাজা'কে ডেকে জিজ্ঞেস করেন : আমার আরেক পুত্র দাউদের ব্যাপারে আপনার মত কি? রাজা' বললেন : সে তো বর্তমানে কনস্টান্টিনোপলে, জীবিত আছে কি মারা গেছে তা আমাদের জানা নেই। সুলায়মান বললেন : তাহলে এই খলীফা মনোনয়নের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি? রাজা' বললেন : প্রকৃত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক তো আপনি। আপনি কারো নাম বলুন, আমি ভেবে দেখবো। সুলায়মান বললেন :

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের ব্যাপারে আপনার ধারণা কি? অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, 'উমারের নামটি রাজা'ই উচ্চারণ করেন। যাই হোক, রাজা' বললেন, আমি মনে করি তিনি একজন জ্ঞানী ও ভালো মুসলমান। সুলায়মান বললেন, আল্লাহর কসম! সে এমনই। কিন্তু আমি যদি 'আবদুল মালিকের সন্তানদের একেবারে উপেক্ষা করে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে খলীফা মনোনীত করে যাই তাহলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। যদি তার পরে 'আবদুল মালিকের কোন ছেলের নাম প্রস্তাব না করে যাই তাহলে তারা তাঁকে খিলাফতের মসনদে আসীন হতেই দেবে না। এ কারণে আমি 'উমারের পরে খলীফা হিসেবে ইয়াযীদের নাম মনোনীত করে যাচ্ছি। তিনি আরো বলেন : لأعقدن عقدا لايكون للشيطان نصيب. 'আমি অবশ্যই এমন একটি অঙ্গীকার পত্র লিখে যাব যেখানে শয়তানের কোন অংশ থাকবে না।'[৮৬] এতে তারা শান্ত থাকবে এবং তাকে মেনে নেবে। রাজা'ও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেন। এরপর সুলায়মান নিজ হাতে এ অসীয়ত নামা লেখেন :[৮৭]

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبد الله سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز، إني وليته الخلافة من بعدى وجعلتها من بعده ليزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع الطامعون فيكم.

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। এই লেখা আল্লাহর বান্দাহ্ সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক, আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের জন্য। আমি আমার পরে তাঁকে খলীফা বানালাম এবং তার পরে খলীফা মনোনীত করলাম ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিককে। আপনারা তার কথা শুনুন, আনুগত্য করুন এবং আল্লাহকে ভয় করুন। মতবিরোধ সৃষ্টি করবেন না, তাহলে সুযোগ সন্ধানীরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে।' ইবন কুতায়বা সংকলিত এই অঙ্গীকার পত্রটি একটু দীর্ঘ ও ভিন্ন প্রকৃতির। তার শেষ প্যারাটি নিম্নরূপ :[৮৮]

---

৮৬. ইবন 'আবদিল হাকাম, সীরাতু 'উমার-২৯-৩০; রিজালুল ফিক্র ওয়াদ-দা'ওয়াহ্-১/৪০

৮৭. তাবাকাত-৫/৪০৭; তাবারী, তারীখ-৮/১২৯; আল-কামিল ফিত-তারীখ-৫/৩৯; 'আবদুল মুন'ইম আল-হাশিমী-১৮৩

৮৮. ইবন কুতায়বা, আল-ইমামা ওয়াস-সিয়াসা-২/৮০; আল-কালকাশান্দী, সুবহুল আ'শা-৯/৩৬০; আহমাদ যাকী সাফওয়াত, জামহারাতু রাসায়িল আল-'আরাব-২/২৬৫-২৬৭

وأن ولى عهدى فيكم وصاحب أمرى بعدى فـى جنـدى ورعيتـى وخـاصتى وعـامتى وكل من استخلفنى الله عليه واسترعانى النظـر فيـه الرجـل الصـالح عمـر بـن عبـد العزيز ابن عمى لـما بلوت من باطن أمره وظاهره، ورجوت الله بذلك، وأردت رضاه ورحمته إن شاء الله، ثم ليزيد بن عبد الملك من بعده، فانى مارأيت منه إلا خـيرا، ولا اطلعت له على مكروه، وصغار ولـدى وكبـارهم إلى عمـر، إذ رجـوت ألا يـألوهم رشدا وصلاحا، والله خليفتى عليهم وعلى جماعـة المؤمنـين والمسـلمين، وهـو أرحـم الراحمين، واقرأ عليكم السلام ورحمـة الله. ومـن أبـى عـهدى هـذا وخـالف أمـرى فالسيف،ورجوت أن لا يخالفه أحد، ومن خالفه فهو ضـالٌ مضـل يسـتعتب، فـان أعتب و إلا فالسيف، والله الـمستعان، ولاحول ولاقوة إلا بالله.

"আমার সেনাবাহিনী, প্রজা সাধারণ, বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাধারণ জনগণ এবং আল্লাহ যাদের খিলাফতের দায়িত্ব আমাকে দান করেছেন, তাদের সকলের জন্য সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি আমার চাচাতো ভাই 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে আমি আমার পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনীত করলাম। আমি তার জাহিরী ও বাতিনী, প্রকাশ্য ও গোপন উভয় অবস্থা পরীক্ষা করেছি। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছি, তাঁর রিজামন্দী ও রহমত কামনা করেছি। তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসেবে ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিককে মনোনীত করেছি। আমি 'উমারের মধ্যে কেবল ভালো ছাড়া খারাপ কিছু দেখিনি। আমার ছোট-বড় সকল সন্তানকে 'উমারের যিম্মাদারীতে রেখে গেলাম। তিনি তাদেরকে কেবল সত্য-সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। তাদের জন্য এবং সকল মু'মিন-মুসলমানদের জন্য কেবল আল্লাহ আমার প্রতিনিধি। তিনিই দয়াময়, করুণাময়, আপনাদের প্রতি আমার সালাম ও আল্লাহর রহমত। কেউ আমার এ অঙ্গীকার অস্বীকার ও বিরোধিতা করলে তরবারি দ্বারা তাকে সোজা করা হবে। আশা করি কেউ বিরোধিতা করবে না। আর কেউ করলে সে হবে পথভ্রষ্ট এবং মানুষকে বিপথে পরিচালনাকারী। তাকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি করে, তবে ভালো। অন্যথায় তরবারি দ্বারা সোজা করা হবে। আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাওয়া হয়। আল্লাহ ছাড়া নেই কোন শক্তি, নেই কোন ক্ষমতা।"

অঙ্গীকার পত্র লেখার পর তাতে সীল-মোহর করেন। তারপর খান্দানের সকলকে একত্রিত করেন। রাজা'কে নির্দেশ দেন, এই অঙ্গীকার পত্রটি নিয়ে তিনি খান্দানের সমবেত লোকদের নিকট যাবেন এবং তাদেরকে বলবেন, খলীফার এই সীল মোহরকৃত অঙ্গীকার পত্রে যাকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছেন তারা যেন তাঁর আনুগত্যের শপথ তথা বাই'আত করেন। রাজা' খলীফার নির্দেশ পালন করেন। সমবেত সকলে সমস্বরে سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম) বলে ইতিবাচক সায় দেন। তারপর তাঁদের আবেদনের প্রেক্ষিতে খলীফা সুলায়মানের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দান

করা হয়। তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করলে সুলায়মান রাজা'র হাতে থাকা অঙ্গীকার পত্রটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন : "এর মধ্যে আমি যাকে খলীফা বানিয়েছি তার প্রতি বাই'আত কর এবং তার আনুগত্য কর।" সুলায়মান একথা বলার পর দ্বিতীয়বার প্রত্যেকের নিকট থেকে পৃথক পৃথকভাবে বাই'আত গ্রহণ করা হয়।

'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের প্রবল ধারণা ছিল, সুলায়মান তাঁকেই খলীফা মনোনীত করেছেন। তিনি এই গুরুদায়িত্ব পালনে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। এ কারণে তিনি একাকী রাজা'র নিকট গিয়ে বলেন : আমার প্রতি সুলায়মানের যে পরিমাণ স্নেহ-মমতা আছে এবং আমাকে যে রকম অনুগ্রহ দেখিয়েছেন তাতে আমার ধারণা হয়, তিনি আমাকেই খলীফা মনোনীত করেছেন। যদি এমন হয় তাহলে আমাকে আগে ভাগেই বলে দিন যাতে আমি ঘোষণা দেওয়ার পূর্বেই অব্যাহতি নিয়ে নিতে পারি। কিন্তু রাজা' তা জানাতে অস্বীকার করেন। 'উমার ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে যান।[৮৯] হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকও ঠিক একই রকম আবেদন জানান রাজা'র নিকট। কিন্তু রাজা' তাকেও একই জবাব দেন।[৯০]

খলীফা মনোনয়নের পর্ব শেষ হওয়ার পরেই সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক ইনতিকাল করেন। রাজা' অত্যন্ত দায়িত্ব ও সতর্কতার সাথে সুলায়মানের মনোনয়ন পত্রের বিষয়বস্তু এবং তাঁর মৃত্যুর কথা গোপন রাখলেন। তিনি দ্বিতীয়বার দাবিকের জামে' মসজিদে শাহী খান্দানের সদস্যদের সমবেত করেন। তারপর সকলকে লক্ষ্য করে বলেন : আমীরুল মু'মিনীনের এই মনোনয়ন পত্রে যাঁর নাম আছে তাঁর প্রতি আপনারা দ্বিতীয়বার বাই'আত করুন। উপস্থিত সদস্যদের অনেকে বললেন : আমরা তো একবার বাই'আত করেছি, আবার কেন? এর কোন প্রয়োজন আছে কি? রাজা' বললেন : এটা আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ।

তারা এক এক করে সীল-মোহরকৃত অঙ্গীকার পত্রে উল্লেখিত অজ্ঞাত খলীফার প্রতি বাই'আত করলেন। এভাবে রাজা' তাঁদের বাই'আত নিশ্চিত করে খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের মৃত্যুর ঘোষণা দেন। তারপর সেই মনোনয়ন পত্রটি খুলে সকলের সামনে পাঠ করে শোনান। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নাম শুনেই সদ্য প্রয়াত খলীফা সুলায়মানের ছোট ভাই হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক বলে উঠলেন : আমরা কখনো তাঁর বাই'আত করবো না। রাজা' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন : চুপ করে বাই'আত করে নাও, নইলে ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে। তারপর রাজা' 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের হাত ধরে মিম্বরের উপর বসিয়ে দেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এই বিশাল দায়িত্বের বোঝা কাঁধে অর্পিত হওয়ায় তাঁর মুখ থেকে তখন উচ্চারিত হয় : إنا لله وإنا إليه راجعون (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন)। আর এদিকে হিশাম রাজা'র এক ধমক খেয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বঞ্চিত হওয়ার

---

৮৯. আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৪০
৯০. 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-২০

দুঃখে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন পাঠ করতে করতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দিকে এগিয়ে যান এবং তাঁর হাতে বাই'আত করেন। তারপর সুলায়মানের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। নতুন খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর জানাযার নামায পড়ান।[৯১]

আল-মাদায়িনী বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয হিজরী ৯৯ সনের সফর মাসের ১১ তারিখ (দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর) শুক্রবার খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[৯২]

ইয়া'কূব ইবন দাউদ আছ-ছাকাফী বলেন : 'উমারের খিলাফতের মনোনয়ন পত্র যখন পাঠ করা হয়েছিল তখন তিনি মজলিসের এক কোণে বসা ছিলেন। ছাকীফ গোত্রের সালিম নামক এক ব্যক্তি– যিনি 'উমারের এক মামা– তাঁকে কাঁধ ধরে দাঁড় করিয়ে দেন। 'উমার তখন বলেন : আল্লাহর কসম! আমি এ চাইনি। এর দ্বারা দুনিয়া আমার কাছ থেকে কিছুই পাবে না।[৯৩]

খিলাফতের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয পূর্ণ সচেতন ছিলেন। যদি খলীফা হিসেবে তাঁর নাম মনোনয়নের সময় তিনি কোনভাবে জানতে পারতেন তাহলে তখনই অস্বীকৃতি ও অপারগতা প্রকাশ করতে পারতেন। যেমন, বর্ণিত হয়েছে যে, 'উমার রাজা' ইবন হায়ওয়াকে কসম দিয়ে বলেছিলেন, খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক যদি আমার নাম উচ্চারণ করেন তাহলে আপনি তাকে বিরত রাখবেন। আর আমার নাম যদি উচ্চারিত না হয়, আপনি মোটেই উচ্চারণ করবেন না।[৯৪] যাই হোক, এখন তো এ বোঝা ঘাড়ে চেপে বসেছে। তবুও তিনি এর থেকে অব্যাহতি লাভের শেষ চেষ্টা করে দেখতে চান। তিনি জনগণকে মসজিদে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজে মসজিদে প্রবেশ করে মিম্বরের উপর বসলেন। তারপর সমবেত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে নিম্নের এই সংক্ষিপ্ত ভাষণটি দান করেন :[৯৫]

أيها الناس! إنى قد ابتليتُ بهذا الأمر عن غير رأى كان منى فيه، ولا طلبة له، ولا مشورة من المسلمين، وإنى قد خلعت مافى أعناقكم من بيعتى، فاختاروا لأنفسكم.

"ওহে জনমণ্ডলী! আমার ইচ্ছা, মতামত এবং সাধারণ মুসলমানদের সাথে কোন রকম পরামর্শ ছাড়াই আমাকে খিলাফতের এই দায়িত্বের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। এ কারণে

৯১. আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৪১; 'আসরুত তাবি'ঈন-১৮৩

৯২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩২

৯৩. প্রাগুক্ত-৪/৪৩৩

৯৪. ইবন 'আবদিল হাকাম, সীরাতু 'উমার-৩০

৯৫. তাবাকাত-৫/৩৩৮; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২০৩

আমার বাই'আতের যে বেড়ী আপনাদের গলায় পরানো হয়েছে তা আমি নিজেই খুলে নিলাম। এখন আপনারা যাকে খুশী খলীফা নির্বাচিত করুন।"

আবূ বিশর আল-খুরাসানী বলেন : খলীফা হিসেবে 'উমারের নাম ঘোষিত হওয়ার পর তিনি যে ভাষণ দেন তাতে একথাও বলেন : "ওহে জনমণ্ডলী! আল্লাহর কসম! আমি প্রকাশ্যে বা গোপনে কখনো আল্লাহর নিকট এ দায়িত্ব কামনা করিনি। যে জিনিস আমি সব সময় অপছন্দ করেছি, এখন সেই দায়িত্ব আমার কাঁধে চেপে বসেছে।" জনতার মধ্য থেকে সা'ঈদ ইবন 'আবদিল মালিক বললেন : আপনার অপছন্দের কথা প্রকাশের ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়ো করছেন। আপনি কি চান মতবিরোধ সৃষ্টি হোক এবং মানুষ পরস্পর খুনোখুনি করুক? অন্য এক ব্যক্তি বললেন : সুবহানাল্লাহ! আবূ বকর, 'উমার, 'উছমান ও 'আলী (রা) এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের কেউ তো এমন কথা বলেননি, অথচ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এখন তাই বলছেন![৯৬]

তাঁর ভাষণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে জনতা সমস্বরে চিৎকার করে বলতে থাকে, আমরা আপনাকে খলীফা নির্বাচন করেছি এবং আপনার পরিচালিত খিলাফতেই আমরা রাজি। আল্লাহর নাম নিয়ে আপনি কাজ শুরু করুন।

যখন তাঁর বিশ্বাস হলো, তাঁর খলীফা হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই তখন তিনি সমবেত জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে নিম্নের ভাষণটি দান করেন :[৯৭]

أيها الناس! أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خَلَف من كل شئ، وليس من تقوى الله عزوجل خَلَف،واعملوا لآخرتكم، فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه وأصلحوا سرائركم، يُصلح اللهُ الكريم علانيتكم، وأكثروا ذكَر الموت وأحسِنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم،فانه هادم اللذات،وإن من لايذكر من آبائه فيما بينه وبين آدم عليه السلام أبًا حيًّا لمغرق في الموت، وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها عزوجل،ولافي نبيها صلى الله عليه وسلم، ولافي كتابها، وإنما اختلفوا في الدنيا والدرهم، وإني والله لاأعْطي أحدًا باطلا، ولاأمنع أحدا حقا، إني لست بخازن، ولكني أضع حيث أمرت. أيها الناس! إنه قد كان قبلي ولاة تجترُّون مؤدتهم، بأن تدفعوا بذلك ظلمهم عنكم، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى اللهَ فلا طاعة له، أطيعوني ماأطعت الله فيكم،

---

৯৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৩

৯৭. তাবাকাত-৫/৩৩৮; সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৪-১১৫; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২০২-২০৩

فـاذا عصيـت الله فـلا طاعـة لى عليكـم. أقـول قـولى هـذا، وأسـتغفر الله العظيم لى ولكم.

"ওহে জনমণ্ডলী! আমি আপনাদের আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। প্রতিটি জিনিসের শেষ কথা হলো আল্লাহ-ভীতি। আল্লাহ ভীতির কোন শেষ নেই। আপনারা প্রত্যেকেই আখিরাতের জন্য কাজ করুন। যে ব্যক্তি আখিরাতের জন্য কাজ করে আল্লাহ তার দুনিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আপনারা নিজেদের ভিতরকে সংশোধন করুন, আল্লাহ আপনাদের বাহিরকে সংশোধন করবেন। বেশী করে মৃত্যুকে স্মরণ করুন এবং তার আসার পূর্বেই ভালো রকম প্রস্তুতি নিন। কারণ, মৃত্যু সকল স্বাদ-আস্বাদনকে ধ্বংস করে দেয়। যে ব্যক্তি তার ও আদমের (আ) মাঝখানের তার সকল পিতৃপুরুষকে জীবিত পিতার ন্যায় স্মরণ না করে সে মূলত মৃত্যুর গভীরে ডুবে আছে। এই উম্মাত না তার রবের ব্যাপারে, না নবীর (সা) এবং না কিতাবের ব্যাপারে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। বরং তারা দীনার ও দিরহামের ব্যাপারে বিভক্ত হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি কাউকে অন্যায়ভাবে কোন কিছু দিব না, তেমনি ন্যায়ভাবে কাউকে কিছু দান করা থেকে বিরত থাকবো না। আমি পুঞ্জিভূতকারী নই। আমাকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেভাবে যেখানে যা কিছু রাখার, রাখবো।

ওহে জনমণ্ডলী! আমার পূর্বে আপনারা এমন অনেক শাসক পেয়েছেন যাদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য নানাভাবে তাদের প্রীতি ও ভালোবাসা লাভের চেষ্টা করতেন। জেনে রাখুন, স্রষ্টার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না। যে আল্লাহর আনুগত্য করে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর যে আল্লাহর অবাধ্যতা করে তার আনুগত্য করা যাবে না। আপনাদের ব্যাপারে যতক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্য করবো ততক্ষণ আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। যখন আমি আল্লাহর নাফরমানি করবো তখন আপনাদের জন্য আমার আনুগত্য জরুরী নয়। আমার কথা এতটুকুই। মহান আল্লাহর নিকট আমার ও আপনাদের মাগফিরাত কামনা করছি।"

কোন কোন বর্ণনায় তাঁর সেই ভাষণটি নিম্নরূপ এসেছে: তিনি মিম্বরের উপর উঠে সর্বপ্রথম আল্লাহর হামদ ও ছানা এবং নবীর (সা) প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করেন। তারপর বলেন:[৯৮]

أما بعد، أيها الناس، إنه ليس بعد نبيكم صلى الله عليـه وسـلم نبـى، وليـس بعـد الكتاب الذى أنزل عليه كتاب، فما أحلَّ الله على لسـان نبيـه فـهو حـلال إلى يـوم القيامة، وما حرَّم الله على لسان نبيـه فـهو حـرام إلى يـوم القيامـة، ألا إنـى لسـت بقاض، ولكني منفذٌ لله، ولست بمبتدع ولكنى متَّبعٌ، ألا إنـه ليـس لأحـد أن يطـاع

৯৮. আল-মাস'উদী, মুরূজ আয-যাহাব-২/১৬৮; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২০৪, ২০৫

Contents

في معصية الله عزوجل، ألا انى لست بخيركم، وإنما أنا رجل منكـم، غـير أن الله جعلنى أثقلكم حملاً، يا أيها النــاس! إن أفضـل العبـادة أداء الفرائـض، واجتنـاب المحارم. أقول قولى هذا واستغفر الله العظيم لى ولكم.

"আম্মা বাদ। ওহে জনমণ্ডলী! আপনাদের নবীর (সা) পরে কোন নবী নেই এবং তাঁর উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে তার পরে আর কোন কিতাব নেই। আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমে যা কিছু হালাল করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হালাল, আর তাঁর নবীর মাধ্যমে যা কিছু হারাম করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। আমি নিজে কোন সিদ্ধান্ত দানকারী নই, বরং আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নকারী। আমি নতুন কিছু উদ্ভাবনকারী নই, বরং একজন অনুসরণকারী মাত্র। শুনে রাখুন, আল্লাহর নাফরমানির ক্ষেত্রে কারো আনুগত্য লাভের অধিকার নেই। শুনে রাখুন! আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। আমি আপনাদের একজন সাধারণ মানুষ। তবে আল্লাহ আমার উপর সবচেয়ে ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। ওহে জনমণ্ডলী! ফরযসমূহ আদায় করা এবং হারামসমূহ পরহেয করা সর্বোত্তম ইবাদাত এবং আমার কথা এতটুকুই। আমার নিজের ও আপনাদের সকলের জন্য মহান আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করি।"

এখানে দিমাশ্‌কে এ সবকিছু ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু 'আবদুল 'আযীয ইবন আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক দূরে কোথাও থাকায় কিছুই জানতে পারেননি। এ কারণে সুলায়মানের মৃত্যুর খবর শুনে তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিকট থেকে নিজের জন্য বাই'আত গ্রহণ করেন এবং দিমাশ্‌কের দিকে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সুলায়মানের অসীয়াত এবং 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের বাই'আতের সকল ঘটনা অবগত হলেন। এরপর তিনি সোজা তাঁর নিকট উপস্থিত হন। নিজের জন্য তাঁর বাই'আত গ্রহণের কথা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। এ কারণে তিনি 'আবদুল 'আযীযকে বললেন, আমি জেনেছি, আপনি নিজের জন্য বাই'আত গ্রহণ করে দিমাশ্‌কে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। 'আবদুল 'আযীয বললেন : সুলায়মান যে আপনাকে খলীফা মনোনীত করে গেছেন সে কথা আমার জানা ছিল না। এ জন্য আমি শঙ্কিত হয়েছিলাম, জনগণ কোষাগারে লুটপাট না চালায়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন : জনগণ যদি আপনার হাতে বাই'আত করতো এবং আপনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন তাহলে আমি আপনার সাথে বিবাদে লিপ্ত হতাম না। আমি আমার ঘরে চুপচাপ বসে থাকতাম। 'আবদুল 'আযীয বললেন, আপনি থাকতে অন্য কেউ খলীফা হওয়াকে আমি পছন্দই করতাম না। আমি আপনার হাতে বাই'আত করে ফেলেছি।[৯৯]

---

৯৯. তাবারী, তারীখ-৪/৬১; আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৪১; তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩১০

খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের অনুসারী হয়ে গেলেন

খিলাফতের মসনদে আসীন হয়েই তিনি সম্পূর্ণ বদলে যান। শাহী খান্দানের সৌখিন ও বিলাসী 'উমার এখন দুনিয়া বিরাগী হযরত আবূ যার আলগিফারী ও হযরত আবূ হুরায়রার (রা) রূপ ধারণ করেন। সুলায়মানের কাফন-দাফন শেষ হওয়ার পর বাহন পশুর দৌড়-ঝাপ ও পদধ্বনি শোনা গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি? বলা হলো : আমীরুল মু'মিনীন! এগুলো খিলাফতের বাহন। আপনি চড়বেন তাই আনা হয়েছে। বললেন : এগুলো আমার সামনে থেকে সরাও। আমার খচ্চরটি আন। তিনি নিজের খচ্চরের পিঠে উঠলেন। পুলিশ বাহিনী প্রধান এক দল সশস্ত্র পুলিশসহ সামনে চলতে লাগলো। বললেন : সরে যাও, আমার কোন দেহরক্ষীর প্রয়োজন নেই। আমি সাধারণ মুসলমানদের একজন। তিনি চললেন এবং তাঁর সাথে সাথে আরো বহু লোক চললো।[১০০]

সীরাতে ইবন 'আবদিল হাকামে এসেছে, যখন তাঁর সামনে রাষ্ট্রীয় বাহন-পশু উপস্থাপন করা হলো তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, এগুলো কি? লোকেরা জবাব দিল, এগুলোর পিঠে এখন পর্যন্ত কেউ আরোহী হয়নি। যখন কেউ নতুন খলীফা হন তখন তিনি সর্ব প্রথম এ জাতীয় বাহনের পিঠে আরোহণ করেন। কিন্তু নতুন খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর নিজের খচ্চরটি আনতে বলেন। সেটি আনা হলে তিনি মন্তব্য করেন, এই ধূসর বর্ণের মাদী খচ্চরটি আমার জন্য যথেষ্ট। তারপর তিনি ব্যক্তিগত চাকর মুযাহিমকে বলেন, এই পশুগুলো শামের বিভিন্ন বাজারে পাঠিয়ে বিক্রী করে দাও এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ বায়তুল মালে জমা করে দাও।[১০১]

এভাবে তাঁর জন্য সুদৃশ্য তাঁবু নির্মাণ করা হয়। তিনি এই তাঁবু সম্পর্কেও প্রশ্ন রাখেন। জানতে পারেন, এ জাতীয় তাঁবু নতুন খলীফার জন্য নির্মাণ করা হয়, যেখানে তিনিই সর্ব প্রথম প্রবেশ করেন। তিনি মুযাহিমকে তাঁবুটি বায়তুল মালে জমা দানের নির্দেশ দেন। তারপর তিনি নিজের খচ্চরটির পিঠে সোয়ার হয়ে সেই সব মহামূল্যবান জাঁকজমকপূর্ণ গালিচা ও বিছানাপত্র যা কেবল একজন নতুন খলীফার জন্য বিছানো হয়, দলিয়ে-মাড়িয়ে চাটাই পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং সেখানে বসে সেই সব দামী গালিচা ও বিছানাপত্র বায়তুল মালে জমা দানের জন্য মুযাহিমকে নির্দেশ দেন।[১০২]

বানূ উমাইয়্যা খলীফাদের নিয়ম ছিল, যখন কোন খলীফার মৃত্যু হতো তখন তাঁর ব্যবহৃত পোশাক, সুগন্ধিদ্রব্য ইত্যাদি তাঁর সন্তানরা লাভ করতো, আর অব্যবহৃত জিনিসপত্রের অধিকারী হতেন নতুন খলীফা। এই নিয়ম অনুযায়ী মৃত সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের সন্তানরা এসব জিনিস ভাগ করতে চান। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাদেরকে বলেন : এগুলো যেমন আমার নয়, তেমনি না সুলায়মানের, আর না

---

১০০. তাবাকাত-৫/৪৪৭-৪৪৯; আহমাদ মা'মূর আল-'উসাইরী, আ'জামু 'উজামা' আল-মুসলিমীন-১৪৩
১০১. তারীখ আল-খুলাফা'-১৫৩
১০২. 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার-২২

তোমাদের। অতঃপর তিনি সেই পরিত্যক্ত জিনিসগুলো বায়তুল মালে জমা দানের নির্দেশ দেন।[১০৩]

পূর্ববর্তী খলীফা সুলায়মানের পরিবার-পরিজন তখনো খলীফার রাষ্ট্রীয় ভবনে অবস্থান করছিলেন, তাই তিনি নিজের তাঁবুতে গেলেন এবং বললেন : আমার তাঁবু আমার জন্য যথেষ্ট। তখন তাঁর চেহারা ভীষণ মলিন ও বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। তাই দাসী জিজ্ঞেস করলো, মনে হচ্ছে আপনি বেশ চিন্তিত। বললেন : এর চেয়ে বেশী দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা আর কি থাকতে পারে যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত উম্মাতে মুহাম্মাদীর সকল সদস্যের অধিকার আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে এবং তাদের কোন রকম দাবী ছাড়াই তা পূরণ করা আমার জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১০৪]

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। সালিম আস-সুদী ছিলেন একজন বিখ্যাত তাবি'ঈ ও সজ্জন ব্যক্তি। 'উমার খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পর একদিন দেখা করতে আসেন। 'উমার তাঁকে বলেন : আমার খলীফা হওয়াতে আপনি খুশী না অখুশী? সালিম বলেন : মানুষের জন্য খুশী হয়েছি, কিন্তু আপনার জন্য হয়েছি অখুশী। 'উমার তাঁকে বললেন : আমার ভয় হচ্ছে, আমি আমার নিজেকে ধ্বংস করে না ফেলি। সালিম বললেন : আপনি যদি ভয়ই পেয়ে থাকেন তাহলে আপনার অবস্থাতো চমৎকার। আমার ভয় হচ্ছিল আপনি ভয় পাবেন না। 'উমার বললেন : আমাকে কিছু উপদেশ দিন। সালিম বললেন : আমাদের পিতা আদমকে একটি মাত্র ভুলের কারণে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।[১০৫]

আল-'উতবী বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যখন খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের কাফন-দাফন শেষ করে ঘরে ফিরছিলেন তখন তাঁর পিছনে পিছনে 'উমাইয়্যা খান্দানের লোকেরাও চলতে থাকে। তিনি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করলেন। দ্বাররক্ষী তাঁকে বললো : উমাইয়্যা খান্দানের লোকেরা দরজায় অপেক্ষমান। তিনি বললেন : তারা কি চায়? বললো : নতুন খলীফা হলে তাঁর সাথে সাক্ষাতের এ রেওয়াজ পূর্ব থেকে চলে আসছে। 'উমারের ছেলে আবদুল মালিক, যার বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বছর, বললো : আপনার পক্ষ থেকে আমাকে তাদের সাথে কথা বলার অনুমতি দিন। বললেন : তুমি কি বলবে? সে বললো : আমি বলবো, আমার পিতা আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন :

إِنِّىْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

"আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমি ভয় করি মহাদিনের শাস্তির।"[১০৬]

---

১০৩. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-৩৩; ইবন 'আবদিল হাকাম-২২

১০৪. মু'ঈন উদ্দীন আহমাদ-নাদবী, তাবি'ঈন-৩২৪

১০৫. মুরূজ আয-যাহাব-২/১৬৭-১৬৮

১০৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৮

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে প্রশাসনিক বিষয়াদির প্রতি মনোযোগী হন। একজন সেক্রেটারীকে ডেকে একটি ফরমান লিখে খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান। কনস্টান্টিনোপলে যে বাহিনীটি ছিল তাদের সরবরাহ যথেষ্ট না থাকায় তারা খাদ্যাভাবে পড়ে। তিনি দ্রুত তাদের নিকট খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিস পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং একই সাথে সেই বাহিনীকে প্রত্যাবর্তনের আদেশও দেন। মৃত্যুর পূর্বে সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দ্রুতগামী ঘোড়া সংগ্রহ করে দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি এ প্রতিযোগিতার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। স্বভাবগতভাবে 'উমার যদিও এ জাতীয় কাজ পছন্দ করতেন না, তবুও লোকেরা যখন বললো, দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ কষ্ট করে ঘোড়া নিয়ে এসেছে, তাই এই দৌড়-প্রতিযোগিতার অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দেন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কারও বণ্টন করেন। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মকর্তা ও কাজী নিয়োগ করেন।[১০৭]

খিলাফতে রাশেদার পুনরুজ্জীবন

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতার বিভিন্ন পর্যায় ও পর্ব শেষ করে তিনি খিলাফতের বিভিন্ন বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলেন। খিলাফতের ব্যাপারে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অতীতের উমাইয়্যা খলীফাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাঁর পরিকল্পনা ছিল খিলাফতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিচালন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা। রাষ্ট্রের বাহ্যিক উন্নতি, যেমন নতুন নতুন দেশ জয়, খাজনা ও করের মাধ্যমে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি, সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ ইত্যাদি তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল না। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল উমাইয়্যা সাম্রাজ্যকে খিলাফতে রাশেদায় পরিবর্তন করা। কিন্তু এ কাজ এত গুরুত্বপূর্ণ, দুরূহ ও মারাত্মক ছিল যে, তাতে হাত দেওয়ার সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখী হওয়া ছিল অপরিহার্য। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সম্ভাব্য সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে অত্যন্ত সাহসের সাথে বেপরোয়াভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড শুরু করে দেন।

জোর-জবরদস্তীমূলক দখলকৃত অর্থ-সম্পদ ফেরত দান

এ পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কাজটি ছিল বছরের পর বছর ধরে উমাইয়্যা শাহী খান্দানের লোকেরা জোর-জবরদস্তীমূলকভাবে জনগণের যে সকল ভূ-সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল তা তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দান। এ কাজে গোটা খান্দানের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) সর্বপ্রথম এই মহৎ কাজটি সম্পাদনে উদ্যোগী হন। আর এ কাজের সূচনা করেন নিজের পরিবার ও খান্দান থেকে।

---

১০৭. 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার-২৪

বানূ উমাইয়্যা খলীফাগণ সাধারণ মানুষের অর্থ-সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তি যা অন্যায়ভাবে দখল করেছিল তা ফেরত দেওয়া ইসলামী খিলাফতের একজন মহান মুজাদ্দিদের প্রথম দায়িত্ব ছিল। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দ্বারা সেই কাজটি সম্পাদন করেন। তিনি সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের কাফন-দাফন ও খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের প্রাথমিক পর্যায় ও আনুষ্ঠানিকতাগুলো শেষ করে ঘরে ফিরে একটু বিশ্রাম নিতে চান। তখন তাঁর চৌদ্দ বছর বয়সী কিশোর পুত্র আবদুল মালিক এসে বলেন, "আপনি জোর-জবরদস্তীমূলকভাবে দখল করা সম্পদ ফেরত দানের পূর্বে বিশ্রাম নিতে চাচ্ছেন? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন, আমি সুলায়মানের কাফন-দাফনের জন্য সারা রাত ব্যস্ত সময় কাটিয়েছি। তাই একটু বিশ্রাম নেওয়ার পর যুহর নামাযের পরে এ কাজে হাত দিব। কিন্তু আবদুল মালিক বললেন, যুহর নামায পর্যন্ত আপনার বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা কে দিবে? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের উপর তাঁর এই মন্তব্যের এত প্রভাব পড়ে যে, তাঁকে তিনি কাছে ডেকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন এবং কপালে চুমু দিয়ে বলেন! "সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমাকে এমন সন্তান দান করেছেন যে আমাকে ধর্মীয় কাজে সাহায্য করে।"[১০৮] বিশ্রামের কথা তিনি ভুলে গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে ঘোষণা করলেন যে কারো কোন অন্যায়ভাবে কোন সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ থাকলে সে যেন উপস্থাপন করে।

ভিন্ন একটি বর্ণনায় এসেছে যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন মায়মূন ইবন মিহরান, মাকহূল ও আবূ কিলাবার সাথে। এ তিনজন তখন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ তাবি'ঈ। মাকহূল ক্ষীণকণ্ঠে দুর্বল ভাষায় তাঁর যে মতামত প্রকাশ করেন তা 'উমারের মনোপূত না হওয়ায় তিনি মায়মূন ইবন মিহরানের দিকে তাকান। মায়মূন বললেন, আপনার পুত্র 'আবদুল মালিককেও ডাকুন। তাঁর মতামতও আমাদের চেয়ে কোন অংশে গুরুত্বহীন নয়। আবদুল মালিককে ডাকা হলো। 'উমার বললেন, মানুষ তাদের ছিনিয়ে নেওয়া ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী জানাচ্ছে– এ ব্যাপারে তোমার মত কি? 'আবদুল মালিক বললেন, আপনি এক্ষুণি তা ফিরিয়ে দিন। তা না হলে, যারা জোর-জবরদস্তীমূলক এসব সম্পদ দখল করে নিয়েছিল, আপনিও তাদের কাজের অংশীদার হবেন।[১০৯]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, 'আবদুল মালিক ইবন 'উমার তাঁর পিতাকে বলেন : আব্বা! আপনি এখনো কেন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করছেন না? আল্লাহর কসম! সত্য প্রতিষ্ঠায় যদি আমাকে-আপনাকে ডেগের টগবগে পানিতে ফেলে দেওয়া হয় তাতেও আমি কোন পরোয়া করবো না। 'উমার তাঁকে বলেন : ছেলে! তাড়াহুড়ো করো না। আল্লাহ কুরআনে মদের দু'বার নিন্দার পর তৃতীয়বার হারাম ঘোষণা করেন। আমি আশঙ্কা করছি, যদি এক সাথে বহু কিছু চাপিয়ে দিই তাহলে তারা এক সাথে প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আর তাতে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।[১১০]

---

১০৮. 'আবদুস সাফওয়া-২/১১৫

১০৯. সুওয়ারুম মিন হায়াত তাবি'ঈন-৮১-৮২

১১০. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৮

Contents

তিনি সর্বপ্রথম স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত 'আবদিল মালিককে বলেন :

إنْ أردتِ صحبتي فردِّي مامعكِ من مال وحلي وجوهر إلى بيت مال المسلمين فإنه لهم. فإني لا أجتمع أنا وأنت وهو في بيت واحد.

"যদি তুমি আমার সঙ্গ চাও তাহলে তোমার যাবতীয় অর্থ-সম্পদ, অলঙ্কারাদি ও মূল্যবান রত্নরাজি মুসলমানদের বায়তুল মালে জমা দাও। কারণ এসব কিছু তাদের। আমি, তুমি ও এ সকল সম্পদ একই গৃহে থাকতে পারে না।"

স্বামীর একান্ত অনুগত স্ত্রী বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁর সকল জিনিস যা তিনি পিতৃকূলের দিক থেকে লাভ করেছিলেন, বায়তুল মালে জমা দেন।[১১১] এমনকি তাঁর পিতা খলীফা 'আবদুল মালিক তাঁকে একটি অতি মূল্যবান রত্ন উপহার দিয়েছিলেন। 'উমার তাঁকে বলেন, এটিও বায়তুল মালে জমা দাও, নয়তো আমাকে ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হও। অগত্যা সেটিও তিনি জমা দেন। 'উমারের ইনতিকালের পর ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক খলীফা হয়ে বোনকে সেই রত্নটি ফেরত দিতে চান, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন।[১১২]

তিনি নিজের ও স্ত্রীর সকল দাসীকে ডেকে বলেন :

إنه قد نزل أمر قد شغلني عنكن، فمن أحب أن أعتقه أعتقته، ومن أراد أن أمسكه أمسكته ولم يكن مني أليها شئ، فبكين يأسًا منه.

'আমার উপর একটি মহাদায়িত্ব চেপে বসেছে যা তোমাদের প্রতি আমার কর্তব্য পালনে আমাকে বিরত রেখেছে। সুতরাং তোমাদের কেউ মুক্তি চাইলে আমি মুক্তি দিচ্ছি, আর কেউ আমার অধিকারে থাকতে চাইলে, তাকে রেখে দিচ্ছি। তবে আমার নিকট থেকে তোমরা কিছুই পাবে না। তখন তারা হতাশ হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।[১১৩]

অতঃপর শাহী খান্দানের সদস্যদের সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন :

'মারওয়ানের বংশধরগণ! সম্মান, মর্যাদা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিরাট একটি অংশ আপনারা লাভ করেছেন। আমার ধারণা, মুসলিম উম্মাহ্‌র মোট সম্পদের অর্ধেক অথবা দুই তৃতীয়াংশ রয়েছে আপনাদের অধিকারে।' উপস্থিত লোকেরা খলীফার এই ইঙ্গিত সহজেই বুঝে যায়। তারা বলে ওঠে : যতক্ষণ আমাদের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ আমরা এটা হতে দেব না। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা না আমাদের বাপ-দাদাদেরকে কাফির বানাতে পারি, আর না পারি আমাদের সন্তানদেরকে কপর্দকশূন্য হতদরিদ্র বানাতে।' উল্লেখ্য যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর বংশের উর্ধ্বতন পুরুষদের অনেক কর্মকাণ্ডকে হারাম বলে বিশ্বাস করতেন। তাই তারা এমন

---

১১১. আল-কাসিম ফিত তারীখ-৫/৪১

১১২. তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৩

১১৩. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৮

কথা বলে। যাই হোক, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাদের সাফ বলে দিলেন : আল্লাহর কসম! যদি আপনারা এই সত্য ও সৎ কর্মে আমাকে সাহায্য না করেন তাহলে আমি আপনাদেরকে হেয় ও লাঞ্ছিত করে ছাড়বো। আপনারা এখন যেতে পারেন।[১১৪]

তিনি আরেকদিন মারওয়ান বংশের লোকদের ডেকে বললেন : তোমাদের হাতে মানুষের যে সকল অধিকার আছে তা ফিরিয়ে দাও। আমি যা পছন্দ করিনে তা করতে আমাকে বাধ্য করো না। ফলে এমন হতে পারে যে, তোমরা যা পছন্দ করো না তাই আমি করতে তোমাদেরকে বাধ্য করছি। কেউ তাঁর একথার কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন : তোমরা আমার কথার জবাব দাও। তখন একজন বললো : আল্লাহর কসম! আমাদের বাপ-দাদার সূত্রে আমরা যে সম্পদের মালিক হয়েছি তা আমরা ছেড়ে দেব না। আর তা দিলে আমরা ফকীর ও দুর্বল হয়ে পড়বো। তাছাড়া আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে কাফির বলতে পারি না। 'উমার বললেন : আমি যার অধিকার ফিরিয়ে দিতে চাই সে ব্যাপারে যদি তোমরা সহযোগিতা না কর তাহলে খুব শিগ্গির আমি তোমাদের ঔদ্ধত্য ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেব। কিন্তু আমি বিশৃঙ্খলার ভয় করি। আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, ইন্‌শাআল্লাহ প্রত্যেককে আমি তার অধিকার অবশ্যই ফিরিয়ে দেব।[১১৫]

অতঃপর তিনি সাধারণ মুসলমানদের মসজিদে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণের কিছু অংশ নিম্নরূপ :

فإن هؤلاء القوم كانوا أعطَوْنا عطايا، والله ما كان لهم أن يعطوناها، وما كان لنا أن نقبلها، وإن ذلك قد صار إليّ، ليس عليّ فيه دون الله محاسب، ألاو إني قد رددتها، وبدأت بنفسي وأهل بيتي.

"এই লোকেরা (বানূ উমাইয়্যা) আমাদেরকে অনেক অর্থ-সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তি দান করেছেন। আল্লাহর কসম! তাদের না এসব কিছু দেওয়ার অধিকার ছিল, আর না ছিল আমাদের নেওয়ার। এখন তা আমার হাতে এসেছে এবং সে ব্যাপারে কেবল আল্লাহ ছাড়া আমার নিকট থেকে হিসাব নেওয়ার আর কেউ নেই। এখন আমি সকল ভূ-সম্পত্তি তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দিচ্ছি। আর সে কাজ আমি আমার নিজের থেকে ও আমার খান্দানের থেকে শুরু করেছি।" উল্লেখ্য যে, বানু উমাইয়্যারা বছরের পর বছর ধরে জোর-জবরদস্তী করে মানুষের যেসব অর্থ-সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তি দখল করেছিল তা উত্তরাধিকার সূত্রে এই খান্দানের হাতেই ছিল। তিনি উপরোক্ত ভাষণে সেই সম্পদের কথাই বলেছেন।

পূর্বেই একটি ঝুড়িতে সেই সকল সম্পদের দলিলপত্র ও ম্যাপ এনে রাখা হয়েছিল। তিনি ভাষণ শেষ করে তাঁর বিশ্বস্ত দাস মুযাহিমকে সেই ঝুড়ি থেকে একটি একটি করে দলিল

---

১১৪. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-১১৫
১১৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৭

উঠিয়ে পাঠ করতে নির্দেশ দিলেন। মুযাহিম একটির পাঠ শেষ করলে তিনি সেটা তার হাত থেকে নিয়ে কেঁইচি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করতে থাকেন। সকাল থেকে যুহরের নামায পর্যন্ত সেদিন এ কাজ চলতে থাকে।[১১৬]

তাঁর এসব ভূ-সম্পত্তি ইয়ামন, ইয়ামামাসহ আরবের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এসব ভূ-সম্পত্তির প্রত্যর্পণ শেষ করে নিজেকে দায়মুক্ত করেন। এমনকি একটি আংটির মূল্যবান মুক্তো, যেটি ওয়ালীদ তাঁকে দিয়েছিলেন, সেটিও তিনি ফিরিয়ে দেন। এ অবস্থা দেখে বিশ্বস্ত ও অনুগত চাকর মুযাহিম চুপ থাকতে পারলো না, সে বলে বসলো, আপনার সন্তানদের জীবিকার কি ব্যবস্থা হবে? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। এ অবস্থায় তিনি বললেন : "তাদেরকে আমি আল্লাহর যিম্মায় ছেড়ে দিচ্ছি।" তিনি নিজের এবং পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য কেবল খায়বারের ভূ-সম্পদ ও একটি জলাশয় রেখে দেন। যেটি তিনি নিজের প্রাপ্ত ভাতার অর্থ দিয়ে খনন করেছিলেন। এই জলাশয় ও খায়বারের ভূ-সম্পত্তি থেকে তাঁর বাৎসরিক আয় ছিল মাত্র এক শো পঞ্চাশ দীনার। কিন্তু যখন তিনি অবগত হলেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় খায়বারের এ ভূ-সম্পত্তিতে ছিল সাধারণ মুসলমানের অধিকার। কিন্তু তৃতীয় খলীফা হযরত 'উছমান (রা) এটা মারওয়ানের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করে দেন। সেখান থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এটার মালিক হন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয। তিনি এ সম্পত্তিও ফেরত দেন। এখন কেবল অবশিষ্ট থাকে জলাশয়টি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'ফাদাক'[১১৭]-এর বাগিচাটি। এটিও হস্তান্তর হয়ে তাঁর অধিকারে এসেছিল। ইবন সা'দ লিখেছেন, যখন তিনি খলীফা হন তখন পর্যন্ত তাঁর নিজের ও পরিবারের জীবিকা ও যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হতো এই ফাদাকের উৎপন্ন ফসল থেকে। যার বাৎসরিক মূল্য ছিল দশ হাজার দীনার। কিন্তু খলীফা হওয়ার পরই তিনি ফাদাকের ব্যাপারে রাসূল (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের কার্যক্রম কি ছিল তা জানার চেষ্টা করেন।

---

১১৬. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-১৯৮; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২০৮

১১৭. 'ফাদাক' হিজাযের একটি পল্লী। মদীনা থেকে পায়ে হেঁটে বা জন্তুযানে দুই অথবা তিন দিনের পথ। হিজরী সপ্তম সনে 'ফাই' অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়া সন্ধির ভিত্তিতে এটা রাসূলুল্লাহর (সা) অধিকারে আসে। পরবর্তীকালে হযরত ফাতিমা (রা) দাবী করেন যে, এটি রাসূল (সা) তাঁকে দান করে গেছেন। 'উমার (রা) এটা রাসূলুল্লাহর (সা) ওয়ারিছদেরকে দান করেন। মু'আবিয়া (রা) এটাকে মারওয়ানকে দান করেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের হাতে পৌঁছে। তিনি খলীফা হওয়ার পর ফাতিমার (রা) বংশধরদের হাতে তুলে দেন। ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক আবার তা ছিনিয়ে নেন। আব্বাসীয় খলীফা আবুল 'আব্বাস আস-সাফ্ফাহ আবার তা হাসান ইবন হাসান ইবন 'আলীর (রা) হাতে ফেরত দেন। মানসূর খলীফা হয়ে আবার তা কেড়ে নেন। কিন্তু খলীফা মাহদী ফেরত দেন। খলীফা হাদী আবার তা ছিনিয়ে নেন। এভাবে খলীফা আল-মামুনের হাতে পৌঁছে। তিনি হযরত 'আলীর (রা) বংশধরদের বরাবরে এর একটি দলীল করে দেন। (আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৪/২১৬, টীকা নং-১; আল-বালাযুরী, মু'জামুল বুলদান-৪/২৩৮-২৪০)

যখন প্রকৃত সত্য তাঁর সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো তখন তিনি গোটা মারওয়ান খান্দানের সদস্যদের সমবেত করে বললেন, ফাদাকে ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) একান্ত অধিকার। এর আয় তিনি নিজের ও বানূ হাশিমের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয় করতেন। হযরত ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এটি দাবী করেন; কিন্তু তিনি তাঁকে দিতে অস্বীকৃতি জানান। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) সময় পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চালু ছিল। মু'আবিয়া (রা) বানূ হাশিমদের থেকে তা কেড়ে নিয়ে মারওয়ানকে দান করেন। আর তিনি সেটি নিজের খামারের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তারপর সেটি উত্তরাধিকার সূত্রে আমার অধিকারে এসেছে। কিন্তু যে জিনিস রাসূল (স) ফাতিমাকে (রা) দেননি তাতে আমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় কেমন করে? এখন আমি আপনাদের সকলকে সাক্ষী রেখে বলছি, রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে ফাদাক যে অবস্থায় ছিল, আমি আবার সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দিলাম।

অতঃপর তিনি আবূ বকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আমর ইবন হাযমকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি বলেন, অনুসন্ধানের পর আমি অবগত হয়েছি যে, ফাদাকের আয় ভোগ করা আমার জন্য বৈধ নয়। এ কারণে আমি তা পূর্বের সেই অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই, যে অবস্থায় রাসূল (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে ছিল। আমার এই চিঠি আপনার হাতে পৌঁছার পর ফাদাক এমন এক ব্যক্তির দায়িত্বে অর্পণ করুন যে তার সকল অধিকার রক্ষার সাথে সাথে তত্ত্বাবধানও করতে পারে।[১১৮]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের স্ত্রী ফাতিমার একটি দাসী ছিল যার প্রতি তিনি কিছুটা দুর্বল ছিলেন। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর একদিন দাসীটি সেজেগুজে তাঁর সামনে আসে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি ফাতিমার মালিকানায় কিভাবে এলে? বলে, হাজ্জাজ কূফার একজন কর্মকর্তাকে জরিমানা করে। আমি ছিলাম সেই কর্মকর্তার দাসী। হাজ্জাজ তার নিকট থেকে আমাকে গ্রহণ করে খলীফা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের নিকট পাঠিয়ে দেয়। আমি তখন একেবারেই ছোট। এ কারণে 'আবদুল মালিক আমাকে তাঁর কন্যা ফাতিমার হাতে তুলে দেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয জিজ্ঞেস করেন, সেই কর্মকর্তার বর্তমান অবস্থা কি? বলে, তিনি মারা গেছেন, তবে তাঁর সন্তানরা জীবিত আছে। তাদের অবস্থা এখন খুব খারাপ। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তৎক্ষণাত তাদেরকে ডেকে পাঠান। তারা উপস্থিত হলে তাদের সকল অর্থ, এই দাসীসহ ফেরৎ দেন। দাসীটি তার পূর্বের মনিব-পুত্রদের সাথে যাওয়ার সময় 'উমারকে লক্ষ্য করে বলে : আপনার ভালোবাসার কি হলো? বললেন, তা এখনো আছে, বরং তা আরো বেড়ে গেছে।[১১৯]

আম্বাসা ইবন সা'ঈদ ইবন আল-'আস ছিলেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের একজন

---

১১৮. সুনান আবী দাউদ, কিতাবুলকারাজ ওয়াল ইমারাহ্; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৪/৪৩৫; তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৫-৩০৬

১১৯. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-১৫৬

ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে বিশ হাজার দিরহাম বায়তুল মাল থেকে দেওয়ার নির্দেশ দেন। নির্দেশ বাস্তবায়নের দাপ্তরিক কাজ শেষ হওয়ার পথে ছিল, এমন সময় সুলায়মান মারা যান। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হন। সেই বন্ধুটি তাঁর নিকট আসেন এবং বন্ধুত্বের সুবাদে সেই অর্থ দাবী করেন। তিনি তাঁকে বলেন, বিশ হাজার দীনার তো চার হাজার মুসলিম পরিবারকে দেওয়া যেতে পারে। এত বেশী অর্থ আমি একজনকে কিভাবে দিই? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খামারের অন্তর্ভুক্ত ছিল 'জাবাল আল-ওয়ারাস' নামে একটি পাহাড়। বন্ধুটি একটু খোঁচা মেরে বলেন, তাহলে "জাবাল আল-ওয়ারাস" নিজের অধিকারে রাখছো কেন? তিনি বলেন, তোমার এই খোঁচাতে আমার স্মরণ হয়েছে। আমি তো এর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এরপর তিনি 'আবদুল 'আযীযের জমিদারী ও খামারের সকল দলিল-দস্তাবেজ আনিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন।[১২০]

যে সকল কর্মকর্তা তাঁর এই নির্দেশ বাস্তবায়নে গড়িমসি করতো তাদের প্রতি ভীষণ নারাজ হতেন। 'উরওয়া ছিলেন ইয়ামনের প্রশাসক। একবার তিনি খলীফার এই নির্দেশ পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। বিষয়টি তিনি অবহিত হয়ে 'উরওয়াকে লেখেন, আমি তোমাকে লিখেছি যে, তুমি মুসলমানদের জবর-দখলকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দাও, আর তুমি সে ব্যাপারে আমার সামনে নানারকম প্রশ্ন উত্থাপন করে চলেছো। তোমার হয়তো জানা নেই যে, তোমার ও আমার মাঝের দূরত্ব কত এবং তোমার মৃত্যুর সময়ও তোমার জানা নেই। আমি যদি তোমাকে লিখি একজন মুসলমানের ছিনিয়ে নেওয়া ছাগল ফিরিয়ে দাও, জবাবে তুমি লিখছো, ছাগলটি ধুসর না কালো বর্ণের? মুসলমানদের সম্পদ ফিরিয়ে দাও, আর এ ব্যাপারে আমার সাথে পত্র লেখালেখি বন্ধ কর।[১২১]

আবুয যিনাদ বলেন : আমি ছিলাম 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সেক্রেটারী। তিনি মদীনার ওয়ালী 'আবদুল হামীদের নিকট তথাকার জবর-দখলকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পত্র লিখতেন। আর 'আবদুল হামীদ সেই ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে চেয়ে আবার পত্র লিখতেন। একবার 'আবদুল হামীদের এমন একটি পত্রের জবাবে তিনি লেখেন :[১২২]

إنه يخيَّل إلىَّ أنى لو كتبت إليك أن تُعطِى رجلا شاةً، لكتبت إلىَّ : أضأنا أم معزا؟ ولو كتبت إليك بأحدِهما لكتبت إلىَّ : أذكــرا أم انثـى؟ ولـو كتبـتُ إليـك بأحدهمـا لكتبت : أصغيرًا أم كبيرًا؟ فإذا كتبت إليك فى مظلمة فنفذ أمرى ولاتراجعنى فيها.

"আমার মনে হচ্ছে, আমি যদি তোমাকে লিখি যে, এক ব্যক্তিকে একটি বকরী দাও, তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে লিখবে : সেটা ভেড়া না ছাগল? আমি যদি দু'টির যে

---

১২০. ইবন 'আবদিল হাকাম, সীরাত-৫৬-৫৭
১২১. ইবনুল জাওযী, সীরাত-৯৭
১২২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/৯; ৪/৪৩৭

কোন একটির কথা লিখি, তুমি অবশ্যই লিখবে : সেটা নর না মাদী? যদি আমি যে কোন একটির কথা লিখি, তুমি লিখবে : ছোট না বড়? যখন আমি তোমাকে কোন অন্যায়-অবিচারের ব্যাপারে কোন কিছু লিখি, আমার কাছে দ্বিতীয়বার কিছু জানতে না চেয়ে আমার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবে।"

তাঁর নিয়োগকৃত কিছু কর্মকর্তা তাঁকে অবহিত করতেন যে, তার পূর্বের কর্মকর্তা জোর করে আল্লাহর সম্পদ হাতিয়ে নিয়েছেন। আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ পেলে তারা সেসব সম্পদ তাদের নিকট থেকে জোরপূর্বক উদ্ধার করতে পারেন। খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লিখিত ফরমান পাঠাতেন যে, এ ব্যাপারে আমার সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই। যদি সাক্ষী থাকে তাহলে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে, স্বীকারোক্তি থাকে তো তার ভিত্তিতে সম্পদ ফিরিয়ে নাও। অন্যথায় হলফ নিয়ে ছেড়ে দাও। 'আদী ইবন আরতাত ও 'আবদুল হামীদের সাথে এমন আচরণ করা হয়।[১২৩]

বায়তুল মাল থেকে যে অর্থ ফেরত দেওয়া হতো সে সম্পর্কে প্রথমে নির্দেশ দেন যে, যখন থেকে এ অর্থ বায়তুল মালে ঢোকানো হয়েছে সে সময় থেকে তার যাকাত কেটে রাখতে হবে। কিন্তু পরবর্তীতে এ নির্দেশ প্রত্যাহার করে কেবল এক বছরের যাকাত নেওয়ার কথা বলেন।[১২৪]

নিজের ও নিজ খান্দানের অন্যায়ভাবে দখলকৃত ভূ-সম্পত্তি ফেরতদানের পর্ব শেষ করে সাধারণভাবে জোর-জবরদস্তী দখল করা সম্পদের দিকে দৃষ্টি দেন। হযরত মু'আবিয়ার (রা) সময় থেকে নিয়ে তাঁর সময় পর্যন্ত অন্যায়ভাবে দখল করা স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পদ সবই এক এক করে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) ও ইয়াযীদের উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে এ রকম সম্পদ উদ্ধার করে তার প্রকৃত মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেন।

শাম ছাড়াও খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্ণরদের জোর করে দখল করা সম্পদ প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করে ফেরত দানের নির্দেশ দেন।

আবুয যিনাদ বলেন, আমরা যারা ইরাকের প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলাম তাদেরকে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লেখেন যে, আমরা যেন প্রত্যেকের ছিনতাইকৃত অধিকার ফিরিয়ে দিই। নির্দেশ মতো আমরা এ কাজ শুরু করলে বায়তুল মাল শূন্য হয়ে যায়। ফলে শাম থেকে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে অর্থ পাঠাতে হয়।

আবূ বকর ইবন 'আমর ইবন হাযম বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এমন কোন চিঠি আসতো না যাতে জোর-দখলকৃত সম্পদের ফিরিয়ে দেওয়া, সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন, বিদ'আত দূরীকরণ, অথবা অর্থ বন্টন ও ভাতা নির্ধারণের দিক নির্দেশনা থাকতো না। একবার লেখেন, বিভিন্ন অফিসের খাতাপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা কর। যদি পূর্বের কোন কর্মকর্তা কারো অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নিয়েছে এমন ধরা পড়ে তাহলে অত্যাচারিত ব্যক্তি

---

১২৩. ইবনুল জাওযী, সীরাত-৮৪
১২৪. তাবাকাত-৫/২৫২

জীবিত থাকলে তাকে এবং মৃত্যুবরণ করে থাকলে তার উত্তরাধিকারীদের তা ফিরিয়ে দাও।[১২৫]

ইমাম আশ-শাফি'ঈ (রহ) বলেন :[১২৬]

وكان يكتب إلى عماله ثلاث،فهى تدور بينهم : بإحياء سنة أو إطفاء بدعة ، أو قسم في مسكنة أو رد مظلمة.

"তিনি তাঁর কর্মকর্তাদের যে চিঠি লিখতেন তাতে তিনটি বিষয় ঘুরেফিরে আসতো : কোন সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন অথবা বিদ'আত দূরীকরণ, অথবা হতদরিদ্রদের মাঝে অর্থ বণ্টন অথবা অন্যায়-অবিচারের প্রতিবিধান।"

ইরাকে এত বেশী পরিমাণ সম্পদ ফেরত দেওয়া হয় যে, সরকারী কোষাগার শূন্য হয়ে যায় এবং তথাকার সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে দিমাশ্ক থেকে অর্থ পাঠাতে হয়।

সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার এই প্রক্রিয়া সহজীকরণের দিকেও দৃষ্টি রাখা হয়। মালিকানা প্রমাণের জন্য বড় ধরনের কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না। মামুলী ধরনের প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারলেই মালিক তাঁর বেহাত হওয়া সম্পদ ফেরত পেত। যারা মৃত্যুবরণ করেছিল তাদের উত্তরাধিকারীদের ফেরত দেওয়া হয়েছিল।[১২৭] ফেরত দানের এ ধারা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) ওফাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

তিনি ঘোষক নিয়োগ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন এই ঘোষণা দানের জন্য : "কারো প্রতি কোন রকম জুলুম করা হয়ে থাকলে সে যেন তার প্রতিকারের আবেদন জানায়।" ঘোষণা শুনে শুভ্র কেশ ও শ্মশ্রু বিশিষ্ট হিমসের একজন অমুসলিম যিম্মী খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট এসে বলে : ইয়া আমীরাল মু'মিনীন! আমি আপনার নিকট কিতাবুল্লাহর (আল্লাহর কিতাব) বাস্তবায়নের আবেদন জানাচ্ছি। 'উমার বললেন : আপনার বিষয়টি খুলে বলুন। লোকটি বললো : আল-'আব্বাস ইবন আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদুল মালিক আমার ভূমি জোর করে দখল করে নিয়েছে। আল-'আব্বাস সেখানে বসা ছিল। 'উমার বললেন : 'আব্বাস! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি? 'আব্বাস বললো : এ ভূমি আমার পিতা আল-ওয়ালীদ আমাকে দিয়েছেন। তিনি লিখিত একটি দলিলও করে দিয়েছেন। 'উমার বললেন : ওহে যিম্মী! তোমার আর কোন কথা আছে কি? সে বললো : আমি আপনার নিকট কিতাবুল্লাহর বাস্তবায়ন চাই। 'উমার তখন মন্তব্য করলেন : আল-ওয়ালীদের কিতাবের (লেখা) চেয়ে কিতাবুল্লাহ অধিকতর অনুসরণযোগ্য। অতএব, হে আব্বাস! তুমি তার ভূমি ফেরত দাও। 'আব্বাস সে ভূমি তাকে ফেরত দেয়।

---

১২৬. প্রাগুক্ত

১২৬. আল-কাসিম ফিত তারীখ-১/৬৫

১২৭. তাবাকাত-৫/২৫২; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/২০

এভাবে তিনি নিজের অধিকারে এবং তাঁর খান্দানের দখলে থাকা সকল সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তি একটি একটি করে যথার্থ মালিককে ফেরত দেন।[১২৮]

'উমার খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর জনৈক ব্যক্তি এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললো : আমীরুল মু'মিনীন! এই লোকটির বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন। একথা বলে সে এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে দেখায়। 'উমার জিজ্ঞেস করেন : কোন বিষয়ে? সে বললো : আমার সম্পদ জোর করে হাতিয়ে নিয়েছে এবং আমার পিঠে মেরেছে। 'উমার সেই লোকটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : সে যা বলছে তা কি ঠিক? বললো : সে ঠিক বলছে। এ সম্পদ দখল করার জন্য ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক আমাকে লিখিত নির্দেশ দেন। আপনাদের আনুগত্য আমাদের জন্য ফরয বা অবশ্যকর্তব্য। 'উমার বললেন : তুমি মিথ্যা বলেছো। আল্লাহর আনুগত্য হয় এমন কাজ ছাড়া অন্য কিছুতে আমাদের আনুগত্য তোমাদের জন্য জরুরী নয়। অতঃপর তিনি সেই ভূমি ফেরত দানের নির্দেশ দেন।[১২৯]

সম্পদ ফেরত দানের প্রতিক্রিয়া

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এই কর্ম পদ্ধতির প্রভাব পড়লো বিভিন্ন জনের উপর বিভিন্ন রকম। যে খারেজী সম্প্রদায় সর্বদা উমাইয়্যা খলীফাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন রাখতো তারা এই 'আদল ও ইনসাফের কথা শুনে সম্মিলিতভাবে পরিষ্কারভাবে বলে দিল এখন এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমাদের সঙ্গত হবে না।[১২৯] তবে গোটা বানূ উমাইয়্যা খান্দান একসাথে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত সম্পদ যা তারা ভোগ করছিল তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া এর কারণ ছিল। তাছাড়া যে বিশেষ মর্যাদা ও আভিজাত্য তারা ধারণ করেছিল তা তাদেরকে সমতা ও সাম্যবাদিতার কথা একেবারেই ভুলিয়ে দিয়েছিল। এ কারণে যখন তারা নিজেদেরকে অন্য সকল মুসলমানের সংগে একই কাতারে পাশাপাশি দেখতে পেল তখন ভীষণ অপমান বোধ করলো। তবে সবচেয়ে বড় বিষয়টি এই ছিল যে, হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এই কর্ম পদ্ধতিতে তাদের অন্তরে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, তাঁর পূর্ববর্তী উমাইয়্যা খলীফাগণ যে কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল আইনগত দিক দিয়ে অবৈধ এবং 'আদল ও ইনসাফের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কারণে এই খান্দানের পুরো ধারাবাহিকতাকে তারা সম্পূর্ণ চিহ্ন যুক্ত দেখতে পাচ্ছিল। আর তাই এ খান্দানের বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে খোদ 'উমারের সামনে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

একদিন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মারওয়ান বংশের সকলকে সমবেত করে বলেন, "ওহে মারওয়ান বংশের লোকেরা! তোমরা মান-সম্মান ও ধন-সম্পদের বিরাট একটি অংশ লাভ করেছিলে। আমার ধারণা মতে এই উম্মাতের সকল সম্পদের অর্ধেক অথবা

---

১২৮. আল-আজিরী, আখবারু 'উমার-৫৮; আ'জামু 'উজামা' আল-মুসলিমীন-১৪৪
১২৯. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৪/৪৩৪
১২৯. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-৫৪

এক তৃতীয়াংশ তোমাদের অধিকারে এসে গিয়েছিল।" তাঁর একথা শুনে সকলে একেবারে নীরব থাকে। 'উমার তাদেরকে বলেন, "তোমরা আমার একথার জবাব দাও।" সকলে এক বাক্যে বলে উঠলো : "যতক্ষণ না আমাদের মাথা আমাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে কাফির বলতে পারবো না, তেমনিভাবে পারবো না আমাদের সন্তানদের অন্যের মুখাপেক্ষী বানাতে।" একদিন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকের সামনে বানূ উমাইয়্যাদের অতীত জুলুম-অত্যাচারের আলোচনা করছিলেন। হিশাম নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না, হঠাৎ বলে উঠলেন, "আল্লাহর কসম! আমরা না আমাদের বাপ-দাদাদের উপর কোন দোষ লাগাতে পারি, আর না পারি আমাদের মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত করতে।"

'উমার বলেন : তোমরা যদি আমাকে এ অধিকার প্রত্যর্পণে সহায়তা না কর তাহলে খুব শিগ্‌গীর আমি তোমাদের মাথা নীচু করে ছাড়বো। কিন্তু আমি বিশৃঙ্খলাকে ভয় করি। তবে আল্লাহ্ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, ইনশাআল্লাহ্ প্রত্যেক বঞ্চিত ব্যক্তির অধিকার অবশ্যই ফিরিয়ে দেব।[১৩০]

একদিন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সামনে বহু দাসী উপস্থাপন করা হচ্ছিল। ঘটনাক্রমে সেখানে 'আব্বাস ইবন আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিকও উপস্থিত ছিল। যখনই কোন সুন্দরী দাসী সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল তখনই সে বলে উঠছিল : "আমীরুল মু'মিনীন! একে আপনি নিন।" যখন সে বার বার একই কথা বললো তখন 'উমার বললেন : তুমি কি আমাকে ব্যভিচারের জন্য উৎসাহিত করছো? 'আব্বাস সেখান থেকে উঠে পড়ে এবং বাইরে এসে নিজ খান্দানের কতিপয় সদস্যকে বলে! তোমরা এমন ব্যক্তির দরজায় বসে আছ কেন যে কিনা তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে ব্যভিচারী বলে?

'উমার ঘোষণা করেন, এ সকল দাস-দাসীদেরকে তাদের প্রকৃত মনিবের নিকট ফেরত পাঠানো হবে।[১৩১] এ সকল কারণে গোটা মারওয়ান খান্দান 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এমন ন্যায় ও সুবিচারমূলক কর্ম পদ্ধতিকে দারুণ অপছন্দ করতে থাকে এবং নানাভাবে তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। এরই ধারাবাহিকতায় আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিকের পুত্র 'উমার এই 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় একটি পত্র লেখে, যার সারকথা এই :

'আপনি পূর্ববর্তী খলীফাদের প্রতি দোষারোপ করেছেন এবং তাঁদের সন্তানদের প্রতি শত্রুতাবশতঃ তাদের সাথে বিরোধিতার নীতি অবলম্বন করেছেন। আপনি কুরায়শদের সম্পদ এবং তাদের উত্তরাধিকারকে অন্যায়ভাবে বায়তুল মালে ঢুকিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। ওহে 'আবদুল 'আযীযের পুত্র! আল্লাহকে ভয় করুন এবং মনে রাখুন, আপনি জুলুম করেছেন। মিম্বরের উপর বসার সাথে সাথে আপনি নিজের

---

১৩০. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/১৭৩; আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার-৩২
১৩১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/১৭৩

খান্দানকে জুলুম-অত্যাচারের জন্য বেছে নিয়েছেন। সেই আল্লাহর শপথ যিনি মুহাম্মাদকে (সা) বহুবিধ বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট করেছেন। আপনি রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে পেয়ে, যাকে আপনি একটা বিপদ বলে থাকেন, আল্লাহ থেকে বহুদূরে চলে গেছেন। নিজের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনায় লাগাম দিন এবং বিশ্বাস করুন যে, আপনি এক মহাপ্রতাপশালীর সামনে ও হাতের মুঠোয় আছেন এবং আপনাকে এ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে না।"

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যদিও ধৈর্য ও সহনশীলতার বাস্তব প্রতীক ছিলেন তা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে তিনি মোটেও নমনীয়তা দেখাননি। সাথে সাথে তিনি 'উমার ইবন আল-ওয়ালীদের পত্রের জবাব দিলেন অত্যন্ত কঠোর ভাষায়। পত্রটির তরজমা নিম্নরূপ :

"তোমার পত্র আমি পেয়েছি। তুমি যেমন লিখেছো আমিও তেমন জবাব দিব। তোমার প্রাথমিক অবস্থা তো এই যে, তোমার মা ছিল বাতাতা সুকূনের (بتام سكون) দাসী– যে হিমসের বাজারে মানুষের মনোরঞ্জন করে বেড়াতো, মদের আড্ডাখানায় যেত। যুবইয়ান ইবন যুবইয়ান তাকে মুসলমানদের গণীমতের মাল থেকে খরিদ করে তোমার পিতাকে উপহার দেয়। সেই মায়ের পেটে তোমার জন্ম। মা যেমন নিকৃষ্ট, সন্তানও তেমন নিকৃষ্ট। এরপর লালিত-পালিত হয়ে তুমি একজন অহঙ্কারী জালেমে পরিণত হয়েছো। তোমার ধারণা আমি একজন জালেম। আমি তোমাকে এবং তোমার খান্দানকে আল্লাহর সম্পদ থেকে, যে সম্পদে রয়েছে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটাত্মীয়, গরীব-মিসকীন ও অসহায় বিধবাদের অধিকার, বঞ্চিত করেছি। তবে আমার চেয়ে বেশী জালেম, আমার চেয়ে আল্লাহর অঙ্গীকারকে পরিত্যাগকারী সেই ব্যক্তি যে তোমাকে তোমার অপরিপক্ক বয়সে স্বল্পবুদ্ধির অবস্থায় মুসলমানদের একটি সেনাশিবিরের কর্মকর্তা নিয়োগ করে তোমাকে নিজের খেয়াল-খুশীমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজ করার ক্ষমতা দান করেছে। এই নিয়োগদানের পিছনে শুধুমাত্র পিতৃ-স্নেহ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না। সুতরাং অভিশাপ তোমার উপর এবং অভিশাপ তোমার জন্মদাতা পিতার উপর। কিয়ামতের দিন তোমাদের বিরুদ্ধে কত অভিযোগকারী হবে! তোমার পিতা এ সকল অভিযোগকারীদের থেকে মুক্তি পাবে কিভাবে?

আমার চেয়ে বড় জালেম এবং আমার চেয়ে বড় আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গকারী সেই ব্যক্তি যে হাজ্জাজকে সমগ্র আরবের এক-পঞ্চমাংশের উপর নিয়োগ দিয়েছিল। সে অন্যায়ভাবে মানুষের রক্ত প্রবাহিত করতো এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ হাতিয়ে নিত।

আমার চেয়ে বড় জালেম এবং বড় আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গকারী সেই ব্যক্তি যে কুররা ইবন শুরাইকের মত একজন পাঁড় বদ্দুকে মিসরের ওয়ালী নিয়োগ করেছিল। সে সেখানে গান-বাজনা, অশ্লীল আনন্দ-ফূর্তি ও মদ পানের অনুমতি দিয়েছিল। আমার চেয়ে বড় জালেম ও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গকারী সেই ব্যক্তি যে আরবের এক-পঞ্চমাংশে 'আলীয়া বারবারিয়াকে অংশ দিয়েছিল।

আমার যদি সুযোগ হয় তাহলে তোমার খান্দান ও তোমাকে আলোকিত পথে নিয়ে

আসবো। দীর্ঘকাল আমরা সত্যকে পরিত্যাগ করেছি। যদি তোমাদেরকে বিক্রী করা হয় এবং সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ ইয়াতীম, মিসকীন এবং অসহায় বিধবাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় তাহলেও তা যথেষ্ট হবে না। কেননা, তোমাদের মধ্যে সকলের অধিকার আছে। আমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহর সালাম জালেমদের নিকট পৌঁছে না।"[১৩২]

মারওয়ান বংশের লোকেরা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিককে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে 'উমারের নিকট পাঠান। হিশাম তাদের পক্ষ থেকে বলেন, মারওয়ান বংশের লোকেরা বলছে, আপনার নিজের সংগে যে সকল বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে সে ব্যাপারে আপনি যা ইচ্ছা করুন। কিন্তু পূর্ববর্তী খলীফাগণ যা কিছু করে গেছেন তা সেই অবস্থায় বহাল রাখুন। 'উমার হিশামকে জিজ্ঞেস করলেন যদি একই বিষয়ে তোমাদের নিকট দুইটি দলিল থাকে– একটি আমীর মু'আবিয়ার এবং দ্বিতীয়টি 'আবদুল মালিকের, তাহলে তোমরা কোনটি গ্রহণ করবে? হিশাম বললেন, আগেরটি। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তখন বললেন, আমি কিতাবুল্লাহকে আগের দলিল হিসেবে পেয়েছি। এ কারণে, আমার ক্ষমতার আওতাভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যাপারে– তা সে আমার সময়ের হোক বা অতীতের সাথে সম্পৃক্ত হোক, সেই কিতাবুল্লাহর নির্দেশ অনুসারে কাজ করবো। এ কথা শুনে সেখানে উপস্থিত সা'ঈদ ইবন খালিদ বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! যে জিনিস আপনার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে আছে সে ক্ষেত্রে আপনি হক ও ইনসাফের সাথে নিজের মত সিদ্ধান্ত নিন। আর পূর্ববর্তী খলীফাগণকে তাঁদের ভালো-মন্দসহ তাঁদের অবস্থায় থাকতে দিন। এতটুকুই আপনার জন্য যথেষ্ট।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন : আল্লাহর নামে কসম করে তোমাকে জিজ্ঞেস করি, যদি কোন ব্যক্তি ছোট-বড় কয়েকজন ছেলে রেখে মারা যায়, তারপর বড়রা শক্তির জোরে ছোটদের বিষয়-সম্পদ দখল করে নেয় এবং ছোটরা তা উদ্ধারের জন্য তোমাদের সাহায্য চায়, তখন তোমরা কি করবে? সা'ঈদ বললেন : তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেব। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন : আমি তো সেই কাজটি করছি। আমার পূর্ববর্তী খলীফাগণ শক্তির জোরে তাদেরকে দাবিয়ে রেখেছিলেন, তাঁদের অধীনস্থরাও তাঁদের অনুসরণ করেছিল, এখন আমি যখন খলীফা হয়েছি তখন সেই সকল মানুষ আমার নিকট এসেছে। সুতরাং সবলের নিকট থেকে দুর্বলের এবং উঁচু স্তরের নিকট থেকে নীচু স্তরের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। একথা শুনে ইবনে খালিদ বলে ওঠেন : আল্লাহ আমীরুল মু'মিনীনকে তাওফীক দিন।[১৩৩]

একবার বানু মারওয়ানের লোকেরা 'উমারের বাড়ীর দরজায় সমবেত হয়ে 'উমারের ছেলে 'আবদুল মালিককে বলে, হয় আমাদের ভিতরে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে আস অথবা তোমার বাবাকে একথা বল যে, তাঁর পূর্বে যাঁরা খলীফা ছিলেন তাঁরা আমাদের দিতেন এবং আমাদের থেকে নিতেন। আমাদের মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কিন্তু

---

১৩২. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-১১২
১৩৩. প্রাগুক্ত-১১৮, ১১৯; তাবি'ঈন-৩৩০

তোমার বাবা আমাদেরকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করেছেন। 'আবদুল মালিক পিতাকে এসব কথা বললেন। 'উমার বললেন, তুমি গিয়ে তাদেরকে বলে দাও, যদি আমি আল্লাহর নাফরমানি করি তাহলে কিয়ামতের শাস্তির ভয় করি।[১৩৪]

উমাইয়্যা খান্দানের লোকেরা একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের ফুফু ফাতিমা বিন্‌ত মারওয়ানের নিকট গেল। এই ফুফুকে তিনি খুবই আদব-লেহাজ করতেন। তাই লোকেরা তাঁকে বললো, আপনি তাঁকে এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলুন। ফুফু 'উমারকে তাঁর খান্দানের লোকদের বক্তব্য শোনালেন। 'উমার জবাব দিলেন : যখন শাসকের আপনজনেরা জুলুম-অত্যাচার করে এবং শাসক তা বন্ধ করতে পারে না তখন কোন মুখে সে অন্যদের জুলুম-অত্যাচার বন্ধ করবে? তাদের এমন কোন অধিকার যেমন আমি আটকে রাখিনি, তেমনি তাদের এমন কোন অধিকার কেড়েও নিইনি।

ফুফু বললেন : তোমার খান্দানের লোকেরা তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছে যে, তোমার এমন আচরণের জন্য তোমাকে খারাপ পরিণতি ভোগ করতে হবে। 'উমার জবাব দিলেন : কিয়ামতের দিনের চেয়ে অন্য কোন জিনিসকে যদি আমি বেশী ভয় করি তাহলে দু'আ করি আল্লাহ যেন তার অনিষ্ট থেকে আমাকে রেহাই না দেন।

অতঃপর তিনি একটি দীনার, গোশ্‌তের একটি টুকরো এবং একটি আংটি আনান। ফুফুর সামনে দীনারটি আগুনে ফেলেন। যখন সেটি আগুনে পুড়ে লাল হয়ে গেল তখন উঠিয়ে গোশতের টুকরোটির উপর রাখেন। সেটি একেবারে ঝলসে গেল। এবার তিনি ফুফুর দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনি এ ধরনের শাস্তি থেকে আপনার ভাতিজার মুক্তি চান না?

একটি বর্ণনায় এসেছে, 'উমার একথাও বলেন : ফুফু! রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষকে একটি নদী দান করে যান, যেখান থেকে সকলে সমানভাবে পান করতো। পরে আবূ বকর নদীটির মালিক হন এবং পূর্ববর্তী অবস্থায় রেখে যান। তারপর 'উমার ইবন আল-খাত্তাব সেটার অধিকারী হলেন। তিনি সেটার ব্যবহারে পূর্ববর্তী দু'জনের অনুসরণ করলেন। অতঃপর তার থেকে আরো অনেক ছোট নদী বের করা হয়। সেই সব নদী থেকে এখনো পর্যন্ত ইয়াযীদ, মারওয়ান, আবদুল মালিক, ওয়ালীদ ও সুলায়মানের বংশধরেরা পান করে পরিতৃপ্ত হচ্ছে। অবশেষে সেটি যখন আমার হাতে এসেছে তখন মূল নদীটি শুকিয়ে গেছে। কাউকে আর পরিতৃপ্ত করছে না। আল্লাহর কসম! যদি আমি জীবিত থাকি তাহলে অন্য সকল শাখা নদী ভরাট করে মূল নদীটি স্রোতোস্বিনী করে ছাড়বো।

ফুফু হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। গোত্রের লোকদের তিনি বললেন : এসব কিছু তোমাদের কর্মফল। তোমরা 'উমার ইবন খাত্তাবের (রা) খান্দানের মেয়েকে বিয়ে করে আনলে। শেষমেষ ছেলে নানার দিকেই চলে গেল।[১৩৫] উল্লেখ্য যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মা ছিলেন হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) দৌহিত্রী।

---

১৩৪. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-১১৭

১৩৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২১৪; তাবাকাত-৫/৩৭৩; আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৬৪-৬৫; আ'জামু 'উজামা' আল-মুসলমীন-১৪৫

'উমারের নিজের পরিবারের লোকেরাও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করে। ইমাম আল-আওযা'ঈ বর্ণনা করেছেন, যখন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) নিজের পরিবারের লোকদের ভাতা বন্ধ করে দিলেন তখন 'আনবাসা ইবন সা'দ অভিযোগ করলেন : আমীরুল মু'মিনীন! আপনার উপর আমাদের নিকট-আত্মীয়তার অধিকার রয়েছে। তিনি জবাব দিলেন : আমার ব্যক্তিগত সম্পদে তোমাদের জন্য সে সুযোগ নেই। আর বায়তুল মালের সম্পদে বারকুল 'ইমাদ-এর শেষ সীমান্তে একজন বসবাসকারীর যতটুকু অধিকার আছে, তার চেয়ে তোমাদের অধিকার একটুও বেশী নেই। আল্লাহর কসম! যদি গোটা দুনিয়া তোমাদের সাথে একমত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাদের উপর 'আযাব নাযিল করুন![১৩৬]

এ রকম আরো বহু ঘটনা আছে, কিন্তু কোন কিছুই 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের 'আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের উপর এ সকল বিক্ষোভ, হৈ চৈ ও আবেদন-নিবেদনের বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়লো না। তবে তিনি বিভিন্ন নৈতিক পদ্ধতিতে নিজ খান্দানের অসন্তুষ্টি কিছুটা দূর করতে সক্ষম হন। একবার সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের এক পুত্র তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর জব্দকৃত জমিদারী ফেরত চান। তাঁর দাবীর স্বপক্ষে পকেট থেকে একটি লিখিত দলিল বের করে 'উমারের হাতে দেন। তিনি সেটা পাঠ করে বলেন : এটি কার ছিল? বললেন : হাজ্জাজের। 'উমার বললেন : তাহলে তো এতে মুসলমানদের অধিকার সবচেয়ে বেশী। তিনি বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! আমার দলিলটি ফেরত দিন। 'উমার বললেন : তুমি এটা নিজে না আনলে আমি তোমার নিকট চাইতাম না। এখন, যখন তুমি নিজেই নিয়ে এসেছো তখন তোমাকে এ অনুমতি দেব না যে, এই দলিলের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে অন্যায় দাবী উপস্থাপন করবে। একথা শুনে তিনি কেঁদে ফেলেন।

'উমার একদিন মারওয়ানের খান্দানের কিছু লোককে নিজের বাড়ীতে আটকে রাখেন এবং তাদেরকে একটু দেরীতে খাবার দেওয়ার নির্দেশ দেন। বেলা বাড়তে থাকে, আর সেই লোকগুলো ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়তে থাকে। তারা বাবুর্চিকে তাড়াতাড়ি খাবার দিতে বলে। বাবুর্চি তাদেরকে ছাতু ও খেজুর খেতে দেয়। যখন তারা এসব খেয়ে পেট ভরে ফেলে তখন তাদের সামনে ভালো খাবার উপস্থিত করা হয়। কিন্তু তারা খেতে অপারগতা প্রকাশ করে। 'উমার তাদেরকে খাওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ করতে থাকেন, আর তারাও বলতে থাকে– আমাদের পেট ভরা, আমরা আর কিছুই খেতে পারবো না। অবশেষে 'উমার তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তাহলে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করছো কেন? এতটুকু পরিমাণ খাবার যখন মানুষের প্রয়োজন মেটায় তখন সে পেট ভরার জন্য, জীবিকার জন্য অবৈধ পন্থা গ্রহণ করা কেন? একথা বলে তিনি নিজে কাঁদেন এবং তাদেরকেও কাঁদান।[১৩৭]

---

১৩৬. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-১১৪-১১৫
১৩৭. 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার-৩৬-৩৭

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড

ধর্ম, রাজনীতি, নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা বিশ্বের যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় যখন মরিচা পড়ে যায় তখন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তা পরিষ্কারের জন্য একজন মুজাদ্দিদ তথা সংস্কারক সৃষ্টি করেন, যিনি যাবতীয় ব্যবস্থাপনার উপর পুঞ্জিভূত আবর্জনা সাফ করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় বিশ্ববাসীর সামনে নতুন করে উপস্থাপন করেন।

সুলায়মান ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকাল পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের শত বর্ষ পূর্ণ হয়ে যায়। এই দীর্ঘ সময়ে ইসলামের ধর্ম, রাজনীতি, নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, মোটকথা জীবনের প্রতিটি ব্যবস্থাপনায় মরিচা পড়ে যায়। এ সকল বিষয়ের তাজদীদ ও ইসলাহের (সংস্কার ও সংশোধন) জন্য একজন মুজাদ্দিদের (সংস্কারক) প্রয়োজন ছিল। আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহ) মিসরের মানুষ। তাই তাঁর বড় গর্ব এ জন্য যে, মিসরের মাটি সর্বপ্রথম 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দ্বারা মুজাদ্দিদের এই প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন। শুধু তাই নয় তার পরেও একাধারে কয়েক শতক পর্যন্ত মিসরের মাটি এ প্রয়োজন পূর্ণ করতে থাকে। তিনি লিখেছেন :[১৩৮]

ومن اللطائف أن شرط المبعوثين على رؤس القرون مصريون، عمر بن عبد العزيز فى الأولى والشافعى فى الثانية وابن دقيق العيد فى السابعة والبلقينى فى الثامنة.

"এ এক রহস্য যে, কয়েক শতকের সূচনায় যে সংস্কারকগণ জন্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরা সকলে মিসরবাসী। প্রথম শতকে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, দ্বিতীয় শতকে ইমাম আশ-শাফি'ঈ, সপ্তম শতকে ইবন দাকীক আল-'ঈদ এবং অষ্টম শতকে আল-বালকীনী (রহ)।"

তবে কালের অগ্রগামিতা ছাড়াও আরো অনেক দিক দিয়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) অন্যদেরকে অতিক্রম করে গেছেন। অন্যদের কর্মকাণ্ড যেখানে কেবল ধর্মীয় বিষয় ও গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) একজন খলীফা হওয়ার কারণে ধর্ম, নৈতিকতা, রাজনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। তাই তিনি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সংশোধন ও সংস্কার করেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি কথা, কর্ম ও আচরণের দ্বারা এ কথা মানুষকে জানিয়ে দেন যে, তাঁর কর্ম পদ্ধতি হবে কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্ম-পদ্ধতির ভিত্তিতে। এ কথা তিনি একটি উন্মুক্ত পত্রে মানুষকে জানিয়ে দেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিকট পাঠিয়ে তা জনসাধারণকে পাঠ করে শোনাতে নির্দেশ দেন। একবার জুম'আর খুতবায় তিনি বলেন :[১৩৯]

ألا إنّ ما سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه فهو دين، نأخذ به وننتهى إليه، وما سَنَّ سواهما فانا نرجئه.

---

১৩৮. হুসনুল মুহাদারা-১/১৩৫

১৩৯. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ), -২০৩

'আপনারা জেনে রাখুন, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর দু'সঙ্গী যা কিছু চালু করেছেন তাই দীন। আমরা তা থেকে গ্রহণ করবো এবং সেখানেই বিরত থাকবো। তাঁদের দু'জন ছাড়া অন্যরা যা কিছু চালু করেছেন সে ব্যাপারে আমরা চিন্তা-ভাবনা করবো।'

আরেকবার তিনি বলেন :[১৪০]

سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه بعده سننًا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستعمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأى من خالفها. فمن اقتدى بما سبق هُدى، ومن استبصر بها أبصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين، ولاّه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.

'রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর পরে তাঁর খলীফাগণ অনেক রীতি-পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন চালু করেছেন। সেগুলো গ্রহণ করা আল্লাহর কিতাবের সত্যায়ন ও আল্লাহর আনুগত্যের বাস্তবায়নের নামান্তর। সেগুলো পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অধিকার কারো নেই। যে ব্যক্তি সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করেছে তার প্রতি সদয় দৃষ্টিতে দেখার কোন সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি অনুসরণ করবে সে সৎ পথপ্রাপ্ত হবে, যে সেগুলোর আলোকে দেখতে চাইবে, দেখতে পাবে। যে বিরোধিতা করবে এবং ঈমানদারদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাকে সেই দিকে ফিরিয়ে দিবেন যেদিকে সে ফিরে গেছে। পরিণামে তাকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দেবেন। জাহান্নাম অতি নিকৃষ্ট ঠিকানা।'

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই শৈশবে যখন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মায়ের সাথে মদীনায় থাকতেন, মায়ের হাত ধরে নানা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট যেতেন তখন ঘরে ফিরে এসে মাকে বলতেন, মা! আমি মামার মত ('আবদুল্লাহ ইবন 'উমার রা.) হতে চাই। মা আদর করে বলতেন, তুমি তাই হবে। তাই তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই মদীনায় অবস্থানরত মামা সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (মায়ের চাচাতো ভাই)-কে লিখলেন :

اكتب لى سيرة عمر حتى أعمل بها.

'আমার জন্য আপনি 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের জীবন ও কর্ম পদ্ধতি লিখে পাঠান যাতে আমি তা অনুসরণ করতে পারি।'

সালিম বললেন, আপনি তা অনুসরণ করতে পারবেন না। 'উমার জানতে চাইলেন, কেন আমি অনুসরণ করতে পারবো না? জবাবে সালিম লেখেন :

إن عملت بها كنت أفضل من عمر، لأنه كان يجد على الخير أعوانا وأنت لاتجد من يعينك على الخير.

---

১৪০. প্রাগুক্ত

'যদি আপনি তা অনুসরণ করতে পারেন, আপনি 'উমারের চেয়েও উত্তম মানুষে পরিণত হবেন। কারণ, 'উমার তাঁর কল্যাণমূলক কাজে অসংখ্য সহযোগী পেয়েছিলেন, কিন্তু আপনি তা পাবেন না।'[১৪১]

হয়তো তিনি 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) চেয়ে উত্তম হতে পারেননি, তবে ইতিহাস সাক্ষী, তিনি জীবন যাপনে ও খিলাফত পরিচালনায় 'উমারের (রা) যথার্থ অনুসারী হতে পেরেছিলেন। এখানে অতি সংক্ষেপে তাঁর কিছু সংস্কারমূলক উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডের বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো।

খিলাফতকে শূরা পদ্ধতিতে ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) যদিও খলীফা নির্বাচন সংক্রান্ত ইসলামের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং পূর্ববর্তী খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের অসীয়াত মত এই পবিত্র আমানত ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের হাতে অর্পণ করেন, তথাপি তিনি এই স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল খিলাফতকে শূরা পদ্ধতিতে ফিরিয়ে নেওয়ার, কিন্তু এত বড় মৌলিক পরিবর্তন করা তাঁর একার সাধ্য সীমার মধ্যে ছিল না। কারণ, নীতিগতভাবে তখন শাহী খান্দানে উত্তরাধিকার সূত্রের রাজতন্ত্র স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলিম জনসাধারণও তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া তিনি এই পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট সময়ও পাননি।

তবে তিনি রাজতন্ত্রের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য দূর করার সিদ্ধান্ত নেন। এ লক্ষ্যে রাজকীয় দাপট, শক্তির প্রদর্শন ও সকল প্রকার বিকৃতি দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, মাত্র তিরিশ মাসে রাষ্ট্রের প্রতিটি শাখা ও ক্ষেত্রে রাজতন্ত্রের ষাট বছরের পুঞ্জিভূত সকল আবর্জনা, প্রভাব ও চিহ্ন একেবারেই পরিষ্কার করে ফেলেন।

ইসলামের ইতিহাসে ব্যক্তিগত পসন্দের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রথম খলীফা ইয়াযীদ। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে খলীফা বলে স্বীকার করতেন না। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁর সামনে ইয়াযীদকে আমীরুল মু'মিনীন বলায় তিনি তাঁকে বিশটি চাবুক মারেন।[১৪২]

সন্তানদের মধ্যে আবদুল মালিক ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয়পাত্র। এই প্রিয়তম সন্তান মারা গেলে তাঁর প্রশংসায় কিছু কথা মুখ থেকে বের হলে মাসলামা বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি সে বেঁচে থাকতো তাহলে আপনি কি তাঁকে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করতেন? বললেন : না। মাসলামা বললেন : কেন? আপনি তো তার খুবই প্রশংসা করেন। বললেন : আমার ভয় হয়, পিতৃ-বাৎসল্য তার ব্যাপারে আমাকে বিপথগামী না করে ফেলে।[১৪৩]

---

১৪১. তাবাকাত-৫/২৫২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/২০০ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/১২৭
১৪২. তারীখ আল-খুলাফা'-২০৯
১৪৩. প্রাগুক্ত-২৪০

ব্যক্তিগত পসন্দ ও মতামতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আরো নানাভাবে দৃশ্যমান হতো। যেমন গোটা শাহী খান্দান অস্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। খলীফাদের পক্ষ থেকে তারা নানা রকম বিশেষ ভাতা ও আর্থিক সুবিধা লাভ করতো। তাদেরকে জাতীয় সকল ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হতো। খলীফাদের ছিল জনসাধারণের উপর বিশেষ মর্যাদা। এমনকি নামাযের পরে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করার মত তাঁদের প্রতিও পাঠ করা হতো। মানুষ বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁদেরকে সালাম করতো। তাঁরা যখন চলতেন তখন বিশেষ পতাকাবাহী, ঘোষক ও দেহরক্ষী সংগে সংগে চলতো। কোন জানাযায় অংশগ্রহণ করলে তাঁদের জন্য এক বিশেষ ধরনের চাদর বিছানো হতো। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হওয়ার সাথে সাথে এসব রীতি-পদ্ধতি দূর করে সকলকে একই কাতারে নিয়ে আসেন। সুতরাং বেতন-ভাতা বন্টনে এমন সমতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেন যে, যারা বিশেষ সম্মান ও সুবিধা লাভে অভ্যস্ত ছিল তারা তাঁর থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে যায়।

একবার তো গোটা মারওয়ান খান্দানের লোকেরা একজোট হয়ে তাঁর নিকট আসে এবং তাদের পূর্বের প্রভাব-প্রতিপত্তির ভিত্তিতে তাঁকে তিরস্কারমূলক ভাষায় বলে, আপনার পূর্ববর্তী খলীফাগণ আমাদেরকে যে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতেন, আপনি তা একেবারেই উপেক্ষা করছেন। তিনি তাদেরকে বলেন : যদি তোমরা আগামীতে এমন দাবী নিয়ে আস তাহলে আমি সোজা মদীনায় চলে যাব এবং এই খিলাফতকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর ছেড়ে দেব। 'উ'য়াইমিশ অর্থাৎ কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা) এই খিলাফত পরিচালনার অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি। তাঁর নামটি আমার স্মরণ আছে।[১৪৪]

সাধারণ মানুষের চাইতে শাহী খান্দানের লোকেরা যে সম্মান, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো সে সম্পর্কে তিনি আবূ বকর ইবন হাযমকে লেখেন যে, সাধারণ সরকারী সমাবেশে খলীফার খান্দানের লোক বলে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিবেন না। আমার দৃষ্টিতে তারা সকলে অন্য সব মুসলমানের সমান মর্যাদার অধিকারী।[১৪৫] একবার তাঁর নিজের এজলাসে একটি মোকদ্দমার একটি পক্ষ হিসেবে শ্যালক মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক উপস্থিত হন এবং দরবারের একটি সম্মানজনক আসনে বসে পড়েন। 'উমার তাঁকে সে আসন থেকে উঠে তার প্রতিপক্ষের সাথে বসার নির্দেশ দেন। তাকে আরো বলেন, যদি তার সাথে বসতে সংকোচ বোধ কর তাহলে উকিল নিয়োগ করে বেরিয়ে যাও।[১৪৬]

নামায শেষে খলীফার প্রতি যে দরূদ-সালাম পেশের প্রথা চালু হয়েছিল তা বন্ধ করার লক্ষ্যে আল-জাযীরার ওয়ালীকে লেখেন যে, ওয়ায-নসীহতকারী যে সকল লোক এই বিদ'আত চালু করেছে তাদেরকে বলে দিন, দরূদ কেবল হযরত রাসূলে কারীমের (সা)

---

১৪৪. তাবাকাত-৫/২৫৩
১৪৫. প্রাগুক্ত-৫/২৫২
১৪৬. ইবনুল জাওযী-৭৩

জন্যই পেশ করতে হবে এবং দু'আ করতে হবে সকল মুসলমানের জন্য। আর অন্য সকল কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করতে হবে।[১৪৭]

নিজের সম্পর্কে লেখেন যে, বিশেষভাবে আমার জন্য যেন দু'আ করা না হয়; বরং সে দু'আ হবে সকল মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য। যদি আমার জন্যই করতে হয় তাহলে আমিও তো তাদের অন্তর্ভুক্ত। একবার জনৈক ব্যক্তি বিশেষভাবে তাঁকে সালাম করে। তিনি তাকে বলেন, সালাম করবে সাধারণভাবে।[১৪৮]

খলীফাদের সাথে দায়িত্বশীল পুলিশ-কর্মকর্তা ও পতাকাবাহীদের চলার প্রথা চালু করেন যিয়াদ। হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) স্বীয় নিরাপত্তার জন্য সর্বপ্রথম দেহরক্ষী নিয়োগ করেন। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হওয়ার সাথে সাথে এই প্রথা সম্পূর্ণ বিলোপ করেন। তিনি যখন তাঁর পূর্বসূরী খলীফা সুলায়মানের কাফন-দাফন শেষ করে খলীফা হিসেবে চলতে শুরু করেন তখন তাঁর দেহরক্ষী নিযা হাতে নিয়ে সাথে সাথে চলতে আরম্ভ করে। কিন্তু তিনি সামনে থেকে তাঁকে সরিয়ে দেন এবং বলেন, আমার এর কোন প্রয়োজন নেই। আমি তো অন্য সকল মুসলমানের মতই একজন মানুষ। তিনি সকলের সাথে পাশাপাশি চলে মসজিদে যান এবং স্বীয় খিলাফতের ঘোষণা দেন।[১৪৯]

শাহী প্রাসাদে খলীফাদের জন্য বিশেষভাবে যে বিছানা পাতা হতো তা বিক্রী করে সে অর্থ বায়তুল মালে জমা করেন। জানাযার নামাযে অংশগ্রহণের সময় খলীফাদের জন্য অন্য সাধারণ মুসলমানদের থেকে পৃথক করে যে চাদর বিছানো হতো, যখন একটি জানাযায় তাঁর জন্য বিছানো হয়, তিনি তা পা দিয়ে গুটিয়ে রেখে বসে পড়েন।[১৫০] মোটকথা হযরত মু'আবিয়ার (রা) সময় থেকে নিয়ে সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের সময় পর্যন্ত ব্যক্তি বিশেষকে বড় করে দেখানোর যে রীতি গড়ে উঠেছিল তিনি তার মূলোৎপাটন করেন। বিশ্ববাসী আবার খিলাফতের দরবারে 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) অনাড়ম্বর জীবন-চিত্র দেখতে পেল।

বায়তুল মালের আয়ের সংশোধন

উমাইয়্যা শাসন আমলে বায়তুল মালে আয়-ব্যয়ের মধ্যে মাত্রা ছাড়া অনিয়ম ও অসামঞ্জস্য ছিল। আয়ের ক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধ কোন বিবেচনায় আনা হতো না। বিবিধ প্রকার অবৈধ আয়ের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কোষাগার, যাকে বায়তুল মাল বলা হয়, ভরে ফেলা হতো। তেমনিভাবে অবৈধ পন্থায় তা ব্যয়ও করা হতো। যে বায়তুল মাল হলো দেশের জনগণের সম্পদ তা একান্ত ব্যক্তিগত কোষাগারে পরিণত হয়। এর সিংহ ভাগ ব্যয় হতো

---

১৪৭. প্রাগুক্ত-২৩৬
১৪৮. তাবাকাত-৫/২৭৮, ২৮৩
১৪৯. ইবনুল জাওযী-৫৩
১৫০. প্রাগুক্ত-৫৭

খলীফাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও জীবিকার জন্য। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এ সকল অনিয়মের প্রতিবিধান করেন।

শাহী খান্দানের যাবতীয় বিশেষ ভাতা বন্ধ করে দেন। শাহী মহলের যাবতীয় ডেকোরেশনের বরাদ্দও বাতিল করেন। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকারী আঁস্তাবলের কর্মকর্তা আঁস্তাবলের পশুর জন্য অর্থ বরাদ্দের আবেদন জানায়। তিনি বলেন, পশুগুলো বিক্রী করে সেই অর্থ বায়তুল মালে জমা দেওয়া হোক। আমার খচ্চরটি আমার জন্য যথেষ্ট।[১৫১]

তিনি রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে বদলে দেন। পার্থিব রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে "খিলাফত 'আলা মিনহাজ আন-নুবুওয়াত" (নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত)-এ রূপান্তর ঘটান। তাঁর গোটা খিলাফতকালটাই ছিল এই একটি বাক্যের বাস্তব ব্যাখ্যা। তিনি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ও স্বার্থের বিপরীতে সব সময় দীন, দীনের মূলনীতি ও নৈতিকতাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দীনের প্রচার-প্রতিষ্ঠা ও জনগণের সুখ-সুবিধার বিপরীতে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতিকে কখনো গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। একবার একজন আঞ্চলিক কর্মকর্তাকে তিনি লেখেন :[১৫২]

والله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حرّاثين نأكل من كسب أيدينا.

"আল্লাহর কসম! আমি চাই সকল মানুষ মুসলমান হয়ে যাক এবং জিযিয়া খাতের আয় বন্ধ হওয়ার কারণে তুমি, আমি উভয়ে হাল চালিয়ে নিজ হাতের উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি।"

খারাজ, জিযিয়া এবং বিভিন্ন ট্যাক্সই হলো ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস। এগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপরই নির্ভর করে দেশ ও সরকার উভয়ের স্থায়িত্ব, প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালের পূর্বে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনা এতই নিম্নমানের হয়ে পড়েছিল যে, তা জনগণের উপর জবরদস্তী চাপিয়ে দেওয়ার জিনিসে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপ :

১. ইসলামে জিযিয়া কেবল অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ কারণে কোন খৃস্টান, ইহুদী বা অন্য কোন ধর্মের লোক ইসলাম গ্রহণ করলে তার উপর থেকে জিযিয়া রহিত হয়ে যেত। কিন্তু হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ এই পার্থক্য সম্পূর্ণ মুছে ফেলেন। তিনি নও মুসলিমদের নিকট থেকেও জিযিয়া আদায় করতেন। আল-মাকরীযী বলেন :[১৫৩]

وأول من أخذ الجزية ممن أسلم من أهل الذمة الحجاج.

---

১৫১. তারীখ আল-খিলাফা'-২৩০

১৫২. তারীখ আল-'আরাব-২৮৪, ২৮৬

১৫৩. তারীখ আল-মাকরীযী-৭৭-৭৮

"যিম্মীদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের নিকট থেকে সর্বপ্রথম যিনি জিযিয়া গ্রহণ করেন তিনি হলেন হাজ্জাজ।"

২. নওরোয ও মাহ্রজান ছিল পারস্যবাসীর তাহ্ওয়ার বা আনন্দ-উৎসব। এর রীতি-প্রথার অনুসরণ কেবল পারসিকরাই করতে পারতো। কিন্তু হযরত মু'আবিয়া (রা) এ উপলক্ষে তাদের নিকট থেকে মোটা অংকের অর্থ, যার পরিমাণ এক কোটি দিরহাম ছিল, উপহার স্বরূপ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন।[১৫৪]

৩. হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের ভাই মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ যখন ইয়ামনের গভর্ণর নিযুক্ত হন তখন তিনি তথাকার অধিবাসীদের উপর ভীষণ নির্যাতন চালান এবং তাদের উপর এক প্রকার নতুন ট্যাক্স ধার্য করেন।[১৫৫]

৪. ফুরাতে কিছু খারাজী ভূমি ছিল। যখন সেখানকার অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং কিছু ভূমি অন্যদের থেকে হাত-বদল হয়ে মুসলমানদের অধিকারে আসে তখন নিয়ম অনুযায়ী এ সকল ভূমি 'উশরী ভূমিতে পরিণত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হাজ্জাজ তাঁর শাসনকালে তাদের নিকট থেকেও খারাজ আদায় করেছেন।[১৫৬]

৫. জনসাধারণের উপর বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স ধার্য করা হয়। মুদ্রা তৈরির উপর ট্যাক্স, রূপো গলানোর জন্য ট্যাক্স, দলিল ও আবেদন পত্র লেখালেখির উপর ট্যাক্স, দোকানের উপর ট্যাক্স, বিয়ে শাদীর জন্য ট্যাক্স, মোটকথা, জীবনের জন্য প্রয়োজন এমন কোন জিনিসই ট্যাক্সের আওতার বাইরে ছিল না। আর এ সকল ট্যাক্স মাসিক হিসেবে আদায় করা হতো। এজন্য এই অর্থকে "মালে হিলালী" বা নতুন চাঁদের অর্থ বলা হতো।[১৫৭]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর দেখতে পেলেন যে, এমন কিছু আয় বায়তুল মালে জমা হয় যা শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ। আর কিছু আছে যা জনসাধারণের উপর বোঝা স্বরূপ। তিনি এ ধরনের আয় বন্ধের নির্দেশ দেন।

বায়তুল মালের আমদানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ নও-মুসলিমদের থেকেও জিযিয়া কর আদায় করতো। 'উমার খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর ফরমান জারী করেন, যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না। এ ব্যাপারে তিনি হায়্যান ইবন শুরাইহকে যে পত্রটি লেখেন তা নিম্নরূপ :[১৫৮]

ضع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة، فإن الله تبارك وتعالى قال : فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وقال : قاتلوا الذين لا

---

১৫৪. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/২৫
১৫৫. ফুতূহ আল-বুলদান-৮০
১৫৬. প্রাগুক্ত-৩৭৫
১৫৭. কিতাবুল খারাজ-৪৯
১৫৮. জামহারাতু রাসায়িল আল-'আরাব-২/২৯৫

يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدو هم صاغرون.

"যিম্মীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের জিযিয়া রহিত করুন। কারণ, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা বলেছেন : "যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" তিনি আরো বলেছেন : "যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনেনা ও শেষ দিনেও বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।"

এই নির্দেশের পর অমুসলিমরা এত ব্যাপক হারে মুসলমান হতে শুরু করে যে, জিযিয়া রাজস্বে বিশাল ঘাটতি দেখা দেয়। হায়্যান ইবন শুরাইহ খলীফাকে জানালেন, ব্যাপক হারে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করায় রাজস্বে ঘাটতি দেখা দিয়েছে এবং আমাকে ঋণ নিয়ে কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা দিতে হচ্ছে। পত্রটির কিছু অংশ নিম্নরূপ :[১৫৯]

أما بعد، فإن الإسلام قد أضرَّ بالجزية حتى تسلَّفتُ من الحارث بن ثابتة عشرين ألف دينار. أتممت بها عطاء أهل الديوان. فإن رأى أمير المؤمنين يأمر بقضائها فعل."

"অতঃপর, ইসলাম জিযিয়া রাজস্বের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। এমনকি আমি আল-হারিছ ইবন ছাবিতার নিকট থেকে বিশ হাজার দীনার ধার করে কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতন দিয়েছি। আমীরুল মু'মিনীন যদি জিযিয়ার ব্যাপারে তাঁর আগের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে চান করতে পারেন।"

এই পত্রের জবাবে খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অত্যন্ত কঠোর ভাষায় যে জবাবটি দেন তা নিম্নরূপ :[১৬০]

أما بعد، فقد بلغني كتابك، وقد وَلَّيْتُك جند مصر وأنا عارف بضعفك، وقد أمرت رسولي بضربك على رأسك عشرين سوطًا، فضع الجزية عمن أسلم، قبَّح الله رأيك، فإن الله إنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديًا، ولم يبعثه جابيًا.

"অতঃপর এই যে, আপনার পত্র পেয়েছি, আপনার দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও আমি আপনাকে মিসরের সেনাবাহিনীর দায়িত্ব প্রদান করেছি। আমি আমার দূতকে নির্দেশ দিয়েছি, সে যেন আপনার মাথায় বিশটি বেত্রাঘাত করে। যারা ইসলাম

---

১৫৯. প্রাগুক্ত-২/২৯৫-২৯৬
১৬০. প্রাগুক্ত

গ্রহণ করেছে তাদের জিযিয়া রহিত করুন। আল্লাহ আপনার সিদ্ধান্তকে খারাপ করুন। আল্লাহ মুহাম্মাদকে (সা) পথ প্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়েছেন, তাহসীলদার হিসেবে নয়।"

হীরার ওয়ালী 'আবদুল হামীদ ইবন 'আবদির রহমানের অনুরূপ একটি পত্রের জবাবে তিনি লেখেন :[১৬১]

كتبت إلىّ تسألنى عن أناس من أهل الحيرة، يُسْلِمون من اليهود والنصارى والمجوس وعليهم جزية عظيمة وتستأذننى فى أخذ الجزية منهم، وإن الله عز وجل ثناؤه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الاسلام ولم يبعثه جابيًا، فمن أسلم من أهل تلك الملل فعليه فى ماله الصدقة ولاجزية عليه، وميراثه لذوى رحمه إذا كان منهم، يتوارثون كما يتوارث أهل الاسلام، وإن لم يكن له وارث فميراثه فى بيت مال المسلمين الذى يقسم بين المسلمين. والسلام.

"হীরার অধিবাসীদের মধ্যে যে সকল ইহূদী, খৃস্টান ও অগ্নি উপাসক ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং যাদের উপর বিরাট অংকের জিযিয়া ধার্য ছিল, তাদের সম্পর্কে আপনি জানতে চেয়েছেন এবং তাদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণের অনুমতিও চেয়েছেন। শুনুন, মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ মুহাম্মাদকে (সা) ইসলামের দিকে আহ্বানকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন, ট্যাক্স কালেক্টর হিসেবে পাঠাননি। অতএব, ঐ সকল ধর্মাবলম্বীদের যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের উপর তাদের সম্পদের যাকাত প্রযোজ্য। তাদের উপর জিযিয়া প্রযোজ্য নয়। তাদের কোন রক্ত সম্পর্কীয় কেউ থাকলে সে তাদের উত্তরাধিকার লাভ করবে এবং মুসলমানদের অনুরূপ তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলতে থাকবে। আর যদি কোন উত্তরাধিকারী না থাকে তাহলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বায়তুল মালে জমা হবে, যা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টিত হবে। ওয়াস সালাম।"

আল-জাররাহ সম্পর্কে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তিনি নও-মুসলিমদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করছেন তখন তাঁকে বরখাস্ত করেন।[১৬২]

নও-মুসলিমদের উপর ধার্যকৃত জিযিয়া রহিতকরণের ব্যাপারে তিনি এত জোর দেন যে, একবার তিনি এক আঞ্চলিক কর্মকর্তাকে লেখেন, যদি একজন যিম্মীর নিকট থেকে গৃহীত জিযিয়া ওযনের জন্য পাল্লায় রাখা হয়েছে, এমতাবস্থায় সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলেও তার জিযিয়া ফেরত দেওয়া হোক। তাঁর কথা ছিল বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন আগেও যদি কোন যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করে তাহলেও তাঁর কাছ থেকে সে বছরের জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না।[১৬৩]

---

১৬১. কিতাবুল খারাজ-১৩১
১৬২. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩৬২
১৬৩. তাবাকাত-৫/২৬২

নওরোয ও আনন্দ-উৎসবের উপহার-উপঢৌকন সম্পর্কে তিনি নির্দেশ দেন, এসব উপহার-উপঢৌকনের কোন জিনিস যেন তাঁর নিকট পাঠানো না হয়।

হাজ্জাজের ভাই মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইয়ামনবাসীদের উপর যে নতুন খাজনা-ট্যাক্স ধার্য করেছিলেন তিনি তা রহিত করে তাদের উপর কেবল 'উশর ধার্য করেন।

ফুরাতের তীরে বসবাসকারী মুসলমানদের যে সকল ভূমিকে হাজ্জাজ দ্বিতীয়বার খারাজী ভূমির অন্তর্ভুক্ত করেন, তিনি তা বাতিল করে 'উশরী ভূমির অধিভুক্ত করেন।

জনগণের উপর ধার্যকৃত সকল অযৌক্তিক খাজনা-ট্যাক্স তিনি রহিত করার ঘোষণা দেন। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ট্যাক্সকে "مُكْس" 'মুক্স' বলে। এ কারণে তিনি বলতেন, এ সকল অন্যায় ট্যাক্স "مُكْس"– মুক্স নয়, বরং একে "بَخْس" (বাখস) বলা সঙ্গত, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَائَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

"তোমরা লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না।"[১৬৪]

খারাজের ব্যাপারে তিনি 'আবদুল হামীদ ইবন 'আবদির রহমানকে যে পত্রটি লেখেন সেটি কাজী আবূ ইউসুফ হুবহু বর্ণনা করেছেন। উক্ত পত্রে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কর্ম পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে। পত্রটি নিম্নরূপ :[১৬৫]

أنظر الأرض ولا تحمل خرابا على عامرولا عامرا على خراب، وانظـر الخـراب فـان أطلق شيئًا فخذ منه ما أطلق وأصلحــه حتــى يعمـر، ولا تـأخذ مـن عـامر لا يعتمـل شيئًا، وما أجدب من العامر من الخراج فخذه في رفق وتسكين لأهل الأرض. وآمرك أن لا تأخذ في الخراج الاوزن سبعة ليـس فيـها تـبرو لا أجـور الضرابـين ولا اذابـة الفضة ولا هدية النيروز والمهرجان ولاثمن الصحف ولا أجور الفتوح ولا أجور البيوت ولا دراهم النكاح، ولا خراج على من اسلم من أهل الأرض.

'ভূমি জরীপ করুন। অনাবাদী ভূমির বোঝা আবাদী ভূমির উপর এবং আবাদী ভূমির ভার অনাবাদী ভূমির উপর চাপাবেন না। অনাবাদী ভূমি জরীপ করুন। তাতে যদি কিছু উৎপাদন ক্ষমতা থাকে তাহলে সেই অনুপাতে খারাজ ধার্য করুন। এ ধরনের ভূমির পরিচর্যা করুন, যাতে তা পূর্ণ আবাদী ভূমিতে পরিণত হয়। যে সকল আবাদী ভূমিতে কোন ফসল হয় না তা থেকে কোন খারাজ নিবেন না। কোন ভূমিতে উৎপাদন কম হলে খারাজ আদায়ের ক্ষেত্রে মালিকের সাথে সদয় আচরণ করবেন। খারাজের ক্ষেত্রে কেবল

---

১৬৪. তাবাকাত-৫/২৮৩; তারখী আল-মাকরীযী-১/১০৩
১৬৫. কিতাবুল খারাজ-৮৬

সাত প্রকার ওযনযোগ্য জিনিস গ্রহণ করবেন, তার মধ্যে সোনা থাকবে না। যারা সোনা-রূপা গলায় তাদের থেকে ট্যাক্স, ঈদ ও আনন্দ উৎসবের উপঢৌকন, দলিল-দস্তাবেজ লেখক ও মুহুরী থেকে এবং বাড়ী-ঘর, বিয়ে শাদী ইত্যাদি থেকে কোন ট্যাক্স নেওয়া যাবে না। কোন যিম্মী মুসলমান হলে তার উপর কোন খারাজ নেই।"

ফসল ভালো হোক কিংবা মন্দ হোক, য়ামনের রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারিত ছিল। এতে কৃষকদের ভীষণ কষ্ট হতো। বিষয়টি য়ামনের তৎকালীন ওয়ালী 'উরওয়া ইবন মুহাম্মাদ খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে লিখে জানালেন। জবাবে 'উমার তাঁকে লিখলেন :[১৬৬]

أما بعد، فإنك كتبت إليّ تذكر أنك قدمت اليمن، فوجدت علـى أهلـها ضريبـة مـن الخراج مضروبة، ثابتة في أعناقهم كالجزية، يؤدونها على كل حـال، إن أخصبـوا أو أجدبوا، وحيوا أو ماتوا، سبحان الله رب العالمين، ثم سبحان الله رب العـالمين، ثم سبحان الله رب العالمين، إذا أتـاك كتـابي هـذا، فـدع مـا تُنكـر مـن البـاطل إلى ماتعرفه من الحق، ثم إئتنف الحق، فاعمل بـه بالغا بـي وبـك، وإن أحـاط بمـهج أنفسنا، وإن لم ترفع إليّ من جميع إلاجفنة من كتم، فقد علم الله أنـي بـها مسـرور إذا كانت موافقة للحق والسلام.

"অতঃপর এই যে, আপনি আপনার পত্রে উল্লেখ করেছেন য়ামনে গিয়ে আপনি দেখতে পেয়েছেন যে, সেখানের অধিবাসীদের উপর নির্দিষ্টভাবে খারাজ বা খাজনা ধার্য করা আছে। জিযিয়ার মত তা তাদের কাঁধের উপর চেপে বসে আছে। ফসল হোক বা না হোক, বাঁচুক বা মরুক সর্ব অবস্থায় তারা তা পরিশোধ করতে বাধ্য। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অতি পবিত্র। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অতি পবিত্র। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অতি পবিত্র। অতএব, যে অন্যায়কে তুমি অপছন্দ কর তা ছেড়ে দাও, এমনকি যে সত্যকে তুমি পছন্দ কর তারও কিছু। অতঃপর নতুন করে সত্যকে আমার ও তোমার পক্ষ থেকে বাস্তবায়িত কর। এতে যদি আমাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং গোটা য়ামন থেকে অতি সামান্য কিছুই আসুক না কেন তাতে কোন পরোয়া নেই। আল্লাহ জানেন, আমি ভীষণ খুশী হই যখন আমাদের কাজ হয় সত্যের অনুকূলে। ওয়াস-সালাম!"

তিনি স্থল ও সমুদ্র পথ খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং সকল প্রকার বাণিজ্যিক বাধ্যবাধকতা ও কঠোর বিধি-নিষেধ রহিত করেন। তিনি বলেন :[১৬৭]

---

১৬৬. ইবনুল জাওযী-১২৬; তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৬
১৬৭. ইবনুল জাওযী-৯৯; রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ-দা'ওয়া-৪৫

أما البحر فإنا نرى سبيله سبيل البر قال تعالى : الله الذى سخرلكم البحــر لتجـرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. فأذن فيه أن يتجر فيه من شاء، وأرى ألانحـول بين أحد من الناس وبينه، فإن البر والبحر لله جميعا سخرهما لعباده،يبتغون فيهما من فضله، فكيف نحُولُ بين عباد الله وبين معائشهم.

"আর সমুদ্রের ব্যাপারে আমাদের মত হলো, সাগর-পথ স্থল পথের মতই। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : 'আল্লাহই তো সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে ও যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যেন তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।' সমুদ্র পথে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চায় আল্লাহ তাদের অনুমতি দিয়েছেন। আমরা এর মধ্যে প্রতিবন্ধক হতে চাই না। কারণ, আল্লাহ জল ও স্থল উভয়কে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তারা সেখানে রুযি-রিযিকের সন্ধান করতে পারে। সুতরাং আমরা কিভাবে আল্লাহর বান্দাহগণ ও তাদের জীবিকার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারি?"

পূর্ববর্তী খলীফাদের সময় ধার্যকৃত যাবতীয় 'উশর ও কর তিনি কমিয়ে দেন। তিনি নিয়ম চালু করেন, কেউ বাৎসরিক কর-খাজনা পরিশোধ করলে তাকে একটি পরিশোধ-পত্র দেওয়া হবে। তিনি বিধান জারি করেন :[১৬৮]

فأما المسلمون فإنماعليهم صدقات أموالهم،إذا أدوها فى بيت المـال كتبـت لهـم بـها البراءة، فليس عليهم فى عامهم فى ذلك فى أموالهم تباعة.

"মুসলমানদের সম্পদের যাকাত দিতে হবে। কেউ সে যাকাত বায়তুল মালে জমা দিলে তাকে একটি দায় মুক্তি-পত্র দেওয়া হবে। সেই বছরের জন্য তার সেই সম্পদের উপর আর কোন ট্যাক্স-কর ধার্য হবে না।"

যাকাত ও সাদাকা

যদিও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতের এই বরকত ছিল যে মানুষ যখন তাঁর খলীফা হওয়ার খবর পেল তখন তারা স্বেচ্ছায় খুব দ্রুত সাদাকায়ে ফিতর আদায় করতে আরম্ভ করলো। এমনকি তাঁর একজন আঞ্চলিক কর্মকর্তা লিখলেন যে, প্রচুর সাদাকায়ে ফিতর জমা হয়ে গেছে। কি করতে হবে সে ব্যাপারে আপনি অবহিত করুন। তা সত্ত্বেও তিনি মানুষকে যথাযথভাবে যাকাত-সাদাকা আদায়ের ব্যাপারে তীব্রভাবে উৎসাহিত করতেন। একবার খুনাসিরায় 'ঈদের একদিন পূর্বে জুম'আর খুতবা দেন। তাতে তিনি মানুষকে সাদাকায়ে ফিতর আদায়ের ব্যাপারে প্রচণ্ড তাকীদ ও উৎসাহ দেন। খুতবায়

---

১৬৮. ইবনুল জাওযী-৯৮

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি যাকাত দেয় না তার নামায কবুল হয় না। মানুষ আটা, ছাতু নিয়ে আসতো, আর তিনি তা গ্রহণ করতেন।

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ যাকাত ব্যবস্থার সর্বনাশ করে ফেলেন। যাকাতের শরী'আত নির্ধারিত আয়-ব্যয়ের যে খাত ছিল হাজ্জাজ তার অনুসরণ একেবারেই ত্যাগ করেন। এ কারণে তিনি আঞ্চলিক কর্মকর্তাদেরকে হাজ্জাজের অনুসরণের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন। একবার হাজ্জাজ সম্পর্কে 'আদী ইবন আরতাতকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাতে তিনি লেখেন :[১৬৯]

ونهيتك عن فعله في الصلاة، فإنه كان يؤخرها تأخيرًا لا يحل له، ونهيتك عن فعله في الزكاة، فإنه كان يأخذها غير حقّها،ثم يسئُ مواقعها، فاجتنب ذلك منه، واحذر العمل به، فإن الله عزوجل قد أراح منه وطهَّر العباد والبلاد من شره، والسلام.

"নামাযের ব্যাপারে আমি আপনাকে হাজ্জাজের অনুকরণ থেকে বিরত থাকতে বলছি। কারণ, সে নামায এত দেরীতে আদায় করতো যে তা তার জন্য মোটেই বৈধ ছিল না। তেমনিভাবে যাকাতের ব্যাপারেও তাকে অনুসরণ করতে নিষেধ করছি। কারণ, সে যেমন অন্যায়ভাবে যাকাত আদায় করতো তেমনি বে-মাওকা খরচও করতো। তার এসব কাজ থেকে দূরে থাকুন। তার অনুকরণের ব্যাপারে সতর্ক হোন। মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ তার থেকে মানুষকে স্বস্তি দিয়েছেন এবং জনগণ ও দেশকে তার অনিষ্ট থেকে পবিত্র করেছেন। ওয়াস সালাম!"

একবার তিনি জানতে পারলেন যে, 'আদী ইবন আরতাত মদ থেকেও 'উশর আদায় করছেন। তাঁকে লিখলেন, বায়তুল মালে কেবল হালাল মাল ঢোকান।[১৭০]

আঞ্চলিক ওয়ালীদেরকে তিনি সাদাকায়ে ফিতরের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন এভাবে :[১৭১]

مُرُوا من كان قبلكم فلا يبقى أحد من أحرارهم ولامماليكهم صغيرا ولاكبيرا، ذكرا ولا أنثى، إلا أخرج عنه صدقة فطر رمضان؛ مُدَّيْن من قمح، أو صاعا من تمر، أو قيمة ذلك نصف درهم، فأما أهل العطاء فيؤخذ ذلك من أعطياتهم عن أنفسهم وعيالاتهم، واستعملوا على ذلك رجلين من أهل الأمانة يقبضان ماجتمع من ذلك ثم يقسمانه في مساكين أهل الحاضرة، ولا يُقسم على أهل االبادية.

---

১৬৯. প্রাগুক্ত; জামহারাতু রাসায়িল আল-'আরাব-২/৩৭১
১৭০. তাবাকাত-৫/২৮০
১৭১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/১৭১

"তোমাদের পূর্বে যারা সেখানে আছে তাদেরকে নির্দেশ দাও, তাদের স্বাধীন-দাস, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ কেউই রমাদানের সাদাকায়ে ফিতর আদায় থেকে রেহাই পাবে না। প্রত্যেকের জন্য দুই মুদ গম অথবা এক সা' খোরমা অথবা এর মূল্য অর্ধ দিরহাম। ভাতা প্রাপ্তদের ভাতা থেকে তাদের নিজেদের ও পরিবার-পরিজনদের সাদাকা কেটে রাখা হবে। আর সাদাকা সংগ্রহের জন্য দু'জন বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ কর। যারা সংগ্রহ করবে, অতঃপর স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করবে। তবে পল্লীবাসী বেদুঈনদের মধ্যে বণ্টন করবে না।"

এ সকল সংস্কারমূলক কাজ করার সাথে সাথে এ বিষয়েও সতর্ক ছিলেন, যেন কোনভাবেই যাকাত-সাদাকা আদায়ে কোন অন্যায় করা না হয়। প্রথমদিকে বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রধান প্রধান সড়কে বসে যাকাত আদায় করা হতো, কিন্তু যখন জানতে পারলেন, এ পদ্ধতিতে মানুষ নানাভাবে ফায়দা উঠাচ্ছে তখন তা বাতিল করেন এবং তার পরিবর্তে প্রত্যেক শহর ও জনপদে একজন করে যাকাত-সাদাকা আদায়কারী নিয়োগ দেন।[১৭২]

রাজস্ব খাতে এত উদারতা প্রদর্শন ও ছাড় দেওয়া সত্ত্বেও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময় যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হতো তা রীতিমত বিস্ময়কর। তাঁর সময়ের সাথে হাজ্জাজের অত্যাচার-উৎপীড়নমূলক সময়ের কোন তুলনাই চলে না। 'উমার নিজেই গর্বের সাথে বলতেন, হাজ্জাজের উপর আল্লাহর লা'নত! তার না ছিল কোন ধর্মীয় যোগ্যতা, আর না ছিল পার্থিব যোগ্যতা। হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) ইরাক থেকে ১০ কোটি ৮০ লাখ দিরহাম, যিয়াদ ১০ কোটি ২৫ লাখ দিরহাম আদায় করতেন। হাজ্জাজ জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও সেখান থেকে মাত্র দু'কোটি আশি লাখ আদায় করতে সক্ষম হয়। সে কৃষকদেরকে বিশ লাখ দিরহাম ঋণ দেয় এবং এক কোটি ষাট লাখ দিরহাম আদায় করে। কিন্তু ইরাক যখন আমার অধীনে আসে তখন আমি সেখান থেকে দশ কোটি চব্বিশ লাখ দিরহাম আদায় করি। আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) সময়ের চাইতেও বেশী আদায় করবো।[১৭৩]

মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বাজারের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মনে করতেন, কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ, এ সম্পর্কে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের একটি বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। প্রখ্যাত তাবি'ঈ ছাওবান একদিন 'উমারকে বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! আপনার পূর্ববর্তীদের সময় জিনিস পত্রের দাম অনেক কম ছিল, কিন্তু আপনার সময়ে অনেক বেড়ে গেছে– এমন হলো কেন? তিনি জবাব দিলেন : আমার পূর্ববর্তীরা যিম্মী (অমুসলিম)-দের উপর তাদের সাধ্যের বাইরে ট্যাক্সের বোঝা

---

১৭২. তাবাকাত-৫/২৮৩

১৭৩. আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১২৪

চাপাতো। সুতরাং তা পরিশোধের জন্য তারা তাদের হাতে যা কিছু থাকতো লোকসান দিয়ে বিক্রী করতে বাধ্য হতো। আমি কারো উপর তার সাধ্যের বাইরে কোন বোঝা চাপাই না। সুতরাং মানুষ তার ইচ্ছে মত বেচা-কেনা করতে পারে। ছাওবান বললেন : আপনি যদি মূল্য নির্ধারণ করে দিতেন, ভালো হতো। বললেন : এ ব্যাপারে আমাদের কোন ইখতিয়ার নেই। মূল্যের ব্যাপারটি আল্লাহর অধিকারে।[১৭৪]

মূলতঃ তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। একবার লোকেরা রাসূলে কারীমকে বলেন : জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে, আপনি দাম নির্ধারণ করে দিন। রাসূল (সা) বললেন :

إن السعر غلاؤه ورخصه بيد الله.

–জিনিসপত্রের দাম বাড়া-কমা সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে।[১৭৫]

বায়তুল মালের ব্যয় সংস্কার

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে বায়তুল মালের সংস্কার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো :

১. বায়তুল মাল হলো রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের আয়ের সামষ্টিক নাম। যার আয় ও ব্যয়ের খাতসমূহ ভিন্ন ভিন্নভাবে সংরক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পূর্বে রাষ্ট্রের যাবতীয় আয় একই স্থানে জমা হতো। কিন্তু তিনি এর আয়-ব্যয়ের খাতসমূহ পৃথক পৃথকভাবে হিসাব রাখার নিয়ম চালু করেন। ফলে যাকাত, খুমুস, ফাই ও মালে গনীমতের আলাদা আলাদা হিসাব রাখা হতো।

২. বায়তুল মাল প্রকৃতপক্ষে খিলাফতের সকল মুসলমানের সম-অংশীদারিত্বের সঞ্চিত অর্থ। এ থেকে প্রত্যেক মুসলমান সমানভাবে উপকার লাভ করতে পারে। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পূর্বে উমাইয়্যা খান্দানের লোকেরা সাধারণ মুসলমানদের থেকে ভিন্নভাবেপ্রাপ্ত এ অর্থ থেকে বিশেষ বিশেষ ভাতা লাভ করতো এবং বিশেষ ভাতা নামে চালু ছিল। 'উমার এটা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন।

৩. স্তুতিমূলক কবিতার বিনিময়ে বায়তুল মাল থেকে কবিদেরকে যে উপহার-উপঢৌকন বা পুরস্কার দেওয়া হতো 'উমার তা একেবারেই বন্ধ করে দেন। একবার কবি জারীর একটি এ জাতীয় কবিতা পাঠ করলে 'উমার বলেন, আল্লাহর কিতাবে তোমার কোন অধিকারের কথা বলা হয়নি। জারীর বললেন, আমি তো একজন মুসাফিরও। সেখানে তো মুসাফিরের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তারপর তিনি নিজের অর্থ থেকে জারীরকে পঞ্চাশটি দীনার দেন।

৪. 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতের পূর্ব থেকে নিয়ম ছিল যে, সরকারী কর্মকর্তারা যখন 'ঈশা ও ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে যেত তখন এক ব্যক্তি প্রদীপ

---

১৭৪. কিতাবুল খারাজ-১৩২

১৭৫. প্রাগুক্ত-৪৯

হাতে নিয়ে তাদের আগে আগে চলতো। জুম'আর দিন ও রমাদান মাসে মসজিদে নববীতে সুগন্ধি কাঠ জ্বালানো হতো। বায়তুল মাল থেকে এ সবকিছুর ব্যয় নির্বাহ করা হতো। 'উমার উপরোক্ত কাজের জন্য বায়তুল মাল থেকে বরাদ্দ বন্ধ করে দেন।[১৭৬]

খলীফা সুলায়মানের খিলাফতের একেবারে শেষ পর্যায়ে মদীনার ওয়ালী 'আবূ বকর ইবন হাযম সরকারী দফতরে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দকৃত কাগজ, কলম, দোয়াত, মোমবাতি বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে খলীফাকে একটি পত্র লেখেন। সুলায়মান তার ব্যবস্থা করে যেতে পারেননি। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হলেন। পত্রটি তাঁর সামনে উপস্থাপিত হলো। জবাবে তিনি লিখলেন :

ولعمرى لقد عهدتك يابن أم حازم وأنت تخرج من بيتك فى الليلة الشاتية المظلمة من غير مصباح، ولعمرى أنت يومئذ خير منك اليوم، ولقد كان فى فتائل أهلك مايغنيك، والسلام.

"ওহে উম্মু হাযিমের ছেলে আবূ বকর! আমার স্মরণ আছে যে, এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে শীতের অন্ধকার রাতেও আপনি মোমবাতি এবং অন্য কোন প্রদীপ ছাড়াই পথে বের হতেন। আপনার সেই অবস্থা আজকের এই অবস্থা থেকে উত্তম ছিল। আমার ধারণা, আপনার ঘরের মোমবাতি এবং প্রদীপ দ্বারাই আপনার কাজ সারা উচিত।"

এ ধরনেরই একটি দরখাস্তের জবাবে যাতে সরকারী প্রয়োজনে কাগজ চাওয়া হয়েছিল, তিনি আবূ বকর ইবন হাযমকে লিখেছিলেন :[১৭৭]

فإذا جاءك كتابى هذا فأدقَّ القلم واجمع الخط واجمع الحوائج الكثيرة فى الصحيفة الواحدة، فإنه لا حاجة للمسلمين فى فضل قولٍ أضرَّ ببيت مالهم، والسلام عليكم.

"আমার পত্র পাওয়ার পর আপনি কলম চিকন করে নিবেন, ছোট ছোট অক্ষরে ঘন করে লিখবেন এবং এক পৃষ্ঠায় অনেক জরুরী বিষয় লিপিবদ্ধ করবেন। মুসলমানদের এমন লম্বা-চওড়া কথার প্রয়োজন নেই, যার কারণে তাদের বায়তুল মালের ক্ষতি হয়। ওয়াস্ সালামু 'আলাইকুম!"

উল্লেখ্য যে, 'উমারের লিখিত কোন ফরমান এক বিঘাতের বেশী হতো না।[১৭৮]

৫. বায়তুল মালের অন্যতম আয় হলো খুমুস (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ)। এ অর্থ ব্যয়ের পাঁচটি খাত কুরআন-সুন্নাহ নির্ধারিত। এর বাইরে অন্য কোথাও এ অর্থ ব্যয় করা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পূর্ববর্তী উমাইয়্যা খলীফারা এই অর্থ ব্যয়ের নির্ধারিত খাতসমূহের কোন পরোয়া করতেন না। খুমুস ব্যয়ের

---

১৭৬. তাবাকাত-৫/২৯৫; ইবনুল জাওযী-৮১
১৭৭. জামহারাতু রাসায়িল আল-'আরাব-২/২৮৩
১৭৮. তাবাকাত-৫/২৯৬

অন্যতম প্রধান খাত হলো আহ্লি বায়ত তথা নবী-খান্দানের লোকেরা। পরিতাপের বিষয় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর পূর্ববর্তী দু'জন খলীফা– ওয়ালীদ ও সুলায়মানকে বিষয়টি বার বার বুঝানো সত্ত্বেও তাঁরা আহ্লি বায়তকে তাঁদের এই অধিকার থেকে একেবারেই বঞ্চিত করেন। 'উমার খলীফা হওয়ার পর খুমুসের অর্থ সঠিক খাতসমূহে ব্যয় করেন এবং আহ্লি বায়তকে তাদের অংশ প্রদান করেন।

বায়তুল মাল রক্ষণাবেক্ষণে কঠোর ব্যবস্থা

বায়তুল মাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। একবার য়ামনের বায়তুল মাল থেকে একটি দীনার হারিয়ে গেল। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সেখানের বায়তুল মালের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে লিখলেন, আমি আপনার সততায় সন্দেহ পোষণ করছিনে। তবে আপনার উদাসীনতাকে অপরাধ বলছি এবং মুসলিম উম্মাহ্র পক্ষ থেকে তাদের অর্থের দাবী করছি। শরী'আতের বিধান মত আপনার কসম খাওয়া ফরয।[১৭৯]

খুরাসানের ওয়ালী ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাব ইবন আবী সুফরাকে অর্থ-আত্মসাতের অপরাধে বরখাস্ত করে জেলে ঢুকিয়ে দেন।[১৮০]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) বায়তুল মালকে ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত তহবিলের অবস্থান থেকে উদ্ধার করে পুনরায় জনগণের গচ্ছিত সম্পদের মর্যাদায় ফিরিয়ে আনেন এবং জনগণের প্রয়োজন পূরণের জন্য এ সম্পদ নির্দিষ্ট করে দেন। সুতরাং এ সম্পদের বড় একটি অংশ জনসাধারণের কল্যাণে ব্যয়িত হতে থাকে। খিলাফতের সকল পঙ্গু-অক্ষমদের নামের একটি তালিকা তৈরি করা হয়। সেই তালিকা অনুযায়ী সকলকে ভাতা দেওয়া হতো।[১৮১] কোন কর্মকর্তা এ ব্যাপারে সামান্য উদাসীনতা দেখালে অথবা পরিবর্তন করলে তাকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হতো। দিমাশ্কের বায়তুল মাল থেকে একজন পঙ্গুর ভাতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মায়মূন ইবন মিহরান বলেন, এদের সংগে ভালো আচরণ তো করতে হবে, কিন্তু সুস্থ-সবলদের সমপরিমাণ ভাতা দেওয়া যায় না। একথা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) কানে পৌঁছলে তিনি তাঁকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ভাষায় পত্র লেখেন।[১৮২]

অনেকে নগদ অর্থের পরিবর্তে দ্রব্য-সম্ভার লাভ করতো। প্রত্যেককে মাথা প্রতি চার "আরুব" পরিমাণ খাদ্যশস্য দেওয়া হতো। ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত ছিল এক "মুদ" পরিমাণ শস্য। দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্যও ভাতা নির্ধারিত ছিল। দেশব্যাপী সাধারণ লঙ্গরখানা চালু ছিল, সেখান থেকে অভাবী ও দুঃস্থরা খাবার পেত।[১৮৩]

---

১৭৯. ইবনুল জাওযী-৮৫
১৮০. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩১৩
১৮১. আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা-৫/৮০
১৮২. তাবাকাত-৫/২৮১
১৮৩. প্রাগুক্ত-৫/২৫৫, ২৭৯

যাকাত-সাদাকার অর্থ একটু ব্যাপকভাবে বিলি-বণ্টন করা হতো। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ বণ্টনের জন্য 'রাক্কা' পাঠাতে চান। লোকটি আপত্তি জানিয়ে বললো, আপনি আমাকে এমন এক স্থানে পাঠাচ্ছেন যেখানে আমি কাউকে চিনি না। সেখানে ধনী-গরীব সবই আছে। 'উমার বললেন, যে কেউ তোমার দিকে হাত বাড়াবে তাকে দিবে।[১৮৪]

এছাড়া অসংখ্য ধরনের জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করেন। এমন উদারভাবে খরচ করায় বায়তুল মালের উপর ভীষণ চাপ পড়তো। কোন কোন কর্মকর্তা এদিকে খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে জবাবে তিনি লেখেন : যতক্ষণ থাকে দিতে থাক।[১৮৫]

যিম্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা

কোন রাষ্ট্র বা সরকারের আদল-ইনসাফ ও জুলুম-অত্যাচারের একটি বড় মাপকাঠি হলো অন্য সম্প্রদায় ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সংগে তার আচরণ ও কর্মপদ্ধতি। এই মাপকাঠিতেও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) আমল ছিল আগাগোড়া আদল-ইনসাফে পরিপূর্ণ। যেভাবে তিনি যিম্মীদের অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং তাদের সঙ্গে যেমন কোমল আচরণ করেন তার উদাহরণ কেবল দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) খিলাফতকাল ছাড়া আর কোন কালে পাওয়া যাবে না। মুসলমানদের মত তাদেরও জান-মালের হিফাজত করেন। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় কোন রকম হস্তক্ষেপ করেননি, তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায়ে অত্যন্ত নমনীয় ও সহজ পন্থা অবলম্বন করেন। খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নিকট সময় সময় তিনি যিম্মীদের সম্পর্কে যে সকল উপদেশাবলী লিখে পাঠাতেন তাতেই তাঁর এ সংক্রান্ত কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

একবার 'আদী ইবন আরতাতকে লিখলেন, যিম্মীদের সাথে নমনীয় ব্যবহার করবেন। তাদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ ও অসহায় হয়ে পড়বে তাদের দেখাশুনা করবেন। তাদের কোন আত্মীয়-স্বজন থাকলে দেখাশুনার নির্দেশ দিবেন। যেমন আমাদের কোন দাস বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাকে মুক্ত করে দিতে হয় অথবা আমরণ তার দেখাশুনা ও সেবা করতে হয়।

যিম্মীর রক্তের মূল্য মুসলমানদের রক্তের সমান করে দেওয়া হয়। একবার হীরার একজন মুসলমান একজন যিম্মীকে হত্যা করে। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সেখানের ওয়ালীকে লিখলেন, হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের নিকট অর্পণ কর। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা অথবা মাফ করে দিতে পারে। খলীফার নির্দেশ মত কাজ করা হয় এবং নিহত যিম্মীর বদলা হিসেবে ঘাতককে হত্যা করা হয়।

কোন মুসলমান কোন যিম্মীর অর্থ-সম্পদের প্রতি অবৈধভাবে হাত বাড়ানোর দুঃসাহস করতো না। কেউ এমন করলে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো। একবার রাবী'আ

---

১৮৪. প্রাগুক্ত-২৭২
১৮৫. যুরকানী, শারহু মুওয়াত্তা-৪/২৩৭

শা'উযী নামে একজন মুসলমান একটি সরকারী কাজে বিনা ভাড়ায় একজন নাবাতী যিম্মীর একটি ঘোড়া ধরে নেয় এবং তার পিঠে আরোহণ করে। 'উমার তাকে এজন্য চল্লিশটি চাবুক মারেন।[১৮৬]

একবার তাঁর একজন কর্মকর্তা একজন যিম্মীর নিকট থেকে কিছু জ্বালানী কাঠ নিলে তিনি কাঠের মালিক যিম্মীকে ন্যায্য মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দেন।[১৮৭]

জবর দখলকৃত সম্পত্তি ফেরতদানের সময় যিম্মীদের ভূ-সম্পত্তিও ফেরত দেওয়া হয়। 'আব্বাস ইবন আল-ওয়ালীদ ও এক যিম্মীর এ সম্পর্কিত একটি বিরোধের ঘটনায় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যে সিদ্ধান্ত দান করেন তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী খলীফাদের সময়ে তাদের ধর্মীয় অধিকার বলতে তেমন কিছু অবশিষ্ট ছিল না। তিনি আবার নতুন করে তাদের সে অধিকার দান করেন। দিমাশকে দীর্ঘদিন ধরে একটি গীর্জা একটি মুসলিম খান্দানের জমিদারীতে চলে আসছিল। খৃস্টানরা সেটি ফিরে পাওয়ার জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) নিকট দাবী জানায়। তিনি ফিরিয়ে দেন। একজন মুসলমান একটি গীর্জা সম্পর্কে দাবী করে যে সেটি তার জমিদারীর মধ্যে। 'উমার বললেন, যদি এটি খৃস্টানদের চুক্তির মধ্যে পড়ে তাহলে তুমি তা পেতে পার না।[১৮৮]

দিমাশকে খৃস্টানদের সবচেয়ে বড় গীর্জাটি ছিল ইউহান্না। হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) ও 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান এটি সর্বাধিক মূল্যে ক্রয় করে মসজিদে ঢুকিয়ে নিতে চান। কিন্তু খৃস্টানরা রাজী হলো না। খলীফা ওয়ালীদও চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি জোরপূর্বক গীর্জাটি ভেঙ্গে ফেলে মসজিদের অংশ বানিয়ে ফেলেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হওয়ার পর খৃস্টানরা উক্ত গীর্জাটি ফিরে পাওয়ার আবেদন জানায়। তিনি গীর্জাটি তাদের ফিরিয়ে দেন। এতে মুসলমানরা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়। অবশেষে তিনি গোতে নামক স্থানের সকল গীর্জা খৃস্টানদের হাতে অর্পণ করে উক্ত গীর্জাটির উপর থেকে তাদের দাবী প্রত্যাহারে সম্মত করান।[১৮৯]

জিযিয়া আদায়ে যত অনিয়ম চালু হয়েছিল তিনি তা সব বন্ধ করে দিয়ে সহজ পদ্ধতি চালু করেন। ইবনু আশ'আছকে তার বিদ্রোহে সহযোগিতার অভিযোগে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ইরাকের যিম্মীদের জিযিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। 'উমার তা আবার কমিয়ে দেন।[১৯০]

তাঁর সময়ে যিম্মীদের সাথে যে নমনীয় আচরণ করা হয় তার ফলে সাধারণ মানুষকে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এর ফলে খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে যায়।

---

১৮৬. তাবাকাত-৫/২৭৬; ইবনুল জাওযী-১০২, ১০৫
১৮৭. আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার-১৬৬
১৮৮. আল-বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান-১৩০
১৮৯. প্রাগুক্ত
১৯০. প্রাগুক্ত

শাহী খান্দানের সদস্য ও যিম্মীদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করেন। একবার হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক এক খৃস্টানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এজলাসে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয দু'জনকে এক স্থানে পাশাপাশি দাঁড় করান। হিশাম আত্ম-অহমিকার কারণে খৃস্টান লোকটিকে শক্ত কথা বলেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাকে ধমক দেন এবং শাস্তি দানের হুমকি দেন।

একবার তাঁর শ্যালক মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক ও দায়রে ইসহাকের কিছু যিম্মী বাদী-বিবাদী হিসেবে খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়। মাসলামা একদিকে রাজ পরিবারের সদস্য অন্যদিকে খোদ খলীফার নিকট আত্মীয়। তাই দরবারে ঢুকেই গালিচার উপর গিয়ে বসে পড়েন। অপরদিকে বাদী বেচারা যিম্মীগণ ঠাঁয় দাড়িয়ে থাকে। ব্যাপারটি খলীফা 'উমারের দৃষ্টিতে পড়তেই মাসলামাকে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন! এমন হতে পারে না। যদি তোমার প্রতিপক্ষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে অপমান বোধ কর তাহলে কাউকে উকিল নিয়োগ করতে পার। মাসলামা তাই করেন। বিচারে খলীফা যিম্মীদের পক্ষে রায় দেন।

জনগণের আয় ও সচ্ছলতা বৃদ্ধি

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) এ এক বড় বরকত যে, অবৈধ আয়ের সকল উৎস বন্ধ এবং ব্যয়ের কল্যাণমূলক খাতের বৃদ্ধি সত্ত্বেও বায়তুল মালের উপর তেমন বিশেষ কোন প্রভাব পড়েনি। বরং কোন কোন প্রদেশের রাজস্ব আয় বিস্ময়করভাবে বেড়ে যায়। ইরাকের আয় হাজ্জাজের জুলুম-অত্যাচারের সময়ের চেয়েও বেড়ে যায়।

জুলুম-অত্যাচার বন্ধকরণ, বেআইনী ট্যাক্স-কর রহিতকরণ, যিম্মীদের সাথে সদাচরণ এবং ব্যাপক দান-খায়রাত সত্ত্বেও দেশের আর্থিক অবস্থার দারুণ উন্নতি ঘটে এবং জনসাধারণের সচ্ছলতাও বৃদ্ধি পায়। দেশের কোথাও অভাব ও দারিদ্র্যের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল না। মুহাজির ইবন ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন যে, আমরা যাকাতের অর্থ বণ্টন করতাম। দেখতাম, এ বছর যারা যাকাত নিচ্ছে পরের বছর তারাই অন্যকে যাকাত দিচ্ছে।

হযরত যায়দ ইবন আল-খাত্তাবের (রা) বংশধরদের একজন বলেন :[১৯১]

إنما وَلِي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفًا، فذلك ثلاثون شهرًا، فما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح بماله يتذكر من يضعه فيهم فما يجده،فيرجع بماله، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس.

---

১৯১. ইবনুল জাওযী-১২৮; রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৫৮

১২−

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) মাত্র আড়াইবছর খিলাফতের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পান। এ স্বল্প সময়ে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, মানুষ স্থানীয় কর্মকর্তাদের নিকট তাদের যাকাতের অর্থ নিয়ে আসতো ফকীর-মিসকনদের মধ্যে বন্টনের জন্য। কিন্তু কোন প্রার্থীকে পাওয়া যেত না। ফলে সে অর্থ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। তাঁর সময়ে মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা এত বৃদ্ধি পায় যে, কোথাও কোন অভাবী মানুষ ছিল না।"

ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ বলেন :[১৯২]

بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها، وطلبت فقراء نعطيها فلم نجدبها فقيرا، ولم نجد من يأخذها مني، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، فاشتريت بها رقابا فاعتقتهم، وولاؤهم للمسلمين.

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) আমাকে যাকাত আদায় ও বন্টনের জন্য আফ্রিকায় পাঠালেন। আমরা যাকাত আদায় করলাম, তারপর বন্টনের জন্য গরীব-মিসকীন খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু কোথাও কোন ফকীর-মিসকীন পেলাম না। আমাদের নিকট থেকে সে অর্থ নেওয়ার মত কাউকে পেলাম না। অগত্যা সে অর্থ দিয়ে কিছু দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দিলাম এই শর্তে যে, তাদের وَلاَءٌ বা উত্তরাধিকার পাবে মুসলিম উম্মাহ্।"

তাঁর সময়ে জনগণের সচ্ছলতা এত পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যে, মানুষের মধ্যে গর্ব ও অহঙ্কার সৃষ্টি হওয়ার মারাত্মক সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই 'আদী ইবন আরতাত খলীফাকে লিখলেন, বসরাবাসী এত বেশী সচ্ছল হয়েছে যে, আমার আশঙ্কা হয় গর্ব-অহঙ্কারে লিপ্ত হয়ে না পড়ে। তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ যখন জান্নাতবাসীকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তখন নির্দেশ দিবেন তারা যেন বলে— আল-হামদু লিল্লাহ। তাই আপনারাও তাদেরকে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করার নির্দেশ দিন।[১৯৩]

একবার মদীনা থেকে এক ব্যক্তি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট আসলো। তিনি মদীনাবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে বললেন, সেই হত-দরিদ্র লোকগুলোর এখন কি অবস্থা যারা অমুক অমুক স্থানে বসতো? লোকটি বললো, এখন তারা সেখানে আর বসে না। আল্লাহ তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। উল্লেখ্য যে, এই দরিদ্র লোকগুলো পথের ধারে বসে বাইরে থেকে আগত লোকদের নিকট টোটকা ঔষধ বিক্রী করতো। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে যখন তাদের নিকট সেই ঔষধ চাওয়া হলো তখন তারা জানালো 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দান ও অনুগ্রহ আমাদেরকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে।[১৯৪]

---

১৯২. ইবনুল জাওযী-৬৯; আ'জামু 'উজামা' আল-ইসলাম-১৪৭
১৯৩. তাবাকাত-৫/২৮২
১৯৪. ইবনুল জাওযী-৭৬

জনসাধারণের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার উপরের চিত্রগুলো সামনে রাখলে সঙ্গত কারণে সকলের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়। আর সেই প্রশ্নটি হলো, এই সচ্ছলতার পিছনে কি কি কারণ কাজ করেছে? আমরা বলবো সেই কারণগুলো খোঁজার জন্য বেশী শ্রম ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের জীবন-ইতিহাসের যে কোন একটি অধ্যায় পাঠ করলেই সেই কারণগুলো দৃষ্টিগোচর হবে। এখানে বিশেষ কয়েকটি কারণ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. ইসলামী খিলাফতে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করতো সম্পূর্ণ বায়তুল মালের উপর। খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয দেশের সকল নাগরিকের জন্য বায়তুল মালের দরজা খুলে দেন। ধনী-গরীব সকলে সমানভাবে তার থেকে উপকার লাভ করতো। যেমন একবার এক ব্যক্তিকে রাক্কায় অর্থ বন্টনের জন্য পাঠাতে চাইলেন। সে বললো, আপনি আমাকে এমন এক স্থানে পাঠাচ্ছেন যেখানে আমি কাউকে চিনিনে। সেখানে তো ধনী-গরীব সব ধরনের লোক আছে। বললেন : যে কেউ তোমার সামনে হাত বাড়াবে তাকে দিবে।[১৯৫]

রাষ্ট্রের সকল পঙ্গু-অক্ষমদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে তা চালু রাখেন। এ ক্ষেত্রে কোন কর্মচারী-কর্মকর্তা কোন রকম গাফলতি দেখালে তাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতেন। একবার দিমাশকের বায়তুল মাল থেকে একজন পঙ্গুর ভাতা নির্ধারণ করা হলে একজন কর্মকর্তা মন্তব্য করে, এদের ভাতা দেওয়া যেতে পারে, তবে তা সুস্থ ব্যক্তিদের সমান নয়। একথা খলীফা 'উমারের কানে গেলে তাকে ভীষণ তিরস্কার করেন।[১৯৬]

দেশের যত মুসলিম শিশু ছিল তাদের প্রত্যেকের জন্য ভাতা চালু করেন। মুহাম্মাদ ইবন 'উমার বলেন, আমি হিজরী ১০০ সনে জন্মগ্রহণ করি। জন্মের পর ধাত্রী আমাকে আবূ বকর ইবন হাযমের নিকট নিয়ে যায়। তিনি আমাকে এক দীনার ভাতা দেন। হায়ছাম ইবন ওয়াকিদ বলেন, আমার জন্ম হয় হিজরী ৯৭ সনে। এরপর 'উমার খলীফা হন। তাঁর খিলাফতকালে আমি বছরে তিন দীনার ভাতা পেতাম। এ ভাতা সকল স্তরের মানুষ সমানভাবে লাভ করতো। যারা আভিজাত্যের অহমিকায় বিভোর ছিল তারা এখন সমতা দেখে তাঁর থেকে দূরে সরে যায়। আরব-অনারব সকলের ভাতায় সমতা ছিল। কেবল মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের কিছু পার্থক্য ছিল। তারা পেত ২৫ দিরহাম।[১৯৭]

মাঝে মাঝে অতিরিক্ত ভাতাও দেওয়া হতো। একবার দশ দীনার, মতান্তরে দশ দিরহাম করে আরব-অনারব সকলকে অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করা হয়। এতে তারা দারুণ উপকার লাভ করে।

এমন উদার কর্মপদ্ধতি গ্রহণের ফলে বায়তুল মালের উপর ভীষণ চাপ পড়ে। কিছু

---

১৯৫. যুরকানী, শারহু মুওয়াত্তা-৪/২৩৭
১৯৬. তাবাকাত-৫/২৮১
১৯৭. প্রাগুক্ত-৫/২৫৪, ২৫৫, ২৭৭

কর্মকর্তা সেদিকে খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণও করে। কিন্তু তিনি তাদের পরামর্শে কর্ণপাত করেননি। তিনি তাদেরকে লেখেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থ আছে দিতে থাক। যখন কিছুই থাকবে না তখন খড়-কুটো দিয়ে বায়তুল মাল ভরে দাও।[১৯৮]

ভাতা ও সাহায্য কর্মসূচী ছাড়াও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতি চালু করেন। যেমন :

(ক) একটি সাধারণ লঙ্গরখানা চালু করেন, সেখান থেকে দুঃস্থ মানুষদের খাবার সরবরাহ করা হতো।

(খ) প্রত্যেকটি মানুষের জন্য সমান পরিমাণ খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হতো।

(গ) গরীব মানুষদের নিকট কোন জাল ও অচল মুদ্রা থাকলে তা বদল করে চালু মুদ্রা প্রদানের নির্দেশ দেন।

(ঘ) বায়তুল মাল থেকে ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়।

(ঙ) জেল-বন্দীদের ভাতা চালু করেন।

(চ) কোন অপরাধ বা অন্য কোন কারণে যে সকল লোকের ভাতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাদের সকল বকেয়া ভাতা প্রদান করেন।

২. পূর্ববর্তী খলীফাদের সময়ে দেশের অভাব ও দারিদ্র্যের একটা বড় কারণ এই ছিল যে, খলীফা ও সরকারী কর্মকর্তারা সাধারণ নাগরিকের অর্থ-সম্পদ জোর করে হাতিয়ে নিত। চিরদিনের জন্য তা তাদের মালিকানায় পরিণত হতো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এ জাতীয় সকল সম্পদ তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দেন। এমনকি এই কর্মকাণ্ডে বায়তুল মাল থেকেও অর্থ প্রদান করেন। তাঁর কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ অন্য কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে বলে তিনি যদি জানতে পেতেন তাহলে সাথে সাথে তা ফেরৎ দানের কঠোর ব্যবস্থা করেছেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁর নিকট অভিযোগ করে যে, আযারবায়জানের গভর্ণর অন্যায়ভাবে তার নিকট থেকে বারো হাজার দিরহাম নিয়ে বায়তুল মালে জমা দিয়েছে। তিনি তক্ষুণি এই অর্থ ফেরত দানের নির্দেশ দেন। একবার এক ব্যক্তি এসে অভিযোগ করলো যে, রাজকীয় সেনাবাহিনীর গমনাগমনের কারণে তার একটি কৃষি ক্ষেত একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তিনি তাকে দশ হাজার দিরহাম ক্ষতিপূরণ দেন।

৩. বায়তুল মাল থেকে জনসাধারণ যা কিছু লাভ করতো তা দানের ক্ষেত্রে তো যথেষ্ট উদারতা ছিল, কিন্তু মানুষের নিকট থেকে আদায়কৃত যে অর্থ বায়তুল মালে জমা হতো তার মধ্যে অনেক অর্থকে তিনি অবৈধ বলে ঘোষণা দেন। যাকাত খাতে পূর্বে অতিরিক্ত যা কিছু আদায় করা হতো তা তিনি মওকুফ করে দেন।

একবার তাঁর এক যাকাত আদায়কারী ফিরে এলে তিনি আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ জানতে চান। সে পরিমাণ জানালে তিনি আবার জানতে চান তোমার পূর্বে কত আদায়

১৯৮. ইবনুল জাওযী-৮৫

হতো? সে বেশী পরিমাণের কথা বললো। তিনি বললেন, এই অতিরিক্ত অর্থ কোথা থেকে এবং কিভাবে আদায় হতো? বলা হলো, আমীরুল মু'মিনীন! পূর্বে ঘোড়া প্রতি এক দীনার, দাস প্রতি এক দীনার এবং জমির একর প্রতি পাঁচ দিরহাম আদায় করা হতো। কিন্তু আপনি তো এসব মওকুফ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি নই, আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন।[১৯৯]

খাজনা আদায়ের ব্যাপারে যাতে কোন রকম অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা না হয় সে ব্যাপারে তিনি কঠোর নির্দেশ দেন। তিনি মায়মূন ইবন মিহরানকে লেখা একটি পত্রে লেখেন, আমি বিচার-ফায়সালা, খাজনা ও জিযিয়া আদায়ে আপনাকে বাড়াবাড়ি করার জন্য বাধ্য করিনি। যা কিছু আদায় করবেন হালাল সম্পদ থেকে আদায় করবেন এবং মুসলমানদের জন্য কেবল হালাল ও পবিত্র সম্পদ জমা করবেন।[২০০]

যদি কখনো জানতে পারতেন যে, খাজনা-ট্যাক্স আদায়ে কোথাও অন্যায় ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, সাথে সাথে তা কঠোরভাবে বন্ধ করার নির্দেশ দিতেন এবং তদন্তের জন্য তদন্তকারী দল পাঠাতেন। যেমন একবার ইরানে ফল ক্রয়-বিক্রয় ও 'উশর আদায়ের ব্যাপারে ঘটেছিল এবং তিনি একটি তদন্তকারী দল পাঠিয়েছিলেন।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পূর্ববর্তী খলীফাগণ যিম্মীদের নিকট থেকে অস্বাভাবিক কঠোরতার সাথে জিযিয়া আদায় করতেন। এ কারণে ফল ও শস্য পাকা ও কাটার মওসুমে তারা কম মূল্যে উৎপাদিত ফল ও শস্য বিক্রী করে জিযিয়া পরিশোধ করে নানা বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই পেত। এ ক্ষেত্রে 'উমার তাদেরকে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দান করেন। এ কারণে তাঁর সময়ে উৎপাদিত শস্যের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পায়।[২০১] কিন্তু এতে যিম্মীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে।

এখন তাঁর সময়ে দেশের সার্বিক আর্থিক সচ্ছলতা ও উন্নতির কারণসমূহের উপর সার্বিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে বায়তুল মালের সকল অর্থ জনগণের জন্য ব্যয় হচ্ছে, সকল শ্রেণীর জনগণ ভাতা পাচ্ছে, পঙ্গু, অক্ষম, বৃদ্ধ, শিশু, আরব, অনারব সকলে সমান সুবিধা লাভ করছে। বেতন-ভাতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, লঙ্গরখানায় খাবার পাচ্ছে, রেশনে সবাই খাদ্যশস্য লাভ করছে, গরীব-দুঃস্থদের হাতে আসা অচল মুদ্রা বায়তুল মাল থেকে বদলে দেওয়া হচ্ছে, জনসাধারণের জোর-জবরদস্তী দখলকৃত সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বায়তুল মাল থেকে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত ট্যাক্স মওকুফ করা হচ্ছে, জিযিয়া-খাজনার বোঝা লাঘব হচ্ছে এবং তা আদায়ের পদ্ধতিও সহজ করা হচ্ছে, দেশের উৎপাদিত শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে– এসব দ্বারা বুঝা যায়, যে দেশ, যে জাতি এবং যে রাষ্ট্র ও সরকারে এ সকল বৈশিষ্ট্য থাকবে সেখানে অবশ্যই শান্তি, প্রগতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিদ্যমান থাকবে। 'উমার ইবন

---

১৯৯. তাবাকাত-৫/২৭৭

২০০. ইবনুল জাওযী-৯৫

২০১. কিতাবুল খারাজ-৭৬

'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে উপরে উল্লেখিত কারণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের সমাবেশ ঘটেছিল। আর তাই ইমাম আল-বায়হাকীর ধারণা মতে রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তিনিই।

এখানে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সেই বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একদিন তিনি হযরত 'আদী ইবন হাতিমের (রা) সাথে কথা বলেন এভাবে :

ياعدى هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قـال فـان طـالت بـك حيـاة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لاتخاف أحدًا إلا الله... ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى... ولئن طالت بك حياة لـترين الرجـل يخـرج ملء أكفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلايجد أحدا يقبله منه.

"ওহে 'আদী! তুমি কি হীরা দেখেছো? 'আদী বললেন : দেখিনি, তবে হীরার কথা শুনেছি। রাসূল (সা) বললেন : তুমি যদি আরো কিছু দিন জীবিত থাক তাহলে দেখবে উটের পিঠে হাওদা-নশীন একজন মহিলা একাকী হীরা থেকে সফর করে মক্কায় আসবে এবং কা'বা তাওয়াফ করবে। এই সফরে এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন কিছুর ভয় তার থাকবে না।... তুমি যদি আরো কিছু দিন জীবিত থাক তাহলে দেখবে যে, (শাহেন শাহে ইরান) কিসরার ধন ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।... তুমি যদি আরো কিছু দিন বেঁচে থাক তাহলে দেখবে, এক ব্যক্তি তার দু'হাত ভরে সোনা-চান্দি নিয়ে এমন মানুষের খোঁজে বের হবে যে তা গ্রহণ করে। কিন্তু সে কোন গ্রহণকারীকে পাবে না।"

'আদী ইবন হাতিমের জীবনকালে প্রথম দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রত্যক্ষ করে গেছেন। তৃতীয়টি দেখে যাওয়ার সুযোগ পাননি। তৃতীয়টি কবে বাস্তবায়িত হবে সে সম্পর্কে হাদীছ বিশারদদের মতপার্থক্য হয়েছে। অনেকের ধারণা, সেটা হবে হযরত 'ঈসার (আ) পুনঃ আবির্ভাবের পরে। কিন্তু ইমাম আল-বায়হাকীর (রহ) বিশ্বাস, হযরত রাসূলে কারীমের (সা) তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটিও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে বাস্তবায়িত হয়েছে। কারণ, তাঁর সময়ে জনসাধারণের আর্থিক সচ্ছলতা এত বৃদ্ধি পায় যে, যাকাত-সাদাকার অর্থ গ্রহণ করার মত মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না। ইবন হাজার আল-'আসকিলানী (রহ) বায়হাকীর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ, রাসূল (সা) 'আদী ইবন হাতিমকে (রা) বলেন :

"لئن طالت بـك حيـاة – যদি তুমি আরো কিছু দিন জীবিত থাক।" 'ঈসার (আ) আবির্ভাব পর্যন্ত কোনভাবেই তাঁর জীবিত থাকা সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর জীবন কালের নিকটবর্তী 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময়কালকে তিনি বুঝিয়েছেন।[২০২]

---

২০২. ফাতহুল বারী-৬/৪৫১

ইসলামী শরী'আতের পুনরুজ্জীবন

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) একজন সাচ্চা ঈমানদার মুসলমান ছিলেন। এ কারণে তাঁর যাবতীয় সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড দীনী খিদমতের আওতাভুক্ত। তবে একান্তই দীনী খিদমতমূলক বহু কাজ তিনি করেছেন। পূর্ববর্তী উমাইয়্যা খলীফাদের উদাসীনতার ফলে ইসলামী শরী'আতের অনেক কিছুই নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছিল, তিনি তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন, ইসলামী শরী'আত থেকে বিচ্যুৎ সবকিছু আবার সীরাতে মুস্তাকীমে নিয়ে আসেন। আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নামে যে সকল নির্দেশনামা পাঠাতেন তাতে ইসলামী শরী'আতকে জীবিত এবং যাবতীয় বিদ'আত দূর করার তাকীদ থাকতো।

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) পূর্ব পর্যন্ত উমাইয়্যা খলীফাগণ কেবল শাসকই ছিলেন। জনসাধারণের আমল-আখলাকের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার ফুরসুৎ যেমন তাঁদের ছিল না, তেমনি ছিল না এর কোন যোগ্যতাও। এমনকি তখন খলীফাগণ মানুষকে ধর্মীয় উপদেশ ও পরামর্শ দান করবেন এবং তাদের আদব-আখলাক ও আচার-আচরণ দেখাশুনা করবেন, এমন চিন্তাও কেউ করতো না। তখন মনে করা হতো এ কাজ কেবল 'উলামা ও মুহাদ্দিছীন কিরামই করবেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এমন ধারণার অবসান ঘটান এবং নিজেকে প্রকৃত খলীফা প্রমাণ করেন। খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতেই খিলাফতের সামরিক-বেসামরিক আমলা ও কর্মকর্তাদের নিকট যে সকল চিঠি ও ফরমান পাঠান তা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক হওয়ার তুলনায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক বিষয় সম্পর্কিত ছিল। তাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার প্রাণসত্তার চেয়ে পরামর্শ ও উপদেশের রূপই প্রধান হয়ে ফুটে উঠতো। কোন কোন পত্রে তিনি নুবুওয়াত ও খিলাফতে রাশেদার আমলের ইসলামী যিন্দেগী ও সমাজের চিত্র অংকন করেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন ইসলামের অর্থ ব্যবস্থাপনা ও রাষ্ট্র পরিচালন পদ্ধতির। কোন কোন পত্রে তিনি সামরিক কর্মকর্তাদের সময় মত সালাত কায়েম করতে, সময় মত হচ্ছে কিনা তা তদারক করতে এবং ইলমের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর হতে তাকীদ দিয়েছেন।

আমলাদেরকে তিনি তাকওয়া ও শরী'আতের আনুগত্যের অসীয়াত করেছেন, নিজ নিজ এলাকায় ইসলামের দা'ওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এবং এ কাজকেই রাসূলের (সা) রিসালাত ও ইসলামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন। জনসাধারণকে সৎ কাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যেও তিনি আমলাদের তাকীদ দিয়েছেন। এই অপরিহার্য দায়িত্ব পালনে অসতর্কতা দেখালে কি ক্ষতি হবে এবং এর কি পরিণতি হবে তা তিনি সকলকে বুঝিয়ে বলেছেন। একটি চিঠিতে তিনি বলেন :[২০৩]

---

২০৩. ইবনুল জাওযী, ১৬৮; রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৪৮

إنه قد بلغني أنه قد كثر الفجور فيكم، أمنَ الفساق في مداينكم، وجاهروا من المحارم بأمر لايحب اللهُ من فعله، ولا يرضى المداهنة عليه، كان لا يُظهر مثله في علانيته قوم يرجون لله وقارا ويخافون منه غيرًا، وهم الأعزون الأكثرون من أهل الفجور، وليس بذلك أمرُ سلفكم، ولا بذلك تمت نعمة الله عليهم.

'আমি জেনেছি আপনাদের ওখানে পাপ কর্ম বেড়ে গেছে, আপনাদের শহরগুলোতে পাপীরা নিরাপদ হয়ে গেছে। তারা এমন সব নিষিদ্ধ কাজ প্রকাশ্যে করছে, যা কেউ করলে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন না। যে জাতি বা সম্প্রদায় আল্লাহর নিকট চায় ও তাকে ভয় করে তারা এমন কাজ প্রকাশ্যে করতে পারে না। অথচ এই পাপাচারীরা খুবই সম্মানীয় ও সংখ্যাধিক্য। এটা আপনাদের পূর্ববর্তীদের কাজ ছিল না। আর না এর জন্য তাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ পূর্ণতা লাভ করেছিল।'

কোন কোন চিঠিতে তিনি শাস্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ এবং ইসলামের শাস্তির বিধানের ব্যাখ্যা দেন। তিনি নারীদের উচ্চস্বরে বিলাপ ও মাতম করা এবং তাদের জানাযায় যোগদান নিষিদ্ধ করেন এবং হিজাবের ব্যাপারে তাকীদ দেন। তখন মানুষ নাবীয অর্থাৎ খেজুর ভিজানো পানি পানের ব্যাপারে খুবই উদার হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় তা নেশা জাতীয় পানীয়ের পর্যায়ে চলে যেত। সমাজে এই নাবীয পানের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে মদ জাতীয় দ্রব্যের ব্যাপক প্রচলনে সমাজে যে সকল অপকর্ম ও অশ্লীলতার প্রসার ঘটে, এই নাবীয পানের ফলে সমাজে একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) অতি সূক্ষ্মভাবে তা প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি যাবতীয় মদ জাতীয় পানীয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি 'আদী ইবন আরতাতকে একটি বিশেষ চিঠিতে লেখেন :

"ولَعمرى إن ما قرب إلى الخمر فى مطعم أو مشرب أو غير ذلك يتقى."

'আমার জীবনের শপথ! যে সকল খাবার, অথবা পানীয় অথবা এ জাতীয় অন্য কিছু মদের কাছাকাছি পৌঁছে তা অবশ্যই পরিহারযোগ্য।'

তিনি মনে করেন, নাবীযকে মুসলিম সমাজে এমন ব্যাপকভাবে প্রচলন করার পিছনে ইহুদী-নাসারাদের হাত আছে। এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে মাদকাসক্তির দিকে নিয়ে যেতে চায়, অন্যদিকে তাদের অর্থও হাতিয়ে নিয়ে লাভবান হতে চায়। তারপর তিনি সেই চিঠিতে একজন জ্ঞানী ও দরদী অভিভাবকের মত লেখেন :[২০৪]

إن الله قد جعل عن الخمور والمسكرات غنًى فى المشروبات الجائزة السائغة، فما يحمل المسلمين على هذاالإثم؟ فإن الله جعل عنه غنًى وسعة، من الماء الفرات، ومن

---

২০৪. ইবনুল জাওযী, ১০২; রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৪৯

الأشربة التى ليس فى الأنفس منها حاجةً من العسل واللبن والسويق ولانبيذ من الزبيب والتمر.

"আল্লাহ বৈধ সুমিষ্ট পানীয়ের মাধ্যমে মানুষকে যাবতীয় মদ ও নেশা জাতীয় পানীয় থেকে মুখাপেক্ষীহীন করেছেন। তাহলে মুসলমানরা কেন এ পাপ কাজ করবে? আল্লাহ তা'আলা এর থেকে অভাব মুক্তি ও প্রশস্ততা দান করেছেন সুমিষ্ট পানি দ্বারা এবং মধু, দুধ, ছাতু এবং কিসমিস ও খেজুরের নাবীযের দ্বারা। সুতরাং ঐ সমস্ত পানীয়ের কোন প্রয়োজন নেই।" নাবীযের ব্যাপারে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে তিনি বিভিন্ন শহরের অধিবাসীদের নিকট একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন।[২০৫]

সমাজ থেকে মদপান সম্পূর্ণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল কর্মপন্থা গ্রহণ করেন তা সংক্ষেপে এরূপ :

১. কোন যিম্মী যাতে কোন মুসলমান অধ্যুষিত শহরে মদ আনতে না পারে সে ব্যাপারে সকল আঞ্চলিক কর্মকর্তাদেরকে লিখিত নির্দেশ দেন।

২. মদ ক্রয়-বিক্রয়ের দোকান ও মদের আড্ডাখানা ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন।

৩. মদ্যপায়ীকে শরী'আতের বিধান মত কঠোর শাস্তি দিতেন।

মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মদ নিয়ে প্রবেশের ব্যাপারে অমুসলিমদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এরপরেও মদ ভর্তি যে সকল বোতল, মশক ও মটকা অবশিষ্ট ছিল তা ভেঙ্গে অথবা ফেড়ে ফেলার নির্দেশ দেন। হারূন ইবন মুহাম্মাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[২০৬]

رأيت عمر بن عبد العزيز بخُناصِرَة يأمر بزقاق الخمر أن تشقق وبالقوارير أن تُكسَّرَ.

'আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে খুনাসিরায় মদের মশক ফেঁড়ে ফেলার এবং মদের বোতল ভেঙ্গে চুরমার করার নির্দেশ দিতে দেখেছি।'

একই সনদে ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন :[২০৭]

كتب عمر فى خلافته أن لا يدخل أهل الذمة بالخمر أمصار المسلمين.

'উমার তাঁর খিলাফতকালে লেখেন যে, কোন যিম্মী যেন মদ নিয়ে মুসলমানদের শহরে প্রবেশ না করে।'

তিনি অতিথি সেবা ও প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি সকলকে মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দেন। পুরুষদের নগ্ন অবস্থায়, নারী-পুরুষের এক সাথে হাম্মামে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) এ হাদীছটি লিখে খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান :

---

২০৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৬/৩৫৯-৩৬০
২০৬. তাবাকাত-৫/৩৬৯; কিতাবু উলাতি মিসর-৬৮
২০৭. তাবাকাত-৫/৩৬৫

Contents

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كـان يؤمـن بـالله واليـوم الآخـر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّـام إلا بمـئزر، ومـن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمّام.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। যে আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন লুঙ্গি না পরে হাম্মামে না যায়। আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যে আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন (গণ) হাম্মামে প্রবেশ না করে।'

ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিম্নের কথাগুলো লিখে পাঠান :

لا يدخل الحمّام من الرجال إلا بمئزر، ولا تدخله النساء رأسًا.

'লুঙ্গি পরা অবস্থায় ছাড়া কোন পুরুষ হাম্মামে প্রবেশ করবে না। আর মহিলারা একেবারেই হাম্মামে ঢুকবে না।'

উমামা ইবন যায়দ ইবন আসলাম বলেন : লুঙ্গি পরা ছাড়া কেউ হাম্মামে প্রবেশ করবে না- যখন আমাদের নিকট 'উমারের এ নির্দেশ আসলো, তখন আমরা বহু হাম্মাম মালিক ও হাম্মামে প্রবেশকারীকে শাস্তি ভোগ করতে দেখেছি। আমি 'উমারের এ ফরমানও পাঠ করে শোনাতে দেখেছি :

استقبلوا بذبائحكم القبلة.

'তোমরা তোমাদের পশু কিবলামুখী করে জবাই করবে।' নাফি' ইবন জুবাইর তখন আমার পাশে ছিলেন। আমি তাঁর দিকে তাকালে তিনি মন্তব্য করেন : এটা কেউ ভুল করে?[২০৮] উল্লেখ্য যে, হাম্মাম বলতে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্মিত হাম্মাম বা গোসলখানা বুঝানো হয়েছে।

এভাবে তিনি যেমন নিজে ইসলামের সকল বিধি-বিধান পূর্ণরূপে পালন করতেন তেমনিভাবে জনসাধারণকে তা যথাযথভাবে পালন করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন এবং তা পালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকিও করতেন।

জাহিলী যুগের রীতিতে মৈত্রী চুক্তি বন্ধকরণ

জাহিলী যুগে চুক্তির মাধ্যমে এক গোত্র অন্য কোন গোত্রের এবং এক ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির মিত্রে পরিণত হতো। অতঃপর ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যে সকল ক্ষেত্রে একে অপরকে সমর্থন ও সহায়তা করতো। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অবগত হলেন যে, কোন কোন গোত্র নেতা এবং কিছু নব্য ধনিক ব্যক্তি জাহিলী যুগের সেই মৈত্রী

---

২০৮. প্রাগুক্ত-৫/৩৭৫; আল-হাকেম, আল-মুসতাদরিক-৪/২৮৯

পুনরুজ্জীবিত করেছে। তারা যুদ্ধ, ঝগড়া-বিবাদ তথা প্রতিটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে-

يا بنى فلان! يا المضر!

'ওহে অমুক গোত্র অথবা ওহে মুদার গোত্র! তোমরা তোমাদের মিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে এসো'– এ ধরনের জাহিলী যুগের সম্বোধনমূলক ধ্বনি উচ্চারণ করতে শুরু করেছে। আর এ কাজ ছিল ইসলামের সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক রীতি ও ব্যবস্থাপনার বিপরীত একটি জাহিলী রীতি, ব্যবস্থাপনা ও প্রথার পুনরুজ্জীবন। এতে ছিল বহু বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার পূর্বাভাষ। পূর্ববর্তী উমাইয়্যা শাসকরা সম্ভবত অসৎ রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের কু-মতলবে এ জাহিলী প্রথার পুনরুজ্জীবনে প্রশ্রয় দিত। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) এর বিপদের দিকটি ভালোভাবে উপলব্ধি করেন এবং এর প্রতিবিধানের ব্যাপারে স্থায়ী নির্দেশ জারি করেন। তিনি খিলাফতের একজন উচ্চপদস্থ আমলা দাহ্হাক ইবন 'আবদির রহ্মানকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন এবং তাতে মুসলিম সমাজকে সত্য-সঠিক পথের বিচ্যুতি থেকে রক্ষার জন্য অনেক দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ দান করেন। তাতে তিনি মৈত্রী চুক্তির প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। তিনি লেখেন :[২০৯]

وذكرلى أن رجالاً من أولئك يتحاربون إلى مضر وإلى اليمن، يزعمون أنهم ولاية على سواهم، وسبحان الله وبحمده ما أبعدهم من شكر نعمة الله، وأقربهم من كل مهلكة ومذلة وصغر، قاتلهم الله أية منزلة نزلوا ومن اى أمان خرجوا، أو بأى أمر لصقوا، ولكن قد عرفت أن الشقى شقى بنيّته يشقى، وأن النار لم تخلق باطلا، او لم يسمعوا قول الله فى كتابه : إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

وقوله : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا.

'আমাকে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কিছু লোক যুদ্ধে মুদার ও য়ামনীদের সাহায্য ও সহায়তা কামনা করে থাকে। তাদের ধারণা, অন্যদের মুকাবিলায় তারাই তাদের একমাত্র সাহায্য ও সহায়তা দানকারী বন্ধু। আল্লাহর জন্যই সকল তাসবীহ ও হামদ। এটা অত্যন্ত জঘন্য ধরনের অকৃতজ্ঞতা এবং অনুগ্রহের অস্বীকৃতি। ধ্বংস ও লাঞ্ছনার কত না নিকটবর্তী হয়েছে তারা। তারা কি দেখছে না, কী অনুপম শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে তারা নিজেদের বঞ্চিত করেছে এবং কেমন একটা নিকৃষ্ট কাজের সংগে জড়িত করেছে? এখন আমি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি যে, হতভাগা তার নিজের ইচ্ছাতেই হতভাগা হয়ে

২০৯. রিজালুল ফিক্র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৫৩-৫৪

থাকে। আর জাহান্নামও অযথা সৃষ্টি করা হয়নি। ঐসব লোক কি আল্লাহর কালামে একথা শোনেনি : 'মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। এতে করে তোমরা আল্লাহর করুণা প্রাপ্ত হবে।'

তিনি আরো বলেছেন : আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।'

তিনি দাহ্হাককে আরো লিখলেন :[২১০]

وقد ذكرلى مع ذلك أن رجالا يتداعون إلى الحلف، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف وقال : "لاحلف فى الاسلام" قال وما كان من حلف فى الجاهلية فلم يزده الاسلام إلاشدة ـ فكان يرجو أحد من الفريقين حفظ حلفه الفاجر الآثم الذى فيه معصية الله ومعصية رسوله، وقد ترك الاسلام حين انخلع منه، وأنا أحذر كل من سمع كتابى هذا ومن بلغه، أن يتخذ غير الاسلام حصنا، أو دون الله ودون رسوله ودون المؤمنين وليجة،تحذيرا بعد تحذير، وأذكرهم تذكيرا بعد تذكير، وأشهد عليهم الذى هو أخذ بناصية كل دابّة، والذى هو أقرب إلى كل عبد من حبل الوريد.

'আমাকে বলা হয়েছে যে, কিছু লোক জাহিলী যুগের পারস্পরিক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। অথচ রাসূল (সা) এরূপ মিত্রতা ও চুক্তিবদ্ধতা করতে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন : ইসলামে কোন অন্যায় মিত্রতা ও চুক্তিবদ্ধতা নেই। জাহিলী যুগে প্রতিটি চুক্তিবদ্ধ মিত্র অপর চুক্তিবদ্ধ মিত্রের নিকট এই আশা-ভরসা রাখতো যে, সে পারস্পরিক মৈত্রী চুক্তির হক আদায় করবে এবং তা পূরণ করবে– চাই কি তা জুলুম-সর্বস্ব হোক, অন্যায় হোক অথবা তাতে আল্লাহ ও রাসূলের (সা) অবমাননাই হোক। আমি সেইসব লোককে ভীতি প্রদর্শন করছি যারা আমার এই আহ্বান শুনবে এবং যাদের নিকট এই পত্র পৌঁছবে। তারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় যেন না নেয় এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা) মু'মিনদের পরিত্যাগ করে অপর কাউকে যেন বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে। এই বিষয়ে আমি পরিষ্কার ভাষায়, বারবার সতর্ক ও সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি এবং আমি ঐসব লোকের উপর এমন এক সত্তাকে সাক্ষী মানছি, প্রতিটি প্রাণী যার হাতের মুঠোয়, যিনি প্রতিটি মানুষের জীবন-শিরার চাইতেও নিকটবর্তী।'

---

২১০. প্রাগুক্ত

তিনি মানসূর ইবন গালিবকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে একটি যুদ্ধে পাঠানোর সময় যে হিদায়াতনামা লিখে দিয়েছিলেন তা থেকেই পরিমাপ করা যায় তাঁর মানসিকতা কি পরিমাণ কুরআনের ছাঁচে গড়ে উঠেছিল এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা দুনিয়াদার বাদশাহ ও রাজনৈতিক শাসকদের থেকে কতখানি ভিন্নতর ছিল। তিনি মানসূরকে সর্ব অবস্থায় তাকওয়া অবলম্বন করতে বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, দুশমন অপেক্ষা আল্লাহর অবাধ্যতাকেই বেশী ভয় করা উচিত। কারণ, পাপ শত্রুর অপকৌশল ও অপপ্রয়াসের চেয়েও অধিকতর ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। আমরা মুসলমানরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করি এবং তাদের পাপের কারণেই আমরা তাদের উপর বিজয়ী হই। একথা সত্যি না হলে তাদের সংগে মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। কারণ, তাদের সংখ্যা, তাদের সাজ-সরঞ্জাম অনেক বেশী ও উন্নত। কোন দিক দিয়ে তাদের সামনে আমাদের দাঁড়ানো ও টিকে থাকা সম্ভব নয়। তবে সত্য ও ন্যায়ের দ্বারা আমরা তাদের উপর জয়ী হতে পারি। তাই কারোর শত্রুতাকে নিজের পাপ থেকে বেশী ভয় করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর নিকট আমাদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে, যেমন আমরা আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য কামনা করে থাকি। তারপর তিনি মানসূরকে তাঁর অধীনস্থ সৈনিক ও সঙ্গী-সাথীদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, তাদেরকে কোন রকম কষ্ট না দেওয়ার কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, নিজেদের বাহন পশুগুলোর যত্ন নেওয়া, তাদেরকে বিশ্রাম দেওয়া এবং এজন্য পথে থেমে থেমে চলার কথা বলেছেন। কোন জনপদ এবং প্রতিপক্ষ কোন জনগোষ্ঠীর উপর যেন কোন রকম জুলুম-অত্যাচার না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর সকল ব্যাপারে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করতে বলেছেন। সবশেষে তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন :[২১১]

وامره أن تكون عيونه من العرب، وممن يطمئن إلى نصيحته وصدقه من أهل ألارض، فإن الكذوب لاينفع خبره وإن صدق في بعضه، وإن الغاشَّ عين عليك وليس بعين لك، والسلام عليك.

'আমি তাকে এই নির্দেশ দিচ্ছি যে, আরব ও অনারবের মধ্যে সেই সব লোকই তাঁর গোয়েন্দা হওয়ার যোগ্য যাদের ইখলাস ও সততার উপর তিনি আস্থাশীল। কারণ যারা অসৎ ও মিথ্যাবাদী তাদের প্রদত্ত তথ্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না, যদিও তার কোন কোন কথা সঠিক হয়। প্রতারক ও ধোঁকাবাজ আসলে তোমাদের জন্য নয়, বরং তোমাদের শত্রুপক্ষের গুপ্তচর হিসেবেই কাজ করে থাকে।'

ইসলামী খিলাফতের অনারব অঞ্চলে অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের ওঠা-বসার মধ্যে যাতে প্রত্যেকের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে এবং অতিরিক্ত মেলামেশার ফলে কোন রকম দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি না হয় সেজন্য তিনি অনেক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অমুসলিমরা যাতে কোনভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে না

---

২১১. ইবন 'আবদিল হাকাম, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-৮৪

পারে, কোনভাবে মুসলমানদেরকে অসম্মান করার সুযোগ না পায়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য তিনি আঞ্চলিক শাসনকর্তাদেরকে সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। একবার তিনি সকল আঞ্চলিক কর্মকর্তাদেরকে লিখলেন :

أما بعد، فإن الله عزوجل،أكرم بالاسلام أهله، وشرفهم وأعزهم، ضرب الذلةوالصغار على من خالفهم، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، فلا تولّيَنَّ أمور المسلمين أحدا من أهل ذمتهم وخراجهم، فتتبسّط عليهم أيديهم وألسنتهم فتذلهم بعد أن أعزهم الله، وتهينهم بعدأن أكرمهم الله تعالى، وتعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم، ومع هذا فلا يؤمن غشهم إياهم،فان الله، عزوجل يقول : (لا تتخذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالا ودُّوا ماعنتم.) (ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم اولياء بعض.)

'অতঃপর এই যে, মহিমান্বিত আল্লাহ ইসলাম দ্বারা এর অধিকারীদেরকে সম্মানিত করেছেন, তাদেরকে মর্যাদাবান ও শক্তিশালী করেছেন। তাদের বিরোধীদেরকে করেছেন অপমান ও তুচ্ছ। তাদেরকে বানিয়েছেন মানুষের কল্যাণের জন্য সর্বোত্তম জাতি। অতএব মুসলমানদের কোন বিষয়ের দায়িত্ব তাদের যিম্মীদের হাতে অর্পণ করবেন না। তাহলে তারা তাদের হাত ও মুখের দ্বারা মুসলমানদের উপর দাপট দেখাবে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে শক্তিশালী করার পর তারা তাদেরকে অপমান এবং সম্মানিত করার পর হেয় ও লাঞ্ছিত করার সুযোগ পাবে। তারা তাদের ধোঁকা ও প্রতারণার ফাঁদে আবদ্ধ করবে। তাছাড়া তাদের ধোঁকা থেকে নিরাপদও থাকবে না। আল্লাহ বলেছেন : 'তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের ক্ষতি করার কোন সুযোগই হাতছাড়া করবে না। সবসময় তারা তোমাদের ক্ষতিই কামনা করে।' 'তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু।'

এ সম্পর্কিত তাঁর আরেকটি ফরমানের ভাষা ছিল নিম্নরূপ :[২১২]

مروا من كان على غير الاسلام أن يضعوا العمائم ويلبسوا الأكسية، ولا يتشبَّهوا بشئ من الاسلام، ولاتتركوا أحدا من الكفار يستخدم أحدا من المسلمين.

'যারা অমুসলিম তাদেরকে নির্দেশ দিবে তারা যেন পাগড়ী পরিহার করে, অন্যান্য পোশাক পরে এবং ইসলামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন অনুকরণ না করে। আর কোন কাফির তথা অবিশ্বাসীকে কোন মুসলমানের সেবা গ্রহণ করার সুযোগ দেবে না।'

২১২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/১৭১

'আকীদা বিষয়ে অহেতুক বিতর্কের অবসান ঘটান

'আকীদা অর্থ দৃঢ় প্রত্যয়, দৃঢ় বিশ্বাস। বিশ্বাসের এই দৃঢ়তা অর্জনের সবচেয়ে বড় উপায় হলো ধর্মীয় রহস্য ও প্রতীকসমূহ নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা ও ঘাটাঘাটি না করা। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ব্যক্তিগতভাবে মাঝে মধ্যে এ ধরনের তর্ক-বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। যখন তিনি খলীফা হলেন তখন 'আওন ইবন 'আবদিল্লাহ, মূসা ইবন আবী কাছীর ও 'উমার ইবন হামযা আসেন এবং তাঁর সাথে মুরাজিয়াদের "ইরজা" মতবাদটি নিয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য যে, "ইরজা" শব্দের অর্থ স্থগিত করা বা রাখা। আর এ থেকেই "মুরজিয়া" শব্দের উদ্ভব হয়েছে। হাশরের দিন আল্লাহর বিচারের পূর্ব পর্যন্ত পাপী মুসলমানদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দান স্থগিত রাখার কথা বলতেন মুরজিয়া চিন্তাবিদগণ। খারিজী ও শিয়া ছিল দু'টি চরমপন্থী চিন্তা-গোষ্ঠী। পক্ষান্তরে মুরজিয়াগণ ছিলেন মধ্যমপন্থী চিন্তা-গোষ্ঠী। যাই হোক, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয "ইরজা" বিষয়ে তাঁদের সাথে একমত পোষণ করেন। তবে তিনি সাধারণভাবে মানুষকে কখনো এমন সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে উৎসাহ দিতেন না। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে এ ধরনের একটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, শিশু ও মরুচারী বেদুঈনদের দীন ধারণ কর এবং অন্য সবকিছু ভুলে যাও। তিনি বলতেন, যখন কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে সাধারণ মানুষের সামনে এ ধরনের আলোচনা করতে দেখবে তখন বুঝবে তারা গোমরাহীর ভিত্তি রচনা করছে।[২১৩]

সে যুগে 'আকীদার ক্ষেত্রে যে সকল নতুন নতুন প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয় মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় তাকে "আহওয়া" বলা হতো। আসলে তা ছিল পথভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির নামান্তর। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময়কালে এ জাতীয় জিজ্ঞাসার মধ্যে "কাজা ও কদর"-এর চর্চা বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এ চর্চা আরো তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন মা'বাদ আল-জুহানী ও গায়লান আদ-দিমাশ্‌কীর মত দু'জন চিন্তাবিদ। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সর্বপ্রথম মা'বাদকে তাওবা করান এবং তিনি বাহ্যিকভাবে তাওবা করেনও।[২১৪] এরপর 'উমার সম্ভাব্য সকল প্রক্রিয়ায় এই মতবাদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দূর করার চেষ্টা করেন। সে যুগে সব ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও মতামতের প্রচার-প্রসার ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতো মুহাদ্দিছ ও ফকীহদের মাধ্যমে। এ কারণে 'উমার তাঁদেরকে এ সকল মতবাদ গ্রহণ না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, যাতে এ ব্যাধি গোটা জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে না পারে। এই লক্ষ্যে একবার তিনি ইমাম মাকহূলকে লেখেন :[২১৫]

إياك ان تقول في القدر ما يقول هؤلاء يعني غيلان واضحا.

"গায়লান ও তাঁর অনুসারীরা তাকদীর বিষয়ে যা বলে থাকেন, আপনি তা বলা থেকে বিরত থাকুন।"

---

২১৩. তাবাকাত-৫/২৭৫, জামি'উ বায়ান আল-'ইলম-১৫৩
২১৪. তারীখ আল-খুলাফা'-২৪৪
২১৫. তাবাকাত-৫/২৮৪

'উমারের হস্তক্ষেপে এই বিতর্ক কিছু দিন স্তিমিত থাকলেও তাঁর মৃত্যুর পর আবার তীব্রভাবে মাথাচড়া দিয়ে ওঠে।

বিশ্বাস ও কর্মের সমষ্টির নাম ধর্ম। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময়ে এ দু'টি জিনিসেই মরিচা ধরে গিয়েছিল। 'আকায়েদ শাস্ত্রের কাজা ও কদর তথা তাকদীরের বিষয়টি এতই সূক্ষ্ম যে, সাধারণ মানুষকে যদি সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে ইসলামের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সরল বিষয়টি সহসাই মাটিতে পরিণত হবে। এ কারণে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময়ে যখন এই মারাত্মক বিষয়টি দেখা গেল এবং গায়লান আদ-দিমাশ্কী এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের পতাকা উড্ডীন করলেন তখন তিনি তাঁকে পাকড়াও করে তাওবা করান।

তিনি সবসময় মুসলমানদের রক্তপাত এড়িয়ে চলতেন। এ কারণে তাঁর সময়ে বিদ্রোহী খারেজীদের গর্দানও নিরাপত্তা লাভ করে। তবে তাকদীর বিষয়ের তর্ক-বিতর্কের মূলোৎপাটনের উপর তিনি এত অটল ছিলেন যে, এ জাতীয় লোকদের হত্যাকেও তিনি অপরাধ বলে মনে করতেন না। যেমন একবার তিনি আবূ সুহাইলকে প্রশ্ন করেন, কাদরীয়া তথা নিয়তীবাদীদের ব্যাপারে আপনার মত কি?

তিনি বলেন, যদি তাওবা করে ফিরে আসে তাহলে তো ভালো কথা, অন্যথায় তাদের ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা উচিত। 'উমার বললেন, এটাই সঠিক মত, সঠিক সিদ্ধান্ত।[২১৬]

সময়মত নামায আদায়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ

সালাত ও যাকাত একান্তই দু'টি ধর্মীয় বিষয়, কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একই সাথে এ দু'টির আলোচনা এসেছে। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পূর্বে এ দু'টি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিচালন ও অনুষ্ঠান ব্যবস্থা খুবই নিম্ন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। সালাতের মূল জিনিস সময়ানুবর্তিতা। তাছাড়া 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মনে করতেন কুরআনের নিম্নের এ আয়াতটিতে সালাত বিনষ্টের যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ সময়মত আদায় না করা। আয়াতটি এই :[২১৭]

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوْا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

'তাদের পরে আসলো অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা সালাত নষ্ট করলো ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।'

বানূ উমাইয়্যারা, বিশেষতঃ হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ সালাত আদায়ে সময়ের পাবন্দী একেবারেই ছেড়ে দেয়। এ কারণে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয 'আদী ইবন আরতাতকে একটি চিঠিতে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন :[২১৮]

---

২১৬. প্রাগুক্ত-৫/২৮৩
২১৭. সূরা মারয়াম-৫৯
২১৮. ইবনুল জাওযী-৮৬-৮৮

فلا تستن بسنة فانه كان يصلي الصلوة بغير وقت.

'হাজ্জাজের অনুসরণ করবেন না। কারণ, সে সময়মত সালাত আদায় করতো না।'

'আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতীর (রহ) লেখায় জানা যায় যে, উমাইয়্যাদের এই বিদ'আত দূর করার গৌরব অর্জন করেন খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক। আসলে তিনিও এ কাজটি করেন এই 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পরামর্শক্রমে। 'আল্লামা সুয়ূতী সে কথা বলেছেন এভাবে :[২১৯]

ومحاسنه أن عمر بن عبد العزيز كان له كالوزير يمتثل أو امره فى الخير فعزل عمال الحجاج وأخرج من كان فى سجن العراق وأحيى الصلوة لأول مواقيتها وكان بنو أمية أماتوها بالتأخير.

'এবং সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের অনেক ভালোর একটি ভালো এই ছিল যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর উযীর ও উপদেষ্টার মতো ছিলেন। তিনি কল্যাণমূলক কাজে 'উমারের নির্দেশ মেনে চলতেন। এ কারণে তিনি হাজ্জাজের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অপসারণ করেন, ইরাকের কারাগারের বন্দীদেরকে মুক্তি দেন এবং প্রথম ওয়াকতে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করেন। অথচ বানূ উমাইয়্যারা শেষ ওয়াকত পর্যন্ত বিলম্ব করে এই সালাতকে মৃতে পরিণত করে।'

নামায আদায়ের ব্যাপারে মসজিদের ইমামদেরকে নির্দেশ দেন, তারা যেন রাসূলুল্লাহ (সা) যেভাবে নামায আদায় করতেন সেভাবে নামায আদায় করে। তিনি আরো নির্দেশ দেন, মুয়াযযিন যখন ইকামত দেবে তখন মুসল্লীরা যেন কিবলামুখী দাঁড়িয়ে যায় এবং 'ঈদের নামাযে পায়ে হেঁটে যায়। তিনি আঞ্চলিক ওয়ালীদেরকে লেখেন :[২২০]

من استطاع أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيًا فليمش.

'ঈদের নামাযে যে হেঁটে যেতে সক্ষম সে যেন হেঁটে যায়।'

তিনি আরো বলেন, 'ঈদের নামাযে যাওয়ার আগে যেন খেজুর খেয়ে যায়।'[২২১]

كلوا قبل أن تغدوا إلى العيد.

'ঈদগাহে যাওয়ার আগে তোমরা খাও।'

বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নরদের নির্দেশ দেন :[২২২]

اجتنبوا الأشغال عند حضور الصلوة فمن أضاعها فهو لما سواها من شرائع الإسلام أشد تضييعًا.

---

২১৯. তারীখ আল-খুলাফা'-২২৬

২২০. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/২২

২২১. তাবাকাত-৫/৩৬২, ৩৬৩, ৩৮৫

২২২. ইবনুল জাওযী-১০২

'তোমরা সালাতের সময় হলে সকল কাজ পরিত্যাগ করবে। কারণ, যে সালাত বিনষ্ট করবে সে ইসলামের অন্যান্য বিধিবিধান অধিকতর বিনষ্টকারী হবে।'

ব্যক্তিগতভাবেও তিনি মানুষকে সালাত আদায়ের ব্যাপারে সময়ের দিকে মনোযোগী হওয়ার তাকীদ দেন। একবার জনৈক ব্যক্তিকে তিনি মিসর পাঠাতে চান। সে রওয়ানা করতে একটু দেরী করে। লোক পাঠিয়ে তিনি তাকে ডেকে আনেন। সে ভীত-শংকিত অবস্থায় উপস্থিত হলে তিনি বলেন, ভয়ের কিছু নেই। আজ জুম'আ বার। জুম'আর নামায আদায় ব্যতীত এখান থেকে সরবে না। আমি তোমাকে একটি জরুরী কাজে পাঠাচ্ছিলাম। কিন্তু এই তাড়াহুড়ো যেন বিলম্বে নামায আদায়ের প্রতি উৎসাহিত না করে। যারা নামায বিনষ্ট করেছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, তারা খুব শীঘ্র পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। তারা কিন্তু নামায একেবারে ত্যাগ করেনি, বরং তারা সময়ের পাবন্দী ছেড়ে দিয়েছিল।

সময়মত সালাত আদায়ের ব্যাপারে নির্দেশই শুধু দেননি, তার বাস্তবায়নও ঘটান। মুয়াযযিনদের বেতন নির্ধারণ করেন। ইবন সা'দ কুছায়্যির ইবন যায়িদ থেকে বর্ণনা করেছেন :[২২৩]

قدمت خناصرة في خلافة عمر بن عبدالعزيز فرأيته يرزق المؤذنين من بيت المال.

'আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে খুনাসিরায় এসে দেখলাম, তিনি বায়তুল মাল থেকে মুয়াযযিনদের বেতন দিচ্ছেন।'

তিনি আল-জাযীরার ওয়ালী 'আদী ইবন 'আদীকে লেখেন :[২২৪]

إن للايمان فرائض وشرائع وحدودا و سننا فمن استتكلها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسابينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص.

'ঈমান হচ্ছে কিছু ফরয, কিছু বিধিবিধান ও কিছু সুন্নাতের সমষ্টির নাম। যে ঈমানের এই অংশগুলো পূর্ণ করবে তার ঈমান পূর্ণ হবে। আর ঐগুলো যে পূর্ণ করবে না তার ঈমানও পূর্ণ হবে না। আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে ঈমানের এ অংশগুলো আপনাদের সামনে এমন স্পষ্টরূপে তুলে ধরবো যাতে আপনারা তার উপর আমল করতে পারেন। আর যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে আপনাদের সংগে থাকার লোভও আমার নেই।'

তিনি যেভাবে এই অংশগুলো সংরক্ষণ করেন এবং তার প্রচার-প্রসারে যে পরিমাণ চেষ্টা-সাধনা করেন তা একেবারেই নজীরবিহীন। সে কাহিনী অনেক লম্বা, সংক্ষেপে বলা যায়,

---

২২৩. তাবাকাত-৫/৩৬৪

২২৪. ফাতহুল বারী-১/৪৫ (বুখারী : কিতাবুল ঈমান); রিজালুল ফিক্‌র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৫২

ইসলামী চেতনা ও প্রাণসত্তা তাঁর খিলাফতকালের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ফলে জনসাধারণের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন আসে এবং জাতির মেজায ও রুচি নতুনরূপ ধারণ করে। ঐতিহাসিক তাবারীর একটি বর্ণনায় একথার সত্যতা লাভ করা যায়। তিনি 'উমারের খিলাফতকালের এক ব্যক্তির মন্তব্য তুলে ধরেছেন এভাবে :[২২৫]

كان الوليد صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع،كان الناس يلتقون فى زمانه فإنما يسأل بعضهم بعضا عن البناء والمصانع، فولى سليمان فكان صاحب نكاح وطعام، فكان الناس يسأل بضعهم بعضا عن التزويج والجوارى، فلما ولى عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل ماوراءك الليلة، وكم تحفظ من القرآن، ومتى تختم، ومتى ختمت، وماتصوم من الشهر؟

'ওয়ালীদ ছিলেন ভবন ও শিল্প-কারখানার নির্মাতা এবং অধিক ভূ-সম্পত্তির অধিকারী। এ কারণে তাঁর সময়ে মানুষের সাধারণ রুচি এমনই হয়ে গিয়েছিল যে, যখন তারা পরস্পর মিলিত হতো তখন কেবল ভবন ও শিল্প-কারখানা সম্পর্কে আলোচনা করতো। তারপর খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন সুলায়মান। তিনি ছিলেন বিয়ে পাগল ও ভোজনবিলাসী মানুষ। এ কারণে তাঁর সময়ে মানুষের পরস্পরের আলোচনার বিষয় ছিল বিয়ে-শাদী ও দাসী। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের যামানায় 'ইবাদাত-বন্দেগী মজলিসী আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করতো, রাতে তুমি কি করেছো, তুমি কতখানি কুরআন মুখস্থ করেছো, তুমি কুরআন কবে খতম করেছিলে, তুমি মাসে কতটি রোযা রাখ ইত্যাদি।'

হদ বা শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ

হদ তথা শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'উমারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সালাত ও যাকাত কায়েমের মতো। এ ব্যাপারে তিনি আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নিকট পাঠানো এক পত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন এভাবে :[২২৬]

إن إقامة الحدود عندى كاقامة الصلاة والزكاة.

'আমার নিকট হদ কায়েম করা সালাত ও যাকাত কায়েম করার মতো।'

বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে সে ক্ষেত্রে হদ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন :[২২৭]

أدرؤوا الحدود ما استطعتم فى كل شبهة، فان الوالى إذا أخطأ فى العفو خير من أن يتعدى فى الظلم والعقوبة.

---

২২৫. তারাবী, তারীখ-৩/৯৮
২২৬. তাবাকাত-৫/৩৭৮
২২৭. ইবনুল জাওযী-১২৬; হিলয়াতুল আওলিয়া-৫/৩১১

'প্রত্যেক সন্দেহের ক্ষেত্রে তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী হদ কায়েম থেকে বিরত থাক। কারণ একজন ওয়ালী বা শাসকের জুলুম ও শাস্তির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার চেয়ে ক্ষমার ক্ষেত্রে ভুল করা শ্রেয়।'

তাঁর দৃষ্টিতে হদ কায়েম এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, নিজ হাতেও মাঝে মাঝে তা বাস্তবায়ন করেছেন। 'উবাদা ইবনু নুসায় বর্ণনা করেছেন :[২২৮]

شهدت عمر بن عبد العزيز يضرب رجلا حدا فى خمر، فخلع ثيابه ثم ضربه ثمانين، رأيت منها مابضع ومنها لم يبضع. ثم قال : إنك إن عدت الثانية ضربتك، ثم ألزمتك الحبس حتى تحدث خيرا. قال يا أمير المؤمنين، أتوب إلى الله أن أعود فى هذا أبدا. قال فتركه عمر.

'আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে মদ পানের শাস্তি হিসেবে এক ব্যক্তিকে মারতে দেখেছি। তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির দেহের কাপড় খুলে ফেলেন। তারপর আশিটি বেত্রাঘাত করেন। আমি তার দেহের কিছু ত্বক আহত ও কিছু অক্ষত দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি লোকটির উদ্দেশ্যে বলেন : যদি আবার পান করো তাহলে আবার পেটাবো। তারপর কারাগারে আটকে রাখবো– যতদিন না ভালো হবে। সে বললো : হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আল্লাহর নিকট তাওবা করছি যেন আর কখনো এ কাজ না করি। অতঃপর তাকে ছেড়ে দেন।'

হদ কায়েমের ব্যাপারে মিসরের ওয়ালীর নিকট পাঠানো তাঁর একটি পত্রে নিম্নের নির্দেশটিও ছিল :[২২৯]

لاتبلغ فى العقوبة اكثر من ثلاثين سوطا، إلا فى حد من حدود الله.

'একমাত্র আল্লাহ নির্ধারিত কোন হদ ছাড়া সতর্কতামূলক শাস্তির ক্ষেত্রে তিরিশ বেত্রাঘাতের অধিক হবে না।'

পূর্ববর্তী উমাইয়্যা খলীফাদের সময়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ব্যাপারটি খুবই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। বহু মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এ কারণে তা রোধ করার উদ্দেশ্যে যে কোন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। তিনি আঞ্চলিক কর্মকর্তাদেরকে এ নির্দেশও দেন যে, তাঁকে না জানিয়ে যেন কোন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা না হয়। কূফার ওয়ালী আবদুল হামীদ ইবন আবদুর রহমানকে লেখা একটি পত্রে বলেন :[২৩০]

ولا تعجل دونى بقطع ولا صلب حتى تراجعنى فيه.

---

২২৮. তাবাকাত-৫/৩৬৫

২২৯. প্রাগুক্ত-৫/৩৬৫, ৩৮৫

২৩০. তাবারী-৭/৪৭৩-৪৭৪; কিতাবুল আমওয়াল-২৭

'আমাকে না জানিয়ে কারো হাত কাটা বা ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না।'

ইসলামের প্রচার

খিলাফতের পরিধি বিস্তৃতির পরিবর্তে তিনি ইসলামের বিস্তার ও প্রসারকে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সব ধরনের বস্তুগত ও নৈতিক উপায়-উপকরণের সুযোগ গ্রহণ করেন। রোমানদের সাথে যুদ্ধরত একজন সেনাপতিকে তিনি নির্দেশ দেন, রোমানদের কোন ছোট অথবা বড় দলের উপর কোনক্রমেই আক্রমণ করা যাবে না যতক্ষণ না তাদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানো হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের সকল ওয়ালীকে তাঁদের নিজ নিজ এলাকার যিম্মীদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর নির্দেশ দেন। একথাও বলে দেন, কোন যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করলে তার উপর ধার্যকৃত জিযিয়া রহিত করা হবে। এর ফলে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। একমাত্র খুরাসানের ওয়ালী 'আবদুল্লাহ ইবন আল জাররাহর হাতে চার হাজার যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করে।[২৩১]

তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক আগ্রহ ও উৎসাহ ভরে কাজ করেন। বিজিত অঞ্চলসমূহের অধিবাসীদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য নানাভাবে উৎসাহিত করেন। এমনকি তাদেরকে নগদ অর্থ-সম্পদসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করতেন। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একজন খৃস্টান সেনা কমান্ডারকে এক হাজার দীনার দান করেন যাতে ইসলামের প্রতি তার অন্তর আকৃষ্ট হয়। এমন কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রোমান সম্রাট তৃতীয় লুইকে একটি পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত দেন।[২৩২]

'উমারের বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার ফলে খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলের অমুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে। মা ওয়ারা আন-নাহর-এর অঞ্চলসমূহের অসংখ্য মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে। মরক্কোর বারবারদের মধ্যে ইসলামের দা'ওয়াত দানের জন্য তিনি দশজন বিখ্যাত ফকীহকে পাঠান। তাঁদের চেষ্টায় সেখানে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে।[২৩৩]

আল-বালাযুরী বলেন :[২৩৪]

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ملوك الهند يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن يملكهم، ولهم ما للمسلمين وعليهم ماعليهم، وقد كانت بلغتهم سيرته ومذهبه، فأسلموا وتسموا بأسماء العرب.

---

২৩১. আল-বালাযুরী, ফুতুহ আল-বুলদান-৩৫৭

২৩২. তাবাকাত-২৫৮

২৩৩. ড. হাসান ইবরাহীম, তারীখ আল-ইসলাম-১/৩২৯

২৩৪. ফুতূহ আল-বুলদান-৪৪৬-৪৪৭; রিজালুল ফিক্র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৫০

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের নিকট পত্র লেখেন এবং তাদেরকে ইসলাম ও আনুগত্যের আহ্বান জানান। তিনি তাঁদেরকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি তাঁরা এই আহ্বানে সাড়া দেন তাহলে তাদেরকে নিজ নিজ সাম্রাজ্যের ক্ষমতায় রাখা হবে এবং তাঁদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য তাই হবে যা একজন মুসলমানের হয়ে থাকে। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের জীবন, চরিত্র ও মত-পথের সুখ্যাতি পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই তাঁরা ইসলাম কবুল করে এবং আরবদের ন্যায় নিজেদের নামও রাখে।' এ চিঠি তিনি লেখেন হিজরী ১০০ সনে।[২৩৫]

ইসমা'ঈল ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আবিল মুহাজিরকে– যিনি বানূ মাখযূমের আযাদকৃত দাস ছিলেন, পশ্চিম আফ্রিকার ওয়ালী নিয়োগ করা হয়। তিনি সেখানে স্বীয় কর্মকাণ্ড ও উত্তম আচার-আচরণ দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীদের মন জয় করেন। তারপর বার্বারদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযও সেখানকার লোকদের নিকট একটি পত্র পাঠান এবং তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। এই পত্র ইসমা'ঈল প্রকাশ্যে জনসমাবেশে পাঠ করে শোনান। শেষ পর্যন্ত সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৩৬]

খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) মা-ওয়ারা আন-নাহার-এর সুলতানদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত সম্বলিত পত্র লেখেন। তিনি সেখানে আবদুল্লাহ ইবন মা'মার আল-ইয়াশকুরীকে পাঠান। তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন। খুরাসানের যে সকল যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করেছিল তিনি তাদের জিযিয়া রহিত করেন। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করে সরাইখানা নির্মাণ করেছিল তাদেরকে পুরস্কৃত করেন এবং তাদের ভাতা নির্ধারণ করেন।[২৩৭] খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে এত বেশী সংখ্যক যিম্মী মুসলমান হয় যে, একাধিক ওয়ালী জিযিয়া-রাজস্বের ঘাটতির কথা খলীফাকে জানান। 'উমার তাঁদের কথার কোন গুরুত্ব দিলেন না। বরং কারো কারো অভিযোগের জবাবে তিনি লেখেন : রাসূলুল্লাহকে (সা) হাদী বা পথ প্রদর্শক হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, জিযিয়া আদায়ের জন্য নয়।[২৩৮] অনেককে তিনি লেখেন, আমি তো চাই সকল যিম্মী মুসলমান হয়ে যাক, আমি ও তুমি কৃষক হয়ে যাই এবং নিজেদের শ্রমে অর্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করি। কোন কোন ওয়ালী এ প্রস্তাব দেন যে, যিম্মীরা জিযিয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মুসলমান হচ্ছে। এজন্য খাত্না করে তাদের পরীক্ষা করা হোক। 'উমার লিখলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পথ প্রদর্শক ছিলেন, খাতনাকারী ছিলেন না।[২৩৯]

তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্যের খ্যাতি এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের প্রতি প্রবল আগ্রহের কথা

---

২৩৫. আল-কামিল ফিত-তারীখ-৫/৫৪
২৩৬. ফুতূহ আল-বুলদান-৩৩৯; রিজালুল ফিক্র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৫০
২৩৭. কুরদ 'আলী, আল-ইসলাম ওয়াল হাদারা আল-'আরাবিয়্যা-২/১৮৯
২৩৮. কিতাবুল খারাজ-৭৫; আ'জামু 'উজামা' আল-ইসলাম-১৪৫
২৩৯. তাবাকাত-৫/৩৮৫

শুনে কোন কোন দেশের রাজন্যবর্গ তাঁদের দেশে মুবাল্লিগ বা প্রচারক পাঠানোর আবেদন জানান। এরই ধারাবাহিকতায় তিব্বতের একটি প্রতিনিধি দলের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি সুলাইত ইবন 'আবদিল্লাহ হানফীকে তিব্বতে পাঠান। এভাবে তাঁর সময়ে ইসলামের অভূতপূর্ব প্রচার-প্রসার ঘটে।[২৪০]

ভারতবর্ষের রাজার চিঠি

ভারতবর্ষের এক রাজা হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে নিম্নের এই চিঠিটি লেখেন :[২৪১]

من ملك الأملاك الذى هو ابن ألف ملك، والذى تحته ابنة ألف ملك والذى فى مربطه ألف فيل، والذى له نهران ينبتان العود والألوة والجوز والكافور، والذى يوجد ريحه على مسيرة اثنى عشر ميلا، إلى ملك العرب الذى لا يشرك بالله شيئا، أما بعد : فإني قد بعثت إليك بهدية وما هى بهدية، ولكنها تحية، وأحببت أن تبعث إلى رجلا يعلمنى ويفهمنى الإسلام، والسلام، يعنى بالهدية الكتاب.

'রাজন্যবর্গের রাজার পক্ষ থেকে– যিনি হাজার রাজার বংশধর, যার অধীনে হাজার রাজার কন্যা, যাঁর হাতীশালে হাজার হাতী, যার আছে দু'টি নদী যার পানিতে মূল্যবান সুগন্ধি কাঠ, বাদাম ও কর্পূর উৎপন্ন হয় এবং যার সুগন্ধি বারো মাইল দূর থেকে পাওয়া যায়– আরবের বাদশার প্রতি– যিনি আল্লাহর সাথে অন্য কোন কিছু শরীক করেন না। অতঃপর, আমি আপনার নিকট একটি উপহার পাঠিয়েছি। আসলে সেটি কোন উপহার নয়, বরং তা একটি সালাম ও অভিবাদন। আমি চাই আপনি আমার নিকট এমন এক ব্যক্তিকে পাঠান যে আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিবেন ও বুঝাবেন। ওয়াস-সালাম।' মূলতঃ হাদিয়া (উপহার) দ্বারা চিঠি বুঝিয়েছেন। চিঠিটি আল-জাহিজ 'কিতাবুল হায়ওয়ান' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তবে সেখানে ভারতবর্ষের স্থলে চীনের রাজার কথা এসেছে।[২৪২]

খেল-তামাশা ও মাতমের উপর নিষেধাজ্ঞা

ইসলামী শরী'আত যে সকল জিনিসের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, 'উমার অত্যন্ত কঠোরভাবে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেন। একবার তিনি জানতে পারেন যে, বহু মুসলমান খেল-তামাশায় মত্ত থাকে এবং বহু মুসলিম নারী লাশের খাটিয়ার পিছনে পিছনে মাথার চুল ছিঁড়ে, বুক চাপড়িয়ে মাতম করতে করতে চলতে থাকে। তিনি সকল

---

২৪০. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০২
২৪১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/৪০৪
২৪২. কিতাবুল হায়ওয়ান-৭/৩৬

আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নামে একটি সাধারণ ফরমান জারী করেন। সেই ফরমানটির সারকথা নিম্নরূপ :

'আমি অবগত হয়েছি যে, নির্বোধ লোকদের নারীরা তাদের কোন আপনজনদের মৃত্যুর সময় জাহিলী যুগের নারীদের মতো মাথার চুল ছেড়ে দিয়ে মাতম করতে করতে ঘর থেকে বের হয়। অথচ নারীদেরকে আঁচল টেনে চলতে বলা হয়েছে এবং ওড়না ফেলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই মাতমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। এই অনারব লোকেরা, যাদের দৃষ্টিতে শয়তান কয়েকটি জিনিস পসন্দনীয় করে দিয়েছিল, তাদের অন্তরকে সেদিকে আকৃষ্ট করেছিল। সুতরাং মুসলমানদেরকে এই খেল-তামাশা, গান-বাজনা থেকে বিরত রাখ। যে বিরত না হবে তাকে ইনসাফমূলক শাস্তি দাও।'

হাম্মামের দেওয়ালে ছবি অঙ্কন করা হতো। আর এটা ছিল ইসলামী শরী'আতের মূল নীতির পরিপন্থী। একবার তিনি একটি হাম্মামে এ ধরনের চিত্র দেখে তা মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়ে বলেন, যদি এই চিত্রকরের পরিচয় জানা যেত তাহলে আমি তাকে শাস্তি দিতাম।

ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। তা সত্ত্বেও তিনি অনারবদের মতো বিলাসী জীবন-যাপন করাকেও বৈধ মনে করতেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) যদিও কেশ পরিচর্যার নির্দেশ দিয়েছেন, তবে তার উদ্দেশ্য এই নয় যে, মাথার চুল ফুলিয়ে ট্যারা কেটে দু'দিকে ঝুলিয়ে দেবে। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময়ে এ ধরনের সৌখিন কেশ পরিচর্যাকারী সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি পুলিশ বিভাগকে নির্দেশ দেন, তারা জুম'আর দিন নামাযের সময় মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং এ রকম সৌখিন কেশ পরিচর্যাকারীকে মসজিদ থেকে বের হতে দেখলেই ধরে তার চুল কেটে দেবে।[২৪৩]

আরবদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য যাতে বিনষ্ট হতে না পারে সে ব্যাপারে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। যেমন একবার তিনি অবগত হলেন যে, কিছু লোক যখন সামনে তশতরী রেখে ওযু করে তখন তা ভরে যাওয়ার আগেই পানি ফেলে দেয়। তিনি 'আদী ইবন আরতাতকে লিখলেন যে, এটা অনারব কৃষ্টি। এখন থেকে যতক্ষণ তশতরী ভরে না যাবে অথবা সব মানুষের ওযু শেষ না হবে, পানি ফেলা যাবে না।

জনকল্যাণমূলক কাজ

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যে সকল সংস্কারমূলক কাজ করেন তা সবই ছিল মূলতঃ জনকল্যাণমূলক। তবে তিনি প্রচলিত অর্থের বহু জনকল্যাণমূলক কাজও করেন। খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য সরাইখানা নির্মাণ করেন। খুরাসানের ওয়ালীকে তথাকার সকল সড়কে সরাইখানা তৈরি করার নির্দেশ দেন। সমরকন্দের ওয়ালী সুলায়মান ইবন আস-সারজীকে লেখেন :[২৪৪]

---

২৪৩. তাবাকাত-৫/৩৮২
২৪৪. আল-কামিল ফিত-তারীখ-৫/৬০

أن اعمل خانات، فمن مربك من المسلمين فأقروه يوما وليلة وتعـهدوا دوابـهم، ومـن كانت به علة فأقروه يومين وليلتين، وإن كان منقطعا به فأبلغه بلده.

'ওখানকার শহরগুলোতে সরাইখানা নির্মাণ করুন, ও পথে চলাচলকারী মুসলমানদেরকে একদিন একরাত অতিথি হিসেবে সেবা ও আপ্যায়ন করুন, তাদের বাহন পশুর সেবা-যত্ন করুন। কেউ অসুস্থ হলে তাকে চিকিৎসা সেবা দিন এবং দু'দিন দু'রাত আপ্যায়ন করুন। যদি বাড়ীতে পৌঁছার বাহন না থাকে তাহলে তার পৌঁছার ব্যবস্থা করুন।' তিনি একটি স্থায়ী সাধারণ লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে অভাবী ও দুঃস্থদেরকে আহার করানো হতো।

ইমাম আল-আসমা'ঈ বর্ণনা করেছেন। একবার 'আদী ইবন আল-ফুদাইল 'আল-'উযবা' নামক স্থানে একটি কূপ খননের অনুমতি লাভের জন্য গেলেন খলীফা হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট। তিনি প্রশ্ন করলেন : আল-'উযবা' কোথায়? বললেন : বসরা থেকে দু'রাত্রির পথ। 'উমার সেখানে পানি সঙ্কটের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। তাঁকে কূপ খননের নির্দেশ দিয়ে বলেন, আমার একটি শর্ত আছে। সেই শর্তটি হলো, এই কূপের পানির প্রথম পানকারী যেন হয় একজন মুসাফির।[২৪৫]

জেলখানার সংস্কার

রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে অপরাধীর অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি বিধান করা জরুরী। তবে বিশ্বাস ও সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে শাস্তির ধরন এবং অপরাধের অবস্থার ভিন্নতা হয়ে থাকে। ইসলাম যেহেতু একটি সুসভ্য ও সুসংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে, এ কারণে কারাবন্দীদের সাথে এর বিধিবিধান ও আচরণে মানবিক দিকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা চলে এর সূচনা হয়েছে হযরত 'আলীর (রা) খিলাফতকাল থেকে। বায়তুল মাল থেকে তিনি কারাবন্দীদের পোশাক ও খাবার সরবরাহের নির্দেশ দেন। কারারুদ্ধ ব্যক্তি বিত্তশালী হলে তার নিজের অর্থ থেকে অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হতো। অন্যথায় বায়তুল মাল থেকে তার জন্য খরচ করা হতো। ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন :[২৪৬]

كان على بن أبى طالب إذا كان فى القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه فان كان له مال انفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال انفق عليه من بيت مـال المسـلمين و قال : يحبس عنهم شره وينفق عليه من بيت مالهم.

'কোন গোত্রে অথবা সম্প্রদায়ে কোন অপরাধী থাকলে 'আলী (রা) তাকে কারারুদ্ধ করতেন। তারপর সে বিত্তশালী হলে তার নিজের অর্থে তার অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করতেন।

---

২৪৫. 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-১৫২
২৪৬. কিতাবুল খারাজ-১৫০

আর বিত্তহীন হলে বায়তুল মালের অর্থ থেকে তার জন্য খরচ করা হতো। তিনি বলতেন : তাদের মন্দ লোককে বন্দী করা হবে এবং তাদের অর্থে তার অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হবে।'

পরবর্তী খলীফাগণ যদিও এ নিয়ম চালু রাখেন, তবে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) সময় পর্যন্ত এই নিয়মে নানা রকম দুর্নীতি ও অব্যবস্থা ঢুকে পড়ে।

১. কেবল মাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে খলীফা ওয়ালীদ মানুষকে গ্রেফতার করতেন এবং তাদেরকে হত্যার মতো কঠোর শাস্তি দিতেন।

২. যে সকল কয়েদী নিজের জন্মস্থান ও আত্মীয়-বন্ধুদের থেকে বহু দূরে কারাগারে মারা যেত তাদের লাশ দুই দিন পর্যন্ত কারাগারে অযত্ন ও অবহেলায় পড়ে থাকতো। অবশেষে কারাগারের কয়েদীরা নিজেদের দান-সাদাকা সংগ্রহ করে শ্রমিকদের মাধ্যমে লাশটি কবরস্তান পর্যন্ত পৌঁছে দিত। তারা গোসল, কাফন ও জানাযা ছাড়াই দাফন করে দিত।[২৪৭]

৩. ইসলাম যে সকল অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে তাতে তো কোন রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যায় না, তবে ইসলাম তা'যীর তথা নিবর্তনমূলক শাস্তির কোন সীমা নির্ধারণ করেনি। বরং বিষয়টি শাসন-কর্তৃত্ব তথা সমকালীন ইমামের উপর ছেড়ে দিয়েছে। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) সময়ে এসে তা রীতিমত জুলুমে পরিণত হয়। কোন কোন শাসক এত কঠোরতা করতো যে, মামুলী ধরনের অপরাধ, এমনকি শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে তিনশো চাবুক পর্যন্ত মারতো।[২৪৮]

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এ সকল অন্যায় ও নিপীড়ন পদ্ধতি ও কর্মপন্থার দিকে দৃষ্টি দেন এবং এ জাতীয় সবকিছু দূর করেন। মূসেলে চুরি-ছ্যাঁচড়ামীর ঘটনা অত্যধিক বেড়ে যায়। তথাকার শাসক এ অপরাধ দমনের জন্য সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেফতার করে শাস্তি দেবেন কিনা তা জানতে চেয়ে খলীফাকে পত্র লেখেন। জবাবে তিনি লিখলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ অনুযায়ী সাক্ষ্যের ভিত্তিতে গ্রেফতার করবে। সত্য এবং সঠিক পন্থা যদি তাদেরকে সংশোধন করতে না পারে তাহলে আল্লাহ সংশোধন না করুন![২৪৯]

মৃত কয়েদীদেরকে কাফন-দাফন ছাড়াই ফেলে রাখার যে নিয়ম চালু হয়ে গিয়েছিল তা যে কত বড় অপরাধ সে সম্পর্কে চিঠি লিখে আঞ্চলিক শাসনকর্তাদেরকে সতর্ক করেন। সন্দেহের ভিত্তিতে যে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো, তিনি বলেন, মানবিক দিক দিয়ে এ কাজ সম্পূর্ণ অবৈধ। শরী'আত প্রদত্ত অধিকার প্রয়োগ ছাড়া প্রতিটি মুসলমানের পিঠ সম্পূর্ণ নিরাপদ। তা'যীর তথা নিবর্তনমূলক শাস্তিও নির্ধারণ করে দেন। যার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল তিরিশ বেত্রাঘাত।[২৫০]

---

২৪৭. প্রাগুক্ত-৮৯

২৪৮. প্রাগুক্ত

২৪৯. ইবনুল জাওযী-৯৭

২৫০. কিতাবুল খারাজ-১৫০; তাবাকাত-৫/৩৮৪

সাধারণভাবে তিনি এ নির্দেশ দেন যে, নামায আদায় করতে অসুবিধা হয়, কোন কয়েদীকে এমন ভারী বেড়ী পরানো যাবে না এবং কেবল মানুষ হত্যাকারী ছাড়া অন্য সকল কয়েদীর বেড়ী রাতে খুলে দিতে হবে। কয়েদীদেরকে যে খাদ্য-খাবার দেওয়া হতো সে ব্যাপারে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসততার অভিযোগ শোনা যেত। তাই তিনি খাদ্যের পরিবর্তে প্রত্যেক কয়েদীর জন্য নির্ধারিত অর্থ মাসিক ভিত্তিতে প্রদানের নির্দেশ দেন।[২৫১] বিভিন্ন শ্রেণীর ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কয়েদীদের জন্য পৃথক পৃথক নির্দেশ জারী করেন। তিনি আঞ্চলিক শাসনকর্তাদেরকে লেখেন যে, কোন অসুস্থ কয়েদীর যদি আপনজন না থাকে অথবা তার নিকট অর্থ না থাকে তাহলে তাকে দেখাশুনা ও সেবাযত্ন করবে। ঋণ পরিশোধে অপারগতার কারণে যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে অন্য ধরনের অপরাধীদের সাথে একই সেলে রাখবে না। মহিলাদেরকে পৃথকভাবে রাখবে। জেলারকে নির্দেশ দেন সৎ ও বিশ্বস্ত এমন কর্মচারী নিয়োগ দিতে, যে ঘুষ খায় না।

এ সকল সাধারণ নির্দেশ জারীর সাথে সাথে মদীনার ওয়ালী আবূ বকর ইবন হাযামকে (রহ) বিশেষভাবে লেখেন, তিনি যেন সপ্তাহে একদিন কারাগার পরিদর্শন করেন। এছাড়া অন্যান্য ওয়ালীগণকেও কয়েদীদের সাথে সদাচরণের কঠোর নির্দেশ দেন।[২৫২]

কারাগারের সংস্কারের ব্যাপারে তাঁর পদক্ষেপ ও কর্মপন্থার সারকথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য এখানে তাঁর কয়েকটি নির্দেশ হুবহু উদ্ধৃত করা হলো :[২৫৩]

عن جعفر بن برقان قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز لا تدعن في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائما، ولاتبيتن في قيد إلا رجلا مطلوبا بدم، وأجروا عليهم من الصدقة مايصلحهم في طعامهم وأدمهم، فمر بالتقدير لهم مايقوتهم في طعامهم وأدمهم، وصير ذلك دراهم تجرى عليهم في كل شهر يدفع ذلك إليهم، فإنك إن أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوزة. وول ذلك رجلا من أهل الخير والصلاح يثبت أسماء من في السجن ممن تجرى عليهم الصدقة، وتكون الأسماء عنده ويدفع ذلك إليهم شهرا بشهر، يقعد ويدعو باسم رجل رجل ويدفع ذلك إليه في يده، فمن كان منهم قد أطلق وخلى سبيله رد مايجرى عليه، ويكون للأجراء عشرة دراهم في الشهر لكل واحد، وليس كل من في السجن يحتاج إلى أن يجرى عليه، وكسوتهم في الشتاء

---

২৫১. কিতাবুল খারাজ-১৫০

২৫২. তাবাকাত-৫/২৬৩, ২৮৮

২৫৩. কিতাবুল খারাজ-১৫০-১৫১; জামহারাতু রাসায়িল আল-'আরাব-২/২৯৮

قميص ومقنعة وكساء، وفي الصيف قميص و إزار ومقنعة، وأغنهم عن الخروج في السلاسل يتصدق عليهم الناس، فان هذا عظيم أن يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا وأخطأو اوقضى الله عليهم ماهم فيه فحبسوا يخرجون في السلاسل يتصدقون، وماأظن أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلمين الذين في أيديهم فكيف ينبغي أن يفعل هذا بأهل الاسلام؟ وإنما صاروا إلى الخروج في السلاسل يتصدقون لماهم فيه من جهد الجوع، فربما أصابوا ما يأكلون وربما لم يصيبوا، إن ابن آدم لم يعر من الذنوب، فتفقد أمرهم ومر بالإجراء عليهم مثل ما فسرت لك، ومن مات منهم ولم يكن له ولي ولاقرابة غسل وكفن من بيت المال وصلى عليه ودفن، فإنه بلغني وأخبرني به الثقات أنه ربما مات منهم الميت الغريب فيمكث في السجن اليوم واليومين حتى يستأمر الوالي في دفنه وحتى يجمع أهل السجن من عندهم ما يتصدقون ويكترون من يحمله إلى المقابر فيدفن بلاغسل ولاكفن ولاصلاة عليه، فما أعظم هذا في الاسلام وأهله.ولو أمرت باقامة الحدود لقل أهل الحبس ولخاف الفساق وأهل الدعارة ولتناهوا عماهم عليه، وإنما يكثر أهل الحبس لقلة النظر في أمرهم، إنما هو حبس وليس فيه نظر، فمر ولاتك جميعا بالنظر في أمر أهل الحبوس في كل أيام، فمن كان عليه أدب أدب وأطلق، ومن لم يكن له قضية خلي عنه، وتقدم إليهم أن لايسرفوا في الأدب ولايتجاوزوا بذلك إلى مالايحل ولايسع، فانه بلغني أنهم يضربون الرجل في التهمة وفي الجناية الثلاثمائة والمائتين وأكثر وأقل، وهذا مما لايحل ولايسع. ظهر المؤمن حمى إلا من حق يجب بفحور او قذف أو سكر أو تعزير لأمر اتاه لايجب فيه حد، وليس يضرب في شئ من ذلك، كما بلغني أن ولاتك يضربون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ضرب المصلين.

"জা'ফার ইবন বারকান বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আমাদেরকে লিখলেন : কারাগারে কোন মুসলমান কয়েদীকে এমনভাবে বেড়ী পরানো যাবে না যাতে সে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে না পারে এবং একমাত্র মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামী ছাড়া সকল কয়েদীর বেড়ী রাতে খুলে দিতে হবে। প্রত্যেক কয়েদীর জন্য এত পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করতে

হবে যাতে সে পেট ভরে খেতে পারে। প্রত্যেক কয়েদীর প্রতিদিনের খাবার নির্ধারণ করে তার অর্থ মাসিক ভিত্তিতে তাকে দিতে হবে। তাদেরকে যদি নগদ অর্থের পরিবর্তে রুটি সরবরাহ করা হয় তাহলে কারাগারের কর্মচারী, কর্মকর্তা ও পুলিশ তাতে ভাগ বসাবে। এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একজন সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করতে হবে, সে ভাতা প্রাপ্ত কয়েদীদের নাম খাতায় লিপিবদ্ধ করবে এবং সে খাতা তার হিফাজতেই থাকবে। সে প্রত্যেক মাসে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে একজন একজন করে কয়েদীর নাম ধরে জোরে ডাকবে এবং সে এসে নিজ হাতে তার ভাতা গ্রহণ করবে। যারা মুক্তি পাবে তাদের ভাতা বন্ধ করে দিতে হবে। প্রত্যেক কয়েদীকে মাসিক দশ দিরহাম করে দিতে হবে। তবে সকল কয়েদীকে ভাতা দানের প্রয়োজন নেই।

শীতকালে প্রত্যেক কয়েদী একটি জামা ও একটি কম্বল এবং গরমকালে একটি জামা একটি লুঙ্গি পাবে। মহিলা কয়েদীরাও এটা পাবে, তবে তারা হিজাবের জন্য একটি বোরকাও পাবে। কয়েদীরা ডাণ্ডাবেড়ী পরে হেলতে-দুলতে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে যে দান-সাদাকা কুড়ায় তা থেকে তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে। কারণ, এ একটি বড় অন্যায় যে, মুসলমানদের একটি দল তাদের কোন অপরাধের কারণে বন্দী হয়ে এভাবে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে দান-সাদাকা সংগ্রহ করে। আমার ধারণা অমুসলিমরাও মুসলিম কয়েদীদের সাথে এমন আচরণ করবে না। তাহলে মুসলমান কয়েদীদের সাথে আমাদের এ আচরণ কেমন করে বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে?

এই কয়েদীরা মারাত্মক ক্ষুধার কারণে এভাবে ডাণ্ডাবেড়ী ধারণ করে মানুষের দ্বারে যায়। কখনো হয়তো কিছু পায়, আবার কখনো পায় না। কোন মানুষই পাপমুক্ত নয়। তাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে এবং আমার নির্দেশ মতো ভাতা দিতে হবে। কোন কয়েদী মারা গেলে তার কোন আত্মীয়-বন্ধু না থাকলে বায়তুল মালের খরচে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। তার জানাযার নামায আদায় করার পর দাফন করতে হবে। বিশ্বস্ত সূত্রে আমি জানতে পেরেছি যে, আত্মীয়-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন দূরের কোন কয়েদী মারা গেলে দু'দিন পর্যন্ত তার লাশ কারাগারে অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকে। এমনকি দাফনের জন্য যখন ওয়ালীর অনুমতি পাওয়া যায় তখন অন্য কয়েদীরা নিজ উদ্যোগে তার দাফনের জন্য দান-সাদাকা সংগ্রহ করে এবং অর্থের বিনিময়ে নিয়োগকৃত মজুরের মাধ্যমে লাশটি গোরস্তানে পৌছানো হয়। তখন তাকে গোসল-কাফন ও জানাযা ছাড়াই দাফন করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এ একটা মারাত্মক অপরাধ। এখন যদি তোমরা আল্লাহর হদ তথা নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ কর তাহলে কয়েদীর সংখ্যা কমে যাবে, চোর-ডাকাত, গুণ্ডা-বদমায়েশ ভয় পেতে থাকবে এবং তারা অপরাধ থেকে বিরত থাকবে। যথাযথ পর্যবেক্ষণের অভাবেই কয়েদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এরা কেবল বন্দীই আছে, তাদের কোন তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ নেই। প্রত্যেকে নিজের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিবে, তারা যেন প্রতিদিন কয়েদীদের তত্ত্বাবধান করে। যাদের সংশোধন কেবল সৎ উপদেশ দ্বারা হয়, তাদেরকে উপদেশ দিয়ে মুক্তি দিতে হবে। যাদের বিরুদ্ধে কোন

মামলা নেই তাদেরকে একেবারে মুক্তি দিতে হবে। তা'যীর তথা নিবর্তনমূলক শাস্তি দানের ক্ষেত্রে যেন সীমালংঘন করা না হয়। আমি জানতে পেরেছি যে, কেউ কেউ সন্দেহ ভাজন অপরাধীকে কেবল সন্দেহের ভিত্তিতে দু'তিন শো' অথবা কিছু কম-বেশী চাবুক মেরে থাকে। কিন্তু একাজ সম্পূর্ণ অবৈধ। শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি ছাড়া মুসলমানদের পিঠ সর্বঅবস্থায় সংরক্ষিত। আমি জেনেছি কোন কোন কর্মকর্তা মানুষকে বেত্রাঘাত করে। অথচ রাসূল (সা) নামাযীদেরকে প্রহার করতে নিষেধ করেছেন।"

আধুনিক যুগে কারাগার ও কয়েদীদের সংশোধন ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য যে সকল নীতিমালা গ্রহণ করা হয় তার সাথে প্রায় সাড়ে তের শো' বছর পূর্বে জারী করা 'উমারের (রহ) উপরোক্ত ফরমানটি তুলনা করলে বুঝা যায়, যে কোন বিচারেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশী আধুনিক ও উন্নত মানের।

'আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

কোন ঘটনার যথার্থতার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি হলো তার সম্পর্কে অতিরঞ্জিত নানা কথা ছড়িয়ে পড়া। 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের 'আদল-ইনসাফের ঘটনাবলী এই মাপকাঠির ভিত্তিতে ঠিকভাবেই উৎরে যায়। কবিরা যখন তাঁদের কবিতায় কোন রাজা-বাদশার 'আদল-ইনসাফের অতিরঞ্জিত প্রশংসা করে তখন বলে, তার সময়ে নেকড়ে ও মেষ একসাথে পানি পান করে। কখনো এর চেয়ে আরো একটু বাড়িয়ে বলা হয় "নেকড়ে মেষ পালের রাখালী করে।" হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের সময় এই অতিরঞ্জন বাস্তবরূপ লাভ করে এবং সে সম্পর্কে বহু বানোয়াট ও অতিরঞ্জিত কাহিনীর সৃষ্টি হয়। যেমন মূসা ইবন 'আয়ান বলেছেন, আমরা 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের খিলাফতকালে ছাগল চরাতাম। নেকড়েও আমাদের সাথে চরতো। কিন্তু এক রাতে নেকড়ে একটি ছাগলকে আক্রমণ করে বসে। তখন আমি বললাম, নিশ্চয় সেই সৎ লোকটির মৃত্যু হয়েছে। পরে দেখা গেল বাস্তবে সেই রাতে 'উমার ইনতিকাল করেছেন।[২৫৪]

এখন আমাদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে বলতে হবে এই অতিরঞ্জনের মধ্যে সত্য ও বাস্তবতার পরিমাণ কতটুকু? 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের খিলাফতকালের পূর্বে :

১. জনসাধারণের অর্থ-সম্পদ জোর করে অন্যায়ভাবে দখল করে নেওয়া হয়েছিল।

২. বিশ্ব মুসলিমের পরম প্রিয় বানূ হাশিমের সকল অধিকার হরণ করা হয়েছিল।

৩. চরম খুনী ও রক্ত পিপাসু সব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল।

৪. নিতান্ত ধারণা ও সন্দেহের ভিত্তিতে মানুষকে শাস্তি দেওয়া হতো এবং পুরুষের বদলে নারীদেরকে গ্রেফতার করা হতো।

৫. কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই জনগণকে বেগার খাটানো হতো।

---

২৫৪. ইবনুল জাওযী-৭০; 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয-১৭০

'উমার ইবন 'আবদিল আযীয খিলাফতের মসনদে আসীন হয়েই এই সকল অন্যায়-অবিচারের মূলোৎপাটন করে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ঐতিহাসিক ইয়া'কূবী লিখেছেন :[২৫৫]

نكث عمر أعمال أهل بيته وسماها مظالم وكتب إلى عماله جميعا أما بعد فان النـاس قد اصابهم بلاء وشدة وجور فى أحكام الله وسنن سيئة سنها عليهم عمال السوء قلما قصدوا قصد الحق والرفق والإحسان.

"উমার ইবন 'আবদিল আযীয নিজ খান্দানের কর্ম পদ্ধতিকে বদলে দেন এবং তার নাম দেন জুলুম-অত্যাচার। তিনি তাঁর কর্মকর্তাদের লেখেন যে, মানুষ আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সেইসব অসৎ কর্মকর্তাদের কারণে যারা খুব কমই সত্য-সততা, কোমলতা ও উপকারের পথ ও পন্থা অনুসরণ করেছে, বিপদ, কঠোরতা ও জুলুম-অত্যাচারে নিপতিত হয়েছে। আর তারা তাদের উপর খারাপ রীতি-পদ্ধতি চালু করেছে।'

এ কারণে তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর সর্বপ্রথম জনসাধারণের অধিকারের প্রতি মনোযোগ দেন এবং অন্যায়ভাবে জোর-জবরদস্তী দখলকৃত সকল সম্পদ তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দেন।

বানূ হাশিমের প্রতি বিদ্বেষ দূরীকরণ ও তাদের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা

হযরত নবী কারীমের (সা) বংশ বানূ হাশিমের অধিকার হরণের সূচনা হয় হযরত আমীর মু'আবিয়ার (রা) সময় থেকে। ফাদাক– যা ছিল হযরত রাসূলে কারীমের (সা) একান্ত অধিকারভুক্ত এবং যার আয় থেকে তিনি বানূ হাশিমকে সাহায্য করতেন, সেটা হযরত মু'আবিয়া (রা) মারওয়ানকে দান করেন।[২৫৬] খুমুস (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ), যা ছিল বানূ হাশিমের একক অধিকারের, তাও তিনি কেড়ে নেন। তবে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পূর্বে ওয়ালীদ ও সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের, যখন তাঁরা খিলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন, এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু তাঁরা উভয়ে বানূ হাশিমের এ অধিকার ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। তাই তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পরই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন এবং নিজের অতীত পরামর্শকে বাস্তবায়িত করেন। ফাদাকের ব্যাপারে আবূ বকর ইবন হাযমকে লেখেন; অনুসন্ধানের পর জানা গেছে ফাদাকের আয় ভোগ করা আমার জন্য বৈধ নয়। এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) সময়কালে, আবূ বকর, 'উমার ও 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে তা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দিই। পরে যা কিছু হয়েছে তা পরিহার করি। খুমুসের ব্যাপারেও তিনি অনুসন্ধান করেন এবং আবূ বকর ইবন হাযমের নিকট পাঁচ হাজার দীনারসহ একটি পত্র পাঠান। পত্রে

---

২৫৫. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৫
২৫৬. প্রাগুক্ত-২/৩৬৬

তিনি লেখেন : এর সঙ্গে আরো পাঁচ হাজার যোগ করে বানূ হাশিমের নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করুন। যদিও এতে যায়দ ইবন হাসান ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং মন্তব্য করেন : আমাদেরকে বান্দী-দাসীদের সমান করা হয়েছে। কিন্তু 'উমার তার কোন পরোয়া করেননি।

'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আকীলের একটি বর্ণনা আছে যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয প্রথমবারের মত কিছু অর্থ নবী-খান্দানের মধ্যে বন্টন করেন। তাঁতে নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু সকলে সমানভাবে অংশীদার ছিল। প্রত্যেকে তিন হাজার দীনার করে লাভ করেছিল। তিনি একটি পত্রে একথাও লিখে পাঠান যে, আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে আপনাদের সব অধিকারই ফিরিয়ে দেব।

নবী-খান্দানের উপর তাঁর এ অনুগ্রহের বিরাট প্রভাব পড়ে। তাঁরা তাঁর প্রবল সমর্থকে পরিণত হন। যেমন, একদিন 'আলী ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) ও আবূ জা'ফার ইবন 'আলী বসে আছেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের দুর্নাম করতে আরম্ভ করে। তাঁরা তাকে 'উমারের নিন্দা-মন্দ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন আমীর মু'আবিয়ার (রা) সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমরা "খুমুস" থেকে বঞ্চিত ছিলাম। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয 'আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের মধ্যে তা বন্টন করেছেন।

নবী-খান্দানের প্রতি 'উমারের এমন সদাচরণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে হযরত ফাতিমা বিনত হুসাইন (রা) একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণে আমাদের জন্য যে অর্থ পাঠিয়েছেন এবং আমাদের মধ্যে যা বণ্টিত হয়েছে আল্লাহ তা'আলা সেজন্য আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমাদের প্রতি জুলুম করা হচ্ছিল এবং আমাদের প্রতি ইনসাফ করা আপনার দায়িত্ব ছিল। হে আমীরুল মু'মিনীন! নবী-খান্দানের যাদের চাকর ছিল না তারা এখন চাকর রাখতে পেরেছে, যাদের কাপড় ছিল না, তারা কাপড় পেয়েছে, আর যাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য অর্থ ছিল না তারা সে অর্থ পেয়েছে।

হযরত ফাতিমা বিনত হুসায়নের (রা) এ পত্র নিয়ে 'উমারের নিকট এলে তিনি দারুণ খুশী হন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং পত্র-বাহক দূতকে দশ দীনার বখশীশ হিসেবে দান করেন। দূতকে বিদায় দেওয়ার সময় তার হাতে আরো পঞ্চাশ দীনার ও একটি পত্র ধরিয়ে দিয়ে বলেন, এগুলো ফাতিমাকে দিবে। পত্রে তিনি ফাতিমাকে লেখেন, এই দীনারগুলো আপনার প্রয়োজনে ব্যয় করুন।

তিনি আহলি বায়তের লোকদের অত্যন্ত সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন। একবার তাঁর মজলিসে ফাতিমা বিনত আল-হুসায়নের (রা) আলোচনা উঠলো। যখন কেউ একজন বললো, ফাতিমা মন্দ কাজ করা তো দূরের কথা, মন্দ কি তাও তিনি জানেন না। সাথে সাথে উমার মন্তব্য করলেন, মন্দ না জানাই মন্দ থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।[২৫৭]

---

২৫৭. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১২

উমাইয়্যা খান্দানের হাতে খিলাফতের দায়িত্বভার আসার পর থেকে জুম'আর খুতবায় আমীরুল মু'মিনীন হযরত 'আলীর (রা) প্রতি লা'নত তথা অভিশাপ দানের যে রীতি চলে আসছিল 'উমার তা পরিহার করার এবং তদস্থলে আল-কুরআনের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করার নির্দেশ দেন :[২৫৮]

إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى، يعظكم لعلكم تذكرون.[২৫৯]

'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন, তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।'

অনেকে বলেন, 'আলীর (রা) ব্যাপারে 'উমার তাঁর পিতা 'আবদুল 'আযীযের পথ অনুসরণ করেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি 'আলীকে (রা) অভিশাপ দিতেন না। খুতবা দানের সময় 'আলীর (রা) প্রসঙ্গ এলে তো তো করে তোৎলামির ভান করতেন। একদিন 'উমার তাঁর পিতার এমন আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : বেটা! 'আলী সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি, জনগণ যদি ততটুকু জানে তাহলে তারা আমাদেরকে ছেড়ে তাঁর সন্তানদের দিকেই চলে যাবে। সম্ভবতঃ পিতার এ কথায় পুত্র 'উমার দারুণ প্রভাবিত হন।[২৬০]

নবী-খান্দানের প্রতি 'উমারের এমন উদার ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণে জনসাধারণ দারুণ খুশী হয়। মানুষ তাঁর এ কাজকে একটি মহৎ কাজ বলে বিবেচনা করে এবং তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়ে। সেকালের আরব কবিগণও তাঁদের কবিতায় তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিখ্যাত কবি কুছায়্যির 'আয্যা (মৃ. হি. ১০৫/খ্রী. ৭২৩) তাঁর একটি কবিতায় বলেন :

وُلِّيتَ فلم تشتم عليًا ولم تُخِفْ بَرِيًّا ولم تتبع مقالة مجرم
تَكَلَّمْتَ بالحق المبين وإنما تُبَيِّنُ آيات الهدى بالتكلم
وصدَّقت معروف الذى قلت بالذى فعلتَ فأضحى راضيًا كلُّ مسلم
ألا إنما يكفى الفتى بعد زيغه من الأود البادى ثقاف الـمُقَوِّم

'আপনাকে খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়া হলো, আলীকে গালি দিলেন না, সৃষ্টি জগতের কাউকে ভয় দেখালেন না এবং কোন অপরাধীর কথাও মানলেন না।
আপনি স্পষ্ট সত্য উচ্চারণ করলেন। আর আপনি তো কথার মাধ্যমে সত্য-সঠিক পথের নিদর্শনাবলী ব্যাখ্যা করেন।

---

২৫৮. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-১/৬০৪
২৫৯. সূরা আন-নাহল : ৯০
২৬০. ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখ আল-ইসলাম-১/৩৩০

আপনি আপনার কর্মের দ্বারা কথাকে সত্যে পরিণত করলেন। ফলে প্রত্যেকটি মুসলমান সন্তুষ্ট হলো।

জেনে রাখুন, একজন যুবকের সত্য থেকে বিচ্যুতির পর যেভাবে ধারালো ও সোজা করার যন্ত্র দিয়ে তীর সোজা ও ধারালো করা হয় তেমনি তার জন্য একটু প্রচেষ্টাই যথেষ্ট।'

কবি কুছায়্যির 'উমারকে এ কবিতাটি শোনালে তিনি মন্তব্য করেন : أَفْلَحْنَا إِذًا – তাহলে আমরা সফল হয়েছি।[২৬১]

অত্যাচারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বরখাস্তকরণ

অন্যায়ভাবে জোর-জবরদস্তী দখলকৃত সম্পদ ফেরত দান ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কাজ করার পর তার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারমূলক কাজ ছিল কর্মচারী-কর্মকর্তাদের জুলুম-অত্যাচারের প্রতিবিধান করা। অবশ্য তাঁর পরামর্শ মত খলীফা সুলায়মানের সময়কালেই বহুলাংশে এর প্রতিবিধান হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কিছু প্রভাব বিদ্যমান ছিল। উমাইয়্যা শাসনকালে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ, তার গোটা খান্দান এবং তার অধীনের কর্মকর্তারা ছিল সবচেয়ে বেশী বেপরোয়া ও জঘন্য ধরনের অত্যাচারী-উৎপীড়ক।

খলীফা 'আবদুল মালিক ও তাঁর পুত্র আল-ওয়ালীদের খিলাফতকালের সবচেয়ে বড় অভিশাপ হলো হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের মত চরম অত্যাচারীর দীর্ঘ বিশ বছর যাবত গভর্ণর থাকা। কিরাত শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম 'আসিম ইবন আবী আন-নাজূদ (রহ) বলেন : 'আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজসমূহের মধ্যে এমন কোন কাজ ছিল না যা সে করেনি।' 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) বলতেন :

"لو جاءت كل أمة بمنافقيها وجئنا بالحجاج لفضلناهم."

'যদি দুনিয়ার সকল জাতি-গোষ্ঠী পাপাচারের প্রতিযোগিতা করে এবং নিজেদের সকল কপট পাপাচারীকে এনে দাঁড় করায় তাহলে আমরা কেবল হাজ্জাজকে দাঁড় করিয়ে তাদের সকলের উপর জয় লাভ করতে পারবো।'[২৬২] তার সময়ে আদালতের বিচার-ফয়সালা ছাড়া বন্দী অবস্থায় যাদের হত্যা করা হয়েছে, বলা হয়, কেবল তাদের সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজার। যখন সে মারা যায় তখন তার কারাগারে আশি হাজার নির্দোষ মানুষ বন্দী ছিল যাদেরকে কখনো আদালতে হাজির করা হয়নি।[২৬৩]

হাজ্জাজের মৃত্যুর খবর শুনে 'উমার সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন, হাজ্জাজের মৃত্যু যেন তার বিছানায় হয়, যাতে আখিরাতে সে কঠিন শাস্তি লাভ করে।

---

২৬১. আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৪২-৪৩; ড. 'উমার ফাররূখ,তারীখ-১/৬২০

২৬২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/৪৯

২৬৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২, ৮৩, ৯১, ১২৮, ১২৯, ১৩১, ১৩৮; আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/২৯, ১৩৩; খিলাফত ও মুলূকিয়াত-১৮৬

হাজ্জাজের মৃত্যুর পর মানুষ শোক প্রকাশের জন্য খলীফা ওয়ালীদের নিকট আসে। তারা তাদের শোক প্রকাশ ও হাজ্জাজের প্রশংসায় অনেক কথা বলে। সেখানে 'উমার উপস্থিত ছিলেন। ওয়ালীদ তাঁর দিকে তাকালেন যাতে মানুষে যা বলছে সেও যেন তেমন কিছু বলে। 'উমার বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! হাজ্জাজ আমাদের মধ্যকার একজন মানুষই ছিল।[২৬৪]

খলীফা আল-ওয়ালীদ ইবন আবদিল মালিকের দরবারে একবার 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের উপস্থিতিতে বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালী, বিশেষতঃ হাজ্জাজের জুলুম-অত্যাচারের প্রসঙ্গ ওঠে। 'উমার তখন বললেন :[২৬৫]

الحجاج بالعراق والوليد بالشام وقُرَّة بمصر وعثمان بالمدينة وخالد بمكة، اللهم قد امتلأت الدنيا ظلما وجورا فارح الناس!

'ইরাকে হাজ্জাজ, শামে ওয়ালীদ, মিসরে কুররা ইবন শারীক, মদীনায় 'উছমান ইবন হায়্যান, মক্কায় খালিদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-কাসারী– ইয়া আল্লাহ! জুলুম-অত্যাচারে এ দুনিয়া ভরে গেছে, তুমি মানুষকে শান্তি দাও।'

'আল্লাহ 'উমারের দু'আ কবুল করেন। এর এক মাসের মধ্যে হাজ্জাজ ও কুররা মৃত্যুবরণ করে, তার অল্প কিছু দিন পর মারা যায় আল-ওয়ালীদ। অতঃপর 'উছমান ও খালিদকে বরখাস্ত করা হয়।' অপর একটি বর্ণনায় ইয়ামনে মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফের কথাও এসেছে।[২৬৬]

'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) এই জুলুম-অত্যাচার নির্মূল করার দিকে মনোযোগী হওয়ার পর হাজ্জাজের গোটা খান্দানকে ইয়ামনে নির্বাসন দেন। তারপর সেখানের ওয়ালীকে লেখেন যে, তোমাদের নিকট আবূ 'আকীলের খান্দানকে– যেটি আরবের নিকৃষ্ট খান্দান, পাঠালাম। তাদেরকে একস্থানে থাকার সুযোগ না দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাও। তিনি হাজ্জাজের নিজ গোত্রের লোক অথবা যারা তার অধীনে কোন কাজ করেছে তাদেরকে সবরকম রাষ্ট্রীয় অধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার নির্দেশ দেন।[২৬৭]

আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের দমন নীতি বন্ধকরণ

উমাইয়্যা শাসন আমলে ভুল ধারণা ও সন্দেহবশতঃ ধরপাকড় ও শাস্তিদান খুব সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে যা ছিল মারাত্মক জুলুম। ঐতিহাসিক ইয়া'কূবীর বর্ণনা মতে খলীফা ওয়ালীদ এমন অপকর্মের সূচনা করেন এবং শুধুমাত্র

---

২৬৪. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/৫৫, ৫৭
২৬৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/৮৯; খিলাফত ও মুলূকিয়াত-১৮৭
২৬৬. আল-কামিল ফিল লুগা ওয়াল আদাব-১/৮৭, ১২৩
২৬৭. ইবনুল জাওযী-১১৪

সন্দেহের ভিত্তিতে বহু অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডের মত কঠোর শাস্তি দেন।[২৬৮] তাবারীর মতে যিয়াদই সর্বপ্রথম এমন অপকর্ম চালু করেন। যাই হোক না কেন, এই জুলুমের সূচনা হয় 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের খিলাফতকালের পূর্বে এবং অসংখ্য মানুষকে কেবল সন্দেহমূলক অপরাধের ভিত্তিতে হত্যা করা হয়। 'উমার খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর এ রকম শাস্তিকে সম্পূর্ণ অবৈধ ও সুন্নাতের পরিপন্থী বলে সিদ্ধান্ত দান করেন। তিনি এ জাতীয় শাস্তিদান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন।

মুসেলে চুরি-ছ্যাঁচড়ামির ঘটনা খুব বেশী পরিমাণে ঘটছিল। তাই সেখানকার ওয়ালী ইয়াহইয়া আল-গাসসানী খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযকে লিখলেন যে, সন্দেহের ভিত্তিতে ধরপাকড় করে শাস্তি দেওয়া না হলে এসব চুরি-ছ্যাঁচড়ামি বন্ধ হবে না।

জবাবে 'উমার লিখলেন, কেবল আইনসম্মত সাক্ষী-প্রমাণের ভিত্তিতে ধর-পাকড় ও শাস্তি দিবেন। সত্য যদি তাদের সংশোধন করতে না পারে তাহলে আল্লাহ সংশোধন না করুন।[২৬৯]

একবার আঞ্চলিক কর্মকর্তা 'আবদুল হামীদ ইবন 'আবদির রহমান 'উমারকে লিখলেন : এক ব্যক্তি আপনাকে গালি দিয়েছে। আমি তাকে হত্যা করতে চাই। 'উমার লিখলেন : যদি আপনি তাকে হত্যা করেন, আমি আপনাকে গ্রেফতার করবো। কারণ, একমাত্র নবীকে (সা) গালি দেওয়া ছাড়া কাউকে গালির কারণে হত্যা করা যায় না।[২৭০]

আরেকজন কর্মকর্তা 'উমারকে লিখলেন : আমরা একজন জাদুকরকে পানিতে ফেলে দিই। কিন্তু সে পানির উপরে ভেসে থাকে। তার ব্যাপারে আপনি সিদ্ধান্ত দিন। 'উমার লিখলেন : পানির সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। তার বিরুদ্ধে সাক্ষী-প্রমাণ থাকে তো পাকড়াও করুন, অন্যথায় ছেড়ে দিন।[২৭১]

একবার খুরাসানের ওয়ালী আল-জাররাহ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হাকামী লিখলেন : খুরাসানের লোকদের অভ্যাস-আচরণ অত্যন্ত খারাপ। কেবল চাবুক ও অসি ছাড়া আর কোন কিছু তাদেরকে সংশোধন করতে পারবে না। আমীরুল মু'মিনীন সমীচীন মনে করলে অনুমতি দান করবেন। জবাবে 'উমার (রহ) লিখলেন : আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি যে লিখেছেন, খুরাসানবাসীদেরকে চাবুক ও অসি ছাড়া আর কোন কিছু সংশোধন করতে পারবে না, একথা একদম ভুল। তাদেরকে সত্য ও ন্যায়বিচার সংশোধন করতে পারে। আর আপনি তাই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিন। তিনি আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের এ নির্দেশও দেন যে, আমার অনুমতি ছাড়া কোন অপরাধীকে হাত কাটার শাস্তি দিবে না।[২৭২]

---

২৬৮. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩৪৮
২৬৯. তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৮
২৭০. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৬
২৭১. প্রাগুক্ত-৪/৪৩৩, ৪৩৭; ৫/২৬৬
২৭২. তারীখ আল-খুলাফা'-২৪৩; আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/১৫৮, ১৬৩

সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে কম মূল্যে জনসাধারণের নিকট থেকে জিনিসপত্র কেনার ব্যাপারে শক্তভাবে বারণ করেন। ফারেসের ওয়ালী 'আদী ইবন আরতাতকে তিনি লিখলেন : আমি জেনেছি আপনার কর্মকর্তারা অনুমানের ভিত্তিতে বাজার দরের চেয়ে কম মূল্যে ফল ক্রয় করে। কোন কোন গোত্র অস্থানীয়দের নিকট থেকে 'উশর আদায় করে। যদি জানা যায় যে, এসব কিছু আপনার ইচ্ছা অথবা ইঙ্গিতে হয়েছে তাহলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। বিষয়গুলো তদন্তের উদ্দেশ্যে আমি বিশ্র ইবন সাফওয়ান, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আজলান ও খালিদ ইবন সালিমকে পাঠালাম। যদি তারা সঠিক বলে প্রমাণ পায় তাহলে সমস্ত ফল তার মালিককে ফিরিয়ে দিবেন। এছাড়া আর যে সকল বিষয়ের কথা আমি জেনেছি, তারা সেসব কিছুও তদন্ত করবে। আপনি তাদের সাথে কোন প্রকার অসহযোগিতা করবেন না।

একই ধরনের মাপ চালু ও সরকারী কর্মকর্তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা নিষিদ্ধকরণ

তিনি গোটা খিলাফতের সর্বত্র একই ধরনের মাপ চালু করেন। প্রাদেশিক ওয়ালী ও রাষ্ট্রের আমলাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। তিনি লেখেন :[২৭৩]

ونرى ألاَّ يَتَّجر إمام، ولايحل لعامل تجارة في سلطانه الذى هو عليه، فإن الأمير متى يتجر ليستأثر ويصيب أمورًا فيها عنت، إن حرص ألاَّ يفعل.

'আমরা মনে করি কোন শাসনকর্তার ব্যবসা-বাণিজ্য করা উচিত নয়। কোন কর্মকর্তার তার শাসনাধীন অঞ্চলে ব্যবসা করা বৈধ নয়। কারণ, একজন শাসক যখন ব্যবসা করবে তখন সে না চাইলেও এমন সব কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়বে যা জনগণের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।' 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কয়েক শো বছর পর জন্ম হয় প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ইবন খালদুনের। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে 'উমারের মত একই কথা বলেন :[২৭৪]

إن التجارة من السلطانُ مضِرَّةٌ بالرعايا مفسدة للضريبة.

'শাসকের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা জনগণের জন্য যেমন ক্ষতির কারণ, তেমনি ধ্বংসের কারণ ট্যাক্স-কর ব্যবস্থারও।'

বেগার শ্রম নিষিদ্ধকরণ

সব ধরনের বেগার শ্রমকে তিনি আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এ রকম বেগার শ্রমিকের ঘামঝরা শ্রমের দ্বারাই প্রাচীন মিসরের পিরামিড এবং রোমান সাম্রাজ্যে বিশাল প্রাসাদ, স্তম্ভ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। তাই 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন :[২৭৫]

---

২৭৩. ইবনুল জাওযী-৯৯; রিজালুল ফিক্র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৪৬
২৭৪. ইবন খালদূন, মুকাদ্দিমা-১৯৭
২৭৫. ইবনুল জাওযী-১০০

ونرى أن توضع السُّخَر عن أهل الأرض، فإن غايتها أمور يدخل فيها الظلم.

'আমরা চাই পৃথিবীর অধিবাসীদের উপর থেকে বেগার শ্রম দূরীভূত হোক। কারণ, এর পরিণতিতে এমন সব বিষয় থাকে যাতে জুলুম-অত্যাচার ঢুকে যায়।'

একবার একজন কর্মকর্তা কোন রকম পারিশ্রমিক প্রদান ছাড়াই জনৈক ব্যক্তির জন্তুর পিঠে সাওয়ার হয়ে তাঁর নিকট আসে। তিনি তা জানতে পেরে বলেন, আমার শাসনামলে তোমরা এমন বেগার খাটাও? তারপর তাকে ৪০টি বেত্রাঘাত করেন।

সরকারী চারণক্ষেত্র সকলের জন্য উন্মুক্তকরণ

রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশকে আমীর-উমারা, শাহী খান্দানের লোকেরা এবং শাসনকর্তারা নিজেদের শিকার ক্ষেত্র অথবা চারণভূমিতে পরিণত করে পতিত রেখে দিয়েছিল। তিনি নির্দেশ দেন যে, তার সবকিছুতে জনগণের অধিকার আছে। তিনি বলেন :[২৭৬]

ونرى أن الحمى يباح للمسلمين عامة ... وإنما الإمام فيها كرجل من المسلمين، إنما هو الغيث ينزله الله لعباده فهم فيه سواء.

'আমরা চাই চারণভূমি সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য বৈধ করা হোক।... তাতে ইমাম ও আমীরের অধিকার একজন সাধারণ মুসলমানের মত সমান। আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তাতে সবার সমান অধিকার।'

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ও তিনি গভীরভাবে ভেবে দেখেন। যেখানেই তিনি কোন অন্যায় ও অসাধুতার ছিদ্র খুঁজে পেয়েছেন, তা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তেমন একটি বিষয় আমলাদের জনসাধারণের নিকট থেকে হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করা। সরকারী কর্মকর্তারা হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করতো। কারণ, তা গ্রহণ করা সুন্নাত। কিন্তু 'উমার সময়, অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই তিনি সরকারী কর্মকর্তাদের জনসাধারণের নিকট থেকে হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। একবার তাঁকে কিছু হাদিয়া দেওয়া হলে তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন এক ব্যক্তি বলে, রাসূলুল্লাহ (সা) হাদিয়া গ্রহণ করতেন। জবাবে তিনি বললেন :[২৭৭]

هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ولنارشوة ولاحاجة لى به.

'যা রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য হাদিয়া তা হয়েছে আমাদের জন্য রিশওয়াত বা ঘুষ। এর প্রয়োজন আমার নেই।'

খলীফাদের ঘিরে একটি বেষ্টনী তৈরি হয়েছিল। সাধারণ মানুষের যেমন তাঁর কাছে

---

২৭৬. প্রাগুক্ত-৯৭; রিজালুল ফিক্র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৪৬
২৭৭. ইবনুল জাওযী-৩৬; রিজালুল ফিকর ওয়াদ দা'ওয়া-১/৪৬

পৌঁছার কোন সুযোগ ছিল না, তেমনি মানুষের হাল-হাকীকত এবং খিলাফতের সার্বিক অবস্থা জানার উপায়ও তাঁর ছিল না। পারিষদবর্গ সর্বদাই তাঁকে লোহার বেষ্টনীর মত ঘিরে রাখতো। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালীদের প্রতি নির্দেশ পাঠান তাঁরা যেন জনসাধারণকে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ এবং অভাব-অভিযোগ পেশ করার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। কেউ কোন সঠিক তথ্য খলীফাকে অবহিত করলে অথবা ইসলামী খিলাফত ও মুসলমানদের কল্যাণমূলক কোন প্রস্তাব বা পরামর্শ দান করলে 'উমার তার জন্য পুরস্কার ও আর্থিক ভাতা ঘোষণা করেন।

হজ্জের সময় ঘোষণা দেওয়া হতো : কারো উপর জুলুম করা হয়েছে– এমন কোন তথ্য কেউ প্রদান করলে, অথবা জনকল্যাণ ও দীনের কোন ব্যাপারে সৎ পরামর্শ দিলে তাকে এক শো' থেকে তিন শো' দীনার পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।[২৭৮]

প্রাদেশিক শাসনকর্তা 'আবদুল হামীদকে তিনি প্রথমে লিখলেন : 'শয়তানের প্ররোচনা এবং রাষ্ট্রীয় জুলুম-অত্যাচারের পর মানুষের কোন স্থায়িত্ব থাকতে পারে না। এ কারণে আমার এ চিঠি পাওয়ার সংগে সংগে প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা পরিশোধ করবেন।' সকল প্রকার অন্যায় ট্যাক্স তিনি মওকুফ করে দেন।[২৭৯] এছাড়া যাবতীয় নিবর্তনমূলক রীতি-পদ্ধতি তিনি রহিত করেন। পূর্ববর্তী খলীফা ও আমলারা বিশ প্রকার ট্যাক্স উদ্ভাবন করেছিল, তিনি তা চিরতরে মাফ করে দেন।[২৮০]

'উমারের সন্তুষ্টি

একবার মদীনা থেকে এক ব্যক্তি খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট আসলো। তিনি তাঁর নিকট মদীনার অধিবাসীদের সম্পর্কে জানতে চান। লোকটি বললো, আপনি চাইলে আংশিক তথ্য অথবা পূর্ণ তথ্য দিতে পারি। 'উমার বললেন, বিস্তারিতভাবে পূর্ণ তথ্যই দাও। লোকটি বললো :

إني تركت أهل المدينة والظالم بها مقهور، والمظلوم منصور، والغنيّ موفور، والعائل مجبور.

'আমি মদীনাবাসীদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, তথাকার অত্যাচারী পরাজিত, অত্যাচারিত সাহায্য প্রাপ্ত, ধনী আরো প্রাচুর্যের অধিকারী ও ক্রন্দনকারী সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হয়েছে।' তার বক্তব্য শুনে 'উমার দারুণ খুশী হলেন। বললেন :

والله لئن تكون البلدان كلهاعلى هذه الصفة أحبُّ إليّ مما طلعت عليه الشمس.

'বিশ্বের যেখানে সূর্যোদয় হয় তার সবটুকু আমার হাতের মুঠোয় আসার চেয়ে সকল শহর যদি তোমার বর্ণিত অবস্থায় থাকে তাহলে সেটাই আমার অধিকতর পছন্দনীয়।'[২৮১]

---

২৭৮. ইবনুল জাওযী-১৪১

২৭৯. তাবাকাত-৫/৩৭১, ৩৮৩

২৮০. ইবনুল জাওযী-৯৯

২৮১. আল-কিন্দী, তারীখ আল-কুদাত-৩৪৪; আহমাদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম-২৩৬

বিচার ব্যবস্থা

একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পদসমূহের একটি হলো বিচারকের পদ। এ পদটি সবচেয়ে বেশী স্পর্শকাতর এবং জনগণের উপর সর্বাধিক প্রভাবশালীও। একজন কাযী বা বিচারক প্রতিদিন মানুষের সামনে আসেন, তাদের মধ্যে বিচার কাজ পরিচালনা করেন, তাদের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করেন। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, উযীর-শ্রমিক, অখ্যাত-বিখ্যাত প্রতিটি শ্রেণী ও স্তরের মানুষ তাঁর কাছে আসে। তিনি যদি বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ না হন, বিজ্ঞ-বিচক্ষণ না হন; খোদাভীরু ও সত্যের উপর অটল না হন এবং মানুষের অধিকারে যা কিছু আছে সে ব্যাপারে পাক-পবিত্র মানসের না হন, তাহলে তাঁর দ্বারা প্রথম যার ক্ষতি হয় সে হলো রাষ্ট্র ও আমীরুল মু'মিনীন তথা রাষ্ট্র-প্রধানের। এ কারণে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মত বিজ্ঞ-বিচক্ষণ খলীফা বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। বিচারক হওয়ার জন্য অনেকগুলো গুণ থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন এবং সেভাবে নির্বাচন করে কিছু বিচারক নিয়োগ করেন। তিনি কেবল বিচারক নিয়োগ করেই বসে থাকেননি, তাদেরকে সর্বদা সময়োপযোগী দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, 'উমারের সাফল্যের পিছনে এই বিচারকদের বিরাট অবদান রয়েছে।

মুযাহিম ইবন যুফার বলেন :[২৮২]

قدمت على عمر بن عبد العزيز فى وفد أهل الكوفة، فسألنا عن بلدنا وأميرنا وقاضينا، ثم قال : خمس إن أخطأ القاضى منهن خصلةً كانت فيه وصمة : أن يكون فهيمًا، وأن يكون حليمًا، وأن يكون عفيفًا، وأن يكون صليبًا، وأن يكون عالمًا يسأل عما لايعلم.

'আমি কূফার একটি প্রতিনিধি দলের সংগে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট গেলাম। তিনি আমাদের শহর, আমীর ও কাজী সম্পর্কে জানার জন্য আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বললেন : পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কোন একটি যদি কোন কাজীর মধ্যে না থাকে তাহলে তার একটি ত্রুটি বলে বিবেচিত হয়। ১. তিনি হবেন বুদ্ধি-দীপ্ত, ২. তিনি হবেন ধৈর্যশীল, ৩. তিনি হবেন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী, ৪. তিনি হবেন দৃঢ় ও অনমনীয়, ৫. তিনি হবেন এমন জ্ঞানী, কিছু জানা না থাকলে তা অন্যকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন।'

তিনি বিচারকের গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো বলেছেন :[২৮৩]

إذا كان فى القاضى خمس خصال فقد كمل : علم بما كان قبله، ونزاهة عن

---

২৮২. তাবাকাত-৫/৩৬৯-৩৭০; শাজারাত আয যাহব-১/২০

২৮৩. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-১/৮৪

الطمع، وحلم عن الخصم واقتداء بالأئمة، ومشاورة أهل العلم والرأى.

'একজন কাজীর মধ্যে যখন পাঁচটি গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তখন তিনি হন একজন পূর্ণ কাজী। ১. পূর্ববর্তী বিচার-ফয়সালা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, ২. লোভ-লালসা হতে পবিত্র থাকা, ৩. বিবদমান পক্ষদ্বয়ের প্রতি ধৈর্য ও সহনশীল থাকা, ৪. পূর্ববর্তী ইমামদের অনুসরণ করা এবং ৫. জ্ঞানী ও সিদ্ধান্ত দানের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা।'

অপর একটি বর্ণনা মতে, তিনি পূর্বে উল্লেখিত গুণগুলোর সাথে আরো একটি গুণের কথাও বলেছেন। তা হলো : তিনি মানুষের তিরস্কার ও সমালোচনার ব্যাপারে হবেন বেপরোয়া।[২৮৪]

এসব মূলনীতি ও মাপকাঠির আলোকেই 'উমার তাঁর সকল কাজী নিয়োগ করেন। তিনি কাজীদের নিয়োগ দান করেই বসে থাকেননি, বরং সব সময় তাঁদের করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন :[২৮৫]

إذا أتاك الخصم وقد فُقِئَتْ عَيْنُهُ، فلا تحكم له حتى يأتي خصمه؛ فلعله قد فُقِئَت عيناه جميعًا.

'যখন বাদী তার এক চোখ উপড়ানো অবস্থায় আপনার নিকট আসে তখন বিবাদী না আসা পর্যন্ত তার পক্ষে রায় দিবেন না। কারণ, হতে পারে তার দু'চোখই উপড়ে ফেলা হয়েছে।'

খুরাসানে কাজী হিসেবে নিয়োগ দানের জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছিলেন। তিনি আবূ মিজলাযকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন : অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন? বললেন : কৃত্রিমভাবে প্রস্তুতকৃত। সে এর উপযুক্ত নয়। আবার জিজ্ঞেস করলেন : অমুক? বললেন : দ্রুত রেগে যায়, মোটেই খুশী হয় না। প্রচুর চায়, খুব কম বিরত হয়। ভাইকে হিংসা করে, পিতার সাথে পাল্লা দেয় এবং দাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তিনি আবার প্রশ্ন করেন : অমুক? বললেন : সমকক্ষের সাথে প্রতিযোগিতা করে, শত্রুর সাথে শত্রুতা করে এবং যা খুশী তাই করে। 'উমার মন্তব্য করেন : এদের কারো মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।[২৮৬]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মায়মূন ইবন মিহ্‌রানকে 'আল-জাযীরা'র বিচার ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর মায়মূন অব্যাহতি চেয়ে তাঁকে লিখলেন : 'আমি একজন দুর্বল বয়োবৃদ্ধ মানুষ। আমাকে মানুষের ঝগড়া-বিবাদের বিচার করতে হয়। আমার সাধ্যাতীত বোঝা আমার কাঁধে চাপিয়েছেন।' জবাবে 'উমার লিখলেন :[২৮৭]

---

২৮৪. ইবনুল জাওযী-২৭৫

২৮৫. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-১/৮৪; আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/৪৯৩

২৮৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-১/১৫

২৮৭. কিতাবুল খারাজ-১১৫; ইবনুল জাওযী-১১৯

إجْبِ الخَرَاجَ الطيب، واقض ما استبانَ لك، وإذا التبس عليك أمر فارفعه إليَّ، فـان الناس لو كانوا إذا كثر عليهم شئ تركوه ما قام لهم دين ولا دنيا.

'পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কর আদায় করুন। যা কিছু আপনার নিকট স্পষ্ট হবে কেবল সে ব্যাপারে ফয়সালা করবেন। কোন ব্যাপার আপনার নিকট অস্পষ্ট হলে তা আমাকে অবহিত করবেন। কোন কিছু বেশী হলেই মানুষ যদি তা পরিত্যাগ করতো তাহলে দীন ও দুনিয়ার কিছুই বিদ্যমান থাকতো না।'

তিনি কাজীদেরকে মানুষের সাথে বসতে, সর্বসাধারণের জন্য দরজা খোলা রাখতে এবং আদল ও ইনসাফের ভিত্তিতে তাদের অধিকার লাভের পথ সহজসাধ্য করতে সব সময় নির্দেশ দিতেন। মদীনার কাজী ও আমীর ইবন হাযমকে লিখলেন :[২৮৮]

إيَّاك والجلوس فى بيتك، اخرج للناس، فآس بينهم فى المجلـس والمنظـر، ولايكـن أحد من الناس آثر عندك من أحد...

'আপনি আপনার বাড়ীতে বসে থাকা পরিহার করুন। মানুষের মধ্যে বের হোন এবং বৈঠকে, দেখা-সাক্ষাতে তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করুন। কারো উপর কেউ যেন আপনার নিকট প্রাধান্য না পায়।'

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কাজীগণ অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। মানুষের ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা এবং মজলুমের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা রাত-দিন একাধারে কাজ করেন। তাঁদের খলীফার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার দীপ্তি ও আভায় তাঁদের অন্তকরণ ও বুদ্ধি আলোকিত হয়ে ওঠে। তাই তাঁরা হয়ে ওঠেন সর্বোত্তম খলীফার সর্বোত্তম কাজী। ইবরাহীম ইবন জা'ফর তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[২৮৯]

رأيت أبا بكر محمد بن عمرو بـن حـزم يعمـل بـالليل كعمله بالنـهار، لاسـتحثاث عمر إياه.

'আমি আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন 'আমর ইবন হাযমকে দেখেছি, তিনি তাঁর দিনের কাজের মত রাতেও কাজ করছেন। 'উমারের উৎসাহে তিনি একাজ করতেন।'

সত্য ও সঠিকভাবে বিচার কাজ সম্পন্ন করার প্রথম ও পূর্বশর্ত হলো সাক্ষী ও প্রমাণ। ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে অথবা লোভ দেখিয়ে যাতে কেউ সাক্ষীকে সাক্ষ্যদান থেকে বিরত না রাখে সে ব্যাপারেও তিনি সতর্ক ছিলেন। তিনি নিজে একটি মামলার একজন সাক্ষীকে ভয় দেখানোর অপরাধে এক ব্যক্তিকে তিরিশটি বেত্রাঘাত করেন। এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালী ও কাজীদেরকে একটি পত্রে লেখেন :[২৯০]

---

২৮৮. তাবাকাত-৫/৩৪৩
২৮৯. প্রাগুক্ত-৫/৩৪৭; ইবনুল জাওযী-১০২
২৯০. তাবাকাত-৫/৩৮৫

فأيُّما رجل آذى شاهد عدل فاضربه ثلاثين سوطا، وقفه للناس.

'কোন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীকে কেউ কষ্ট দিলে তাকে তিরিশটি বেত্রাঘাত করুন এবং মানুষের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখুন।'

বিচার কাজে তিনি কাজীদেরকে তাঁদের বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগাতে বলেছেন। আল-কিন্দীর 'তারীখ আল-কুজাত' গ্রন্থে এসেছে, একবার মিসরের কাজী আয়্যাদ ইবন 'উবাইদুল্লাহ একটি বিষয়ে 'উমারের পরামর্শ চেয়ে পত্র লিখলেন। জবাবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লিখলেন :[২৯১]

إنه لم يبلغني في هذا شئ وقد جعلته لك فاقض فيه برأيك.

'এ ব্যাপারে আমার নিকট পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে কিছু পৌঁছেনি। বিষয়টি আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি আপনার বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা ফয়সালা করুন।'

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের শাসনকালের অন্যতম সফলতা এই যে, তিনি সুবিজ্ঞ 'আলিম ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ পূতঃপবিত্র মানসের আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গকে কাজী হিসেবে নিয়োগ দান করেন, শতকের পর শতক ধরে যাঁদের সুনাম ও খ্যাতি পৃথিবীর মানুষের কানে প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। তাঁদের কয়েকজন হলেন :

১. ইমাম আল-হাসান আল-বসরী (রহ) : তিনি কিছুদিন বসরার কাজী ছিলেন। তারপর তিনি অব্যাহতি চাইলে 'উমার তাঁকে অব্যাহতি দেন।

তিনি বসরার ইমাম এবং তাঁর সময়ের তত্ত্বজ্ঞানী 'আলিম। মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। হযরত 'আলী ইবন আবী তালিবের (রা) তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালে খুরাসানের ওয়ালী রাবী' ইবন যিয়াদ তাঁকে সেক্রেটারী হিসেবে গ্রহণ করেন। বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে মানুষের মনে সশ্রদ্ধ ভীতির উদ্রেক হতো। তিনি ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের মুখোমুখী নির্ভীকভাবে তাদের সমালোচনা করতেন, আদেশ-নিষেধ করতেন। সত্য উচ্চারণে কারো পরোয়া করতেন না।

ইমাম আল-গাযালী (রহ) বলেন : কথার দিক দিয়ে হাসান আল-বসরী ছিলেন আম্বিয়াদের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ এবং জীবন যাপনের দিক দিয়ে সাহাবীদের অধিক নিকটবর্তী। তিনি ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের শুদ্ধভাষী। তাঁর মুখ থেকে সব সময় জ্ঞান ও উপদেশপূর্ণ কথা বের হতো। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হওয়ার পর তাঁকে লেখেন :

إني قد ابتليت بهذا الأمر فانظرني أعوانًا يعينوني عليه.

'এই খিলাফতের দায়িত্ব দ্বারা আমাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আপনি আমার জন্য কিছু সাহায্যকারী দেখুন।' জবাবে হাসান লেখেন :

---

২৯১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/২৫৪

أما ابناء الدنيا فلا تريدهم، وأما ابناء الآخرة فلا يريدونك، فاستعن بالله.

'দুনিয়ার সন্তানরা, তা তাদেরকে আপনি চাইবেন না। আর আখিরাতের সন্তানরা, তা তারা আপনাকে চাইবে না। অতএব আপনি আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন।'[২৯২]

২. ইয়াস ইবন মু'আবিয়া : হাসান আল-বসরীর স্থলে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। তিনি তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

৩. 'আমির আশ-শা'বী : তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীছ ও ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ, ইমাম। তিনি কূফার কাজী ছিলেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালের পূর্ণ সময়ে তিনি সেখানকার কাজীর দায়িত্ব পালন করেন।

৪. আবূ তুওয়ালা : তিনি একজন আস্থাভাজন নির্ভরযোগ্য ফকীহ ছিলেন। অত্যধিক সিয়াম পালনকারী, অতিরিক্ত সালাত আদায়কারী এবং কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনকারী মানুষ ছিলেন।

৫. সুলায়মান ইবন হাবীব আল-মুহারিবী আদ-দিমাশ্কী আদ-দাররানী : দিমাশ্কের কাজী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উঁচু মর্যাদার অধিকারী ইমাম। তাঁর সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবন মু'ঈন বলেন : তিনি তিরিশ বছর যাবত দিমাশ্কের শাসনকর্তা ছিলেন।

৬. মায়মূন ইবন মিহ্রান : তিনি ছিলেন একজন ফকীহ, মুফতী ও মুত্তাকী ইমাম। আল-জাযীরার বিচার ও কর-খাজনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[২৯৩]

রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর কর্মধারা

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বুঝেছিলেন রাষ্ট্রের প্রতিটি কাঠামোর পরিচালকদের অবশ্যই দায়িত্বশীল হতে হবে, চরিত্র ও আদর্শবাদিতায় অনুসরণীয় মানের হতে হবে। তাঁর দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের চারটি স্তম্ভ। তিনি বলেন :[২৯৪]

إن للسلطان أركانًا لايثبت إلا بها : فالوالى ركن، والقاضى ركن، وصاحب بيت المال ركن، والركن الرابع أنا.

'একজন শাসকের থাকে অনেকগুলো স্তম্ভ। এগুলো ছাড়া সে দৃঢ়পদ হতে পারে না। আঞ্চলিক ওয়ালী বা কর্মকর্তা একটি স্তম্ভ, কাজী একটি স্তম্ভ, বায়তুল মাল-এর পরিচালক একটি স্তম্ভ এবং চতুর্থটি আমি নিজে।"

একজন খলীফা যতই যোগ্যতাসম্পন্ন ও সত্যনিষ্ঠ হোন না কেন এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও জনগণের কল্যাণের যত সদিচ্ছাই তাঁর থাকুক না কেন তিনি কোনভাবে সফলকাম হবেন

---

২৯২. হিলয়াতুল আওলিয়া-১৩১

২৯৩. তারাবী, তারীখ-৭/৪৫৭-৪৫৮; তাবাকাত-৫/৩৪১; আল-কামিল ফিত তারীখ-৪/১৫৪-১৫৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/১৮৫

২৯৪. তাবারী, তারীখ-৭/৪৭৩

না যদি না তাঁর পাশে রাষ্ট্রযন্ত্রের কিছু সৎ ও যোগ্য পরিচালক ও উপদেষ্টামণ্ডলী থাকেন। এ কারণে তিনি তাঁর পরামর্শক ও সহযোগী হিসেবে কিছু লোক বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরা সব সময় তাঁকে সৎ পরামর্শ দিয়েছেন এবং সঠিক কাজটি করার জন্য সহযোগিতা করেছেন।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর ন্যায়পরায়ণ শাসন ব্যবস্থায় আরব ও অনারবের মধ্যে সাম্য ও সমতা বিধান করেন। কোন বংশ-গোত্রের প্রতি কোন রকম অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করেননি। আঞ্চলিক ওয়ালীগণকে কেবল তাদের যোগ্যতা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেন এবং যারা সত্য ও আদল-ইনসাফ পরিপন্থী কাজে দুঃসাহস দেখান তাদেরকে অপসারণ করেন। এই মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি আল-জাররাহ ইবন 'আবদিল্লাহকে অপসারণ করেন। এ কারণে তাঁর সময়কালে সর্বত্র একটা সম্প্রীতি ও ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তাঁর এই ন্যায়-নীতি ভিত্তিক সুশাসনে যাঁরা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

রাজা' ইবন হায়ওয়া, ইয়াস ইবনু মু'আবিয়া, 'আবদুর রহমান ইবন নু'আইম, 'আবদুর রহমান ইবন 'আবদিল্লাহ আল-কাশইয়ারী, 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুগীরা, মাকহূল (শামের ফকীহ), আস-সামহ ইবন মালিক আল-খাওলানী, 'আদী ইবন আরতাত, আল-হাসান আল-বসরী, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কারাজী, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ, যিয়াদ ইবন আবী যিয়াদ, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উতবা, আল-কাসিম ইবন রাবী'আ আল-জাওশানী, মায়মূন ইবন মিহ্রান, আবূ কিলাবা, ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব, জা'ফার ইবন রাবী'আ, 'আবদুল্লাহ ইবন আবী জা'ফার (রহ) ও আরো অনেকে।[২৯৫]

এখানে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো :

১. রাজা' ইবন হায়ওয়া (রহ) : তাঁর সময়ে তিনি শামের শায়খ (ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব), ওয়ায়িজ ও বাগ্মী 'আলিম ছিলেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যখন আমীর ছিলেন এবং পরবর্তীকালে যখন খলীফা হন– উভয় অবস্থায় রাজা' তাঁর সংগে ছিলেন। খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক তাঁকে সেক্রেটারী হিসেবে গ্রহণ করেন। মূলতঃ তিনিই 'উমারকে খলীফা মনোনীত করার জন্য সুলায়মানকে পরামর্শ দেন।[২৯৬]

২. ইয়াস ইবন মু'আবিয়া (রহ) : তিনি ছিলেন বসরার কাজী। তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির জন্য যাদেরকে যুগের বিস্ময় বলে মনে করা হতো তিনি তাঁদের একজন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও আন্দাজ-অনুমান সত্যে পরিণত হওয়া প্রবাদে পরিণত হয়। একবার তাঁকে বলা হলো : আপনি একজন বিস্ময়কর মানুষ ছাড়া আপনার মধ্যে আর কোন দোষ নেই। বললেন : আমি যা বলি তা কি তোমাদেরকে বিস্মিত করে? লোকেরা বললো : হাঁ! বললেন : তাহলে আমাকে দেখে বিস্মিত হওয়া অধিকতর সঙ্গত।

---

২৯৫. 'আলী-ফা'উর, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয-১১০

২৯৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১১; তাহযীব আত-তাহযীব-৩/২৬৫

তিনি ওয়াসিত নগরে গেলেন। কিছুদিন পর সেখানকার অধিবাসীদের বললেন : যে দিন আমি আপনাদের এই শহরে এসেছি সেদিনই আমি আপনাদের ভালো ও মন্দ লোকগুলোকে চিনে ফেলেছি। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : কিভাবে? বললেন : আমাদের সাথে কিছু ভালো লোক আছে এবং তাদের সাথে আপনাদের কিছু লোকের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর ঠিক বিপরীতে আমাদের সাথে কিছু খারাপ লোক আছে এবং তাদের সাথে আপনাদের কিছু লোকের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর দ্বারা আমি বুঝেছি আপনাদের ভালো মানুষের সাথে আমাদের ভালো মানুষের এবং আপনাদের মন্দ মানুষের সাথে আমাদের মন্দ মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আল-জাহিজ বলেন : ইয়াস মুদার গোত্রের গর্ব এবং কাজীদের পুরোধা। তাঁর আন্দাজ-অনুমান সত্য-সঠিক হতো। বিস্ময়কর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, ইলহাম প্রাপ্ত এবং খলীফাদের নিকট অত্যন্ত মান্যবর ব্যক্তি ছিলেন।[২৯৭]

৩. মাকহূল (রহ) : তিনি একজন হাফেজে হাদীছ এবং তাঁর সময়ে শামের ফকীহ ছিলেন। তাঁর মূল পারস্যের। কাবুলে জন্ম এবং সেখানে বেড়ে ওঠেন। যুদ্ধবন্দী হিসেবে আরবদের হাতে আসেন এবং সেখান থেকে মিসরে এক মহিলার মালিকানায় চলে যান। তাঁর সাথেই তাঁর পরিচয় আরোপ করা হয়। অতঃপর দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। ফিকাহ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। হাদীছের জ্ঞান অর্জনের জন্য ইরাক যান এবং সেখান থেকে যান মদীনায়। তৎকালীন মুসলিম খিলাফতের বহু অঞ্চল ও শহর ভ্রমণ করেন। অবশেষে দিমাশ্কে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ইমাম যুহ্রী বলেন : মাকহূলের সময়ে ফাতওয়া বিষয়ে তাঁর চেয়ে অধিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আর কেউ নেই।[২৯৮]

৪. আস-সামহু ইবন মালিক (রহ) : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে স্পেনের আমীর নিয়োগ করেন। তাঁকে স্পেনের একটা লিখিত পরিচয় ও বিবরণ লিখে পাঠাতে বলেন এবং ভূমি জরিফ করে খারাজ, খুমুস ও 'উশর নির্ধারণ করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী হি. ১০০ সনে তিনি একটি বিবরণ উপস্থাপন করেন এবং অন্য সকল নির্দেশ বাস্তবায়ন করেন। বালাতের যুদ্ধে, স্পেনের মাটিতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলের রাজধানী ছিল কর্ডোভা। এই কর্ডোভার পুলটি তিনি নির্মাণ করেন।[২৯৯]

৫. 'আদী ইবন আরতাত (রহ) : তিনি দিমাশ্কের অধিবাসী ছিলেন। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ও সাহসী ব্যক্তি। হিজরী ৯৯ সনে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে বসরার ওয়ালী নিয়োগ করেন এবং ইরাকে ইয়াযীদ ইবন আল-মুহাল্লাবের বিদ্রোহের ডামাডোলে ওয়াসিতে মু'আবিয়া ইবন ইয়াযীদের হাতে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।[৩০০]

---

২৯৭. ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান-১/৮১; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৫৬
২৯৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০১; আল-আ'লাম-৭/৩৮৪
২৯৯. নাফহুত তীব-১/১১১
৩০০. আল-মুবাররাদ, আল-কামিল ফিল লুগা-২/১৪৯; তারীখ আল-ইয়া'কূবী-৩/৫২

৬. সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (রহ) : তিনি মদীনার বিখ্যাত সাত ফকীহ্র অন্যতম এবং বিশ্বস্ত 'আলিম ও শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের একজন। স্বৈরাচারী উমাইয়া খলীফাগণ তাঁকে ভীষণ সম্মান ও সমাদর করতেন। একবার সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের দরবারে যান। সুলায়মান নিজ আসন থেকে নেমে তাঁকে স্বাগতম জানান এবং তাঁকে সংগে নিয়ে নিজের আসনে পাশাপাশি বসান।[৩০১]

৭. 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উতবা (রহ) : তিনি মদীনার বিখ্যাত সাত ফকীহ্র অন্যতম ও তথাকার মুফতী। তিনি একজন কবি। তাঁর অনেক চমৎকার কবিতা আছে। একটি কবিতা আবূ তাম্মাম তাঁর বিখ্যাত "আল-হামাসা" সংকলনে সন্নিবেশ করেছেন। তাছাড়া আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী তাঁর বিখ্যাত "কিতাবুল আসানী" গ্রন্থে অনেক কবিতা সংকলিত করেছেন। তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের একজন শিক্ষক ছিলেন।[৩০২]

৮. মায়মূন ইবন মিহ্রান (রহ) : একজন কাজী ও ফকীহ্। তিনি কূফার এক মহিলার দাস ছিলেন এবং তিনি তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। কূফায় বেড়ে ওঠেন। অতঃপর রাক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি আল-জাযীরার একজন 'আলিম ও নেতা ছিলেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে তথাকার রাজস্ব কর্মকর্তা ও কাজী হিসেবে নিয়োগ দেন। ১০৮ হিজরীতে মু'আবিয়া ইবন হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক সাগর পাড়ি দিয়ে যে "কুবরুস" (সাইপ্রাস) অভিযান পরিচালনা করেন তিনি সেই বাহিনীর একজন অগ্রবর্তী সৈনিক ছিলেন। হাদীছ বর্ণনায় অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং একজন অত্যধিক ইবাদাতকারী ব্যক্তি ছিলেন।[৩০৩]

৯. আবূ কিলাবা (রহ) : তাঁর আসল নাম 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ। একজন আইন ও বিচারে পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে কাজী হিসেবে নিয়োগ করতে চাইলে তিনি শামে পালিয়ে যান এবং সেখানে মারা যান। তিনি একজন বিশ্বস্ত হাদীছ বর্ণনকারী ব্যক্তি ছিলেন।[৩০৪]

১০. ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব, যিনি ইয়াযীদ ইবন সুওয়াইদ আল-আযদী নামেও পরিচিত। তিনি মিসরের মুফতী ছিলেন এবং সেখানে ইল্মে দীন ও ইল্মে ফিকহ্র প্রসার ঘটান। ইমাম আল-লাইছ বলেন : ইয়াযীদ আমাদের 'আলিম ও নেতা। তিনি হাদীছের একজন হুজ্জাত ও হাফেজ ছিলেন।[৩০৫]

একান্ত ঘনিষ্ঠজন

তিন ব্যক্তি ছিলেন তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠজন ও সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী। তারা প্রায় সবসময় তার সঙ্গে থাকতেন। এ তিনজন ছিলেন তার পরিবারের সদস্য।

---

৩০১. হিলয়াতুল আওলিয়া-২/১৯৩; তাহযীব আত-তাহযীব-৩/৪৩৬
৩০২. 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার-১১৩
৩০৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪
৩০৪. প্রাগুক্ত-১/৯৩
৩০৫. তাহযীবু ইবন 'আসাকির-৭/৪২৬

১. নিজের সুযোগ্যপুত্র আবদুল মালিক, ২. দাস মুযাহিম, ৩. ভাই সাহ্‌ল ইবন 'আবদিল 'আযীয। মায়মূন ইবন মিহ্‌রান বলেন :[৩০৬]

مارأيت ثلاثة في بيت خيرًا من عمر ابن عبد العزيز، وابنه عبد الملك ومولاه مزاحم.

"'উমার ইবন 'আবদিল আযীয, তাঁর ছেলে 'আবদুল মালিক ও তাঁর দাস মুযাহিমের চেয়ে অধিকতর ভালো তিনজন মানুষ একটি বাড়ীতে আমি আর দেখিনি।"

উপদেষ্টা পরিষদ

তাঁর উচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ হলেন : মায়মূন ইবন মিহ্‌রান, রাজা' ইবন হায়ওয়া, রিয়াহ ইবন 'উবায়দা আল-কিন্দী। উল্লেখিত ব্যক্তিদের চেয়ে একটু নিম্ন পর্যায়ের আরো কয়েকজন উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁরা হলেন : 'আমর ইবন কায়স, 'আওন ইবন 'আবদিল্লাহ্ ইবন 'উতবা ও মুহাম্মাদ ইবন আয-যুবায়র আল-হানজালী।[৩০৭]

তিনি তাঁর সময়ের জ্ঞানী-গুণী, খোদাভীরু, জনগণের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও রাজনীতি বিষয়ে পরিপক্ক ব্যক্তিবর্গের নিকট পত্র লিখে তাঁদের সাহচর্য ও পরামর্শ চাইতেন। কেউ কোন পরামর্শ দান করলে তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করতেন ও বাস্তবায়নের চেষ্টাও করতেন। এ জাতীয় খ্যাতিমান কয়েক ব্যক্তি হলেন : হাসান আল-বসরী, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ্ ইবন 'উমার (রা), তাউস, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কারাজী, 'আমর ইবন মুহাজির, যিয়াদ আল-'আবদ, ইয়াযীদ আর-রাক্‌কাশী (রহ) ও আরো অনেকে। একবার তিনি মুহাম্মাদ আল-কারাজীর একটি উপদেশের পরে বলেন :[৩০৮]

ولأن ينجو رجل بموعظتك من تهلكة، خير من أن ينجو بصدقتك من فقر.

'আপনার দানের দ্বারা একজন দরিদ্র ব্যক্তি তার দারিদ্র থেকে মুক্তি পাওয়ার চেয়ে আপনার উপদেশ দ্বারা একজন মানুষ ধ্বংস থেকে মুক্তি পাওয়া অধিক ভালো।'

একবার তিনি মায়মূন ইবন মিহ্‌রানকে বললেন : ওহে মায়মূন! খিলাফতের এ দায়িত্ব পালনে আমি কিভাবে সহযোগী নির্বাচন করবো এবং কিভাবে তার উপর আস্থা রাখবো? মায়মূন বললেন :[৩০৯]

ياأمير المؤمنين! لاتشغل بهذا، فإنك سوق، وإنما يحمل إلى كل سوق ماينفق فيها، فاذا عرف الناس أنه لاينفق عندك الا الصحيح، لم يأتوك إلا بالصحيح.

---

৩০৬. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ, সীরাতু 'উমার-২১৬
৩০৭. তাবাকাত-৫/৩৯৫
৩০৮. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ, সীরাতু 'উমার-২১৬
৩০৯. তাবাকাত-৫/৩৯৪

'হে আমীরুল মু'মিনীন! এ নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। আপনি হলেন বাজারতুল্য। বাজারে যা চলে তাই আসে। মানুষ যখন জানবে আপনার নিকট কেবল সঠিক জিনিসই চলে তখন সঠিক জিনিস ছাড়া আর কিছু আপনার নিকট আসবে না।'

মুহাম্মাদ ইবন কা'ব একবার তাঁকে বলেন, যে ব্যক্তির আপনার কাছে কোন প্রয়োজন আছে তাকে আপনার সহচর করবেন না। কারণ, তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে তার হৃদ্যতাও শেষ হয়ে যাবে। বরং আপনি সহচর করুন এদেরকে :[৩১০]

ذا العلى فى الخير، الأناة فى الحق، يعينك على نفسك ويكفيك مؤنته.

'কল্যাণমূলক কাজে মহত্তর, সত্যের পথে ধৈর্যশীল ব্যক্তি, সে আপনাকে সাহায্য করবে এবং তাঁর সাহায্যও আপনার জন্য যথেষ্ট হবে।'

একবার 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয ইরাকের ফকীহদেরকে ডেকে পাঠালেন। হাসান আল-বসরী পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে আসতে পারলেন না। তবে একথাগুলো লিখে পাঠালেন :

ياأمير المؤمنين! إن استقمت استقاموا، وإن ملت مالوا، ياأمير المؤمنين، لو أن لك عمر نوح، وسلطان سليمان، ويقين إبراهيم، وحكمة لقمان، ماكان لك بدٌّ أن تقتحم العقبة، ومن وراء العقبة الجنة والنار، من أخطأته هذه دخل هذه.

'হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি আপনি অটল থাকেন জনগণও অটল থাকবে, যদি আপনি ঝুঁকে যান তারাও ঝুঁকে যাবে। হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি আপনি লাভ করেন নূহের জীবন, সুলায়মানের শাসন কর্তৃত্ব, ইবরাহীমের দৃঢ় প্রত্যয় ও লুকমানের জ্ঞান, তাহলেও আপনাকে বাধা অতিক্রম করা ছাড়া উপায় নেই। সেই বাধার পিছনেই হবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম। একটা তাকে ভুল করলে অন্যটায় সে প্রবেশ করবে।'

চিঠিটি 'উমারের হাতে পৌঁছলে তিনি সেটা তাঁর দু'চোখের উপর রাখেন। কিছুক্ষণ কাঁদলেন, তারপর বললেন : আমাকে নূহের জীবন, ইবরাহীমের বিশ্বাস, সুলায়মানের ক্ষমতা ও লুকমানের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কে দেবে? আমি যদি এসব লাভ করতাম তাহলেও পূর্ববর্তীদের পেয়ালা পান করা ছাড়া আমার কোন উপায় থাকতো না।[৩১১]

একবার তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ তাবি'ঈ তাউস ইবন কায়সানের নিকট পাঠানো একটি পত্রে রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে উপদেশ চেয়ে পাঠালেন। জবাবে তাউস দশটি বাক্য লিখে পাঠান। তার কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ :[৩১২]

سلام عليك ياأمير المؤمنين، فإن الله عزوجل ـ أنزل كتابا وأحل فيه حلالاً وحرم فيه

---

৩১০. ইবনুল জাওযী-১৪৭

৩১১. প্রাগুক্ত

৩১২. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-২২১

حرامًا وضرب فيه امثالاً وجعل بعضه محكما وبعضه متشابها ـ فـأحِلَّ حـلال الله، وحَـرِّم حـرام الله وتفكـر فـي امثـال الله، واعمـل بِمُحْكَمِـه وآمـن بمتشـابهه، والسلام عليك.

'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার প্রতি সালাম। মহাপরাক্রমশালী মহিমান্বিত আল্লাহ একখানি গ্রন্থ নাযিল করেছেন। তাতে কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছেন। তাতে কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে কিছু অংশকে করেছেন সুদৃঢ়, আর কিছু অংশকে করেছেন সাদৃশ্যপূর্ণ। অতঃপর আল্লাহর হালালকে হালাল ও আল্লাহর হারামকে হারাম ঘোষণা করুন। আল্লাহর দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে চিন্তা করুন, তাঁর নির্দেশ মত কাজ করুন এবং তাঁর সাদৃশ্যপূর্ণ অংশে ঈমান আনুন। আস্-সালামু আলাইকুম।'

একবার মুহাম্মাদ ইবন আল-কারাজী 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের নিকট গিয়ে দেখেন, তিনি মজলিসে উপস্থিত একজনের উপদেশমূলক বক্তব্য শুনে কাঁদছেন। মুহাম্মাদ তখন দুনিয়া, আখিরাত ও খিলাফত পরিচালনা বিষয়ে বেশ দীর্ঘ একটা ভাষণ দেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ :[৩১৩]

ياأمير المؤمنين! انما الدنيا سوق من الأسواق، فمنها خرج الناس بما ضرّهـم، ومنـها خرجوا بما نفعهم، وكم من قوم غرهم منها مثـل الـذى أصبحنـا فيـه، حتـى أتـاهم الموت فاستوعبهم فخرجوا منها مَلُومين،لم يأخذوا منها لما أحبوا مـن الأخـرة عـدة، ولالما كرهوا جُنَّة... فاتق الله ياأمير المؤمنين، واجعل فى قبلك سبيل اثنين : انظر الذى تحب أن يكون معك إذا قدمت على ربـك عزوجـل ـ فـابتغ بـه البـدل حيـث لايؤخذ البدل، ولاتذهبن إلى سلعة قد بارت على مَـنْ كـان قبلـك، ترجـو أن تجـوز عنك، فاتق الله ياأمير المؤمنين، وافتح الأبواب، وسـهِّل الحجـاب، وانصـر المظلـوم ورد الظالم. ثلاث من كن فيـه استكمل الايمـان بـالله عزوجـل : مـن إذا رضـى لم يدخله رضاه فى البـاطل، وإذا غضـب لم يخرجـه غضبـه مـن الحـق، وإذا قـدر لم يتناول ماليس له.

'হে আমীরুল মু'মিনীন! এ দুনিয়া হচ্ছে একটি বাজারের মত। এখান থেকে কেউ লোকসান দিয়ে বাড়ী ফেরে, কেউ ফেরে লাভবান হয়ে। এ দুনিয়া দ্বারা বহু জাতি-সম্প্রদায় প্রতারিত হয়েছে যেমন আমরা হচ্ছি। অবশেষে মৃত্যু এসে তাদের সবকিছু

---

৩১৩. ইবনুল জাওযী-১৫৭-১৫৯

ঘিরে ফেলেছে এবং তিরস্কৃত অবস্থায় তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আখিরাতের জীবনে তারা যা চেয়েছে তার জন্য কোন পাথেয় যেমন তারা সংগে নিয়ে যায়নি, তেমনি যা চায়নি তা থেকে রক্ষারও ব্যবস্থা করে যায়নি।

হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহকে ভয় করুন এবং আপনার অন্তরে দু'টি পথের যে কোন একটিকে স্থান দিন। যখন আপনি আপনার মহান প্রভুর সামনে উপস্থিত হবেন তখন যে জিনিস আপনার সংগে থাকা আপনি পছন্দ করেন তার দিকে দৃষ্টি দেন। তার বিনিময় অন্বেষণ করুন সেই দিনের জন্য যে দিন কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। আপনি সেই পণ্য-সামগ্রীর দিকে অবশ্যই যাবেন না যা আপনার পূর্ববর্তীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। আপনি চাইবেন, তা যেন আপনার সামনে থেকে দূর হয়ে যায়।

হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহকে ভয় করুন। সকল দরজা খোলা রাখুন, পর্দা (নিরাপত্তা প্রহরী) সহজ করুন এবং মজলুমকে সাহায্য ও জালেমকে প্রতিহত করুন। যার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকে আল্লাহর প্রতি তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। কেউ যখন সন্তুষ্ট হয়, তখন তার এই সন্তুষ্টি তাকে মিথ্যার মধ্যে নিয়ে যায় না। রাগান্বিত হলে তার রাগ তাকে সত্য থেকে বের করে দেয় না। আর ক্ষমতাবান হলে তার অধিকার বহির্ভূত কোন কিছু হাতিয়ে নেয় না।"

একবার আবূ হাযিম (রহ) 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযকে নিম্নের কথাটি লিখে পাঠালেন :[৩১৪]

اتق الله أن تلقى محمدا ـ عليه السلام ـ وأنت بتبليغ الرسالة له مصدق، وهو عليك بسوء الخلافة فى أمته شهيد.

'আপনি মুহাম্মাদ (সা)-এর সাক্ষাতকে ভয় করুন। এমতাবস্থায় যে, আপনি রিসালাতের প্রচার করছেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস সহকারে এবং তিনি আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন তাঁর উম্মাতের উপর নিকৃষ্টভাবে খিলাফত পরিচালনার ব্যাপারে।'

আরেকবার 'উমার আবূ হাযিমকে বললেন : আবূ হাযিম, আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। আবূ হাযিম বললেন :[৩১৫]

اضطجع، ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم انظر ماتحب أن تكون فيه تلك الساعة، فخذ فيه الآن، وماتكره أن يكون فيك تلك الساعة، فدعه الآن.

'আপনি শুয়ে পড়ুন। তারপর মৃত্যুকে আপনার মাথার পাশে রেখে দিন। তারপর ভেবে দেখুন, মৃত্যুর সময় আপনি কিসের মধ্যে থাকতে পছন্দ করেন, এখনই তার মধ্যে থাকুন। তেমনিভাবে মৃত্যুর সময় যার মধ্যে থাকতে অপছন্দ করেন তা এখনই ছেড়ে দিন।"

---

৩১৪. প্রাগুক্ত
৩১৫. প্রাগুক্ত, হিলয়াতুল আওলিয়া-৫/৩১৭

আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের অপসারণ

উমাইয়্যাদের স্বৈরাচারী রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কেবল তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তারা সাধারণ মানুষের জান-মাল নিয়েও ছিনিমিনি খেলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এ কারণে যতদিন এ ধরনের শাসনকর্তাদেরকে অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় পদ্ধতিতে অপসারণ না করা হতো ততদিন রাষ্ট্রের শাসন-শৃঙ্খলা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না। যার ভিত্তি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আদল ও ইনসাফের উপর স্থাপন করতে চাচ্ছিলেন। এ কারণে তিনি জোর-জবরদস্তী আত্মসাৎকৃত অর্থ-সম্পদ ফেরত দানের পর ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক প্রশাসন থেকে এ জাতীয় প্রজা-পীড়ক শাসনকর্তাদের বিতাড়নে উদ্যোগী হন। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম তিনি খুরাসানের শাসনকর্তা ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাবকে অপসারণ করেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয পূর্ব থেকেই এই ইয়াযীদকে পছন্দ করতেন না। আর ইয়াযীদও 'উমারকে একজন রিয়াকার বলে মনে করতো। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হওয়ার পর হিজরী ১০০ সনে তাঁকে লিখলেন : "অন্য কাউকে দায়িত্ব দিয়ে তুমি চলে এসো।"

তিনি নিজ পুত্র মাখলাদকে তথাকার ওয়ালীর দায়িত্ব দিয়ে যে সকল জিনিস ও সম্পদ পুঞ্জিভূত করেছিলেন তা নিয়ে সরে পড়তে চেয়েছিলেন; কিন্তু তথাকার অধিবাসীরা বাধা দেয়। তিনি বসরায় চলে যান। সেখানে 'উমার (রহ) কর্তৃক নিয়োগকৃত ওয়ালী 'আদী ইবন আরতাত তাঁর সাথে দেখা করে খলীফা 'উমারের (রহ) একটি চিঠি তাঁকে দেন। ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাব سَمْعًا وَطَاعَةً (শুনলাম ও মেনে নিলাম) বলে তাঁর আনুগত্য মেনে নেন। 'আদী তাঁকে বন্দী করে 'উমারের নিকট হাজির করেন। 'উমার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : আমি পূর্ববর্তী খলীফা সুলায়মানকে লেখা আপনার একটি পত্র পেয়েছি, তাতে আপনি দুই কোটি দিরহাম জমা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। সেই অর্থ কোথায়? ইয়াযীদ প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে বলেন, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি তা সংগ্রহ করে দেব। 'উমার বললেন : কোথা থেকে? বললেন : মানুষের নিকট থেকে। 'উমার বললেন : আবার তাদের নিকট থেকে? না, সে সুযোগ তোমাকে দেওয়া হবে না।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তার নিকট সম্পূর্ণ অর্থ দাবী করেন। সে বললো : "সুলায়মানের নিকট আমার যে স্থান ও মর্যাদা ছিল তা আপনি জানেন। আমি সুলায়মানকে এই অর্থের কথা এজন্য জানিয়েছিলাম যে, মানুষ কথাটি জেনে যাক। আমার তো বিশ্বাস ছিল সুলায়মান কখনো আমার নিকট এ অর্থ দাবী করবেন না।" তার জবাবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সন্তুষ্ট হলেন না। তাকে বললেন : "আল্লাহকে ভয় কর। এ অর্থ তোমার নিকট গচ্ছিত আমানত। ফেরত দাও। এ মুসলমানদের অধিকার, আমি মাফ করতে পারিনে।"– একথা বলে তিনি তাকে জেলে ঢুকিয়ে দেন।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আল-জাররাহ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হাকামীকে খুরাসানের ওয়ালী নিয়োগ করেন এবং তাঁকে মাখলাদ ইবন ইয়াযীদকে বন্দী করার নির্দেশ দেন। তাঁকে আরো নির্দেশ দেন, কেবল নামাযের জন্য ছাড়া মাখলাদের হাতকড়া

ও বেড়ী খোলা যাবে না। আল-জাররাহ্ তাকে বন্দী করে হাতকড়া পরানো অবস্থায় 'উমারের নিকট পাঠিয়ে দেন। মাখলাদ যখন খলীফার নিকট পৌঁছেন তখন তার মাথায় ছিল সাদা টুপি এবং পরনের কাপড় ছিল মাটি অথবা পায়ের গিরার উপরে।

'উমার তাকে লক্ষ্য করে বলেন : তোমার সম্পর্কে আমি যে তথ্য পেয়েছি, তোমার এখনকার এ অবয়ব তার বিপরীত। তখন আল-জাররাহ্ বললেন :[৩১৬]

أنتم الأئمة إذا أسبلتم أسبلنا وإذا شمرتم شمرنا.

'আপনারা হলেন ইমাম (নেতা)। আপনারা কাপড় ঝুলিয়ে চললে আমরাও ঝুলিয়ে চলি, আর আপনারা গুটিয়ে চললে আমরাও গুটিয়ে চলি।'

তাবারীর ইতিহাসে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আল-জাররাহ্ খুরাসানে পৌঁছার পর মাখলাদ সেখান থেকে যাত্রা করে। পথে যে জনপদ ও শহর অতিক্রম করেছিল সেখানে মানুষের মধ্যে দু'হাতে অঢেল অর্থ বিলাতে থাকে। এভাবে এক সময় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সামনে উপস্থিত হয়। খলীফার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহর হামদ ও রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশের পর খলীফাকে লক্ষ্য করে বলে, আল্লাহ আপনাকে খলীফা বানিয়ে সমগ্র উম্মাতের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কেবল আমরাই আপনার কারণে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আপনার খিলাফতে আমাদের উপর এমন মুসীবত আপতিত হওয়া উচিত নয়। আপনি এই বৃদ্ধকে (ইয়াযীদ) কেন বন্দী করে রেখেছেন? তাঁর নিকট যদি কিছু দাবী থাকে তা আমি পূরণ করছি। আপনি আমার সঙ্গে একটি আপোষ-মীমাংসায় আসুন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন, যতক্ষণ সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন রকম আপোষ নেই। সে বললো : 'আপনার নিকট যদি কোন সাক্ষী-প্রমাণ থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী কাজ করুন। আর প্রমাণ না থাকলে ইয়াযীদের বক্তব্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করুন। তা না হলে তাঁর নিকট থেকে হলফ নিন। তিনি হলফ করতে অস্বীকার করলে তাঁর সাথে আপোষ করুন।' 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন : সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাঁর ব্যাপারে অন্য কোন উপায় দেখছি না।

এই আলোচনার পর মাখলাদ ফিরে আসে এবং এর কিছুদিন পর মারা যায়। এখন ইয়াযীদ এই অর্থের একটি পয়সাও দিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। এ কারণে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাকে একটি জোব্বা পরিয়ে উটের উপর চড়িয়ে "দাহ্লাক"-এর দিকে নির্বাসন দেন। এ অবস্থায় চলতে চলতে পথে যাকে পাচ্ছিলো তাকে লক্ষ্য করে বলছিল, আমার কি কোন গোত্র নেই? আমাকে কেন দাহ্লাক-এ নির্বাসন করা হচ্ছে? সেখানে তো কেবল পাপাচারী, ডাকাত ও সন্দেহভাজন লোকদের পাঠানো হয়। সুবহানাল্লাহ! আমার কি কোন গোত্র নেই? ইয়াযীদের গোত্রের উপর তার এই উত্তেজনামূলক আবেদনের দারুণ প্রভাব পড়লো। তারা ভীষণ অসন্তুষ্ট হলো। একথা

---

৩১৬. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০২

সালামা ইবন নু'আইম আল-খাওলানী অবগত হয়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট গেলেন এবং ইয়াযীদের গোত্রের অসন্তুষ্টির কথা জানালেন। তিনি খলীফাকে একথাও বললেন, হয়তো ইয়াযীদের গোত্র তাকে পথ থেকে ছিনতাই করে নিয়ে যাবে। এর প্রেক্ষিতে 'উমার তাকে ফিরিয়ে এনে জেলে বন্দী করে রাখেন। 'উমারের মৃত্যু পর্যন্ত সে জেলেই ছিল।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অন্তিম রোগ শয্যায়। এ খবর পেয়ে কারা অভ্যন্তরে ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাব দারুণ বিচলিত হয়ে পড়ে। কারণ, সে ইযায়ীদ ইবন 'আবদিল মালিকের এক নিকট আত্মীয় আবূ 'আকীলের উপর একবার নির্যাতন চালিয়েছিল। যার প্রেক্ষিতে ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক শপথ করেছিলেন যে, যদি কখনো সুযোগ আসে তাহলে ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাবের চামড়া দিয়ে জুতোর তলা বানিয়ে ছাড়বেন। এখন ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাব জেলের ভিতরে বসে ভেবে দেখলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পরে তিনিই খলীফা হবেন। আর তখন তাঁর শপথ পূরণ করার পথে কোন বাধা থাকবে না। ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাব জেল থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নিল। নিজের চাকর-বাকর ও চাচাতো ভাইদের বলে রাখলো তারা যেন এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কিছু সোয়ারী প্রস্তুত রাখে। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আরো বেশী অসুস্থ্য হয়ে পড়লে সে কারাগার থেকে পালিয়ে যায়। সঙ্গী-সাথীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য পূর্বেই একটি স্থান নির্ধারিত ছিল। সেখানে পৌঁছে দেখে কেউ নেই। সেখান থেকে স্ত্রীকে সংগে নিয়ে যাত্রার পূর্বে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে একটি পত্র লেখে। যার মর্ম এরূপ : "যদি আপনার বাঁচার আশা থাকতো, আল্লাহর কসম আমি পালাতাম না। কিন্তু ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের উপর আমার মোটেই বিশ্বাস নেই।" 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয চিঠি পাঠ করে বলেন, হে আল্লাহ! ইয়াযীদ যদি এই উম্মাতের অকল্যাণ করতে চায় তাহলে আপনি তাদেরকে তার অকল্যাণ থেকে বাঁচান এবং তার ষড়যন্ত্রকে তার দিকে ফিরিয়ে দিন।" ইয়াযীদ পালিয়ে যুকাকে পৌঁছে। সেখানে কায়স গোত্রের কিছু লোকের সাথে হুযায়ল ইবন যুফার আগে থেকেই উপস্থিত ছিল। তারা ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাবের পালানোর খবর পেয়ে তার পিছু ধাওয়া করে তার জিনিসপত্র লুটপাট ও কয়েকটি দাস বন্দী করে।[৩১৭]

ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাবের পরে আল-জাররাহ এক বছর পাঁচ মাস খুরাসানের ওয়ালী ছিলেন। এরপর 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকেও অপসারণ করেন। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাব তার শাসনকালে জাহ্‌ম ইবন যাহরকে জুরজানের ওয়ালীর পদে নিয়োগ দেন। ইয়াযীদ গ্রেফতার হওয়ার পর ইরাকের শাসনকর্তা জাহ্‌মের স্থলে অন্য এক ব্যক্তিকে তথাকার ওয়ালীর পদে নিয়োগ দিয়ে পাঠান। সে জুরজানে পৌঁছালে জাহ্‌ম উক্ত ব্যক্তিকে তার সঙ্গী-সাথীসহ বন্দী করে ফেলে এবং সে নিজে পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে খুরাসানের দিকে যাত্রা করে। আল-জাররাহর

---

৩১৭. আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার :৪৬-৪৭

সাথে সাক্ষাতের পর তিনি বলেন, তুমি যদি আমার চাচাতো ভাই না হতে তাহলে আমি তোমার এমন আচরণ সহ্য করতাম না। জবাবে জাহ্‌ম বলে : "আত্মীয়তার এ সম্পর্ক না থাকলে আমিও আপনার নিকট আসতাম না।" অতঃপর আল-জাররাহ তার এই গুনাহর কাফ্‌ফারার জন্য তাকে একটি যুদ্ধে পাঠিয়ে দেয়। যুদ্ধ শেষে বিজয়ীর বেশে সে ফিরে এলে আল-জাররাহ সে কথা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে অবহিত করেন। অতঃপর দুইজন আরব ও একজন অনারব মোট তিন জনের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দলকে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট পাঠান। তারা খলীফার দরবারে পৌঁছার পর আরবীয় ব্যক্তিদ্বয় কথা বললেন, কিন্তু অনারব ব্যক্তিটি চুপ থাকলো। 'উমার তাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বললেন : তুমিও তো প্রতিনিধি দলের সদস্য, কোন কথা বলছো না কেন? সুযোগ পেয়ে এবার সে বললো : আমীরুল মু'মিনীন! বিশ হাজার মাওয়ালী (অনারব) জিহাদ করছে, কিন্তু তারা কোন বেতন-ভাতা পাচ্ছে না। আর এ রকম সংখ্যক যিম্মী মুসলমান হয়েছে। তা সত্ত্বেও তাদের নিকট থেকে এখনো জিযিয়া আদায় করা হচ্ছে। আমাদের আমীর একজন অত্যাচারী ও পক্ষপাতী। মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, আমি একজন দয়ালু হিসেবে এসেছিলাম, কিন্তু এখন একজন পক্ষপাতী মানুষ হয়ে গিয়েছি। আমার সম্প্রদায়ের একজন মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষের চেয়ে আমার অধিক প্রিয়। তাঁর অত্যাচারের সীমা এই যে, তাঁর জামার হাতা এত প্রশস্ত যে তা জামার অর্ধেকে গিয়ে পড়ে। এখনো পর্যন্ত হাজ্জাজের একটি তরবারি তাঁর নিকট আছে এবং জুলুম ও বাড়াবাড়িমূলক কাজ করেন।"

তার বক্তব্য শুনে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয দারুণ খুশী হলেন। বললেন : "প্রতিনিধি দলে এমন লোকেরই আসা উচিত।" তখনই তিনি আল-জাররাহকে লিখলেন : "যারা কিবলার দিকে মুখ করে নামায আদায় করে, এমন সকল মানুষের জিযিয়া মওকুফ করে দাও।"

তাঁর এই ফরমান প্রচার হওয়ার সাথে সাথে এত বেশী সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যে, লোকেরা আল-জাররাহকে পরামর্শ দিল :

"মানুষ কেবল জিযিয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ইসলাম গ্রহণ করছে। তাদের খাত্‌না করুন, তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাবে।" আল-জাররাহ এসব কথা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে জানালেন। তিনি লিখলেন : "আল্লাহ মুহাম্মাদকে (সা) দা'ঈ (আহ্বানকারী) হিসেবে পাঠিয়েছিলেন খাত্‌নাকারী হিসেবে নয়।" এরপর তিনি দরবারে উপস্থিত লোকদের বললেন, আপনারা আমাকে এমন একজন লোকের নাম বলুন যার নিকট আমি খুরাসানের প্রকৃত অবস্থা জিজ্ঞেস করতে পারি। লোকেরা আবূ মিজলাযের নাম বললো। এবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আল-জাররাহকে লিখলেন, তুমি আবূ মিজলাযকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত চলে এসো। আল-জাররাহ আবদুর রহমান ইবন নু'আয়ম আল-গামিদীর হাতে যুদ্ধ এবং 'আবদুল্লাহ ইবন হাবীবের হাতে খারাজের দায়িত্ব অর্পণ করে হিজরী ১০০ সনের রামাদান মাসে যাত্রা করেন। খলীফার সামনে উপস্থিত হলে তিনি তাকে প্রশ্ন করেন : সেখান থেকে কবে যাত্রা করেছো? বললেন : রামাদান মাসে। খলীফা বললেন :

যে তোমাকে জালিম বলেছে, ঠিক বলেছে। রামাদান শেষ করে এলে না কেন? আসার সময় আল-জাররাহ করজ হিসেবে বায়তুল মাল থেকে বিশ হাজার দিরহাম নিয়েছিলেন। সেই অর্থ খলীফার পক্ষ থেকে বায়তুল মালে ফেরত দানের জন্য তিনি আবেদন করেন। জবাবে খলীফা বলেন : যদি তুমি রামাদানের পরে আসতে তাহলে আমি পরিশোধ করতাম। অবশেষে তাঁর গোত্রের লোকেরা নিজেদের ভাতা থেকে সেই অর্থ পরিশোধ করে।

উল্লেখিত অভিযোগ ছাড়াও আল-জাররাহর জুলুম ও সীমা লংঘনের আরো অনেক প্রমাণ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের হাতে আসে। আল-জাররাহ প্রথম যখন খুরাসানে আসেন তখন তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে লেখেন : "এখানকার কিছু মানুষ বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আল্লাহর হক বা অধিকারসমূহকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়। তরবারি ও চাবুক ছাড়া আর কোন কিছু তাদেরকে একাজ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। কিন্তু আপনার অনুমতি ছাড়া আমি কোন পদক্ষেপ নিতে পারি না।" এর জবাবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লিখলেন : "তুমি তাদের চেয়েও বেশী বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাও। কোন মুসলমান অথবা যিম্মীকে অন্যায়ভাবে একটি চাবুকও মারবে না।"

উল্লিখিত কারণে আল-জাররাহকে খুরাসানের ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করে 'আবদুর রহমান ইবন নু'আয়মকে যুদ্ধ এবং আবদুর রহমান কাশয়ারীকে খারাজের দায়িত্বে নিয়োগ করেন।

আঞ্চলিক ওয়ালী বা প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ

সেকালে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক কর্মকর্তা বা গভর্ণরকে ওয়ালী বা 'আমিল বলা হতো। তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ যুগের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মতো ছিল না। বর্তমানকালে শাসকদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে, রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা ওলট-পালট হয়, ব্যক্তির জায়গায় গণতন্ত্র স্থান করে নেয়। কিন্তু রাষ্ট্রের পরিচালন ব্যবস্থার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, কর্মকর্তাদের উপর তার কোন প্রভাবই পড়ে না। তবে প্রাচীনকালে ব্যক্তি শাসকের পরিবর্তনে গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় যেন বিপ্লব ঘটে যেত। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে এ বিপ্লব সবচেয়ে বেশী পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার সাথে সাথে সেই সকল পচন ও বিকৃতির সংশোধন করতে উদ্যোগী হন, যার উপাদান হযরত আমীর মু'আবিয়ার (রা) সময় থেকে শুরু হয় এবং ক্রমান্বয়ে পরিপক্ক হতে থাকে। তবে এই সংশোধনের জন্য এমন জনবলের প্রয়োজন ছিল যারা নিষ্ঠা ও সততার সংগে রাষ্ট্রযন্ত্রকে চালাতে পারতো। তাঁর সময়ে এ ধরনের জনবলের প্রায় কোন অস্তিত্বই ছিল না। ইয়াস ইবন মু'আবিয়া বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একজন অত্যন্ত দক্ষ কারিগর ছিলেন। কিন্তু তাঁর আশে পাশে এমন কোন সহযোগী ছিল না যাদের সাহায্য তিনি নিতে পারতেন। তিনি নিজেও দেখতেন তাঁর যে ধরনের সহকারী ও সহযোগীর প্রয়োজন তা সরকারী দফতরগুলোতে নেই। এ কারণে তিনি তাঁর দৃষ্টি দূর-

দূরান্তে ফেরাতেন। যেখানেই কোন যোগ্য লোক দেখতে পেতেন তাঁকেই এ ফাঁদে আটকাতে চাইতেন, যাতে তিনি নিজে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। সিরিয়ায় তখন একজন সত্যনিষ্ঠ বুযর্গ ব্যক্তি একান্ত নিরিবিলি জীবন যাপন করতেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর কথা জানতে পেরে তাঁকে লিখলেন, সত্যিকার সাহায্যকারী কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি জবাব দিলেন, আমি পাপীদের সাহায্য করতে পারিনে। এতদসত্ত্বেও খিলাফত পরিচালনার জন্য কর্মচারী-কর্মকর্তাদের নিয়োগ ছিল অপরিহার্য। এ কারণে তিনি খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বিভিন্ন জনকে নিয়োগ দান করেন। নিম্নে এমন কয়েকজন আঞ্চলিক কর্মকর্তার নাম দেওয়া হলো :

১. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন হাযম। খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক তাঁকে মদীনার গভর্ণর নিয়োগ করেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে উক্ত পদে বহাল রাখেন।

২. আবদুল হামীদ ইবন 'আবদির রহমান ইবন যায়দ ইবন খাত্তাব : তাঁকে কূফার গভর্ণর নিয়োগ করেন।

৩. 'আদী ইবন আরতাত : বসরার গভর্ণর।

৪. 'উরওয়াহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আতিয়্যা আস-সা'দী : ইয়ামনের গভর্ণর।

৫. 'আদী ইবন 'আদী আল-কিন্দী : জাযীরার ওয়ালী।

৬. ইসমা'ঈল ইবন 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবিল মুহাজির : আফ্রিকার ওয়ালী।

৭. মুহাম্মাদ ইবন সুওয়ায়িদ আল ফিহ্‌রী : দিমাশ্‌কের ওয়ালী।

৮. জাররাহ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হাকামী : খুরাসানের ওয়ালী।[৩১৮]

এছাড়া আরো অনেক পদ ও পদাধিকারী ব্যক্তি ছিল যারা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের প্রশাসনের জন্য মোটেই প্রয়োজন ছিল না। যেমন, এমন অনেক নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও রক্ষী ছিল যা কেবল শাসকদের ঠাঁট-বাট, আভিজাত্য ও কৌলিন্য দেখানোর জন্য নিয়োগ করা হতো। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময়ে তাদের সংখ্যা ছয় শোতে পৌঁছে। তার মধ্যে তিন শো পুলিশ বাহিনীর সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং বাকী তিন শো ছিল নিরাপত্তা রক্ষী। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন সকল প্রকার ঠাঁট-বাট ও জাঁকজমকের উর্ধ্বে। আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল তাঁকে একেবারেই নির্ভীক করে তোলে। তাই তিনি খলীফা হওয়ার পর ঐ সকল কর্মচারী-কর্মকর্তাদেরকে সাফ বলে দেন : 'তোমাদের কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমার তাকদীর আমার রক্ষক এবং আমার মৃত্যু আমার প্রহরী।" এতদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে একেবারে চাকুরীচ্যুত করা সমীচীন মনে করেননি। তাদেরকে বলে দেন, যারা স্বেচ্ছায় চলে যেতে চাও যেতে পার। আর যারা থাকতে চাও তারা দশ দীনার করে পাবে।[৩১৯]

---

৩১৮. তাবাকাত-৫/২৫১
৩১৯. ইবনুল জাওযী-৯৮

ব্যক্তি হিসেবে তিনি কেবল খালিদ ইবন রায়্যানকে বরখাস্ত করেন। সে ছিল জাল্লাদ, সব সময় খলীফাদের সামনে তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতো। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কঠোরতার কথা তার জানা ছিল, এ কারণে খলীফা হওয়ার পর খালিদ যখন তার অভ্যাস অনুযায়ী তরবারি উঁচিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় তখন 'উমার তাকে বলেন, খালিদ! তরবারি রেখে দাও। হে আল্লাহ্! আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য খালিদকে নত করছি, আপনি আর কখনো তাকে সমুন্নত করবেন না। খালিদকে অপসারণের পর তার স্থলে 'আমর ইবন মুহাজির আল-আনসারীকে নিয়োগ দেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি।[৩২০] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ-বদলী যে সকল মৌলিক নীতির ভিত্তিতে করা হতো তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১. 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট আত্মীয় হলে তাঁকে কখনো কোথাও ওয়ালী নিয়োগ করতেন না। পুত্রের চেয়ে বেশী প্রিয় আর কে হতে পারে? কিন্তু তিনি তাঁর পুত্রদের কাউকে কোন পদে নিয়োগ দান করেননি। একবার তিনি তাঁর পুত্রদের সকলকে সমবেত করে জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কি এটা চাও যে, তোমাদের প্রত্যেককে এক একটি অঞ্চলের ওয়ালী নিয়োগ করি এবং যখন তোমরা চলবে তখন তোমাদের সাথে ডাক হরকরা চলার সময় ঘণ্টা বাজার মতো ঘণ্টাধ্বনি হতে থাকুক? এক পুত্র বললো, যে কাজ আপনি করবেন না, সে প্রশ্ন করছেন কেন? তিনি তখন বললেন : তোমরা দেখতে পাচ্ছো আমার এ বিছানাটি পুরানো হয়ে গেছে, তবুও আমি চাই না যে, তোমরা এটাকে তোমাদের মোজা দিয়ে ময়লা করে ফেল। তাহলে তোমাদের দীনকে তোমাদের হাতে কিভাবে সোপর্দ করি যাতে তোমরা প্রতিটি অঞ্চলে তাকে ধুলিমলিন করে ফেল।[৩২১] তারীখুল খুলাফা গ্রন্থে এসেছে যে, এ প্রশ্ন তিনি বানু উমাইয়্যার কতিপয় সদস্যকে করেন। হতে পারে তাদের মধ্যে তাঁর পুত্রও ছিল।

একবার আল-জাররাহ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হাকামী 'আবদুল্লাহ ইবন আহতামকে কোথাও ওয়ালী হিসেবে নিয়োগ করলেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সে কথা জানতে পেরে লিখলেন : "তাকে অপসারণ কর। কারণ, আরো অনেক কথা ছাড়াও সে খোদ আমীরুল মু'মিনীনের আত্মীয়।"[৩২২]

২. কোন ব্যক্তি যদি কোন পদে নিয়োগ লাভের প্রার্থনা করতো, তিনি তাকে সেই পদ দিতেন না। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সুন্নাতও ছিল এ রকম। একবার বিলাল ইবন আবী বুরদাহ্ ও 'আবদুর রহমান ইবন আবী বুরদাহ্– দুই ভাই তাঁর নিকট উপস্থিত হয় এবং প্রত্যেকে তাদের মহল্লার মসজিদের মুআয্যিন হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির আবেদন জানায়। তাদের উভয়ের সম্পর্কে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মনে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়। তিনি গোপনে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করে বলেন, তুমি তাদের নিকট গিয়ে

---

৩২০. প্রাগুক্ত-৪০
৩২১. প্রাগুক্ত-২৭৪
৩২২. প্রাগুক্ত-৮৬

বলবে, আমি যদি আমীরুল মু'মিনীনকে বলে তোমাদের দু'জনকে ইরাকের ওয়ালী হিসেবে নিয়োগ পাইয়ে দিই তাহলে আমাকে কি দেবে? লোকটি বিলালকে জিজ্ঞেস করলে সে এক লাখ দিরহাম দানের অঙ্গীকার করে। লোকটি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে একথা জানালে তিনি ইরাকের ওয়ালী 'আবদুল হামীদ ইবন 'আবদির রহমানকে লিখলেন যে, না বিলাল অর্থাৎ অসৎ বিলালকে কোন পদ দিবে, আর না মূসার কোন বংশধরকে।[৩২৩]

৩. কোন অত্যাচারী ও নিরাপরাধ মানুষের রক্তপাতকারী ব্যক্তিকেও তিনি কোন পদে নিয়োগ দিতেন না। একবার আল-জাররাহ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হাকামী আম্মারাকে কোন স্থানের 'আমিল নিয়োগ করেন। একথা তিনি জানতে পেরে লেখেন : আম্মারার কোন প্রয়োজন নেই। আর যে ব্যক্তি নিজের হাতকে মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত করেছে তারও কোন প্রয়োজন নেই। তাকে অপসারণ কর।[৩২৪] আল-জাররাহ ইবন 'আবদিল্লাহ এবং ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাবের বরখাস্তের কারণও ছিল অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও অত্যাচার। একই কারণে তিনি হাজ্জাজের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তার গোত্রের লোকদের কোন প্রশ্রয় দেননি। আবূ মুসলিম ছিল হাজ্জাজের জাল্লাদ ও স্বগোত্রীয়। সে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময় সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়ে। তিনি তাকে অপসারণ করেন। এমনিভাবে অন্য এক ব্যক্তিকে তিনি একটি পদে নিয়োগ দেন, পরে জানতে পারেন, সে হাজ্জাজের কর্মকর্তা ছিল। তিনি তাকে প্রত্যাহার করেন। লোকটি কৈফিয়াতের সুরে বলে, আমি হাজ্জাজের অধীনে খুব অল্প দিন কাজ করেছি। তিনি বলেন, একদিনের অসৎ সংসর্গও বহু কিছু হতে পারে।[৩২৫]

৪. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হতো সে যেন কুরআন-হাদীছের জ্ঞানে পারদর্শী হয়। তিনি সকল আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন তারা যেন কুরআনে পারদর্শী ব্যক্তি ছাড়া কাউকে কোন পদে নিয়োগ না দেয়। কিন্তু তারা সকলে জানায় যে, আমরা কুরআনে পারদর্শীদের নিয়োগ করে দেখেছি, কিন্তু তাদের অনেককে অবিশ্বস্ত পাওয়া গেছে। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তবুও তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তিনি আবারও নির্দেশ জারী করেন, আমি যেন একথা না শুনি যে, তোমরা কুরআনের ধারক-বাহক ব্যতীত অন্য কাউকে নিয়োগ দিয়েছো। যদি কুরআনের ধারক-বাহকদের মধ্যে কল্যাণ না থাকে তাহলে অন্যদের মধ্যে তো থাকবেই না।[৩২৬]

৫. কোন ব্যক্তির মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিকতার দিক দিয়ে কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলে তাকে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় কাজে লাগাতে চাইতেন। তাঁর খিলাফতকালের পূর্বে সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের নিকট মিসরবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল আসে।

---

৩২৩. তাবাকাত-৫/২৯২

৩২৪. ইবনুল জাওযী-৮৬

৩২৫. প্রাগুক্ত-৮৯

৩২৬. প্রাগুক্ত-১০০

সেই দলটির মধ্যে ইবন খুযামির (ابن خذامر) নামের এক ব্যক্তি ছিল। খলীফা সুলায়মান তাদের নিকট আফ্রিকাবাসীদের কিছু অবস্থা জানতে চাইলেন। একমাত্র ইবন খুযামির ছাড়া অন্য সকলে সেখানকার অবস্থা বর্ণনা করলো। প্রতিনিধিদলটি দরবার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একান্তে ইবন খুযামিরের এই চুপ থাকার কারণ জানতে চাইলেন।

তিনি বললেন, মিথ্যা বলতে আমার আল্লাহর ভয় হয়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এ ঘটনাটি মনে ছিল। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর ইবন খুযামিরকে মিসরের কাযী নিয়োগ করেন।[৩২৭]

নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতেন সততা ও বিশ্বস্ততার উপর। একবার 'আদী ইবন আরতাতকে লেখেন, সেনাবাহিনীর গোয়েন্দাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করুন। যে বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত হবে তাকে রাখবেন, আর যার সততায় আপনাদের আস্থা হবে না তাকে বিদায় করে তার স্থলে অন্যকে নিয়োগ করবেন। তবে সর্বদা আমানতদারী ও তাকওয়া-পরহেযগারীর প্রতি সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি দেবেন।[৩২৮] বিচারকের জন্য আরো বেশী শর্ত আরোপ করেন। তিনি বলতেন, বিচারকের মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকা উচিত। ক. রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের জ্ঞান থাকতে হবে। খ. বিচক্ষণ হতে হবে। গ. তাড়াহুড়োকারী হবে না। ঘ. পবিত্র আত্মা হতে হবে। ঙ. পরামর্শকারী হবে।[৩২৯]

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এত হিসেবী ও মিতব্যয়ী ছিলেন যে, প্রতিদিনের খরচের জন্য তাঁর দুই দিরহামই যথেষ্ট ছিল। তবে অত্যন্ত উদারভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা নির্ধারণ করেন। একবার জনৈক ব্যক্তি প্রতিবাদী কণ্ঠে তাঁকে বলেন, আপনি কর্মকর্তাদেরকে কয়েক শ' দীনার করে বেতন-ভাতা দেন, বরং ক্ষেত্র বিশেষে এর থেকেও বেশী দেন। এটা কিসের ভিত্তিতে দেন? তিনি বলেন, যদি তারা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতের উপর আমল করে তাহলে যা তাদেরকে দেওয়া হয় তা খুবই কম। আমি তাদেরকে জীবিকার ধান্দা এবং পরিবার-পরিজনের ঝগড়া-বিবাদ থেকে মুক্ত রাখতে চাই।[৩৩০]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খিলাফতের দায়িত্ব হাতে নেওয়ার পর যখন নির্ভরযোগ্য সহযোগীদের খুঁজছিলেন তখন মায়মূন ইবন মিহরান তাঁকে বলেন, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি হলেন একটি বাজারতুল্য। বাজারে সেই মালই আসে যা চলে। মানুষ যখন জেনে যাবে, আপনার এখানে কেবল ভালো মাল চলে তখন সবাই ভাল মালই নিয়ে

---

৩২৭. কিতাবু উলাতি মিসর-৩৩৮
৩২৮. তাবাকাত-৫/২৯৩
৩২৯. ইবনুল জাওযী-২৩৮
৩৩০. প্রাগুক্ত-১৬৪

আসবে। মায়মূনের কথা সত্যে পরিণত হয়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন একজন সৎ মানুষ। তাই তাঁর চার পাশে সৎ মানুষের সমাবেশ ঘটে। এ সকল মানুষ যেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের অস্তিত্বের ছায়াস্বরূপ ছিল। তাঁরই ইঙ্গিতে তাঁরা কর্মতৎপর হতো। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয প্রতিটি বিষয়ে কর্মকর্তাদেরকে উপদেশ দিতেন, আদেশ-নিষেধ করতেন, কাজ করতে উৎসাহ দিতেন ও বিরত থাকতে বলতেন। এ কারণে তাদের উপর তাঁর নৈতিকতার প্রভাব পড়তো। আবূ বকর ইবন হাযম রাতেও কাজ করতেন। একাজ তিনি করতেন শুধুমাত্র 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের উৎসাহে। একবার একজন আঞ্চলিক কর্মকর্তা তাঁর নিকট একটি অভিযোগ উত্থাপন করে। জবাবে তিনি একটি উপদেশপূর্ণ পত্র লেখেন। পত্রটি তার উপর এতটা প্রভাব ফেলে যে, সে তার পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয় এবং বলে, আপনার পত্রটি পাঠ করে আমার অন্তর কাঁপতে আরম্ভ করে। এখন থেকে আমি আমার নিজের সেবার কাজে আর যাব না।[৩৩১]

মুহাদ্দিছ ইবনুল জাওযী (রহ) 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সকল ফরমান ও নির্দেশাবলী তাঁর গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সন্নিবেশ করেছেন। এতে যদিও নিতান্ত ছোটখাট বিষয়ও স্থান লাভ করেছে, তবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

১. রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন, বিদ'আতের বিলুপ্তি সাধন এবং বেতন-ভাতা বণ্টনের প্রতি তিনি অত্যধিক গুরুত্ব দেন। জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কোন পত্র এলে তাতে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের কোন একটির উল্লেখ অবশ্যই থাকতো।

২. কর্মকর্তাদের প্রতি কঠোর আদেশ ছিল তারা যেন হাজ্জাজের রূপ ধারণ না করে। একবার তিনি 'আদী ইবন আরতাতকে লেখেন, আমি তোমাদেরকে হাজ্জাজের রূপ ধারণ থেকে বিরত রাখতে চাই। কারণ, হাজ্জাজ ছিল একটি বালা-মুসীবত। একটি দল তাদের কাজের দ্বারা তার সকল অপকর্মের সমর্থন দিয়েছে। এ কারণে, তার সময়ে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পেরেছে। কিন্তু এখন সে যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং আল্লাহর শান্তি ও নিরাপত্তা আবার ফিরে এসেছে। যদি তা একদিনও বিদ্যমান থাকে তবুও তা হবে আল্লাহর অনুগ্রহ। আমি সালাতের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছি। কারণ সে সময় হওয়ার পরও বিলম্ব করতো। অনুরূপভাবে যাকাতের ক্ষেত্রেও তাকে অনুসরণ করতে নিষেধ করেছি। কারণ, সে যথাস্থান থেকে যথাযথভাবে যেমন গ্রহণ করতো না, তেমনি যথাস্থানে তা ব্যয়ও করতো না।

৩. সকল কর্মকর্তাকে আদল ও ইনসাফ কায়েমের শক্ত তাকীদ দেন। একজন কর্মকর্তা লিখলেন, আমাদের শহরটি বিরান হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কিছু অর্থ বরাদ্দ করলে সংস্কার করা যেত। জবাবে তিনি লেখেন, ওতে আদল-ইনসাফের কিল্লা তৈরি কর এবং ওর রাস্তা-ঘাট থেকে জুলুমের আবর্জনা পরিষ্কার কর। এই হলো ওর সংস্কার।[৩৩২]

---

৩৩১. প্রাগুক্ত-১০০

৩৩২. প্রাগুক্ত-৮৮

অন্য একজন কর্মকর্তাকে তিনি লেখেন, তুমি তোমার হাতকে মুসলমানদের রক্ত থেকে শুকনো, তাদের সম্পদ থেকে পেটকে শূন্য এবং মান-মর্যাদা থেকে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখ। যদি তুমি একাজ করতে পার তাহলে তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর জুলুম করে।[৩৩৩]

আরেকজন কর্মকর্তাকে তিনি লেখেন, তোমাদের আগের লোকেরা যে পরিমাণ জুলুম করেছে, তোমরা যদি সেই পরিমাণ ইনসাফ, ইহ্‌সান ও ইসলাহ অর্থাৎ ন্যায় বিচার, অনুগ্রহ ও সংশোধন করতে পার তাহলে তাই কর।

৪. তিনি কেবল ফরমান জারী ও আদেশ-নিষেধমূলক পত্র লিখেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, বরং সম্ভাব্য যৌক্তিক উপায়ে কর্মকর্তাদের কর্মতৎপরতার খোঁজ-খবরও রাখতেন। যাতে তারা ন্যায়ানুগ পথ ও পন্থা থেকে সরে যেতে না পারে। রাবাহ্ ইবন 'উবায়দাহ্ বলেন, একবার আমি তাঁকে বললাম, ইরাকে আমার বিষয়-সম্পত্তি ও পরিবার-পরিজন রয়েছে, অনুমতি দিলে আমি তাদেরকে একটু দেখে আসতে পারি। প্রথমে তিনি রাজী হননি। অনেক পীড়াপীড়ির পর অনুমতি দেন। বিদায় নেওয়ার সময় বললাম, সেখানে আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে বলুন। তিনি বললেন, আমার প্রয়োজন কেবল এই যে, তুমি ইরাকের জনগণ এবং তাদের সাথে সেখানকার কর্মকর্তাদের আচরণ ও কর্মপদ্ধতির অবস্থা সম্পর্কে অবগত হবে। আমি বহু মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। সকলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশংসা করলো। দিমাশ্‌কে ফিরে এসে একথা খলীফাকে অবহিত করলে তিনি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর বললেন, যদি এর বিপরীত খবর দিতে তাহলে আমি তাদের সকলকে বরখাস্ত করতাম।[৩৩৪]

তবে এত কঠোরতা অবলম্বন সত্ত্বেও বাস্তবে তিনি কর্মচারী-কর্মকর্তাদেরকে কোন রকম শাস্তি দেওয়া পছন্দ করতেন না। একবার এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এটাই পছন্দ করি যে, কর্মচারীরা তাদের নিজ নিজ অবিশ্বস্ততামূলক কাজ সাথে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হোক। আর তাদের রক্তের বোঝা কাঁধে নিয়ে আমি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হই– এ আমার মোটেই পছন্দ নয়।[৩৩৫]

বুদ্ধিমান কর্মকর্তা নিয়োগ

বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দেখেই তিনি কর্মকর্তা নিয়োগ দিতেন। এ ক্ষেত্রে বয়স কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিলেন। বলা হলো, সে তো একেবারে তরুণ, ঠিক মত তার দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। তার থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের পর তিনি বললেন : আমার মনে হচ্ছে এত অল্প বয়সে তুমি এই দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। তখন সেই তরুণ কর্মকর্তাটি নিম্নের চরণটি আবৃত্তি করে :

---

৩৩৩. প্রাগুক্ত-৯৪
৩৩৪. কিতাবুল খারাজ-৬৫
৩৩৫. তাবাকাত-৫/২৭৭

وليس يزيد المرء جهلا ولاعمىً + إذاكان ذا عقل حداثة سنه.

'কোন মানুষের অল্প বয়স তার মূর্খতা ও অন্ধত্বকে বৃদ্ধি করে না– যদি সে হয় বুদ্ধিমান।'

'উমার বললেন : কবি ঠিক বলেছে। তিনি সেই তরুণকে তার পদে বহাল রাখেন।[৩৩৬]

কাতিব বা সচিবগণ

তাঁর যে সকল সচিবের নাম জানা যায় তাঁরা হলেন :

উম্মুল হাকামের আযাদকৃত দাস আল-লাইছ ইবন আবী রুকাইয়া, আয-যুবায়রের আযাদকৃত দাস ইসমা'ঈল ইবন আবী হাকীম ও সুলায়মান ইবন সা'দ আল-খুশানী। দিওয়ানুল খারাজের সচিব ছিলেন এই সুলায়মান। আর-রাজা' ইবন হায়ওয়া ছিলেন তাঁর একান্ত সচিব। অনেক সময় 'উমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফরমান ও চিঠি-পত্র নিজেই লিখতেন।[৩৩৭]

তাঁর পুলিশ বাহিনী প্রধান ছিলেন ইয়াযীদ ইবন বাশীর আল-হিলালী এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনী প্রধান 'আমর ইবন আল-মুহাজির। এই 'আমরকে আবুল 'আব্বাস আল-হিলালীও বলা হয়। খিলাফতের খাতাম (خاتم) বা সীল-মোহরের দায়িত্বে ছিলেন ইবন আবী সালামা এবং সেনাবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন সালিহ ইবন আবী জুবায়র। আমীরুল মু'মিনীনের সাথে যোগাযোগ ও সাক্ষাৎকারের সার্বিক দায়িত্ব পালন করতেন তাঁর দাস আবূ 'উবায়দা আল-আসওয়াদ।[৩৩৮]

আল-ইয়া'কূবী বলেন : তাঁর পুলিশ বাহিনী প্রধান ছিলেন তাঁর আযাদকৃত দাস রাওহ ইবন ইয়াযীদ আস-সাকসাকী। আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তি ছিলেন এই রাওহ ও রাজা' ইবন হায়ওয়া আল-কিন্দী।[৩৩৯]

যুদ্ধ-অভিযান

রাষ্ট্র ও ক্ষমতার ব্যাপারে 'উমারের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ববর্তী খলীফাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। খিলাফতের বিস্তৃতি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল সংস্কার ও সংশোধন করা। এ কারণে তাঁর সময়ে সবচেয়ে কম গুরুত্ব পায় যে বিষয়টি তা হলো সেনা অভিযান। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও সার্বভৌমত্বের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন ছাড়া কোন আক্রমণাত্মক অভিযান তাঁর সময়ে খুব কমই হয়েছে। কেবল স্পেনের কিছু কিছু এলাকা ও সিন্ধুর কিছু অংশের বিজয় ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন অঞ্চল তাঁর সময় বিজিত হয়নি।

---

৩৩৬. আল-ইকদ আল-ফারীদ-২/২৫
৩৩৭. প্রাগুক্ত-৪/১৬৫
৩৩৮. প্রাগুক্ত-৪/৪৩২
৩৩৯. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৮

খারেজীদের বিশৃঙ্খলা দমন

হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালের সময় থেকে নিয়ে তাঁর সময় পর্যন্ত ইতিহাসের পাতা মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছিল। এ কারণে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এ ব্যাপারে এত সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যে, কোন বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টিকারী ইসলামী উপদলের বিরুদ্ধেও অস্ত্র চালনার অনুমতি দেননি। খারেজীরা ছিল উমাইয়্যাদের পুরানো দুশমন। তাদের বিরুদ্ধাচরণমূলক আচরণ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময় পর্যন্তও বিদ্যমান ছিল। তিনি সম্ভাব্য সব রকম মাধ্যম ও পদ্ধতিতে তাদেরকে এ হিংসাত্মক আচরণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। তিনি কূফার ওয়ালী আবদুল হামীদকে– যিনি তখন খারেজীদের দমনের দায়িত্বে ছিলেন, লেখেন, "যতক্ষণ তারা খুন-খারাবি ও ফাসাদ সৃষ্টি না করে ততক্ষণ তাদের উপর চড়াও হবেন না। একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ধীর-স্থির প্রকৃতির লোককে আমার এ নির্দেশ জানিয়ে অল্প কিছু সৈনিকসহ তাদের নিকট পাঠান।" এই নির্দেশ মত 'আবদুল হামীদ মুহাম্মাদ ইবন জারীর আল-বাজালীকে দুই হাজার সৈন্যসহ তাদের নিকট পাঠান।

এর চেয়ে আরো একটি সতর্ক পদক্ষেপ নেন। আর তা হলো খারেজীদের নেতা বুসতামকে সংশোধন ও বিতর্কের আহ্বান জানিয়ে পত্র লেখেন। তিনি বলেন : 'আসুন, আমরা পরস্পর বাহাছ-মুনাজিরা করি। যদি আমরা সত্যের উপর থাকি তাহলে আপনারা আনুগত্য করবেন। আর যদি আপনারা সত্যের উপর থাকেন তাহলে আমরা আমাদের ব্যাপারটি ভেবে দেখবো।' এই আহ্বানের প্রেক্ষিতে বিতর্কের জন্য বুসতাম দুই ব্যক্তিকে পাঠান এবং বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বুসতাম প্রেরিত লোক দু'টি বললো : আমরা মানছি যে, আপনার রীতি-পদ্ধতি আপনার খান্দানের থেকে ভিন্ন এবং তাদের কর্মকাণ্ডকে আপনি জুলুম-অত্যাচার বলে অভিহিত করেন। কিন্তু তারা যদি ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার উপর থেকে থাকে তাহলে আপনি তাদের প্রতি লা'নত বা অভিশাপ দেন না কেন? হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয জবাব দিলেন : তাদের নিন্দা জানানোর জন্য এতটুকু যথেষ্ট নয় যে, আমি তাদের কর্মকাণ্ডকে জুলুম-অত্যাচার বলে থাকি? এর পরেও তাঁদের প্রতি লা'নত বা অভিশাপ দেওয়া এত জরুরী কেন? তোমরা ফির'আউনের প্রতি কতবার লা'নত দিয়ে থাক? এভাবে তিনি খারেজীদের একেকটি প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে থাকেন। সবশেষে ঐ দুই জনের একজন বললো : একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কি এটা মেনে নিতে পারেন যে, তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি একজন জালেম হোক? 'উমার বললেন : না। সে বললো : তাহলে আপনি আপনার পরে ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করে যাবেন কিভাবে? অথচ আপনি জানেন যে, সে সত্য ও ন্যায়ের উপর অটল থাকবে না। 'উমার বললেন : তার জন্য তো আমার পূর্বসূরী সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক আমার পরে খলীফা হওয়ার বাই'আত সম্পন্ন করে গেছেন। এখন আমি কি করতে পারি? আমার পরে মুসলমনরাই তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে। লোকটি বললো : যে ব্যক্তি আপনার পরে ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিককে মনোনীত করেছেন, আপনার ধারণায় তার কি একাজ করার অধিকার ছিল এবং এ সিদ্ধান্ত কি সঠিক ছিল? এবার হযরত 'উমার নিরুত্তর হয়ে যান। বিতর্ক সভা ভেঙ্গে যাবার পর তিনি বারবার বলতে থাকেন :

أهلكني امر يزيد وخصمت فيه، فاستغفر الله.

'ইয়াযীদের বিষয়টি আমাকে শেষ করে দিয়েছে এবং তাতে আমি পরাজিত হয়েছি। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।'

এই ঘটনার পর বানূ উমাইয়্যারা শঙ্কিত হয়ে পড়ে যে, তিনি ইয়াযীদের স্থলাভিষিক্তির বাই'আতকে বাতিল করে খিলাফতকে আবার শূরা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে যান কিনা। তারা 'উমারকে বিষ প্রয়োগের জন্য একজনকে নিয়োগ করে।[৩৪০]

যাই হোক, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাদেরকে বুঝানোর সব রকম চেষ্টা করেন, কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তারা তাদের সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হলো না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি কয়েকটি শর্তে তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দান করেন। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

১. নারী, শিশু ও বন্দীদের হত্যা করা যাবে না এবং আহতদের হত্যা বা পিছু ধাওয়া করা যাবে না।
২. বিজয় লাভের পর গনীমতের যে সম্পদ হস্তগত হবে তা তাদের পরিবার ও সন্তানদের নিকট ফেরত দেওয়া হবে।
৩. বন্দী ততদিন পর্যন্ত বন্দী অবস্থায় থাকবে যতদিন সে ঠিক পথে ফিরে না আসে।

এই বিধি নিষেধের আওতায় 'আবদুল হামীদ তাদের উপর আক্রমণ চালান, কিন্তু তিনি পরাজিত হন। এ খবর খলীফা 'উমারের নিকট পৌঁছলে তিনি মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিককে পাঠান। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনেন।

নৌ-অভিযান

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের যুদ্ধ অভিযানসমূহের মধ্যে নৌ যুদ্ধের কোন কথা পাওয়া যায় না। আল্লামা যুরকানী বলেছেন, হযরত 'উছমানের যুগে নৌ যুদ্ধের যে ধারা শুরু হয় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তা একেবারে বন্ধ করে দেন। তাঁর নৌ অভিযানের মধ্যে কেবল এটাই দেখা যায় যে, হিজরী ১০০ সনে রোমানরা যখন লাযেকিয়ার উপকূলবর্তী জনপদে আক্রমণ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং তথাকার অধিবাসীদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায় তখন 'উমার জনপদের পুনঃনির্মাণ, নিরাপত্তার নিশ্চিতকরণ এবং বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ পাঠানোর নির্দেশ দেন। এর মধ্যে হিজরী ১০১ সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক এ কাজগুলো সমাধা করেন। কিন্তু অপর একটি বর্ণনা মতে জনপদের পুনঃনির্মাণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য দুর্গ তৈরির কাজ দু'টি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযই শেষ করে যান।[৩৪১]

---

৩৪০. আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৪৫-৪৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/১৮৭; মুরূজ আয-যাহাব-২/১৭১; খিলাফত ও মুলূকিয়াত-১৯০-১৯১; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২১৪-২১৭

৩৪১. ফুতূহ আল-বুলদান-১৩৯

জ্ঞানের জগতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ)

ইসলাম জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি দারুণ উৎসাহ দিয়েছে। মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে চিন্তা ও অনুধ্যানের প্রতি। নানাভাবে মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ও মেধা-মননকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। আল-কুরআনে জ্ঞানীদের প্রশংসা করে তাদের উঁচু মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন :[৩৪২]

وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ.

'এ সকল দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য দেই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা বুঝে।'

তিনি আরো বলেছেন :[৩৪৩]

يَرْفَعُ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন।'

হযরত রাসূলে কারীমের পবিত্র হাদীছে 'ইলম ও ইবাদাত তথা জ্ঞান ও উপাসনার তুলনা করে ইলমকে প্রাধান্য দান করা হয়েছে। তেমনিভাবে জ্ঞান চর্চার প্রধান উপকরণ লেখার কালিকে শহীদের পবিত্র রক্তের সমান মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে। জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহব্যাঞ্জক রাসূলুল্লাহর (সা) বাণীসমূহের কয়েকটি অংশ নিম্নরূপ :

(١) العلم زينة أمام الأصدقاء وسلاح أمام الأعداء.

(٢) ترفرف ملائكة الله بأجنحتها فوق طالب العلم.

(٣) أول ما خلق الله العقل، ولم يخلق أفضل منه.

১. জ্ঞান হচ্ছে বন্ধুদের সামনে সাজ-সজ্জা ও শোভা এবং শত্রুদের সামনে অস্ত্রস্বরূপ।

২. জ্ঞান অন্বেষণকারীর মাথার উপর আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের ডানা দ্বারা ছায়া দিতে থাকে।

৩. আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হলো বুদ্ধি ও জ্ঞান। এর চেয়ে ভালো আর কিছু সৃষ্টি করেননি।

খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কিরাম এ সকল আয়াত ও হাদীছের আলোকে নিজেদের জীবন পরিচালনা করেছেন। নিজেদের সময়ে তাঁরা মূর্খতা, গোঁড়ামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষকে জ্ঞান ও আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন। সাহাবায়ে কিরামের এমনই আবহ ও পরিবেশে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বেড়ে ওঠেন।

---

৩৪২. সূরা আল-'আনকাবূত-৪৩
৩৪৩. সূরা আল-মুজাদালা-১১

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন শৈশবেই 'উমারের প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞানের প্রতি তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এ কারণে ছোটবেলাতেই জ্ঞানের কেন্দ্র ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের মজলিসের প্রতি তিনি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতেন। তিনি যখন মিসরে তখন পিতাকে বলতেন :[৩৪৪]

ترحلني إلى المدنية، فاقعد إلى فقهائها وأتأدب بهم.

'আমাকে মদীনায় নিয়ে চলুন। আমি সেখানকার ফকীহ্দের মজলিসে বসবো এবং তাঁদের নিকট জ্ঞান ও আচার-আচরণ শিখবো।'

এ কারণে দেখা যায়, কৈশোর-যৌবনে তার সমবয়সী কিশোর-যুবকদের থেকে দূরে থাকতেন। অন্যরা যখন খেলাধুলা ও গল্প-গুজবে সময় কাটাতো তখন তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের মজলিসে আসা-যাওয়া করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের বক্তব্য শোনা যাক :[৩৪৫]

ولقد رأيتني وأنا بالمدينة غلام مع الغلمان، ثم تـاقت نفسـي إلى العلـم، إلى العربيـة فالشعر، فأصبت منه حاجتي.

'আমি আমার বাল্যকালে মদীনায় বালকদের সাথে খেলতাম। তারপর জ্ঞানের প্রতি, আরবী ভাষার প্রতি, অতঃপর কবিতার প্রতি আমার অন্তর আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। আমি তার থেকে আমার প্রয়োজন মত গ্রহণ করলাম।'

এরপর তিনি জ্ঞান অন্বেষণে একাগ্র হয়ে পড়েন। ফকীহদের মজলিসে, মুহাদ্দিছদের হালকায় দীর্ঘ সময় ধরে বসে বসে গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁদের আলোচনা শুনতেন। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে অধ্যয়ন, লেখালেখি, আলোচনা, বিতর্ক অথবা বিশিষ্ট আলিমদের দারসে অংশগ্রহণ ইত্যাদির মধ্যে তাঁর সময় কাটতো। তখনকার দিনের জ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র মদীনার পবিত্র ভূমিতে এভাবে জীবনের একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে নিজকে যোগ্য করে গড়ে তোলেন।

সুযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ

তিনি অনেক সাহাবী ও উঁচু স্তরের তাবি'ঈর নিকট থেকে সেকালে প্রচলিত জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। সাহাবী শিক্ষকরা হলেন :

> আনাস ইবন মালিক, তিনি তাঁর থেকে হাদীছ শুনেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব, আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার ইবন আবী তালিব, 'উমার ইবন আবী সালামা আল-মাখযূমী, আস-সায়িব ইবন ইয়াযীদ, ইউসুফ ইবন সাল্লাম, 'উবাদা ইবন আস-সামিত, 'উকবা ইবন 'আমির, 'আয়িশা, খাওলা বিন্ত হাকীম (রা) ও আরো অনেকে।

---

৩৪৪. ইবনুল জাওযী-১৪
৩৪৫. প্রাগুক্ত

উঁচু স্তরের একদল তাবি'ঈর নিকট থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং বর্ণনাও করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন : সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, আবূ বকর ইবন 'আবদির রহমান ইবন আল-হারিছ, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার, 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র, আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান ইবন 'আওফ, 'আমির ইবন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, খারিজা ইবন যায়দ ইবন ছাবিত, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবা, আবূ বুরদা ইবন আবী মূসা, ইবন শিহাব আয-যুহ্রী (রহ) এবং আরো অনেকে।[৩৪৬]

আল-ইমাম আল-হাফেজ আল-বাগান্দী (মৃ. ৩১২ হি.) 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বর্ণিত সকল হাদীছ তাঁর বিখ্যাত "মুসনাদ" গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তাঁর হাদীছের শায়খদের (উস্তাদ) সংখ্যা তেত্রিশ জনে পৌঁছেছে। তাঁদের মধ্যে আটজন সাহাবী এবং পঁচিশজন তাবি'ঈ।

তাঁর কয়েকজন মহান শায়খ ও শিক্ষকবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১. 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) (হি. পূ. ১০-হি. ৭৩) :

একজন মহান সাহাবী, অনুসরণীয় ইমাম, দুনিয়া বিরাগী 'আবিদ, মহাজ্ঞানী, মুজাহিদ, মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তি। জ্ঞান ও কর্মে তিনি ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী। সাহাবী সমাজে তাঁকে খলীফা হওয়ার যোগ্য মনে করা হতো। ষাট বছর যাবত তিনি ফাতওয়া দানের দায়িত্ব পালন করেন। কোন কারণে জামা'আতে 'ঈশার নামায আদায় করতে না পারলে সে রাতে আর শয্যায় যেতেন না। ইবাদাত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। অত্যন্ত কঠোরভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) পদাঙ্ক অনসুরণ করতেন। 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) সন্তানদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক পিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন :

إن عبد الله رجل صالح، لو كان يقوم الليل.

'আবদুল্লাহ একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ, যদি সে কিয়ামুল লাইল করতো অর্থাৎ রাতে নামাযে দাঁড়াতো। রাসূলুল্লাহর (সা) একথার পর থেকে আমরণ 'কিয়ামুল লাইল' করেছেন। যে সকল দাস-দাসী তিনি মুক্ত করেছেন তার সংখ্যা এক হাজার। উদার হস্তে দান করতেন। একবার এক বৈঠকে ত্রিশ হাজার দিরহাম বিলিয়ে দেন। হযরত জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) বলেন :

ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها إلا ابن عمر.

'আমাদের মধ্যে একমাত্র ইবন 'উমার ছাড়া আর যে কেউ দুনিয়া পেয়েছে, দুনিয়া তাঁর প্রতি ঝুঁকেছে এবং সেও দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকেছে।'

---

৩৪৬. আয-যাহবী, তারীখ আল-ইসলাম-১/১৮৭-১৮৮; তাহযীব আত-তাহযীব-৭/৪৭; সিফাতুস সাফওয়া-২/১২৬-১২৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১১৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৮

হযরত রাসূলে কারীম (সা) থেকে সর্বমোট ২৬৩০টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি মক্কায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে ভীষণ পছন্দ করতেন। সেই শৈশবে তিনি মাকে বলতেন, আমি আমার মামার (ইবন 'উমার) মত হবো। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর বাসনা পূরণ করেন। পরবর্তী জীবনে সত্যিকার অর্থে তিনি ইবন 'উমারের (রা) অনুসারী হন।

২. আনাস ইবন মালিক (রা) : (হি. পূ. ১০-হি. ৯৩) : তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অন্যতম শ্রেষ্ঠ আনসারী সাহাবী, তাঁর বিশ্বস্ত খাদেম, ইমাম, মুফতী, কারী, মুহাদ্দিছ। মদীনার খায়রাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। তাঁর মদীনায় আগমনের পর থেকে ওফাত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর খিদমত করেন। একাধিক যুদ্ধে তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করেন। হুদায়বিয়ার 'বাই'য়াতে শাজারা'র অন্যতম সদস্য। হযরত নবী কারীম (সা) তাঁর জন্য দু'আ করেছেন যা তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমার জন্য এভাবে দু'আ করেছেন :

اللهم أكثر ماله وولدَه وأطِل حياته.

'হে আল্লাহ! তুমি তার অর্থ-বিত্ত ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধি দাও এবং তার জীবনকাল দীর্ঘ কর।' আল্লাহ আমার সম্পদে এত সমৃদ্ধি দান করেন যে, আমার একটি আঙ্গুরের বাগান ছিল যাতে বছরে দু'বার ফল আসতো এবং আমার ঔরসজাত সন্তান সংখ্যা এক শ' ছয় জন।

তিনি এত বেশী নামায পড়তেন যে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দু'টি পা ফুলে যেত। হযরত রাসূলে কারীমের ২২৮৬ (দু'হাজার দু'শত ছিয়াশি)টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বসরায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন। খলীফা ওয়ালীদের সময় মদীনার ওয়ালী থাকাকালেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। হাফ্‌স ইবন 'উমার ইবন আবী তালহা আল-আনসারী বলেন : খলীফা ওয়ালীদের সময় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যখন মদীনার ওয়ালী, তখন একবার তিনি মদীনা থেকে হজ্জে যাওয়ার ইরাদা করেন। তখন একদিন আনাস ইবন মালিক (রা) তাঁর নিকট আসেন। 'উমার তাঁকে বলেন : আবূ হামযা! আপনি কি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) ভাষণ সম্পর্কে অবহিত করবেন না? আনাস বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় 'ইউমুত তারবিয়্যা'র একদিন পূর্বে, 'আরাফার দিন 'আরাফাতে, মিনায় কুরবানীর দিন সকালে এবং মিনা ত্যাগের দিন সকালে খুতবা দেন।[৩৪৭]

৩. 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবদিল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'উদ (রা) (মৃ. হি. ৯৮) : একজন ইমাম, মদীনার আলিম, মুফতী, সাতজন শ্রেষ্ঠ ফকীহর একজন। ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। মদীনার অধিবাসী অন্ধ মানুষ ছিলেন। তাঁর দাদা উতবা ছিলেন মহান সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) ভাই।

---

৩৪৭. তাবাকাত-৫/৩৩১; সিয়ারু আ'লাম আল-নুবালা'-৩/৩৯৫; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৪৪

তিনি ছিলেন বিশাল জ্ঞানের অধিকারী মানুষ। হাদীছ ও কবিতায় ছিল তাঁর সীমাহীন জ্ঞান।

ইমাম 'যুহরী বলেন, আমি যখনই কোন 'আলিমের নিকট বসেছি, তাঁর সবটুকু জ্ঞান নিয়ে তবে উঠেছি। আমি 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়রের (রা) নিকট মাঝে মাঝে যেতাম। তাঁর কাছে একই কথা বার বার শুনতাম। তবে ব্যতিক্রম হলেন 'উবায়দুল্লাহ, তাঁর কাছে যতবার গিয়েছি নতুন নতুন জ্ঞান লাভ করেছি। তাঁর সম্পর্কে যুহরী আরো বলেন : আমি মনে করতাম আমি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছি। কিন্তু আমি যখন 'উবায়দুল্লাহর সান্নিধ্যে গেলাম, মনে হলো আমি সাগরকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করছি। ইবন 'আবদিল বার বলেন : 'উবায়দুল্লাহ ছিলেন শ্রেষ্ঠ দশ ফকীহর একজন। ফাতওয়ার বিষয়টি যে সাতজনের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরতো তিনি তাদেরও অন্যতম। তিনি একজন উঁচু স্তরের 'আলিম, ফিক্হ বিষয়ে অগ্রগামী, আল্লাহভীরু ও মননশীল কবি। আমার জানা মতে, সাহাবীদের পর থেকে নিয়ে আমাদের সময় পর্যন্ত কোন ফকীহ তাঁর চেয়ে ভালো কবি হননি, তেমনিভাবে কোন কবি তাঁর মতো ভালো ফকীহ হননি।

এমন মহান ইমামের দারসের মজলিসে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বসেছেন, তাঁর জ্ঞানের সাগর থেকে অঞ্জলী ভরে গ্রহণ করেছেন, তাঁর আদব-আখলাকে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাই অনেকের ধারণা 'উমার জ্ঞান-গরীমা, আদব-আখলাক ও রুচি-সংস্কৃতিতে মহান শিক্ষককেও ছাড়িয়ে গেছেন। তাই 'আলিমগণ 'উবায়দুল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : هو معلم عمر بن عبد العزيز – তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের শিক্ষক।

একবার 'উবায়দুল্লাহ নিম্নের স্বরচিত কবিতাটি 'উমারকে লিখে পাঠান :

بسم الله الذى أنزلت من عنده السور + والحمد لله أما بعد ياعمر

إن كنت تعلم ما تأتي وماتذر + فكن على حذر قد ينفع الحذر

واصبر على القدر المحتوم وارض به + وإن أتاك بما لا تشتهى القدر.

فما صفا لامرئ عيش يسرُّ به + الا سيتبع يوما صفوه كَدَرُ.

'সেই আল্লাহর নামে যাঁর নিকট থেকে এই সূরাগুলো নাযিল হয়েছে। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর। অতঃপর হে 'উমার!

যদি তুমি জানতে পার যা কিছু আসে এবং যা কিছু আসে না সে সম্পর্কে, তাহলে তুমি সতর্ক হবে। সতকর্তা উপকারে আসে।

অবশ্যম্ভাবী তাকদীরের উপর ধৈর্য ধারণ করবে এবং তার আচরণে সন্তুষ্ট থাকবে, যদিও সেই তাকদীর তোমার জীবনে এমন কিছু নিয়ে আসে যা তুমি মোটেও কামনা করনি।

মানুষের স্বচ্ছ আনন্দময় জীবনকে এমন একটা দিন সব সময় অনুসরণ করছে যা তার স্বচ্ছতাকে ঘোলা করে দেবে।'

এ কারণে 'উমার যখন মদীনার ওয়ালী, তখন সব সময় তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করতেন, তাঁর মজলিসে বসতেন। অনেক সময় হয়তো উস্তাদের সাক্ষাৎ পেতেন না, তাতে তিনি মোটেও বিরক্ত না হয়ে পরের দিন আবার যেতেন। ইবন আবী আয-যিনাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'উমার মদীনার ওয়ালী থাকাকালে অনেক সময় আমি তাঁকে 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহর গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। কখনো ঢোকার অনুমতি পেতেন, কখনো পেতেন না। 'উমার তাঁর এই শিক্ষকের প্রতি এতই মুগ্ধ ছিলেন যে, প্রায়ই বলতেন :

لمجلس من الأعمى : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أحب إلى من ألف دينار.

'অন্ধ 'উবায়দুল্লাহর একটি মজলিস আমার নিকট হাজার দীনারের চেয়েও প্রিয়।' তিনি তাঁর খিলাফতকালে বলতেন :

لو كان عبيد الله حيًّا ماصدرت الا عن رأيه،ولوددت أن لى بيوم واحد من عبيد الله كذا وكذا.

'যদি 'উবায়দুল্লাহ জীবিত থাকতেন তাহলে আমি তাঁর মতামত ব্যতীত কোন ফরমান জারী করতাম না। আর তাঁর একটি দিনের বিনিময়ে আমার এত এত কিছু হোক তাও চাইতাম না।

এই মহান শিক্ষকের প্রতি ছিল দৃঢ় আস্থা ও প্রবল নির্ভরতা। খলীফা হওয়ার পর বলতেন :

لو أدركنى عبيد بن عبد الله بن عتبة إذ وقعت فيما وقعت فيه، لهان علىَّ ما أنا فيه.

'আমি যে অবস্থায় পড়েছি, এখন যদি 'উবায়দুল্লাহ জীবিত থাকতেন তাহলে এ অবস্থা আমার জন্য খুবই সহজ হয়ে যেত।' 'উমার তাঁর এই মহান শিক্ষকের সূত্রে বহু জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

لَمَّا رويت عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أكثر مما رويت عن جميع الناس.

'আমি অন্য সকল মানুষের নিকট থেকে যা বর্ণনা করেছি, তার চেয়ে অনেক বেশী বর্ণনা করেছি এক 'উবায়দুল্লাহর নিকট থেকে।'[৩৪৮]

৪. সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) (মৃ. হি. ১০৬) : দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ ও নির্মোহ স্বভাবের ইমাম, ফকীহ, মদীনার মুফতী, মদীনার

৩৪৮. ইবনুল জাওযী : ৮০-৯০; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৮

সপ্ত ফকীহর অন্যতম, বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী, উঁচু স্তরের হাদীছ ব্যক্তিত্ব ও একান্ত আল্লাহভীরু তথা মুত্তাকী মানুষ ছিলেন। মুসলিম মনীষীদের মধ্যে যাঁদের জীবনে জ্ঞান ও কর্ম এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার প্রতি চরম বৈরাগ্য ভাব ও সম্মান-মর্যাদার সমন্বয় ঘটেছিল সালিম তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁর মহান পিতা 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ বলেন : একবার আমি সালিমকে তাঁর বর্ণিত একটি হাদীছ সম্পর্কে বললাম : আপনি কি হাদীছটি আপনার পিতা 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন : একবার? এক শো বারেরও বেশী! চেহারা-সুরতে, চলনে-বলনে তিনি পিতার অনুরূপ ছিলেন। সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন :

كان أشبهَ ولد عمر بعمر عبد الله، وأشبهَ ولد عبد الله بعبد الله سالم.

'উমারের (রা) সন্তানদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ছিলেন 'উমারের সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ, তেমনিভাবে 'আবদুল্লাহর সন্তানদের মধ্যে সালিম ছিলেন তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।' পিতা তাঁর পুত্রের দারুণ গুণমুগ্ধ ছিলেন। ভীষণ ভালোবাসতেন।

তাঁর সমকালীন খলীফাগণ তাঁকে খুবই সমাদর ও সম্মান করতেন। একবার তিনি খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের দরবারে গেলে তিনি এগিয়ে এসে তাঁকে স্বাগতম-শুভেচ্ছা জানাতে জানাতে সংগে করে তাঁর আসনে পাশাপাশি বসান। ইমাম মালিক (রহ) এই মনীষী সম্পর্কে বলেন : পূর্ববর্তী যে সকল সত্যনিষ্ঠ মনীষী চলে গেছেন, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখিতায় ও জ্ঞান-গরিমায় সালিমের যুগে তাঁদের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ তার চেয়ে আর কেউ ছিলেন না।[৩৪৯]

৫. সালিহ ইবন কায়সান (মৃ. ১৪০ হি.) : তিনি ছিলেন হাদীছের ইমাম, হাফেজ, হাদীছ বর্ণনায় বিশ্বস্ত, মদীনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম। একবার ইমাম আহমাদকে (রহ) সালিহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন : চমৎকার! চমৎকার! ইবন হিব্বান বলেন : সালিহ ছিলেন মদীনার অন্যতম ফকীহ, হাদীছ ও ফিকহর সমাবেশস্থল এবং অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও সম্মানীয় মানুষ। ইবন 'আবদিল বার বলেন : তিনি ছিলেন বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী, বিশ্বস্ত এবং হুজ্জাত তথা প্রমাণতুল্য মানুষ। 'উমারের ছোটবেলার শিক্ষক ছিলেন, অত্যন্ত যত্ন ও কঠোরতার সাথে শিক্ষার পাশাপাশি আদব-কায়দা, আচার-আচরণ ও শিষ্টাচারও শিক্ষা দেন।[৩৫০]

পরে 'উমার তাঁর এই মহান শিক্ষককে নিজের সন্তানদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন। নিজের পরামর্শক হিসেবে সব সময় নিজের কাছে রাখেন।

উপরে উল্লেখিত এ রকম মহান শিক্ষকদের নিকট 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয শিক্ষা

---

৩৪৯. তাবাকাত-৫/১৯৫; হিলয়াতুল আওলিয়া-২/১৯৩, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২৩৪
৩৫০. শাজারাতুয যাহ্‌ব-১/২০৮; তাহযীব আত-তাহযীব-৪/৩৫০; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৪৮

গ্রহণ করেন। কথা-কাজে, চিন্তা-অনুধ্যানে, খোদাভীতিতে আজীবন তিনি তাদেরকে অনুসরণ করেন।

প্রথম জীবনে 'উমার কবিতার প্রতি ভীষণ অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কাব্য চর্চায় অনুরাগী হয়ে ওঠেন। অসংখ্য কবিতা স্মৃতিতে ধারণ করেন। কবিতার একজন সমঝদার সমালোচকও হয়ে পড়েন। তাঁর সময়ে কাব্য চর্চা ইসলামী সমাজের উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। সর্বত্র কবিতা রচনার প্রতিযোগিতা ও কবিতা পাঠের আসর জমে উঠতো। সে সময় আরব জগতের সর্বত্র মৌমাছির গুনগুন আওয়াজের মত কবিদের গুনগুনানি ধ্বনিত হতো। সে সময় আরব বিশ্বের সর্বাধিক খ্যাতিমান কবি ছিলেন তিনজন : জারীর, ফারাযদাক ও আখতাল। দীর্ঘকাল যাবত তাঁরা আরব বিশ্বের মানুষকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। 'উমারও তাঁদের দ্বারা ভীষণ প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাঁর পিতা 'আবদুল 'আযীয মিসরের ওয়ালী থাকাকালে তাঁর দরবারে কবিদের আসর জমতো। পুরস্কার, দান-অনুগ্রহ লাভের জন্য সেখানে আহওয়াস, কুছায়্যির, 'ইয্যা, নুসায়ব ইবন রাবাহ্-এর মত কবিগণ সমবেত হতেন। 'উমার তাঁদের সাথে মেলামেশা করতেন। এতে তিনি যথেষ্ট উপকার লাভ করেন। আরবী দিওয়ান থেকে অসংখ্য কবিতা মুখস্থ করেন, যা তাঁর ভাষা-সাহিত্যের শুদ্ধতায় অবদান রাখে এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ বুঝতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

তিনি নৈতিক মূল্যবোধ ও ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন কবিতা পছন্দ করতেন এবং মাঝে মধ্যে এ জাতীয় কিছু কবিতা রচনাও করেছেন। ইবনুল জাওযী (রহ) তাঁর "সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ওয়া মানাকিবুহু" গ্রন্থে সেই সকল কবিতার কিছু সংকলন করেছেন। মদীনায় অত্যন্ত জনপ্রিয় এক প্রকার রাগ সঙ্গীত তাঁর নামে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ এ রাগ তিনি উদ্ভাবন করেন মদীনার ওয়ালী থাকাকালে। আর তখন তিনি বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।[৩৫১]

পিতা 'আবদুল 'আযীযের ইনতিকালের পর চাচা খলীফা 'আবদুল মালিক তাঁকে নিজ পরিবারের সাথে যুক্ত করেন। খলীফা আবদুল মালিকও ছিলেন একজন বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিছ। তাঁর সম্পর্কে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন : إن لمروان إبنًا فقيها فسلوه 'মারওয়ানের একটি ফকীহ ছেলে আছে। তোমরা তাঁর কাছে জিজ্ঞেস কর।' তিনি আরো বলেন :

ولد الناس أبناء، وولد مروان أبًا.

'মানুষ সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, আর মারওয়ানের জন্ম হয়েছে পিতা হিসেবে।'

আবুয যিনাদ বলেন : 'মদীনার ফকীহগণ হলেন, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, 'আবদুল মালিক, 'উরওয়া ও কুবাইসা ইবন যুওয়াইব।' ইমাম আশ-শা'বী বলেন : 'একমাত্র 'আবদুল মালিক ছাড়া আর যার কাছেই আমি বসেছি, নিজেকে তার উপর শ্রেষ্ঠ

---

৩৫১. ইবনুল জাওযী-২২৫

পেয়েছি।[৩৫২] মোটকথা খলীফা আবদুল মালিক ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ। ধূর্ত রাজনীতিক হওয়া সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ ফকীহদের মধ্যে গণ্য করা হয়। কাব্য শাস্ত্রেও তাঁর প্রচণ্ড দখল ছিল।

এমন একজন বিদ্বান চাচার তত্ত্বাবধান লাভ করেন 'উমার এবং নিজেকে চাচার মত গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রাণিত হন।

'উমার উপলব্ধি করেছিলেন জ্ঞান চর্চাই তাঁর জীবন, আর এর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানে মরণ। এ কারণে তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গ উপভোগ করতেন, তাঁদের নিকট না জানা বিষয় প্রশ্ন করে জেনে নিতেন। যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হজ্জের সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) কোথায় কিভাবে খুতবা দিয়েছিলেন তা সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিককে (রা) প্রশ্ন করে জেনে নেন। অথচ তখন 'উমার মদীনার ওয়ালী। আরেকবার حديث الحوض বা হাউজ সম্পর্কে বর্ণিত রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীছ বর্ণনাকারী একজন তাবি'ঈর মুখ থেকে শোনার জন্য তাঁকে আনতে লোক পাঠান। 'আব্বাস ইবন সালিম আল-লাখমী বলেন :[৩৫৩]

بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلاّم الحبشي يُحمل على البريد، فلما قدم عليه قال : لقد شقّ عليّ. قال عمر : ما أردنا ذلك،ولكنه بلغني عنك حديث ثوبان في الحوض، فأحببت أن أشافهك به! فقال : سمعت ثوبان يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن حوض من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه اشد بياضا من اللبن، واحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لمَ يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين.

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ডাকের বাহনে চড়িয়ে আবী সাল্লাম আল-হাবশীকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। যখন তিনি আসলেন, বললেন : আমার জন্য কষ্টকর হয়েছে। 'উমার বললেন : আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি, তবে আপনার সূত্রে "হাউজ" বিষয়ে ছাওবানের হাদীছটি পৌঁছেছে। সেটি আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চেয়েছি। তিনি বললেন : আমি ছাওবানকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি : আমার হাউজ হবে 'আদন (এডেন) থেকে 'আম্মানের বালকা' পর্যন্ত প্রশস্ত। এর পানি হবে দুধের চেয়ে বেশী সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি, এবং পেয়ালার সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্ররাজির সম-সংখ্যক। কেউ একবার এর পানি পান করলে অনন্তকালের জন্য আর তৃষ্ণা অনুভব করবে না। এই হাউজে প্রথম অবতরণকারী হবে মুহাজিরদের দরিদ্র মানুষেরা।

---

৩৫২. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয-৬১
৩৫৩. ইবনুল জাওযী : ৩২-৩৩

তাঁর জ্ঞানের গভীরতা

তাঁর সময়ের বড় বড় জ্ঞানী-গুণীদের দারসে বসা ও সাহচর্য লাভের কারণে তিনিও বহু শাস্ত্রে বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। অর্জিত জ্ঞানের জন্য তিনিও বেশ তুষ্ট ছিলেন বলে মনে হয়। যেমন তিনি মদীনা ত্যাগের সময়কালের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এভাবে :[৩৫৪]

خرجت من المدينة ومامن رجل أعلم منى، فلما قدمت الشام نسيتُ.

'আমি যখন মদীনা থেকে বের হলাম তখন আমার চেয়ে বড় 'আলিম কেউ ছিলেন না। অতঃপর আমি শামে এসে সব ভুলে গেলাম।'

নিজের জ্ঞানের প্রতি তাঁর কতখানি আস্থা থাকলে তিনি এমন কথা বলতে পারেন? অথচ সে সময় মদীনাতে হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব ও তাঁর মত আরো অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন। ইমাম যুহ্‌রীর সঙ্গে একদিন সারা রাত হাদীছ ও ফিকহ্ বিষয়ে আলোচনা করলেন। ইমাম যুহ্‌রী 'উমারকে বহু হাদীছ শোনালেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে 'উমার বললেন : আজ রাতে আপনি যত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, সবই আমি পূর্বে শুনেছি। তবে আপনি মুখস্থ রেখেছেন, আর আমি ভুলে গিয়েছি।[৩৫৫]

ইমাম যুহ্‌রীর মত মহাজ্ঞানী মানুষকে এমন কথা বলতে পারায় প্রমাণিত হয় জ্ঞানের জগতে তাঁর ভিত্তি ছিল অতি মজবুত, জানাশোনার পরিধি ছিল অতি ব্যাপক ও প্রশস্ত এবং তাঁর শ্রুত ও বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা অনেক বেশী। এ কারণে পরবর্তীকালে সংকলিত হাদীছের অথবা রচিত ফিকহর অধিকাংশ গ্রন্থাবলীতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নাম দেখা যায়। হয়তো তা হাদীছ বর্ণনা সূত্রে, ফিকহ্ বিষয়ক কোন মতামত, কোন আদেশ-নিষেধ অথবা বিচার-ফয়সালার সিদ্ধান্ত হিসেবে। ইসলামের প্রথম পর্বের 'আলিম ও ইমাম-মুজতাহিদগণ বিভিন্ন বিষয়ে নিজ নিজ মতের স্বপক্ষে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কথা ও কাজকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম লাইছ ইবন সা'দ-এর সেই বিখ্যাত চিঠিটির কথা উল্লেখ করা যায়, যা তিনি ইমাম মালিকের নিকট পাঠিয়েছিলেন। যাতে তিনি ইমাম মালিকের মতের বিরুদ্ধে এবং নিজের মতের স্বপক্ষে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কথা ও কাজকে একাধিক মাসয়ালায় উল্লেখ করেছেন। এমনকি চার মাযহাবের ফিকহর গ্রন্থাবলীতে প্রমাণ হিসেবে বার বার তাঁর কথা ও কাজ উল্লেখ করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের ইমামগণ তাঁকে তাঁর মাতৃকূলের ঊর্ধ্বতন পুরুষ হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) থেকে পৃথক করার জন্য তাঁকে "'উমার আস-সাগীর" তথা ছোট 'উমার নামে অভিহিত করেছেন। ইমাম মালিক (রহ) তাঁর বিখ্যাত "আল-মুওয়াত্তা" গ্রন্থে বিশ বারেরও অধিক তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। ইমাম মালিকের অনুসারী পরবর্তী ইমাম-মুজতাহিদগণ তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীতে অত্যন্ত

---

৩৫৪. 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/১৯৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১২১

৩৫৫. প্রাগুক্ত; ইবনুল জাওযী-৩৭

শ্রদ্ধার সংগে বহুবার বহুভাবে তাঁর কথা ও কাজ উল্লেখ করেছেন। শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ইমামগণও তেমন করেছেন। ইমাম আন-নাওবী (রহ) তাঁর 'তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত' গ্রন্থে তাঁর জীবনী সন্নিবেশ করেছেন। আর হাম্বলী মাযহাবের লোকেরা তাঁকে কতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন তা বুঝা যায় এই মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের এই উক্তি দ্বারা :[৩৫৬]

لا أدرى قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز.

'একমাত্র 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কথা ছাড়া অন্য কোন তাবি'ঈর কোন কথা 'হুজ্জাত' (প্রমাণ) হিসেবে ধরা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।'

কাদরিয়্যাদের মতবাদ খণ্ডন করে তিনি যে পত্রটি লেখেন তাতে যে শক্তিশালী যুক্তি এবং কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন তাতে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা অনুমান করা যায়। তেমনিভাবে খারেজীদের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত যুক্তিতেও তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য প্রমাণিত হয়।[৩৫৭]

তাঁর জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে তাঁর সমকালীন ও পরবর্তীকালের মনীষীদের কিছু মন্তব্য

পণ্ডিত মনীষীদের মন্তব্য ও সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন তত্ত্ব-জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের অন্যতম। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর তাবি'ঈ 'আলিমদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান ও মর্যাদার অধিকারী। নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষীর উক্তি উপস্থাপন করা হলো :

ইমাম যুহ্রী 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। 'উবায়দুল্লাহ বলেন :[৩৫৮]

كانت العلماء عند عمر ابن عبد العزيز تلامذة.

"আলিমগণ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট ছিলেন ছাত্র সমতুল্য।'

বিখ্যাত তাবি'ঈ মুজাহিদ (রহ) বলেন :[৩৫৯]

أتينا عمر بن عبد العزيز ونحن نرى أنه سيحتاج إلينا، فما خرجنا من عنـده حتـى احتجنا إليه.

'আমরা এই ধারণা নিয়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট গেলাম যে, তিনি আমাদের জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হবেন; কিন্তু যখন তাঁর নিকট থেকে বের হলাম তখন আমরাই তাঁর জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয়ে গেলাম।' তিনি আরো বলেন :

أتينا عمرنعلمه، فما برحنا حتى تعلمنا منه.

---

৩৫৬. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৬৩
৩৫৭. হিলয়াতুল আওলিয়া-৫/৩০৯-৩১০, ৩৪৬, ৩৫৩; ইবনুল জাওযী : ৯০-৯৬
৩৫৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/১৯৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৯
৩৫৯. তাবাকাত-৫/৩৬৮; তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-২/২২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১২০

'আমরা 'উমারের নিকট গেলাম তাঁকে কিছু শেখাবো বলে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে আমরাই তাঁর নিকট থেকে শিখতে লাগলাম।'

মায়মূন ইবন মিহ্রান বলেন :[৩৬০]

كان عمر بن عبد العزيز معلم العلماء.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন 'আলিমদের মু'আল্লিম বা শিক্ষক।'

তিনি আরো বলেন :

أتينا عمر بن عبد العزيز ونحن نرى أنه يحتاج إلينا، فما كنا معه إلا تلامذة.

'আমরা এই ধারণা নিয়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট গেলাম যে, তিনি আমাদের জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হবেন; কিন্তু কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে থাকার পর আমরাই তাঁর ছাত্র হয়ে গেলাম।'

প্রখ্যাত তাবি'ঈ মুহাদ্দিছ আইউব আস-সিখতিয়ানী বলেন : আমরা যাঁদেরকে পেয়েছি তাঁদের কেউ 'উমারের চেয়ে নবীর (সা) হাদীছ অধিক ধারণকারী আছেন বলে আমার জানা নেই।[৩৬১] ইমাম মালিক ও ইবন 'উয়ায়না বলেন :[৩৬২] عمر بن عبد العزيز إمام. – "উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একজন ইমাম।'

ইবন সা'দ বলেন : তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও আমানতদার। তাঁর ছিল ফিকহ ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান এবং খোদাভীতি। বহু হাদীছ তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ ইমাম। আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন ও সন্তুষ্ট থাকুন![৩৬৩]

হাফেজ ইবন 'আবদিল বার বলেন :[৩৬৪]

كان أحد الراسخين في العلم.

'জ্ঞানের জগতে তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ ও পারদর্শী ব্যক্তি।'

ইমাম আয-যাহাবী বলেন :[৩৬৫]

وكان إماما فقيها مجتهدا، عارفا بالسنن، كبير الشان، ثبتا، حجة، حافظا، قانتا لله أواها منيبا.

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন একজন ইমাম, ফকীহ, মুজতাহিদ, সুন্নাহর জ্ঞানে

---

৩৬০. প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৯
৩৬১. তাহযীবুত তাহযীব-৭/৪১৯
৩৬২. প্রাগুক্ত
৩৬৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১১৫
৩৬৪. জামি' বায়ান আল-'ইলম-২/১৩০
৩৬৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১১৪

পারদর্শী, বিশাল কর্মকাণ্ডের অধিকারী, দৃঢ় চিত্ত, হাদীছ শাস্ত্রের হুজ্জাত, হাফেজ, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মানুষ।'

ইমাম আল-লায়ছ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ও 'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের (রা) সুহবত ও সাহচার্য পেয়েছেন এবং 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে জাযীরার ওয়ালী নিয়োগ করেছিলেন, এমন এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন :[৩৬৬]

ما التمسنا علم شيئ إلا وجدنا عمر بن عبد العزيز أعلم الناس بأصله وفرعــه، وكـان العلماء عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة.

'আমরা যখনই কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে চেয়েছি তখন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে সে বিষয়ের মূল ও শাখা-প্রশাখায় সকলের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিরূপে পেয়েছি। অন্য সকল 'আলিম 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট ছাত্র সমতুল্য ছিলেন।'

ইমাম নাওবী (রহ) লিখেছেন : 'তাঁর বিশাল জ্ঞান, অগাধ পাণ্ডিত্য, পরিচ্ছন্ন স্বভাব, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ তাপস্য, তাকওয়া, 'আদল-ইনসাফ, মুসলমানদের প্রতি দয়া ও মমতা, উন্নত চরিত্র, আল্লাহর রাস্তায় চূড়ান্ত রকমের প্রচেষ্টা, সুন্নাতে নববীর আনুগত্য-অনুসরণ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুকরণের ব্যাপারে সকলে একমত।'

'আল্লামা আবুল হাসান 'আলী আন-নাদবীর (রহ) একটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানছি। তিনি বলেন :[৩৬৭]

وكان عمر من العلماء الراسخين الربانيين، ولولا الخلافة وتكاليفها لكان مـن العلمـاء المـعدودين، ومن الفقهاء المـشهورين.

"উমার ছিলেন আল্লাহ ওয়ালা সুদক্ষ জ্ঞানী ব্যক্তিদের একজন। যদি খিলাফত ও তার বিশাল দায়িত্ব তাঁর উপর না চাপতো তাহলে মুষ্টিমেয় হাতে গোনা জ্ঞানী ব্যক্তিদের একজন এবং বিখ্যাত ফকীহদের মধ্যে গণ্য হতেন।'

তাঁর ছাত্র এবং যাঁরা তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন

বিশিষ্ট 'আলিম ও ইমামদের বিশাল একটি সংখ্যা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁদের কয়েকজন হলেন : তাঁর অন্যতম শিক্ষক আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান, তাঁর দুই ছেলে 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুল 'আযীয ইবন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, তাঁর ভাই যাব্বান ইবন 'আবদিল 'আযীয, চাচাতো ভাই মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক। তাছাড়া আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন 'আমর ইবন হায্ম, রাজা' ইবন হায়ওয়া, আয-যুহ্রী, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, আম্বাসা ইবন

---

৩৬৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/১৯৪
৩৬৭. রিজালুল ফিক্র ওয়াদ দা'ওয়া-১/৫২

সা'ঈদ ইবন আল-'আস, হুমাইদ আত-তাবীল, মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির, তাম্মাম ইবন নাজীহ, তাওবা আল-'আম্বরী, 'আমর ইবন মুহাজির, গায়লান ইবন আনাস, লায়ছ ইবন আবী রুকাইয়া আছ-ছাকাফী, (তাঁর সেক্রেটারী), মুহাম্মাদ ইবন কায়স, আন-নাদার ইবন 'আরাবী, নু'আইম ইবন 'আবদিল্লাহ আল-কায়নী, হিলাল আবূ তা'মা ('উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের আযাদকৃত দাস), ইয়া'কূব ইবন 'উতবা ইবন আল-মুগীরা ইবন আল-আখনাস, মুহাম্মাদ ইবন আয-যুবাইর, আল-হানজালী, আইউব আস-সাখতিয়ানী, ইবরাহীম ইবন আবী 'আবালা, সালিহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন যায়িদা আল-লায়ছী, সাখর ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন হারমালা, 'উছমান ইবন দাউদ আল-খাওলানী, তাঁর ভাই সুলায়মান ইবন দাউদ, 'উমাইর ইবন হানী আল-'আনসী, 'ঈসা ইবন আবী 'আতা আল-কাতিব, আবূ হাশিম মালিক ইবন যিয়াদ, মুহাম্মাদ ইবন আবী সুওয়াইদ আছ-ছাকাফী, মারওয়ান ইবন জানাহ এবং আরো অনেকে।[৩৬৮]

তাঁর জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটেনি কেন?

বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ও বিশাল পাণ্ডিত্য, যা তাঁকে একজন ইমামের মর্যাদা দান করেছে, যাঁকে জ্ঞানে সাগরতুল্য ইমাম আয-যুহ্‌রীর সমান মনে করা হয়, সমকালীন অন্য সকল 'আলিমকে তাঁর ছাত্রতুল্য গণ্য করা হয়, জ্ঞানের এত অত্যুচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির জ্ঞানের তেমন প্রচার-প্রসার ঘটেনি কেন? তাঁর সমকক্ষ অন্যান্য ইমাম যথা আয-যুহ্‌রী, মালিক ও সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব প্রমুখের মত হাদীছ ও ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর বর্ণনা পাওয়া যায় না কেন?

এ প্রশ্নের জবাবে দু'টি কারণ উল্লেখ করা যায়। প্রথম কারণ, আর এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তিনি তাঁর বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার ছড়িয়ে দেওয়ার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ লাভ করেননি। প্রথম জীবনে মদীনার শ্রেষ্ঠ 'আলিম ও ফকীহদের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণের পর মদীনা ত্যাগ করেন। কিছুকাল পরে আবার সেখানে ফিরে আসেন তথাকার ওয়ালী হিসেবে। কিছুদিন পর সেই সাথে যুক্ত হয় মক্কার ইমারতের দায়িত্ব। তখন তিনি হন মক্কা-মদীনা তথা হারামাইনের আমীর। এ বিশাল দায়িত্ব পালনের কারণে তিনি তখন অন্যদের মত দারসের মজলিস করে ছাত্রদের ফিক্‌হর জ্ঞান দিতে পারেননি, তাদের নিকট নিজের সংগ্রহের হাদীছ ভাণ্ডার বর্ণনা করতে সক্ষম হননি। এক সময় এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁকে দারুল খিলাফা দিমাশ্‌কে ডেকে নেওয়া হয়। সেখানে বেশ কয়েকটি বছর তাঁর অতিবাহিত হয় খলীফাদের পরামর্শক, উপদেষ্টা হিসেবে এবং কিছুকাল খলীফা সুলায়মানের উযীর হিসেবে।

এরপর তাঁর কাঁধে চেপে বসে বিশাল ইসলামী খিলাফতের মহান দায়িত্ব। যে খিলাফতের সীমা-সরহদ ছিল আটলান্টিকের উপকূল থেকে ভারতবর্ষের সিন্ধু পর্যন্ত। বানূ উমাইয়্যারা

---

৩৬৮. তাহযীবুত তাহযীব-৭/৪১৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১১৪; তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/১১৪-১১৫; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৮

দীর্ঘকাল ধরে ইসলামী খিলাফতের ধ্যান-ধারণা ও রূপরেখার মধ্যে যে বিকৃতি সাধন করেছিল, তিনি দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার প্রথম দিন থেকে তা আবার খিলাফতে রাশেদার আদলে ফিরিয়ে আনার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন। এ কাজ করতে গিয়ে জীবনের সবটুকু সময় এর পিছনে ব্যয় করেন। মৃত্যু পর্যন্ত এমন একটু অবসর পাননি যখন তিনি জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা দানের দিকে মনোযোগ দিতে পারতেন। খিলাফতে রাশেদার প্রথম খলীফা মহান সাহাবী হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) জীবনেও এমনটি ঘটেছিল। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশী হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সঙ্গ ও সাহচর্য লাভ করেছেন। অন্যদের তুলনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে তিনি বেশী জ্ঞান লাভ করেন। মুসলিম উম্মার নিকট সর্বক্ষেত্রে তাঁর যে সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদা, সেই তুলনায় তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীছ নিতান্ত অপ্রতুল। এর কারণ হলো, হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর তিনি খুব অল্প সময় পেয়েছিলেন। আর তাও কেটে যায় ইসলামী খিলাফতের গুরুদায়িত্ব বহনের মধ্য দিয়ে। তেমনিভাবে খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান, খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূর ও আরো অনেকের নাম উল্লেখ করা যায়, যাঁরা ছিলেন বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিত্ব, কিন্তু খিলাফত পরিচালনা ও রাজনীতির জটিল বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে পড়ার কারণে জ্ঞান চর্চার অঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

দ্বিতীয় কারণ হলো অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ। চল্লিশটি বছর জীবনকালও পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আয-যাহাবীর একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :[৩৬৯]

وقد ولى أولا امرة المدينة فى خلافة الوليد وبنى المسجد وزخرفه، وكان إذ ذاك لايذكر بكثير عدل ولازهد ولكن تجدد له لما استخلف وقبله لله فصار يعد فى حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر، وفى الزهد مع الحسن البصرى، وفى العلم مع الزهرى، ولكن موته قرب من موت شيوخه فلم ينشر علمه.

'আল-ওয়ালীদের খিলাফতকালে প্রথম মদীনার ওয়ালী নিযুক্ত হন এবং মদীনার মসজিদ পুনর্নির্মাণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। সে সময় তাঁকে অত্যধিক ন্যায়পরায়ণ ও ভোগবিলাস বিমুখ বলে উল্লেখ করা হতো না। কিন্তু খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আল্লাহ তাঁকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেন এবং তিনি নতুন রূপ ধারণ করেন। অতঃপর উত্তম চরিত্র ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তাঁর নানা 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা), দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ স্বভাবের জন্য হাসান আল-বসরী (রহ) এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে আয-যুহ্রীর (রহ) সাথে তাঁকে তুলনা করা হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যু তাঁর শিক্ষকদের কাছাকাছি সময়ে হওয়ায় তাঁর জ্ঞানের প্রচার-প্রসার তেমন ঘটেনি।'

---

৩৬৯. ইবনুল জাওযী-১৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৯

জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ও লিপিবদ্ধকরণে তাঁর অবদান

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর অর্জিত জ্ঞান মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কোন হালকায়ে দারসে বসেননি, তেমনিভাবে বসেননি কোন ফিকহ ও ইফতার মজলিসে। তবে এক্ষেত্রে তিনি এক বিশাল অবদান রেখে গেছেন। আর তা হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ লিপিবদ্ধকরণ, মানুষকে শিক্ষাদান এবং তাদেরকে সত্য-সঠিক পথে পরিচালনার জন্য খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য 'উলামা-ফকীহকে প্রেরণ।

নিম্নে এক্ষেত্রে তাঁর কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো :

১. বিভিন্ন শহর ও জনপদে জ্ঞানের প্রচার-প্রসার : জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী ও উপযোগী লোকদের নিকট শিক্ষার উপায়-উপকরণ সহজ সাধ্য করে দেওয়া ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অতি চমৎকারভাবে এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন শহরে, এমনকি বিভিন্ন পল্লীতে পাঠান যাতে সেখানে বসবাসকারী মানুষ তাঁদের নিকট থেকে আল্লাহর দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

মদীনার বিখ্যাত ইমাম, মুফতী ও 'আলিম হযরত নাফে'কে তিনি মিসরে পাঠান। এই নাফে' ছিলেন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) আযাদকৃত দাস এবং তাঁর হাদীছের একজন বর্ণনাকারী। এ প্রসঙ্গে 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন :[৩৭০]

بعث عمر بن عبد العزيز نافعا مولى ابن عمر إلى أهل مصر يعلمهم السنن.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয নাফে'– ইবন 'উমারের দাসকে মিসরবাসীদের নিকট পাঠান, যাতে তিনি তাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহসমূহ শিক্ষা দিতে পারেন।'

তিনি তাবি'ঈ ফকীহদের মধ্য থেকে দশজনকে আফ্রিকায় পাঠান। হিজায, শাম ও ইরাকের বিভিন্ন শহর ও জনপদে যেমন অসংখ্য মুহাদ্দিছ ও ফকীহ তাবি'ঈ ইসলামী জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে নিয়োজিত ছিলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয প্রেরিত এই তাবি'ঈগণও আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় জনগণকে ইসলামী জ্ঞান ও আমলে সমৃদ্ধ করে তোলেন। সেই দশজন বিখ্যাত তাবি'ঈ হলেন :

১. আবূ ছুমামা বাকর ইবন সাওয়াদা আল-জুযামী আল-মিসরী। তাঁর সম্পর্কে হাফেজ ইবন হাজার বলেন, 'আফ্রিকাবাসীদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে সেখানে পাঠান। তিনি ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য মুফতী ফকীহ।'[৩৭১]

২. 'আবদুর রহমান ইবন রাফি' আত-তানূখী। ইবন হাজার তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আফ্রিকাবাসীদেরকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দানের জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যে

---

৩৭০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৯৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০০; হুসনুল মুহাদারা-১/১১৯

৩৭১. তাহযীব আত-তাহযীব-১/৪২৪; তাকরীব আত-তাহযীব-১/১০৬

দশজন ফকীহ (ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী) পাঠান, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি আফ্রিকার কাজীর দায়িত্বও পালন করেন।'[৩৭২]

৩. 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-মু'আফিরী। হাফেজ ইবন হাজার বলেন, 'আফ্রিকাবাসীদেরকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দানের জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে সেখানে পাঠান। তিনি সেখানে ব্যাপকভাবে জ্ঞান ছড়িয়ে দেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, সৎ ও জ্ঞানী মানুষ।[৩৭৩]

৪. তালাক ইবন জা'বান : তাঁর সম্পর্কে হাফেজ ইবন মাকূলা বলেন : 'মাগরিব (মরক্কো) বাসীদেরকে ইসলামী জ্ঞান দানের জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যে সকল মিসরীয় ফকীহকে পাঠান, তিনি তাঁদের অন্যতম।'

৫. সা'দ ইবন মাস'উদ আত-তুজায়বী : তিনি কায়রাওয়ানে অবস্থান করে সেখানে ব্যাপকভাবে ইসলামী জ্ঞান ছড়িয়ে দেন।

৬. ইসমা'ঈল ইবন 'উবায়দুল্লাহ আল-আনসারী : তিনি কায়রাওয়ানে অবস্থান করেন। তথাকার এবং আশেপাশের অসংখ্য মানুষ তাঁর দ্বারা ব্যাপক উপকার লাভ করে। তিনি কায়রাওয়ানে বিশাল একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উক্ত মসজিদটি বর্তমানে 'মসজিদ আয-যায়তূনা' নামে পরিচিত। তিনি তাঁর আয়ের এক তৃতীয়াংশ আল্লাহর পথে ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন। এ কারণে জনগণের নিকট থেকে 'তাজিরুল্লাহ' বা আল্লাহর ব্যবসায়ী উপাধি লাভ করেন। হিজরী ১০৭ সনে তিনি সাগরে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। লাশ উত্তোলনের পর দেখা যায় কুরআনের একটি কপি তিনি হাত দিয়ে বুকের সাথে ঠেসে ধরে রেখেছেন।[৩৭৪]

৭. ইসমা'ঈল ইবন 'উবায়দিল্লাহ ইবন আবিল মুহাজির : বানূ মাখযূমের আযাদকৃত দাস। তিনি ছিলেন একজন বড় ইমাম ও আস্থাভাজন 'আলিম। আফ্রিকাবাসীদেরকে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষাদান ও তাদের মধ্যে বিচার কাজ পরিচালনার জন্য 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে সেখানে পাঠান। উত্তম জীবনধারার অধিকারী মানুষ এবং একজন ভালো আমীর ছিলেন। ফিকহ বিষয়ক তাঁর জ্ঞান মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করে। তাঁর সময়ে বারবার উপজাতির অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করে। হিজরী ১৩২ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[৩৭৫]

৮. আবূ সা'ঈদ জু'ছাল ইবন হা'আন আর-রু'আয়নী : হাফেজ ইবন হাজার ইবন ইউনুসের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে মরক্কোবাসীদেরকে কুরআন শিক্ষাদানের জন্য পাঠান। তিনি ছিলেন ফকীহ কারীদের একজন।[৩৭৬]

---

৩৭২. তাহযীব আত-তাহযীব-১/১৫৩; তাকরীব আত-তাহযীব-১/৪৭৮; মীযান আল-ই'তিদাল-২/৫৬০
৩৭৩. তাহযীব আত-তাহযীব-৬/৭৪; তাকরীব আত-তাহযীব-১/৪৬২
৩৭৪. 'আবদুল সাত্তার আশ-শায়খ-৭০
৩৭৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/২১৩; আল-আ'লাম-১/৩১৯
৩৭৬. তাহযীব আত-তাহযীব-২/৬৮; তাকরীব আত-তাহযীব-১/১২৮

৯. হিব্‌বান ইবন আবী জাবালা আল-কুরাশী : মিসরের অধিবাসী। অতঃপর কায়রাওয়ানে বসবাস করেন। তথাকার অধিবাসীরা শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকার লাভ করে।[৩৭৭]

১০. মাওহাব ইবন হায় আল-মু'আফিরী : তিনি কায়রাওয়ানে আবাসন গড়ে তোলেন এবং সেখানে ইসলামী জ্ঞান ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও তিনি ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী বহু ব্যক্তিকে বিভিন্ন পল্লী ও জনপদে পাঠান, যাতে তথাকার অধিবাসীরা তাঁদের নিকট থেকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে। যেমন আবূ 'উবাইদ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম, ইবনুল জাওযী ও আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন :[৩৭৮]

بعث عمر بن عبد العزيز يزيد بن أبى مالك الدمشقي والحارث بن يمجد الأشعرى أن يعلما الناس في البدو، وأجرى عليهما رزقا، فأما يزيد فقبل، وأما الحارث فأبى أن يقبل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك،فكتب عمر : إنا لا نعلم بما صنع يزيد بأسا، وأكثر الله فينا مثل الحارث بن يمجد.

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ইয়াযীদ ইবন আবী মালিক আদ-দিমাশকী ও আল-হারিছ ইবন ইয়ামজুদকে মরু অঞ্চলের বেদুঈনদেরকে সুন্নাহ শিক্ষা দানের জন্য পাঠান এবং তাদের দু'জনের ভাতার ব্যবস্থা করেন। ইয়াযীদ সে ভাতা গ্রহণ করেন, কিন্তু আল-হারিছ তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। একথা লিখে 'উমারকে জানানো হলে তিনি লেখেন : ইয়াযীদ যা করেছেন তাতে কোন দোষ দেখিনা। তবে আল্লাহ আমাদের মধ্যে আল-হারিছের মত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।'

তিনি বিশাল ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত দা'ঈ, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সাথে সব সময় পত্র যোগাযোগ রাখতেন। সেই সকল পত্রে তিনি তাদেরকে ইসলামী ফিকহ, সুন্নাহ ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন, মানুষের সামনে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনাচার তুলে ধরার জন্য তাকিদ দিতেন, শরী'আতের বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ এবং বিরুদ্ধাচারণ থেকে দূরে থাকার কথা বলতেন। আঞ্চলিক আমীর ও ওয়ালীগণকে তিনি পত্রে যে দিক নির্দেশনা দিতেন তা বাস্তবায়ন ও জনসাধারণকে তা মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অত্যন্ত তাকিদ দিতেন। 'উমার নিজে কোন বিষয়ে দ্বিধা-সংশয়ে পড়লে লোক মারফত পত্র পাঠিয়ে মদীনার 'আলিমদের নিকট থেকে তার সমাধান জেনে নিতেন। ইমাম মালিক (রহ) বলেন :[৩৭৯]

---

৩৭৭. তাহযীব আত-তাহযীব-২/১৪৯; তাকরীব আত-তাহযীব-১/১৪৭

৩৭৮. ইবন 'আবদিল হাকাম, সীরাতু 'উমার-১৬৭; ইবনুল জাওযী-৯২; রিজলুল ফিক্‌র ওয়াদ-দা'ওয়া-১/৫২

৩৭৯. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৭১

Contents

كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه، ويكتب المدينة يسألهم عما مضى، وأن يعملوا بما عندهم.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বিভিন্ন শহরে পত্র পাঠিয়ে তথাকার অধিবাসীদেরকে সুন্নাহ ও ফিকাহ শিক্ষা দিতেন। আর মদীনাবাসীদের নিকট তাঁদের অতীত কথা জানতে চাইতেন এবং তাদের নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহর যে জ্ঞান আছে তার উপর আমল করতে বলতেন।'

হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) বলেন, আমাদের নিকট 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কোন পত্র এলেই তাতে তিনটি বিষয় অবশ্যই থাকতো : সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন, অথবা বিদ'আতের নিশ্চিহ্নকরণ অথবা জুলুম-অত্যাচারের প্রতিকার।

তিনি তাঁর বহু পত্রে জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা গোপন রাখার কঠোর সমালোচনা করেছেন। এ বিষয়টি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে আবূ বকর ইবন হাযমকে লেখা তাঁর একটি পত্রে। তাতে তিনি লেখেন :[৩৮০]

ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لايعلم، فإن العلم لايهلك حتى يكون سرا.

'আপনারা 'ইলমের প্রসার ঘটান এবং যারা জানে না তাদেরকে শিক্ষা দানের জন্য বসুন। কারণ, জ্ঞান কেবল গোপন থাকলেই বিলীন হয়।'

জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে তাঁর কর্ম পদ্ধতি

ক. 'আলিমদের জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারণ; এমনকি এমন প্রত্যেকের জন্য বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা যারা জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কুরআনের হাফেজ, কুরআনের শিক্ষক, হাদীছের ছাত্র, শিক্ষক, সংগ্রাহক, ফকীহ, ফিকহর ছাত্র, কুরআন-হাদীছের গবেষক– প্রত্যেকের জন্য 'উমার ভাতার ব্যবস্থা করেন। জীবিকা ও ঘর-সংসার প্রতিপালনের চিন্তা থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখার জন্য বায়তুল মাল থেকে জ্ঞান চর্চার সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। মূলতঃ এ দ্বারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিরা দারুণ উৎসাহিত হন। তারা জ্ঞানের প্রচার-প্রসার এবং দীন ও উম্মাহর সেবায় নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন।

খতীব আল-বাগদাদী ও ইবনুল জাওযী আবূ বকর ইবন আবী মারইয়ামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[৩৮১]

كتب عمر بن عبد العزيز إلى والى حمص 'مر لأهل الصلاح من بيت المال بما يغنيهم، لئلا يشغلهم شيئ من تلاوة القرآن وما حملوا من الأحاديث.'

---

৩৮০. ফাতহুল বারী-১/১৯৪
৩৮১. ইবনুল জাওযী-১২৩; উসূল আল-হাদীছ-১৭৮

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয হিমসের ওয়ালীকে লেখেন : 'আপনি বায়তুল মাল থেকে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে তাদের প্রয়োজন পূরণ হয় এমন পরিমাণ অর্থদানের নির্দেশ দিবেন, যাতে কুরআন তিলাওয়াত এবং যে সকল হাদীছ তাঁরা বহন করছে, তার আলোচনা থেকে কোন কিছু তাঁদেরকে বিরত রাখতে না পারে।'

ইবনুল জাওযী ইবন আবী মারইয়াম থেকে আরো বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয হিমসের ওয়ালীকে লেখেন :[৩৮২]

انظروا إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه، وحبسوها فى المسجد عن طلب الدنيا، فأعط كل رجل منهم مائة دينار، يستعينون بها على ماهم عليه، من بيت مال المسلمين، حين ياتيك كتابى هذا، وإن خير الخير أعجله. والسلام عليك.

'যে লোকগুলো ফিকাহ্ বিষয়ে গবেষণার জন্য নিজেদেরকে নিবদ্ধ করেছে এবং দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়া থেকে মুক্ত থেকে মসজিদে আবদ্ধ করেছে, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিন। আমার এ পত্র আপনার নিকট পৌঁছার পর মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে তাদের প্রত্যেককে এক শ' দীনার করে দিন। এ দ্বারা তারা তাদের প্রয়োজন পূরণ করবে। ভালোর ভালো হলো তাড়াতাড়ি করা। ওয়াস সালামু 'আলাইকুম!'

এমনকি যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধ-বিগ্রহ, সাহাবীদের পরিচিতি-বৈশিষ্ট্য, ইসলামের প্রথম দিকের ঘটনাবলী গল্পাকারে বর্ণনা করতো এবং মানুষের মধ্যে যারা ওয়াজ-নসীহত করতো তাদের সকলের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। 'আসিম ইবন 'উমার ইবন কাতাদা ছিলেন সে যুগের একজন বড় 'আলিম। সীরাত ও মাগাযীতে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। হাদীছ বর্ণনায় তিনি বিশ্বস্ত এবং বহু হাদীছের বর্ণনাকারী। ইবন সা'দ বলেন, এই 'আসিম 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে বড় রকমের একটা ঋণে জড়িয়ে পড়েন এবং তা পরিশোধ করা তাঁর জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সে ঋণ 'উমার পরিশোধ করেন এবং বায়তুল মাল থেকে তাঁকে ভাতা দানের নির্দেশ দেন। আর 'আসিমকে নির্দেশ দেন তিনি যেন দিমাশ্কের জামি' মসজিদে বসে রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সাহাবীদের জীবনকথা মানুষকে শোনান। তিনি 'আসিমকে এই ভাষায় নির্দেশ দেন :[৩৮৩]

إن بني مروان كانوا يكرهون هذا وينهون عنه، فاجلس فحدث الناس بذلك. ففعل.

'বানূ মারওয়ান এ কাজ অপছন্দ করতো এবং এ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখতো। আপনি বসুন এবং মানুষের নিকট বর্ণনা করুন।' অতঃপর তিনি তা পালন করেন।

---

৩৮২. প্রাগুক্ত

৩৮৩. তাবাকাত-৫/৩৪৯; তাহযীব আত-তাহযীব-৫/৪৭

ইবন শাব্বাহ্ বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মদীনায় বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী গল্পাকারে মানুষকে শোনানোর নির্দেশ দেন এবং তার জন্য মাসিক দু' দীনার ভাতা নির্ধারণ করেন। পরে হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক এ ভাতা কমিয়ে বাৎসরিক ছয় দীনার করেন।[৩৮৪]

শিক্ষার্থীরা যাতে রুজি-রিযিক ও অর্থ সঙ্কটের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে পড়াশোনা করতে পারে সে জন্য তাদের ভাতার ব্যবস্থা করেন।

ইবন 'আবদিল বার ইয়াহইয়া ইবন আবী কাছীরের সূত্রে উল্লেখ করেছেন :[৩৮৫]

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله! أن أجْروا على طلبة العلم الرزق، وفرغوهم للطلب.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর কর্মকর্তাদেরকে লেখেন : শিক্ষার্থীদের জীবিকার ব্যবস্থা করে তাদেরকে জ্ঞান অন্বেষণে একাগ্র হওয়ার সুযোগ করে দাও।'

খ. তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের জন্য ভীষণ উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁদেরকে দেশের সকল মসজিদকে জনগণের ধর্মীয় শিক্ষা দানের কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দান, হাদীছ লেখা এবং সুন্নাহর পুনরুজ্জীবনের নির্দেশ দেন। ইয়ামনের অধিবাসী 'আকরামা ইবন 'আম্মার বলেন, আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এই পত্রটি পাঠ করতে শুনেছি :[৩৮৬]

أما بعد! فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم فى مساجدهم فإن السنة قد أميتت.

'অতঃপর এই যে, জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে তাদের নিজ নিজ মসজিদসমূহে জ্ঞান প্রচারের নির্দেশ দাও। কারণ, সুন্নাহর মৃত্যু হয়েছে।'

ইবন 'আবদিল বার জা'ফার ইবন বুরকান আর-রাকী থেকে বর্ণনা করেছেন। এই রাকী ছিলেন সিরিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসী। তিনি বলেন :[৩৮৭]

كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : أما بعد! فَمُرْ أهل الفقه والعلم من عندك فلينشروا ماعلمهم فىمجالسهم ومساجدهم. والسلام.

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আমাদেরকে লেখেন : অতঃপর এই যে, ফিকাহ্ শাস্ত্রের অধিকারী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে তাঁরা যা জানে তা তাঁদের নিজ নিজ বৈঠক ও মসজিদসমূহে প্রচারের নির্দেশ দাও। ওয়াস সালাম।'

তিনি সকল শ্রেণীর মানুষকে জ্ঞানার্জন, জ্ঞান চর্চার বৈঠকসমূহে বসা এবং মুহাদ্দিছ,

---

৩৮৪. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৭৩
৩৮৫. জামি'উ বায়ান আল-'ইলম-১/২২৮
৩৮৬. ইবনুল জাওযী-১১৩; উসূল আল-হাদীছ-১৭৮
৩৮৭. জামি'উ বায়ান আল-'ইলম-১/১৪৯

ফকীহ্ ও ওয়াজ-নসীহতকারীদের মুখ থেকে দীনের কথা শোনার জন্য উৎসাহিত করেন। যেমন, তিনি প্রায়ই বলতেন :[৩৮৮]

إن استطعت فكن عالـما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فـإن لم تستطع فلا تبغضهم، ثم قال : لقد جعل الله له مخرجًا إن قبل.

'সম্ভব হলে 'আলিম হও, তা না হলে শিক্ষার্থী হও। তা সম্ভব না হলে তাদেরকে ভালোবাস। তাও সম্ভব না হলে, অন্ততঃ তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না। তারপর বলেন : আল্লাহ চাইলে তাতেই তার মুক্তির পথ করে দিতে পারেন।'

হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণ এবং এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা

ইসলামের প্রাথমিক পর্বে হযরত রাসূলে কারীম (সা) কেবল কুরআন ছাড়া আর কোন কিছু লেখার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, অন্য যা কিছু লেখা হবে তা হয়তো কালক্রমে কুরআনের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে এবং মানুষ তা কুরআন মনে করে চর্চা শুরু করে দেবে। পরবর্তীকালে রাসূল (সা) এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন এবং কুরআনের সাথে সাথে হাদীছও লেখার অনুমতি দান করেন। খতীব আল-বাগদাদী বলেন : কিতাবুল্লাহর সাথে যাতে অন্য কোন কিছু মিলেমিশে না যায় অথবা মানুষ কুরআন ছেড়ে অন্য কোন কিছু নিয়ে মাতামাতি শুরু করে না দেয়, এ কারণে ইসলামের প্রথম পর্বে হাদীছ লেখা অপছন্দনীয় কাজ মনে করা হয়েছে। তাছাড়া সে সময় ইসলামের তত্ত্বজ্ঞানী লোকের সংখ্যা ছিল অনেক কম। পল্লী এলাকার যে সকল বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করেছিল, দীন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল খুবই অপ্রতুল। তারা ওহী এবং ওহী বহির্ভূত বাণীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম ছিল না। লিখিত কোন কিছু দেখলেই তারা কুরআন মনে করে ভুল করতে পারতো। এ কারণে তখন হাদীছ লেখালেখির জন্য অনুমতি বা উৎসাহ দেওয়া হয়নি।

'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের চিন্তা করেন। দীর্ঘ ভাবনা-চিন্তার পর এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র (রা) বর্ণনা করেছেন :[৩৮৯]

أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أراد أن يكتب السنن، فاستفتى أصحـاب النبـى صلى الله عليه وسلم فى ذلك، فأشاروا عليـه أن يكتبـها، فطفـق عمـر يسـتخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يومًا وقد عزم الله لـه، فقـال : إنـى أريـد أن اكتـب السـنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإنــي والله لاأشوب كتاب الله بشئ أبدا.

---

৩৮৮. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৭৪

৩৮৯. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৭৪-৭৫

"'উমার ইবন আল-খাত্তাব সুন্নাহ লিপিবদ্ধকরণের ইচ্ছা করেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মতামত তলব করেন। তাঁরা লেখার প্রতি ইঙ্গিত করেন। অতঃপর 'উমার (রা) এক মাস যাবত এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট ইসতিখারা (সঠিক ও কল্যাণকর কোনটি তা জানার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা) করতে থাকেন। আল্লাহ তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক দান করেন। তিনি বলেন : আমি ইচ্ছা করেছিলাম সুন্নাহ লিপিবদ্ধকরণের। সাথে একথাও স্মরণ করলাম, তোমাদের পূর্ববর্তী সেই সম্প্রদায়ের কথা যারা গ্রন্থ রচনা করেছিল এবং আল্লাহর কিতাব ছেড়ে তাই নিয়ে মেতে উঠেছিল। আল্লাহর কসম! আমি কখনো আল্লাহর কিতাবের সাথে কোন কিছু সংমিশ্রণ ঘটাবো না।'

যখন উপরোক্ত আশঙ্কা দূর হয়ে যায় এবং সুন্নাহ লেখার প্রয়োজনও দেখা দেয়, তখন আর লেখালেখি খারাপ মনে করা হতো না। একথা প্রমাণিত যে, বহু সাহাবী হাদীছ লিপিবদ্ধ করা দোষণীয় মনে করেননি, তাঁরা নিজেদের জন্য কিছু কিছু হাদীছ লিখে রেখেছেন, তাঁদের ছাত্র-শিষ্যরা তাঁদের সামনে হাদীছ লিখেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা হাদীছ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও লেখার জন্য উপদেশ দিতেন। ইবনুস সালাহ বলেন :

ثم إنه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الأخرة.

'অতঃপর এই মতবিরোধ দূর হয়ে যায় এবং মুসলমানরা হাদীছ লেখার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছে। যদি তা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা না হতো তাহলে পরবর্তীকালে তা বিলীন হয়ে যেত।'

একথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) সর্বপ্রথম সরকারীভাবে হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের ফরমান জারি করেন। তবে একথা সত্য যে, তাঁর পিতা 'আবদুল 'আযীয ইবন মারওয়ান মিসরের ওয়ালী থাকাকালে হাদীছ লিপিবদ্ধকরণের প্রয়োজন অনুভব করেন। এ ব্যাপারে তাঁর লেখা একটি পত্র ইবন সা'দ লাইছ ইবন সা'দের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন :

حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد العزيز بن مروان كتب إلىكثير بن مرّة الحضرمي ـ وكان قد أدرك بحمص سبعين بَدْرِيًّا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قال ليث : وكان يسمى الجند المقدم، قال : فكتب إليه أن يكتب إليه بما سمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديثهم، إلا حديث أبي هريرة فإنه عندنا.

'ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব আমাকে বলেছেন, 'আবদুল 'আযীয ইবন মারওয়ান কুছায়্যির ইবন মুররা আল-হাদরামীকে লেখেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের নিকট থেকে যে সকল হাদীছ শুনেছেন তা যেন তাঁকে লিখে পাঠান। তবে আবূ হুরায়রার (রা)

হাদীছ পাঠানোর প্রয়োজন নেই। কারণ, তা আমাদের নিকট আছে। উল্লেখ্য যে, এই কুছায়্যির ইবন মুররা হিমসে রাসূলুল্লাহর (সা) সত্তরজন বদরী সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। লাইছ বলেন, তাঁকে 'অগ্রবর্তী সৈনিক' নামে আখ্যায়িত করা হতো।'

হিমসের এই 'আলিমের নিকট মিসরের আমীরের এ পত্রটি লেখা হয় সম্ভবতঃ হিজরী ৭৫ সনে বা তার কাছাকাছি সময়ে। কারণ, কুছায়্যির হিজরী ৭৫ থেকে ৮০ সনের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে ইনতিকাল করেন।[৩৯০]

তবে 'আবদুল 'আযীযের পরে তাঁর সুযোগ্য পুত্র আমীরুল মু'মিনীন 'উমার হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের সত্যিকার ফলপ্রসু উদ্যোগ ও ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি সর্বত্র ও সর্বদা একথাটি উচ্চারণ করতে থাকেন :[৩৯১]

أيها الناس! قيدوا النعم بالشكر، وقيدوا العلم بالكتاب.

'ওহে জনগণ! দান-অনুগ্রহকে কৃতজ্ঞতা দ্বারা এবং জ্ঞানকে গ্রন্থের দ্বারা বন্দী কর।'

তিনি মানুষকে শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলের 'আলিমদেরকে হাদীছ সংগ্রহ ও লেখার নির্দেশ দেন। কারণ, বহু তাবি'ঈ যাঁরা তাঁদের বক্ষে রাসূলুল্লাহর (সা) বহু বাণী ধারণ করে রেখেছিলেন, 'উমার আশঙ্কা করেছিলেন, সাহাবীগণের যুগ শেষ হতে চলেছে, আর তাবি'ঈদের এই প্রজন্মটি দুনিয়া থেকে চলে গেলে এই হাদীছও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে। তাছাড়া স্মৃতিতে ধারণ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গও সবসময় পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে গ্রন্থে লিখিত না থাকায় প্রয়োজনের সময় হাদীছ দ্বারা উপকারও পাওয়া যায় না। এ সকল কারণের পাশাপাশি আরো একটি বড় বিপদ তখন দেখা দেয়– আর তা হলো, বিভিন্ন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর উদ্ভবের ফলে জাল ও মিথ্যা হাদীছ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে কোনটি বিশুদ্ধ হাদীছ, আর কোনটি জাল হাদীছ তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। কালক্রমে এ বিপদ আরো বৃদ্ধি পাবে, এ আশঙ্কায় 'উমারের মত আরো অনেক 'আলিম, তাবি'ঈ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। যেমন, ইমাম যুহরীর একটি মন্তব্যে একথার সমর্থন পাওয়া যায় :

لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لانعرفها، ماكتبت حديثا، ولا أذنت في كتابه.

'পূর্বদিক থেকে যদি এমন সব হাদীছ আমাদের নিকট না আসতো যা আমরা জানি না, চিনি না, তাহলে আমি হাদীছ লিখতাম না এবং লেখার অনুমতিও দিতাম না।'

এরই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্ণধার আমীরুল মু'মিনীন 'উমার উপলব্ধি করলেন, হাদীছ সংরক্ষণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।[৩৯২] যেমন :

---

৩৯০. তাবাকাত-৭/৪৪৮; উসূল আল-হাদীছ-১৭৬, ২১৮-২১৯

৩৯১. ইবনুল জাওযী-২৭৬

৩৯২. উসূল আল-হাদীছ-১৭৬-১৭৭, ১৮৬

১. মদীনার আমীর, বিখ্যাত ইমাম ও সমকালীনদের মধ্যে বিচার কাজে সর্বাধিক দক্ষ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি আবূ বকর ইবন হাযমকে তিনি স্বীয় চিন্তা ও শঙ্কার কথা লিখে জানান। সহীহ বুখারীতে এসেছে :[৩৯৩]

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حَزْم : انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًّا.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আবূ বকর ইবন হাযমকে লেখেন : রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছের প্রতি দৃষ্টি দিন। আমি 'ইল্মের বিলুপ্তি ও 'আলিমদের তিরোধানের ভয় করছি। তবে কেবল নবীর (সা) হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। 'ইল্মের প্রসার ঘটান এবং শিক্ষাদানের জন্য বসুন, যাতে যে জানে না, সে জানতে পারে। কারণ, 'ইল্ম যতক্ষণ গোপন না হয়ে পড়ে, বিলীন হয় না।'

দারেমী 'আবদুল্লাহ ইবন দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[৩৯৪]

كتبَ عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : اكتب إليّ بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحديث عمر، فإني قد خشيت درس العلم وذهابه.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আবূ বকর ইবন হাযমকে লেখেন : আপনার নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) যে সকল হাদীছ প্রমাণিত, তা এবং 'উমারের হাদীছ আমাকে লিখে পাঠান। কারণ, আমি 'ইল্মের বিলুপ্তি ও হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।'

ইবন সা'দের তাবাকাতে উপরোক্ত বর্ণনাটি এসেছে। তবে তাতে 'উমার এর স্থলে আমরা বিন্ত 'আবদির রহমানের হাদীছের কথা আছে।[৩৯৫]

২. তিনি সে যুগের বিখ্যাত হাদীছ বিশারদ ইবন শিহাব আয-যুহরীকেও এ ব্যাপারে পত্র লেখেন। তিনি বলেন :

أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن، فكتبناها دفترًا دفترًا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترًا.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আমাদেরকে সুনান সংগ্রহের নির্দেশ দেন। আমরা তা

৩৯৩. ফাতহুল বারী-১/১৯৪-১৯৫
৩৯৪. সুনান আদ-দারিমী-১/১৩৭
৩৯৫. তাবাকাত-২/৩৮৭; উসূল আল-হাদীছ-১৭৬-১৭৭

ভিন্ন ভিন্ন খাতায় লিপিবদ্ধ করি। অতঃপর তিনি তাঁর কর্তৃত্বাধীন খিলাফতের প্রতিটি অঞ্চলে একটি করে খাতা পাঠান।'

তিনি যাকাত বণ্টনের আটটি খাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) যে সকল হাদীছ আছে তা লিখে পাঠানোর জন্য ইমাম যুহ্‌রীকে অনুরোধ করে চিঠি লেখেন। ইমাম যুহ্‌রী তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে তা বিস্তারিতভাবে লিখে পাঠান।[৩৯৬]

এরই প্রেক্ষিতে হাফেজ ইবন হাজার বলেন :

وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهرى على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير، فللّه الحمد.

'হিজরী প্রথম শতকের মাথায় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নির্দেশে ইবন শিহাব আয-যুহ্‌রী সর্বপ্রথম হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন। তারপর ব্যাপকভাবে লেখালেখি হয়। তারপর শুরু হয় গ্রন্থাবদ্ধকরণ। এতে বহু কল্যাণ অর্জিত হয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর।'

৩. 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খিলাফতের সকল শহর ও জনপদে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের নির্দেশ সম্বলিত ফরমান পাঠান। এ বিষয়ে যাদের জ্ঞান আছে, তা দু'একটি হাদীছই হোক না কেন, তাদের সকলকে এ কাজে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন দীনার বলেন :[৩৯৭]

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة : أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মদীনাবাসীদেরকে লেখেন : আপনারা রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছের প্রতি দৃষ্টি দিন এবং লিপিবদ্ধ করুন। কারণ, আমি জ্ঞানের বিলুপ্তি ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের তিরোধানের ভয় করছি।'

আবূ নু'আইম "তারীখু ইসবাহান" গ্রন্থে বলেছেন :[৩৯৮]

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق : انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه واحفظوه، فإني أخاف دروس العلم وذهاب العلماء.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খিলাফতের দূরবর্তী অঞ্চলে লিখে পাঠান : আপনারা রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ দেখুন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করুন। আমি জ্ঞানের বিলুপ্তি ও 'আলিমদের তিরোধানের ভয় করি।'

---

৩৯৬. আল-আমওয়াল-২৩১-২৩২
৩৯৭. সুনান আদ-দারিমী-১/১৩৭
৩৯৮. ফাতহুল বারী-১/১৯৭, উসূল আল-হাদীছ-১৭৮

৪. যেহেতু কিতাবুল্লাহ আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ ভাণ্ডার আরবী ভাষায় এবং তা বুঝার জন্য আরবী ভাষায় পারদর্শিতা একান্ত প্রয়োজন, তাই তিনি আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেন। বিজিত অনারব অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে আরবী ভাষা শেখার জন্য নানাভাবে উৎসাহ দেন। এ ভাষার শিক্ষার্থীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন।[৩৯৯]

লিপিবদ্ধকরণে তাঁর রীতি-পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে 'উমার একটি সঠিক ও শক্তিশালী পদ্ধতি অনুসরণ করেন, অনেকগুলো কঠিন শর্ত মেনে চলেন এবং কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেন। মোটামুটি চারটি বিষয়ে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে :

ক. এ কাজের জন্য ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ও সাফল্য :

যেমন তিনি এ কাজের জন্য আবূ বকর ইবন হাযমকে নির্বাচন করেন। তিনি ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি। জ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম মালিক বলেছেন :

مارأيت مثل ابن حزم أعظم مروءة ولا أتم حالا، ولا رأيت من أوتى مثل ما أوتـــى : ولايـــة الـــمدينة، والقضـــاء، والـــموسم، وقـــال : كـــان رجـــل صـــدق، كثير الحديث.

'আমি ইবন হাযমের মত বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও পরিপূর্ণ অবস্থার আর কাউকে দেখিনি। তিনি যা লাভ করেছেন অন্য কেউ তা লাভ করেছে, এমন কাউকে আমি দেখিনি। যেমন, মদীনার শাসন কর্তৃত্ব, বিচারকের ও হজ্জ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। তিনি আরো বলেন : 'তিনি একজন সত্য-সঠিক মানুষ, বহু হাদীছের ধারক-বাহক।' ইবন সা'দ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : كان ثقة عالما، كثير الحديث

'তিনি একজন বিশ্বস্ত 'আলিম, বহু হাদীছের ধারক-বাহক'। হিজরী ১২০ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[৪০০]

তাঁর নির্বাচিত আরেকজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন ইমাম যুহ্‌রী। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী, হাদীছের হাফেজ। তাঁর খ্যাতি আকাশচুম্বি। লাইছ ইবন সা'দ তাঁর সম্পর্কে বলেন : আমি ইবন শিহাবের চেয়ে হাদীছে অধিক পারদর্শী কোন ব্যক্তিকে দেখিনি। তিনি উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভীতি প্রদর্শনমূলক হাদীছ বর্ণনা করলে আমরা বলতাম, এর চেয়ে সুন্দর আর হয় না। যদি আরবদের ইতিহাস ও বংশ বিদ্যা বিষয়ে বর্ণনা করতেন, বলতাম, এর চেয়ে ভালো আর হয় না। আর কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে বর্ণনা করলে

---

৩৯৯. আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৭৯

৪০০. তাহযীব আত-তাহযীব-৯/৩৯৫; তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/১০৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/৩৪০

বলতাম, সঠিক কথাই বলেছেন।'[৪০১] 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : 'তোমরা ইবন শিহাব থেকে গ্রহণ করবে। কারণ, অতীত সুন্নাহ বিষয়ে তাঁর চেয়ে বেশী জানে এমন কেউ আর নেই।'

ইমাম মাকহূলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি যাঁদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জানে কে? বললেন : ইবন শিহাব। আবার জিজ্ঞেস করা হয়, তারপর কে? বলেন : ইবন শিহাব। তাঁর মুখস্থ শক্তি ছিল অসাধারণ। মাত্র আশি রাতে কুরআন মুখস্থ করেন।[৪০২]

খ. তিনি সাধারণভাবে হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি অত্যধিক গুরুত্বের কারণে কিছু ব্যক্তিবিশেষের হাদীছ লিপিবদ্ধ করার জন্য বিশেষ তাকিদ দেন। যেমন তিনি আবূ বকর ইবন হাযমকে 'আমরা বিন্‌ত 'আবদির রহমান বর্ণিত হাদীছ লেখার নির্দেশ দেন। কারণ, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) সাথে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই তিনি ছিলেন 'আয়িশার (রা) হাদীছে বিশেষ পারদর্শী। আর 'আয়িশা (রা) সবার চেয়ে বেশী জানতেন রাসূলে কারীমের গৃহ অভ্যন্তরের জীবন সম্পর্কে।

এই 'আমরা ছিলেন মদীনার নাজ্জার গোত্রের এক আনসারী মহিলা। হযরত 'আয়িশার (রা) তত্ত্বাবধানে তিনি বড় হন। তাঁর বিশেষ ছাত্রী। তাঁর মহান দাদা সা'দ ইবন যুরারা (রা) একজন উঁচু স্তরের সাহাবী। মহান সাহাবী আস'আদ ইবন যুরারা (রা) তাঁর ভাই। ইবনুল মাদীনী বলেন, 'আয়িশার (রা) তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা বিশ্বস্ত বিদূষী মহিলাদের একজন 'আমরা। ইমাম যুহ্‌রী বলেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি জ্ঞানের এমন সাগর যা কখনো শুকাবে না। হিজরী ৯৮ মতান্তরে ১০৬ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) হাদীছ সংগ্রহ ও লেখার ব্যাপারেও তিনি আবূ বকর ইবন হাযমকে নির্দেশ দেন। কারণ, তিনি 'উমার আল-খাত্তাবের বিচার-ফয়সালা, যাকাত বন্টনের নিয়ম-নীতি এবং বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নিকট পাঠানো তার ফরমানের অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। এমনিভাবে সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (রা)-কেও অনুরোধ করেন তাঁদের মহান ঊর্ধ্বতন পুরুষ 'উমারের (রা) জীবনচিত্র লিখে পাঠানোর জন্য। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করা। তেমনিভাবে তিনি 'উমার ইবন হাযমকে লেখেন যাকাত-সাদাকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) লিখিত পত্রাদির অনুলিপি পাঠানোর জন্য, যাতে তিনি তা বাস্তবায়ন করতে পারেন।

গ. যাঁরা হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করবেন, 'উমার তাঁদেরকে সাহীহ ও গায়র সাহীহ হাদীছের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন। যাতে কোনভাবে জাল হাদীছ

---

৪০১. প্রাগুক্ত; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৩২৬

৪০২. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৮০

বিশুদ্ধ হাদীছ হিসেবে লিখিত না হয়। একথা তিনি 'আমর ইবন হাযমকে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যা আদ-দারিমী বর্ণনা করেছেন। এমনি আরেকটি চিঠি ইমাম আহমাদ "আল-'ইলাল" গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

পরবর্তীকালে একটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর হাদীছ লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর এই দিক নির্দেশনা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ঘ. হাদীছের বিশুদ্ধতা ও হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা

'উমার নিজেও ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের একজন। যাঁদেরকে তিনি হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের নির্দেশ দেন তাঁদের চেয়ে তিনি কোন অংশে কম ছিলেন না। এ কারণে অতিরিক্ত যাচাই-বাছাই-এর উদ্দেশ্যে 'আলিমদের সংগৃহীত হাদীছের ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন। যেমন আবুয যিনাদ আবদুল্লাহ ইবন যাকওয়ান বলেন : 'আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে ফকীহগণের সাথে সমাবেশ করতে দেখেছি। সেই সমাবেশে তাঁরা বহু হাদীছ উপস্থাপন করেন। যখন এমন কোন হাদীছ উপস্থাপন করা হতো যার উপর বর্তমানে আমল নেই, তিনি বলতেন : এটা অতিরিক্ত, এর উপর এখন আর আমল নেই।[৪০৩]

এই লিপিবদ্ধকরণের ফলাফল

প্রাথমিক পর্বের এই প্রচেষ্টা বিশাল কল্যাণ বয়ে আনে। ইমাম আয-যুহ্রী যে খাতাগুলো তৈরি করেছিলেন, 'উমার তার অনেকগুলো কপি করার নির্দেশ দেন এবং খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে তার একটি করে কপি পাঠিয়ে দেন। এটাও লক্ষ্যণীয় যে, বহু 'আলিম নিজের শোনা হাদীছগুলো লিখে রাখেন। যাতে প্রয়োজন মত তা বার বার দেখে নেওয়া যায়। তবে সরকারীভাবে যে লেখালেখি হয় এবং খিলাফতের সর্বত্র যার ফলাফল ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তার সবটুকু কৃতিত্ব 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) পরামর্শে খলীফাতু রাসূলিল্লাহ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বিভিন্ন জনের নিকট ছড়িয়ে থাকা কুরআন একত্র করেন। এই কুরআন সংগ্রহ ও একত্রকরণে তাঁরা উভয়ে মুসলিম উম্মার অশেষ কল্যাণ সাধন করে। তারপর তৃতীয় খলীফা হযরত 'উছমান (রা) কুরআন সংরক্ষণের অসমাপ্ত কাজটুকু সমাপ্ত করে যান। তিনি কুরায়শদের উচ্চারণে একটি মাসহাফে কুরআন লিপিবদ্ধ করে অবশিষ্ট কাজ পরিণতিতে পৌঁছে দেন। আল-কুরআনের পরে ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস আল-হাদীছ। এই হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার সরকারী ফরমান জারি করে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর পূর্বসূরী খুলাফায়ে রাশেদীনের মত আরেকটি অক্ষয় অবদান রেখে যান। এই মহৎ কাজের প্রতিদান তিনি কিয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকবেন। সংগ্রহ ও লেখার সরকারী উদ্যোগ যদি তিনি সেদিন না নিতেন তাহলে হয়তো বহু হাদীছ তাঁর সময়ে না হলেও পরবর্তীকালে হারিয়ে যেত।

---

৪০৩. উসূল আল-হাদীছ-১৭৯

তাছাড়া পরবর্তীকালে মুসলিম উম্মাহ তাদের নবীর (সা) হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপারে যে সীমাহীন গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং ব্যাপকভাবে মনোযোগী হয়েছে, তার পশ্চাতেও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এই প্রচেষ্টা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর তিরিশ মাসের শাসনকালে যে মহৎ কাজগুলো সম্পাদিত হয়েছে, হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের এই সরকারী নির্দেশই সবচেয়ে বড় কাজ বলে মুসলিম উম্মাহর নিকট চিরকাল স্বীকৃত হয়ে থাকবে।

তাঁর বর্ণিত হাদীছের কিছু নমুনা

হাদীছের গ্রন্থাবলী 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের বহু হাদীছ বর্ণনা করেছে। সেখান থেকে বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকটি হাদীছ এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যাতে পাঠকবর্গ এক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা ও স্থান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারেন।

١. عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ وابن المسيّب عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت ـ والإمام يخطب ـ فقد لغوت.[৪০৪]

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয 'আবদুল্লাহ ইবন ইবরাহীম ও সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব থেকে এবং তাঁরা আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি : জুম'আর দিন ইমাম যখন খুতবা দিতে থাকবে তখন যদি তুমি তোমার সঙ্গীকে বল : চুপ কর, তাহলে তুমি ভুল করলে।'

٢. عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة قال : سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : في "إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ".[৪০৫]

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আবূ বকর ইবন 'আবদির রহমান ইবন আল-হারিছ ইবন হিশাম থেকে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে- إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পাঠের পর সিজদা করেছি।'

٣. عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سَبْرَةَ الْجَهْنِي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الْمُتْعَةِ، وقال : ألا أنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه. (الحديث رواه بهذا اللفظ مسلم والبيهقي.)

---

৪০৪. ইবনুল জাওযী-২৩; হাদীছটি মুসলিম ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।
৪০৫. ইবনুল জাওযী-২৬; বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয রাবী' ইবন সাবরা আল-জাহ্নী থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) "মুত'আ" বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : শুনে রাখ, তোমাদের এই আজকের দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এই বিয়ে হারাম ঘোষণা করা হলো। আর কেউ কাউকে কিছু দিয়ে থাকলে তা ফেরত নিবে না।'

٤. عن ابن الهاد أن زياد بن أبي زياد ـ مولى ابن عياش ـ حدثه عن عِراك بن مالك سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة رض أنــها قـالت : جـاءتني مسـكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتُها ثلاث تمرات، فأعطتْ كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستَطْعَمَتْها ابنتاهـا، فشـقت التمـرة التـي كـانت تريـد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذى صنعت لرسـول الله صلـى الله عليـه وسلم، فقال : إن الله قد أوجب لها بها بالجنة، أو أعتقها مـن النـار. (رواه مسـلم في صحيحه ٢٠٢٧/٤، وأحمد في مسندة)

'ইবনুল হাদ থেকে বর্ণিত। যিয়াদ ইবন আবী যিয়াদ– ইবন আয়্যাশের আযাদকৃত দাস– 'ইরাক ইবন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে বলতে শুনেছি যে, আয়িশা (রা) বলেছেন : একবার এক হত দরিদ্র মহিলা তার দু'টি কন্যা সন্তান নিয়ে আমার নিকট আসলো। আমি তাকে তিনটি খোরমা দিলাম। সে দু'টি খোরমা তার দুই কন্যার হাতে দিল এবং অন্যটি নিজে খাওয়ার জন্য মুখে দিতে উদ্যত হলো। এমন সময় কন্যা দু'টি সেটি নেওয়ার জন্য হাত পাতলো। সে নিজের খোরমাটি দু'ভাগ করে দু'কন্যার হাতে তুলে দিল। আমি তার কাণ্ড দেখে বিস্মিত হলাম। রাসূল (সা) ঘরে আসলে আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন : আল্লাহ তার এই কাজের বিনিময়ে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অথবা তিনি একথা বলেন যে, আল্লাহ তার এই কাজের বিনিময়ে তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।'

٥. عن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الدرداء قال : سمعت رسـول الله صلـى الله عليه وسلم يقول : إذَا خَشِيَ أَحَدَكُمْ نِسْيَانَ القرآنِ فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِـتَرْكِ الْمَعَاصِيْ أَبَدًا أَبْقَيْتَنِيْ، وَارْحَمْنِيْ بِـتَرْكِ مَـالاَ يَعْنِيْنِـيْ، وَارْزُقْنِـيْ حُسْـنَ النَّظْـرِ فِيْمَـا يُرْضِيْكَ عَنِّي، وَأَلْزَمْ قَلْبِي حِفْظَ كِتَـابِكَ كَمَـا عَلَّمْتَنِـيْ، وَنَـوِّرْ بِـه قَلْبِـيْ، وَاشْـرَحْ بِـه صَدْرِىْ، وَاجْعَلْنِيْ أَتْلُوْهُ كَمَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ، وَافْتَحْ به قَلْبِيْ، وَأَطْلِقْ به لِسانِيْ.[৪০৬]

---

৪০৬. ইবনুল জাওযী-৩০-৩১

Contents

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আবুদ দারদা' (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যখন কুরআন ভুলে যাওয়ার ভয় করে তখন সে যেন বলে : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যতদিন জীবিত রাখ, চিরদিনের জন্য পাপ কাজ পরিহারের ব্যাপারে আমার প্রতি দয়া কর, বেহুদা কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। আমার যে কাজ তোমাকে সন্তুষ্ট করে সে কাজ সুদৃষ্টিতে দেখার ক্ষমতা দাও। তুমি যেভাবে তোমার কিতাব শিখিয়েছো আমার অন্তরকে সেভাবে ধারণ করার তাওফীক দাও। তার দ্বারা আমার অন্তরকে আলোকিত কর, আমার বক্ষকে প্রশস্ত কর। তুমি সন্তুষ্ট হও তেমনভাবে তা পাঠ করার ক্ষমতা দাও। তার দ্বারা আমার অন্তর উন্মুক্ত করে দাও এবং তার দ্বারা আমার জিহ্বাকে সাবলীল করে দাও।'

তাঁর ফিক্‌হ ও ফাতওয়া বিষয়ক জ্ঞানের কিছু দৃষ্টান্ত

'উমার ছিলেন একজন মহান তাবি'ঈ। তাঁর গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্ম অনুধাবন ক্ষমতা ইসলামী শরী'আতের প্রাণসত্তা বুঝতে, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। শরী'আতের বিধিবিধানের বিভিন্ন কারণ ও গূঢ় রহস্য সম্পর্কে যে কত গভীর জ্ঞান রাখতেন তা বুঝা যায় তাঁর জীবন-ইতিহাস, কর্ম-পদ্ধতি ও আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নিকট তাঁর পত্রাদি পর্যালোচনা দ্বারা। যেমন ইমাম আদ-দারিমী ইমাম আল-আওযা'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

كتب عمر بن عبد العزيز أنه لا رأى لأحد فى كتاب الله، وإنما رأى الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى لأحد فى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.[৪০৭]

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একটি পত্রে লেখেন, আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে কারো কোন মতামত দেওয়ার অধিকার নেই। ইমামদের মতামত কেবল সেই সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবে নাযিলকৃত কিছু নেই এবং নেই কোন দিক-নির্দেশনা রাসূলুল্লাহর সুন্নাতেও। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবর্তিত সুন্নাতের ব্যাপারেও কারো মতামত দানের অধিকার নেই।'

তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বোধ ও বুদ্ধিমত্তার মানুষ ছিলেন। ইসলামী বিধিবিধানের বিভিন্ন শাখায় ছিল গভীর অন্তর্দৃষ্টি। বুদ্ধি-বিবেক ও কিয়াসের ভিত্তিতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বের করার সীমাহীন যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। এ কারণে তাঁকে "মুজতাহিদ ইমাম" অভিধায় ভূষিত করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ তাঁর কিছু গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত এখানে উপস্থাপন করা হলো :

---

৪০৭. সুনান আদ-দারিমী-১/১২৫-১২৬

১. 'তিলা' পানের ব্যাপারে তিনি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

'তিলা' (الطلاء) হলো আঙ্গুল ছাড়া অন্য কোন কিছু ভিজানো পানি, যা পান করলে নেশার উদ্রেক করে। ইবন 'আওন বলেন : 'ইবন সীরীনকে যখন 'তিলা' পানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন : সত্য-সঠিক পথের অনুসারী ইমাম অর্থাৎ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তা পান করতে নিষেধ করেছেন।' এ ব্যাপারে 'উমারের যুক্তি হলো, এই 'তিলা'র মধ্যে মুসলমানদের কোন কল্যাণ নেই। 'তিলা' নামে যা বুঝানো হয় আসলে তা মদ (خمر)। এর পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা বহু হালাল পানীয় আমাদেরকে দান করেছেন। সুতরাং নেশাদায়ক পানীয়কে হারাম বিশ্বাস করে তা পান থেকে বিরত থাকা মুসলমানদের উচিত। কারণ, মদ সকল পাপের সদর দরজা। এই 'তিলা' পান করতে করতে এক সময় মুসলিম সমাজ ব্যাপকভাবে মাদকদ্রব্য পানে আসক্ত হওয়ার আশংকা হয়।[৪০৮]

২. তিনি নামাযে জোরে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করতেন না।

'আবদুল হাকীম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আবী ফারওয়া বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মদীনায় আমাদের নামাযের ইমামতি করতেন। তিনি জোরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়তেন না।[৪০৯]

৩. সাহূ সিজদা সালামের পরে করা।

মুহাম্মাদ ইবন মুহাজির থেকে বর্ণিত। তিনি সাহূ সিজদার ব্যাপারে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে লক্ষ্য করে ইমাম যুহ্‌রীকে বলতে শোনেন যে, উহা সালামের পূর্বে। কিন্তু 'উমার তা মানতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, ওহে ইবন শিহাব! এ ব্যাপারে আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান আমাদেরকে অবহিত করেছেন। মতান্তরে তিনি যুহ্‌রীকে বলেন : আমাদের সামনে আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান ইবন 'আওফ একথা মানতে অস্বীকার করেছেন।[৪১০]

বিশ্বস্ত লোকদের মুখ থেকে তিনি যা শুনেছিলেন তার প্রতি এবং নিজের গভীর চিন্তা-গবেষণার প্রতি কি পরিমাণ আস্থা থাকলে ইমাম যুহ্‌রীর মতো মানুষের মত ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারেন তা ভেবে দেখার বিষয়।

৪. মৃত জন্তুর হাড় অপবিত্র।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের এক দাসী বলেন : একবার 'উমার আমাকে তেল আনতে বললেন। আমি তেল ও হাতীর হাড়ের একটি চিরুনী নিয়ে আসলাম। তিনি চিরুনীটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা মৃত জন্তুর অংশ। আমি বললাম : এটা মৃত হলো কিভাবে? বললেন : তোমার জন্য আফসোস! হাতীটি কে জবাই করেছিল?[৪১১]

---

৪০৮. ইবনুল জাওযী-৭৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৩০; হিলয়াতুল আওলিয়া-৫/২৫৭
৪০৯. তাবাকাত-৫/৩৩৫
৪১০. ফিকহুস সুন্নাহ-১/২২৫
৪১১. তাবাকাত-৫/৪০১

Contents

উল্লেখ্য যে, এটা একটি মতবিরোধমূলক মাসয়ালা। ইমাম যুহ্‌রী হাতী বা এ জাতীয় মৃত জন্তু-জানোয়ারের হাড় সম্পর্কে বলেন. : আমি পূর্ববর্তী বহু আলিমকে পেয়েছি যাঁরা এ রকম হাড়ের তৈরি চিরুনী দ্বারা চুল আঁচড়িয়েছেন এবং এ রকম হাড়ের পাত্রে তেল রেখে ব্যবহার করেছেন। কোন রকম দোষ মনে করেননি।[৪১২]

৫. অর্থের বিনিময়ে মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা।

তিনি এ কাজ বৈধ মনে করতেন। বায়তুল মালের অর্থ দিয়ে মাঝে মাঝে এ কাজ করেছেন। এ লক্ষ্যে একবার এক বিশপকে এক লক্ষ দীনার দান করেন।[৪১৩]

৬. মুরতাদ ব্যক্তিকে তাওবার সুযোগ দান।

রাবী'আ ইবন 'আতা' 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : মুরতাদ ব্যক্তিকে তিন দিন পর্যন্ত তাওবা করতে বলা হবে। যদি তাওবা করে তাহলে ভালো, অন্যথায় তার শিরচ্ছেদ করা হবে।[৪১৪]

৭. কারারুদ্ধ ব্যক্তির স্ত্রীর বিয়ে।

এ বিষয়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বলেন : কারারুদ্ধ ব্যক্তি যতদিন কারাগারে থাকবে তার স্ত্রীকে বিয়ে করা যাবে না।[৪১৫]

৮. মধুর যাকাত দিতে হবে না।

ইমাম বুখারী বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মধুতে যাকাত আছে বলে মনে করেননি।

ইমাম মালিক তাঁর "আল-মুওয়াত্তা" গ্রন্থে 'আবদুল্লাহ ইবন আবী বকর ইবন হাযম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমার পিতার নিকট 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের একটি পত্র আসে। তখন তিনি মিনায়। তাতে লেখা ছিল, ঘোড়া ও মধুতে যাকাত নেই।[৪১৬]

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) দাস নাফে' বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আমাকে ইয়ামনে পাঠালেন। আমি সেখানে মধুর 'উশর (এক দশমাংশ) গ্রহণের ইচ্ছা করলাম। তখন মুগীরা ইবন হাকীম আস-সান'আনী আমাকে বললেন : মধুর যাকাত নেই। আমি বিষয়টি জানিয়ে 'উমারকে পত্র লিখলাম। জবাবে তিনি লিখলেন : মুগীরা সত্য বলেছেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ, মধুতে কিছু নেই।[৪১৭] তবে একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, 'উমার মধুতে 'উশর আছে বলে মনে করতেন।[৪১৮]

---

৪১২. ফিকহুস সুন্নাহ-১/২৪
৪১৩. তাবাকাত-৫/৩৫০
৪১৪. প্রাগুক্ত; ফিকহুস সুন্নাহ-২/৪৫৭-৪৫৯
৪১৫. তাবাকাত-৫/৩৫১
৪১৬. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৮৯
৪১৭. ফাতহুল বারী-৩/৩৪৭-৩৪৮; আল-আমওয়াল-৩০০
৪১৮. ফিকহুস সুন্নাহ-১/৩৬২-৩৬৩

৯. তাঁর মতে ছোলা, মটর কলাই, মসুরি, শিমজাতীয় শস্যের বীচি ইত্যাদির যাকাত দিতে হবে।

ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লেখেন : ছোলা ও মসুরির যাকাত গ্রহণ করা হোক।

ইয়াযীদ ইবন আবী মালিক তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর খাতায় লেখা ছিল : শিম জাতীয় শস্যের বীচির যাকাত গ্রহণ করতে হবে, যেভাবে গম-যব থেকে গ্রহণ করা হয়।[৪১৯]

১০. ব্যবসায়ীর লাভের অর্থের উপর এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যাকাত দিতে হবে না।

কাতন ইবন ফুলান বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সময় আমি একবার ওয়াসিত গেলাম। সেখানকার লোকেরা আমাকে বললো, আমাদেরকে আমীরুল মু'মিনীনের একটি পত্র পাঠ করে শোনানো হয়েছে এবং তাতে লেখা আছে : তোমরা ব্যবসায়ীর লাভের থেকে কোন কিছু গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ না তা এক বছর পূর্ণ হবে। ইবন 'আওন বলেন, আমি মসজিদে গেলাম। শুনলাম, আমি যাওয়ার পূর্বেই একটি পত্র পাঠ করে শোনানো হয়েছে। আমার পাশের লোকটি আমাকে বললো, ব্যবসায়ীর লাভের ব্যাপারে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পত্রটি পাঠের সময় যদি আপনি উপস্থিত থাকতেন! তিনি লিখেছেন, এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত লাভের অর্থ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা যাবে না।

ইমাম মালিকের মতে লাভকে মূলধনের সাথে যোগ করতে হবে। আবূ 'উবায়দ বলেন, এ ব্যাপারে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যা বলেছেন তাই আমাদের মত। আর তিনি বলেছেন, এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত লাভের অর্থের যাকাত দিতে হবে না। ইমাম লাইছও এমন কথাই বলেছেন।

১১. মহিষের যাকাত

ইবন শিহাব বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লেখেন : গরুর যাকাত যেভাবে গ্রহণ করা হয় মহিষের যাকাতও সেভাবে গ্রহণ করতে হবে।[৪২০]

১২. যিম্মীর জিযিয়া গ্রহণ করার পূর্ব মুহূর্তে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তা রহিত হয়ে যাবে। 'আমর ইবন আল-মুহাজির 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বছর পূর্ণ হওয়ার একদিন পূর্বেও যদি কোন যিম্মী মুসলমান হয় তাহলে তার থেকে জিযিয়া নেওয়া যাবে না।

সুওয়াইদ ইবন হুসায়ন বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লেখেন : জিযিয়া যদি পাল্লার এক প্রান্তে থাকে, আর তখন যিম্মী মুসলমান হয়ে যায়, তাহলেও তার নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে না।[৪২১]

---

৪১৯. প্রাগুক্ত-১/৩৪৭-৩৬১; 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৯০

৪২০. তাবাকাত-৫/৩৫৩

৪২১. প্রাগুক্ত

তাঁর বিচার ও রায়

আমাদের পূর্বের আলোচনা থেকে হাদীছ ও ফিকহ বিষয়ে 'উমারের গভীর জ্ঞান ও ইসলামের বিধি বিধানের প্রাণসত্তা সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে তাঁর বিচার-ফয়সালা ও রায় সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করে এ প্রসঙ্গটির সমাপ্তি টানবো। ইসলামী শরী'আতের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রাণসত্তা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের কারণে মানুষের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তি ও বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে সবসময় তিনি সঠিক রায়টি প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের একথার স্বপক্ষে ইমাম আল-লাইছ ইবন সা'দের বর্ণনাটি উপস্থাপন করাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। তিনি বলেন :[৪২২]

حدثني قادم البربرى أنه ذاكر ربيعة بن أبى عبد الرحمن شيئا من قضاء عمر بن عبد العزيز إذ كان بالمدينة، فقال ربيعة : كأنك تقول : أخطأ، والذى نفسى بيده ما أخطأ قط.

'কাদিম আল-বারবারী আমাকে বলেছেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মদীনায় থাকাকালে যে সকল বিচার-ফয়সালা করেন সে ব্যাপারে তিনি রাবী'আ ইবন আবদির রহমানের সাথে কিছু আলোচনা করেন। এক পর্যায়ে রাবী'আ বলেন : তুমি যেন বলতে চাচ্ছো, তিনি ভুল করেছেন। যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ! তিনি কখনো ভুল করেননি।

উল্লেখ্য যে, এই রাবী'আ হলেন, মদীনার সেই বিখ্যাত ইমাম, ফকীহ ও মুজতাহিদ। তাঁর সময়ের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম এবং যিনি 'রাবী'আতুর রায়' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। পূর্বে উল্লেখিত তাঁর মন্তব্যে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের জ্ঞান-গরিমা ও সঠিক রায় ও সিদ্ধান্তের পক্ষে বিরাট সাক্ষ্য।

অপরাধীকে শাস্তি দানের ক্ষেত্রে তাঁর ধৈর্য ও বিচক্ষণতা সম্পর্কে ইমাম আল-আওযা'ঈ বলেন :[৪২৩]

أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ثلاثة أيام ثم عاقبه، كراهية أن يعجل فى أول غضبه.

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যখন কোন ব্যক্তিকে শাস্তিদানের ইচ্ছা করতেন তখন তিনদিন তাকে আটকে রাখতেন। তারপর শাস্তি দিতেন। রাগের প্রথম পর্যায়ে তাড়াহুড়ো করে শাস্তি দান পছন্দ না করার কারণে এমন করতেন।'

বিচার কাজ পরিচালনা ও রায় দানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ভীষণ বিনয়ী। রায় দানের পরেও ভুল বুঝতে পারলে খুব সহজেই পূর্ববর্তী রায় থেকে ফিরে আসতেন। প্রকাশিত সত্যের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিতেন। 'আবদুর রহমান ইবন আল-হাসান আল-আযরুকী তাঁর

---

৪২২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/১৯৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১১৮
৪২৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৩৩; তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৬

পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দরবারে বসা ছিলেন। তখন কুরায়শদের পরস্পর বিবদমান দু'টি দল নিজেদের বিবাদ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হয়। 'উমার উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত দিলেন। তখন রায়টি যার বিপক্ষে গেল সে বললো : আমার একটি প্রমাণ আছে যা উপস্থিত করা হয়নি। 'উমার বললেন : আমি যখন দেখেছি সত্য তোমার প্রতিপক্ষের দিকে আছে তখন সিদ্ধান্ত দানে বিলম্ব করতে পারিনে। তবে তুমি দ্রুত চলে যাও এবং তোমার প্রমাণ উপস্থিত কর। যদি দেখি সত্য তোমার পক্ষে, তাহলে আমি হবো প্রথম ব্যক্তি যে তার পূর্ববর্তী রায়কে বাতিল করে নতুন রায় দিবে।[৪২৪]

তিনি আরো বলতেন : একটি মাটির ঢেলা টুকরো টুকরো করে ফেলা, অথবা একটি পত্র পাঠানোর পর তা আবার ফিরিয়ে আনার চেয়ে আমার একটি বিচারের রায় টুকরো টুকরো ফেলা আমার নিকট অধিক সহজ, যখন আমি দেখতে পাই যে, সত্য আমার প্রদত্ত রায়ের বিপক্ষে রয়েছে।[৪২৫]

এ প্রসঙ্গে আরেকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। ইমাম শাফি'ঈ (রহ) তাঁর নিজস্ব সনদে মাখলাদ ইবন খুফাফ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি একটি দাস খরিদ করে কিছু আয়ের জন্য তাকে কাজে লাগালাম। কয়েকদিন পর দাসটির দোষ ধরা পড়লো। বিক্রেতার সংগে এ নিয়ে ঝগড়া হলো। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে বিচারক মানলাম। তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে দাসটি এবং আমার যিম্মাদারিতে থাকা অবস্থায় তার আয়ের অর্থ ফেরত দানের নির্দেশ দিলেন। অপরদিকে বিক্রেতাকেও নির্দেশ দিলেন মূল্য ফেরতদানের জন্য। এরপর আমি গেলাম 'উরওয়া ইবন আয্-যুবায়র (রা)-এর নিকট এবং তাকে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, আমি আজ সন্ধ্যায় 'উমারের নিকট যাব এবং তাঁকে জানাবো যে, আয়িশা (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূল (সা) এমনই একটি বিচার করেছিলেন এবং রায়ে বলেছিলেন :

أن الخراج بالضمان. – যিম্মাদারির কারণে আয় পাবে যিম্মাদার বা ক্রেতা। কারণ, এ সময়ে দাসটি মারা গেলে বিক্রেতার উপর কোন কিছুই বর্তাতো না; সবটুকু ক্ষতি হতো ক্রেতার। আমি আবার 'উমারের নিকট গেলাম এবং তাঁকে 'উরওয়ার মুখে শোনা 'আয়িশার (রা) সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহর (সা) বিচার ও রায়ের কথা জানালাম। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমি যে বিচার করেছি, তাতে সত্য ছাড়া আর কোন কিছুই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এখন আমার নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ পৌঁছেছে। আমি 'উমারের সিদ্ধান্ত বাতিল করছি এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ বাস্তবায়নের নির্দেশ দিচ্ছি। এরপর 'উরওয়া তাঁর কাছে যান। অতঃপর আমাকে দাসের আয় গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।[৪২৬]

---

৪২৪. তাবাকাত-৫/৩৮৬

৪২৫. ইবনুল জাওযী-৯৩

৪২৬. ইমাম শাফি'ঈ (রহ) তাঁর الرسالة -তে এবং আল-বায়হাকী তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া 'লিসানুল 'আরাব'-১/৮০৮ (خ - ر - ج) দ্রঃ।

গ্রীক গ্রন্থের প্রকাশনা

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের যদিও মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের প্রচার ও প্রসার এবং সম্ভাব্য সকল পন্থায় তিনি একাজ করেছেনও, তা সত্ত্বেও অন্যান্য জাতির কল্যাণকর জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে মুসলমানদের একেবারে অজ্ঞাতও রাখেননি। 'আহরান আল-কুস' ছিলেন একজন বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক। চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর তাঁর একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল। খলীফা মারওয়ান ইবন আল-হাকামের সময় 'মাসিরজুয়া' নামক এক ব্যক্তি গ্রন্থটি আরবীতে অনুবাদ করেন। অনূদিত পাণ্ডুলিপিটিসহ গ্রন্থটি সরকারী গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল। সেটি খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দৃষ্টিতে পড়ে। গ্রন্থটির অনুবাদ মানুষের মাঝে প্রকাশ করা ঠিক হবে কি হবে না, এ ব্যাপারে তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহর নিকট ইসতিখারা করেন। তারপর সেটি খিলাফতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।[৪২৭]

ভবন নির্মাণ

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) কর্মময় জীবনে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বহীন মনে হয়েছিল তা হলো ভবনাদি নির্মাণ। তাঁর খিলাফতকালে একটিও ভবন নির্মিত হয়নি। তিনি অতি মামুলি ধরনের কিছু প্রয়োজনীয় ভবন তৈরি করান। তারও অধিকাংশ ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

১. মসজিদ : মদীনায় বানূ 'আদী ইবন আন-নাজ্জারের মসজিদটি ধসে পড়ে। সেটি পুনঃনির্মাণের জন্য কাজী আবূ বকর ইবন হাযম খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্র লেখেন। জবাবে তিনি লেখেন, আমার ইচ্ছা তো এই ছিল যে, একটি পাথরের উপর আরেকটি পাথর এবং একটি ইটের উপর আরেকটি ইট না রেখেই দুনিয়া থেকে চলে যাই। কিন্তু তা আর হলো না। আপনি কাঁচা ইট দিয়ে মধ্যম মানের একটি মসজিদ পুনঃনির্মাণ করে দিন।[৪২৮]

আল্লামা ইবন জুবায়র 'রা'স 'আইন' নগরীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, এখানে দু'টি জামে' মসজিদ আছে। একটি নতুন ও অন্যটি পুরাতন। পুরাতন মসজিদটি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয কর্তৃক নির্মিত। এখন সেটি খুবই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।[৪২৯]

দামেশকের মসজিদের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এর উত্তরের প্রবেশ দ্বারের সামনে একটি ছোট মসজিদ আছে এবং তা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের প্রতি আরোপ করা হয়।[৪৩০] তারীখে হলব-এ এসেছে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয

---

৪২৭. আখবারুল হুকামা'-২১৩
৪২৮. ইবনুল জাওযী-৮৩
৪২৯. রিহলাতু ইবন জুবায়র-২৪৪
৪৩০. প্রাগুক্ত-২৬৬

'কাফরীবা'-তে যান এবং সেখানকার মানুষের জন্য একটি জামে' মসজিদ নির্মাণ এবং একটি দীঘি খনন করেন।[৪৩১]

মসজিদে নববীর সংস্কার

পূর্ববর্তী অধিকাংশ খলীফাদের সময়ে মসজিদে নববীর সীমা সম্প্রসারণ ও সংস্কার করা হয়েছিল। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযও (রহ) তাঁর খিলাফতকালে কাজী আবূ বকর ইবন হাযমকে মসজিদে নববীর সীমা সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন।

সরকারী ভবন নির্মাণ

তারীখে হলব-এ এসেছে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খুনাসিরায় একটি ভবন নির্মাণ করেন এবং তিনি যখন সেখানে যেতেন তখন প্রায়ই সেই ভবনে অবস্থান করতেন।[৪৩২] তবে সম্ভবতঃ তাঁর খিলাফতকালে এটি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভবন নির্মিত হয়নি। একবার 'আদী ইবন আরতাত বসরার গভর্ণর হাউসের উপরে আরেকটি তলা নির্মাণ করার অনুমতি চান। তিনি তাঁকে অনুমতি না দিয়ে লেখেন, যে ভবন যিয়াদ ও তার পরিবারের জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল তাও আপনার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে? অতঃপর 'আদী একাজ থেকে বিরত থাকেন।[৪৩৩]

নতুন শহরের পত্তন

খলীফা ওয়ালীদ যখন সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিককে ফিলিস্তীনের গভর্ণর নিয়োগ করেন তখন তিনি রামলা নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি সর্বপ্রথম নিজের রাসভবন নির্মাণ করেন। মধ্যবর্তী স্থলে একটি দীঘি খনন করেন এবং একটি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন। এই নগরীর নির্মাণ কাজ চলা অবস্থায় সুলায়মান নিজে খলীফা হন। তাঁর খিলাফতকালেও একাজ চলতে থাকে। সমাপ্ত হওয়ার আগেই তিনি ইনতিকাল করেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সেই কাজ সমাপ্ত করেন। তবে তিনি মূল পরিকল্পনাতে কাটছাঁট করেন এবং বলেন, রামলাবাসীদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। হিজরী ১০০ সনে উপকূলবর্তী শহর 'লায়েকিয়া' রোমানরা ধ্বংস করলে তিনি তা আবার নির্মাণ করে প্রাচীর বেষ্টিত করেন।[৪৩৪]

অন্তিম রোগশয্যায়

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থায় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লব সাধারণ মানুষের জন্য দারুণ কল্যাণ বয়ে এনেছিল, বিশ্ববাসীর নিকট ইসলামী রাষ্ট্রের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং পৃথিবী আরেকবার একথা

---

৪৩১. তারীখু মামলিকাতি হলব-১৭৯

৪৩২. প্রাগুক্ত-৫৯

৪৩৩. ফুতূহ আল-বুলদান-৩৫৭

৪৩৪. প্রাগুক্ত-১৩৯, ১৫০

উপলব্ধি করেছিল যে, ইসলাম মানবতার সংরক্ষণ এবং মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য এসেছে। ইসলাম যে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে তা কোন শ্রেণী বা দলের পৃষ্ঠপোষকতা ও আরাম-আয়েশের জন্য নয় বরং তার উদ্দেশ্য বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ। বিশ্ববাসী ইসলাম সম্পর্কে এমন সুধারণা রাখুক তা বানূ উমাইয়্যাদের মনোপুত ছিল না। কারণ, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) জন্য তারা ভীষণ বিপদে পড়ে গিয়েছিল। তাদের অন্যায়ভাবে অর্জিত ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তাদের জবর-দখলকৃত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ কেড়ে নিয়ে প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরো কিছু দিন জীবিত থাকলে বানূ উমাইয়্যাদের জন্য আরো বেশী অস্থিরতা ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতেন। বিশেষতঃ ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের মনে তো সব সময় এ সন্দেহ ও সংশয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, তাঁর পরবর্তী খলীফা হওয়ার মনোনয়ন বাতিল করে অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে না যান। যদিও পূর্ববর্তী খলীফা সুলায়মান ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক তাকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে জনগণের থেকে বাই'আতও সম্পন্ন করে গেছেন। সে অঙ্গীকার ও বাই'আত ভঙ্গ করা 'উমারের জন্য এত সহজ ছিল না। তবুও তা সম্ভব ছিল। তাঁর চিন্তা-চেতনায় এটা মোটেই অসম্ভব ছিল না যে তিনি ইয়াযীদকে সরিয়ে তার স্থলে অন্য কোন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে খিলাফতের মনোনয়ন দিয়ে যাবেন।

ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের এই সন্দেহ তাঁকে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) হত্যার ষড়যন্ত্র করতে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি 'উমারের এক খাস খাদিমকে এক হাজার দীনারের বিনিময়ে নিজের পক্ষে টেনে নেন। সে তাঁকে খাদ্য অথবা পানীয়ের সাথে বিষ মিশিয়ে দেয়। ইবন কাছীর বলেন :[৪৩৫]

إن مولى له سمه فى طعام أو شراب وأعطى علـى ذلك ألف دينـار فحصل بسبب ذلك مرض.

'তাঁর ('উমার) এক দাস তাঁকে খাদ্য অথবা পানীয়ে বিষ প্রয়োগ করে। বিনিময়ে সে এক হাজার দীনার লাভ করে। আর এর কারণে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন।'

ইবন 'আবদি রাব্বিহি বলেন, মানুষের ধারণা ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক তাঁকে বিষ প্রয়োগের ষড়যন্ত্র করেন। তিনি 'উমারের একজন খাদিমকে হাত করেন। সে তার বুড়ো আংগুলের নখে বিষ লাগিয়ে নেয়। 'উমার পান করার জন্য পানি চাইলে সে গ্লাস ভর্তি পানিতে বিষ মিশ্রিত নখ চুবিয়ে পান করতে দেয়। সেই পানি পান করে 'উমার (রহ) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। সেই রোগেই তাঁর ইনতিকাল হয়।[৪৩৬]

তিনি রোগগ্রস্ত হওয়ার পর প্রথম প্রথম তাঁর খান্দানের অধিকাংশ মানুষ ধারণা করেছিল যে, তাঁকে জাদু করা হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, এই অসুস্থ অবস্থায় একদিন তিনি

---

৪৩৫. রশীদ আখতার নাদবী, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ)-৩৬০
৪৩৬. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১১৩

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : মানুষ আমার সম্পর্কে কি বলাবলি করছে? বললাম : আপনাকে জাদু করা হয়েছে। বললেন : আমি জাদুগ্রস্ত নই।[৪৩৭]

আসলে যেদিন বিষ প্রয়োগ করা হয় সেদিনই তিনি তা বুঝতে পারেন। কিন্তু তিনি উপেক্ষা ও গোপন রাখার নীতি অবলম্বন করেন। অবশেষে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে তিনি সেই খাস খাদিমকে ডেকে বলেন :[৪৩৮]

ويحك ماحملك على أن سقيتنى السمَّ؟ قال ألف دينار أعطيتها وعلى أن أعتق. قـال هات الألف، فجاء بها فألقاها عمر فى بيت المال. وقال: اذهب حيث لايراك أحد.

'তোমার ধ্বংস হোক! আমাকে বিষ প্রয়োগ করতে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে? বললো : হাজার দীনার আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। বললেন : এক হাজার দীনার নিয়ে এসো। সে দীনারগুলো নিয়ে এলো। 'উমার সেগুলো বায়তুল মালে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন : কেউ তোমাকে না দেখে এমন স্থানে চলে যাও।' তাঁর একথা বলার কারণ হলো, অপরাধের কথা ফাঁস হয়ে গেলে পরিবারের লোকদের হাত থেকে সে বাঁচতে পারবে না।

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় 'উমার (রহ) তাঁর খান্দানের লোকদের নিকট এ অপরাধ আপনা থেকে প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত গোপন রাখতে চান। চিকিৎসার জন্য যে চিকিৎসককে ডাকা হয় সে-ই এ বিষ প্রয়োগের কথা প্রকাশ করে দেয়।

হযরত 'উমার (রহ) তখন হিমসের 'দায়রু সাম'আন'[৪৩৯] নামক জনপদে অবস্থান করছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় সেখানে বিশ দিন থাকেন। অসুস্থতার খবর রোমে পৌঁছলে রোমান সম্রাট তাঁর চিকিৎসার জন্য নিজের ব্যক্তিগত চিকিৎসককে পাঠান। তিনি দায়রু সাম'আনে এসে 'উমারকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হন যে, তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি যখন চিকিৎসার উদ্যোগ নেন তখন 'উমার কোন রকম চিকিৎসা করাতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন :[৪৪০]

والله لو أن شفائى أن أمس شحمة أذنى أو أوتى بطيب فأشمه مافعلت.

'আল্লাহর কসম! যদি আমার নিরাময় কেবল এতেই হয় যে, আমি আমার কানের লতি স্পর্শ করি অথবা একটু সুগন্ধির ঘ্রাণ নিই তাহলেও আমি তা করবো না।'

আসলে তিনি নানা কারণে জীবনের প্রতি ভীষণ বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে তিনি মোটেও মেনে নিতে পারছিলেন না। ইবন 'আবদিল হাকাম বর্ণনা

---

৪৩৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২১

৪৩৮. প্রাগুক্ত

৪৩৯. দিমাশকের পাশে একটি বিনোদনমূলক স্থান। (আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/২৮৫, টীকা নং-৩, ৪/৪৩২; টীকা নং-৪)

৪৪০. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২১০; আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৬৫

করেছেন, তাঁর অতি প্রিয় পুত্র 'আবদুল মালিক, ভাই সুহায়ল এবং ব্যক্তিগত খাদিম মুযাহিম-এর মৃত্যুর পর থেকে তিনি সব সময় ভীষণ বিষণ্ন থাকতেন। পার্থিব কোন কিছুর প্রতি তাঁর আর কোন আকর্ষণ ছিল না। বিশেষ করে পুত্র 'আবদুল মালিকের মৃত্যুতে তিনি শোকে এত কাতর হয়ে পড়েন যে, সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যান। তারপর একে একে ভাই সুহায়ল এবং একান্ত খাদিম মুযাহিমের মৃত্যু তাঁর জন্য মোটেও কম বেদনার ছিল না। তাই এ সময় তিনি দিমাশ্কের তৎকালীন সবচেয়ে বড় দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি আবূ যাকারিয়াকে ডেকে পাঠান। তিনি উপস্থিত হলে তাঁদের মধ্যে নিম্নের কথোপকথন হয়:

'উমার : 'ওহে ইবন আবী যাকারিয়া, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন আমি আপনাকে কি জন্য ডেকে পাঠিয়েছি?

ইবন আবী যাকারিয়া : না, আমি বুঝতে পারিনি।

'উমার : এমন একটি কথা আমি আপনাকে বলতে চাই, যা আপনি গোপন রাখবেন বলে কসম খেয়ে অঙ্গীকার না করলে আমি বলবো না।

আবূ যাকারিয়া কসম খেয়ে প্রকাশ না করার অঙ্গীকার করলেন।

'উমার বললেন : আপনি আমার জন্য দু'আ করুন আল্লাহ যেন আমাকে মৃত্যু দান করেন।

ইবন আবী যাকারিয়া : এটা মুসলমানদের জন্য খুবই খারাপ কথা হবে। আমি যদি এ দু'আ করি, তা হবে মুসলিম উম্মাহর সংগে চরম দুশমনি।

'উমার (রা) তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, আপনি আমার কাছে কসম খেয়ে অঙ্গীকার করেছেন।'

ইবন আবী যাকারিয়া দু'আ করলেন এবং সেই সাথে নিজের মৃত্যু কামনা করেও দু'আ করেন। হযরত 'উমার নিজের ছোট এক সন্তানকেও ডেকে আনান এবং আবূ যাকারিয়াকে বলেন, এই সন্তানটিকে আমি খুব বেশী ভালোবাসি। এর মৃত্যু কামনা করেও দু'আ করুন। ইবন আবী যাকারিয়া শিশুটির মৃত্যু কামনা করে দু'আ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'উমার, ইবন আবী যাকারিয়া ও শিশু তিনজনই একে একে প্রায় একই সঙ্গে মারা যান। তবে এটা জানা যায় না যে, ইবন আবী যাকারিয়াকে তিনি অসুস্থ অবস্থায় ডেকে ছিলেন নাকি তার আগে।[৪৪১]

অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায়, যখন তাঁর পুত্র আবদুল মালিক, তাঁর ভাই সুহায়ল এবং একান্ত খাদিম মুযাহিম একের পর এক ইনতিকাল করেন তখন তিনি দুঃখ-বেদনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ অসুস্থ অবস্থায় তিনি ওযু করেন, নামায পড়েন এবং অত্যন্ত বিনয় ও বিনম্র চিত্তে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন:

---

৪৪১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২১০; সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-১১৫

'হে আল্লাহ, তুমি সুহায়ল, আবদুল মালিক ও মুযাহিমকে মৃত্যু দান করেছো। তারা ছিল আমার সঙ্গী ও সহযোগী। এখন আমাকেও উঠিয়ে নাও।' তাঁর এ দু'আ কবুল হয় এবং তিনি ইনতিকাল করেন।

তাঁর এই অসুস্থতা ছিল বেশ কিছুদিন। স্ত্রী ফাতিমা ও ভাই মাসলামা সর্বক্ষণ তাঁর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। এ দু'জন তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। একদিন মাসলামা বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! আপনার অনেকগুলো সন্তান এবং তাদেরকে আপনি বায়তুল মালের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছেন। আপনি আমাকে অথবা খান্দানের অন্য কাউকে নির্দেশ দিলে আপনার জীবদ্দশায় তাদের জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায়।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয শোয়া অবস্থায় ছিলেন। তার একথা শুনে বললেন : তোমরা আমাকে ধরে একটু বসাও। তাঁকে ধরে বসানো হলে তিনি বললেন :

الحمد لله، أبالفقر تَخَوِّفني يامسلمة! أما ما ذكرت من أني فطمت أفواه ولـدى عـن هذا المال، وتركتهم عالة، فإني لم أمنعهم حقا هو لهم، ولم أعطهم حقا هو لغيرهم : وأما ماسألت من الوصاة إليك، أو إلى نظرائك من أهل بيتى، فـإن وصيتـي بـهم إلى الله الذى نزَّل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإنما بنو عمر أحد رجلـين : رجـل اتقى الله، فجعل الله له من أمره يسرا، ورزقه من حيـث لايحتسـب، ورجـل غـير وفجر، فلايكون عمر أول من أعانه على ارتكابه.

'সকল প্রশংসা আল্লাহর। মাসলামা! তুমি কি আমাকে দারিদ্রের ভয় দেখাচ্ছো? এই যে তুমি বললে, আমি আমার সন্তানদের মুখ এই ধন-সম্পদ থেকে শুকনো রেখেছি এবং তাদেরকে আমি নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে যাচ্ছি। আসলে আমি তাদের কোন কিছু থেকে বঞ্চিত করিনি এবং অন্যের কোন অধিকার হরণ করে তাদের দিইনি। আর এই যে তুমি দাবী করলে, আমি যেন তাদের ব্যাপারে তোমাকে অথবা তোমার মত আমার খান্দানের অন্য কাউকে অসীয়াত করে যাই। তাদের ব্যাপারে আমি আল্লাহকে অসী বানিয়ে যাচ্ছি যিনি কিতাব নাযিল করেছেন এবং যিনি সৎকর্মশীলদের ওলী বা অভিভাবক। 'উমারের সন্তানগণ দু'ধরনের লোকের যে কোন একটি হতে পারে। এক ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জীবনকে সহজ করে দেবেন এবং তার জীবিকার এমনভাবে ব্যবস্থা করে দেবেন যে সে তার ধারণাও করতে পারবে না। আরেক ব্যক্তি যে বিকৃত হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হবে। সেক্ষেত্রে উমার তার পাপাচারের প্রথম সাহায্যকারী হতে পারে না।'

তারপর তিনি সন্তানদের সকলকে ডাকতে বলেন। তাদের সংখ্যা ছিল মোট বারো মতান্তরে নয় জন। তারা উপস্থিত হলে তিনি তাদের প্রতি গভীর মমতাভরা দৃষ্টিতে তাকান। তাঁর চোখ দু'টি অশ্রুতে টলমল হয়ে যায়। সন্তানরাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এ অবস্থায় তাদের লক্ষ্য করে বলেন :

بنفسى فتية تركتهم ولامال لهم! يـابنى : إنـى قـد تركتكـم مـن الله بخـير، إنكـم لاتمرون على مسلم ولامعاهد إلا ولكم عليه حـق واجـب إن شـاء الله، يـابنى ميَّلـتُ رائى بين أن تفتقروا فى الدنيا، وبين أن يدخل أبوكـم النـار، فكـان أن تفتقـروا إلى آخر الأبد خيرا مـن دخـول أبيكـم يومـا واحـدا فـى النـار، قومـوا يـابنى عصمكـم الله ورزقكم.

'আমার সন্তানগণ যাদের আমি নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে যাচ্ছি তাদের প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হোক! আমার সন্তানগণ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালো অবস্থায় রেখে যাচ্ছি। তোমরা যে কোন মুসলমান ও চুক্তিবদ্ধ যিম্মীর নিকট যাও না কেন তার উপর তোমাদের কিছু না কিছু অধিকার থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমার সন্তানগণ! দুইটি পথের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করা তোমার পিতার এখতিয়ারে ছিল। একটি এই যে, দুনিয়াতে অভাব ও দারিদ্রের মধ্যে থাকা, আর দ্বিতীয় এই যে, তোমাদের পিতার দোযখে প্রবেশ করা। তোমাদের পিতা একদিনের জন্য দোযখে প্রবেশ করার চেয়ে চিরকালের জন্য তোমাদের অভাবী থাকা শ্রেয় বলে মনে করেছে। এখন তোমরা যাও। আল্লাহ তোমাদের হিফাজত করুন, জীবিকা দান করুন।' ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, 'উমারের কোন সন্তান অভাবে কষ্ট পায়নি। কারো মুখাপেক্ষীও হয়নি।[৪৪২]

যখন তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, তিনি আর বেঁচে থাকবেন না তখন পরবর্তী খলীফা ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিককে ডেকে তাঁকে একটি লিখিত অন্তিম উপদেশ দান করেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ :[৪৪৩]

بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤمنـين إلى يزيـد بـن عبـد الملـك، السلام عليك، فإنى أحْمَدُ إليك الله الذى لاإله إلا هو، أما بعدُ، فإنى كتبـت إليـك وأنا دَنِفٌ (المريض الثقيل) من وَجَعى، وقد علمت أنى مسئول عما وَليت، يحاسبنى عليه مليكُ الدنيا والأخرة،ولست أستطيع أن أُخْفِـى عليـه مـن عملـى شـيئًا، يقـول تعالى فيما يقول : (فلنقصَّنَّ عليهم بعلم وماكنا غائبين) فان يَرْضَ عنى الرحيمُ، فقـد أفلحتُ ونجوتُ من الهوان الطويـل، وإن سَخِط علـىَّ فيـاويح نفسـى! إلاَمَ أصـيرُ؟ أسأل الله الذى لا إله إلا هو أن يُجيرنى من النار برحمته، وأن يمُنَّ علــىَّ برضوانـهِ

৪৪২. ইবনুল জাওযী-২৮০; আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৪/৪৩৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/১২৬; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/১১২-১১৪

৪৪৩. জামহারাতু রাসায়িল আল-'আরাব-২/৩১৪

والجنة، وعليك بتقوى الله، والرعية والرعية، فإنك لن تَبْغِي بعدى إلا قليـلا حتـى تَلْحَقَ باللطيف الخبير، والسلام.

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মিনীন 'উমারের পক্ষ থেকে ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। আমি আপনার নিকট সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। অতঃপর এই যে, আমি যখন আপনাকে এ উপদেশ পত্র লিখছি তখন আমি একজন যন্ত্রণা কাতর মরণপথের যাত্রী। আমি একথাও অবগত যে, আমার দায়িত্ব সম্পর্কে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক আমার নিকট থেকে এর হিসাব নিবেন। তাঁর কাছে আমি আমার কাজের কোন কিছু গোপন করতে সক্ষম হবো না। আল্লাহ বলেন : 'অতঃপর তাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞানের সাথে তাদের কার্যাবলী বিবৃত করবোই, আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।' (৭/৭) পরম দয়ালু যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন তাহলে তো আমি সফলকাম এবং দীর্ঘ অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাব। আর তিনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন তাহলে তো আমার সর্বনাশ। আমি কার কাছে যাব? আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তাঁর নিকট আমার প্রার্থনা যে, তিনি যেন তাঁর করুণায় আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত দ্বারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন। তাকওয়া বা আল্লাহর ভীতি অবলম্বন করা আপনার উচিত হবে। জনগণের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন, জনগণের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। মনে রাখবেন, আমার পরে আপনি অতি অল্পই সময় পাবেন। অতঃপর আপনি সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ সত্তার সাথে মিলিত হবেন। ওয়াস সালাম!'

কোন কোন বর্ণনায় উক্ত উপদেশ বাণীতে নিম্নের কথাগুলোও ছিল : "সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক আল্লাহর এক বান্দাহ ছিলেন, আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেছেন এবং তিনি আমাকে খলীফা বানিয়ে তোমাকে পরবর্তী উত্তরাধিকার মনোনীত করে গেছেন। আমি যে অবস্থা ও অবস্থানে ছিলাম সেখান থেকে যদি আমি চাইতাম যে আমার অনেকগুলো স্ত্রী হোক, অঢেল অর্থ-বিত্তের অধিকারী হই তাহলে আল্লাহ আমাকে এর চেয়ে ভালো ভালো জিনিস আমাকে দিতেন। যা তিনি অন্য যে কোন বান্দাহকে দিতে পারেন। কিন্তু একটি কঠিন ও মারাত্মক জিজ্ঞাসাবাদকে ভীষণ ভয় করি। আর সেটা আল্লাহর পাকড়াও ছাড়া আর কিছু নয়।"[৪৪৪]

যখন তিনি একেবারে অন্তিম অবস্থায় তখন অনেকে বললেন, আপনি মদীনায় চলে গেলে ভালো হতো। তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) কবরের পাশে চতুর্থ যে স্থানটুকু খালি আছে সেখানে আবূ বকর ও 'উমারের (রা) পাশে সমাহিত হতে পারেন। একথার জবাবে তিনি বলেন : "আল্লাহর কসম! আগুন ছাড়া আর যে কোন রকমের শাস্তি আল্লাহ আমাকে দেন আমি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবো। কিন্তু এ আমার মনঃপূত নয় যে, আল্লাহ একথা জানুন, আমি তাঁর নবীর (সা) পাশে দাফন হওয়ার যোগ্য বলে মনে করি।"[৪৪৫]

---

৪৪৪. ইবনুল জাওযী-২৮০
৪৪৫. তাবাকাত-৫/২৯৮

Contents

কবরের জন্য ভূমি ক্রয়

অতঃপর তিনি দায়রু সাম'আনের এক যিম্মীর নিকট থেকে চল্লিশ হাজার দিরহামে কবরের জন্য একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। কিন্তু লোকটি মূল্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে, আপনি আমার ভূমিতে দাফন হচ্ছেন, সেটাই আমার শুভ ও কল্যাণের কারণ হবে। কিন্তু 'উমার তাঁর কোন কথা শুনলেন না। জোর করে ভূমির মূল্য তার হাতে তুলে দেন।[৪৪৬]

একেবারে অন্তিম সময়ে মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক দেখা করতে চাইলেন। অতি অল্প সময়ের জন্য অনুমতি দিলেন। মাসলামা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন: হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আপনি আমাদের পাষাণ হৃদয়কে কোমল করে দিয়েছেন। আপনি আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের মধ্যে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য করে তুলেছেন।

একটি বর্ণনায় এসেছে যে, মাসলামা যখন খলীফাকে কিছু অসীয়াত করে যাওয়ার অনুরোধ করেন তখন তিনি বলেন, সম্পদ কোথায় যে অসীয়াত করবো? মাসলামা বললেন, আমি এক লাখ দিরহাম আপনার নিকট পাঠাচ্ছি। সেই অর্থের ব্যাপারে অসীয়াত করে যাবেন। বললেন, ঐ অর্থ যেখান থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে এসেছো সেখানে ফিরিয়ে দাও। একথার পর মাসলামা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।[৪৪৭]

রাজা' ইবন হায়ওয়াকে ডেকে বললেন, তিনি যেন গোসল দেন, কাফন পরান এবং ধরে কবরে নামান। দাসীকে সুগন্ধির সাথে মিশ্‌ক মিশাতে নিষেধ করেন, ইট দিয়ে কবর পাকা করতেও বারণ করেন। কাফনের জন্য নিজেই পাঁচ প্রস্থ কাপড় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এবং বলে রেখেছিলেন যে, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) তাঁর খান্দানের মৃতদেরকে এভাবে কাফন পরাতেন। হযরত রাসূলে কারীমের (রা) কয়েক টুকরো নখ ও কয়েকটি কেশ চেয়ে এনে কাফনের মধ্যে দেওয়ার কথা বলে যান।[৪৪৮]

একেবারে অন্তিম সময়ে স্ত্রী ফাতিমা ও শ্যালক মাসলামা নিকটে বসা ছিলেন। তাঁদেরকে বলেন:

قوموا عنى فإني أرى خلقا مايزدادون إلا كثرة ماهم بجن ولاأنس.

"আমার কাছ থেকে তোমরা একটু সরে যাও। আমি দেখতে পাচ্ছি, বিশাল সংখ্যক এক ধরনের সৃষ্টি (মাখলূক) আমার নিকট সমবেত হচ্ছে। তারা না জিন এবং না মানুষ।" আল্লাহই জানেন, তারা কোন ধরনের মাখলূক ছিল। তারা কি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ফেরেশতা ছিল, না অন্য কিছু।

ফাতিমা ও মাসলামা দু'জনই তাঁর কথা মত উঠে পাশের একটি কক্ষে গেলেন। সেখান থেকেই তাঁরা নিম্নের এ আয়াতটি পাঠের আওয়াজ শুনতে পেলেন:

---

৪৪৬. প্রাগুক্ত-৫/২৯৯; আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩২, ৪৪০

৪৪৭. আল-কামিল ফিল লুগাহ্ ওয়াল আদাব-১/১৩৯-১৪০

৪৪৮. তাবাকাত-৫/৩০০; ইবনুল জাওযী-২৮২

تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَيُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الأَرْضِ وَلاَفَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. (القصص : ٨٣)

'ইহা আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।'[৪৪৯]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে। একেবারে অন্তিম সময়ে স্ত্রী ফাতিমা স্বামীকে বললেন, আপনি মোটেই ঘুমাননি। আমি একটু সরে যাই, আপনি একটু ঘুমান। তারপর তিনি উঠে পাশের কক্ষে যান। একটু পরেই সেখান থেকে পূর্বে উল্লেখিত আয়াতটি পাঠ করার শব্দ শুনতে পান। তারপর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে তিনি তাঁর সেবায় রত চাকরকে ডেকে বলেন, দেখতো কি হলো? সে ছুটে গিয়ে দেখতে পায় খলীফা ঘাড় কাৎ করে পড়ে আছেন। সে চিৎকার দিয়ে উঠলে স্ত্রী ও মাসলামা ছুটে গিয়ে তাঁকে মৃত পান। মুখ কিবলার দিকে, একটি হাত মুখের উপর এবং আরেকটি হাত চোখের উপর রাখা। এভাবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথম বছরে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সৎ, আল্লাহভীরু ও মর্যাদাবান মানুষটি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন। সেটা ছিল হিজরী ১০১ সনের রজব মাসের ২০, মতান্তরে ২৪ অথবা ২৫ তারিখ, খ্রী. ৭১৯ সন।[৪৫০] তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৯ বছর কয়েক মাস, মতান্তরে ৪০ বছর কয়েক মাস। মোট দুই বছর পাঁচ মাস খিলাফতের মসনদে আসীন ছিলেন। খুনাসিরা মতান্তরে দায়রু সাম'আন-এ তাঁকে দাফন করা হয়।[৪৫১] মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক তাঁর জানাযার নামায পড়ান।[৪৫২]

পরবর্তী খলীফা

তিনি ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিককে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যান। অবশ্য একথাই সঠিক যে, তাঁর পূর্ববর্তী খলীফা সুলায়মান 'উমারের পরে ইয়াযীদকে মনোনীত করে যান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছিলেন :[৪৫৩]

لو كان الأمر إلىَّ لولَّيتُ ميمون بن مهران والقاسم بن محمد.

'বিষয়টি যদি আমার হাতে থাকতো তাহলে আমি মায়মূন ইবন মিহ্‌রান ও কাসিম ইবন মুহাম্মাদকে মনোনীত করতাম।'

সন্তান

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) চার স্ত্রী ছিলেন। প্রত্যেকেরই সন্তান ছিল। লুমাইস বিন্‌ত 'আলীর ছিল তিন সন্তান 'আবদুল্লাহ, বাকর, ও উম্মু 'আম্মার। উম্মু

---

৪৪৯. আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৬২

৪৫০. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখুল আদাব আল-'আরাবী-১/৬০৫

৪৫১. তাবাকাত-৫/৩০১-৩০২; আল-কামিল ফিত তারীখ-২/৬২

৪৫২. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৮

৪৫৩. প্রাগুক্ত

'উছমান বিন্‌ত শুআইবের ছিল এক ছেলে– ইবরাহীম। ফাতিমা বিন্‌ত 'আবদিল মালিকের ছিল তিন ছেলে– ইসহাক, ইয়া'কূব ও মূসা। আর উম্মু ওয়ালীদের ছিল নয় ছেলে-মেয়ে। যথা : 'আবদুল মালিক, ওয়ালীদ, 'আসিম, ইয়াযীদ, 'উবায়দুল্লাহ, 'আবদুল 'আযীয, যাবানা, আমাতা ও উম্মু 'আবদিল্লাহ। আল-ইয়া'কূবী বলেন, মৃত্যুর সময় তিনি নয়জন পুত্র সন্তান রেখে যান।[৪৫৪] তাঁর জীবদ্দশায় অতি আদরের ছেলে 'আবদুল মালিকের মৃত্যু হয়। তিনি নিজ হাতে তাকে কবরে নামিয়ে মাটি সমান করেন। কবরের উপর মাথা ও পায়ের দিকে যয়তূনের দু'টি ডাল গেড়ে দেন। মানুষ তখন 'উমারকে ঘিরে ছিল। তিনি দাঁড়িয়ে মৃত ছেলের উদ্দেশ্যে নিম্নের কথাগুলো উচ্চারণ করেন :

رحمك الله يا بنيّ، فقد كنت برًّا بأبيك، والله مازلت مذ وهبك الله لى بك مسرورًا ولاوالله ما كنتُ قط أشدّ سرورا بك، ولاأرجى لحظى من الله فيك، مذوضعتك فى الموضع الذى صيَّرك الله إليه، فغفر الله لك ذنبك، وجازاك بأحسن عملك، وتجاوز عن سيئاتك، وحم الله كل شافع يشفع لك بخير، من شاهد أو غائب، رضينا بقضاء الله، وسلمنا لأمره، والحمد لله رب العالمين.

'আমার ছেলে! আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন। তুমি তোমার পিতার বাধ্য ছিলে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে দান করার পর থেকে আমি তোমাকে নিয়ে সবসময় খুশী ছিলাম। আল্লাহর কসম! কখনো সে খুশী মাত্রাতিরিক্ত ছিল না। আল্লাহ যেখানে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছেন সেখানে তোমাকে রাখার পর তোমার মধ্যে আমার জন্য আল্লাহর নিকট কিছুই প্রত্যাশা করি না। আল্লাহ তোমার গুনাহ্ মাফ করুন, তোমার ভালো কাজের বদলা দিন এবং খারাপ কাজ উপেক্ষা করুন। দূরের ও নিকটের যে কেউ তোমার জন্য সুপারিশ করেন, আল্লাহ এমন সকল সুপারিশকারীকে দয়া করুন। আমরা আল্লাহর ফয়সালায় রাজি এবং তাঁর ইচ্ছা ও আদেশকে মেনে নিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য সকল প্রশংসা।'

ভদ্র, শালীন ও রুচিশীল মানুষ ছিলেন

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনম্র ও মিষ্টি-মধুর চরিত্রের মানুষ। কিছু বিশেষ লোক ছিলেন যাদের সাথে রাতের বেলা খিলাফতের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতেন। কিন্তু যখন তাঁর ইচ্ছা হতো যে, এই লোকগুলো এখন উঠে যাক, তখন শুধু এতটুকু বলতেন যে– যদি আপনারা চান!

একবার 'আবদুল্লাহ ইবন হাসান তাঁর কিছু প্রয়োজনে খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের নিকট আসেন এবং 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে মাধ্যম বানান। এ

---

৪৫৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/১৮২; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২১৭

কারণে সময়ে সময়ে তাঁর কাছে আসা-যাওয়া আরম্ভ করেন। একদিন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে বলেন, আপনি আমার নিকট কেবল তখন আসবেন যখন ভিতরে প্রবেশের অনুমতি লাভ করেন। কারণ, আমার এটা পছন্দ নয় যে, আপনি আমার দরজায় এসে অনুমতি না পেয়ে ফিরে যান।

একদিন তিনি আসলে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে বললেন, সেনাবাহিনীর একজন সদস্য প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে। আপনি আপনার জন্মভূমিতে ফিরে যান। কারণ, আপনি আমার একজন অতি প্রিয় ব্যক্তি।

একবার তিনি ভুলক্রমে সালাম না দিয়েই কিছু মানুষের নিকট বসে পড়েন। স্মরণ হলে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম করে আবার বসেন।[৪৫৫]

বিনয়, সাম্য ও নিরহঙ্কার মনের মানুষ

খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পূর্বে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন একজন অহঙ্কারী ও বিলাসী মানুষ। অত্যন্ত দামী কাপড় পরতেন, মূল্যবান সুগন্ধি গায়ে লাগাতেন এবং গর্বভরে রাস্তায় চলতেন। তবে খলীফা হওয়ার সাথে সাথে তাঁর স্বভাব-চরিত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। তিনি তাঁর গর্ব-অহঙ্কারকে বিনয় ও নম্রতায় পরিবর্তন ঘটান। যখন তিনি মদীনার ওয়ালী ছিলেন তখন তাঁর আচার-আচরণে পরিষ্কার বুঝা যেত, তিনি একজন ওয়ালী। তবে খলীফা হওয়ার পর কেউ বুঝতে পারতো না যে, তিনি একজন খলীফা।

খলীফা হওয়ার পর যখন রাজকীয় বাহন এসে দাঁড়ালো তখন তিনি তাদেরকে একথা বলে ফিরিয়ে দেন যে, "আমার খচ্চরটিই আমার জন্য যথেষ্ট।" যখন তিনি খচ্চরের উপর সোয়ার হয়ে চলতে যাবেন তখন কোতোয়াল বর্শা উঁচিয়ে আগে আগে চলতে চাইলো। তিনি তাকে একথা বলে বিদায় করেন যে, আমিও অন্য সাধারণ মুসলমানদের মত একজন মুসলমান। শাহী প্রাসাদে প্রবেশ করে দামী দামী পর্দাসমূহ ছিঁড়ে ফেলার নির্দেশ দেন। খলীফাগণ যে মূল্যবান কার্পেট ও বিছানায় বসতেন তা বিক্রী করে সেই অর্থ বায়তুল মালে জমা দিয়ে দেন।[৪৫৬]

লোকেরা যখন তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ালো, তিনি বললেন : "ওহে জনগণ! যদি আপনারা দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে আমিও দাঁড়িয়ে থাকবো। আপনারা বসলে আমিও বসবো। মানুষের কেবল আল্লাহর সামনেই দাঁড়ানো উচিত।[৪৫৭]

বানূ উমাইয়্যা খলীফাদের নিয়ম ছিল যখন তাঁরা কোন জানাযায় যোগাদান করতেন তখন সর্বপ্রথম তাঁদের বসার জন্য এক ধরনের বিশেষ চাদর বিছানো হতো। একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একটি জানাযায় যোগদান করেন এবং নিয়ম অনুযায়ী তাঁর জন্যও

---

৪৫৫. ইবনুল জাওযী-৬২, ৬৩
৪৫৬. প্রাগুক্ত : ৫৩-৫৪
৪৫৭. সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-৩০

চাদর বিছানো হয়। তবে তিনি পা দ্বারা চাদরটি গুঁটিয়ে মাটিতে বসে পড়েন। সরকারী নিরাপত্তা প্রহরীদেরকে খলীফার সম্মানে উঠে দাঁড়াতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন এবং তাদের সাথে সমান্তরালভাবে পাশাপাশি বসতেন। তারা তাড়াহুড়ো করে আগে ভাগে সালাম দিত। তিনি তাদেরকে বলতেন, তোমরা প্রথমে সালাম করবে না; বরং আমাদের উপর এটা ওয়াজিব যে, আমরা তোমাদেরকে প্রথমে সালাম করি।

গর্ব, অহঙ্কার ও আত্ম-অহমিকার প্রতি তাঁর এতই ঘৃণা ছিল যে, যখন কোন ভাষণ দিতেন অথবা কিছু লিখতেন তখন যদি মনে সামান্য পরিমাণ গর্ব-অহঙ্কারের ভাব সৃষ্টি হতো তাহলে ভাষণ বন্ধ করে চুপ হয়ে যেতেন এবং লেখা কাগজটি ছিঁড়ে ফেলতেন। তারপর আল্লাহর নিকট ফরিয়াদের সুরে বলতেন: হে আল্লাহ! আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই।[৪৫৮]

তিনি বলতেন, আত্ম-অহঙ্কারের ভয়ে আমি বেশী কথা বলি না।[৪৫৯]

তিনি ছিলেন খলীফা এবং আমীরুল মু'মিনীন। তা সত্ত্বেও নিজেকে ব্যক্তি 'উমারই মনে করতেন। একবার তাঁর এক ভাই এসে বলে, "আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনাকে 'উমার হিসেবে এমন কথা বলবো যা আজ আপনার পছন্দ হবে না, তবে আগামী দিনে পছন্দ হবে। আর তা না হলে আপনাকে আমীরুল মু'মিনীন মনে করেই কথা বলবো, যা আজ আপনার পছন্দ হবে কিন্তু আগামীকাল তা হবে অপছন্দ। বললেন, আমাকে তুমি 'উমার মনে করেই কথা বল যা আজ আমার অপ্রিয় হবে কিন্তু আগামীকাল হবে প্রিয়।

সাধারণতঃ সকল জানাযায় তিনি অংশগ্রহণ করতেন এবং অন্য সাধারণ মুসলমানদের মত লাশের খাটিয়ায় কাঁধ দিতেন। একবার এক বৃষ্টির দিনে একটি জানাযার নামায পড়ান। ঘটনাক্রমে একজন মুসাফির এসে পড়ে। তার গায়ে কোন চাদর ছিল না। তিনি লোকটিকে নিকটে ডেকে নিয়ে নিজের গায়ের চাদরে তাকে জড়িয়ে নেন।

একবার তিনি একটি গির্জায় যান। সেখানে দেখতে পান যে, কিছু লোক থালায় করে কিছু নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এতে কি? লোকেরা বললো: গির্জার পাদরী মানুষকে আহার করাচ্ছেন। এরপর তাঁর সামনেও একটি খাবারের থালা উপস্থাপন করা হলো। তাতে পেস্তা ও বাদাম ছিল। তিনি জানতে চান অন্য থালাতেও একই খাবার আছে কিনা। তারা বললো: নেই। তিনি বললেন, তাহলে খাবারের থালাটি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।[৪৬০]

বিনয় ও নম্রতার কারণে যে কোন প্রশংসাকারীকে ভীষণ অপছন্দ করতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি সামনেই তাঁর প্রশংসা করে। তিনি বলেন, আমার নিজের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে যতটুকু আমি জানি, তা যদি তোমার জানা থাকতো তাহলে তুমি আমার চেহারার দিকে তাকাতেই না।

---

৪৫৮. ইবনুল জাওযী-৫৭, ৬৩, ৮৬

৪৫৯. তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৮

৪৬০. সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-৫৫

Contents

তাঁর এমন বিনয় ও নম্রতার ফলে যারা তাঁকে জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় দেখতে চাইতো, চিনতেই পারতো না। হাকাম ইবন 'উমার আর-রু'আইনী বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একদল মানুষের নিকট থেকে উঠে আরেকদল মানুষের নিকট গিয়ে বসতেন। আগন্তুকদের অনেকে যারা তাঁকে চিনতো না, জিজ্ঞেস করতো, আমীরুল মু'মিনীন কোন দলটির মধ্যে আছেন? যতক্ষণ আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে না দেওয়া হতো যে, ইনি আমীরুল মু'মিনীন, তারা তাঁকে চিনতেই পারতো না।

এমন বিনয় স্বভাব সত্ত্বেও তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল টনটনে। খলীফা হওয়ার পর নিজের বংশের লোকদের সাথে মেলামেশা কমিয়ে দেন। তখন কেউ কেউ বলতো, তিনি অহঙ্কারী হয়ে গেছেন। এ কথা শুনে তিনি বলেন, প্রথমে আমি ছিলাম একটি বখাটে ছোকরা। বংশের লোকেরা বিনা অনুমতিতে আমার কাছে আসতো, আমার গালিচা-বিছানা দলে-মুঁচড়ে একাকার করে ফেলতো। একজন শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তির যে কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, তা ছিল না। তবে খলীফা হওয়ার পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, হয় পূর্বের অবস্থায় থেকে আমি আমার অধিকার ক্ষুণ্ন করার জন্য তাদেরকে শাস্তি দিব, না হয় তাদের সাথে মেলামেশা ছেড়ে দিব। যাতে তারা আমার অধিকার ক্ষুণ্ন করার দুঃসাহস না করে। আমি এই শেষ পন্থাটি অবলম্বন করেছি। আর অহঙ্কার! তাতো আল্লাহর চাদর, তা নিয়ে আমি টানাটানি করতে পারি কিভাবে?[৪৬১]

দাস-দাসীদের সাথে তাঁর আচরণ এমন সমতার রূপ নেয় যে, কখনো কখনো তিনি নিজেই চাকর-বাকরদের সেবায় লেগে যেতেন। একবার পাখা ঘুরাতে ঘুরাতে এক দাসী নিদ্রাকাতর হয়ে পড়ে। তিনি পাখাটি নিয়ে তাকেই বাতাস করতে থাকেন। দাসী চোখ মেলে মনিবকে বাতাস করতে দেখে ভয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠে। তিনি তাকে শান্ত করে বলেন, তুমিও তো আমার মত মানুষ, তোমারও তো গরম লাগতে পারে। যেভাবে পাখা ঘুরিয়ে তুমি আমাকে বাতাস করছিলে, তেমনি তোমাকেও বাতাস করা আমি সঙ্গত মনে করেছি।[৪৬২]

কর্মচারী ও চাকর-বাকরদের বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটাতেন না। তাদের বিশ্রামের সময় নিজের কাজ নিজে করে নিতেন। একদিন রাজা' ইবন হায়ওয়ার সাথে কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে যায়। এক সময় বাতি দফ দফ করতে থাকে। পাশেই চাকর শুয়ে ছিল। রাজা' বললেন, তাকেই জাগিয়ে দিন সে ঠিক করুক। 'উমার বললেন, না, তাকে ঘুমাতে দিন। রাজা' নিজেই বাতি ঠিক করতে চাইলেন। কিন্তু অতিথির দ্বারা কাজ করানো ভদ্রতার পরিপন্থী, তাই তাঁকেও করতে দিলেন না। তিনি নিজেই উঠে গিয়ে চেরাগে যয়তূনের তেল ঢেলে ঠিক করে ফিরে এসে বললেন : "যখন আমি উঠেছিলাম তখনও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলাম এবং এখনো 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আছি।[৪৬৩]

---

৪৬১. ইবনুল জাওযী : ১৭২-১৭৫
৪৬২. প্রাগুক্ত-১৭২
৪৬৩. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/৪২৫

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য আবু আবদিল মালিক বলেছেন, একবার 'ঈদের দিন 'উমার কাতানের জামা গায়ে দিয়ে এবং মাথায় টুপির উপর পাগড়ি পরে আমাদের নিকট আসলেন। আমরা দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন : থাম। আমি একা, আর আপনারা একদল। আমি আপনাদের সালাম দিব, আর আপনারা আমার সালামের জবাব দিবেন। একথা বলে তিনি সালাম দিলেন, আর আমরা তাঁর সালামের জবাব দিলাম। আমরা তাঁর বাহনের পশু হাজির করলাম, কিন্তু তিনি তাতে চড়লেন না। আমরা সকলে তাঁর সাথে হেঁটে মসজিদে গেলাম। তারপর তিনি মিম্বরে উঠে এমন এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন যে, ডানে-বাঁয়ে সকল দিকের সকল মানুষ কাঁদতে আরম্ভ করে। তারপর তিনি ভাষণ শেষ করে নেমে পড়েন। রাজা ইবন হায়ওয়া তাঁর নিকটে গিয়ে বলেন : আমীরুল মু'মিনীন এমন ভাষণ দিয়েছেন যে, লোকদের অন্তর বিগলিত হয়ে গেছে এবং তাদেরকে কাঁদিয়ে ছেড়েছেন। আর এমন সময় কথা বন্ধ করেছেন যখন তারা তা শুনতে আরো আগ্রহী হয়েছে। 'উমার বললেন : রাজা'! আমি অহঙ্কার একেবারেই পছন্দ করিনে।[৪৬৪]

শিষ্টাচারিতা, বুদ্ধিমত্তা ও উদারতা

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যৌবনের সূচনা পর্ব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন ক্ষমতাধর শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করেন। তবে সব সময় একজন বিচক্ষণ, বিনম্র ও ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাবের মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। একবার একজন খারিজী সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিককে সমালোচনা ও নিন্দামন্দ করে। এই অপরাধে সুলায়মান লোকটিকে হত্যা করান। তবে হত্যার পূর্বে যখন তিনি 'উমারের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন তখন তিনি বলেন : "আপনিও তার সমালোচনা ও নিন্দামন্দ করুন।"[৪৬৫]

সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের জীবদ্দশায় তো তিনি এই পরামর্শ দেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তিনি নিজে যখন খলীফা হলেন তখন তা বাস্তবায়নের সময় আসে।

সুতরাং একবার আঞ্চলিক কর্মকর্তা আবদুল হামীদ তাঁকে লিখে জানালেন, আমার এজলাসে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই অপরাধের মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে যে, সে আপনাকে গালি দেয়। আমি তার শিরচ্ছেদের ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু পরে তাকে এই ভেবে কারারুদ্ধ করেছি যে, এ ব্যাপারে আপনার মতামতটি জেনে নিই। জবাবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয লিখলেন, যদি তুমি তাকে হত্যা করতে তাহলে আমি তোমার থেকে কিসাস নিতাম। অর্থাৎ বিনিময়ে তোমাকে হত্যা করতাম। একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা) ছাড়া আর কাউকে কেউ গালি দিলে তাকে হত্যা করা যায় না। এ কারণে তুমি ইচ্ছা করলে তাকে গালি দিতে পার, অন্যথায় তাকে মুক্তি দাও।[৪৬৬]

---

৪৬৪. প্রাগুক্ত-২/৪৩৩; ৪/৯২-৯৩
৪৬৫. ইবনুল জাওযী-৩৯
৪৬৬. তাবাকাত-৫/৩৭২

একবার তিনি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন। এক ব্যক্তি বলে উঠলো, আমি যদি সাক্ষ্য দিই যে, আপনি একজন ফাসিক মানুষ। একথা শুনে শুধু এতটুকু বলেন যে, তুমি একজন মিথ্যাবাদী সাক্ষী। আমি তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করিনে।

একবার জনৈক ব্যক্তি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে একটি অসংগত কথা বলে। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। লোকেরা বললো, আপনি চুপ করে আছেন কেন? বললেন, তাকওয়া আমার মুখে লাগাম লাগিয়ে দিয়েছে। একবার এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁকে বলে, সে আপনাকে গালি দেয়। তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। লোকটি আবার বললো। তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নেন। তৃতীয়বার বললে তিনি বলেন, 'উমার তাকে এমন ঢিল দিচ্ছে যে, সে তা জানতেই পারে না।

একবার তিনি বাহনের পিঠে সোয়ার হয়ে কোথাও যাচ্ছেন। এক ব্যক্তি সোয়ারীর সামনে পড়ে গেল। সে রাগের সাথে বলে উঠলো : তুমি দেখতে পাও না? যখন সব সোয়ারীগুলো পার হয়ে গেল তখন লোকটি বলে উঠলো : এমন কেউ কি আছে যে তার বাহনের পিঠে আমাকে উঠিয়ে নিতে পারে? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর দাসকে নির্দেশ দিলেন তাঁকে তার বাহনের পিঠে উঠিয়ে 'খাছমিয়া' পর্যন্ত পৌঁছে দিতে।

একদিন রাতে তিনি মসজিদে গেলেন। এক ব্যক্তি শুয়ে ছিল। অন্ধকারে লোকটির পায়ের সাথে ঠোকর খেলেন। লোকটি উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো : তুমি কি পাগল! তিনি শুধু বললেন : না। তবে সাথে থাকা চাকরটি লোকটির এমন অমার্জিত আচরণের জন্য শাস্তি দিতে চাইলো। কিন্তু 'উমার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, সে তো শুধু আমার কাছে জানতে চেয়েছে, আমি পাগল কিনা। আমি তার জবাবে বলেছি, না।

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে ভীষণ কটু কথা বলে। তিনি বললেন, তুমি চাচ্ছো যে, আমি রাষ্ট্রক্ষমতার অহঙ্কারে তোমার সাথে এমন আচরণ করি যা তুমি কিয়ামতের দিন আমার সাথে করবে। একথা বলে তাকে ক্ষমা করে দেন।

একদিন তিনি দুপুরের বিশ্রামের জন্য উঠছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি কাগজের একটি বাণ্ডিল হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো এবং বাণ্ডিলটি তাঁর দিকে ছুড়ে দিল। তিনি মুখ ফিরিয়ে সেদিকে তাকাতেই বাণ্ডিলটি তাঁর মুখে এসে পড়লো। এতে তিনি মুখে চোট পেলেন এবং রক্তও বের হলো। তিনি একটুও উত্তেজিত না হয়ে তার আবেদন পত্রটি পাঠ করলেন এবং তার প্রয়োজন পূরণের নির্দেশ দিলেন।

একবার প্রতিবেশীর এক ছেলে তাঁর এক ছেলেকে মারে। লোকেরা ছেলেটিকে ধরে তাঁর স্ত্রী ফাতিমার নিকট নিয়ে আসে। 'উমার তখন অন্য একটি কক্ষে ছিলেন। হৈ চৈ শুনে বেরিয়ে আসেন। এ সময় একজন মহিলা এসে বলে, এ আমার ছেলে এবং পিতৃহীন ইয়াতীম। 'উমার তাকে জিজ্ঞেস করেন, এই ইয়াতীম ছেলে কি ভাতা পায়? সে বলে : না। তিনি সেই ছেলেটির নাম ভাতাপ্রাপ্ত শিশুদের তালিকায় লিখে নেওয়ার নির্দেশ দেন। স্ত্রী ফাতিমা তখন বলেন : যদি আমার ছেলেকে সে আবারও না মারে তাহলে আল্লাহ তাঁর সাথে যেন এমন আচরণ করেন। তিনি বললেন : তুমি তো তাকে ভয় পাইয়ে দিলে।

একবার তিনি এক ব্যক্তির উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং তার শরীর থেকে কাপড় খুলে চাবুক লাগাতে চাইলেন। কিন্তু চাবুক লাগানোর সময় তাকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, যদি আমি ক্রুদ্ধ অবস্থায় না থাকতাম তাহলে তাকে শাস্তি দিতাম। তারপর এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. (آل عمران : ١٣٤)

'এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।'[৪৬৭]

ধৈর্য ও সহনশীলতা

একটা সময়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের উপর হঠাৎ করে যেন বিপদ-আপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর সর্বাধিক প্রিয় তিন ব্যক্তি অল্প দিনের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করে। তারা হলো পুত্র আবদুল মালিক, ভাই সাহ্‌ল ইবন 'আবদিল 'আযীয এবং অতি বিশ্বস্ত খাদেম মুযাহিম। এ সময় তিনি কেবল ধৈর্য ধারণই করেননি, বরং যে দৃঢ়তা অবলম্বন করেন তা দেখে লোকেরা অবাক হয়ে যায়। তিনি যখন পুত্র আবদুল মালিকের দাফন কাজে ব্যস্ত তখন এক ব্যক্তি বাম হাতে ইঙ্গিত করে বলে, আল্লাহ্ আমীরুল মু'মিনীনকে তাঁর এই ধৈর্যের বদলা দিন। তিনি লোকটির ভুল শুধরে দিয়ে বলেন, কথার মধ্যে বাম হাতে ইঙ্গিত করবে না, ডান হাতে করবে। লোকটি মন্তব্য করে : আমি আজকের মত এত বিস্ময়কর ঘটনা আর দেখিনি। একজন মানুষ তার সর্বাধিক প্রিয় সন্তানকে দাফন করছে, অথচ সে সময়ও তার ডান-বাম হাতের কথাও স্মরণ আছে।

উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুর পর মানুষ সমবেদনামূলক যত কথা বলেছে, তিনি জবাবে কেবল ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। একবার রাবী' ইবন সুবরা তাঁর কাছে আসেন এবং বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা আপনাকে অশেষ প্রতিদান দিন। আমি এমন কোন ব্যক্তি দেখি না যার উপর মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে এত সব মুসীবত আপতিত হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি আপনার পুত্রের মত কোন পুত্র, আপনার ভাইয়ের মত কোন ভাই এবং আপনার চাকরের মত কোন চাকর আর কখনো দেখিনি। একথা শুনে 'উমার মাথা নীচু করে ফেলেন। রাবী'র পাশে আরেক ব্যক্তি বসা ছিল। সে বললো, আপনি তো আমীরুল মু'মিনীনকে অস্থির করে ফেললেন। একথা শুনে 'উমার মাথা উঁচু করলেন এবং বললেন : রাবী'! তুমি কি বললে? রাবী' তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি বললেন : সেই সত্তার শপথ! যিনি তাদের মৃত্যুর ফয়সালা করেছেন। এ আমার পছন্দ নয় যে, এসব ঘটনা না ঘটতো। আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তিনি যে ভাষণটি দেন তাতে বলেন, জন্মের পর থেকে সে ছিল আমার অন্তরের সন্তুষ্টি ও চোখের প্রশান্তি। কিন্তু আজকের মত এত প্রশান্তি আর কখনো অনুভব করিনি। তারপর তিনি মাতম ও শোক পালন না করার নির্দেশ জারী করেন।[৪৬৮]

---

৪৬৭. ইবনুল জাওযী : ১৭৬-১৭৮
৪৬৮. প্রাগুক্ত : ২৬৪-২৬৫

সততা ও আমানতদারী

একজন খলীফার জিম্মাদারীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আমানতটি আসে তা হলো 'বায়তুল মাল' বা সরকারী অর্থ ভাণ্ডার। এ কারণে তার সততার মাপকাঠি এটাকেই নির্ধারণ করা যায়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা প্রমাণ করে যে, এই মাপকাঠির নিরিখে তাঁর সততার পাল্লা সর্বদাই ভারী থেকেছে।

তিনি বায়তুল মালের বাতি জ্বালিয়ে খিলাফতের কাজ করতেন। কিন্তু যখন ব্যক্তিগত কাজ করার প্রয়োজন হতো তখন সরকারী বাতি নিভিয়ে দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত বাতিটি জ্বালিয়ে নিতেন।[৪৬৯]

ফুরাত ইবন মাসলাম প্রতি জুমাবারে তাঁর সামনে সরকারী কাগজপত্র উপস্থাপন করতো। একদিন কাগজপত্র উপস্থাপন করা হলো। তিনি সেই কাগজ থেকে এক বিঘৎ পরিমাণ সাদা কাগজ নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গ্রহণ করেন। যেহেতু তাঁর সততা ও আমানতদারীর কথা ফুরাতের জানা ছিল। এ কারণে তিনি মনে করলেন, হয়তো আমীরুল মু'মিনীন ভুল করে ফেলেছেন। পরের দিন খলীফা ফুরাতকে কাগজপত্রসহ ডেকে পাঠালেন। তিনি আনলেন এবং তাঁকে অন্য আরেকটি কাজে কোথাও পাঠালেন। তিনি ফিরে এলে খলীফা বললেন, আমি এখনো তোমার কাগজগুলো দেখতে পারিনি। এখন নিয়ে যাও, আমি তোমাকে ডেকে পাঠাবো। তিনি বাড়ীতে গিয়ে কাগজপত্রগুলো খুলে দেখতে পান যে, আগের দিন তিনি যে পরিমাণ কাগজ নিয়েছেন, ঠিক সেই পরিমাণ কাগজ এতে রেখে দিয়েছেন।

বায়তুল মালের অর্থ দিয়ে গরীব-মিসকীন ও সরকারী অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হতো। কখনো তিনি এর কোন সুবিধা গ্রহণ করতেন না, তেমনিভাবে তাঁর পরিবার তথা খান্দানের কাউকে এর সুবিধা ভোগ করতে দিতেন না। নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, এই অতিথি আপ্যায়নশালার পাকঘর থেকে যেন তাঁর ওজু-গোসলের পানি গরম করা না হয়। একবার তাঁর অজ্ঞাতে চাকর এক মাস সেখান থেকে ওজুর পানি গরম করে। তিনি জানতে পেরে সমপরিমাণ জ্বালানী কাঠ কিনে সরকারী পাকঘরে জমা করান। আরেকবার সরকারী কয়লায় গরম করা পানি দিয়ে ওজু করতে অস্বীকৃতি জানান। একবার চাকরকে এক টুকরো গোশ্‌ত ভুনে আনতে বলেন। সে সরকারী পাকঘর থেকে ভুনে আনলে বলেন, ওটা তুমি খাও। তোমার ভাগ্যে লেখা ছিল, আমার ভাগ্যে নয়।[৪৭০]

তাঁর এমন অবস্থা দেখে লোকেরা বললো, যদি আপনি এমনিভাবে সরকারী পাক ঘরের খাবার পরিহার করতে থাকেন তাহলে অন্যরাও পরিহার করতে থাকবে। একথার পর তিনি খাবারের মূল্য বায়তুল মালে জমা করে অতিথিদের সাথে আহারে অংশগ্রহণ করতে থাকেন।

---

৪৬৯. তাবাকাত-৫/৩৯৫
৪৭০. প্রাগুক্ত-৫/৩৮৪-৩৮৫

একবার তিনি চাকর মুযাহিমকে বললেন, আমার জন্য একটি রিহ্ল (কুরআন শরীফ রেখে পাঠের জন্য বিশেষভাবে তৈরি কাঠের মঞ্চ) কিনে আন। সে একটি রিহ্ল নিয়ে আসলো। তাঁর ভীষণ পছন্দ হলো। জানতে চাইলেন, কোথা থেকে এনেছো? সে বললো, সরকারী গুদামে এই কাঠটি পেয়েছি এবং তা দিয়ে রিহ্লটি তৈরি করেছি। বললেন, বাজারে যাও এবং এর কত দাম হয় দেখ। সে রিহ্লটি নিয়ে বাজারে গেল এবং আধা দীনার দাম উঠলো। সে ফিরে এসে জানালো। তিনি বললেন, তোমার মত কি? আমি যদি বায়তুল মালে এক দীনার জমা করি তাহলে কি দায়মুক্তি হবে? সে বললো, দাম তো আধা দীনার, এক দীনার দেবেন কেন। বললেন, বায়তুল মালে দুই দীনার জমা করে দাও।[৪৭১]

তিনি কখনো সরকারী জিনিস-পত্র নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন না। একবার তাঁর এক দাস সরকারী ডাকবাহী ঘোড়ার পিঠে এক ব্যক্তিকে বহন করে। তিনি তা অবগত হয়ে তাদেরকে ডেকে এই বহনের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে তা বায়তুল মালে জমা দানের নির্দেশ দেন।[৪৭২]

عن طلحة بن يحيى أن عمر بن عبد العزيز كان يبرد فحمل مولى له رجلا على البريد بغير اذنه فدعاه فقال لاتبرح حتى تقومه ثم تجعله في بيت المال.

'তালহা ইবন ইয়াহইয়া বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের জন্য ডাক পরিবহন করা হতো। একবার তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর এক দাস ডাকবাহী পশুর পিঠে এক ব্যক্তিকে বহন করে। তিনি জানতে পেরে তাকে ডাকেন এবং বলেন, এই বহনের জন্য ভাড়া নির্ধারণ করে তা বায়তুল মালে জমা না দিয়ে এখান থেকে যেতে পারবে না।'

একবার বায়তুল মাল থেকে মিশ্ক বের করে তাঁর সামনে রাখা হয়। এর সুগন্ধি তাঁর মস্তিষ্কে ঢুকে যেতে পারে এ ভয়ে সাথে সাথে নাক বন্ধ করে ফেলেন। তাঁর পাশে বসা এক ব্যক্তি বললো, সুগন্ধির একটু ঘ্রাণ নিলে এমনকি ক্ষতি হতো? বললেন, মিশ্ক কেবল সুগন্ধির জন্য ছাড়া আর কি জন্য খরীদ করা হয়?[৪৭৩]

একবার এক ব্যক্তি তাঁর জন্য বেশ কিছু খেজুর পাঠালো। লোকেরা খেজুর সামনে এনে রাখলো। জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে আনা হলো? বলা হলো, সরকারী ডাকের ঘোড়ার পিঠে। তিনি সমস্ত খেজুর বাজারে নিয়ে বিক্রী করার নির্দেশ দিলেন। খেজুর বাজারে আনা হলে মারওয়ান বংশের জনৈক ব্যক্তি তা ক্রয় করে এবং পরে তা উপহার হিসেবে 'উমারের নিকট পাঠায়। খেজুর সামনে আনা হলে বললেন, এতো পূর্বের সেই খেজুর। একথা বলে নিজে খাওয়ার জন্য কিছু সামনে রেখে দিয়ে অবশিষ্ট খেজুর পরিবারের জন্য পাঠিয়ে দেন। তবে খেজুরের মূল্য নিজে বায়তুল মালে জমা দেন।

---

৪৭১. প্রাগুক্ত-৫/৩৭০
৪৭২. কিতাবুল খারাজ-১৮৬
৪৭৩. ইবনুল জাওযী-১৬২

একবার অনেক সরকারী আপেল আসলো। তিনি জনগণের মধ্যে বণ্টন করছেন। এমন সময় তাঁর ছোট্ট একটা বাচ্চা দৌড়ে এসে একটি আপেল উঠিয়ে নিয়ে কামড় বসিয়ে দিল। তিনি মা'সূম বাচ্চাটির মুখ থেকে ফলটি কেড়ে নিলেন। বাচ্চাটি কান্না শুরু করে দিল এবং মার কাছে গিয়ে অভিযোগ করলো। মা বাজার থেকে আপেল আনিয়ে সন্তানের হাতে দিয়ে তাকে শান্ত করেন। আপেল বণ্টন শেষে তিনি ঘরে এসে আপেলের ঘ্রাণ পেলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন : ফাতিমা! কোন সরকারী আপেল তোমার কাছে এসে পড়েনি তো? স্ত্রী ঘটনা খুলে বললেন। তিনি তখন একজন অপরাধীর সুরে বললেন :

"আল্লাহর কসম! আমি ওর মুখ থেকে কেড়ে নিইনি, বরং আমি যেন আমার অন্তর থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম। তবে আমার মোটেই মনঃপূত ছিল না যে, আমি মুসলিম জনগণের অংশের একটি আপেলের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট নিজেকে একেবারেই ধ্বংস করে দিই।[৪৭৪]

লেবাননের মধু তাঁর খুব প্রিয় ছিল। একবার তিনি কথা প্রসঙ্গে সেই মধু খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। স্ত্রী ফাতিমা স্বামীর ইচ্ছা পূরণের জন্য লেবাননের ওয়ালী ইবন মা'দিকারিবকে বিষয়টি জানালেন। তিনি অনেক মধু পাঠিয়ে দিলেন। ফাতিমা সেই মধুর কিছু অংশ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) সামনে উপস্থাপন করলেন। তিনি মধু দেখে বললেন, মনে হচ্ছে তুমি ইবন মা'দিকারিবকে মধু পাঠাতে বলেছিলে এবং তিনিই পাঠিয়েছেন। এরপর তিনি সব মধু বিক্রী করে তার অর্থ বায়তুল মালে জমা করে দেন। ইবন মা'দিকারিবকেও লেখেন : তুমি ফাতিমার কথামত মধু পাঠিয়েছো। ভবিষ্যতে যদি আর কখনো এমন কর তাহলে তোমার এই পদে থাকার অধিকার হারাবে। তোমার চেহারাও আর আমি দেখবো না।[৪৭৫]

একবার তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর জন্য কিছু দুধের প্রয়োজন পড়লো। দাসী একটি পেয়ালায় করে কিছু দুধ আনলো সরকারী মেহমানখানা থেকে। ফেরার পথে 'উমারের সামনে পড়ে গেল। তিনি পেয়ালায় কি তা জানতে চাইলেন। দাসী বললো : বেগম সাহেবার জন্য দুধের প্রয়োজন ছিল। যদি এ সময় তাঁকে দুধ না দেওয়া হয় তাহলে গর্ভপাতের আশঙ্কা আছে। এজন্য এই দুধটুকু সরকারী মেহমানখানা থেকে নিয়ে এসেছি।

একথা শুনে তিনি দাসীর হাতটি ধরে চিল্লাতে চিল্লাতে বেগমের নিকট টেনে নিয়ে আসেন এবং বলেন : যদি গর্ভস্থ সন্তান ফকীর-মিসকীনদের খাবার ছাড়া আর কোন কিছুতে গর্ভে না থাকে তাহলে আল্লাহ যেন তাকে না রাখে। স্বামীর এমন অসন্তুষ্টি দেখে স্ত্রী সে দুধ ফেরত পাঠান।[৪৭৬]

খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর হাদিয়া-তোহফা লেনদেন একেবারেই বন্ধ করে

---

৪৭৪. প্রাগুক্ত

৪৭৫. প্রাগুক্ত-১৫৮

৪৭৬. তাবাকাত-৫/৩৭৯

দেন। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে কিছু আপেল ও আরো কিছু ফল হাদিয়া পাঠায়, তিনি তা ফেরত পাঠান। প্রেরক তাঁকে বললেন, হাদিয়া তো রাসূলুল্লাহ (সা)ও গ্রহণ করতেন। জবাবে তিনি বললেন : যা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য হাদিয়া তা আমাদের জন্য ও আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য ঘুষ।[৪৭৭]

একবার তাঁর ছোট্ট মেয়ে মতির একটা দানা পিতার নিকট পাঠিয়ে দিয়ে এরকম আরেকটি দানা পাঠাতে বললো। যাতে দুটো দিয়ে কানের এক জোড়া গহনা করতে পারে। তিনি মেয়ের নিকট আগুনের দু'টি অঙ্গার পাঠিয়ের দেন এবং সেই সাথে একথাও বলে দেন যে, যদি তুমি এই অঙ্গার কানে ধারণ করতে পার তাহলে আমি তোমার জন্য মতির জোড়া পাঠিয়ে দেব।[৪৭৮]

পূর্ববর্তী খলীফাগণ খুনাসিরাতে বহু ভবন নির্মাণ করেন। যেহেতু এগুলো বায়তুল মালের অর্থে নির্মিত হয়েছিল, এ কারণে যখন 'উমার সেখানে যান তখন ঐ সকল ভবনে না উঠে খোলা মাঠে তাঁবু টানিয়ে অবস্থান করেন।[৪৭৯]

সাহসী ও স্বাধীনচেতা

খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পূর্বে যদিও তিনি সর্বদা অন্য খলীফাদের অধীনস্থ ও প্রভাবাধীনে ছিলেন তথাপি খলীফাদের সামনে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা বজায় রাখেন। খলীফা ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক তাঁকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) প্রত্যাহার করতে বলেন। তিনি স্পষ্টভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা একই সাথে আপনাদের দু'জনের বাই'আত করেছি। এজন্য এখন এ কেমন করে সম্ভব যে, তার বাই'আত প্রত্যাহার করে আপনার বাই'আত বহাল রাখি?

একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ও খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের দাসদের মধ্যে মারামারি হয়। 'উমার গেছেন সুলায়মানের নিকট। সুলায়মান তাঁকে বললেন, এ কেমন কথা যে, আপনার দাসেরা আমার দাসদের মারলো? 'উমার বললেন, আপনার বলার পূর্বে আমি এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই শুনিনি। সুলায়মান বললেন, আপনি মিথ্যা বলছেন। 'উমার বললেন, আপনি বলছেন যে, আমি মিথ্যা বলছি। অথচ আমার বুদ্ধি-বিবেক হওয়ার পর থেকে আমি কখনো মিথ্যা বলিনি। আল্লাহর যমীন প্রশস্ত যা আপনার সাহচর্য থেকে আমাকে মুখাপেক্ষীহীন করতে পারে। একথা বলে তিনি খলীফা সুলায়মানের দরবার থেকে উঠে চলে যান এবং মিসরে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। অবশেষে সুলায়মান তাকে ডেকে মিটমাট করে নেন।

একবার খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের নিকট তাঁর পুত্র আইউব বসে

---

৪৭৭. ইবনুল জাওযী-১৬০
৪৭৮. সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-১৬৩
৪৭৯. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩৬৮

ছিলেন। এই আইউবকে তিনি পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। এ সময় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয আসেন। এক ব্যক্তি কোন এক খলীফার বেগমদের উত্তরাধিকার দাবী করে। সুলায়মান বললেন, মহিলারা অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় না। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এমন কথা শুনে অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে বললেন, সুবহানাল্লাহ! কুরআন মাজীদ কোথায়? সুলায়মান চাকরকে ডেকে বললেন, এ ব্যাপারে খলীফা আবদুল মালিক যে অসীয়াত নামা লিখে গেছেন সেটি নিয়ে এসো। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একটু বিদ্রূপের সুরে বলেন, মনে হচ্ছে আপনি কুরআন আনতে বলছেন। আইউব এ বিদ্রূপাত্মক কথা শুনে বললো, আমীরুল মু'মিনীনের মজলিসে বসে যদি কেউ এমন কথা বলে তাহলে তার ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা উচিত। সাথে সাথে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বলেন, তুমি যদি খলীফা হও তাহলে সাধারণ মানুষ এর চাইতেও বেশী কষ্ট পাবে। খলীফা সুলায়মান দু'জনের কথার মধ্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং আইউবকে তিরস্কার করে বলেন, 'উমারকে তুমি এমন অশোভন কথা বললে? 'উমার নমনীয় কণ্ঠে বললেন, আমিও তো তাকে কঠিন কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

তাঁর এমন সাহস ও স্বাধীনচিত্ততার ফলাফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, তিনি অবলীলায় খলীফাদেরকে সব রকমের নৈতিক উপদেশ দিতেন এবং তাঁদের কোন ধরনের অসন্তুষ্টিকে মোটেই পরোয়া করতেন না। একবার তিনি খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানকে একটি চিঠিতে লেখেন :

"আপনি একজন রাখাল মাত্র এবং প্রত্যেক রাখালকে তার পশুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। আনাস ইবন মালিক (রা) আমাকে একটি হাদীছ শুনিয়েছেন। হাদীছটি তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছেন। এক আল্লাহ তোমাদের সকলকে কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন। আল্লাহর চাইতে বেশী সত্যভাষী আর কে হতে পারে?"

একবার খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযও সঙ্গে ছিলেন। 'আসফান নামক স্থানের কাছাকাছি পৌঁছে খলীফা তাঁর লোক-লস্কর, তাঁবু ও সাজ-সরঞ্জাম দেখে বিস্ময় ও আত্মঅহমিকার ঘোরে 'উমারকে জিজ্ঞেস করেন, এসব জিনিস তুমি কোন দৃষ্টিতে দেখছো? 'উমার বললেন, আমার মনে হচ্ছে, দুনিয়া দুনিয়াকে ভক্ষণ করছে। এ ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আরাফাতে অবস্থানকালে বৃষ্টির সাথে বিদ্যুৎও চমকাতে থাকে। সুলায়মান ভয়ে জড়সড় হয়ে উটের পিঠে হাওদার মধ্যে মাথা নীচু করে বসে থাকেন। তাঁর এমন বেহাল অবস্থা দেখে 'উমার বলেন, এ বৃষ্টি তো আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হিসেবে এসেছে। যদি তাঁর গজব ও শাস্তি হিসেবে আসতো তাহলে আপনার অবস্থা কেমন হতো?

আরেকবার এক মরুভূমিতে এ রকম একটি ঘটনার অবতারণা হয়। খলীফা সুলায়মান এতই ভয় পেয়ে গেলেন যে, তিনি এক লাখ দিরহাম গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য 'উমারের হাতে তুলে দিলেন। যাতে দানের বরকতে বজ্র-বিদ্যুতের বিপদ

দূর হয়ে যায়। 'উমার তাঁকে বললেন, এর চাইতেও ভালো একটি কাজ আছে। সুলায়মান জানতে চাইলেন, সেটি কী? কিছু লোকের জবর-দখলকৃত বিষয়-সম্পত্তি আপনার নিকট আছে। তারা আপনার সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু এখনো পৌঁছাতে পারেনি। তাদের সেই সব জিনিস ফিরিয়ে দিন। সুলায়মান সকল বিষয়-সম্পত্তি ফেরত দেন।[৪৮০]

গাম্ভীর্য

গাম্ভীর্য ও স্বচ্ছতার কারণে কোন রকম শোর-গোল, হৈ চৈ মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার এক ব্যক্তি তাঁর সামনে উঁচুস্বরে কথা বললে তিনি তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, কথা এতটুকু জোরে বলাই যথেষ্ট যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি তা শুনতে পায়।

কোন রকম হাস্য-রসিকতা তাঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না। একবার 'উমাইয়া খান্দানের কিছু লোক তাঁর মজলিসে সমবেত হয় এবং হাস্য-রসিকতামূলক কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করে। তিনি বিরক্ত হয়ে বলেন, তোমরা কি এজন্য সমবেত হয়েছো? হয় কুরআন কারীম সম্পর্কে আলোচনা কর, নয়তো কম সে কম ভদ্রোচিত আলোচনা কর।'[৪৮১]

দেহের যে সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গের নাম উচ্চারণ করতে লজ্জা পেতেন, উচ্চারণ করতেন না। একবার তাঁর বগলে একটা ফোঁড়া বের হয়। লোকেরা জানতে চাইলো ফোঁড়াটি কোথায় বের হয়েছে। যেহেতু বগল কথাটি উচ্চারণ করা পসন্দ করতেন না, এ কারণে কথাটি এভাবে বলেন : আমার হাতের অভ্যন্তরে।

একবার এক মজলিসে জনৈক ব্যক্তির মুখ থেকে বের হয় : "তোমার বগলের নীচে"– কথাটি। সাথে সাথে তিনি বলেন, এর চেয়ে মার্জিত ভাষায় কেন কথা বলো না? লোকেরা বললো, সেই মার্জিত ভাষাটি কি? তিনি বললেন, "হাতের নীচে" বলাই উত্তম ছিল।[৪৮২]

দয়া-মমতা

দয়া-মমতায় ভরা অত্যন্ত নরম মনের মানুষ ছিলেন। একবার এক বেদুঈন মন গলানো ভাষায় নিজের প্রয়োজনের কথা উপস্থাপন করে, তাতে তিনি এতই প্রভাবিত হন যে, কেঁদে ফেলেন। তাঁর এ দয়া-মমতা কেবল মানুষের ক্ষেত্রে সীমিত ছিল না, বরং জীব-জন্তুকেও কোন রকম কষ্ট দেওয়া সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর একটি অতিরিক্ত খচ্চর ছিল। চাকর সেটি ভাড়ায় খাটাতো। প্রতিদিন সাধারণতঃ এক দিরহাম আয় হতো। চাকরটি একদিন দেড় দিরহাম নিয়ে আসে। তিনি এই অতিরিক্ত অর্থ কিভাবে হলো তা জানতে চাইলেন। চাকরটি বললো, আজ বাহনের চাহিদা ছিল অন্য দিনের তুলনায়

---

৪৮০. 'আবদুস সালাম নাদবী-৭৭
৪৮১. ইবনুল জাওযী-৬৩
৪৮২. প্রাগুক্ত-৬৪

বেশী। এ জবাবে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি ধারণা করলেন, চাকরটি তাকে বেশী খাটিয়েছে। তাই তিনি পশুটিকে তিন দিন বিশ্রামে রাখার নির্দেশ দিলেন।[৪৮৩]

ডাক পরিবহণের পশুর ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ ছিল যে, চাবুকের আগায় সূঁচালো লোহা এবং পশুর মুখে ভারী লাগাম লাগানো যাবে না।

عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يجعل البريد فى طرف السوط حديدة ينخس بها الدابة. ونهى عن اللجم الثقال.

"উবাইদুল্লাহ ইবন 'উমার বলেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয পশুকে খোঁচা দেওয়া যায় এমন লোহার ফলা লাগানো চাবুকে ডাক বহন করতে নিষেধ করেছেন। ভারী লাগাম লাগাতেও নিষেধ করেছেন।[৪৮৪]

মিসরের ওয়ালী হায়্যানকে লেখেন : আমি জেনেছি, মিসরে ভারবাহী উটের পিঠে এক হাজার রতল ওজনের বোঝা চাপানো হয়। আমার এ পত্র পৌঁছার পর আমি যেন জানতে না পারি যে, কোন উটের পিঠে ছয় শো রতলের বেশী বোঝা চাপানো হয়েছে।[৪৮৫]

লজ্জা-শরম : তাঁর স্বভাবে ছিল অতিমাত্রায় লজ্জা-শরম। হাম্মামে প্রবেশের সময় তাঁর বিশেষ চাকর-বাকর ও শিশুদের ছাড়া আর কারো সেখানে যাওয়ার অনুমতি ছিল না।

তাঁর নিকট মানুষের মর্যাদা

তিনি একজন দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ, আল্লাহভীরু, পবিত্র আত্মা, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু, বুদ্ধিমান, দৃঢ় সংকল্প ইত্যাদি গুণসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর যাবতীয় কর্ম তৎপরতার মূল চেতনা ছিল মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব, কল্যাণ চিন্তা, সর্বোপরি মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা। দেশের একজন অতি সাধারণ মানুষের দুঃখ, কষ্টেও তিনি কাতর হয়ে পড়তেন এবং তা দূর করার যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করতেন। তাঁর জীবন-ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা দেখা যায় যাতে তাঁর মহত্ব ও তীব্র মানবতাবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি প্রায়ই বলতেন :[৪৮৬]

وما رفق عبد بعبد فى الدنيا، إلا رفق الله به يوم القيامة.

'দুনিয়াতে কোন মানুষ কোন মানুষের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি দেখালে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতিও দয়া ও সহানুভূতি দেখাবেন।'

একবার কা'বার হাজেব তথা রক্ষণা-বেক্ষণকারীগণ কা'বার গিলাফের জন্য খলীফার নিকট আবেদন জানালেন। পূর্ববর্তী খলীফাগণের সময় থেকে গিলাফ দানের নিয়ম চলে আসছিল। জবাবে 'উমার লিখলেন :[৪৮৭]

---

৪৮৩. প্রাগুক্ত-৭৯
৪৮৪. কিতাবুল খারাজ-১৮৬
৪৮৫. সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-১৬৬
৪৮৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২০১-২০২
৪৮৭. হিলয়াতুল আওলিয়া-৫/৩০৬; ইবনুল জাওযী-৯৪

إني رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة، فإنهم أولى بذلك من البيت.

'আমি মনে করেছি ঐ গিলাফ ক্ষুধার্তদের কলিজায় লাগাবো। কারণ, ঘরের চেয়ে তারাই তা পাওয়ার অধিক উপযুক্ত।'

এই মহান খলীফার বিবেচনায় মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কা'বা ঘর তো মানুষের জন্য। সেই মানুষ যদি অনাহারে মারা যায় তাহলে সেই ঘর আবাদ করবে কে? মানুষ যদি সুস্থ-সবলভাবে বেঁচে থাকে তাহলে কা'বা ঘরের জৌলুষও বাড়াবে।

রোমানদের সাথে মুসলমানদের বহু বছর যাবত যুদ্ধ হয়। এ সকল যুদ্ধে উভয়পক্ষের সৈনিক প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হতো। আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট মুসলমানের জীবন, সুখ-শান্তি ও মর্যাদা এত বেশী প্রাধান্যযোগ্য ছিল যে, একবার মাত্র একজন মুসলিম বন্দীর মুক্তির বিনিময়ে দশ হাজার রোমান সৈনিককে মুক্তি দেন।[৪৮৮] অপর একটি ঘটনায় একজন মুসলমান বন্দীকে এক লাখ দিরহাম মুক্তি পণ দিয়ে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করেন।[৪৮৯] তিনি খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মকর্তাদের লেখেন :[৪৯০]

أن فادوا بأسارى المسلمين، وإن أحاط ذلك بجميع مالهم.

'মুক্তি পণ দিয়ে মুসলমান বন্দীদের মুক্ত করুন, তাতে যদি সকল সম্পদও ব্যয় হয় তাতেও পরোয়া করবেন না।'

কনস্টান্টিনোপল অভিযানের সময় বহু মুসলিম সৈনিক রোমানদের হাতে বন্দী হয়। তাদের বন্দী জীবনের কষ্টের কথা চিন্তা করে 'উমার ভীষণ কাতর হয়ে পড়তেন। মাঝে মধ্যে পত্র লিখে বন্দীদের খোঁজ-খবর নিতেন, তাদেরকে সাহস দিতেন ও সমবেদনা জানাতেন। কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধ বন্দীদের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর একটি পত্র নিম্নরূপ :[৪৯১]

أما بعد : فإنكم تعدون أنفسكم أسارى، ولستم أسارى، معاذ الله! أنتم الحبساء في سبيل الله!! واعلموا أني لست أقسم شيئا بين رعيتي إلا خصصت أهلكم بأوفر ذلك وأطيبه. وقد بعثت إليكم خمسة دنانير، خمسة دنانير، لولا أني خشيت إن زدتكم أن يحبسه عنكم طاغية الروم، لزدتكم. وقد بعثت إليكم فلان إبن فلان يغادى صغيركم وكبيركم، ذكركم وأنثاكم، حركم ومملوككم، بما يسأل، فأبشروا ثم أبشروا.

'অতঃপর এই যে, তোমরা হয়তো নিজেদেরকে যুদ্ধবন্দী মনে করছো, আসলে তোমরা

৪৮৮. তাবাকাত-৫/৩৫৪
৪৮৯. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/২২
৪৯০. ইবনুল জাওযী-১২০
৪৯১. কিতাবুল আসানী-৯/৩০৪

যুদ্ধবন্দী নও। আল্লাহর পানাহ্ চাই! আসলে তোমরা আল্লাহর পথে নিজেদেরকে অবরুদ্ধকারী। তোমরা জেনে রাখ, আমি আমার জনগণের মধ্যে কোন কিছু বণ্টন করলে তোমাদের পরিবারবর্গকে বেশী পরিমাণে এবং ভালো জিনিসটি দিয়ে থাকি। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য পাঁচ দীনার করে পাঠালাম, বেশী পাঠালে রোমানরা আটকে দেবে, এ ভয় আমার না থাকলে আমি আরো বেশী করে পাঠাতাম। আমি তোমাদের নিকট অমুকের ছেলে অমুককে পাঠালাম। সে তাদের দাবী মত তোমাদের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-দাস প্রত্যেকের মুক্তি পণ আদায় করবে। তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমাদের জন্য সুসংবাদ।'

জা'উনা ইবন আল-হারিছকে তিনি 'মালতিয়া'র শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। জা'উনা সেখানে একটি যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে বহু ছাগল-ভেড়া লাভ করেন। অভিযান শেষে তিনি নিজ পুত্রকে এ সংবাদসহ আমীরুল মু'মিনীন 'উমারের নিকট পাঠান। যথাসময়ে সে দিমাশ্কে পৌঁছে এবং খলীফাকে অভিযান সম্পর্কে অবহিত করে। খলীফা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : মুসলমানদের কেউ নিহত হয়েছে কি? এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে বলে সে জানালো। খলীফা অত্যন্ত দুঃখের সাথে এক ব্যক্তি, এক ব্যক্তি,- একথাটি দু'বার উচ্চারণ করলেন। তুমি একজন মুসলমানের বিনিময়ে ছাগল-গরু প্রাপ্তির সংবাদ নিয়ে এসেছো? আমার জীবদ্দশায় তোমরা বাপ-বেটা দু'জনের কেউই আর কোন দায়িত্ব পাবে না।[৪৯২]

একবার তিনি রোমান সম্রাটের নিকট পাঠানো দূতের মারফত জানতে পারলেন যে, একজন মুসলমান বন্দীকে রোমানরা ভীষণ অপমান করেছে। তারা সেই বন্দীর দ্বারা আটা পেষা ও রুটি বানানোর কাজ করাচ্ছে। সংগে সংগে তিনি রোমান সম্রাটকে লেখেন :[৪৯৩]

أما بعد : فقد بلغني خبر فلان بن فلان وأنا أقسم بالله، لئن لم ترسله إلى، لأبعثن إليك من الجنود جنودا يكون أولها عندك، وآخرهم عندى!

'অতঃপর এই যে, আমি অমুকের বিষয়ে অবগত হয়েছি। (তারপর সেই ব্যক্তির পরিচয় দেন) আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, যদি তাকে আমার নিকট ফেরত না পাঠান তাহলে আপনার বিরুদ্ধে এমন এক বিশাল বাহিনী পাঠাবো যার প্রথম সৈনিকটি থাকবে আপনার নিকট, আর শেষ সৈনিকটি থাকবে আমার নিকট।' খলীফার এ পত্র রোমান সম্রাট পাঠ করার পর বললেন : আমরা এই সৎ লোকটিকে এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি না। এই ব্যক্তিকে আমরা তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেব।'

উল্লেখিত ঘটনার অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ইতিহাসে দেখা যায়। আর তা হলো, যে সকল সৈনিক কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেছিল তাদের মধ্য থেকে একজন দুঃসাহসী লড়াকু

---

৪৯২. হিলয়াতুল আওলিয়া-৫/৩৩৪
৪৯৩. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৩২৫

Contents

সৈনিক রোমানদের হাতে বন্দী হয়। আমীরুল মু'মিনীন জানতে পারলেন, তাকে রোমান সম্রাটের সামনে হাজির করা হয় এবং সম্রাট তাকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য প্রবল চাপ প্রয়োগ করেন। আর সৈনিকটি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে আল্লাহদ্রোহী সম্রাট তার দু'টি চোখ উপড়ে ফেলার নির্দেশ দেন।

খবরটি 'উমারের কানে পৌঁছালো। সাথে সাথে তিনি সম্রাটকে এই সংক্ষিপ্ত পত্রটি লিখলেন :[৪৯৪]

أما بعد : فقد بلغني ماصنعت باسيرك فلان، وانى أقسم بالله، لئن لم ترسله إلى من فورك لأبعثن إليك من الجند مايكون أولهم عندك وآخرهم عندى.

অতঃপর এই যে, আপনি আপনার অমুক বন্দীর সাথে যে আচরণ করেছেন, তা আমার কানে পৌঁছেছে। আমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করেছি, যদি আপনি তাকে এই মুহূর্তে আমার নিকট পাঠিয়ে না দেন তাহলে এমন এক বিশাল বাহিনী পাঠাবো যার প্রথম দিক থাকবে আপনার নিকট, আর শেষ দিক থাকবে আমার নিকট।'

'উমারের এই ধমক খেয়ে রোমান সম্রাট ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিলম্ব না করে সেই মুসলমান বন্দীকে মুক্তি দিয়ে স্বদেশে পাঠিয়ে দেন।

উপদেশ গ্রহণ

আত্ম-অহমিকা শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিবর্গকে সব সময় উপদেশ গ্রহণ থেকে বিরত রাখে কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের অন্তরটি ছিল ভীষণ কোমল। তিনি বিশ্বাস করতেন, খিলাফতের বোঝাটি এমন যে, যদি তা সততার সাথে বহনের ইচ্ছে থাকে, তবে তা একা বহন করা সম্ভব না। এজন্য তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট উপদেশ চাইতেন। তাঁদের উপদেশ শুনে দারুণ প্রভাবিত হতেন। একবার তিনি ইমাম হাসান আল-বসরীকে (রহ) লেখেন যে, আমাকে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ লিখে পাঠান। জবাবে তিনি কিছু উপদেশ লিখেও পাঠান।

একবার তিনি ইরাকের সকল ফকীহ্‌কে এ উদ্দেশ্যে ডেকে পাঠান। তাঁরা উপস্থিত হলেন। কেবল ইমাম হাসান আল-বসরী (রহ) অসুস্থতার কথা বলে অনুপস্থিত থাকেন এবং উপদেশমূলক কিছু কথা লিখে পাঠান। লেখাটি পেয়ে 'উমার সেটি নিজের দু'চোখের উপর রাখেন। তারপর তা পাঠ করে এত প্রভাবিত হন যে, তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর একদিন বিখ্যাত তাবি'ঈ সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ও মুহাম্মাদ ইবন কা'ব (রহ) দেখা করতে আসলেন। খলীফা একের পর এক দু'জনের নিকট কিছু উপদেশমূলক কথা শোনার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। তাঁরা কিছু উপদেশমূলক কথা শোনালেন। তিনি এতই প্রভাবিত হলেন যে, কেঁদে ফেললেন। কোন কোন 'আলিম

---

৪৯৪. প্রাগুক্ত-৩২৬

Contents

তাঁর নিকট যেতেন এবং নিজেরাই তাঁকে কিছু উপদেশ বাণী শোনানোর ইচ্ছে ব্যক্ত করতেন। তিনি খুশী মনে অনুমতি দিতেন এবং তাঁরা উপদেশমূলক কথা শোনাতেন। একবার ইবন আহ্তাম তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন, আপনাকে আমি একটু খুশী করবো। বললেন, না। বরং উপদেশমূলক কথা শোনান। একথার পর ইবন আহ্তাম একটি সাধারণ ভাষণ দেন এবং তাতে বিশেষভাবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে সম্বোধন করেন। তৎকালীন 'আলিমগণ তাঁকে যে সকল উপদেশমূলক কথা বলেছেন তা সবই 'আল্লামা ইবনুল জাওযী তাঁর "সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয" গ্রন্থে ২১তম অধ্যায়ে সংকলন করেছেন।

দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ভাব ও আধ্যাত্মিকতা

খিলাফত ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক পর্যন্ত পৌঁছে রোমান কায়সার ও পারস্যের কিস্রার রূপ ধারণ করেছিল। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে খোদ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযও তেমন জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। তাঁর সেই সময়কার জীবন সম্পর্কে আল্লামা যাহাবী (রহ) তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ গ্রন্থে লিখেছেন :

كان إذ ذاك لايذكر بكثير عدل ولازهد.

"সেই সময় তিনি আদল-ইনসাফে এবং যুহ্দ তথা দুনিয়ার প্রতি নির্মোহভাবে তেমন কোন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না।"

মদীনার ওয়ালীর নিয়োগ লাভের পর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সেখানে যাত্রা কালে ৩০টি উট বোঝাই করে নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যান।

রাজা' ইবন হায়ওয়া বলেন :[৪৯৫]

كان عمر بن عبد العزيز من أعطر الناس وأخيلهم في مشيته، فلما استخلف قوموا ثيابه اثني عشر درهما : كمته وعمامته وقميصه وقباءه وقرطفه ورداءه وخفيه.

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন সর্বাধিক সুগন্ধ ব্যবহারকারী ব্যক্তি, চলনে ছিলেন সর্বাধিক অহঙ্কারী। তিনি যখন খলীফা হলেন তখন লোকেরা টুপি, পাগড়ী, জামা, লম্বা আস্তিন বিশিষ্ট ঢিলেঢালা কাবা, চাদর, মোজাসহ তাঁর ব্যবহৃত সকল পোশাকের মূল্য নির্ধারণ করে দেখলেন তা মোট বার দিরহাম হয়।'

সীরাতে ইবন 'আবদিল হাকামে (পৃ.-২১) বলা হয়েছে যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন 'উমাইয়্যাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী বিলাসী ব্যক্তি। যে রাস্তায় চলতেন সেখানে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়তো। তাঁর অহঙ্কারধর্মী চলনের নাম "উমারী চলন" নামে পরিচিতি লাভ করে। মেয়েরাও তাঁর সৌন্দর্য চর্চা ও চলনের অনুকরণ করতো। তবে

---

৪৯৫. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৯

খলীফা হওয়ার পর সবকিছু ত্যাগ করেন, কিন্তু আগের সেই বিশেষ ভঙ্গির চলন ত্যাগ করতে পারেননি। তাঁর লুঙ্গি এতখানি ঝুলানো থাকতো যে, জুতোর মধ্যে ঢুকে যেত, কাঁধ থেকে চাদর ঝুলে পড়ে যেত, কিন্তু উঠাতেন না। কালির পরিবর্তে আম্বর দিয়ে সীলের ছাপ মারতেন। তাঁর সুগন্ধিতে এক প্রকার বিশেষ রং মিশানো হতো এবং দাড়িতে লবণের দানার মত আম্বর চক্চক্ করতো। রায়্যাহ ইবন 'উবায়দা বলেন, মদীনার শাসনকর্তা থাকাকালীন তিনি একবার আমাকে একটি জামা কিনতে বলেন। আমি দশ দীনার দিয়ে একটি জামা কিনে আনলাম। তিনি জামাটি স্পর্শ করে বললেন, এটি খসখসে মনে হচ্ছে। তিনি নিজের বিলাসী জীবন যাপনের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন :[৪৯৬]

ثم تاقت نفسي... إلى اللبس والعيش والطيب فمـا علمـت أن أحـدا مـن أهـل بيتـي ولاغيرهم كان في مثل ماكنت فيه.

"অতঃপর আমার মধ্যে পোশাক, সুগন্ধি ও বিলাসী জীবন যাপনের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমার খান্দানের বা অন্য খান্দানের কেউ আমার মত বিলাসী জীবন যাপন করেছে বলে আমার জানা নেই।"

পোশাকের ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেছেন, আমার কোন নতুন কাপড়ের প্রতি একবার কোন মানুষের দৃষ্টি পড়লে আমি সেটাকে পুরানো হয়ে গেছে বলে মনে করতাম। কিন্তু এমন বিলাসী ও রুচিবান ব্যক্তি খলীফা হওয়ার সাথে সাথে হঠাৎ করে পাল্টে গেলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, আর এখন হয়ে গেলেন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব, হাসান আল-বসরী ও ইমাম আয-যুহ্রী (রা)। আল্লামা যাহাবী তাঁর খিলাফতপূর্ব জীবন আলোচনার পর লিখেছেন :[৪৯৭]

ولكن تجدد له لـما استخلف وقلبه الله فصار بعد في حسن السـيرة والقيـام بالقسـط مع جده لأمه عمرو في الزهد مع الحسن البصرى وفي العلم الزهرى.

"কিন্তু তিনি যখন খলীফা হলেন তখন আল্লাহ্ তাঁকে নতুনরূপে রূপান্তরিত করেন। এখন তিনি 'আদল-ইনসাফে নানা 'উমার ইবন আল-খাত্তাব, দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ ও নির্মোহ স্বভাবে হাসান আল-বসরী ও জ্ঞান-গরিমায় ইমাম যুহ্রীর মত হয়ে যান।"

রায়্যাহ ইবন 'উবায়দা যিনি দশ দীনার দিয়ে একটি জামা কিনে তাঁর সামনে রেখেছিলেন এবং তিনি সেটা স্পর্শ করে বলেছিলেন এটা অমসৃণ ও খসখসে, তিনি বলেন : খলীফা হওয়ার পর তাঁর জন্য মাত্র আট দিরহাম দিয়ে একটি জামা কিনে আনা হলে তিনি তা দেখে বলেন, এতো খুবই কোমল।[৪৯৮]

---

৪৯৬. ইবনুল জাওযী : ১৫০-১৫১
৪৯৭. 'আবদুস সালাম নাদবী-৮১
৪৯৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/১৭০

তিনি বলেছেন, আমার অন্তর সুগন্ধি ও পোশাকের আসক্ত হলো, তখন আমি এ ব্যাপারে আমার গোটা খান্দানের উপর বিজয়ী হলাম। কিন্তু তারপর তাঁর নিজের বর্ণনা এই যে, আমার অন্তর আখিরাতের প্রতি ঝুঁকলো এবং এখন আমি দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে ধ্বংস করতে চাইনে।

'উমারের চাচাতো ভাই ও শ্যালক মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক একদিন একটি মিশরীয় কোমল রেশমী চাদর গায়ে জড়িয়ে 'উমারের নিকট গেলেন। চাদরটি দেখে 'উমার জিজ্ঞেস করলেন : আবূ সা'ঈদ! এটা কত দিয়ে কিনেছো? মাসলামা দাম বললেন। 'উমার বললেন : যদি একটি কম দামের চাদর কিনতে তাতে তোমার সম্মান কি কিছু কমে যেত? মাসলামা বললেন : না। 'উমার বললেন : যদি এর চেয়ে বেশী দামের একটি চাদর কিনতে তাতে কি তোমার মর্যাদা একটু বেড়ে যেত? মাসলামা বললেন : না। তখন 'উমার বললেন :[৪৯৯]

اعلم يا مسلمة! أن أفضل الاقتصاد ما كان بعد الجدة، وأفضل العفو ما كان بعد القدرة، وأفضل اللين ما كان بعد الولاية.

'ওহে মাসলামা! জেনে রেখ, প্রাচুর্যের মধ্যে যে মিতব্যয়িতা, তাই সর্বোত্তম মিতব্যয়িতা, শক্তি ও ক্ষমতা থাকা অবস্থায় ক্ষমা, সর্বোত্তম ক্ষমা এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কোমল হওয়া, সর্বোত্তম কোমলতা।'

খলীফা পূর্ববর্তী জীবনে তাঁর সৌখিনতা ও পরিচ্ছন্ন রুচির অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর পরিধেয় পোশাকের প্রতি কারো একবার দৃষ্টি পড়লে তিনি তা পুরানো হয়ে গেছে বলে মনে করতেন। রাজা' ইবন হায়ওয়া বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধানকারী, সবচেয়ে বেশী সুগন্ধি ব্যবহারকারী এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে চলাচলকারী ছিলেন। তিনি কোন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে অনেক্ষণ পর্যন্ত তা সুগন্ধে মোহিত থাকতো। পরিবেশই বলে দিত এ পথ দিয়ে 'উমার গেছেন। তাঁর বিশেষ মডেলের চলন-বলন 'উমারী চলন-বলন' নামে পরিচিত ছিল। যুবকরা তা অনুকরণ করার চেষ্টা করতো।

ইউনুস ইবন হাবীব তাঁকে খলীফা হওয়ার পূর্বে যখন দেখেন তখন তাঁর পেটে চর্বি জমা ছিল, তিনিই বলেছেন, খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর যদি আমি চাইতাম তাহলে তাঁকে স্পর্শ করা ছাড়াই তাঁর পাঁজরের হাঁড়গুলো গুনতে পারতাম।[৫০০]

প্রকৃত সত্য এই যে, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যখন বাদশাহ ছিলেন না তখন ছিলেন সবচাইতে বড় বাদশাহ। আর যখন খিলাফতের মুকুট মাথায় ধারণ করলেন তখন হয়ে গেলেন একজন বড় রাহিব বা দুনিয়া বিরাগী মানুষ। দাস-দাসী, সুগন্ধি, পোশাক এবং যাবতীয় বিলাসদ্রব্য ৩৩ (তেত্রিশ) হাজার দীনারে বিক্রী করে আল্লাহর রাস্তায় দান

---

৪৯৯. প্রাগুক্ত-৪/৪৩৫; কিতাবুল আমালী-২/২৮২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২০১-২০২
৫০০. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৯

করে দেন।[৫০১] অতএব আস্তাবলের তত্ত্বাবধায়ক যখন এসে ঘোড়ার খোরাকী ও রাখালদের বেতন-ভাতা চাইলো তিনি তাদেরকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন সেগুলো বিক্রী করে সেই অর্থ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বন্টন করার জন্য। দাস-দাসীদের বেতন-ভাতার প্রশ্ন দেখা দিল। তিনি তাদেরকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অন্ধ, আতুড়, খঞ্জ ও ইয়াতীমদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।[৫০২]

পোশাক-পরিচ্ছদ : অতি সাধারণ ছিল তাঁর পোশাক, তাতে অনেক তালি। একবার জামার গলার দিকে সামনে-পিছনে উভয় পাশে তালি লাগানো ছিল। সেই অবস্থায় জুম'আর নামায আদায় করে বসে আছেন। তখন এক ব্যক্তি বললো, আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ আপনাকে সবকিছু দিয়েছেন। যদি আপনি একটু ভালো পোশাক পরতেন! একথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে থাকেন। তারপর মাথা সোজা করে বলেন, অর্থ-বিত্তের মালিক থাকা অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং ক্ষমতার অধিকারী থাকা অবস্থায় ক্ষমা ও উপেক্ষা করা উত্তম।

অধিকাংশ সময় তাঁর দেহে একটি মাত্র কাপড় থাকতো। আর সেটাই বার বার ধুয়ে পরতেন। মায়মূন ইবন মিহ্রান বলেন, তিনি একটি চাদর ছয় মাস পর্যন্ত পাল্টাননি। প্রত্যেক জুম'আর দিন সেটা ধুয়ে আবার পরতেন। প্রতিবার ধোয়ার পর তাতে জাফরানের রং দেওয়া হতো। এক জুম'আর দিনে তিনি একটু দেরীতে মসজিদে গেলেন। এক ব্যক্তি দেরী হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলো। বললেন, চাকর কাপড় ধোয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। ঐ কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় নেই।[৫০৩]

মুসলিম নামক জনৈক ব্যক্তি বলেন : আমি একদিন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট গেলাম। তখন তাঁর নিকট তাঁর সেক্রেটারী বসা ছিলেন। সামনে একটি বাতি জ্বলছিল, সেই আলোতে মুসলমানদের বিষয় সংক্রান্ত একটি ফাইল দেখছিলেন। লোকটি বেরিয়ে গেলে বাতিটি নিভিয়ে দেওয়া হলো। তারপর আরেকটি বাতি এনে 'উমারের নিকট রাখা হলো। আমি তাঁর আরো নিকটে গেলাম। দেখলাম তাঁর গায়ের জামাটির দু'কাঁধের মাঝখানে তালি দেওয়া। এ অবস্থায় তিনি আমার বিষয়টি দেখলেন।[৫০৪]

শামের একজন সম্মানিত ব্যক্তি বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয মৃত্যুর পূর্বে তাঁর এক দাসের নিকট একটি পাত্র জমা রাখেন। এরপর তিনি মারা যান। কথাটি জানাজানি হয়ে গেল। বানু উমাইয়ার লোকেরা মনে করলো, হয়তো তার মধ্যে মূল্যবান ধন-সম্পদ রয়েছে। তারা দাসটির নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলো : 'উমার কি একটি পাত্র তোমার নিকট গচ্ছিত রেখেছেন? সে বললো : হাঁ, তবে তাতে তোমাদের খুশী হওয়ার মত কিছু নেই। তারা এ কথায় খুশী হতে পারলো না। বিষয়টি খলীফা ইয়াযীদ ইবন আবদিল

---

৫০১. তাবাকাত-৫/৩৫৪
৫০২. ইবনুল জাওযী : ১০০-১০২
৫০৩. প্রাগুক্ত : ১৫৪-১৫৬, তাবাকাত-৫/৩৯৬
৫০৪. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৮; আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৬২

মালিককে জানানো হলো। তিনি পাত্রটি আনালেন এবং বানু উমাইয়ার লোকদেরও ডাকলেন। অবশেষে তাদের উপস্থিতিতে পাত্রটি খোলা হলো। দেখা গেল, তাতে রয়েছে কিছু পুরানো কাপড়ের টুকরো যা তিনি রাতে পরতেন।[৫০৫]

পোশাক বলতে সাধারণতঃ তাঁর এক জোড়া কাপড়ই ছিল। একটি ধুইয়ে আরেকটি পরতেন। তিনি যখন অন্তিম রোগ শয্যায় তখন তাঁর একটি মাত্র জামা ছাড়া আর কোন জামা ছিল না। শ্যালক মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক এসে দেখলেন, শয্যাশায়ী খলীফার গায়ের জামাটি ময়লা হয়ে গেছে। বোন ফাতিমাকে বললেন, জামাটি ময়লা হয়ে গেছে, লোকজন সাক্ষাতের জন্য আসছে, তুমি জামাটি পাল্টিয়ে দাও। ফাতিমা চুপ করে থাকলেন। মাসলামা আবারও একই কথা বললেন। এবার ফাতিমা বললেন : আল্লাহর কসম! এই জামাটি ছাড়া তাঁর অন্য কোন কাপড় নেই।[৫০৬] এক জোড়া কাপড়ও সবসময় ভালো থাকতো না, ছিঁড়ে গেলে তালি লাগানো হতো। তাঁর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও নিতান্ত দারিদ্র্যর মধ্যে জীবন কাটাতো। একবার এক ছেলের কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় চাইলেন। তিনি বললেন : খিয়ার ইবন রিবাহ-এর নিকট আমার কাপড় রাখা আছে। তার নিকট গিয়ে চেয়ে নাও। ছেলে তাঁর নিকট গেলেন। রিবাহ অত্যন্ত পুরু কাপড় বের করে আনলেন। ছেলে 'উবায়দুল্লাহ তা দেখে বললেন, এতো আমাদের পরার উপযোগী নয়। খিয়ার বললেন, আমার কাছে তো আমীরুল মু'মিনীনের এই কাপড়ই আছে। 'উবায়দুল্লাহ ফিরে গিয়ে পিতাকে একই কথা বললেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বললেন, আমার কাছে তো এই কাপড়ই আছে। একথা শুনে 'উবায়দুল্লাহ যখন ফিরে যাচ্ছে তখন 'উমার ডেকে বললেন, তোমার ভাতা থেকে যদি অগ্রিম নিতে চাও তাহলে নিতে পার। অবশেষে তাকে এক শ' দিরহাম অগ্রিম দেন এবং ভাতা বণ্টনের সময় তা আবার কেটে নেওয়া হয়।

'আলী ইবন জুযাইমা বলেন :[৫০৭]

رأيت عمر بن عبد العزيز في المدينة وهو من أحسن الناس لباسا، ومن أطيب الناس ريحا، ومن أخيل الناس في مشيته. ثم رأيته بعد ذلك يمشي مشية الرهبان.

'আমি মদীনায় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে দেখেছি। তখন তিনি সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধানকারী, সবচেয়ে বেশী সুগন্ধি ব্যবহারকারী এবং সবচেয়ে অভিজাত ভঙ্গিতে চলাচলকারী একজন মানুষ। পরবর্তী জীবনে আমি তাঁকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ একজন রাহিব হিসেবে চলাচল করতে দেখেছি।'

---

৫০৫. সিফাতুস সাফওয়া-২/১২০-১২১
৫০৬. আল-কামিল ফিত তারীখ-৫/৬২
৫০৭. ইবনুল জাওযী-৩২

খাদ্য-খাবার

অতি সাধারণ খাবার খেতেন। পরিমাণেও কম। একবার সকালে বাড়ী থেকে একটু দেরীতে বের হলেন, পরিবারের লোকেরা মনে করলো, তিনি কারো উপর অসন্তুষ্ট হননি তো! ব্যাপারটি বুঝতে পেরে তিনি ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, গত রাতে আমি মসুরি ও ছোলার ডাল খেয়েছিলাম, তাই পেট খারাপ করেছে। বৈঠকে উপস্থিত একজন বললো, আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে বলেছেন :

فكلوا من طيبات مارزقناكم. (البقرة - ١٧٢)

'আমি তোমাদেরকে যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে আহার কর।'

তিনি বললেন, 'আফসোস! তুমি উল্টো অর্থ গ্রহণ করছো। এ আয়াত দ্বারা তো সেই সম্পদকে বুঝানো হয়েছে যা বৈধ পন্থায় উপার্জন করা হয়েছে। ভালো ভালো সুমিষ্ট খাবার নয়।'[৫০৮]

মুহাম্মাদ ইবন যুবাইর আল-হানজালী বলেন, একদিন রাতের বেলা আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট গিয়ে দেখি, তিনি রুটির টুকরা যয়তূনের তেলে ভিজিয়ে খাচ্ছেন।[৫০৯]

একদিন তিনি এক ব্যক্তিকে বাড়ীর ভিতরে ডেকে নিলেন। লোকটি ভিতরে ঢুকে দেখতে পান যে, একটি দস্তরখানের উপর একটি বড় থালা কাপড় দিয়ে ঢাকা রয়েছে। পাশে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয নামায আদায় করছেন। নামায শেষ করে দস্তরখান সামনে টেনে নিয়ে বললেন, এসো, খাও। কোথায় সেই মিসর ও মদীনার জীবন, আর কোথায় বর্তমানের এই জীবন। একথা বলে তিনি কেঁদে দেন। কিছুই খেলেন না।

একবার তাঁর চাকরকে খাবার জন্য ডাল দেওয়া হলে সে আপত্তির সুরে বলে, রোজ রোজ ডাল? বেগম সাহেবা বললেন, তোমার মনীব আমীরুল মু'মিনীনেরও এই একই খাদ্য। কিন্তু এই মামুলী খাবারও তিনি খলীফা হওয়ার পর কখনো পেট ভরে খাননি। তাঁর এক দাস বর্ণনা করেছেন, যেদিন তিনি খলীফা হন সেদিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন দিন পেট ভরে খাননি।[৫১০]

যদি কখনো ভালো কিছু খাওয়ার ইচ্ছাও হতো, জোটানোর সামর্থ্য হতো না। একবার আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছা হলো। স্ত্রী ফাতিমাকে বললেন, তোমার কাছে কি একটি দিরহাম হবে, আঙ্গুর খেতে ইচ্ছা করছে। স্ত্রী একটু ঝাঁঝের সাথে জবাব দিলেন, আমীরুল মু'মিনীন হয়ে একটি দিরহাম সংগ্রহের ক্ষমতা নেই। 'উমার বললেন, জাহান্নামের হাতকড়ার চেয়ে আমার এ অক্ষমতা উত্তম।[৫১১] একবার তিনি তাঁর সন্তানদের সঙ্গে

---

৫০৮. তাবাকাত-৫/৩৭০
৫০৯. প্রাগুক্ত-৫/৩৭৪
৫১০. ইবনুল জাওযী-১৫২
৫১১. তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৫

মিলিত হতে গিয়ে দেখতে পান, যে বাচ্চাই তাঁর সঙ্গে কথা বলছে, সে তার মুখের উপর হাত চাপা দিচ্ছে। কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, আজ তারা সবাই কেবল ডাল ও পিঁয়াজ খেয়েছে। তিনি অশ্রুভেজা চোখে বললেন : তোমরা কি চাও যে, তোমরা নানা রকমের খাবার খাও, আর তোমাদের পিতা জাহান্নামে যাক?" একথা শোনার পর তারাও কেঁদে ফেলে।[৫১২]

তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ এত কমে গিয়েছিল যে, হজ্জ করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা সমাধা করার প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সঙ্গতি তাঁর ছিল না। খাস খাদিমকে, যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুও ছিল, বলেন : তোমার নিকট কিছু আছে কি? সে বললো : দশ-বারো দীনারের মত আছে। তিনি বললেন : এতে কিভাবে হজ্জ সমাধা হতে পারে? এ সময় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ থেকে কিছু অর্থ তাঁর হাতে আসে। তখন খাদিম খলীফাকে মুবারকবাদ জানিয়ে বলেন, হজ্জের খরচ তো এসে গেছে। খলীফা বললেন : আমরা এই বিত্ত-সম্পদ থেকে বহুদিন যাবত উপকৃত হয়েছি। এখন এটা সাধারণ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত। একথা বলে তিনি সেই অর্থ বায়তুল মালে জমা দিয়ে দেন। এটা সেই সময়ের কথা যখন তিনি তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর।

তাঁর স্ত্রী ফাতিমা ছিলেন রাজপরিবারের মেয়ে। তাঁর পিতা আবদুল মালিক, দাদা মারওয়ান, ভাই ওয়ালীদ সবাই ছিলেন বর্ণাঢ্য উমাইয়্যা খলীফা। তাঁর স্বামীও খলীফা; কিন্তু দুনিয়ার প্রতি একেবারেই নিরাসক্ত, দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ। তাই তিনিও স্বামীর রূপ ধারণ করেন, স্বামীর রঙ্গে রঙ্গিন হন। সৌন্দর্য চর্চা ও সাজ-গোজ একেবারেই ছেড়ে দিয়ে অতি সাদামাটা জীবন ধারণ করেন। একবার এক বিত্তশালী ঘরের মহিলা খলীফা-পত্নীর এমন করুণ অবস্থা দেখে এর কারণ জানতে চান। তিনি বলেন, এরূপই আমার স্বামীর পছন্দ।[৫১৩]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দিরহাম নামে এক দাস ছিল। সে তাঁর ব্যক্তিগত কাজ করতো। খলীফা হওয়ার পর একদিন তিনি জানতে চাইলেন : দিরহাম, লোকে এখন কী বলাবলি করে? সে জবাব দিল : কি আর বলবে? মানুষ, সবাই ভালো আছে, আর আমি ও আপনি আছি খুব খারাপের মধ্যে। 'উমার প্রশ্ন করলেন : কিভাবে? বললো : খলীফা হওয়ার পূর্বে আমি আপনাকে দেখেছি, সবচেয়ে দামী সুগন্ধি ব্যবহার করতে, দামী পোশাক পরতে, উন্নত বাহন ব্যবহার করতে এবং ভালো খাবার খেতে। খলীফা হওয়ার পর আমি আশা করেছিলাম এবার একটু আরাম করবো, বিশ্রাম নিব। কিন্তু আমার কাজ এখন বেড়ে গেছে এবং আপনিও একটি বিপদে জড়িয়ে পড়েছেন। 'উমার বললেন : তোমাকে মুক্তি দিলাম। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও। আর আল্লাহ্ আমার মুক্তির একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আমি এর মধ্যেই থাকবো।[৫১৪]

---

৫১২. সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-৫৫

৫১৩. ইবনুল জাওযী-১৫৪

৫১৪. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৫

আবাসস্থল

প্রাসাদ ও অট্টালিকা রাষ্ট্র পরিচালনার অনুষঙ্গ ও অপরিহার্য অংশ। কিন্তু সারা জীবন ব্যক্তিগতভাবে কোন ভবন তৈরি করেননি। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাত এটাই। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, অথচ ইটের উপর ইট এবং কড়িকাঠের উপর কড়িকাঠ রাখেননি। তাঁর ঘরের উপর তলায় একটি কক্ষ ছিল। সেখানে উঠার সিঁড়িতে একটি ইট বেরিয়ে পড়েছিল। উঠা-নামার সময় নড়াচড়া করতো, যে কোন সময় খসে পড়ার শঙ্কা হতো। একদিন তাঁর চাকর কিছু কাদা দিয়ে ইটটি জায়গামত সেঁটে দেন। এরপর তিনি যখন উপরে গেলেন তখন বুঝতে পারলেন ইটটি আর নড়ছে না। ব্যাপারটি কি তা চাকরের নিকট জানতে চাইলে সে ঘটনাটি খুলে বলে। তিনি কাদা ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, আমি আল্লাহর নিকট অঙ্গীকার করেছিলাম, যদি খলীফা হই তাহলে কখনো ইটের উপর ইট রাখবো না।[৫১৫]

পরিবার-পরিজন

বেগম সাহেবা থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। বেগম সাহেবা ফাতিমা বলেন, খলীফা হওয়ার পর কখনো তাঁর জানাবতের গোসলের প্রয়োজন হয়নি। একবার তিনি একজন ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক (ফকীহ)-কে বলে পাঠান যে, আমীরুল মু'মিনীন যা করছেন তা বৈধ নয়। তিনি স্ত্রীর সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখেন না। উক্ত ফকীহ বিষয়টি আমীরুল মু'মিনীনকে জানালেন। তিনি বললেন, যার ঘাড়ে গোটা উম্মাতে মুহাম্মাদীর বোঝা রয়েছে এবং কিয়ামতের দিন যাকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে, সে কিভাবে এসব সম্পর্ক বিদ্যমান রাখতে পারে?

দাসীদেরকে তিনি এ ইয়াখতিয়ার দেন যে, কেউ ইচ্ছা করলে দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে চলে যেতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে থেকেও যেতে পারে। তবে তারা কোন সুবিধা পাবে না। একথা শুনে বাড়ীতে কান্নার রোল পড়ে যায়।[৫১৬]

তাঁর প্রতিদিনের খরচ ছিল মাত্র দু'দিরহাম, কখনো তা বায়তুল মাল থেকে নিতেন না। ব্যক্তিগত আয় যা কিছু ছিল তাও খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর কম হয়ে যায়। কারণ, জবর-দখলকৃত সম্পদ ফেরত দানের ধারাবাহিকতায় তিনি সর্বপ্রথম নিজের সম্পদ ফেরত দেন। যখন তিনি খলীফা হন তখন তাঁর সম্পদ থেকে বার্ষিক আয় হতো পঞ্চাশ হাজার দীনার। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তা নেমে এসে দাঁড়ায় দু' শ' দীনার। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, খলীফা হওয়ার সময় তাঁর সম্পদের আয় ছিল চল্লিশ হাজার দীনার এবং তা নেমে এসে চার হাজার হয়।[৫১৭] এমন অবস্থায় তাঁর পরিবার-পরিজন দারুণ টানাটানির ভিতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতো। একবার 'আবদুল্লাহ ইবন

---

৫১৫. ইবনুল জাওযী-১৫১, ১৫৭
৫১৬. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৫; তাবাকাত-৫/৩৯৩, তারীখ আল-খুলাফা-২৩৭
৫১৭. ইবনুল জাওযী-২৭২; আবদুস সালাম নাদবী-৮৬, টীকা-২

যাকারিয়া তাঁর কাছে যান এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের অভাব-অনটন দেখে অন্তরে ব্যথা পান। তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আপনার কর্মচারী-কর্মকর্তাদেরকে এক শ', দু' শ' করে, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তার চাইতে বেশী মাসিক বেতন-ভাতা দেন। তিনি বললেন, যদি তারা কুরআন-হাদীছ অনুসারে কাজ করে তাহলে এ পরিমাণ খুবই কম। আমি তাদেরকে জীবিকার ধান্দা থেকে বিলকুল মুক্ত রাখতে চাই। তিনি বললেন, যখন এটা বৈধ এবং আপনি তাদের চাইতেও বেশী কাজ করেন তখন আপনিও মাসিক বেতন-ভাতা নিয়ে পরিবার-পরিজনকে স্বাচ্ছন্দ দান করতে পারেন। কারণ তারা খুবই অভাবী। বললেন, তুমি তো আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ এবং আমার ভালোর উদ্দেশ্যে একথা বলছো। তারপর তিনি নিজের ডান হাতটি বাম হাতের উপর রেখে বলেন, কিন্তু এই গোশ্‌তের সবটুক আল্লাহর সম্পদ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমি আল্লাহর এই সম্পদে অন্য কিছু ঢুকিয়ে বৃদ্ধি করতে চাইনে।

একবার ঘরে জীবন ধারণের জন্য কিছুই ছিল না। চাকর মুযাহিম চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন যে, কি ব্যবস্থা করা যায়। অবশেষে বাধ্য হয়ে এক ব্যক্তির নিকট থেকে পাঁচ দীনার ধার নিলেন। অতঃপর খলীফার ইয়ামনের সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ এসে গেল। মুযাহিম অত্যন্ত খুশী মনে মনিবের নিকট গেলেন যে, এখন ধার শোধ করতে পারবেন। ঘরে ঢুকেই মাথায় হাত রেখে– আল্লাহ আমীরুল মু'মিনীনকে প্রতিদান দিন, আল্লাহ আমীরুল মু'মিনীনকে প্রতিদান দিন, এই ব্যক্তিগত অর্থও তিনি বায়তুল মালে জমা দিয়েছেন– একথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।[৫১৮]

সন্তানদেরকে তিনি দারুণ ভালোবাসতেন। কিন্তু সে ভালোবাসার প্রকাশ পার্থিব জাঁক-জমক ও বিলাসী জীবন যাপনের রূপে হতো না। একবার তিনি ঘরে ফিরে অতি আদরের মেয়ে আমীনাকে কাছে ডাকলেন। কিন্তু সে এলো না। তিনি একজনকে পাঠালেন তাকে আনার জন্য। লোকটি গেল এবং তার না আসার কারণ জানতে চাইলো। সে বললো আমার কাছে কাপড় ছিল না। একথা শুনে খলীফা চাকর মুযাহিমকে বিছানার চাদর ছিঁড়ে তার কামিজ বানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। মেয়ের ফুফু উম্মুল বানীন ছিলেন বিত্তশালী মহিলা, এক ব্যক্তি তাঁকে কথাটি জানালে তিনি একখান কাপড় পাঠিয়ে দিয়ে বলে দেন, 'উমারের কাছে কিছুই চাইবে না।

তাঁর সন্তানদের কেউ যদি একটু দামী জিনিস ব্যবহার করতো, তিনি তাদেরকে তা করতে বারণ করতেন। একবার এক ছেলে একটি আংটি বানায় এবং তাতে লাগানোর জন্য এক হাজার দিরহাম দিয়ে একটি পাথর খরীদ করে। তিনি তা জানতে পেরে তাকে লেখেন, আংটিটি বিক্রী করে দাও এবং সেই অর্থ দিয়ে এক হাজার অভুক্ত মানুষকে আহার করাও। আর লোহার একটি আংটি কিনে তার উপর একথাটি খোদাই করে নিবে– আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর দয়া করেন যে নিজের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত।[৫১৯]

---

৫১৮. ইবনুল জাওযী-১৬২, ২৭৫
৫১৯. প্রাগুক্ত-২৭৫

বায়তুল মাল থেকে ভাতা গ্রহণ

দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) খলীফা হিসেবে দৈনিক মাত্র দুই দিরহাম ভাতা গ্রহণ করেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা হলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি 'উমার আল-খাত্তাব (রা) যে পরিমাণ ভাতা নিতেন, তাই নিন। জবাবে তিনি বললেন :[৫২০]

إن عمر بن الخطاب لم يكن له مال وأنا مالي يُغْنِيْنِي.

"উমারের অর্থ-সম্পদ ছিল না, কিন্তু আমার যা সম্পদ আছে তা যথেষ্ট।'

অপর একটি বর্ণনা মতে তিনি বায়তুল মাল থেকে বছরে চার শ' দীনার গ্রহণ করতেন।[৫২১]

দায়িত্বানুভূতি

ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্ব মানুষের মনকে কঠিন এবং জবাবদিহিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভীক করে তোলে। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের অন্তঃকরণকে খোদাভীতিতে পূর্ণ করে দেয়। তিনি খিলাফতের গুরুদায়িত্বের তীব্র অনুভূতিতে সব সময় ভীতিগ্রস্ত থাকতেন। তাঁর নিয়ম ছিল 'ঈশার নামাযের পরে একান্ত নিরিবিলিতে মসজিদে বসে কেঁদে কেঁদে দু'আ করা। এ অবস্থায় ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে যেত। ঘুমের ভাব কেটে গেলে একই রকম দু'আ আরম্ভ করতেন। এভাবে কান্না, দু'আ, জাগা ও ঘুমানোর মধ্য দিয়ে সারা রাত অতিবাহিত হতো।

একদিন তিনি মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য বসলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একাজ অব্যাহত রাখলেন। রাতের একটা অংশে একাজ শেষ করে সরকারী বাতি নিভিয়ে দিয়ে নিজ অর্থে জ্বালানো বাতি আনতে বললেন। দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন। তারপর চিবুকের নীচে একটি হাত রেখে নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকলেন। তখন তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। এভাবে রাত কেটে যায়। তারপর তিনি ফজরের নামাযে দাঁড়িয়ে যান। স্ত্রী ফাতিমা খলীফার এমন আচরণ লক্ষ্য করেন। তিনি বলেন : আমীরুল মু'মিনীন! গত রাতে আপনাকে এমন আচরণ করতে দেখলাম কেন? বললেন : তুমি ঠিকই ধরেছো। এই উম্মাতের যাবতীয় দায়িত্ব আমার কাঁধে। এদের মধ্যে অনেকে আছে নিঃসম্বল প্রবাসী, সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র মানুষ, একান্ত সহায়হীন কয়েদী এবং এ ধরনের আরো অনেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি জানি, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, মুহাম্মাদ (সা) তাদের পক্ষে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করবেন। আমার ভয় হয় সেদিন আমি আল্লাহর নিকট কোন ওজর-আপত্তি উত্থাপন করতে পারবো না এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর সামনেও কোন যুক্তি দাঁড় করাতে সক্ষম হবো না। এ কারণে নিজের ব্যাপারে বড় ভীত-শংকিত হয়ে পড়েছিলাম।[৫২২]

---

৫২০. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/২৭১, ৪৩৪

৫২১. তাবাকাত-৫/৩৯৬; ইবনুল জাওযী-২৭২

৫২২. আল-কামিল ফিত-তারীখ-৫/৬৫; আল-খলীফা আয-যাহিদ-১৭৫

তাঁর এমন অস্থিরতা ও কান্নাকাটি দেখে বন্ধুদের অনেকে তাঁকে তিরস্কার করতেন। জবাবে তিনি বলতেন : তোমরা আমাকে তিরস্কার করছো, অথচ ফুরাতের তীরে একটি ছাগলের বাচ্চাও অহেতুক মারা গেলে তার জন্য 'উমারকে ধরা হবে।[৫২৩]

একবার তিনি সেনা কর্মকর্তা সুলায়মান ইবন আবী কারীমাকে লিখলেন :

"আল্লাহকে সম্মান ও ভয় করার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সেই বান্দার যাকে তিনি আমার মত এই পরীক্ষায় ফেলেছেন। আল্লাহর নিকট আমার চেয়ে বেশী কঠিন হিসাব দানকারী এবং যদি আমি নাফরমানি করি তাহলে আমার চেয়ে বেশী হেয় ও লাঞ্ছিত কেউ হবে না। আমি আমার নিজের অবস্থায় মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যয়গ্রস্ত। আমার ভয় হয়, আমার এ অবস্থা আমাকে ধ্বংস করে না দেয়। আমি জেনেছি, তুমি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-এর উদ্দেশ্যে বের হচ্ছো। আমার প্রিয় ভাই! তুমি জিহাদের ময়দানে পৌঁছে আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে তিনি যেন আমাকে শাহাদাত দান করেন। কারণ, আমার অবস্থা বড় কঠিন এবং বিপদ বড় ভয়াবহ।"[৫২৪]

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে কথা কম বলতেন। সব সময় নীরব ও নিশ্চুপ থাকতেন। সব রকম হাস্য-কৌতুক, রসিকতা ছেড়ে দেন। হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী নিম্নমানের কথা শোনা বর্জন করেন। সোম, বৃহস্পতি, প্রতি মাসের দশ তারিখ, আরাফার দিন ও আশূরাতে সাওম পালন করতেন। সামান্য হলেও প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন। ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে কোন রকম বাড়াবাড়ি করতেন না। তবে যতটুকু করতেন, সব সময় করতেন। তাঁর নামায ছিল হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নামাযের মত।[৫২৫]

মৃত্যু, কিয়ামত ও জাহান্নামের ভয়

পৃথিবীর রাজা-বাদশাদের ইতিহাসে দেখা যায়, তাদের দরবারে ও জলসায় মৃত্যু, কিয়ামত, পরকাল ও আল্লাহভীতির কোন আলোচনা কখনো স্থান পায় না। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মজলিসেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। রাতে তাঁর দরবারে 'আলিম ও 'আবিদ ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটতো। মৃত্যু ও কিয়ামতের আলোচনা করতে করতে তাঁরা কান্নায় এমনভাবে ভেঙ্গে পড়তেন যেমন মৃত ব্যক্তির জন্য মানুষ মাতম করে।[৫২৬]

রাত জেগে তিনি মৃত্যু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। কবরের ভয়াবহতা স্মরণ করে অচেতন হয়ে পড়তেন। একবার তিনি তাঁর এক বৈঠকী বন্ধুকে বললেন, আমি সারা রাত চিন্তা-ভাবনার মধ্যে জেগে রয়েছি। বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন : কোন বিষয়ে? বললেন : কবর

---

৫২৩. ইবনুল জাওযী : ২৯১-২৯২
৫২৪. তাবাকাত-৩৯৩
৫২৫. 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার-১২৬
৫২৬. তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৭

এবং কবরবাসীদের সম্পর্কে। তুমি যদি তিন দিন পর কবরে মৃতদেহ দেখ তাহলে তাদের প্রতি শত স্নেহ-ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তাদের কাছে যেতে ভয় করবে। তুমি এমন একটি ঘর দেখতে পাবে যেখানে সুন্দর সুন্দর পোশাক ও চমৎকার সুগন্ধির পরিবর্তে পোকা কিলবিল করছে, পুঁজ গড়িয়ে পড়ছে, সেই পুঁজে পোকা সাতার কাটছে, পঁচা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে, কাফন ময়লা-নোংরা হয়ে গেছে। এতটুকু বলার পর কান্নায় তাঁর কণ্ঠ রোধ হয়ে যায় এবং তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। স্ত্রী পানির ছিটা দিয়ে হুঁশ ফিরিয়ে আনেন।

একবার জনৈক ব্যক্তি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি একটি জ্বলন্ত চুলোকে সামনে নিয়ে বসে আছেন। লোকটিকে দেখে বললেন : আমাকে কিছু উপদেশ দাও। লোকটি বললো :

يا أمير المؤمنين، ما ينفعك من دخل الجنة إذا دخلت أنت النار؟ وما يضرك من دخل النار إذا دخلت أنت الجنة؟

"হে আমীরুল মু'মিনীন! কে জান্নাতে গেল তাতে আপনার লাভ কি, যদি আপনি নিজে জাহান্নামে যান? আর কে জাহান্নামে গেল তাতে আপনার ক্ষতি কি, যদি আপনি নিজে জান্নাতে যান?" একথা শুনে 'উমার (রহ) এত কাঁদলেন যে, তাঁর চোখের পানিতে সামনে চুলোর আগুন নিভে যায়।[৫২৭]

মায়মূন ইবন মিহরান বলেন : আমি 'উমারের নিকট বসে আছি। হঠাৎ তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন। বললাম : আপনি এভাবে মৃত্যু কামনা করছেন কেন? আল্লাহ তো আপনার দ্বারা অনেক কল্যাণমূলক কাজ করিয়েছেন, অনেক সুন্নত জীবিত এবং বহু বিদ'আত দূর করিয়েছেন। বললেন : আমি কি সেই সত্যনিষ্ঠ বান্দার মত হবো না, আল্লাহ যার চোখে প্রশান্তি এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেন? তারপর তিনি পাঠ করেন :

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ. (يوسف : ١٠١)

'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছো এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছো। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর।'[৫২৮]

ইয়াযীদ ইবন হাওশাব বলেন :[৫২৯]

---

৫২৭. ইবনুল জাওযী : ১০৮-১০৯, ১৮৭

৫২৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৫; 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার-১২৮

৫২৯. সিফাতুস সাফওয়া-৩/১৫৬; তাবাকাত-৫/৩৯৪; রিজালুল ফিকর ওয়াদ দাওয়া-১/৬১

مارأيت أخوفَ من الحسن وعمر بن عبد العزيز! كأن النار لم تخلق إلا لهما.

"আমি হাসান আল-বসরী ও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) চেয়ে বেশী কাউকে কিয়ামতকে ভয় করতে দেখিনি। মনে হতো, দোযখ যেন কেবল তাঁদের দু'জনের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।"

কুরআনের আয়াতের প্রভাব

কুরআন মাজীদের গভীর উপদেশপূর্ণ আয়াত পাঠ করে ভয়ে, উৎকণ্ঠায় দিশেহারা হয়ে পড়তেন। এক রাতে নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করলেন :[৫৩০]

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.

'সেই দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত। তখন যার পাল্লা ভারী হবে, সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন। কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে 'হাবিয়া'।'

তিলাওয়াত শেষে তিনি জোরে চিৎকার দিয়ে বলে ওঠেন– وَاصَبَاحَاه – হায়, অশুভ সকাল! তারপর লাফ দিয়ে মাটিতে এমনভাবে পড়ে যান যে, মনে হচ্ছিল তাঁর প্রাণ বের হয়ে যাবে। অনেকক্ষণ এমন অসার হয়ে পড়ে থাকলেন মনে হলো তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। তারপর আবার জ্ঞান ফিরে পান। অন্য একদিন নামাযে পাঠ করলেন নিম্নের আয়াতটি :[৫৩১]

وَقِفُوْا هُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ.

'অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

আয়াতটি পাঠের পর এতই প্রভাবিত হলেন যে, বারবার পাঠ করতে থাকেন এবং সামনে আর এগুতে পারলেন না।[৫৩২]

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ নির্ভরতা

তাওয়াক্কুল 'আলাল্লাহ বা আল্লাহ নির্ভরতা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে সকল সঙ্কট ও বিপদ-আপদ থেকে বেপরোয়া করে তুলেছিল। একবার বহু মানুষ তাঁকে পরামর্শ দিল যে, খাদ্য-খাবার দেখে-শুনে সতর্কতার সংগে খাবেন, নামায আদায়ের সময় আশে-পাশে নিরাপত্তা রক্ষী রাখবেন যাতে কেউ অতর্কিত আক্রমণ করতে না পারে এবং প্লেগ জাতীয় কোন মহামারী দেখা দিলে পূর্ববর্তী খলীফাদের রীতি ছিল স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সরে যাওয়া, আপনিও তাই করবেন। তাদের কথা শেষ হলে তিনি বললেন,

---

৫৩০. সূরা আল-কারিআ : ৪-৯
৫৩১. সূরা আস-সাফ্ফাত-২৪
৫৩২. ইবনুল জাওযী-১৯১

অবশেষে তাদের পরিণত কি হয়েছে? যখন তারা বেশী পীড়াপীড়ি করতে লাগলো তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি জান, যদি আমি কিয়ামতের দিন ছাড়া আর কোন দিনকে ভয় করি তাহলে আমার ভয়কে প্রশান্তিতে পরিণত করো না।[৫৩৩]

যেহেতু খারিজীদের অতর্কিত আক্রমণ আশঙ্কায় পূর্ববর্তী সকল খলীফার জীবন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছিল, এ কারণে তাঁদের নিরাপত্তার জন্য সর্বক্ষণ বহু প্রহরী নিয়োজিত থাকতো। যার সূচনা করেন হযরত মু'আবিয়া (রা)। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সম্পূর্ণভাবে এই নিরাপত্তা রক্ষীদের পদ বিলুপ্ত না করলেও তিনি তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দেন যে, আমি তোমাদের পাহারার মোটেই মুখাপেক্ষী নই। আল্লাহর তাকদীরই আমার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট। তোমাদের যার ইচ্ছা থাকতে পার, যার ইচ্ছা চলে যেতে পার।

তাকওয়া-পরহিযগারী

কিছু জিনিস এমন আছে যা দৃশ্যতঃ জায়েয মনে হয়; কিন্তু গভীরভাবে দেখলে তাও সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়। ঐসব জিনিসের সাথেই মূলতঃ তাকওয়া-পরহিযগারীর সম্পর্ক। অনেকে এসব জিনিস পরিহার করে চলেন। তবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মধ্যে ঐ গুণটি পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। যদি কখনো অমুসলিম যিম্মীদের মধ্যে অবস্থান করতেন এবং তারা দুধ, তরকারি ইত্যাদি সরবরাহ করতো, তিনি তাদেরকে বাজারের চাইতে বেশী মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করতেন। কেউ মূল্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তিনি সেই সব জিনিস খেতেন না। কিন্তু যদি কোন মুসলমান কোন জিনিস উপহার দিত, তিনি তা মোটেই গ্রহণ করতেন না। একবার তিনি আপেল খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর খান্দানের এক ব্যক্তি উঠে গেল এবং একটি আপেল উপহার হিসেবে পাঠিয়ে দিল। বাহক আপেলটি নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি গ্রহণ করলেন না। তবে ভদ্রতা বশতঃ বললেন, তাকে বলবে আপনার এ উপহার খুবই পছন্দ হয়েছে। লোকটি বললো, এটা তো ঘরের আপেল। আর আপনি তো জানেন রাসূলুল্লাহ (সা) উপহার গ্রহণ করতেন। বললেন, রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য হাদিয়া-উপহার, নিঃসন্দেহে তা হাদিয়া-উপহারই ছিল। কিন্তু আমাদের জন্য তা ঘুষ।[৫৩৪]

নিজ খান্দানের সপক্ষে

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যদিও ধর্মীয়ভাবে নিজ খান্দানের সর্বেসর্বা মর্যাদার দাবীদার হওয়াকে মোটেই সমর্থন করতেন না, তবে নিজ খান্দানের মান-মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে একেবারে উদাসীন ছিলেন না।

একবার বিদ্রোহী খারিজীরা বিতর্ক চলাকালে বললো, যতক্ষণ আপনি আপনার খান্দানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের প্রতি অভিশম্পাত না করবেন, আমরা আপনার আনুগত্য

---

৫৩৩. তাবাকাত-৫/৩৯৪

৫৩৪. ইবনুল জাওযী-৯৮, ১৬০

করবো না। জবাবে তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা কি ফির'আউনের প্রতি অভিশাপ দিয়ে থাক? তারা না সূচক জবাব দিলে তিনি বলেন, যখন তোমরা ফির'আউনকে ক্ষমা করেছো তখন আমি আমার খান্দানের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখবো না কেন? বিশেষতঃ যখন তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ সব ধরনের মানুষ বিদ্যমান?[৫৩৫]

একবার এক ব্যক্তি তাঁর সামনে হযরত মু'আবিয়া (রা)-কে নিন্দামন্দ করলে তিনি তাকে তিনটি চাবুক মারেন। তিনি তাঁর গোটা খিলাফতকালে নিজ হাতে এই তিনটি চাবুকই মারেন।[৫৩৬]

আপনজনদের প্রতি ভালোবাসা

তিনি আপনজন ও নিকট আত্মীয়দের ভীষণ ভালোবাসতেন। তাঁর চাচা 'আবদুল্লাহ ইবন মারওয়ানের মৃত্যু হলে, যদিও তিনি তখন বিলাসী জীবন যাপন করতেন, আয়েশী জীবন ত্যাগ করে অতি সাদামাটা জীবন ধারণ করেন। প্রায় দু'আড়াই মাস এভাবে চলার পর অবশেষে মুহাম্মাদ ইবন কাসিমের অনুরোধে নিজের প্রকৃত অবস্থায় ফিরে আসেন।

পুত্র সন্তানদের মধ্যে আবদুল মালিক ছিলেন তাঁর বেশী প্রিয়। একবার মায়মূন ইবন মাহরানকে তিনি বলেন, আমার পুত্র 'আবদুল মালিক আমার চোখের পুত্তলিতে পরিণত হয়েছে। আমার ভয় হয়, আমার আবেগ আমার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে না ফেলে। আমার ইচ্ছা, আপনি এসে তার শিক্ষা ও জ্ঞানের পরীক্ষা নিন।

শত্রুর সাথে কোমল ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ

শত্রুর সাথে কোমল আচরণ করতে পারে কেবল অতি ভদ্র ও উদার চিত্তের মানুষেরা। 'উমার ছিলেন এ জাতীয় একজন মানুষ। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় খারিজীদের একটি উপদল সব সময় খলীফাদের দুশমন ভেবেছে। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সারা জীবন তাদের সাথে কোমল ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছেন। একবার জনৈক খারিজী ব্যক্তি খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিককে পাপাচারী ও পাপিষ্ঠ পিতার সন্তান বলে গালি দেয়। খলীফা সুলায়মান লোকটিকে কি শাস্তি দেওয়া যায় সে ব্যাপারে 'উমারের পরামর্শ চান। 'উমার বললেন, সে যেমন আপনাকে গালি দিয়েছে আপনিও তাকে কিছু গালি দিতে পারেন।[৫৩৭]

একবার কয়েকজন খারিজী তাঁর নিকট এসে বিতর্ক শুরু করে। 'উমারের সাথে বসা তাঁর এক বন্ধু তাঁকে বললেন, আপনি উত্তেজিত হয়ে তাকে একটু ভয় দেখান। কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও কোমলভাবে তার সাথে আলোচনা করতে থাকেন। অবশেষে তারা একটি বিশেষ শর্তের উপর রাজী হয়ে চলে যায়। তারপর

---

৫৩৫. প্রাগুক্ত-৭৭
৫৩৬. তাবাকাত-৫/৩৮৩
৫৩৭. ইবনুল জাওযী-৩৫, ৩৯, ২৬৩

'উমার তাঁর বন্ধুর হাঁটুতে হাত রেখে বলেন, যদি ঔষধে কাজ হয় তাহলে কাঁটা-ছেঁড়া করা উচিত নয়।[৫৩৮]

খারিজীদের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষের পর্যায় শুরু হলে তিনি কয়েকটি শর্তে তাদের সাথে যুদ্ধের অনুমতি দেন। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

১. নারী, শিশু ও বন্দীদের হত্যা করা যাবে না।

২. আহতদের পিছু ধাওয়া করা যাবে না।

৩. গণীমতের যে সম্পদ হস্তগত হবে তা তাদের পরিবার-পরিজনকে ফেরত দিতে হবে।

৪. সঠিক পথে ফিরে আসা পর্যন্ত বন্দীকে আটক রাখা যাবে।

তাঁর নিকট হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ এত পরিমাণ অভিশপ্ত ছিল যে, তিনি তার গোটা খান্দানকে দেশান্তর করেন। তাছাড়া তাঁর সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন তারা যেন হাজ্জাজের রূপ ধারণ না করে। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁর সামনে রায়্যাহ্ ইবন 'উবাইদা হাজ্জাজকে গালি দেয় তখন তিনি তাকে বারণ করেন। রায়্যাহকে বলেন : যখন কোন মজলুম ব্যক্তি জালিমকে গালি দিয়ে বদলা নেয় তখন জালিম তার উপর মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে যায়।

তাঁর এমন কোমল ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের কথা দুশমনদের সকলের জানা ছিল। এ কারণে তাঁরই নির্দেশে যখন জার্‌রাহ মাখলাদ ইবন ইয়াযীদ ইবন আল-মুহাল্লাবকে বন্দী করেন তখন বন্দী অবস্থায় তার সাথে অত্যধিক কোমল আচরণ করেন। সে খবর 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কানে গেলে তিনি জার্‌রাহকে লেখেন : তুমি তো আল মুহাল্লাবের মা, যে তার জন্য বিছানা বিছিয়ে তার উপর শোয়ায়। তা সত্ত্বেও জার্‌রাহ যখন 'উমারের সামনে উপস্থিত হন তখন তাঁর বিশ্রাম ও আরাম-আয়েশের প্রতি ভীষণ তৎপর হন। অতঃপর মাখলাদ ইবন ইয়াযীদকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি তাঁকে সসম্মানে মুক্তি দেন।[৫৩৯]

দুঃস্থ ও অভাবীদের সাহায্য

যে সকল মানুষ সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হতো 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে তাদের সাহায্য করতেন। তাঁর বৈঠকী সহচর-সঙ্গী হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত নির্ধারণ করেন তার মধ্যে একটি শর্ত ছিল এ রকম : আমার বৈঠকী সহচরদের উচিত হবে, যে সকল মানুষ তাদের অভাব ও প্রয়োজনের কথা আমার কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয় না, তাদের কথা আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া। একবার তাঁর সামনে এক চোরকে আনা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, অভাবের কারণে চুরি করেছে। তিনি তাকে ক্ষমা করেন এবং দশ দিরহাম দানের নির্দেশ দেন।

---

৫৩৮. প্রাগুক্ত-৬৩

৫৩৯. প্রাগুক্ত : ৮৯-৯০, ৯৬

একবার এক বেদুঈন তাঁর নিকট আসে এবং অত্যন্ত মন গলানো ভাষায় নিজের অভাবের কথা জানায়। তার কথা শুনে 'উমার কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে থাকেন। তখন তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। মাথা উঠিয়ে তিনি লোকটির কাছে জানতে চান, তোমার পরিবারে মোট কতজন লোক? সে বলে, আমি এবং আমার আট কন্যা। তিনি বায়তুল মাল থেকে তাদের সবার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে নিজের অর্থ থেকে তার হাতে তুলে দেন একশ' দিরহাম। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ যা খুমুস নামে পরিচিত, বায়তুল মালে জমা হয়। যখন এই খাতের দাসের সংখ্যা বেড়ে যেত তখন তিনি দু'জন পঙ্গুর জন্য একজন এবং একজন অন্ধের সেবার জন্য একজন করে দাস দান করতেন।

নিয়ম ছিল যখন তাঁর কোন ডাক যেত তখন যে কেউ তার চিঠি-পত্র দিলে তা বহন করা হতো। একবার মিসর থেকে একটি ডাক যাত্রা করলো। সেখানকার জনৈক ব্যক্তির দাসী খলীফার নামে একটি চিঠি ডাকে দিল। চিঠিতে সে খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে লিখলো যে, তার বাড়ীর প্রাচীর এত নীচু যে চোর তা ডিঙ্গিয়ে তার মুরগীগুলো চুরি করে নিয়ে যায়। চিঠিটি পেয়ে মিসরের ওয়ালীকে লিখলেন, আমার এ চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে তুমি এই দাসীর বাড়ীতে যাবে এবং প্রাচীরটি উঁচু করে দেবে। দাসীকে আমার এ নির্দেশের কথা জানাবে।[৫৪০]

একবার ইরাক থেকে এক মহিলা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট আসলো। বাড়ীর দরজায় পৌঁছে সে মানুষের নিকট জিজ্ঞেস করলো : আমীরুল মু'মিনীনের বাড়ীতে দারোয়ান নেই? লোকেরা বললো : না। ইচ্ছা করলে ভিতরে ঢুকতে পার। সে ভিতরে বেগম সাহেবা ফাতিমার নিকট গেল। তখন তার হাতে কিছু তুলা, যা দিয়ে তিনি আমীরুল মু'মিনীনের সেবা করে থাকেন। সে সালাম দিয়ে বসলো। তারপর চোখ উঠিয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখে ঘরে কোথাও কোন জিনিস নেই। বললো : আমি এসেছি আমার ঘরকে পূর্ণ করার জন্য এই শূন্য ঘরে? জবাবে ফাতিমা তাকে বললেন : তোমাদের মত মানুষের ঘর পূর্ণ করতে গিয়ে তিনি নিজের ঘর শূন্য করে ফেলেছেন।

তাদের কথার মাঝখানে 'উমার এসে ঢুকলেন। আগন্তুক মহিলার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আপনার কি প্রয়োজন? মহিলা বললো : আমি একজন ইরাকী মহিলা, আমার বিবাহযোগ্য পাঁচটি মেয়ে আছে; কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে তাদের বিয়ে দিতে পারছিনে। তাদের প্রতি আপনার সুদৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমি এসেছি। সাথে সাথে তিনি কালি, কলম ও কাগজ নিয়ে ইরাকের ওয়ালীকে লিখতে বসলেন। তিনি মহিলার নিকট এক এক করে চারজন মেয়ের নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট হারে ভাতা নির্ধারণ করে পত্রটি শেষ করেন। আর ৫ম জনের ব্যাপারে বলেন, চার জনের ভাতা থেকে তার প্রয়োজন পূরণ হবে। মহিলাটি আল্লাহর হামদ ও আমীরুল মু'মিনীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে। অতঃপর পত্রটি নিয়ে সে ইরাকের দিকে যাত্রা করে।[৫৪১]

---

৫৪০. সীরাত ইবন 'আবদিল হাকাম-৫৫, ৬৫
৫৪১. প্রাগুক্ত-১৭৭; আল-খলীফা আয-যাহিদ-১৭৬

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত মহিলা অন্দর মহলে ঢুকে দেখে যে, এক ব্যক্তি গভীর কূপ থেকে বালতি ভরে পানি উঠিয়ে হাঁড়ি-কলস ভরছে, আর বেগম সাহেবা তা তাকিয়ে দেখছেন। মহিলাটি বিস্মিত হয়ে বেগম সাহেবাকে লক্ষ্য করে বলে, আপনি এই বেগানা চাকর-বাকরদের থেকে পর্দা করেন না কেন? বেগম সাহেবা বললেন : এ আমার স্বামী আমীরুল মু'মিনীন। মহিলা হতবাক! জ্ঞান হারানোর উপক্রম হয় তার।

রোগগ্রস্ত মানুষের পাশে বসা ও সান্ত্বনা দেওয়া

সাধারণতঃ রাজা-বাদশা ও আমীর-উমারাগণ খুব কমই প্রাসাদ থেকে বের হন। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয শত্রু-মিত্র কারো অসুস্থতার খবর পেলে দেখার জন্য ছুটে যেতেন। তাদের শয্যা পাশে বসে কুশল জিজ্ঞেস করতেন, সান্ত্বনা দিতেন। একবার আবূ কিলাবা সিরিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে দেখতে যান। তাঁর শয্যা পাশে বসে বলেন, আবূ কিলাবা : তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। মুনাফিকরা যেন আমাদেরকে নিয়ে হাসা-হাসি করার সুযোগ না পায়।

একবার এক ব্যক্তির পুত্র-বিয়োগ ঘটে। তিনি লোকটিকে সান্ত্বনা দানের জন্য যান। লোকটি ছিল দারুণ কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল। তাই লোকেরা লোকটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলাবলি করতে লাগলো যে, এরই নাম সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণ। তিনি সংশোধন করে দিয়ে বললেন, না। এ হচ্ছে সবর বা ধৈর্য।

'উমার ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবার পিতার মৃত্যু হলে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর নিকট শোকবাণী পাঠান। তাতে তিনি লেখেন : আমরা সকলে তো আখিরাতের অধিবাসী, দুনিয়াতে এসে বসবাস করছি। মৃত নারী ও পুরুষের সন্তান। তাহলে এ তো খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার সেই মৃতের জন্য যে আরেকজন মৃতের নিকট চিঠি লিখছে এবং আরেকজন মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করছে।

সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব

হাদীছে এসেছে :[৫৪২]

إذا أحب الله العبد قال لجبرائيل قد أحْبَبْتُ فلانًا فأحبه فيحبه جبرائيل ثم ينادى فى أهل السماء أن الله قد أحب فلانًا فاحبوه فيحبه أهل السماء يضع له القبول فى الأرض.

"আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরীলকে (আ) বলেন, আমি অমুককে ভালোবাসি তোমরাও তাকে ভালোবাস। এ কারণে জিবরীল (আ) তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর তিনি আসমানের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা দেন যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাস। অতঃপর আসমানের

---

৫৪২. যুরকানী, শারহু মুওয়াত্তা-৪/১৭৬

অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে তাকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দান করেন।"

মানুষের প্রীতিভাজন হওয়া এবং গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের সবচেয়ে বড় উপায় এটাই। আদর্শ মানের উত্তম নৈতিকতার বদৌলতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এই মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। একবার হজ্জ মওসুমে তিনি 'আরাফা অতিক্রম করছিলেন, হঠাৎ করে মানুষের দৃষ্টি তাঁর প্রতি গিয়ে পড়ে। সুহায়ল ইবন আবী সালিহ, উপরোক্ত হাদীছের রাবীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ দৃশ্য দেখে নিজের পিতাকে বলেন, আমার বিশ্বাস আল্লাহ 'উমারকে ভালোবাসেন। তিনি পুত্রের এমন বিশ্বাসের কারণ জানতে চাইলেন। সুহায়ল বললেন, মানুষের অন্তরে তাঁর স্থান আছে। তারপর তিনি উপরোক্ত হাদীছ শোনান।

কেবল মুসলিম সম্প্রদায় নয়, বরং আদল ও ইনসাফ দ্বারা তিনি অমুসলিমদের অন্তরকেও জয় করেছিলেন। একবার তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয জাযীরা দিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন খ্রীস্টান পাদ্রী যিনি কখনো তার গীর্জা থেকে বের হন না, 'আবদুল্লাহর আগমনের খবর পেয়ে বেরিয়ে আসেন এবং 'আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি জান আমি কেন আমার গীর্জার একান্ত নিরিবিলি স্থান থেকে বেরিয়ে এসেছি? তিনি বলেন : না। পাদ্রী বললেন : কেবল তোমার পিতার সম্মানে। কারণ, আমরা তাঁকে ন্যায়পরায়ণ শাসকদের মধ্যে পেয়ে থাকি।[৫৪৩]

জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শ শুনতেন

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট একবার ইরাক থেকে একদল লোক আসে। তিনি দেখলেন, তাদের মধ্য থেকে একটি যুবক কথা বলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি যুবকটিকে বললেন, বড়দের বলতে দাও। যুবকটি বললো : হে আমীরুল মু'মিনীন! কথা বলার যোগ্যতা বয়সের দ্বারা হয়না। আর যদি সবকিছু বয়সের দ্বারা হতো তাহলে মুসলমানদের মধ্যে আপনার চেয়ে বেশী বয়সের অনেক লোক আছে। 'উমার বললেন : আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, তুমি সত্য বলেছো। তুমি কথা বল। যুবক বললো : আমরা কোন প্রত্যাশা নিয়ে ও ভীতিসহকারে আপনার নিকট আসিনি। প্রত্যাশা– তা তো আমাদের গৃহে পৌঁছে গেছে, আর ভীতি– তা আল্লাহ আপনার আদল ও ইনসাফের দ্বারা আপনার জুলুম-অত্যাচার থেকে আমাদের নিরাপদ করেছেন। 'উমার জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি উদ্দেশ্যে এসেছো? যুবক বললো : আমরা একটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী প্রতিনিধি দল। সেই মজলিসে উপস্থিত মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাজী 'উমারের মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে দেখেন তা খুশীতে ঝলমল করছে। তিনি বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা যেন কোনভাবে আপনার নিজের সম্পর্কে আপনার জানার উপর বিজয়ী হতে না পারে। প্রশংসা বহু মানুষকে

---

৫৪৩. তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৩

প্রতারিত করেছে এবং মানুষের কৃতজ্ঞতা তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে। অতঃপর তারা ধ্বংস হয়েছে। আপনি তাদের মত না হন এজন্য আমি আল্লাহর পানাহ চাই। একথা শুনে 'উমার তাঁর বুকের উপর মাথা নীচু করে দিলেন।[৫৪৪]

একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয এক ব্যক্তিকে কোন কারণে দণ্ডাদেশ দেন। তখন রাজা' ইবন হায়ওয়া তাঁকে বলেন : আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যে বিজয় ভালোবাসেন তা তো আল্লাহ পূর্ণ করেছেন। এখন তিনি যে ক্ষমা ভালোবাসেন তা পূর্ণ করুন।[৫৪৫]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যখন মদীনার ওয়ালী ছিলেন তখন হযরত সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) তাঁর দরবারে আসা-যাওয়া করতেন। পরবর্তীকালে 'উমার খলীফা হওয়ার পর সালিম ও মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কারাযীকে দরবারে ডেকে পাঠান। তারা উপস্থিত হলে খলীফা বলেন : আপনারা কিছু উপদেশ দিন। সালিম বললেন :

اجعل الناس أباو أخا وابنا، فَبَرَّ أباك واحفظ أخاك وارحم ابنك.

'আপনি মানুষকে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতা জ্ঞান করবেন। তারপর পিতার সেবা ও ভ্রাতার নিরাপত্তা বিধান করবেন। আর পুত্রের প্রতি দয়া ও স্নেহপরায়ণ হবেন।'
মুহাম্মাদ ইবন কা'ব বললেন :

أحبب للناس ماتحب لنفسك واكره لهم ماتكره لنفسك، واعلم أنك لست أول خليفة يموت.

'আপনি নিজের জন্য যা পছন্দ করেন মানুষের জন্যও তাই পছন্দ করুন, নিজের জন্য যা অপছন্দ করেন তাদের জন্যও তা অপছন্দ করুন। আর জেনে রাখুন, আপনিই এ পৃথিবীর মৃত্যুবরণকারী প্রথম খলীফা নন।'[৫৪৬]

যিয়াদ ইবন আবী যিয়াদ আল-মাদীনী বলেন, ইবন 'আমির ইবন আবী রাবী'আ তার এক প্রয়োজনে আমাকে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট পাঠালেন। আমি যখন তাঁর নিকট পৌঁছলাম তখন তাঁর একজন সেক্রেটারী তাঁর পাশে বসে কি যেন লিখছিলেন। আমি সালাম দিলাম এভাবে : আস-সালামু 'আলাইকুম। জবাবে তিনি বললেন : ওয়া 'আলাইকাস সালাম। তারপর আমি সতর্ক হলাম এবং বললাম : আস-সালামু 'আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তিনি বললেন : ইবন আবী যিয়াদ! তুমি প্রথম যেভাবে সালাম দিয়েছিলে তাতে আমি অখুশী হইনি। সেক্রেটারী বসরা থেকে জুলুম-অত্যাচারের যে রিপোর্ট এসেছিল তা পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন : বস। আমি দরজার চৌকাঠের কাছে বসলাম। সেক্রেটারী পড়ছেন, আর 'উমার জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ছেন। রিপোর্ট পাঠ শেষ হলে তিনি সকলকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। তারপর আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার সামনে বসেন এবং তাঁর দু'টি হাত আমার হাঁটুর উপর রেখে বলেন : ওহে ইবন আবী

---

৫৪৪. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৪/১৪০-১৪১

৫৪৫. প্রাগুক্ত-২/১৮৭

৫৪৬. প্রাগুক্ত-১/৪০; তাবি'ঈদের জীবনকথা-১/১২২

যিয়াদ! আমি তোমার গায়ের পশমী 'আবার (জোব্বা) মধ্যে আমার হাতটি রেখে একটু গরম করে নিই। তারপর তিনি মদীনার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সৎ মানুষদের হাল-হাকীকত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কারো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে বাকী রাখলেন না। মদীনার এমন কিছু বিষয় ছিল যা তিনি করতে বলেছিলেন, সে সম্পর্কেও আমি তাঁকে অবহিত করলাম।

এবার তিনি বললেন : ইবন আবী যিয়াদ! তুমি কি দেখতে পাচ্ছো, আমি কোথায় গিয়ে পড়েছি? বললাম : আমীরুল মু'মিনীন! আপনার জন্য সুসংবাদ। আমি আশা করি আপনি শুভ ও কল্যাণই লাভ করবেন। বললেন : সুদূর পরাহত। তারপর তিনি কান্না জুড়ে দিলেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম : আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যতটুকু করেছেন তাই আপনার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। বললেন : অসম্ভব। আমি নিন্দা-মন্দ করি, আমার নিন্দা-মন্দ করা হয় না। আমি প্রহার করি, কিন্তু আমাকে প্রহার করা হয় না, আমি মানুষকে কষ্ট দিই, আমাকে কষ্ট দেওয়া হয় না। তারপর তিনি আবার কাঁদতে লাগলেন। তাঁর জন্য আমার দয়া হতে লাগলো। আমাকে বিদায় দেওয়ার সময় তাঁর বিছানার নীচ থেকে বিশটি দীনার বের করে আমার হাতে দিয়ে বলেন : এগুলো তোমার কাজে লাগাও। "ফাই" অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত সম্পদ-এ যদি তোমার অধিকার থাকতো, আমি তোমাকে তোমার অংশ দিতাম। কারণ, তুমি দাস। আমি দীনারগুলো নিতে অস্বীকার করলাম। বললেন : এগুলো আমার ব্যক্তিগত অর্থ। তিনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অবশেষে আমি গ্রহণ করলাম।

তিনি আমার মনিবকে একটি চিঠি লিখলেন আমাকে ক্রয় করার জন্য। আমার মনিব আমাকে বিক্রয় করতে অস্বীকার করলেন। তবে তিনি আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন।[৫৪৭]

মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিকের আযাদকৃত দাস 'আবদুস সালাম বলেন, একদিন 'উমার ভীষণ কাঁদলেন। তা দেখে স্ত্রী ফাতিমাও কাঁদলেন। আর তাঁদেরকে কাঁদতে দেখে বাড়ীর অন্যরাও কাঁদলেন। কান্না থামলে স্ত্রী ফাতিমা জিজ্ঞেস করলেন : আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এভাবে কাঁদলেন কেন? বললেন : আমার স্মরণ হলো, মানুষ আল্লাহর সামনে থেকে ফিরে যাচ্ছে– একদল জান্নাতের দিকে, আরেকদল জাহান্নামের দিকে। একথা বলে তিনি চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েন।[৫৪৮]

তিনি ফকীহ, 'আলিম ও আল-কুরআনের কারীদের খুবই সমাদর করতেন। দূর-দূরান্ত থেকে গুণীজনদের ডেকে এনে দরবারের বিশিষ্টজনদের মধ্যে স্থান করে দিতেন। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার (রা), মুহাম্মাদ ইবন কুরাজী, রাজা' ইবন হায়ওয়া এবং রিয়াহ ইবন 'উবায়দার সংগে খিলাফত পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতেন। মায়মূন ইবন মিহরান, রাজা' ইবন হায়ওয়া এবং রিয়াহ

---

৫৪৭. সিফাতুস সাফওয়া-২/১২২
৫৪৮. প্রাগুক্ত-২/১২০-১২১

ইবন 'উবায়দা ছিলেন তাঁর বিশেষ সভাসদ। এছাড়া আরো অনেক 'আলিম তাঁর সাথে ওঠা-বসা করতেন।[৫৪৯]

'উমার ও তাউস

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। একদিন লোক মারফত তাউস ইবন কায়সানকে বলে পাঠালেন : ওহে আবু 'আবদির রহমান! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

তাউস এক লাইনের একটি চিঠি লিখলেন। লাইনটি হলো এই :

إذا أَرَدْتَ أن يَكُوْنَ عملُكَ خيرًا كلُّه فاستعْمِلْ أهلَ الْخَيْرِ، وَالسَّلَامُ.

"যদি আপনি চান আপনার সব কাজ ভালো হোক, তাহলে ভালো লোকদেরকে নিয়োগ করুন। ওয়াস-সালাম!"

চিঠিটি পড়ে 'উমার মন্তব্য করেন : উপদেশের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কথাটি দু'বার উচ্চারণ করেন।[৫৫০]

জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের মর্যাদা দিতেন

একবার 'উমার একজন অল্প বয়সী নওজোয়ানকে কোন একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। তখন কেউ একজন 'উমারকে বললেন : এ একজন অল্প বয়সী যুবক, আপনার অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবে না। 'উমার তাকে ডেকে বললেন : তোমার বয়স অল্প, আমার মনে হয় তুমি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। যুবকটি তখন নিম্নের চরণটি আবৃত্তি করে :

وليس يزيد المرء جهلا ولاعمى + إذا كان ذاعقل، حداثة سنه.

'যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে বয়সের স্বল্পতা তার মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি করতে পারে না।'

'উমার বললেন : সত্য বলেছো। তার নিয়োগ বহাল রাখেন।[৫৫১]

খিলাফত পরিচালনার সুবাদে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে যদিও সব ধরনের মানুষের সাথে উঠাবসা করতে হতো, তবে তাঁর প্রকৃত ঝোঁক ছিল জ্ঞানী ব্যক্তিদের প্রতি। এ কারণে নানাভাবে তাঁদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সমীহ ভাব প্রকাশ করতেন। আঞ্চলিক শাসক 'আদী ইবন আরতাত যখন সকল শর'ঈ মাসয়ালায় তাঁর পরামর্শ নিতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁকে হাসান আল-বসরীর পরামর্শ নিলেই চলবে বলে জানিয়ে দেন। তিনি নিজেও কোন বিচার-ফয়সালা করলে অথবা সিদ্ধান্ত দিলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

---

৫৪৯. তাবাকাত-৫/৩৯২

৫৫০. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান-১/২৩৩; তাবি'ঈদের জীবনকথা-১/১৩২

৫৫১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/২৯; 'আলী ফা'উর, সীরাতু উমার-২০৫

একবার তিনি এক ব্যক্তিকে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের নিকট পাঠালেন একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার জন্য। লোকটি তাঁকে সঙ্গে করে 'উমারের নিকট উপস্থিত হলে তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, আমার পাঠানো লোকটি ভুলক্রমে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি তাকে শুধু আপনার নিকট থেকে মাসয়ালাটি জেনে আসতে বলেছি।[৫৫২]

সর্বদা জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা আলোচনা করতেন। বিসর ইবন সা'ঈদ কপর্দকহীন অবস্থায় মারা গেলন। এমন কি কাফনের কাপড় ক্রয়ের অর্থও রেখে গেলেন না। আর 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল মালিক নগদ লক্ষাধিক দিরহাম রেখে মারা যান। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁদের দু'জনের মৃত্যুর অবস্থা জানার পর বললেন, যদি উভয়ের একই পরিণাম হতো তাহলে আমি 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল মালিকের জীবনকেই প্রাধান্য দিতাম। তখন মাসলামা ইবন 'আবদিল মালিক বললেন, বিসর ইবন সা'ঈদের জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করা আপনার খান্দানের মধ্যে আপনার আত্মহত্যার মতো হতো। তিনি বললেন, যা কিছুই হোক না কেন, আমরা মহৎ ব্যক্তিদের মহত্বের আলোচনা তো ছেড়ে দিতে পারিনে। সমকালীন অধিকাংশ 'আলিমের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাঁদের কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতেন, নিরিবিলি তাঁর সাথে কথা বলতেন। একবার তাঁর একজন বিশিষ্ট 'আলিম বন্ধু আসলেন। তিনি তাঁকে একাকী কাছে বসিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন।[৫৫৩]

তিনি দিনের সবটুকু সময় মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও কর্মতৎপরতায় কাটিয়ে দিতেন। রাতের একাংশও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে অতিবাহিত করতেন। এ অবস্থা দেখে একদিন রাজা' ইবন হায়ওয়া (রহ) তাঁকে বলেন :

يأمير المومنين! نهارك كله مشغول، ذلك جزء من الليل، وأنت تسمر معنا. فقال : يارجاء إن ملاقاة الرجال تلقح لأوليائها، وإن المشورة والمناظرة باب رحمة ومفتاح بركة، لايضل معهما رأى ولا يقعد معهما حزم.

'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার দিনের পুরোটাই ব্যস্ততায় কাটে। রাতের একাংশ আমাদের সাথে আলোচনায় অতিবাহিত হয়। বললেন : ওহে রাজা'! মানুষের সাক্ষাৎকার তাদের নেতাদেরকে পরিপূর্ণ করে। আর পরামর্শ ও তর্ক-বিতর্ক হলো দয়া ও অনুগ্রহের দ্বার এবং বরকত ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। আর এ দু'টির সাথে কোন মতামত ও সিদ্ধান্ত যেমন ভুল হয় না, তেমনি কোন বিচক্ষণ মানুষ এ দু'টি জিনিস নিয়ে বসেও থাকে না।'[৫৫৪] তিনি প্রায়ই বলতেন :

لكل شيئ معدن، ومعدن التقوى قلوب العاقلين، لأنهم عقلوا عن الله، فاتقوه في أمره ونهيه.

---

৫৫২. তাবাকাত-৫/৩৯০
৫৫৩. প্রাগুক্ত-৫/৩০৮, ৩২৫
৫৫৪. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৬

'প্রতিটি জিনিসের উৎসস্থল থাকে। আর তাকওয়া বা আল্লাহ্ ভীতির উৎসস্থল হলো জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্তঃকরণ। কারণ, তারা সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে বোঝে ও উপলব্ধি করে। সুতরাং তোমরা তাঁর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে তাঁকে ভয় কর।'

ইমাম আয-যুহরী বলেন : একদিন আমি 'উমারের নিকট গেলাম। আমি বসা থাকা অবস্থায় কোন এক আঞ্চলিক কর্মকর্তার একটি চিঠি এলো। চিঠিতে তিনি তার কর্তৃত্বাধীন একটি নগরের নিরাপত্তার জন্য দুর্গ তৈরির প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। আমি তাঁকে বললাম : 'আলী ইবন আবী তালিবকেও (রা) তাঁর কোন এক কর্মকর্তা এমন একটি চিঠি লিখেছিলেন। তিনি জবাবে লিখেছিলেন :

أما بعد، فحصِّنْهَا بالعدل، ونقِّ طرقها من الجور.

'অতঃপর এই যে, তুমি ন্যায় বিচার দ্বারা নগরীকে নিরাপদ কর এবং জুলুম-অত্যাচার থেকে এর রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখ।'

'উমারও একথাগুলোই লিখে পাঠান।[৫৫৫]

'উমারের মৃত্যুর পর মনীষীদের মন্তব্য ও শোক

তাঁর মৃত্যুর পর একদল ফকীহ্ তাঁর বেগম সাহেবা ফাতিমার নিকট এসে বললেন :[৫৫৬]

جئناك لنُعَزِّيَنَّكِ بعمر، فقد عمَّت مصيبتُه الأمة، فأخبرينا ـ يرحمك الله ـ عن عمر كيف كانت حاله في بيته، فإن أعلم الناس بالرجل أهله. فقالت : والله ما كان عمر بأكثركم صلاة ولاصياما، ولكني ـ والله ـ مارأيتُ عبدًا لله قط كان أشدَّ خوفا لله من عمر، والله إن كان ليكون في المكان الذي ينتهي إليه سرور الرجل بأهله، بيني وبينه لحاف، فيخطر على قلبه الشيئ من أمر الله، فينتفض كما ينتفض طائر وقع في الماء، ثم ينشج، ثم يرتفع بكاؤه، حتى أقول : والله لتخرجن نفسه! فأطرح اللحاف عني وعنه، رحمة له، وأنا أقول : ياليتنا كان بيننا وبين هذه الإمارة بُعْد المشرقين، فوالله مارأينا سرورا منذ دخلنا فيها.

"উমারের মৃত্যুতে আমরা আপনাকে শোক ও সমবেদনা জানাতে এসেছি। তাঁর মৃত্যুতে গোটা উম্মাতের উপর যেন মুসীবত নেমে এসেছে। আল্লাহ্ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন! গৃহ অভ্যন্তরে 'উমারের অবস্থা কেমন ছিল, সে সম্পর্কে আমাদেরকে একটু অবহিত করুন। কারণ, একজন মানুষ সম্পর্কে তার পরিবারের লোকেরাই সবচেয়ে বেশী জানে।

---

৫৫৫. প্রাগুক্ত

৫৫৬. ইবনুল জাওযী-২০৩; 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৩৯৭

বেগম সাহেবা বললেন : আল্লাহর কসম, 'উমার আপনাদের চেয়ে বেশী সালাত আদায়কারী ও সিয়াম পালনকারী ছিলেন না। তবে 'উমারের চেয়ে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর এমন কোন বান্দাকে আমি কখনো দেখিনি। একজন পুরুষের তার স্ত্রীর সাথে চরম আনন্দঘন মুহূর্তেও, যখন আমি ও তিনি একই লেপের তলে থাকতাম, তখনও যদি আল্লাহর কোন নির্দেশের কথা স্মরণ হতো, অমনি পানিতে পড়া পাখীর মত ডানা ঝাপটা দিয়ে উঠে যেতেন। তারপর এমন ভীত-বিহ্বলভাবে চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকতেন যে, আমি বলতাম : এখনই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি আমি আমাদের লেপটি সরিয়ে ফেলতাম। তাঁর প্রতি আমার দয়া হতো। মনে মনে বলতাম, হায়! আমাদের ও এই ইমারত বা রাষ্ট্র ক্ষমতার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব হতো! আল্লাহর কসম! ইমারত ও খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর কোন রকম আনন্দ-খুশী আমরা উপভোগ করিনি।'

'উমারকে কাফন পরানোর পর মাসলামা ইবন 'আবদিল 'আযীয দাঁড়িয়ে বললেন :[৫৫৭]

رحمك الله يا أمير المؤمنين، فقد أورثتَ صالحينا بك اقتداءً وهـدًى وملأتَ قلوبنا بمواعظك وذكرك خشية وتقًى، وأثّلتَ لنا بفضلك شرفًا وفخرا، وأبقيتَ لنا في الصالحين بعدك ذكرًا.

'হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন। হিদায়াত ও আনুগত্য-অনুসরণের ক্ষেত্রে আপনি আমাদের সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। আপনার উপদেশ ও নীতিকথা দ্বারা আপনি আমাদের অন্তরকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতিতে পূর্ণ করে দিয়েছেন। আপনার সম্মান ও মর্যাদা দ্বারা আমাদেরকে গৌরব ও গর্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মাঝে আমাদেরকে স্মরণীয় করে গেছেন।'

'আবদুল মালিক ইবন 'উমাইর বলেন :[৫৫৮]

رحمك الله ياأمير المؤمنين، إن كنت لغضيض الطرف، أمين الفرج، جوادًا بالحق، بخيلا بالباطل، تغضَب في حين الغضبِ، وترضى في حين الرضى، وماكنتَ مزّاحًا ولاعيّابًا، ولابهاتًا ولامغتابا.

'হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন! আপনি ছিলেন দৃষ্টিকে অবনতকারী, যৌনাঙ্গের সংযতকারী, সত্যের ব্যাপারে উদার ও মিথ্যার ব্যাপারে অনুদার। রাগের সময় রাগ করতেন, খুশীর সময় খুশী হতেন। আপনি না ছিলেন কোন রসিকতাকারী, না ছিলেন মানুষের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণকারী, আর না ছিলেন কোন গীবতকারী।'

---

৫৫৭. কিতাবুল আগানী-৯/৩০৩-৩০৪; ইবনুল জাওযী-৩২৯

৫৫৮. ইবনুল জাওযী-৩০৩

হাসান আল-বসরী মৃত্যুর খবর শুনে মন্তব্য করেন :[৫৫৯]
مات خير الناس – 'সবচেয়ে ভালো মানুষটির মৃত্যু হয়েছে।'

তাঁর মৃত্যুতে মরছিয়া ও ক্রন্দন

তাঁর মৃত্যুতে গোটা মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি মানুষ শোকাতুর হয়ে পড়ে। দুস্থ, ইয়াতীম, ধনী, গরিব, ছাত্র, শিক্ষক, নারী, পুরুষ, ছোট, বড় প্রতিটি মানুষ চোখের পানি ফেলে। এমন কি ইসলামী বিশ্বের বাইরেও এ শোক ছড়িয়ে পড়ে। যে রোমান সম্রাট তাঁর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক পাঠান তিনিও ভীষণ দুঃখ পান। তাঁর সমকালীন কবি জারীর ইবন 'আতিয়্যা আত-তামীমী আল-বাসরী বলেন :[৫৬০]

ينعى النعاه أمير المؤمنين لنا ـ ياخير من حج بيت الله واعتمرا

حملت امرًا عظيما فاضطلعتَ به ـ وسرتَ فيه بحكم الله يا عمرا

الشمس كاسِفةٌ ليست بطالعةٍ ـ تبكى عليك النجومُ الليل والقمرا

'ঘোষক আমীরুল মু'মিনীনের মৃত্যুর ঘোষণা করেছে। হে আল্লাহর ঘরের হজ্জ ও 'উমরাকারীদের মধ্যের সর্বোত্তম ব্যক্তি! আপনি একটি বিরাট দায়িত্ব বহন করেছেন এবং শক্ত ও মজবুতভাবে তা বহন করেছেন। হে 'উমার! আল্লাহর নির্দেশমত সে দায়িত্ব পালন করেছেন। সূর্য খর-তাপবিহীন বিষণ্ন হয়ে পড়েছে, যেন উদিত হয়নি। রাতে আকাশের চাঁদ ও তারকারাজি আপনার জন্য কাঁদছে।'

কবি কুছায়্যির ইবন 'আয্যা তাঁর শোকগাঁথায় বলেন :[৫৬১]

غمَّتْ صنائِعُهُ فعمَّ هلاكُهُ + فالناس فيه كلّهم مأجور

والناس مأتَمُهُمْ عليه واحد + فى كل دار رنَّةٌ وزفيرُ

يُثنى عليك لِسَانُ مَنْ لَم تُولِهِ + خيرًا لأنك بالثناءِ جديرُ

سقى ربُّنا من ديرُ سمعان حفرةً + بها عمر الخيرات رهنًا دفينُها

صوابحُ من مزنٍ ثقال غواديًا + دوالحَ دُهما ماخضات دُجُونها.

'তাঁর সকল শিল্প ও সৃষ্টি শোকক্লিষ্ট, বিষণ্ন, সুতরাং তাতে ব্যাপক ধ্বংসক্রিয়া চলেছে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষকে প্রতিদান দেওয়া হবে। সকল মানুষের শোক ও দুঃখ এক। প্রতিটি গৃহে চলছে ক্রন্দন ও বিলাপ।

যাদের কোন কল্যাণ ও উপকারও আপনি করেননি তারাও আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কারণ, আপনি প্রশংসারই যোগ্য।

---

৫৫৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৪২; মুখতাসার তারীখ ইবন 'আসাকির-১২৭
৫৬০. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২১১-২১২; মুখতাসার তারীখ ইবন 'আসাকির-১২৭
৫৬১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২১১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৪৪; মু'জামুল বুলদান-২/৫১৭

আল্লাহ দায়রু সাম'আনের কবরে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। সেখানে সৎকর্মশীল 'উমার শায়িত আছেন।

প্রত্যূষে প্রবল বর্ষণে ভিজে থাক এবং সন্ধ্যায় কালো গাঢ় মেঘ অঝোরে বর্ষণ করুক!'

এছাড়া আরো অনেক কবি তাঁর মৃত্যুতে মরছিয়া রচনা করেছেন। আরবী সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস ও সংকলনে সে সকল মরছিয়া সংরক্ষিত আছে।

ইসলামের পরম শত্রু রোমান সম্রাট 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকে-দুঃখে কাতর হয়ে পড়েন। মুহাম্মাদ ইবন মা'বাদ বলেন, আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) আমাকে বন্দী বিনিময়ের ব্যাপারে আলোচনার জন্য রোমান সম্রাটের নিকট পাঠালেন। আমি সেখানে গেলাম এবং সম্রাটের দরবারে যাতায়াত করতে লাগলাম। একদিন দরবারে ঢুকে দেখি সম্রাট বিষণ্ন ও বেদনাক্লিষ্ট চেহারায় মেঝেতে বসে আছেন। আমি বললাম : মহামান্য সম্রাটের এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন : কি ঘটেছে তাকি আপনি জানেন না? বললাম : কী ঘটেছে? বললেন : সৎ লোকটি মারা গেছেন। বললাম : কে? বললেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয। আমার বিশ্বাস, 'ঈসা ইবন মারইয়ামের (আ) পরে যদি কেউ মৃতকে জীবিত করতে পারতেন তাহলে তা কেবল 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযই পারতেন। একজন দুনিয়া বিরাগী পাদ্রী দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করে, ঘরের দরজা বন্ধ করে সব সময় উপাসনায় নিমগ্ন থাকে, এতে আমি বিস্মিত হই না। কিন্তু আমি বিস্ময়ে হতবাক হই যখন দেখি কোন ব্যক্তির পায়ের তলায় গোটা দুনিয়া গড়াগড়ি খায়, আর তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বৈরাগ্য জীবন যাপন করেন।[৫৬২]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) সন্তানরা কেমন ছিলেন

এখানে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) সন্তানদের সম্পর্কে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি অনেকগুলো সন্তান নিঃসম্বল অবস্থায় রেখে যান।

'আবদুল মালিক

অতিপ্রিয় সন্তান 'আবদুল মালিক তাঁর জীবদ্দশায় অল্প বয়সে ইনতিকাল করেন এবং তিনি নিজে তাঁকে কবর দেন। এই 'আবদুল মালিক ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, আল্লাহভীরু, পার্থিব ভোগ-বিলাস বিমুখ উঁচু পর্যায়ের তাপস ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে আলোকিত একজন মানুষ। একবার তাঁর স্ত্রী খুব সেজেগুজে সামনে এলে তিনি বলেন, "এবার তোমার 'ইদ্দত পালন করতে বসা উচিত।" শামের কিছু ইসলামী ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করেছেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর ছেলে 'আবদুল মালিককে দেখেই 'ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সায়্যার ইবন আল-হাকাম বলেন, 'আবদুল

---

৫৬২. হিলয়াতুল আওলিয়া-৫/২৯০; ইবনুল জাওযী-২৩০-২৩১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৪২-১৪৩

মালিক তাঁর পিতা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অপেক্ষা উত্তম ছিলেন।[৫৬৩] মায়মূন ইবন মিহরান বলেন, আমি এক বাড়ীতে তিনজন ভালো মানুষ থাকে, এর চাইতে ভালো বাড়ী আর দেখিনি। তাদের একজন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, দ্বিতীয়জন তাঁর ছেলে 'আবদুল মালিক এবং তৃতীয়জন তাঁদের দাস মুযাহিম।' এ কারণে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর উপর নির্ভরও করতেন। খলীফা হওয়ার পর 'আবদুল মালিককে লেখা একটি চিঠিতে উপরিউক্ত বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি লেখেন : 'আমার পরে আমার সকল উপদেশ ও পরামর্শের সবচেয়ে বড় হকদার তোমাকে মনে করি। আর তুমিও তা রক্ষণের জন্য সর্বাধিক যোগ্য। আল্লাহ আমাদের বড় অনুগ্রহ করেছেন, আর যা কিছু বাকী আছে তাও তিনি দান করবেন। সুতরাং আল্লাহর যে অনুগ্রহ তোমার পিতা ও তোমার প্রতি করা হয়েছে তা স্মরণ কর এবং পিতাকে তাঁর সেই সব কাজে যার উপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে, আর তোমার ধারণা মতে তিনি যে কাজ করতে অক্ষম, সেখানে তাকে সাহায্য কর।'

'আবদুল মালিক পিতার এই উপদেশ কঠোরভাবে পালন করেন। তিনি খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পিতাকে সঠিক পরামর্শ দিয়ে সব সময় সাহায্য করেন। পিতা যখন অশান্ত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশংকায় বানূ উমাইয়্যাদের জোর-জবরদস্তী দখলকৃত সম্পদ প্রকৃত মালিককে ফেরত দানের ব্যাপারে ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করতে চাইলেন তখন 'আবদুল মালিকেরই পরামর্শ ও তাকিদে তিনি সে কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করেন। শৈশব থেকেই 'আবদুল মালিকের অন্তরে আল্লাহর ভয় শক্তভাবে গেঁথে বসে। দৈহিক গঠন-প্রকৃতির দিক দিয়ে সাধারণভাবে মহান 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) বংশধরদের সাথে তাঁর সর্বাধিক সাদৃশ্য ছিল। বিশেষ করে ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহভীরুতায় ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) প্রতিচ্ছবি। তাঁর চাচাতো ভাই 'আসিম বলেন : একবার আমি দিমাশকে গিয়ে 'আবদুল মালিকের নিকট উঠলাম। তখনো সে অবিবাহিত। ঈশার নামায আদায় করে আমরা বিছানায় গেলাম। মাঝ রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখলাম 'আবদুল মালিক নামাযে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বার বার নিম্নের আয়াতটি পাঠ করছে :[৫৬৪]

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِيْنَ. ثُمَّ جَاءَ هُمْ مَا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ. مَا أَغْنى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ.

'তুমি ভেবে দেখ যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দেই এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি?'

তার এই কান্না, ভীতি ও বার বার আবৃত্তি দেখে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, হয়তো মারাই যাবে। তাই তাকে এ অবস্থা থেকে বিরত করার জন্য সদ্য ঘুম ভাঙ্গা ব্যক্তির মত আমি জোরে বলে উঠলাম :

---

৫৬৩. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৮৪
৫৬৪. সূরা আশ-শু'আরা' : ২০৫-২০৭

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ.

'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। সকল প্রশংসা আল্লাহর।'

আমার কণ্ঠস্বর শুনে সে চুপ হয়ে গেল। আমি আর কোন সাড়া-শব্দ পেলাম না।

এই যুবক তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের নিকট থেকে কুরআন, হাদীছ ও ফিকাহর জ্ঞান অর্জন করেন। তরুণ বয়সেই তিনি শামের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহরূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। বর্ণিত আছে, একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) শামের বড় বড় ফকীহদের সমবেত করে বলেন, আমার খান্দানের লোকেরা অন্যায়ভাবে জনগণের ধন-সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে যে বিত্তের পাহাড় গড়ে তুলেছে সে ব্যাপারে আপনাদের মতামত জানার জন্যই আপনাদেরকে ডেকেছি। তাঁরা বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! এ অন্যায় কাজ তো আপনার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে হয়েছে। এর দায়-দায়িত্ব আপনার পূর্ববর্তীদের উপর বর্তাবে। তাঁদের এ জবাবে 'উমার খুশী হতে পারলেন না। এ মতের সাথে দ্বিমত পোষণকারী তাঁদের মধ্য থেকে একজন বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার পুত্র 'আবদুল মালিককেও ডাকুন। কারণ, আপনি যাঁদেরকে ডেকেছেন, তাঁদের থেকে বিদ্যা, বুদ্ধি ও ফিক্হ বিষয়ে জ্ঞানে সে কোন অংশে কম নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে তার মতামত নিন।

'আবদুল মালিককে ডেকে আনা হলো। 'উমার তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন :

আমার চাচাতো ভাইয়েরা অন্যায়ভাবে জোর করে মানুষের অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে বিত্তের পাহাড় গড়ে তুলেছে। এখন সেই সব সম্পদের প্রকৃত মালিকরা তাদের সম্পদ ফিরিয়ে পাওয়ার দাবী জানাচ্ছে। আর আমরা জানি, এ তাদের সম্পদ। এ ব্যাপারে তোমার মতামত কি?

'আবদুল মালিক বললেন, আমার মতে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি জানবেন যে, কোন সম্পদ জোর করে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে ততক্ষণ তা তার প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে থাকবেন। আর যদি তা না করেন, তাহলে অন্যায়ভাবে যারা তা গ্রহণ করেছিল, আপনি তাদেরই একজন বলে গণ্য হবেন।

পুত্রের এ জবাব শুনে আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) চেহারায় সন্তুষ্টির আভা ফুটে ওঠে। তাঁর অন্তরের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়।

নও-জোয়ান 'আবদুল মালিক শত্রু বাহিনীর সাথে মুসলিম মুজাহিদদের সংঘাত-সংঘর্ষ হয় এমন এক স্থানে বসবাস করা পছন্দ করতেন। তাই তিনি দারুল খিলাফা দিমাশ্ক ছেড়ে সিরিয়া সীমান্তে এসে বসবাস করতে থাকেন। পিতা 'উমারের তাঁর যোগ্যতা, সততা ও খোদাভীতির উপর পূর্ণ আস্থা থাকা সত্ত্বেও দূরে অবস্থানকারী পুত্রের জন্য দুঃশ্চিন্তায় থাকতেন। না জানি নও-জোয়ান পুত্রকে শয়তান কোন ধোঁকায় ফেলে দেয়। তাই সব সময় পুত্রের সংবাদ জানার জন্য উদগ্রীব থাকতেন।

মায়মূন ইবন মাহরান বলেন, একদিন আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট গিয়ে দেখলাম পুত্র 'আবদুল মালিককে চিঠি লিখছেন। সেই চিঠিতে তিনি পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন, নীতিকথা বলেছেন, বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগানোর কথা বলেছেন, ভয় দেখিয়েছেন ও সতর্ক করেছেন। বিশেষভাবে তিনি একথাগুলো লিখেছেন :

'অতঃপর এই যে, আমার কথা শোনা ও বুঝা তোমারই অগ্রাধিকার। আল্লাহ– সকল প্রশংসা তাঁরই, সকল ছোট-বড় কাজে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং হে আমার ছেলে! তোমার পিতা ও তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। গর্ব-অহঙ্কার ও আত্ম-অহমিকা থেকে দূরে থাক। কারণ তা শয়তানের কাজ। আর শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

আমি তোমাকে এ চিঠি এজন্য লিখছি না যে, তোমার সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জেনেছি। তোমার সম্পর্কে আমি যা জানি তা ভালো ছাড়া আর কিছু নয়। তবে তোমার মধ্যে এক প্রকার আত্মতুষ্টি কাজ করছে সে কথা আমি জেনেছি। যদি তা সত্যি হয়, আর তা যদি তোমাকে আমার অপছন্দনীয় কোন কিছুর দিকে নিয়ে যায় তাহলে তুমি আমার নিকট থেকে তেমন আচরণই লাভ করবে যা তুমি পছন্দ কর না।'

মায়মূন বলেন, তারপর 'উমার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : মায়মূন! আমার পুত্র 'আবদুল মালিক আমার চোখের একটি শোভা ও সৌন্দর্য। আমার ভয় হয়, তার প্রতি আমার স্নেহ-ভালোবাসার প্রাবল্য তার সম্পর্কে আমার জানার উপর বিজয়ী না হয়ে বসে। পিতারা যেমন সন্তানের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে অন্ধ হয়ে থাকে আমিও যেন তদ্রূপ না হয়ে যাই। আপনি একটু তার কাছে যান এবং তাকে একটু পরীক্ষা করুন। গর্ব-অহঙ্কারমূলক কোন কিছু তার মধ্যে আছে কিনা তা একটু দেখুন। আসলে সে তো একজন তরুণ। শয়তানের ধোঁকার ব্যাপারে আমি তাকে মোটেই নিরাপদ মনে করি না।

মায়মূন বলেন, আমি আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশমত যাত্রা করলাম এবং এক সময় 'আবদুল মালিকের ঠিকানায় পৌঁছলাম। দেখলাম তিনি তরুণ যুবক। সতেজ, দীপ্তিমান ও ভীষণ বিনয়ী। পশমের কম্বলের উপর বিছানো সাদা চাদরের উপর বসে আছেন। আমাকে স্বাগতম জানিয়ে বললেন : আমি আপনার অনেক গুণের কথা আমার আব্বার মুখে শুনেছি। আশা করি আল্লাহ আপনার দ্বারা আমাকে উপকৃত করবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম : কেমন আছেন? বললেন ; আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে ভালো আছি। তবে আমার সম্পর্কে আমার আব্বার অতিরিক্ত ভালো ধারণা, অথচ বাস্তবে যা আমি অর্জন করতে পারিনি, আমাকে বিপথগামী করার ভয় আমি করি। আমার আশঙ্কা হয়, আমার প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা আমার সম্পর্কে তাঁর জানার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে না বসে। আর আমি তাঁর জন্য এক আপদ-মুসীবত হয়ে না দাঁড়াই।

আমি বাপ-বেটার চিন্তা ও কথার মিল দেখে বিস্মিত হলাম। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম : আপনার জীবিকা নির্বাহ হয় কি করে?

বললেন : পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত একজনের এক খণ্ড জমি আমি ক্রয় করেছি এবং যে অর্থ

দিয়ে আমি মূল্য পরিশোধ করেছি তা হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ নেই। সেই জমিতে উৎপাদিত ফসল থেকে আমার জীবিকা নির্বাহ হয়। সুতরাং মুসলমানদের কর-খাজনা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন আমার হয় না।

বললাম : আপনার প্রতিদিনের খাদ্য-খাবার কি?

বললেন : এক রাতে গোশ্‌ত, এক রাতে ডাল ও যয়তূনের তেল, আরেক রাতে সিরকা ও যয়তূনের তেল, এভাবেই মোটামুটি আমার চলে যায়।

বললাম : আপনার মধ্যে কি আত্মতুষ্টি কাজ করে না?

বললেন : এক সময় আমার মধ্যে কিছুটা ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার পিতা একদিন যখন আমাকে উপদেশ দিলেন তখন আমার নিজের বাস্তবতা উপলব্ধি করলাম। আর সেদিন থেকেই আমি আমার নিজেকে অতি তুচ্ছ ভাবতে শিখেছি। আল্লাহ তাঁর সেই উপদেশ দ্বারা আমাকে দারুণ উপকার করেছেন। তিনি আমার আব্বাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন!

আমি ঘণ্টাব্যাপী তাঁর সাথে কথা বললাম, তাঁর কথা শুনলাম। এত অল্প বয়স, এত অল্প অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এত সুন্দর চেহারার, এত পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার, এত আদব-লেহাজের অধিকারী কোন যুবক আমি আর দেখিনি।

আমাদের কথার মাঝখানে দিন শেষ হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগে একজন বালক এসে বললো : আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। আমরা খালি করেছি। তিনি চুপ করে থাকলেন। আমি জানতে চাইলাম : তারা কি খালি করেছে? বললেন : হাম্মাম।

বললাম : কিভাবে? বললেন : আমার ব্যবহারের জন্য মানুষকে সরিয়ে দিয়েছে।

বললাম : আপনার একথা শোনার আগ পর্যন্ত আপনি আমার অন্তরে একটা বড় স্থান দখল করেছিলেন। আমার মুখ থেকে একথা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে তিনি ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তারপর 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' পাঠ করতে করতে বললেন :

চাচা! আল্লাহ্ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন! এতে এমন কি হয়েছে?

বললাম : হাম্মাম কি আপনার?

বললেন : না।

বললাম : তাহলে সেখান থেকে মানুষ বের করে দিয়ে খালি করার আপনি কে? এর দ্বারা মনে হয় আপনি নিজেকে তাদের চেয়ে বেশী মর্যাদাবান মনে করেন। তাছাড়া আপনি হাম্মামের মালিককে পুরো দিনের ভাড়া দেন এবং অন্যদেরকে তা ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করেন।

বললেন : হাঁ, হাম্মামের মালিককে পুরো দিনের ভাড়া দিয়ে তাকে। রাজি করি।

বললাম : এতো এক প্রকার অপচয়, এর মধ্যে কিছু গর্ব-অহঙ্কার কাজ করে। আপনি তো

অন্যদের মত একজন সাধারণ মানুষ। তাহলে তাদের সাথে হাম্মামে প্রবেশ করেন না কেন? বললেন : হাম্মামে কিছু গ্রাম্য লোক আসে যারা লুঙ্গি-পাজামা ছাড়াই গোসল করে। তাদের নগ্ন দেহের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ার ভয়ে আমি এমন করি। তাছাড়া তাদেরকে যে আমি লুঙ্গি-পাজামা পরার জন্য বাধ্য করবো, সে ক্ষেত্রে আমার ক্ষমতা প্রদর্শনের ভয় করি। এখন আমি কি করতে পারি, সে বিষয়ে কিছু উপদেশ দিন।

বললাম : আপনি রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তখন মানুষ হাম্মাম খালি করে বাড়ী ফিরে যাবে।

বললেন : ঠিক আছে, তাই করবো। আজ থেকে আর কখনো দিনে হাম্মামে ঢুকবো না। যদি এই শহরে প্রচণ্ড শীত না পড়তো তাহলে জীবনে আর কখনো দিনে সেখানে ঢুকতাম না। কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর মাথা সোজা করে বললেন : আমার এই আচরণের কথাটি আমার আব্বার কাছে গোপন রাখার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। আমি চাই না, আমার আব্বা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হোন। আমার ভয় হয় তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়াই আমার মৃত্যু এসে যায় কিনা।

মায়মূন বলেন : এবার আমি একটু তাঁর বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বললাম, যদি আমীরুল মু'মিনীন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখেছেন? আপনি কি চান আমি তাঁকে মিথ্যা বলি?

বললেন : না, না, তা কেন বলবেন। বলবেন : আমি তার মধ্যে কিছু ত্রুটি দেখেছি এবং তা ধরিয়ে দিয়ে সংশোধনের উপদেশ দিয়েছি। সাথে সাথে সে তা স্বীকার করে সংশোধনের অঙ্গীকার করেছে। আর কি সেই ত্রুটি তা আপনি প্রকাশ না করলে আমার আব্বা তা জানার জন্য কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। কারণ, আল্লাহ যা কিছু গোপন করেছেন তা জানার জন্য অনুসন্ধানের অভ্যাস থেকে তিনি তাঁকে পবিত্র করেছেন।

মায়মূন মন্তব্য করেছেন : আমি এমন পিতা ও এমন সন্তানের মত দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। আল্লাহ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।[৫৬৫]

একবার হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) কোন কারণে ভীষণ রেগে যান। 'আবদুল মালিকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যখন তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয় তখন 'আবদুল মালিক বলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এই অবস্থানে পৌঁছে এত রেগে যান কেন? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) বললেন : কেন, তোমরা কি রাগ করো না? 'আবদুল মালিক বললেন : আমার এই মোটা পেটের লাভটা কি, যদি না আমি রাগ হজম করে ফেলি? উল্লেখ্য যে, তাঁর পেটটি ছিল মোটা।

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) একদিন সকাল থেকে সরকারী দফতরে কর্ম ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করলেন। দুপুরে ক্লান্ত অবস্থায় উঠে একটু বিশ্রামের

---

৫৬৫. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৩-১২৬; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৯৩

জন্য গেলেন। 'আবদুল মালিক পিতার সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন : আপনি অন্দর মহলে চলে আসলেন কেন? বললেন : একটু বিশ্রাম নিতে চাই। 'আবদুল মালিক বললেন : জনগণ দরজায় আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, আর আপনি তাদের থেকে লুকোচ্ছেন? মৃত্যুর উপর কি আপনার এই আস্থা আছে যে, সে এ অবস্থায় আপনার নিকট আসবে না? 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) সেই মুহূর্তে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন এবং কাজ শুরু করেন।[৫৬৬]

'আবদুল মালিক পিতার জীবদ্দশায় প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। অসুস্থ অবস্থায় পিতা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর শয্যাপাশে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থা কেমন আছে তা জানতে চান। জবাবে তিনি বলেন : আমি আমার নিজেকে সত্যের উপর দেখতে পাচ্ছি, তবে আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজের ইচ্ছার চেয়ে আপনার ইচ্ছাকে বেশী পছন্দ করি। 'আবদুল মালিক মারা গেলেন। পিতা 'উমার (রহ) লাশের নিকট গেলে মুযাহিমের মুখে তাঁর মৃত্যুর ঘোষণা শুনে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে পেয়ে লাশের দিকে তাকিয়ে নিম্নের চরণটি আবৃত্তি করেন :

لايغرنك عشاء ساكن ـ قد يوافي بالمنيات السحر

'ভয়-শঙ্কাহীন শান্ত সন্ধ্যা যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। কারণ মৃত্যু কখনো কখনো সকালেও আসে।' তারপর তিনি লাশকে সম্বোধন করে বলেন : ছেলে! দুনিয়াতে তুমি তেমনই ছিলে যেমন আল্লাহ বলেছেন :

المال والبنون زينة الحياة الدنيا.

'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা ও সৌন্দর্য।' আর তুমি ছিলে দুনিয়ার সর্বোত্তম শোভা। আমি আশা করি তুমি আজ থেকে চিরস্থায়ী সৎকর্মসমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়েছো, যার প্রতিদান সবচেয়ে বড়।'[৫৬৭]

তাঁর মৃত্যুতে অনেকেই রীতি অনুযায়ী শোক প্রকাশ করে পিতা 'উমারকে সান্ত্বনা দান করেন।

হযরত হাসান আল-বসরী (রহ) 'উমারকে সান্ত্বনা দিয়ে নিম্নের চরণটি লিখে পাঠান :[৫৬৮]

وعُوِّضت أجْرًا من فقيدٍ فلا يكن + فقيدُك لايأتي وأجرُك يذهب.

'মৃত ব্যক্তির বিনিময়ে আপনাকে প্রতিদান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এমন যেন না হয় যে, মৃত ব্যক্তিও আর ফিরে এলো না এবং প্রতিদানও চলে গেল।'

যখন চতুর্দিক থেকে 'আবদুল মালিকের মৃত্যুতে শোক ও সান্ত্বনা বাণী আসতে থাকলো তখন 'উমার (রহ) বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নিকট নিম্নের ফরমানটি পাঠান :[৫৬৯]

---

৫৬৬. প্রাগুক্ত
৫৬৭. সীরাতু ইবন 'আবদিল হাকাম-১১৬
৫৬৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/৩০৩, ৩১১
৫৬৯. প্রাগুক্ত-৩/৩০৯

إن عبد الملك كان عبدًا من عبيد الله، أحسن الله إليه وإلي فيه، أعاشه ماشاء الله وقبضه حين شاء، وكان ما علمتُ من صالحي شباب أهل بيته قراءةً للقرآن، وتحرِّيًا للخير، أعوذ بالله أن تكون لي محبَّةٌ أخالف فيها محبَّة الله، فإن ذلك لايحسُنُ في إحسانه وتتابع نعمه عليَّ، ولأعلمن مابكت عليه باكية ولاناحت عليه نائحة، قد نهينا أهله الذين هم أحق بالبكاء عليه.

'নিশ্চয় 'আবদুল মালিক অন্যদের মত আল্লাহর একজন বান্দা ছিল। আল্লাহ্ তার প্রতি এবং তার ব্যাপারে আমার প্রতিও অনুগ্রহ করেছেন। যতদিন ইচ্ছা আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং যখন ইচ্ছা তার জান কবজ করেছেন। আমার জানা মতে কুরআন পাঠ, কল্যাণমূলক কাজ করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সে ছিল তার পরিবারের সৎকর্মশীলদের অন্যতম। আল্লাহর ভালোবাসার বিরুদ্ধাচরণ হয়, তার প্রতি আমার এমন ভালোবাসার ব্যাপারে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই। কারণ আমার প্রতি তাঁর যে অনুগ্রহ সে দিক দিয়ে একাজ মোটেই সুন্দর ও শোভন হবে না। আমি জানি কোন ক্রন্দনকারী মহিলা না তার মৃত্যুতে ক্রন্দন করেছে, আর না কোন মাতমকারী তার জন্য মাতম করেছে। তার জন্য কান্নার সবচেয়ে বেশী অধিকার যাদের তাদেরকেও আমরা কাঁদতে নিষেধ করে দিয়েছি।'

আসলে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) প্রত্যেকটি কথা, কাজ ও আচরণে শরী'আতের সীমা-পরিধির মধ্যে থাকতেন। বিন্দুমাত্র সীমা অতিক্রম করা পছন্দ করতেন না। এ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির জন্য শোক ও সমবেদনা প্রকাশের ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) এক বোনের মৃত্যু হলো। দাফন শেষে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে সমবেদনা জানালো। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আরেক ব্যক্তি কাছে এসে সমবেদনা জানালো। এবারও কোন উত্তর দিলেন না। এ অবস্থা দেখে অন্যরা সমবেদনা জানানোর ইচ্ছা ত্যাগ করলো। 'উমার চলতে লাগলেন, তারাও তাঁর সাথে হাঁটতে লাগলো। বাড়ীর দরজায় পৌঁছে তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন :

اَدْرَكْتُ النَّاسَ وهم لا يُعَزون بامرأة إلا أن تكون أمًّا.

'আমি এমন সব লোকদের পেয়েছি যাঁরা কেবল মা ছাড়া অন্য কোন মহিলার মৃত্যুতে শোক ও সমবেদনা জানাতেন না।'[৫৭০]

'আবদুল 'আযীয

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) পুত্র 'আবদুল 'আযীয পরবর্তী খলীফা ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক ও মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মক্কা ও মদীনার গভর্ণর ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অন্যতম হাদীছ বর্ণনাকারী।

---

৫৭০. প্রাগুক্ত-৩/৩১০

'আবদুল্লাহ

তাঁর আরেক পুত্র 'আবদুল্লাহ খলীফা ইয়াযীদ ইবন আল-ওয়ালীদের পক্ষ থেকে কূফার গভর্ণর ছিলেন। তিনি যখন গভর্ণরের দায়িত্ব নিয়ে কূফায় আসেন তখন বসরার অধিবাসীরা সেখানে একটি খাল খননের আবেদন জানায়। তিনি বিষয়টি খলীফা ইয়াযীদকে অবহিত করেন। খলীফা তাঁকে লেখেন : 'ইরাক থেকে আদায়কৃত সকল রাজস্ব যদি ব্যয় হয়ে যায় তবুও সেখানে একটি খাল খনন করে দাও।' তিনি তিন লাখ দিরহাম ব্যয় করে একটি খাল খনন করেন যা ইতিহাসে তাঁর নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।[৫৭১]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) অন্যান্য সন্তানদের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে তিনি তাদের সকলকে যে সুশিক্ষিত করেছিলেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। একথাও জানা যায় যে, তাদের সকলে সচ্ছল জীবন যাপন করেছেন।

একবার খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূর 'আবদুর রহমান ইবন আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরকে (রা) বললেন : আমাকে কিছু উপদেশমূলক কথা শোনান। তিনি বললেন : আমি যা দেখেছি তাই বলবো, না যা শুনেছি তাই? বললেন : যা দেখেছেন তাই বলুন। তিনি বললেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) বারোটি ছেলে রেখে যান। আর তাদের জন্য রেখে যান মাত্র সতেরোটি দীনার। তার থেকে কাফনের জন্য পাঁচ দীনার, কবরের জায়গা ক্রয়ের জন্য দু'দীনার খরচ হয় এবং বাকী দশ দীনার তাঁর সকল সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। প্রত্যেকে মাত্র সতেরোটি দিরহাম করে পায়।

অন্যদিকে খলীফা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকও বারোটি ছেলে রেখে মারা যান। তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করলে তাদের প্রত্যেকে পায় দশ লক্ষ দিরহাম করে। আমি 'উমারের এক ছেলেকে একদিনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য এক শ' ঘোড়া দান করতে যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি হিশামের এক ছেলেকে মানুষের নিকট থেকে সাদাকা (দান) গ্রহণ করতে।[৫৭২]

কাব্য প্রতিভা

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) মধ্যে কাব্য চর্চার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও রুচি ছিল না। তবে উঁচু আদর্শ ও নৈতিকতার মূল্যবোধে সমৃদ্ধ কবিতা মাঝে মাঝে তিনি আবৃত্তি করতেন, আবার কখনো অন্যের মুখ থেকেও শুনতেন। সে সকল কবিতা ইবনুল জাওযী তাঁর গ্রন্থের ৩০তম অধ্যায়ে সংকলন করেছেন।

কবিদের সাথে 'উমারের সম্পর্ক

একথা সত্য যে, কবিতা জ্ঞানের একটি উত্তম ও কল্যাণকর শাখা। তবে কবিতা কেবল তখনই সাধারণ মানুষের শিক্ষা এবং সমাজ ও পরিবেশ পরিশুদ্ধির কাজে আসতে পারে যখন কবিগণ পরিশুদ্ধ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়। কিন্তু এটাকে দুর্ভাগ্য বা দুর্ঘটনা

---

৫৭১. ফুতূহ আল-বুলদান-৩৭৭

৫৭২. ইবনুল জাওযী-৩৩৮; 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৩৯৭

যাই বলা হোক না কেন, সে সময়ের কবিগণ ইসলামী নৈতিকতার মানদণ্ড থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। তারা গোত্রীয় অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ও বংশীয় গর্ব ও গৌরবের পতাকাবাহী তো ছিল, কিন্তু কোন নীতি-নৈতিকতার ধারে-কাছেও ছিল না। তা সত্ত্বেও হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) পূর্বে উমাইয়্যা খলীফাগণ তাদের প্রতি অত্যধিক আনুকূল্য প্রদর্শন করতেন।

খলীফাগণ তাদের দ্বারা নানা রকম অসৎ উদ্দেশ্য সাধন করতেন। বিশেষতঃ আন্ত-গোত্রীয় কোন্দল সৃষ্টিতে কবিদেরকে বেশী ব্যবহার করা হতো। বিনিময়ে তারা লাভ করতো সম্মান ও বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ। উমাইয়্যা আমলের সবচেয়ে বড় তিন কবি– ফারাযদাক, আখতাল ও জারীর তো এক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

উল্লেখিত তিন কবি একে অপরের বংশের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা, নিজের গোত্রকে অন্য সকল গোত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা, বংশীয় কৌলিন্য ও আভিজাত্য নিয়ে গর্ব করাকে খুব সম্মান ও মর্যাদার কাজ বলে মনে করতেন। বিশেষতঃ জারীর ও ফারাযদাক তাঁদের জীবনের চল্লিশটি বছর একে অপরের বিরুদ্ধে অশালীন, নিন্দামূলক এবং অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে কবিতা রচনা করে কাটিয়ে দেন। তাঁরা বসরার "আল-মিরবাদ" নামক বাজারে উপস্থিত হতেন এবং উষ্ট্রীর পিঠে বসে বসেই একে অপরকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করে তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা রচনা করতেন। সেসব কবিতার ভাষা যেমন অশালীন ও নোংরা তেমনি ভাবও ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সে আমলে সাধারণ আরববাসীর মধ্যে ছিল দারুণ কাব্যপ্রীতি। তাঁরা যখন আল-মিরবাদে উপস্থিত হতেন তখন শত শত মানুষ তাঁদের দু'জনের পাশে জমা হয়ে যেত। এভাবে তাদের কাব্যযুদ্ধে আরবের মানুষ দু'পক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। "কিতাবুল আগানী" গ্রন্থকার আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী তাঁদের দু'জন সম্পর্কে বলেছেন, একবার হজ্জ মওসুমে তাঁরা দু'জন মিনায় পরস্পর মুখোমুখী হলেন এবং সেখানেও পরস্পরের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমূলক কবিতার প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকলেন না।

আল-আখতাল– যিনি তাঁদের দু'জনের মতই বড় মাপের কবি ছিলেন। তাঁর অবস্থাও ভিন্ন কিছু ছিল না। ধর্মে তিনি খ্রীস্টান ছিলেন। খামরিয়াত বা মদের প্রশংসামূলক কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন চ্যাম্পিয়ন। নিজে আকণ্ঠ মদ পান করে মাতাল হতেন এবং শরাব ও সাকীর বর্ণনায় কবিতা রচনা করতেন। খলীফা 'আবদুল মালিক ও তাঁর পরবর্তী উমাইয়্যা খলীফাগণ তাঁকে ভীষণ ভালোবাসতেন। তিনি উমাইয়্যা খান্দানের প্রশংসা এবং প্রতিপক্ষ হাশিমী খান্দানের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে কবিতা রচনা করতেন।

কবি জারীর প্রথম যখন খলীফা 'আবদুল মালিকের দরবারে আসেন এবং তাঁর প্রশংসায় প্রথম কাসীদাটি আবৃত্তি করেন তখন 'আবদুল মালিক একজন সতর্ক রাজনীতিক এবং অনেকটা কৃপণ প্রকৃতির রাষ্ট্রনায়ক হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এক শ' উট, আশিটি সুদর্শন দাস

এবং প্রচুর সোনা-রূপা উপঢৌকন দেন।[৫৭৩] কবি ফারাযদাককেও তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ একই রকম ইনাম দিতেন। কিতাবুল আগানীর একটি বর্ণনায় জানা যায়, খলীফা 'আবদুল মালিক কবি আখতালকে এ ক্ষমতা ও অধিকার দিয়ে রেখেছিলেন যে, তিনি যখন ইচ্ছা বায়তুল মাল থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতে পারতেন।

একবার কবি আখতাল নির্ধারিত সময়ের পরে খলীফা 'আবদুল মালিকের দরবারে উপস্থিত হলে খলীফা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, কোথায় আর যেতে পারি? বায়তুল মাল পর্যন্ত গিয়েছিলাম মদ ও মাংসের অর্থ উঠানোর জন্য।[৫৭৪] মোটকথা হযরত মু'আবিয়ার (রা) সময় থেকে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) আগ পর্যন্ত সকল উমাইয়্যা খলীফাদের দরবারে আখতালের অবাধ যাতায়াত ছিল। খলীফাদের মনোরঞ্জনমূলক কবিতা রচনা করে প্রচুর ইনাম ও উপঢৌকন হাতিয়ে নেন। উল্লেখিত তিন কবি ছাড়াও কবি কুছায়্যির ও নুসাইবও উমাইয়্যা শাসকদের দরবারী ও পারিবারিক কবি ছিলেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) প্রথম জীবনে নুসাইবকে সঙ্গ দিতেন।

একবার একটি মাত্র মজলিসে তাঁকে এক হাজার দীনার দান করেন। অন্য একজন খলীফা তনয় তাঁকে দশ হাজার দিরহাম দেন। 'আবদুল মালিক তাঁকে নিয়ে এক সঙ্গে আহার করতেন এবং হাজার হাজার দিরহাম বখশীশ দিতেন।[৫৭৫]

যাই হোক, উমাইয়্যাদের নিকট থেকে সে যুগের কবিগণ প্রচুর অর্থ-বিত্ত ও জমিদারী লাভ করে বিলাসী জীবন যাপন করতেন। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর সেকালের বড় বড় আরব কবিগণ তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে কাসীদা পাঠ করার জন্য দিমাশকে সমবেত হন। তাঁদের মধ্যে নুসাইব, জারীর, ফারাযদাক, আহওয়াস, কুছায়্যির, হাজ্জাজ আল-কুদা'ঈ, 'উমার ও আখতালের মত শ্রেষ্ঠ কবিগণও ছিলেন। তাঁরা ছিলেন তৎকালীন ইসলামী দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কবি। পূর্ববর্তী খলীফাগণ তাদেরকে লা খিরাজ জমিদারী দিয়ে রেখেছিলেন এবং নগদে লাখ লাখ দিরহাম দান করেছিলেন।

নতুন খলীফার ক্ষমতা গ্রহণের খবর শুনে তাঁরা খুশীতে ডগমগ হয়ে এবং বড় ধরনের প্রাপ্তির আশায় দিমাশ্‌কে আসলেন। খলীফার সংগে সাক্ষাতের আশায় দীর্ঘদিন অপেক্ষায় থাকলেন। কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁদের কাউকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন না। অন্যদিকে তাঁর দরবারে 'আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিছদের অবাধ যাতায়াত ছিল। তাঁদের প্রতি কোন রকম নিষেধাজ্ঞা ছিল না। কিন্তু কবিদের সাক্ষাতের কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু তাঁরাও ছিলেন অনমনীয়। নতুন খলীফার সঙ্গে

---

৫৭৩. ইবন কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়াশ শু'আরা-১/৫; কিতাবুল আগানী-৭/৪১, ৪৪, ৫১, ৫২, ১৭২
৫৭৪. কিতাবুল আগানী-৭/১৭২-১৭৩
৫৭৫. প্রাগুক্ত-১/১৩৫-১৩৬, ১৪৫

সাক্ষাৎ ছাড়া তাঁরা দিমাশ্‌ক ত্যাগ করবেন না। তাঁদের মধ্যে কথার উস্তাদ ছিলেন কবি জারীর। সবাই মিলে তাঁকেই প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠালেন। তিনি যে কোনভাবে সাক্ষাতের অনুমতি সংগ্রহ করবেন। জারীর খলীফার দরবার কক্ষের ফটকে উপস্থিত হলেন। সেখানে শামের বিখ্যাত ফকীহ 'আওন ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হুযালীকে পেলেন। তাঁকে দেখেই তিনি তৎক্ষণাত নীচের স্তবক দু'টি আবৃত্তি করেন :

يا أيها الرجل المرخي عمامته + هذا زمانك أتي قد مضى زمني

أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه + أني لدى الباب كالمصفود في قرن

'ওহে লম্বা পাগড়ীধারী কারী! এটা তোমাদের যুগ এসেছে এবং আমাদের যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে।

যদি তুমি খলীফার সংগে সাক্ষাৎ কর তাহলে তাঁকে অবহিত করবে যে, আমি শতবর্ষ যাবত তাঁর দ্বারে শৃঙ্খল পরিহিত ব্যক্তির মত দাঁড়ানো আছি।'

'আওন ইবন 'আবদিল্লাহ আল-হুযালী ভিতরে গেলেন, আমীরুল মু'মিনীনকে দ্বারে অপেক্ষমান কবি জারীরের কথা জানালেন এবং সাথে সাথে কবিতার স্তবক দু'টিও শুনালেন। আমীরুল মু'মিনীন 'উমার কবি জারীরকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর জারীর বললেন : আমি শুনেছি আপনি নীতিকথা ও উপদেশ পছন্দ করেন। আমি এমন কিছু কথা ছন্দোবদ্ধ করেছি, অনুমতি পেলে শুনাতে পারি।

অনুমতি পেয়ে তিনি একটি গভীর আবেগপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটির বিষয় ছিল হিজাযের অনাথ, ইয়াতীম মেয়ে, অভাবী মানুষ ও বিধবাদের দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশার একটি করুণ চিত্র। জারীর কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন, আর খলীফা 'উমার (রহ) শুনছিলেন। তাঁর দু' চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। কবিতা আবৃত্তি শেষ হওয়ার সাথে সাথে 'উমার (রহ) একপাল উটের পিঠে খাদ্য, বস্ত্র ও নগদ অর্থ বোঝাই করার নির্দেশ দিলেন। বোঝাই শেষ হওয়ার সাথে সাথে হিজাযের ঐ সকল ইয়াতীম ও বিধবাদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। আমীরুল মু'মিনীনের এই রোনাজারীর কথাও জারীর তাঁর কবিতায় ধরে রেখেছেন। এরপর আমীরুল মু'মিনীন জারীরকে বলেন :

أخبرني أمن المهاجرين أنت ياجرير؟

'জারীর! আপনি কি মুহাজিরদের অন্তর্গত?'

জারীর বললেন : না, আমি মুহাজিরদের কেউ নই।

আবার জিজ্ঞেস করলেন : তাহলে আপনি দরিদ্র আনসারদের অথবা তাদের বন্ধুদের কেউ?

জারীর বললেন : তাদেরও কেউ নই।

'উমার (রহ) জিজ্ঞেস করলেন : তাহলে আপনি কি ঐ সকল মুসলিম মুহাজিরদের কেউ যারা বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে এবং মুসলমানদের শত্রু নিধনে সাহায্য করেছে?

জারীর বললেন : না, তাদেরও কেউ নই।

'উমার (রহ) বললেন : فلا أرى لك فى شئ من هذا الفئ حقا۔

'জারীর, মুসলমানদের ফাই (যুদ্ধ ছাড়াই অর্জিত) সম্পদে আপনার কোন অধিকার আছে বলে আমি দেখছি না।'

সাথে সাথে জারীর বললেন : আমার এ অধিকার আছে যে, আমি একজন মুসাফির, বহু দূর থেকে এসেছি এবং আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় দ্বারে বসে থাকতে থাকতে দারুণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

'উমার (রহ) মৃদু হেসে একজন কর্মকর্তাকে বিশটি দীনার আনার নির্দেশ দিলেন। দীনারগুলো আনার পর 'উমার (রহ) সেগুলো জারীরের হাতে দিয়ে বললেন : এই বিশটি দীনার আমার ব্যক্তিগত সম্পদের অংশ। এগুলোই অবশিষ্ট ছিল। ইচ্ছা করলে আপনি এগুলো নিতে পারেন এবং আমার প্রশংসা অথবা নিন্দা যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

জারীরের মধ্যে নিন্দার দুঃসাহস আর থাকতে পারে কিভাবে? তিনি বললেন : আমি আপনার প্রশংসা করবো এবং এ দানের জন্য গর্বও করবো। জারীর সকৃতজ্ঞচিত্তে বিশ দীনার গ্রহণ করে সালাম জানিয়ে বিদায় নেন। বাইরে অপেক্ষমান কবিগণ তাঁকে ঘিরে ধরলো এবং তিনি তাদেরকে কাহিনীর আদ্যপান্ত শোনালেন এভাবে :

إنى خرجت من عند رجل يعطى الفقراء ولايعطى الشعراء

'আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে বের হয়ে আসছি যিনি অভাবীদের দেন, কবিদের দেন না।'

ইবনুল জাওযীর বর্ণনা অনুযায়ী ঘটনাটি এ রকম : জারীর তাঁর কবিতাটি 'আদী ইবন আরতাতকে শোনান। 'আদী ভিতরে যেয়ে হযরত 'উমারকে বলেন, বাইরে একদল কবি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি নিজেই তাঁদের জন্য সুপারিশ করে বলেন, কবিদের বায়তুল মালে অংশ আছে। প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 'আব্বাস ইবন মিরদাস আল-আসলামীকে তাঁর একটি প্রশংসামূলক কবিতার জন্য বখশীশ দিয়েছিলেন। 'উমার 'আদীকে 'আব্বাসের সেই কবিতাটি শোনাতে বললেন। 'আদী আবৃত্তি করে শোনালেন। কবিতাটির বিষয়বস্তু ছিল, হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জন্ম, নবুওয়াত প্রাপ্তি, হিজরাত, কুফরের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে ইসলামের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার এক চমৎকার বর্ণনা।

হযরত 'উমার (রহ) কবিতাটি শোনার পর জানতে চাইলেন, দরজায় অপেক্ষমান কবিদের নাম কি? 'আদী বললেন : ফারাযদাক, জামীল, 'উমার ইবন আবী রাবী'আ, আখতাল, আহওয়াস ও জারীর। 'উমার (রহ) তাঁদের প্রত্যেকের এমন কিছু কবিতা 'আদীকে শোনান যাতে চরম অশ্লীলতা, পাপাচারের কথকতা, অনৈতিকতা এবং অপরিচ্ছন্ন কল্পনা বিধৃত হয়েছে। 'উমার (রহ) কসম খেয়ে বলেন, আমি কখনো তাদেরকে আমার নিকট আসার অনুমতি দেব না। তবে জারীরের একটি কবিতা পাঠ

করে বলেন, তাকে ভিতরে নিয়ে আসুন। তিনি ভিতরে ঢুকেই কবিতা আবৃত্তি করতে আরম্ভ করেন। 'উমার (রহ) তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, কাজের কবিতা শোনাও। এরপর জারীর পূর্বে উল্লেখিত কবিতাটি পাঠ করেন। ইনাম হিসেবে 'উমার (রহ) কবি জারীরের হাতে এক শ' দিরহাম তুলে দিয়ে বলেন, আমার ব্যক্তিগত অর্থের মধ্যে মাত্র তিন শ' দিরহাম ছিল, তার থেকে আগেই দু'জনকে দু' শ' দিয়ে দিয়েছি। বাকী এক শ' আপনাকে দিলাম।[৫৭৬] জারীর এক শ' দিরহাম নিয়ে বাইরে আসেন এবং অপেক্ষমান কবিদের সেই সব কথা বলেন যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

উমাইয়্যা খান্দানের পূর্ববর্তী খলীফা ও আমীর-উমারাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সে যুগের কবিগণ একেবারেই লাগামহীন হয়ে পড়েছিল এবং সমাজে মানুষের নৈতিকতার যে চরম ধস নেমেছিল তার পিছনে তাদের রচিত কবিতার বিরাট অবদান ছিল। এ কারণে 'উমার (রহ) যেখানে জ্ঞানী-গুণী, ও 'আলিম-'উলামাদের দারুণ সম্মান ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, বিভিন্ন ভাষার অনুবাদকদের উঁচুমানের সম্মানী দিয়েছেন, সেখানে কোন বড় কবিকে দু'-এক শ' দিরহামের বেশী দেননি। অবশ্য এতে কবিদের মন-মানসিকতায় দারুণ পরিবর্তনও ঘটেছিল।

কবি কুছায়্যির

কবি কুছায়্যির দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হন এবং নিজের দুরবস্থার কথা তুলে ধরে সাহায্যের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। 'উমার কুছায়্যিরকে লক্ষ্য করে বলেন : ওহে কুছায়্যির!

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل.[৫৭৭]

'সাদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য।'

তুমি কি এর কোন একটিতেও পড়? কুছায়্যির বললেন : হাঁ, আমি পাথেয় শেষ হয়ে যাওয়া পথিকের মধ্যে পড়ি। 'উমার জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি আবূ সা'ঈদের অতিথি নও? কুছায়্যির বললেন : হাঁ, আমি তাঁর অতিথি। 'উমার বললেন : আমি আবূ সা'ঈদের অতিথির পাথেয় শেষ হয়েছে বলে মনে করি না। এরপর কুছায়্যির 'উমারের অনুমতি নিয়ে তাঁকে একটি দীর্ঘ কবিতা শোনান। তারপর কবি আল-আহওয়াস 'উমারকে একটি কবিতা শোনান। এমনিভাবে কবি নুসাইবও 'উমারকে একটি কবিতা শোনাতে চান, কিন্তু অনুমতি না দিয়ে তাকে দাবিক যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন। অতঃপর 'উমার কবি

---

৫৭৬. ইবনুল জাওযী-১৬২; আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/৯১-৯২

৫৭৭. সূরা আত-তাওবা-৬০

কুছায়্যিরকে তিন শ', আল-আহওয়াসকে তিন শ' এবং নুসাইবকে দেড় শ' দিরহাম দানের নির্দেশ দেন।[৫৭৮] ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, এ তাঁর জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা।

কবি নুসাইব

কবি নুসাইব ইবন রাবাহ একদিন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। তিনি অনুমতি দিলেন না। কবি তখন দ্বাররক্ষীদের বললেন, তোমরা আমীরুল মু'মিনীনকে অবহিত কর যে, আমি এমন একটি কবিতা রচনা করেছি যার প্রথম কথাটি হলো "আল-হামদু লিল্লাহ"। তারা আমীরুল মু'মিনীন 'উমারকে অবহিত করলো। এবার তিনি কবিকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ভিতরে প্রবেশ করে তিনি যে কবিতাটি শোনালেন তার প্রথম দু'টি চরণ এই :[৫৬৯]

الحمد لله أما بعد ياعمر + فقد اتتنا بك الحاجات والقدر

فأنت رأس قريش وإبن سيدها + والرأس فيه يكون السمع والبصر.

'সকল প্রশংসা আল্লাহর। অতঃপর হে 'উমার! নানাবিধ প্রয়োজন ও ভাগ্য আমাদেরকে আপনার নিকট নিয়ে এসেছে।

আপনি হলেন কুরায়শদের মাথা এবং ঐ গোত্রের নেতার বংশধর। আর মাথায় থাকে কান ও চোখ।'

একবার কবি জারীর একটি কবিতায় 'উমারের প্রশংসা করেন। তার একটি চরণ এই :

هذى الأرامل قد قضيت حاجتها + فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

"এ সকল বিধবাদের প্রয়োজন আপনি পূর্ণ করেছেন। কিন্তু এই বিপত্নীকের প্রয়োজন পূরণের জন্য কে আছে?"

'উমার তাঁকে তিন শ' দিরহাম দানের নির্দেশ দেন। একবার রজয ছন্দের কবি দুকাইন একটি কবিতায় 'উমারের প্রশংসা করলে তিনি তাঁকে পনেরোটি মাদি উট দানের নির্দেশ দেন। 'উমার তখন মদীনার ওয়ালী।[৫৮০]

'উমার ও কবি দুকাইন ইবন সা'ঈদ আদ-দারিমী

দুকাইন ছিলেন একজন রজয ছন্দের পল্লী কবি। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খলীফা সুলায়মানের সময় যখন মদীনার ওয়ালী ছিলেন তখন দুকাইন তাঁর প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করেন। 'উমার খুশী হয়ে তাঁকে উৎকৃষ্ট জাতের পনেরোটি উট দান করেন। তিনি মদীনার আশে পাশে উটগুলো চরাতে থাকেন। উটগুলোর বর্ধিষ্ণু দেহ ও

---

৫৭৮. ইবন কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা'-২৫৪-২৫৬; আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/৮৬-৯১

৫৬৯. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৫/২৯২

৫৮০. প্রাগুক্ত-৫/২৯২, ২/৮৪

নাদুস-নুদুস চেহারা দেখে তিনি দারুণ পুলকিত হতেন। সেগুলো ছেড়ে যেমন কোথাও যেতে ইচ্ছে হতো না, তেমনি বেচতেও মন সায় দিত না। এমনই অবস্থায় একদিন তাঁর কিছু বন্ধু তাঁর নিকট এসে বললো, খুব শীঘ্র তারা তাদের স্বদেশভূমি নাজদের দিকে যাত্রা করবে। উল্লেখ্য যে, কবি দুকাইন নাজদের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের সফরসঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁরা যাত্রার দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললেন।

কবি দুকাইন গেলেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট থেকে বিদায় নিতে। তিনি 'উমারের নিকট দু'জন সম্মানীয় ব্যক্তিকে বসা দেখলেন, যাঁদেরকে তিনি চিনতেন না। তিনি যখন উঠে আসবেন তখন 'উমার বললেন : দুকাইন! আমার একটি উচ্চাভিলাষী মন আছে। আমার বর্তমান অবস্থার চেয়ে উন্নততর কোন অবস্থায় পৌঁছার কথা যদি জানতে পার তাহলে আমার নিকট আসবে, আমি তোমাকে আরো ইনাম-বখশীশ দেব। দুকাইন বললেন : মাননীয় আমীর! আপনার একথার জন্য সাক্ষী থাকা প্রয়োজন। 'উমার বললেন : আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি। দুকাইন বললেন : না, তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে কেউ সাক্ষী থাকা দরকার। 'উমার বললেন : এই দুইজন সম্মানীয় বৃদ্ধ সাক্ষী থাকলেন।

এবার দুকাইন তাঁদের একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন : আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোন! আপনাকে চেনার জন্য আপনার নামটা আমার জানা প্রয়োজন। লোকটি বললেন : সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা)।

দুকাইন 'উমারের দিকে তাকিয়ে বললেন : এমন একজন বড় মাপের সাক্ষী পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

দুকাইন এবার দ্বিতীয় ব্যক্তিটির দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন : অনুগ্রহ করে আপনার পরিচয়টি কি একটু দিবেন?

লোকটি বললেন : এই আমীরের ('উমার) দাস আবূ ইয়াহইয়া।

দুকাইন বললেন : দ্বিতীয় সাক্ষী হলেন আপনার পরিবারেরই একজন।

এরপর দুকাইন তাঁর উটগুলো নিয়ে নাজদে ফিরে গেলেন এবং তার উপর ভিত্তি করে আরো অনেক উট ও দাস-দাসীর মালিক হলেন।

সময় তার আপন গতিতে গড়িয়ে চললো। একদিন দুকাইন নাজদের আল-ইয়ামামা মরু এলাকায় তাঁর উটগুলো চরাচ্ছেন। এমন সময় একজন ঘোষকের মুখে জানতে পারলেন, আমীরুল মু'মিনীন সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক ইনতিকাল করেছেন। তিনি তার নিকট পরবর্তী খলীফা কে হয়েছেন তা জানতে চাইলেন। সে বললো : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয। 'উমারের নামটি শোনার সাথে সাথে তিনি দারুল খিলাফা দিমাশ্‌কে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

এক সময় তিনি দিমাশ্‌কে পৌঁছলেন। সেখানে তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবি জারীরের সাথে তাঁর দেখা হলো। জারীর সবে মাত্র খলীফার সাথে দেখা করে ফিরছেন। দুকাইন তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে বললেন : আবূ হারযা! কোথা থেকে আসছেন?

জারীর : খলীফার দরবার থেকে আসছি। তিনি দুঃস্থ-দরিদ্রদেরকে দেন, কবিদেরকে দেন না। আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যান। সেটাই আপনার জন্য ভালো হবে।

দুকাইন : খলীফার নিকট আপনাদের চাইতে আমার একটা ভিন্ন মর্যাদা আছে।

জারীর : ঠিক আছে, আপনি যা ভালো মনে করেন। দুকাইন খলীফার বাসভবনে গিয়ে পৌঁছলেন। দেখলেন, খলীফা আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে এবং তাকে ঘিরে আছে ইয়াতীম, বিধবা ও বিভিন্ন ধরনের অধিকার বঞ্চিত লোকেরা। এই ভীড়ের বেষ্টনী ভেদ করে তিনি খলীফার নিকট পৌঁছতে পারলেন না। অবশেষে উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগলেন নিম্নের চরণ দু'টি :

يا عمر الخيرات والمكارم + وعمر الدسائع العظائم

إني امرء من قطن دارم + طلبت ديني من أخي المكارم.

'হে উত্তম কর্মকাণ্ড ও মহৎ গুণাবলীর অধিকারী 'উমার! হে সুবিশাল খাঞ্চার অধিকারী 'উমার!

আমি হাদারামাওত উপত্যকার কাতান জনপদের দারিম গোত্রের একজন মানুষ। আমি আমার মহান ভাইয়ের নিকট আমার পাওনা দাবী করছি।'

দুকাইনের কণ্ঠস্বর শুনে আমীরুল মু'মিনীনের দাস আবূ ইয়াহইয়া সে দিকে তাকালেন এবং কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন :

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার নিকট এই বেদুঈনের পাওনার ব্যাপারে আমি সাক্ষী আছি।

'উমার বললেন : তার কথা আমার মনে আছে। তাকে আমার কাছে আন। দুকাইন খলীফার নিকট আসলে তিনি বললেন : দুকাইন! মদীনায় আমি যে একটি কথা তোমাকে বলেছিলাম তাকি তোমার স্মরণ আছে? আমি বলেছিলাম : আমার একটি মন আছে যে সব সময় আমি যা লাভ করি তা থেকে উন্নততর কিছু লাভের আশায় উদগ্রীব থাকে।

দুকাইন বললেন : আমীরুল মু'মিনীন! আমার সেকথা মনে আছে।

'উমার বললেন : আমি দুনিয়ার পরম প্রত্যাশিত বিষয় রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয়েছি। এখন আমার মন আখিরাতের পরম প্রত্যাশিত বিষয় জান্নাত লাভের জন্য উদগ্রীব। পৃথিবীর বাদশারা তাদের বাদশাহীকে পার্থিব সম্মান ও মর্যাদা লাভের পথ ও পন্থা হিসেবে বিবেচনা করে। আর আমি এটাকে করবো আখিরাতের সম্মান ও মর্যাদা লাভের উপায়।

তারপর তিনি বললেন : দুকাইন! আল্লাহর কসম! আমি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের সম্পদ থেকে না একটি দিরহাম, আর না একটি দীনার গ্রহণ করেছি। এখন আমি মাত্র এক হাজার দিরহামের মালিক। তার থেকে অর্ধেক তুমি নিয়ে বাকী অর্ধেক আমার জন্য রেখে যাও। দুকাইন পাঁচ শ' দিরহাম নিয়ে ফিরে আসেন।

পরবর্তীকালে দুকাইন বলতেন : আল্লাহর কসম! 'উমার প্রদত্ত এই অর্থের চেয়ে অধিক বরকতময় আর কোন অর্থ-সম্পদ আমি দেখিনি।[৫৮১]

ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেছেন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয একদিন শুনতে পেলেন বাহনের পিঠে আরোহী জনৈক পথিক জাহিলী যুগের বিখ্যাত ভোগবাদী কবি তারাফার নিম্নের চরণগুলো সুর করে গাইতে গাইতে চলেছে:

فلولا ثلاث هن من لذة الفتى + وجدك لم أحفل متى قام عودى

فمنهن سبق العاذلات بشربة + كميت متى ماتغل بالماء تزبد

وكرى إذا نادى المضاف محنبا + كسيد الغضا فى الطخية المتورد

وتقصير يوم الدجن والدجن معجب + ببهكنة تحت الطراف الممدد

যদি না থাকিত মোর
এ জীবনে তিনটি কামনা,
নিরাশ শুশ্রূষু তরে
থাকিত না আমার ভাবনা।
রক্তাভ মদিরা পান
পিছে ফেলি নিন্দুকের দল,
যে- সুরা মিশ্রণে বারি
হয়ে ওঠে ফেনিল উচ্ছল।

দ্বিতীয় কামনা মোর
শুনি যবে আর্তের আহ্বান
ছুটি যে উদ্ধারিতে
অশ্বযোগে শার্দুল সমান।
যে শার্দুল করে বাস
মরুভূমি 'গাজা' বৃক্ষ তলে
তৃষ্ণার্ত কূপের তীরে
খেয়ে তাড়া বেগে যায় চলে।

তৃতীয় কামনা মোর

৫৮১. প্রাগুক্ত-৩/২০; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৩৩০

হ্রাস করা বাদলের দিন[৫৮২]
যাপি উচ্চ তাঁবু তলে
লয়ে প্রিয়া লাজুক সৌখিন।[৫৮৩]

'উমার মন্তব্য করলেন : আর আমি, তিনটি জিনিস যদি না থাকতো তাহলে আমার জীবন কতদিন থাকলো তার পরোয়া করতাম না। একটি হলো, যদি না আমি যুদ্ধে বেরোতাম, দ্বিতীয়টি হলো, যদি না আমি সমানভাবে বণ্টন করতাম, আর তৃতীয়টি হলো, যদি না আমি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতাম।[৫৮৪]

বক্তৃতা-ভাষণ

বক্তৃতা-ভাষণ হলো মানুষকে মুগ্ধ ও প্রভাবিতকরণের একটি শিল্প ও শাস্ত্র। এর দ্বারা মানুষকে সুপথে ও কুপথে উভয় দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। সেই আদিকাল থেকে নিয়ে আধুনিককাল পর্যন্ত মানুষের নিকট এর প্রয়োজনীয়তা সমানভাবে বিদ্যমান। এ পৃথিবীতে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত, খুনখারাবী, জুলুম-অত্যাচার হয়েছে তার সবকিছুর পিছনে যেমন এই শাস্ত্রের কোন না কোন ভূমিকা রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এর বিপরীতে যত শান্তি ও সন্ধি, শুভ ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পশ্চাতেও রয়েছে এর বিশেষ অবদান। তাই মানব জাতির ইতিহাসের সকল পর্যায়ে সকল জাতি-গোষ্ঠীর নিকট এই শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

জাহিলী আরবদের মধ্যে এর যথেষ্ট চর্চা ও প্রয়োগ হয়েছে। কলহপ্রিয় ও যুদ্ধবাজ জাতি হিসেবে তারা ইতিহাসে খ্যাত। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য তারা বক্তৃতা-ভাষণের যেমন অপব্যবহার করেছে, তেমনি রণক্লান্ত অবস্থায় সন্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এর সদ্ব্যবহার করেছে।

ইসলামের আবির্ভাবে আরবদের এই বাকশিল্পের আরো উন্নতি ঘটে। ইসলাম এর গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দেয়। ইসলামের দা'ওয়াত ও প্রচার-প্রসারে বক্তৃতা-ভাষণ দারুণ ভূমিকা রাখে। দীনের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়। জুম'আ ও 'ঈদের নামাযে, হাজ্জ সম্পাদনে বক্তৃতা-ভাষণ গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যেমন এ শিল্পের চমৎকার ব্যবহার করেছেন, তেমনি খুলাফায়ে রাশেদীন, মুসলিম সেনাপতিগণও এর সুবিধা যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

---

৫৮২. হ্রাস করা বাদলের দিন– অর্থাৎ লাজুক সৌখিন প্রিয়ার সাথে উঁচু তাঁবুর বাসরে একটি বাদল ঘন দিন যাপন করে দীর্ঘ সময়কে কমিয়ে দেওয়া। একা একা বাদল ঘন দিন কাটানো কষ্টকর। প্রেয়সীর সঙ্গে এমন দিন কাটানো, আনন্দময় অবস্থায় কেটে যায় বলে মনে হয় সময় আরো দীর্ঘ হলে ভালো হতো। এই অর্থে দীর্ঘ সময় কমানো।

৫৮৩. কাব্যানুবাদ, নূরুদ্দীন আহমদ, অস-সব'উল মু'আল্লাকাত (কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা-১৯৭২), পৃ. ১৯৯

৫৮৪. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৬/১২-১৩, ২২০

উমাইয়্যা যুগে এ শিল্পের আরো উন্নতি ও বিকাশ ঘটে। এ সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। তারা সকলে জনগণকে প্রভাবিত করার জন্য ব্যাপকভাবে বক্তৃতা-ভাষণকে কাজে লাগায়। তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদিতে ব্যবহার করে। ফলে খুতবা তথা বক্তৃতা-ভাষণ শাণিতরূপ ধারণ করে। তবে খুলাফায়ে রাশেদীন ও বানী উমাইয়্যা শাসকদের বক্তৃতা-ভাষণের ভাব-ভাষা ও রূপ-রীতির দারুণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অতি সংক্ষেপে দু'একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলে তা স্পষ্ট হবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সর্বপ্রথম যে ভাষণটি দেন, তা ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। তার কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ :

أيها الناس! لقد وليت عليكم ولست بخيركم... من رأى منكم فيَّ اعواجًا فليقوّمه، أطيعوني ماأطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم.

'ওহে জনমণ্ডলী! আমাকে আপনাদের নেতৃত্বের আসনে বসানো হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের মধ্যের সর্বোত্তম ব্যক্তি নই।... আপনাদের মধ্যে কেউ যদি আমার মধ্যে কোন রকম বক্রতা দেখে তিনি যেন তা সোজা করে দেন। যতক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্য করবো ততক্ষণ আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। আমি যখন তাঁর অবাধ্যতা করবো তখন আপনারা আমার আনুগত্য করবেন না।'

উপরের বাক্যগুলোতে চমৎকার এক বিনয়ী ও কোমল ভাব ফুটে উঠেছে। পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের সকল বক্তৃতা-ভাষণেও একইরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু স্বৈরাচারী উমাইয়া খলীফা ও আঞ্চলিক গভর্ণরদের বক্তৃতা-ভাষণের রূপ পাল্টে যায়। পূর্বের বিনয় ও কোমলতার স্থলে দেখা যায় রূঢ়তা ও হুমকি-ধমকী। যেমন মিসরের গভর্ণর 'উতবা ইবন আবী সুফইয়ান তথাকার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ ভাষণ দেন। তার দু'টি বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করুন :

فوالله لأقطعنَّ بطون السياط على ظهركم، ولن نبخل عليكم بالعقوبة ماجدتم علينا بالمعصية.

'আল্লাহর কসম! আমি আমার চাবুক তোমাদের পিঠের উপর ছিন্নভিন্ন করে ফেলবো। তোমরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে আবার অপরাধমূলক কাজ কর তাহলে আমরা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দানে কার্পণ্য করবো না।'

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ইরাকবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ ভীতিপ্রদ ও জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তার কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ :

أيها الناس! من أعياه داؤه فعندى دواؤه، ومن استطال أجله فعليَّ أن أعجّله، ومن ثقل رأسه وضعت عنه ثقله، ومن استطال ماضي عمره قصّرت عليه باقيه... والله

لآمر أجدكم أن يخرج من باب من أبواب المسجد، فيخرج من الباب الذى يليه، إلا ضربت عنقه.

'ওহে জনমণ্ডলী! কারো রোগ যদি দুরারোগ্য হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমার নিকট তার ঔষধ আছে। কারো মৃত্যু যদি বিলম্ব করে তাহলে আমার কর্তব্য হবে তা দ্রুত করা। কারো মাথা যদি তার ঘাড়ের উপর ভারী বোঝা হয়ে পড়ে তাহলে আমি সে বোঝা নামিয়ে ফেলবো।... আল্লাহর কসম! আমি যখন তোমাদেরকে মসজিদের কোন একটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিব তখন প্রত্যেকে তার নিকটবর্তী দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কেউ এর অন্যথা করলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।'

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর খলীফা আবদুল মালিকের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণের দু'টি বাক্য নিম্নরূপ :

أيها الناس! من قال منكم اتقوا الله، ضربنا عنقه.

'ওহে জনমণ্ডলী! তোমাদের কেউ যদি আমাকে বলে, আল্লাহকে ভয় কর, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব।'

উপরের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিগুলো দ্বারা কারো বুঝতে কষ্ট হয় না যে, উমাইয়্যা খলীফাদের বক্তৃতা-ভাষণ কেমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। খলীফা ও তাদের আজ্ঞাবহরা তাদের বক্তৃতা-ভাষণে সব সময় জনগণকে হুমকি-ধমকী দিয়ে তটস্থ করে রাখতো। অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত করলেন। তাঁর কল্যাণে শাসক শ্রেণীর বক্তৃতা-ভাষণে আবার ফিরে এলো খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের সেই বিনয়, কোমলতা, তাকওয়া এবং জনগণের সাথে পরামর্শের কথা।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যদিও একজন বাগ্মী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেননি, তবে তাঁর বক্তৃতা-ভাষণ ছিল দারুণ প্রভাব সৃষ্টিকারী ও মনোমুগ্ধকর। ইবনুল জাওযী "সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয" এবং আল-জাহিয "আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন" গ্রন্থে তাঁর বেশ কিছু ভাষণ সংকলন করেছেন।[৫৮৫]

খিলাফতের গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পিত হওয়ার পর তিনি প্রথম যে ভাষণটি দেন তা একটু লক্ষ্য করা যাক। তিনি বলেন :

ياأيها الناس، إني قد ابتُليت بهذا الأمر من غير رأى كان مني فيه، ولاطلبة ولامشورة من المسلمين، وإني قد خلعتُ ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم.

---

৫৮৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১৯৪

'ওহে জনমণ্ডলী! খিলাফতের এ দায়িত্বভার আমার কাঁধে চাপানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার কোন মতামত নেওয়া হয়নি, আমি তা চাইনি এবং মুসলমানদের কোন পরামর্শও নেওয়া হয়নি। আপনাদের কাঁধে আমার বাই'আতের যে বোঝা চাপানো হয়েছে আমি তা নামিয়ে নিলাম। এখন আপনারা নিজেদের জন্য অন্য কাউকে খলীফা মনোনীত করুন।'

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো–

قد اخترناك يأمير المؤمنين ورضينابك، فل امرنا باليمين والبركة.

'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা আপনাকেই নির্বাচিত করেছি এবং আপনার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। এখন আপনি শুভ ও সমৃদ্ধির সাথে আমাদের অর্পিত দায়িত্ব পরিচালনা করুন।'

পুনরায় জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত হয়ে তিনি যে ভাষণ দেন তাতে খলীফা হযরত আবূ বকরের (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রদত্ত প্রথম ভাষণের বাক্যগুলিও উচ্চারণ করেন। তিনি আরো বলেন :

ألا وإنكم تعدون الهارب من ظلم إمامه عاصيا، ألا وإن أولاهما بالمعصية الإمام الظالم.

'ওহে, আপনারা তো শাসকের অত্যাচারে ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো ব্যক্তিকে অপরাধী গণ্য করেন। শুনে রাখুন, তাদের দু'জনের মধ্যে অত্যাচারী শাসকই বড় অপরাধী।'

সাহাবায়ে কিরাম নুবুওয়াতের পদ্ধতিতে যে খিলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মহান চার খলীফা যে মূলনীতির ওপর তা পরিচালনা করেন মাত্র তিরিশ বছর পর উমাইয়্যা শাসকরা তার থেকে দূরে সরে যায়। জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত হওয়া, জনগণের মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা, শূরা বা পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্র পরিচালনায় আল্লাহ এবং জনগণের নিকট জবাবদিহিতা, বায়তুল মাল আল্লাহর সম্পদ ও জনগণের আমানতের বিশ্বাস, আইনের শাসন এবং অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার– এগুলো খিলাফতে রাশেদার মূল বৈশিষ্ট্য। স্বৈরাচারী উমাইয়্যা শাসকরা এ সকল মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক দূরে সরে যায়। প্রায় ৬০ বছর পর 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতের মসনদে আসীন হয়ে সর্বপ্রথম যে ভাষণ দেন তাতে খিলাফতে রাশেদার সেই সকল বিলুপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটে ওঠে। খুলাফায়ে রাশেদীনের ভাষণের মত তাঁর ভাষণেও বিনয়, নম্রতা, কোমলতা, খোদাভীতি, দায়িত্বানুভূতি, দয়া-মমতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়।[৫৮৬]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের বক্তৃতা ভাষণ ইতিহাসের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে প্রচুর পাওয়া যায়। সেইসব ভাষণ পাঠ করলে বুঝা যায়, মিম্বরের উপর উঠে যখন ভাষণ দিতেন তখন তিনি হয়ে যেতেন হাসান বসরী, ইবরাহীম আদহাম, বায়েযীদ বুস্তামী (রহ) প্রমুখের মত পার্থিব লোভ-লালসা ও সুখ-ঐশ্বর্য বিমুখ একজন তাপস মানুষ। এই

৫৮৬. মুরূজ আয-যাহাব-৩/১৯৪

Contents

মানুষেরা যে ভাষায় কথা বলেন তাঁর কথাও তেমন ছিল। আর এ কারণে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর প্রথম ভাষণটি শুনে উপস্থিত স্বার্থবাদী বাগ্মীবক্তা ও কবিগণ অবস্থা বেগতিক ভেবে দ্রুত দরবার থেকে সটকে পড়ে। অন্যদিকে তত্ত্বজ্ঞানী ফকীহ ও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ও নির্লিপ্ত ব্যক্তিগণ বলেন, আমরা তাঁকে ত্যাগ করতে পারিনে। তাঁর একটি ভাষণের কিছু অংশ নিম্নরূপ :[৫৮৭]

ماالجزع مما لابد منه،وماالطمع فيما لايُرجى، وماالحيلة فيما سيزول! وانما الشئ من أصله، فقد مضت قبلنا أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد أصله! انما الناس في الدنيا أغراض تنتضل فيهم المنايا، وهم فيها نهب للمصائب، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لاينالون نعمة إلا بفراق أخرى، ولايُعَمَّر معَمَّر يومًا من عمره إلا بهدم آخر من أجله، وأنتم أعوان الحتوف على انفسكم.

'যা অবধারিত তাতে বিচলিত কেন? যা কিছু আশাতীত তাতে লোভ করে লাভ কি? যা খুব শীঘ্র অপসৃয়মান তার জন্য বাহানার প্রয়োজন কি? বস্তুত অস্তিত্ব মূলের দ্বারা। আমাদের পূর্বে বহু মূল অতিক্রান্ত হয়েছে, যার শাখা হচ্ছি আমরা। মূলের বিলুপ্তির পর শাখার কোন অস্তিত্ব থাকে না। এ পৃথিবীতে মানুষ হচ্ছে লক্ষ্যস্থল, মৃত্যু যা নিশানা করে বিদীর্ণ করছে। এখানে সে বিভিন্ন ধরনের বিপদ-আপদ দ্বারা দলিত-মথিত। প্রতিটি ঢোকে কাঁটা, প্রতিটি গ্রাসে কণ্ঠরোধকারী, এখানে তারা একটি অনুগ্রহের বিচ্ছেদ ছাড়া আরেকটি লাভ করে না, কোন দীর্ঘজীবী তার নির্ধারিত বয়সের একদিন না হারিয়ে আরেকটি দিন পায় না। এখানে আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ মৃত্যুর সহায়তাকারী। সুতরাং যা হওয়া অবশ্যম্ভাবী তা থেকে কোথায় পালাবেন?'

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর খিলাফতকালে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নবীর (সা) পদ্ধতিতে ফিরিয়ে আনার জন্য যা কিছু যেভাবে করণীয় সবই করেন। চিঠিপত্র লেখার মাধ্যমে যেমন সরকারী আমলা ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দিকনির্দেশনা দান করেন, তেমনি বিভিন্ন কারণে ও নানা উপলক্ষে মানুষের সামনে প্রদত্ত বক্তৃতা-ভাষণেও ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরেন। সাথে সাথে সকলের করণীয় কর্তব্য স্পষ্টভাবে বলে দেন। সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থ ও আরবী সাহিত্যের বহু প্রাচীন সংকলনে তাঁর বহু মূল্যবান ভাষণ বা ভাষণের অংশবিশেষ সংকলিত হয়েছে। এখানে আমরা তাঁর কিছু বক্তৃতা-ভাষণের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো। একটি ভাষণে তিনি বলেন :[৫৮৮]

إن لكل سفر زادا لامحالة وفتزودوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة، وكونوا كمن عاين ما أعدد الله له من ثوابه وعقابه، فرغبوا ورهبوا ولايطولنّ عليكم الأمد، فَتَقْسُوَ

---

৫৮৭. কিতাবুল আমালী-২/১০০

৫৮৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/১৪৩; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২০৯

قلوبكم، وتنقادوا لعدوكم، فإنه والله مابسط أمل من لابـد يـدرى لعلـه لايصبـح بعـد إمسائه، ولايمسى بعد إصباحه، وربما كانت بين ذلك خطفات المنايا، فكـم رأينـا ورأيتم من كان بالدنيا مغترًّا، فأصبح فى حبائل خطوبها ومناياها أسيرًا، وإنما تقـر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله، وإنما يفرح من أين من أهوال يوم القيامة، فأما من لايبرأ من كلم إلا أصابه جارح من ناجية أخرى، فكيـف يفـرح؟ أعـوذ بـالله أن أمركم بما أنهى عنه نفسى، فتخسر صفقتى، وتظهر عورتـى وتبـدو مسـكنتى، فـى يوم يبدو فيه الغنى والفقير، والـموزين منصوبة، والجوارح ناطقة، فلقد عنيتم بأمرلو عنيت به النجوم لانكررت، ولو عنيت به الجبال لذابت، أو الأرض لانفطرت، أمـا تعلمون أنه لبس بين الجنة والنار منزله، وأنكم صائرون إلى إحداها.

'প্রত্যেক ভ্রমণের জন্য থাকে পাথেয় ও প্রস্তুতি। সুতরাং আপনারা দুনিয়া থেকে আখিরাতে ভ্রমণের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করুন। আল্লাহ সেখানে যে সাওয়াব ও শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন তা যে প্রত্যক্ষ করেছে তার মত হয়ে যান। তারপর সেই সাওয়াব লাভের প্রত্যাশী ও শাস্তির ভয়ে ভীত হোন। আপনাদের জীবনকাল অবশ্য বৃদ্ধি পাবে না, আর তা হলে আপনাদের অন্তর শক্ত হয়ে যাবে এবং আপনারা আপনাদের শক্রর আনুগত্য করবেন। আল্লাহর কসম! যে জানে না যে, সে সকালের পর সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যার পর সকাল পর্যন্ত বাঁচবে কিনা, তার সব আশা পূর্ণ হতে পারে না। অনেক সময় এর মধ্যেই মৃত্যুর থাবা এসে পড়ে। কত মানুষকে আমি যেমন দেখেছি, আপনারাও দেখেছেন, যারা ছিল দুনিয়ার প্রতি বিমুগ্ধ। পরে তারা সেই দুনিয়ার বিপদ-আপদ ও কামনা-বাসনার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। যারা আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়েছে কেবল তাদের চোখ প্রশান্ত হয়েছে। যারা কিয়ামতের ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে নিশ্চিন্ত হয়েছে কেবল তারা উৎফুল্ল হতে পারে। যে ব্যক্তি ছোট্ট একটি ক্ষতের নিরাময় করে না, তার অন্য অঙ্গে অন্য দিক থেকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তাহলে সে কিভাবে উৎফুল্ল হতে পারে? আমি নিজে যা থেকে বিরত থাকি আপনাদেরকে তা করার আদেশ দানের ব্যাপারে আল্লাহর আশ্রয় চাই। আর তেমন হলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হবো, আমি উন্মুক্ত হয়ে পড়বো এবং আমার দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়বে– সেই দিন যেদিন ধনী-গরীব সমান হয়ে যাবে, দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে।

আপনারা এমন গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন তা যদি নক্ষত্ররাজির উপর চাপানো হতো তাহলে তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত, পবর্তমালা অথবা পৃথিবীর উপর চাপানো হলে তা বিগলিত হয়ে যেত। আপনারা কি জানেন না যে, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী

তৃতীয় কোন স্থান নেই। আপনাদেরকে অবশ্যই এ দু'টির যে কোন একটিতে ফিরে যেতে হবে।'

একটি ভাষণে তিনি সব ধরনের কাজের জন্য, তা সে কাজ ইবাদাত-বন্দেগী হোক বা হোক কোন পার্থিব কাজ, তার জন্য জ্ঞানের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন মানুষের কথা-কাজের ভারসাম্যতার কথা। মানুষকে সন্তুষ্ট করা যায় না, একজন ঈমানদার ব্যক্তির সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল হলো সবর বা ধৈর্য ইত্যাদি। যেমন তিনি বলেছেন :[৫৮৯]

من عمل على غير علم كان مايُفْسد أكثر مما يُصلح، ومن لم يُعدّ كلامه من عمله، كثرت ذنوبه، والرضا قليل، ومعوّل المؤمن الصبر، وأنعم الله على عبد نعمة ثم انتزعها منه، فأعاضه مما انتزع منه الصبر، إلا كان ماأعاضه خيرا مما انتزع منه، ثم قرأ هذه الآية :إنما يوفى الصابرون أجْرَهُمْ بغير حساب.

'যে ব্যক্তি 'ইলম ছাড়া আমল (জ্ঞান ছাড়া কাজ) করে সে পরিশুদ্ধির চেয়ে বিনষ্ট করে বেশী। যে তার কাজের দ্বারা কথার হিসাব করে না তার পাপ বৃদ্ধি পায়। সন্তুষ্টি বিষয়টি খুবই স্বল্প। ঈমানদারের শেষ আশ্রয় ধৈর্য। আল্লাহ কোন বান্দাকে কোন কিছু দান করার পর তা যদি ছিনিয়ে নিয়ে বিনিময়ে তাকে ধৈর্য দান করেন তাহলে তাই হবে তার জন্য সবচেয়ে ভালো দান। তারপর তিনি পাঠ করেন আয়াত : নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের বেহিসাব প্রতিদান দেওয়া হবে।'

একদিন তিনি মিম্বরের উপর উঠে আল্লাহর হামদ পেশের পর অতি সংক্ষেপে নিম্নের কথাগুলো বলে নেমে যান :[৫৯০]

أيها الناس، إنما يراد الطبيب للوجع الشديد، ألا فلاوجع أشد من الجهل، ولاداء أخبث من الذنوب، ولاخوف أخوف من الموت.

'ওহে জনমণ্ডলী! তীব্র ব্যথার জন্য ডাক্তারের নিকট যাওয়া হয়। জেনে রাখুন, মূর্খতার চেয়ে বড় ব্যথা আর নেই, পাপের চেয়ে খারাপ রোগ আর নেই এবং মৃত্যুর চেয়ে বড় ভয় আর কিছু নেই।'

তিনি একদিন একটা উপদেশমূলক ভাষণ দিলেন। তার কিছু অংশ এই :[৫৯১]

يأيها الناس، لاتستصغروا الذنوب، والتمسوا تمحيص ماسلف منها بالتوبة منها، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عز وجل : والذين إذا

---

৫৮৯. তারীখ আত-তাবারী-৮/১৪১
৫৯০. জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২০৭
৫৯১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৩৭

فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصِرُّوا على مافعلوا وهم يعلمون.

'ওহে জনমণ্ডলী! পাপকে ছোট মনে করবেন না। তাওবার মাধ্যমে পিছনের পাপ মোচনের ফরিয়াদ করুন। ভালো কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। এটা যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় তাদের জন্য একটি উপদেশ। মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন : এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে এবং নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে না।'

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয হলব অঞ্চলের খুনাসিরা নামক শহরে তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণটি দান করেন। সেই ভাষণের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো। আল্লাহর হামদ ও ছানা ব্যক্ত করার পর তিনি বলেন :[৫৯২]

أيها الناس، إنكم لم تُخْلَقوا عبثا، ولم تتركوا سُدًى، وإن لكم معادًا يحكم الله بينكم فيه، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شئ، وحُرم جنَّة عرضها السماوات والأرض، واعلموا أن الأمان غدًا لمن يخاف اليوم، وباع قليلا بكثير، وفانيا بباق؛ ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين، سيخلُفها من بعدكم الباقون، حتى تُرَدُّوا إلى خير الوارثين، ثم إنكم في كل يوم تُشَيِّعُون غاديًا ورائحًا إلى الله، قد قضى نَحْبَه وبلغ أجَلَه، ثم تُغَيِّبونه في صَدْع من الأرض، ثم تدعونه غير مُوسَّد ولاممهد، قد خلع الأسباب، وفاروق الأحباب، وواجه الحساب، غنيًا عما ترك، فقيرًا إلى ماقدم. إني لأقول لكم هذه المقالة وماأعلم عند أحد منكم (من الذنوب) أكثر مما عندى، فأستغفر الله لى ولكم.

'ওহে জনমণ্ডলী! আপনাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করা হয়নি এবং এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে না। আপনাদের একটি প্রত্যাবর্তনস্থল আছে, সেখানে আল্লাহ আপনাদের বিচার-ফয়সালা করবেন। সেখানে সবকিছু পরিবেষ্টনকারী আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ থেকে যে বেরিয়ে যাবে সে হতাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে জান্নাত লাভ থেকে বঞ্চিত হবে যার প্রশস্ততা হচ্ছে আসমান ও যমীনের সমান। জেনে রাখুন! আগামীকালের নিরাপত্তা তার জন্য যে আজকে ভয় পায়, সে বেশী মূল্যে অল্প কিছু এবং চিরস্থায়ী জিনিসের বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ীকে বিক্রী করে। আপনারা কি দেখেন না, আপনারা আছেন ধ্বংসপ্রাপ্তদের পিছনে। খুব শিগগির পরবর্তী জীবিতরা আপনাদের স্থান দখল করবে। অবশেষে আপনাদেরকে সর্বোত্তম

---

৫৯২. প্রাগুক্ত-৪/৯৫; সিফাতুস সাফওয়া-২/১২৩, ১২৪

উত্তরাধিকারীর নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আপনারা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা তাদেরকে বিদায় জানাচ্ছেন যারা তাদের জীবনকাল শেষ করেছে। তারপর আপনারা তাদেরকে কোন রকম বালিশ-বিছানা ছাড়াই মাটির তলে গোপন করে আসেন। তার সকল উপায়-উপকরণ ছিন্ন হয়ে যায় এবং সকল প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর সে বিচারের মুখোমুখী হবে। এ পৃথিবীতে যা কিছু রেখে যায় তা তার কোন কাজে আসে না, বরং সামনে যা কিছু পাঠিয়েছে তারই মুখাপেক্ষী থাকে। আমি আপনাদেরকে একথাই বলছি। আমার পাপের চেয়ে বেশী পাপ আপনাদের কারো আছে বলে আমার জানা নেই। অতএব আপনারা আমার জন্য ও আপনাদের নিজেদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'

চিঠিপত্রের জবাবে 'উমারের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের নিকট প্রেরিত চিঠি অথবা দরখাস্তের উপর তাঁর কিছু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য :

এক আঞ্চলিক কর্মকর্তা তাঁর একটি শহর পুনঃনির্মাণের অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখলেন। 'উমার সেই চিঠির নীচে নিম্নের মন্তব্যটি লিখে ফেরত পাঠালেন :[৫৯৩]

أبنها بالعدل، ونقّ طرقاتها من الظلم.

'ওটি তৈরি কর আদল ও ইনসাফ দ্বারা এবং জুলুম-অত্যাচার থেকে ওটির রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখ।' আরেকজন কর্মকর্তার অনুরূপ একটি চিঠির জবাবে লেখেন :

حصِّنها ونفسَكَ بتقوى الله.

'খোদাভীতি দ্বারা ওটি এবং তোমার নিজেকে মজবুত ও সুরক্ষিত কর।' এক ব্যক্তিকে তিনি যাকাতের দায়িত্বে নিয়োগ দান করেন। লোকটি ছিল কুৎসিত চেহারার। সে আদল ও ইনসাফ মত সুন্দরভাবে কাজ করে। তাকে তিনি এই আয়াতটি লিখে পাঠান :[৫৯৪]

وَلَاأَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِى أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا.

'তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় তাদের সম্বন্ধে আমি বলিনা যে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো কল্যাণ দান করবেন না।'

ইরাকের ওয়ালী তথাকার অধিবাসীদের অবাধ্যতার কথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন। 'উমার সেই চিঠির পাশে এই মন্তব্যটি লিখে তাঁর নিকট ফেরত পাঠালেন :

أرْضَ لهم ماتَرضى لنفسك، وخذهم بجرائمهم بعد ذلك.

'তাদের জন্য তাই পছন্দ কর যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ করে থাক, তারপর তাদের অপরাধের ভিত্তিতে তাদেরকে পাকড়াও কর।'

---

৫৯৩. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/২০৯
৫৯৪. সূরা হূদ-৩১

'আদী ইবন আরতাতের কোন কাজে তাঁকে তিরস্কার করে লেখেন : কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হলো–

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ.

'তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে।'
একবার কূফার ওয়ালী তাঁকে লিখলেন যে, তিনি একটি বিষয়ে তেমনই করেছেন যেমন 'উমার ইবন আল-খাত্তাব করেছিলেন। 'উমার শুধু এই মন্তব্যটি লিখে পাঠালেন :

أُولئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَهُدَاهُمُ اقْتَده.

'তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ কর।'
তিনি যখন মদীনার ওয়ালী তখন খলীফা আল-ওয়ালীদের একটি চিঠির জবাবে লেখেন :

الله أعلم أنك لست أول خليفة تموت.

'আল্লাহ একথা ভালোই জানেন যে আপনিই মৃত্যু বরণকারী প্রথম খলীফা নন।'
একবার 'আদী ইবন আরতাত কূফাবাসীদের অবাধ্যতার কথা অবহিত করে চিঠি লিখলেন। জবাবে 'উমার লিখলেন :

لاتطلب طاعة من خذل عليًّا، وكان إماما مَرْضيًّا.

"যারা 'আলীকে (রা) পরিত্যাগ করেছে তাদের আনুগত্য কামনা করো না। অথচ 'আলী (রা) ছিলেন আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত ইমাম।"
একবার মদীনার ওয়ালী ঘর নির্মাণের জন্য তাঁর নিকট একখণ্ড ভূমির আবেদন জানিয়ে পত্র লিখলে তিনি এই কথাটি লিখে পাঠান :

كن من الموت على حذر. – 'মৃত্যুর ব্যাপারে সতর্ক হও।'
একজন মজলূমের আবেদনের জবাবে লেখেন : العدلُ إمامك – "তোমার ইমাম বা খলীফা সাক্ষাৎ ন্যায়বিচার।"

একজন কয়েদীর আবেদনপত্রের উপর মন্তব্য লেখেন :
تُبْ تُطْلَق – "তাওবা কর, মুক্তি পাবে।" একজন মহিলার স্বামীকে বন্দী করা হলে সে উমারের নিকট আবেদন জানালে তিনি লেখেন : اَلْحَقُّ حَبَسَهُ – 'সত্য তাকে বন্দী করেছে'। এভাবে আরো বহু সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবহ মন্তব্য তিনি করেছেন যা আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সূত্রসমূহে দেখা যায়।

'উমারের কিছু জ্ঞানগর্ভ কথা

من قال : لاأدرى فقد أحْرَزَ نصف العلم.

"যে ব্যক্তি বললো : আমি জানিনে সে অর্ধেক জ্ঞান সংরক্ষণ করলো।"[৫৯৫]
এক ব্যক্তি 'উমারকে উট ও সিফ্‌ফীন যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন :[৫৯৬]

---

৫৯৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৩৯৮
৫৯৬. প্রাগুক্ত-২/২৮৯, ৩/১৩০

Contents

تلك دماء كف الله يدى عنها، فلا أحِبُّ أن أغمس لساني فيها.

'তা ছিল কিছু রক্ত। আল্লাহ এই রক্ত থেকে আমার হাতকে বাঁচিয়েছেন। সুতরাং তাতে আমি আমার জিহ্বা ডোবাতে চাই না।'

পাথরের ছোট্ট কণা হাতে নিয়ে তাসবীহ্ পাঠরত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 'উমার দেখলেন, এক শ' বার তাসবীহ্ পাঠ শেষে একটি পাথর কণা পাশে রেখে দিচ্ছে। তিনি লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন :[৫৯৭]

ألق الحصى وأخلص الدعاء.

পাথর ফেলে দাও এবং দু'আকে প্রদর্শনী থেকে পরিচ্ছন্ন কর।

তিনি বলেন :[৫৯৮]

ما قُرِنَ شئ إلى شئ أفضل من حلم إلى علم ومن عفو إلى مقدره.

এক জিনিসের সাথে আরেকটি জিনিসের যুক্ত করার যা কিছু আছে তার মধ্যে সর্বোত্তম সংযুক্তি হলো জ্ঞানের সাথে বিচক্ষণতা ও ক্ষমতার সাথে ক্ষমার।

একবার এক ব্যক্তি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে প্রশ্ন করলো : আমি কখন কথা বলবো? বললেন : যখন তোমার চুপ থাকতে ইচ্ছা হয়। সে আবার প্রশ্ন করলো : আমি চুপ থাকবো কখন? বললেন : যখন তোমার কথা বলতে ইচ্ছা হয়।[৫৯৯]

একবার তিনি রাজা' ইবন হায়ওয়াকে লিখলেন :[৬০০]

أما بعد، فإنه من أكثر ذكرَ الموت اكتفى باليسير، ومن علم أن الكلام عمل قلّ كلامُه إلا فيما ينفعهُ.

'অতঃপর, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করেছে, অল্পে তার তুষ্টি হয়েছে। আর যে জেনেছে কথাও একটি কাজ, তার উপকারে আসে এমন কথা ছাড়া বাজে কথা কমে গেছে।'

জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তিনি বলেন :[৬০১]

التَّقِيُّ مُلْجَمٌ – 'আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তির জিহ্বায় লাগাম লাগানো।'

তিনি আরো বলেন, : 'বিষয় হচ্ছে তিন প্রকার। এক প্রকার যা সত্য-সঠিক হওয়া স্পষ্ট, সুতরাং তা অনুসরণ কর। আরেক প্রকার যা অসত্য ও ক্ষতিকর হওয়া স্পষ্ট, তা পরিহার

---

৫৯৭. প্রাগুক্ত-৩/২৮১
৫৯৮. প্রাগুক্ত-১/২৮৫; ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-১/৬০৭
৫৯৯. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/৪৭৩
৬০০. প্রাগুক্ত-৩/১৫১, ১৮৭
৬০১. প্রাগুক্ত-৩/৮১

কর। তৃতীয় প্রকার হলো অস্পষ্ট ও সংশয়পূর্ণ, সুতরাং তা আল্লাহর দিকে রুজু কর।'[৬০২]

একবার তিনি বলেন :[৬০৩]

أيها الناس، إنه من يُقَدَّر له رزق برأس جبـل أو بحضيـض أرض يأتـه، فـاتقوا الله واجملوا في الطلب.

'ওহে জনমণ্ডলী! কারো নির্ধারিত রিযক যদি পাহাড়ের চূড়ায় অথবা মাটির গভীরেও থাকে, সে তা লাভ করবে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন এবং তা অন্বেষণে ভালো পন্থা অবলম্বন করুন।'

ছেলে 'আবদুল মালিক একদিন পিতার ঘরে গিয়ে দেখেন তিনি পূর্বাহ্নে ঘুমোচ্ছেন। তিনি পিতাকে ডেকে বলেন : আব্বা! বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ আপনার দরজায় অপেক্ষমান, আর আপনি ঘুমিয়ে আছেন? তিনি বললেন : ছেলে! আমাদের নফ্‌স বা আত্মাটি হলো একটি বাহন পশুর মত। সেটিকে যদি আমরা জরাজীর্ণ করে ফেলি তাহলে তা মেরে ফেলা হবে। আর যে তার বাহনকে মেরে ফেলে সে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না।[৬০৪]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) রোগশয্যায় শায়িত। দাজল নামক এক ব্যক্তি তাঁকে দেখতে আসলো, সে তাঁর রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজের রোগ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তখন লোকটি বললো : এই রোগে অমুক অমুক মারা গেছে। 'উমার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন : তুমি যখন কোন রোগীকে দেখতে যাবে তখন তাকে অন্যের মৃত্যুর দুঃসংবাদ দিবে না। আর আজ আমার এখান থেকে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার আমাকে দেখতে আসবে না।[৬০৫]

'উমারের ভাষা দক্ষতা

একদিন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয বসে আছেন খলীফা আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিকের নিকট। আল-ওয়ালীদ ছিলেন একজন অশুদ্ধ ভাষী ব্যক্তি। তিনি চাকরকে বললেন : يَاغُلَامُ اُدْعُ لِىْ صَالِحٌ অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন : চাকর! সালিহকে আমার কাছে ডেকে আন। যেমন মনিব তেমন চাকর। সে ডাকলো : يَا صَالِحًا – ওহে সালিহ। তার ডাক শুনে আল-ওয়ালীদ চাকরকে বললেন : তুমি আলিফ ফেলে দাও। অর্থাৎ يَا صالِحُ বল। তখন 'উমার বললেন : আমীরুল মু'মিনীন, আপনিও একটি আলিফ বাড়িয়ে দিন। অর্থাৎ اُدْعُ لِىْ صَالِحًا বলুন। আসলে মনিব ও চাকর উভয়ে স্বর ধ্বনির ব্যাপারে ভুল করেছিল। চাকরকে মনিব শুদ্ধ করেন এবং মনিবকে করেন 'উমার।[৬০৬]

---

৬০২. প্রাগুক্ত-৪/৪৩৬

৬০৩. আল-কামিল ফিল-লুগা ওয়াল আদাব-২/৯১, ৯২

৬০৪. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৬/৩৭৯

৬০৫. প্রাগুক্ত-২/৪৫০

৬০৬. প্রাগুক্ত-২/৪৮০, ৪/৪২৩

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ)-কে লেখা হাসান আল-বসরীর (রহ) কয়েকটি পত্র

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর সময়ের সকল বড় 'আলিম, 'আবিদ ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ তাপসের সংগে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। বিশেষতঃ তাবি'ঈকুল শিরোমণি হাসান আল-বসরীর (রহ) সাথে ছিল তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতা। ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তাঁদের সুসম্পর্কের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর ন্যায়পরায়ণ শাসকের গুণাবলী কি তা জানতে চেয়ে হাসান আল-বসরীকে (রহ) একটি পত্র লেখেন। জবাবে হাসান (রহ) ন্যায়পরায়ণ শাসকের পরিচয় তুলে ধরে খলীফাকে একটি পত্র লেখেন। পত্রটি নিম্নরূপ :

'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ শাসককে প্রত্যেক ঝোঁক-প্রবণ মানুষের জন্য অবলম্বন, প্রত্যেক অত্যাচারীর জন্য সত্য-সঠিক পথ, প্রত্যেক বিনষ্ট ও বিকৃত মানুষের জন্য সংশোধন, প্রত্যেক দুর্বলের জন্য শক্তি, প্রত্যেক অত্যাচারিতের জন্য সুবিচার এবং প্রত্যেক দুঃখিতজনের আশ্রয়স্থল করে দিয়েছেন। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন সেই রাখালের মতো যে তার উটের প্রতি দয়া ও মমতাশীল, উটগুলোকে উৎকৃষ্ট চারণভূমিতে চরায়, বিপজ্জনক চারণভূমি থেকে রক্ষা করে, হিংস্র জীব-জন্তু থেকে আগলে রাখে এবং ঠাণ্ডা-গরমের কষ্ট থেকে রক্ষা করে। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন সেই স্নেহপ্রবণ পিতার মতো যিনি তাঁর সন্তানদেরকে শৈশবকালে আদর-স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেন, বড় হলে শিক্ষা দেন, জীবনকালে তাদের জন্য আয় করেন এবং মরণের পরেও তাদের খরচের জন্য সঞ্চয় করে রেখে যান। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন সেই স্নেহময়ী পবিত্র মায়ের মতো যিনি তাঁর সন্তানকে পেটে ধারণ ও দুধ পান করানোর কষ্ট স্বীকার করেন, শৈশবে লালন-পালন করেন, সন্তান জেগে থাকলে তিনিও জেগে রাত কাটান, সন্তান ঘুমালে তিনিও ঘুমান, সন্তানকে কখনো দুধ পান করান, কখনো দুধ পান থেকে বিরত রাখেন, সন্তানের সুস্থতায় উৎফুল্ল হন এবং অসুস্থতায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন।

হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন ইয়াতীমদের অসী, গরীব-মিসকীনদের ভাণ্ডার। তিনি তাদের ছোটদের প্রতিপালন করেন, বড়দের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেন। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক হলেন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে হৃদপিণ্ডের মতো। হৃদপিণ্ড সুস্থ থাকলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকে, হৃদপিণ্ড অসুস্থ হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অসুস্থ হয়ে পড়ে। হে আমীরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে দণ্ডায়মান। তিনি আল্লাহর কথা শোনেন, বান্দাদের শোনান; আল্লাহকে দেখেন, তাদেরকে দেখান; আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং তাদেরকে সে দিকে চালিত করেন। অতএব, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আপনাকে যা কিছুর অধিকারী করেছেন সেসব বিষয়ে আপনি সেই দাসের মতো হবেন না, যার নিকট তার মনিব কোন

কিছু গচ্ছিত রেখেছে, তার অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছে, অতঃপর সে অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করে পরিবার-পরিজনকে বিতাড়িত করেছে। ফলে তারা বিত্তহীন হয়ে পড়েছে।

হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ যাবতীয় অশ্লীলতা ও নোংরামি দূর করার জন্য হদ তথা নির্ধারিত শাস্তির বিধান দিয়েছেন। শাসকরাই যদি তা করে তাহলে তা দূর হবে কিভাবে? আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জীবন রক্ষার্থে কিসাসের বিধান দিয়েছেন। সেই বিধান যিনি বাস্তবায়ন করবেন তিনিই যদি বান্দাদের হত্যা করেন তাহলে জীবন রক্ষা হবে কিভাবে?

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা এবং সেখানে আপনার লোক-লস্কর ও সাহায্যকারীর স্বল্পতার কথা স্মরণ করুন। আপনি মৃত্যু ও তার পরবর্তী বিভীষিকাময় অবস্থার জন্য পাথেয় প্রস্তুত করুন।

হে আমীরুল মু'মিনীন! জেনে রাখুন, আপনি যে বাড়ীতে আছেন, সেটি ছাড়াও আপনার আরেকটি বাড়ী আছে। সেখানে আপনার অবস্থান হবে অনেক দীর্ঘ। আপনার আত্মীয়-বন্ধুরা আপনাকে একাকী কবরের গর্তে রেখে আপনার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। আপনি সেই দিনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করুন যে দিন কেউ আপনার সংগী হবে না।

يَوْمَ يَفِرُّ الْـمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ، وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ.

'যে দিন মানুষ তার ভাই, মাতা-পিতা, স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে পালিয়ে যাবে।' ('আবাসা-৩৪)

হে আমীরুল মু'মিনীন! স্মরণ করুন :

إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ.

'যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে। তখন সকল গোপন রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে।' (আল-'আদিয়াত-৯)

وَلاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا.

'আর গ্রন্থ ছোট-বড় কিছুই উপেক্ষা করছে না। সবই লিখে রাখছে।' (আল-কাহ্ফ-৪৯)

অতএব, হে আমীরুল মু'মিনীন! মৃত্যুর আগমন এবং আশা-আরজু বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে আপনি সুযোগের ব্যবহার করুন। আপনি আল্লাহর বান্দাদেরকে জাহিলী আইন ও রীতি-পদ্ধতিতে শাসন করবেন না। আপনি তাদের সাথে অত্যাচারী শাসকদের মতো আচরণ করবেন না। দুর্বলদের উপর ক্ষমতাগর্বী ও অহঙ্কারীদের মতো প্রভুত্ব কায়েম করবেন না। কারণ, তারা কোন মু'মিনের সাথে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না। অতঃপর আপনি আপনার নিজের ও তাদের পাপ ও বোঝা বহন করবেন। তাদের ভোগ-বিলাসী জীবন, যার মধ্যে রয়েছে আপনার দুর্ভাগ্য, আপনাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। আপনার পরকালীন জীবনের সুখ-সুবিধার বিনিময়ে তাদের উপাদেয় খাদ্য-খাবার যেন আপনাকে প্রতারিত না করে। আপনার আজকের শক্তি-ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আগামীকাল মৃত্যুর ফাঁদে আটকা পড়ার পর আপনার ক্ষমতার দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

Contents

যখন আপনি মৃত্যুর ফাঁদে জড়িয়ে ফেরেশতামণ্ডলী ও নবী-রাসূলদের উপস্থিতিতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন। যখন 'চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারকের নিকট সকলেই হবে অধোবদন।' আমীরুল মু'মিনীন! আমি আমার এই উপদেশ দ্বারা সেই কাজ করতে পারবো না যা আমার পূর্বে জ্ঞানী ব্যক্তিরা করেছেন। তবে আমি আপনার প্রতি দরদ ও সহানুভূতি প্রকাশ করতে ও উপদেশ দান করতে বিরত থাকিনি। আমার এই পত্রটিকে আপনি সেই বন্ধুর মতো মনে করুন, যে তার অসুস্থ বন্ধুকে অত্যন্ত তিক্ত ঔষুধ জোর করে পান করায় তার সুস্থতার আশায়।

আমীরুল মু'মিনীন! আস্-সালামু 'আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু![৬০৭]

একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) হাসান আল-বসরীকে (রহ) লিখলেন যে, দুনিয়ার বিষয়টি এক জায়গায় করে দিন এবং সেই সাথে আখিরাতের বর্ণনাও দিন। হাসান (রহ) লিখলেন :[৬০৮]

إنما الدنيا حلم والآخرة يقظة، والموت متوسط : ونحن في أضغاث أحلام، من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواء ضلّ، ومن حَلِم غنم، ومن خاف سلم، ومن اعتبر أبصر،ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، ومن علم عَمِل، فإذا زلّلتَ فارجع، وإذا ندمت فأقلع،وإذا جَهِلْتَ فاسأل، وإذا غضبتَ فأمسك، واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرِهتِ النفوس عليم.

'দুনিয়া হচ্ছে স্বপ্ন, আখিরাত জাগরণ এবং মৃত্যু মধ্যবর্তী অবস্থা। আমরা আছি কিছু স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে। যে আত্মসমালোচনা করেছে, লাভবান হয়েছে; যে তা থেকে উদাসীন থেকেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে পরিণামের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, মুক্তি লাভ করেছে। যে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার আনুগত্য করেছে, পথভ্রষ্ট হয়েছে। যে ধৈর্য ধরেছে সফলকাম হয়েছে। যে ভয় করেছে, নিরাপদ হয়েছে। যে উপদেশ লাভ করেছে, দেখেছে। যে দেখেছে সে বুঝেছে। আর যে বুঝেছে সে জেনেছে। আর যে জেনেছে সে আমল করেছে। যখন আপনার পদস্খলন হবে, ফিরে আসুন। যখন অনুশোচনা হবে তখন তা একেবারে উপড়ে ফেলুন। যখন না জানবেন জিজ্ঞেস করুন, যখন রাগান্বিত হবেন, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। জেনে রাখুন, নফ্স বা প্রবৃত্তিকে যে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে তাই সর্বোত্তম আমল বা কাজ।'

আরেকবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) হাসান আল-বসরীকে (রহ) সংক্ষেপে কিছু উপদেশ লিখে পাঠাতে অনুরোধ জানালেন। জবাবে হাসান আল-বসরী (রহ) লিখলেন :[৬০৯]

---

৬০৭. প্রাগুক্ত-১/৩৫-৩৮; ইবনুল জাওযী, আল-হাসান আল-বাসরী-৫৬; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/৪৯৫-৪৯৭

৬০৮. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৫২

৬০৯. জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/৪৯৭

أما بعد يا أمير المؤمنين! فكأن الذى كان لم يكن، وكأن الذى هو كائن قد نزل، واعلم ياأمير المؤمنين! أن الصبر، وإن أذاقك تعجيل مرارته، فلنعم ما أعقبك من طيب حلاوته وحسن عاقبته، وأن الهَوَى، وإن أذاقك طعم حلاوته، فلبئس ما أعقبك من مرارته، وسوء عاقبته. واعلم ياأمير المؤمنين! أن الفائز من حَرص على السلامة فى دار الاقامة، وفاز بالرحمة فأدخل الجنة.

'অতঃপর হে আমীরুল মু'মিনীন! মনে হচ্ছে যা ছিল তা আর নেই এবং যা হওয়ার পথে ছিল তা সবই এসে পড়েছে। হে আমীরুল মু'মিনীন! ধৈর্য, যদিও আপনাকে তার তিক্ত স্বাদ দ্রুত আস্বাদন করায়, তবে তার পরে আপনার জন্য নিয়ে আসে যে মিষ্টি-মধুর স্বাদ ও সুন্দর পরিণতি তা কতনা ভাল! আর প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, যদিও আপনাকে মিষ্টি-মধুর স্বাদ আস্বাদন করায়, কিন্তু তার পরে আপনার জন্য থাকে তিক্ত স্বাদ ও খারাপ পরিণতি। জেনে রাখুন হে আমীরুল মু'মিনীন! সেই ব্যক্তি সফলকাম যে স্থায়ী আবাস গৃহে শান্তিতে থাকার লোভ করে এবং করুণা লাভে সফলকাম হয়, অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করে।'

'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) হাসান আল-বসরীকে (রহ) লিখলেন : আবূ সা'ঈদ! আমাকে দুনিয়ার দোষ-ত্রুটি লিখে পাঠান! জবাবে তিনি লিখলেন :[৬১০]

'অতঃপর হে আমীরুল মু'মিনীন! দুনিয়া হলো প্রস্থান ও অন্তর্বর্তীকালীন আবাস স্থল, স্থায়ী আবাসস্থল নয়। আদমকে (আ) এখানে শাস্তিস্বরূপ নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এর সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। এর প্রতি মুগ্ধ ব্যক্তিও তাকে ত্যাগ করবে, এখানে বিত্তবানও বিত্তহীন হবে। যে তাকে নিয়ে বেশী মাতামাতি করেনি সেই ভাগ্যবান। বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তি যখন তাকে পরীক্ষা করেছে, দেখেছে সে মর্যাদাবানকে মর্যাদাহীন করে, যে তাকে পুঞ্জিভূত করে, সে তা ছড়িয়ে দেয়। সে বিষের মতো, কেউ না জেনে খেয়ে ফেলে, অজ্ঞতাবশতঃ তার প্রতি মুগ্ধ হয়। আল্লাহর কসম! এতেই তার মরণ নিহিত। হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সেই ক্ষত রোগীর মতো হোন, যে দীর্ঘ কষ্টের ভয়ে স্বল্পকালীন কষ্টকে মেনে নেয়। সাময়িক তীব্রতায় ধৈর্যধারণ করা দীর্ঘদিন কষ্ট ভোগ করার চেয়ে অধিকতর সহজ হয়।

জ্ঞানী সেই যে তার (দুনিয়া) ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং তার চাকচিক্যে ধোঁকা খায় না। কারণ সে ধোঁকাবাজ মরীচিকা ও প্রতারক। সে আশা-আকাংখা মেলে ধরেছে, সাজ-সজ্জা সহকারে তার প্রতি আসক্তদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এ দুনিয়া সেই কনের মতো, দর্শকদের সব চোখ যার প্রতি নিবদ্ধ, সব অন্তর যার প্রতি নিবেদিত। সেই সত্তার শপথ যিনি মুহাম্মাদকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন! এমন কনে তার স্বামীর জন্য বিপজ্জনক

৬১০. প্রাগুক্ত-২/৪৯৮-৪৯৯; ইবনুল জাওযী, আল-হাসান আল-বাসরী-৫৪

হয়ে থাকে। আমীরুল মু'মিনীন! তার আছাড় দেওয়া ও হোঁচট খাওয়ানোর ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ এখানে কঠোরতা ও বিপদ-আপদের সাথে সংযুক্ত। এখানকার স্থায়িত্বও ধ্বংস ও বিনাশের নিকট পৌঁছে দেয়।

হে আমীরুল মু'মিনীন! জেনে রাখুন, এখানের সকল আশা-আকাংখা মিথ্যা ও অসার, সকল স্বচ্ছতাও অস্বচ্ছ ও নোংরা এবং স্বচ্ছতা অভাব-অনটন। যে তাকে ত্যাগ করেছে সে ভাগ্যবান হয়েছে, যে তাকে আঁকড়ে ধরেছে, ডুবেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে। বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান সেই যে আল্লাহ যা কিছুর ভয় দেখিয়েছেন সে তা ভয় করেছে, যা কিছু সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, সতর্ক হয়েছে। এভাবে সে অস্থায়ী আবাস থেকে স্থায়ী আবাসে যেতে সক্ষম হয়েছে। মরণকালে তার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে।

আল্লাহর কসম! হে আমীরুল মু'মিনীন! এ দুনিয়া হচ্ছে শাস্তির আবাস স্থল। বুদ্ধিহীন মানুষই কেবল এর জন্য সঞ্চয় করে, আর জ্ঞানহীন ব্যক্তিই কেবল এর দ্বারা ধোঁকা খায়। আল্লাহর কসম! হে আমীরুল মু'মিনীন! দুনিয়া হচ্ছে স্বপ্ন, আখিরাত জাগরণ। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী অবস্থা হচ্ছে মৃত্যু। মানুষ এখানে আছে স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে। হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি সেই জ্ঞানী ব্যক্তির কথাটিকে আপনাকে শোনাতে চাই :

فإن تنجُ منها تنج من ذى عظيمة + وإلاَّ فإنى لا إخالك ناجيا

'যদি তুমি এর থেকে মুক্তি পাও তাহলে খুব বড় জিনিস থেকে মুক্তি পাবে। তা না হলে আমি তোমার নাজাতের কোন সম্ভাবনা দেখি না।' আল্লাহ হাসানের প্রতি দয়া করুন। সে সব সময় আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়, উদাসীনতা থেকে সাবধান করে।'

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফত কালের একটি পর্যালোচনা

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) খিলাফতের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর খিলাফতের ভিত্তি ছিল আল্লাহর কিতাব, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ্ এবং আল্লাহর ইতা'আত বা আনুগত্য। এই মৌলিক নীতিমালা এবং নিজের অবস্থান তিনি তুলে ধরেন খলীফা হিসেবে তাঁর প্রথম ভাষণে। তিনি বলেন : "ওহে জনমণ্ডলী! আপনাদের নবীর (সা) পরে দ্বিতীয় কোন নবী নেই এবং তাঁর উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে তার পরে আর কোন কিতাব নেই। আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমে যা কিছু হালাল করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হালাল, আর তাঁর নবীর (সা) মাধ্যমে যা কিছু হারাম করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। আমি নিজে কোন সিদ্ধান্ত দানকারী নই, বরং আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নকারী। আমি নতুন কিছু উদ্ভাবনকারী নই, বরং একজন অনুসরণকারী মাত্র। আল্লাহর নাফরমানির ক্ষেত্রে কারো আনুগত্য লাভের কোন অধিকার নেই। শুনে রাখুন! আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। আমি আপনাদের মত একজন সাধারণ মানুষ। তবে আল্লাহ আমার উপর সবচেয়ে ভারী বোঝায় চাপিয়ে দিয়েছেন।"

হযরত 'উমার ইবন 'আযীযের (রহ) এই প্রথম ভাষণটির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্ উমাইয়্যা যুগে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লাভ করে যা থেকে তাদেরকে বহু বছর যাবত বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল।

মদীনার বিখ্যাত ইমাম কাসিম এ ভাষণ শুনে মন্তব্য করেছিলেন :[৬১১]

اليوم ينطق من كان لاينطق.

'যারা কথা বলতে পারতো না এখন তারা কথা বলতে পারবে।'

তিনি খিলাফত পরিচালনার ব্যাপারে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবকে (রা) আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) পৌত্র প্রখ্যাত তাবি'ঈ হযরত সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমারকে (রা) লেখেন :[৬১২]

وقد رأيت أن اسير في الناس بسيرة عمر بن الخطاب رضـي الله عنـه ان قضـى الله ذلك واستطعت إليه سبيلا فابعث إلىّ بكتـب عمروقضائـه أهـل القبلـة وأهـل العـهد فإني متبع أثره وسائر بسيرته ان شاء الله تعالى.

'যদি আল্লাহর মরজি হয় এবং আমার মধ্যে সে যোগ্যতা ও ক্ষমতা থাকে তাহলে, আমি জনগণের যাবতীয় বিষয় ও ব্যাপারে 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাই। এ কারণে আপনি তাঁর লিখিত যাবতীয় ফরমান এবং মুসলমান ও যিম্মীদের ব্যাপারে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আদেশ দান করেন তা সবই পাঠিয়ে দিন। আল্লাহর ইচ্ছা হলে আমি তা অনুসরণ করবো।'

তখন যুগের পরিবর্তন হয়েছিল। নবুওয়াত ও রিসালাত যুগ অতিক্রান্ত হয়েছিল অনেক আগে। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীগণও একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। উমাইয়্যা শাসকদের দীর্ঘদিনের শাসনে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ব্যাপারে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটেছিল। এ কারণে সেই যুগে ফারূকী আদলের খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ভীষণ কঠিন ব্যাপার ছিল। হযরত সালিম এ সকল সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা অনুধাবন করেন এবং 'উমারকে (রহ) লেখেন : "'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) যা কিছু করেছেন তা ছিল ভিন্ন একটা যুগে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন একদল মানুষের দ্বারা। আপনি যদি এই যুগে এ সকল মানুষের দ্বারা 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) অনুসরণ করতে সক্ষম হন তাহলে আপনি তাঁর চেয়ে উত্তম ব্যক্তিতে পরিণত হবেন।

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) এই পরিবর্তিত অবস্থা এবং যাবতীয় বাধা-প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পৃথিবীর মানুষকে আরেকবার ফারূকী খিলাফতের মডেল দেখিয়ে দেন।

---

৬১১. মুফতী 'আমীমুল ইহসান, তারীখ আল-ইসলাম-২০৭
৬১২. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার-১২৭

খলীফা হওয়ার পর তিনি ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাবকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠি পড়ে ইয়াযীদের মুখ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে উচ্চারিত হয়: 'এই চিঠির ভাষা তাঁর পূর্ববর্তী খলীফাদের ভাষার মত নয়। মনে হচ্ছে তিনি তাদের চলার পথে চলতে চাচ্ছেন না।' এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যকে তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থার সারসংক্ষেপ বলা যেতে পারে।

ইসলামী খিলাফতের ভিত্তি কেবল কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কিরামের (রা) কর্ম-পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) খিলাফতকালের পূর্বে এই ভিত্তি একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তিনি পুনরায় তা স্থাপন করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম রাখেন। একবার তিনি ফরমান জারী করেন, যে আঞ্চলিক কর্মকর্তা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা করবে না তার আনুগত্য আবশ্যক নয়। একবার একটি ঘটনায় 'আব্বাস ইবন আল-ওয়ালীদ তার সামনে একটি দলিল উপস্থাপন করে। তিনি সেটি দেখে বলেন: 'আল্লাহর কিতাব আল-ওয়ালীদের এই কিতাবের (লিখিত দলিল) চেয়ে বেশী অনুসরণযোগ্য।' আবূ বকর ইবন হাযম বলেন: 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) যত চিঠি আসতো তাতে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাহ জীবিত করার ও বিদ'আত দূর করার নির্দেশ অবশ্যই থাকতো।

তিনি বলতেন, যদি আমি আমার দেহের গোশতের প্রতিটি টুকরোর বিনিময়ে একটি বিদ'আত দূর করতে ও একটি সুন্নাহ জীবন্ত করতে পারতাম এবং এভাবে আমার জীবনও চলে যেত তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে এ কাজ খুবই নগণ্য হতো। তিনি আরো বলতেন, যদি আমি সুন্নাহর বাস্তবায়ন করতে ও সত্যের পথে চলতে না পারি তাহলে এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে চাই না।[৬১৩]

তাঁর খিলাফতের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, উমাইয়্যা খান্দানের খিলাফতকালে গণতান্ত্রিক চেতনা যা ইসলামী খিলাফতের অন্যতম মূল ভিত্তি, একেবারেই যেতে বসেছিল। তিনি তা আবার প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর আদত-অভ্যাসে বিপ্লব ঘটেছিল, তবে স্বভাব-প্রকৃতি প্রথম থেকেই ছিল গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন। আর তাই যখন আল-ওয়ালীদের সময় তিনি মদীনার ওয়ালী নিযুক্ত হন তখন মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম তথাকার বিখ্যাত 'আলিম ও ফকীহগণকে ডেকে পাঠান। তাঁরা উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আমি আপনাদেরকে এমন কাজের জন্য ডেকেছি যার বিনিময়ে আপনারা সাওয়াব পাবেন এবং আপনারা সত্যের সাহায্যকারী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবেন। আমি আপনাদের মতামত ছাড়া কোন কাজ করতে চাই না। তাঁর এমন মনোভাবের কথা শুনে উপস্থিত মহান ব্যক্তিরা তাঁর শুভ ও কল্যাণ কামনা করতে করতে বিদায় নেন।[৬১৪] তিনি খলীফা হওয়ার পর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিজের একান্ত উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। তাঁরা তাঁকে খিলাফত পরিচালনায় উপদেশ দিতেন। ইবন সা'দ বলেন:[৬১৫]

---

৬১৩. তাবাকাত-৫/৩৮৩

৬১৪. প্রাগুক্ত-৫/৩৪২

৬১৫. ইবনুল জাওযী-৬২; প্রাগুক্ত-৫/৩৮২

كان لعمر بن عبد العزيز سمار ينظرون فى أمور الناس.

"উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কিছু পারিষদ ছিলেন যাঁরা জনগণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন।'

তাঁর খিলাফতকালের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিদের রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি নিজে সবসময় 'আলিমদের পরামর্শ নিতেন, তাঁদের সাহচর্য অবলম্বন করতেন। তাঁর এমন কিছু একান্ত সহচরের নাম ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে উল্লেখ করেছেন।[৬১৬] 'আদী ইবন আরতাত সবসময় শর'ঈ বিষয়ে খলীফা 'উমারের (রহ) মতামত চেয়ে পাঠাতেন। একবার 'উমার তাঁকে লিখলেন, শীত-গ্রীষ্ম সকল মওসুমে সুন্নাহ বিষয়ে জানতে চেয়ে আমার মত একজন মুসলমানকে কষ্ট দিচ্ছো। এতে অবশ্য আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করছো। আল্লাহর কসম! হাসান আল-বসরী তোমাদের জন্য যথেষ্ট। আমার এ পত্র পৌঁছার পর থেকে আমার, তোমার ও সকল মুসলমানের জন্য করণীয় বিষয় সম্পর্কে তাঁর কাছেই জিজ্ঞেস করবে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হাসান আল-বসরীর (রহ) উপর অনুগ্রহ করুন! ইসলামে তিনি একজন উঁচু মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি। তাঁকে আমার পত্র পাঠ করে শোনাবে।[৬১৭]

তাঁর খিলাফত ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে মনীষীদের মূল্যায়ন

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার খলীফা হিসেবে মানুষের মধ্যে মাত্র দু'বছর পাঁচ মাস ও কয়েক দিন বেঁচে ছিলেন। এ অল্প সময়ে তিনি যে বিশাল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেন তা বহু যুগেও করা সম্ভব ছিল না। এ কারণে তাঁর সময় থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত অসংখ্য মনীষী তাঁর খিলাফত পরিচালনা, 'আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি যে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক, অন্যতম খলীফায়ে রাশেদ ও সৎপথ প্রাপ্ত ইমাম ছিলেন– এ ব্যাপারে সকলে একমত পোষণ করেছেন।

ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্ বলেন :[৬১৮]

إن كان فى هذه الأمة مهدى، فهو عمر بن عبد العزيز.

'এই উম্মাতের মধ্যে যদি কোন মাহ্দী হয়ে থাকেন তাহলে তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয।' প্রায় এমন কথাই বলেছেন সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, হাসান আল-বসরী, মুহাম্মাদ ইবন 'আলী (রহ) ও অন্যরা।

মায়মূন ইবন মিহ্রান বলেন :[৬১৯]

---

৬১৬. তাবাকাত-৫/৩৯২
৬১৭. ইবনুল জাওযী-১০১
৬১৮. তাবাকাত-৫/৩৩৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২০০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৩০
৬১৯. ইবনুল জাওযী-৭৪

إن الله كان يتعاهد الناس بنبى بعد نبى، وإن الله تعاهد الناس بعمر بن عبد العزيز.

'আল্লাহ তা'য়ালা একের পর এক নবী পাঠিয়ে মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আর আল্লাহ 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের দ্বারা মানুষকে রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন।'

ইমাম সুফইয়ান আছ-ছাওরী, শাফি'ঈ ও আবূ বকর ইবন 'আয়্যাশ (রহ) বলেন :[৬২০]

الخلفاء الراشدون خمسة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزيز.

'খলীফায়ে রাশেদ পাঁচজন : আবূ বকর, 'উমার ইবন আল-খাত্তাব, 'উছমান, 'আলী ও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রা)।'

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) বলেন :[৬২১]

يروى في الحديث (أن الله تبارك وتعالىيبعث على رأس كـل مائـة عـام مـن يجـدّد لهذه الأمة دينها). فنظرنا في الـمائة الأولى فإذا هو عمربن عبد العزيز، ونظرنـا فـي الـمائة الثانية فإذا هو الشافعي.

'হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, "কল্যাণময় ও সুমহান আল্লাহ প্রতি এক শ' বছরের মাথায় এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন যে এই উম্মাতের জন্য তাদের দীনকে সংস্কার করবে।" আমরা যখন প্রথম শতকে দেখেছি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে পেয়েছি। আর যখন দ্বিতীয় শতকে দেখেছি, শাফি'ঈকে (রহ) পেয়েছি।'

হাফেজ ইবন হাজার 'আসকিলানী (রহ) উল্লেখিত হাদীছের ব্যাখ্যায় অনেক কথা বলেছেন। একমাত্র 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছাড়া অন্য কারো জীবনে এককভাবে মুজাদ্দিদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে বলে তিনি মনে করেননি। তিনি বলেন :[৬২২]

لايلزم أن جميع خصال الخير كلها فى شخص واحد، إلا أن يُدَّعى ذلك فى عمربن عبد العزيز، فإنه كان القائم بالأمر على رأس الـمائة الأولى، باتصافه بجميع صفـات الخير وتقدمه فيها، ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه. وأما مـن جاء بعده : فالشافعي وإن متصفا بالصفـات الجميلـة، إلا أنـه لم يكـن القائم بـامر الجهاد والحكم بالعدل.

'শুভ ও কল্যাণের সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য একই ব্যক্তির মধ্যে থাকা অপরিহার্য নয়। তবে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মধ্যে তা ছিল বলে দাবী করা যায়। কারণ, তিনি শুভ

---

৬২০. সিফাতুস সাফওয়া-২/১১৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২০০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৩০

৬২১. ফাতহুল বারী-১৩/২৯৫; আল-বিদায়া-৯/২০৭

৬২২. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-২৭১

ও কল্যাণের যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যসহকারে, শুধু তাই নয়, বরং তাতে পূর্ণ অগ্রবর্তিতা সহকারে প্রথম শতকের মাথায় শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। আর এ কারণে ইমাম আহমাদ বলেছেন, পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণ এই হাদীছের উদ্দীষ্ট ব্যক্তি তিনিই বলে মনে করেছেন। আর পরে যারা এসেছেন, যেমন : শাফি'ঈ (রহ), বহু অনুপম গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তবে শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী না থাকায় জিহাদ পরিচালনা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।'

ইমাম আন-নাওবী (রহ) বলেন :[৬২৩]

وكانت خلافة عمر سنتين وخمسة أشهر ـ نحو خلافة أبي بكـر الصديـق رضـي الله عنهما ـ فملأ الأرض قسطا وعدلا، وسن السنن الحسنة، وأمات الطرائق السيئة.

"'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকাল ছিল দু'বছর পাঁচ মাস– আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতের মত। এ সময়ে তিনি ইনসাফ ও ন্যায়বিচারে পৃথিবীকে পূর্ণ করে দেন, বহু সুন্দর। সুন্দর রীতি-পদ্ধতি চালু করেন এবং বহু অসুন্দর পন্থা-পদ্ধতি বিদূরিত করেন।'

বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতের ছাগল-ভেড়ার রাখালরাও 'উমারের 'আদল-ইনসাফের, তাঁর সুমহান কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য দিয়েছে। তারাও ভোগ করেছে তাঁর সত্য, সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতার সুফল। তাঁর সময়ে বন-জঙ্গলের হিংস্র জীব-জানোয়ারও হিংস্রতা ভুলে গিয়ে তাদের ছাগল-ভেড়ার পালের সাথে চরেছে। এ রকম বহু ঘটনার সাক্ষ্য অনেকে দিয়েছে। মালিক ইবন দীনার বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যখন খলীফা হলেন, তখন রাজধানী দিমাশ্ক থেকে বহু দূরে পাহাড়ের চূড়ায় ছাগলের রাখালরা বললো : মানুষের শাসন-কর্তৃত্ব হাতে নিয়েছেন, কে এই সত্যনিষ্ঠ মানুষটি? তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো : তোমরা বুঝলে কিভাবে? তারা বললো : একজন ন্যায়পরায়ণ খলীফা যখন মানুষের শাসন-কর্তৃত্ব হাতে নেন তখন নেকড়ে আমাদের ছাগল-ভেড়া শিকার করা থেকে বিরত থাকে।

জাসর আল-কাস্সাব বলেন : আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে বকরীর দুধ দোহন করতাম। একদিন একজন রাখালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম তার ছাগলের পালে প্রায় তিরিশটি নেকড়ে রয়েছে। এর পূর্বে আমি কোনদিন নেকড়ে দেখিনি, তাই সেগুলোকে কুকুর মনে করলাম। আমি রাখালকে জিজ্ঞেস করলাম : এই কুকুরগুলো দিয়ে কি করবে? সে বললো : বেটা! এগুলো কুকুর নয়, নেকড়ে। বিস্ময়ে আমি বলে উঠলাম : সুবহানাল্লাহ! ছাগলের পালে নেকড়ে– কোন ক্ষতি করে না? সে বললো : বেটা! যখন মাথা সুস্থ থাকে তখন দেহ নিয়ে ভয় থাকে না।[৬২৪]

---

৬২৩. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-২/১৮
৬২৪. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ-৩৭২, ৩৭৩

মূসা ইবন আ'য়ান ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন আবী 'উয়ায়নার রাখাল। তিনি বলেন : 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের খিলাফতকালে আমরা কারমানে ছাগল চরাতাম। তখন ছাগল, নেকড়ে ও বন্য জন্তু একই জায়গায় চরতো। হঠাৎ এক রাতে একটি নেকড়ে একটি ছাগল আক্রমণ করে। আমরা বলাবলি করলাম, হয়তো সেই সৎ লোকটি মারা গেছেন। আমরা দিন-তারিখ হিসেব করে রাখলাম। পরে জানা গেল সেই রাতে 'উমার মারা গেছেন।[৬২৫]

একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ও সুলায়মান ইবন আবদিল মালিক দুইজনের দুই ছেলের মাঝে কার পিতা শ্রেষ্ঠ এ নিয়ে তর্ক হয়। এক পর্যায়ে সুলায়মানের ছেলে বলে : ما كان ابوك إلا حسنة من حسنات أبي - তোমার পিতা তো আমার পিতার (সুলায়মান) বহু ভালো কাজের একটি ভালো কাজ ছাড়া আর কিছু নয়।' আমার পিতা সুলায়মান একদিন যে কাজ করেছেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয সারা জীবনেও তা করেননি। তিনি একদিন সত্তর হাজার নিজের মালিকানার দাস-দাসীকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্রও দিয়েছেন।[৬২৬]

ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন। "সালিহ্ ইবন 'আলী একবার শামে গিয়ে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কবরটি কোথায় তা জানার জন্য মানুষের নিকট জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কিন্তু এমন কাউকে পেলেন না যে তাঁকে সন্ধান দিতে পারে। অবশেষে এক পাদ্রীর নিকট গেলন এবং তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন :আপনি কি সত্যবাদী লোকটির কবর তালাশ করছেন? সেটা তো ঐ খামারে।[৬২৭]

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) 'আদল ও ইনসাফভিত্তিক যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তী খলীফা ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক তা মাত্র চল্লিশ দিন বহাল রাখেন। তিনি 'উমারের এই ন্যায়-ইনসাফভিত্তিক শাসন পদ্ধতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন।[৬২৮] 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) যে সকল সৎ ও আল্লাহ ভীরু কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিয়েছিলেন ইয়াযীদ তাদেরকে কলমের একটি মাত্র খোঁচায় বরখাস্ত করেন। নওরোয ও ধর্মীয় উৎসবের যাবতীয় উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ এবং বেগার খাটানোর প্রথা যা 'উমার একেবারে মুছে ফেলেন তা আবার চালু হয়। ফাদাক যা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয স্বীয় উত্তরাধিকার থেকে বের করে হযরত ফাতিমার (রা) বংশধরদের ফিরিয়ে দেন, ইয়াযীদ আবার তা কেড়ে নেন।[৬২৯] দিমাশকের একটি গির্জা বানূ নাসরের জমিদারীর সীমার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, 'উমার সেটি খ্রীস্টানদেরকে

---

৬২৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৯/২০৩; তারীখ আল-খুলাফা'-২৩৩; তাবাকাত-৫/৩৮৬, ৩৮৭

৬২৬. আল-'ইক্‌দ আল-ফারীদ-৪/৪২৫

৬২৭. ইবনুল জাওযী-৩৩১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/১৪৩

৬২৮. তারীখ আল-খুলাফা'-২৪৭

৬২৯. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/২৭২, ২৬৬, ২৭৬

ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াযীদ সেটি আবার নিজ খান্দানের হাতে তুলে দেন। মুহাম্মাদ ইবন ইউসুফ ইয়ামনবাসীদের উপর যে নিপীড়নমূলক খারাজ ধার্য করেন 'উমার তা 'উশরে পরিণত করেন। কিন্তু ইয়াযীদ আবার তা খারাজে রূপান্তরিত করেন।[৬৩০]

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ নাজরানের খ্রীস্টানদের নিকট থেকে জিযিয়া হিসেবে আট শ' কারুকাজ করা কাপড় গ্রহণ করতো। 'উমার তা কমিয়ে দু' শ' ধার্য করেন। কিন্তু খলীফা ইয়াযীদের সময়ে ইউসুফ ইবন 'উমার যখন ইরাকের ওয়ালী নিযুক্ত হন তখন তিনি আবার হাজ্জাজের ধার্য করা আট শ' তে পরিবর্তন করেন। ফুরাত তীরবর্তী অঞ্চলে নওমুসলিমদের যে ভূমি ছিল অথবা অমুসলিমদের যে সকল ভূমি মুসলমানদের অধিকারে এসেছিল হাজ্জাজ তা খারাজী ভূমি হিসেবে কর-খাজনা আদায় করতো, কিন্তু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) সে সকল ভূমিকে 'উশরী ভূমিতে পরিবর্তন করেন। অতঃপর 'উমার ইবন হুবাইরা আবার তা পরিবর্তন করে খারাজ আদায় করেন।[৬৩১] 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) কাদরিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন, কিন্তু ইয়াযীদ ইবন আল-ওয়ালীদ খলীফা হয়ে তাদের ঘোরতর সমর্থকে পরিণত হন এবং উক্ত সম্প্রদায়ের নেতা গায়লান আদ-দিমাশ্‌কীকে নিজের একান্ত সহচর হিসেবে গ্রহণ করেন।[৬৩২]

ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক খিলাফতের দায়িত্বগ্রহণের পরই বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মকর্তাদের নিকট যে পত্রটি লেখেন তাতেই তাঁর কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিম্নে পত্রটি উদ্ধৃত হলো :[**]

أما بعد، فإن عمر كان مغرورا، غررتموه أنتم وأصحابكم. وقد رأيت كتبكم إليـه فـي إنكسار الخراج والضريبة. فإذا أتاكم كتابي هذا فدعـوا مـا كنتـم تعرفـون مـن عـهده وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأولى، أخصبـوا أم أجدبـوا، أحبُّـوا أم كرهـوا، حيُّـوا أم ماتوا، والسلام.

'অতঃপর এই যে, 'উমার ছিলেন প্রতারিত মানুষ। তোমরা ও তোমাদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁর সাথে প্রতারণা করেছো। খাজনা-ট্যাক্‌স কমানোর ব্যাপারে তাঁর কাছে লেখা তোমাদের অনেক চিঠি-পত্র আমি দেখেছি। আমার এ পত্র তোমাদের নিকট পৌঁছা মাত্র তোমাদের জানা তাঁর সকল ওয়াদা-অঙ্গীকার পরিত্যাগ করবে। মানুষকে তাদের সেই পূর্বের মর্যাদা ও স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। চাই ফসল হোক বা খরা হোক, তারা পছন্দ করুক বা না করুক এবং তারা বাঁচুক বা মরুক। ওয়াস সালাম।'

---

৬৩০. ফুতূহ আল-বুলদান-১৩০, ১৮০

৬৩১. প্রাগুক্ত-৭২, ৩৭৫

৬৩২. তারীখ আল-খুলাফা'-২৫৫

** আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৪/৪৪৩

মোটকথা হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) যে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা তাঁর ইনতিকালের অব্যবহিত পরেই বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। বিশ্ববাসী মাত্র আড়াই বছর 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) অনুরূপ রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার সুবিধা ভোগের সুযোগ পায়।

বানূ উমাইয়্যা শাসনের অবসান

'আব্বাসীয়দের আন্দোলনের সূচনা হয় 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) খিলাফতকালে। এর মাত্র তিরিশ বছর পরেই উমাইয়্যা শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ কারণে স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এমন একটি কল্যাণময় শাসনকালের মাত্র তিরিশ বছর পর কালচক্র কিভাবে বানূ উমাইয়্যাদের পতন ঘটালো? এই পতনের কারণ কি হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) শাসনকালে সৃষ্টি হয়েছিল? তাঁর ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা সেই সময়ের জন্য কি উপযোগী ছিল না? জুলুম-উৎপীড়ন ভিত্তিক স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার মূলোৎপাটন, যা ছিল 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) একটি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কি এমন কোন দুর্বলতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল এবং যার সুযোগ গ্রহণ করেছিল প্রতিপক্ষ শক্তি?

এসব প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হতে পারে। এ কারণে আমরা বানূ উমাইয়্যাদের পতনের কারণ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলা সমীচীন মনে করছি। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, জাহিলী যুগ থেকেই আরবে 'উমাইয়্যা-হাশিমী দু'টি পরস্পর বিরোধী শক্তি বিদ্যমান ছিল। এ বিরোধিতা ইসলামী যুগেও বর্তমান ছিল। তবে যতদিন আরবদের জাতীয় শক্তি অনারবদের মুখোমুখী ছিল ততদিন পর্যন্ত উমাইয়্যা-হাশিমীদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়নি। হযরত মু'আবিয়ার (রা) সময়ে এ দু'টি শক্তি পরস্পর মুখোমুখী অবস্থানে দাঁড়ায়। মূলতঃ তখন থেকেই আরবে গৃহ যুদ্ধের সূচনা হয় এবং ইমাম হুসাইন (রা) শাহাদাত বরণ করেন।

অনারবরা স্বভাবগতভাবে প্রথম থেকেই ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। এখন তারা ষড়যন্ত্র করার প্রশস্ত অঙ্গন লাভ করে। এখন তারা আহলি বায়ত তথা নবী বংশের সমর্থন ও সহযোগিতার আড়ালে তাদের প্রাচীন হিংসা-বিদ্বেষের বদলা নিতে চায়, কিন্তু খলীফা 'আবদুল মালিক ও আল-ওয়ালীদের সময়কাল পর্যন্ত এ শক্তি গোপন থাকে। তবে যখন তাদের মত ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের অবসান ঘটে তখন বানূ হাশিম অনারবদের উপর ভর করে মাথা তুলে দাঁড়ায়। তারা অনারব শক্তির কেন্দ্র ইরাক ও খুরাসানে তাদের কর্মী ও প্রতিনিধিদের ছড়িয়ে দেয়। তারা হিজরী ১০২, ১০৫, ১০৭, ১০৯ ও ১১৮ সনে নিজেদের হারানো ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালায়। যারা এ ষড়যন্ত্র ও কর্মতৎপরতায় জড়িত ছিল তারা মুহাম্মাদ ইবন 'আলীর হাতে বাই'আত করে। হিজরী ১২৬ সনে তাঁর ইনতিকাল হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইমাম ইবরাহীমকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে যান। ইমাম ইবরাহীম হিজরী ১২৭ সনে আবূ মুসলিম খুরাসানী নামক একজন

বিস্ময়কর ব্যক্তিকে সহযোগী হিসেবে লাভ করেন। বলা চলে তিনি স্বীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য অলৌকিকভাবে আবূ মুসলিমকে পেয়ে যান। তিনি তাঁকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। পূর্বেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরবদের গৃহযুদ্ধের সুযোগে অনারব শক্তির উত্থান ঘটে, আবূ মুসলিমের সময়ে আরবদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আরো বৃদ্ধি পায়। সেই প্রাচীনকাল থেকে আরবরা মুদার ও কাহতান– দু'টি গোত্রে বিভক্ত এবং পরস্পরের মধ্যে দারুণ দ্বন্দ্ব ও রেষারেষিও ছিল। এ কারণে নাসর ইবন সাইয়ার, যিনি কাহতানদের বিরোধী ছিলেন, তাদের জন্য সরকারী চাকরির দরজা একেবারেই বন্ধ করে দেন। খুরাসানে কাহতানদের নেতা ছিলেন জাদী' ইবন 'আলী কারমানী। তিনি নাসরকে বুঝান যে, তাঁর এই কর্মকাণ্ড ভীষণ গোলযোগ সৃষ্টি করবে এবং বানূ হাশিম আক্রমণের সুযোগ পাবে। এতে ক্ষেপে গিয়ে নাসর কারমানীকে কারারুদ্ধ করেন। তবে কারমানী তাঁর এক অনারব দাসের বুদ্ধিমত্তায় কারাগার থেকে পালিয়ে যান। তারপর রাবী'আ ও ইয়ামীন গোত্রসমূহের সাহায্য নিয়ে নাসরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। প্রায় পৌণে দু'বছর তাদের এ সংঘর্ষ চলে। এতে তাঁদের দু'পক্ষের যে পরিমাণ শক্তি ক্ষয় হয়, ঠিক তাদের প্রতি প্রতিপক্ষ আবূ মুসলিম খুরাসানীর শক্তি সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এমন কি খুরাসানের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর হাতে বাই'আতকারী মানুষের সংখ্যা দু'লাখে পৌঁছে যায়। এখন আবূ মুসলিম নাসরের শক্তি চূর্ণ করার জন্য কারমানীকে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেন। এ খবর নাসরের কানে পৌছলে তিনি কারমানীকে লেখেন, আমরা দু'জন নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াই এবং রাবী'আ গোত্রের কাউকে আমরা নেতা মেনে নেই। যেহেতু পূর্বেই কারমানীর প্রস্তাব এমনই ছিল, এ কারণে তিনি নাসরের প্রস্তাব মেনে নেন এবং গোপনে আবূ মুসলিমের বাহিনী থেকে পালিয়ে নাসরের নিকট যাবার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু নাসর তাঁর সাথে প্রতারণা করে তাঁকে হত্যা করেন। এরপর কারমানীর পুত্র 'আলী আশ্রয় নেয় আবূ মুসলিমের নিকট এবং তাঁর সহায়তায় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চায়। আবূ মুসলিম নাসরকে প্রতিহত করার জন্য কুহতাবাকে বিশাল বাহিনী সহকারে পাঠান। নাসর অবস্থা বেগতিক দেখে আত্মসমর্পণ করেন। কুহতাবা তাঁকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তিনি একদিন রাতের অন্ধকারে কুহতাবার সেনাশিবির থেকে পালিয়ে যান এবং সাওয়া নামক স্থানে পৌছে অল্প কিছু দিন পর মারা যান। এখন নাসর ও কারমানী উভয়ের সকল সৈনিক আবূ মুসলিমের আনুগত্য মেনে নেয়। এভাবে গোটা খুরাসান আবূ মুসলিমের কর্তৃত্বাধীন চলে আসে। এরপর খিলাফতের অন্যান্য অঞ্চলের উপর হাশিমীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উমাইয়্যা বংশের সর্বশেষ খলীফা ছিলেন মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদ। তিনি পালিয়ে মিসরে যাওয়ার পথে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর সাথে হিজরী ১৩২/খ্রী: ৭৫০ সনে উমাইয়্যা শাসনের পতন হয়।

অনেকটা স্থূল পর্যালোচনার ভিত্তিতে একথাও বলা হয় যে, অমুসলিমদের প্রতি 'উমারের উদার ও ন্যায়ানুগ কর্ম-পদ্ধতি গ্রহণের ফলে জিযিয়া ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনিভাবে প্রতিষ্ঠিত সচ্ছল ব্যক্তিদের সম্পদ কেড়ে নিয়ে বায়তুল মালে অথবা

প্রকৃত মালিককে ফেরত দেওয়ায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। ফলে 'উমারের মৃত্যুর মাত্র তিরিশ বছর পর উমাইয়্যা শাসনের পতন হয়।

এভাবে তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। কিন্তু আমরা তাঁর কর্ম পদ্ধতি আলোচনা করে দেখিয়েছি তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁর স্বল্পকালীন শাসনকালে জনগণের মধ্যে যে শান্তি, নিরাপত্তা ও সচ্ছলতা বিরাজমান ছিল তার ভিত্তি ছিল তাঁর উদার ও ন্যায়ানুগ শাসন ব্যবস্থা। আমরা মনে করি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) শূরা ও ইনসাফভিত্তিক যে রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, তার থেকে পরবর্তী খলীফাগণ দূরে সরে যাওয়ার কারণে উমাইয়্যা খিলাফতের পতন ঘটে।

উমাইয়্যাদের অবদান

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) ছিলেন উমাইয়্যা খান্দানের সদস্য। এ কারণে তাঁর কর্মকাণ্ড ও জীবনচিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন উমাইয়্যা শাসকের কর্মকাণ্ড, শাসন পদ্ধতি ও জীবন যাপন প্রণালীর সমালোচনা করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে তাদেরকে হেয় ও তুচ্ছ করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে। মূলতঃ হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) যথাযথ মূল্যায়ন করতে গিয়ে এমন হয়েছে। তাঁদেরকে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এমনটি করা হয়নি। আমাদের মনে রাখতে হবে, উমাইয়্যা খিলাফতের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) একজন মহান সাহাবী। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ও তাঁর রাসূল (সা) সাহাবায়ে কিরামের যে মর্যাদা নির্ধারণ করেছেন, আমরা তাঁদের সে মর্যাদা দানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নানা কারণে মুসলিম উম্মাহর নিকট মারওয়ান ইবন আল-হাকাম বিতর্কিত। কিন্তু তিনি মুসলিম উম্মাহকে আবদুল মালিক ও 'আবদুল আযীযের মত যে দু'জন সুশিক্ষিত সন্তান উপহার দেন তা আমরা ভুলবো কেমন করে? এই মারওয়ানেরই পৌত্র মুসলিম উম্মাহর নয়নমণি ও কলিজার টুকরা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ)।

উমাইয়্যা শাসনামলের একজন আঞ্চলিক গভর্ণর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ। ইতিহাস তাঁকে একজন রক্তপিপাসু খুনী ও জুলুম-অত্যাচারের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করেছে। কিন্তু অনারবদের জন্য কুরআন পাঠ সহজ করার উদ্দেশ্যে নুকতা, হারাকাত, ওয়াক্‌ফ-সুকূন ইত্যাদি চিহ্নের যে ব্যবস্থা তিনি করে গেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে। পারস্য, ভারতবর্ষসহ মধ্য এশিয়ার বিশাল অঞ্চলে ইসলামের যে বিস্তৃতি তা তো তাঁরই অবদান।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহর জন্য তাদের যে বিশাল অবদান তা খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। এখানে অতি সংক্ষেপে তাদের কর্মকাণ্ডের একটি বিবরণ তুলে ধরা হলো।

১. আরবীয় স্বভাব ও স্বাতন্ত্র অক্ষুণ্ন রাখা : এ তাদের একটি বড় কৃতিত্ব যে, খিলাফত পরিচালনায় সর্বক্ষেত্রে তারা আরবীয় প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখে। আরবদের সরলতা ও ঐতিহ্য তারা সংরক্ষণ করে। এ কারণে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁদেরকে কোন রকম ধোঁকা

ও প্রতারণামূলক ডিপ্লোমেসি ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিতে দেখা যায় না। তাদের ভিত্তি ছিল শক্তি, সাহস ও বীরত্ব। অনারবদের জীবনের কোন কৃত্রিমতা ব্যক্তি, সমাজ, আচার-অনুষ্ঠান কোথাও কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এর বিপরীতে পরবর্তী আব্বাসীয় খিলাফত ছিল অনারবদের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আব্বাসীয় খলীফাগণের সকলেই ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। তবে খিলাফত যারা চালাতো সেইসব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের প্রায় সকলে ছিল অনারব। এর পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, খিলাফত নিজস্ব শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং ধোঁকা ও প্রতারণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। 'আদাবুল সুলতানিয়্যা' গ্রন্থে আব্বাসীয় খিলাফতের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে :[৬৩৩]

واعلم ان الدولة العباسية كانت دولة ذات خدع ودهاء وغدر وكان قسم التحيل والمخادعة فيها أوفر من قسم القوة والشدة خصوصا فى أواخرها فان المتأخرين منهم ابطلوا القوة والشدة والنجدة وركنوا إلى الحيل والخدع.

'আব্বাসীয় খিলাফত ছিল ধোঁকা, প্রতারণা ও চাতুরীপূর্ণ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। তাতে শক্তি ও ক্ষমতার চেয়ে প্রতারণার প্রাধান্য ছিল। বিশেষতঃ এ যুগের শেষের দিকের খলীফাগণ বীরত্ব ও সাহসিকতা একেবারেই খুইয়ে বসে এবং ধোঁকা ও প্রতারণার দিকে ঝুঁকে পড়ে।'

২. দেশ জয়

উমাইয়্যা যুগে এত বেশী দেশ ও অঞ্চল বিজিত হয় যে, গোটা ইসলামের ইতিহাসে তার কোন নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। খিলাফতে রাশেদার সময়ে খিলাফতের সীমা-সরহদ অনেক বৃদ্ধি পায়, তবে তা আরব, শাম, মিসর ও ইরান অতিক্রম করেনি। তবে উমাইয়্যা যুগে এর বিস্ময়কর বিস্তৃতি ঘটে। ত্রিপলি, তিউনিসিয়া, মরক্কো, স্পেন, কনস্টান্টিনোপল, ইরাক, খুরাসান, তাবারিস্তান, জুরজান, সিজিস্তান, আফগানিস্তান, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশ ইসলামী খিলাফতের অংশে পরিণত হয়। মোটকথা পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বিশাল ভূখণ্ডে ইসলামী পতাকা উড্ডীন হয়।

এ ক্ষেত্রে উমাইয়্যা খলীফা আল-ওয়ালীদের শাসনকালকে গৌরবজনক অধ্যায় বলে গণ্য করা হয়। আল্লামা সুয়ূতী (রহ) বলেন :[৬৩৪]

ولكنه أقام الجهاد فى أيامه وفتحت فى خلافته فتوحات عظيمة.

'তবে তিনি স্বীয় শাসনকালে জিহাদ অব্যাহত রাখেন এবং তাঁর খিলাফতকালে অনেক বড় বড় বিজয় অর্জিত হয়।'

---

৬৩৩. আদাবুস সুলতানিয়্যা-৩২
৬৩৪. তারীখ আল-খুলাফা'-২২৪

এই সামরিক শক্তি যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামসহ খলীফা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। মাস'উদী বলেছেন :[৬৩৫]

واستجاد الكسى والفرش وعدد الحرب وآلاتها واصطنع الرجال وقوى التغور.

'তিনি উৎকৃষ্ট কাপড়, উৎকৃষ্ট কার্পেট ও উন্নতমানের সমরাস্ত্র তৈরি করেন। সৈন্য বাহিনীর জন্য সৈন্য তৈরি করেন এবং সীমান্ত সুসংহত করেন।'

নিয়মতান্ত্রিকভাবে নৌ অভিযানের সূচনা হয় এই উমাইয়্যা যুগে এবং তা ব্যাপকতা লাভ করে। এ সময় যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থা

শুধুমাত্র দেশ জয় কোন গৌরবের বিষয় নয়। বরং দেশ জয়ের সাথে সাথে এটাও দেখা উচিত, বিজিত অঞ্চলে কি কি ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছিল, জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ, কৃষির উন্নতি, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং বিজিত দেশের অধিবাসীদের উপর বিজয়ীদের কি প্রভাব পড়েছিল? এই দিক দিয়ে বানূ উমাইয়্যাদের শাসনকাল ছিল একটি সুসভ্য ও সুউন্নত শাসনকাল।

৪. ভূমি জরিফ

ভূমি জরিফের কাজটি সর্বপ্রথম করান হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা)। এরপর আর কোন খলীফা এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেননি। ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেন। তিনি ভূমি জরিফ করান এবং 'উমার ইবন হুবাইরাকে ইরাকের ভূমি বন্দোবস্ত দানের নির্দেশ দেন।[৬৩৬] 'আল্লামা ইয়া'কূবীর বর্ণনা মতে যদিও এতে কর-খাজনার ক্ষেত্রে জনগণের বিশেষ কোন সুবিধা হয়নি, তবে এ দ্বারা রাষ্ট্রের ভূমি ব্যবস্থাপনার নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা যায়।

৫. সেচের জন্য কূপ-খাল খনন

হযরত মু'আবিয়া (রা) সেচ ব্যবস্থার প্রতি ভীষণ গুরুত্ব দেন। তাঁর সময়ে এর দারুণ উন্নতি হয়।

খুলাসাতুল ওয়াফা গ্রন্থে এসেছে :[৬৩৭]

كان بالمدينة الشريفة وما حولها عيون كثيرة وكان لمعاوية اهتمام بهذا الباب.

'মদীনা শরীফ ও তার আশে-পাশে বহু খাল প্রবহমান ছিল। এ বিষয়ে হযরত মু'আবিয়া (রা) বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি যে সকল খাল খনন করেন তার মধ্যে অনেকগুলোর নাম ওয়াফা আল-ওয়াফা' এবং 'খুলাসাতুল ওয়াফা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন : নাহ্রু কাজামা, নাহ্রু আযরাক, নাহ্রু শুহাদা' ইত্যাদি।

---

৬৩৫. মুরূজ আয-যাহাব (নাফহুত তীব-এর পার্শ্বটীকা)-৩/২১

৬৩৬. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩৭৬

৬৩৭. খুলাসাতুল ওয়াফা-২৩৭

Contents

৬. পানীয় জলের জন্য খাল খনন

উমাইয়্যা খলীফাগণ সেচ কাজের জন্য খাল খনন ছাড়াও জনসাধারণের পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য বহু কূপ ও খাল খনন করে পানি প্রবাহিত করেন। এতে জনগণের সুমিষ্ট পানি প্রাপ্তির সুবিধা হয়। খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক মক্কায় একটি খাল খনন করেন এবং পাইপের সাহায্যে সেখান থেকে মিষ্টি পানি মসজিদুল হারাম পর্যন্ত নিয়ে যান। সেখান থেকে একটি ফোয়ারার মাধ্যমে হাজারে আসওয়াদ ও যমযমের মাঝখানে নির্মিত একটি হাউজে গিয়ে পড়তো।

উপরিউক্ত হাউজটি বানূ উমাইয়্যাদের শাসনকালের শেষ সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অতঃপর বানূ হাশিম বা আব্বাসীয়দের শাসনকালে দাউদ ইবন 'আলী সেটি ভেঙ্গে ফেলেন। খলীফা হিশামও মক্কার বিভিন্ন রাস্তায় একাধিক হাউজ নির্মাণ ও পুকুর খনন করান। কিন্তু সেগুলো আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনাতে দাউদ ইবন 'আলীর হাতে বিধ্বস্ত হয়।[৬৩৮] এর দ্বারা প্রমাণ হয়, আব্বাসীয় খলীফাগণ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বানূ উমাইয়্যাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও স্মৃতি নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। মক্কার পরে পানির সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল বসরার অধিবাসীদের। উমাইয়্যা খলীফাগণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাদের এই প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেন। একবার বসরার অধিবাসীরা খলীফা ইয়াযীদ কর্তৃক নিয়োগকৃত তথাকার ওয়ালীর নিকট তাদের পানীয় জলের সংকটের কথা জানায়। একথা খলীফা আল-ওয়ালীদকে জানানো হলে তিনি সেখানে একটি খাল খননের নির্দেশ দেন। তিনি লেখেন : এতে যদি ইরাকের কর-খাজনার রাজস্ব আয়ের সব ব্যয় হয়ে যায় তবুও কোন পরোয়া নেই। তিনি সেখানে একটি খাল খনন করেন। সেই নদী বা খাল 'নাহরু 'উমার' নামে পরিচিত। বানূ উমাইয়্যা গভর্ণরদের অনেকে বসরায় আরো অনেক খাল খনন করেন যার নাম এবং বিস্তারিত বিবরণ 'ফুতূহুল বুলদান' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়।

৭. রাস্তা-ঘাট সমতলকরণ

আরব একটি পাহাড়-পর্বতময় অসমতল ভূমি। সেকালে রাস্তা-ঘাট ছিল অত্যন্ত দুর্গম। আল-ওয়ালীদ জনকল্যাণমূলক কাজের ধারাবাহিকতায় আরবের রাস্তা-ঘাট সমতল করে জনগণের চলাচলের জন্য সুগম করেন, আর সেই সংগে পথচারীদের পানির প্রয়োজন মেটানোর জন্য মাঝে মাঝে কূপ খনন করান।

আনতাকিয়া ও মাসীসার মধ্যবর্তী রাস্তা হিংস্র জীব-জন্তুর কারণে জনগণের চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এই আপদ ও উপদ্রব দূর করার জন্য আল-ওয়ালীদ এই পথের আশে-পাশে চার হাজার মহিষ ছেড়ে দেন। এতে হিংস্র জন্তুর উপদ্রব অনেক কমে যায়। এছাড়া বহু বন-জঙ্গল কেটে ফেলে তিনি রাস্তা-ঘাট চলাচলের জন্য নিরাপদ করেন।

---

৬৩৮. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩৫২

৮. হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা

আল-ওয়ালীদ প্রথম মুসলিম শাসক যিনি জনগণের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। আল-ইয়া'কূবী লিখেছেন :[৬৩৯]

وكان أول من عمل البيمارستان للمرض.

'আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক প্রথম ব্যক্তি যিনি অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।'

৯. মুসাফিরদের জন্য মেহমানখানা নির্মাণ করেন সর্বপ্রথম হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা)। হযরত 'উছমানও (রা) তাঁকে অনুসরণ করেন। উমাইয়্যা খলীফা আল-ওয়ালীদ খুলাফায়ে রাশেদীনের এ সুন্নাত অব্যাহত রাখেন এবং তিনিও একটি মেহমানখানা নির্মাণ করান।[৬৪০]

১০. দুঃস্থ, অভাবী ও পঙ্গুদের জন্য ভাতা প্রবর্তন

ঐতিহাসিকগণ খলীফা আল-ওয়ালীদের জুলুম-অত্যাচার ও কঠোরতার কথা বলেছেন। পাশাপাশি তাঁর দয়া-মমতা ও উদারতার কথা বলতেও কার্পণ্য করেননি। যেমন, তিনি অন্ধ, আঁতুড়, খঞ্জ, কুষ্ঠরোগী, দুঃস্থ ও ইয়াতীমদের জন্য ভাতা চালু করেন। ইয়াতীমদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ দেন, প্রত্যেক অন্ধের পথ দেখানোর জন্য একজন লোক দেন, প্রত্যেক খঞ্জের জন্য একজন সেবক দেন।[৬৪১] তাঁর পরে পরবর্তী উমাইয়্যা খলীফা দ্বিতীয় ওয়ালীদ ইবন ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিক পূর্ববর্তী আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিকের অনুসরণ করেন। 'আল্লামা আবুল ফারাজ বলেন, তিনি খঞ্জ ও অন্ধদের ভাতা ও বস্ত্র দেন।

১১. ভবন নির্মাণ

ইসলামের ইতিহাসে স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি বানূ উমাইয়্যাদের যুগে হয়েছে। হযরত মু'আবিয়া (রা) প্রথম ব্যক্তি যিনি জাঁকজমকপূর্ণ ভবন নির্মাণ করেন। আল-ইয়া'কূবী বলেন :[৬৪২]

بنى وشيد البناء.

'তিনি ভবনাদি নির্মাণ করেন ও সৌন্দর্যবর্ধনও করেন।' হযরত মু'আবিয়ার (রা) পরে খলীফা আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক এই স্থাপত্য শিল্পকে এত দূর এগিয়ে নিয়ে যান যে, এই ক্ষেত্রে তাঁর খিলাফতকালকে অন্যদের থেকে অগ্রগামী ও আদর্শ স্থানীয় বলে গণ্য করা হয়। 'আদাবুস সুলতানিয়া' গ্রন্থকার বলেন :[৬৪৩]

---

৬৩৯. প্রাগুক্ত-২/৩৪৮

৬৪০. প্রাগুক্ত-২/৩৩৮

৬৪১. প্রাগুক্ত-২/৩৪৫; তারীখ আল-খুলাফা'-২৪৪

৬৪২. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/২৭৬

৬৪৩. আদাব আস-সুলতানিয়্যা-১১৪

وكان شديد الكلف بالعمارات والأبنية واتخاذ المصانع والضياع وكان الناس يلتقون في زمانه فيسأل بعضهم بعضا عن الأبنية والعمارات.

'ভবন নির্মাণ, জাহাজ তৈরির কারখানা ও খামার গড়ে তোলার প্রতি তাঁর ভীষণ আগ্রহ ছিল। এমনকি তাঁর সময়ে মানুষ যখন একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতো তখন কেবল প্রাসাদ ও ভবনের কথা আলোচনা করতো।'

আল-ওয়ালীদ যে সকল ভবন নির্মাণ করান তার মধ্যে দিমাশকের জামে' মসজিদ, মসজিদে দিমাশ্ক, মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা ইসলামী সভ্যতার একটি উজ্জ্বল দিক। ভবন নির্মাণ ছাড়াও উমাইয়্যা খলীফাগণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু নতুন শহরের পত্তন করেন। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ কূফা ও বসরার মাঝখানে ওয়াসিত শহরের পত্তন করেন। খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক রামলা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তাতে বাসভবন, মসজিদ তৈরি করেন এবং কূপ ও পুকুর খনন করেন।

'উকবা ইবন নাফি' আফ্রিকা মহাদেশে কায়রোয়ান শহর তৈরি করেন। এছাড়া আরো অনেক শহর তিনি গড়ে তোলেন।

১২. আওয়ালিয়াত বা উমাইয়্যাদের সম্পূর্ণ নতুন কার্যক্রম

উমাইয়্যাদের উন্নত রাষ্ট্র ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, তারা বিভিন্ন রকমের নতুন ব্যবস্থাপনা চালু করেন। এখানে তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো :

(১) ডাক ব্যবস্থার প্রচলন

হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতের পূর্বে কোন ডাক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল না। এ কারণে রাষ্ট্রীয় ও সামরিক খবরাখবর দ্রুত আদান-প্রদান সম্ভব হতো না। হযরত মু'আবিয়া (রা) এ সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে দ্রুত গতির ঘোড়া প্রস্তুত রাখেন। এতে খবর আদান-প্রদান অনেকটা সহজ হয়ে যায়। আরবীতে এই বিভাগের নাম 'বারীদ' (بريد)। অভিধানে 'বারীদ' বলতে বারো মাইলের দূরত্ব বুঝায়। আল্লামা ফাখরী লিখেছেন, সম্ভবতঃ বারো মাইল পরপর ঘোড়া রাখা হয়েছিল এ কারণে এ বিভাগের নাম 'বারীদ' হয়েছে।

(২) দিওয়ানুল খাতাম

হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালের পূর্বে খলীফাগণ আদেশ-নিষেধ সম্বলিত যে সকল চিঠিপত্র লিখতেন, তা কোন নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে লেখা হতো না। এ কারণে কেউ জালিয়াতি করতে চাইলে সহজেই তা করতে পারতো। হযরত মু'আবিয়ার (রা) সময়ে কিছু দিন এ অবস্থা চালু ছিল। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তিকে এক লাখ দিরহাম দেওয়ার জন্য যিয়াদকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি খোলা অবস্থায় সেই ব্যক্তির হাতে দিয়ে দেন। লোকটি এক লাখের স্থলে দু'লাখ করে দেয় এবং যিয়াদের নিকট থেকে দু'লাখ হাতিয়ে নেয়। বছর শেষে হযরত মু'আবিয়ার (রা) নিকট হিসাব উপস্থাপন করা

হলে বিষয়টি ধরা পড়ে। মু'আবিয়া (রা) উক্ত লোকটির নিকট থেকে এক লাখ দিরহাম ফিরিয়ে নেন। এ ঘটনার পর তিনি সরকারী চিঠি-পত্র ও ফরমানের ক্ষেত্রে একটি নিয়ম-নীতির প্রতি দৃষ্টি দেন। তিনি 'দিওয়ানুল খাতাম' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করেন। এরপর যে সকল চিঠি-পত্র লেখা হতো তার কপি করে নথিভুক্ত ও সীল-মোহর করা হতো। যাতে কোন রকম জালিয়াতির সুযোগ কেউ না পায়। আব্বাসীয় খিলাফতের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এ বিভাগ চালু ছিল। পরে তা উঠিয়ে দেওয়া হয়।[৬৪৪]

(৩) নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা

ইসলামের ইতিহাসে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন দফতরের প্রতিষ্ঠা হয় সর্বপ্রথম হযরত মু'আবিয়ার (রা) সময়ে। ঐতিহাসিক আল-ইয়া'কূবী যিয়াদের কর্মকাণ্ড আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন :[৬৪৫]

وكان أول من دون الدواوين ووضع النسخ للكتب وأفرد كتاب الرسائل من العرب والموالي المتفصحين وكان زياد يقول ينبغي أن يكون كتاب الخراج من رؤساء الأعاجم العالمين بأمور الخراج... وكان زياد أول من بسط الأرزاق على عماله ألف ألف درهم.

'যিয়াদ প্রথম ব্যক্তি যিনি বিভিন্ন দফতর কায়েম করেন, বিভিন্ন সরকারী কাগজপত্রের কপি করার ব্যবস্থা করেন, সরকারী কাগজপত্র লেখার জন্য আরব ও মাওয়ালীদের মধ্য থেকে বিশুদ্ধ লেখক নিয়োগ করেন। যিয়াদ বলতেন, খারাজ (কর-খাজনা) দফতরের লেখক এমন অনারব নেতাদের মধ্য থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয় যারা খারাজ বিষয়ে অভিজ্ঞ। যিয়াদ প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করেন। তাদের জন্য দশ লক্ষ দিরহাম বরাদ্দ করেন।

(৪) সরকারী দফতরে আরবী ভাষার প্রচলন

বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে ফার্সী ভাষা চালু ছিল। খলীফা 'আবদুল মালিকের সময়ে তিনি আরবী ভাষা চালুর নির্দেশ দেন। এই প্রথমবারের মত আরবী সরকারী ভাষা হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

'আবদুল মালিক ইরাক ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের দফতরসমূহে এ আরবীকরণের ব্যবস্থা করেন। শামের বিভিন্ন অঞ্চলের দফতরে রোমান ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে চালু ছিল। সেখানে কোন পরিবর্তন করেননি। তবে আল-ওয়ালীদ তাঁর খিলাফতকালে এই বৈষম্য দূর করেন। তিনি খ্রীস্টানদের নির্দেশ দেন, তারা যেন সরকারী অফিসের কাগজপত্র লেখার ক্ষেত্রে রোমান ভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষা ব্যবহার করে।

---

৬৪৪. প্রাগুক্ত : ৯৭-৯৮
৬৪৫. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/২৭৯

(৫) টাকশাল প্রতিষ্ঠা

'আবদুল মালিকের খিলাফতকালের পূর্বে ইসলামী খিলাফতে রোমান মুদ্রা চালু ছিল। তিনি সর্বপ্রথম টাকশাল প্রতিষ্ঠা করে আরবী মুদ্রা চালু করেন।[৬৪৬]

(৬) বস্ত্র শিল্পের উন্নতি

খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিক পোশাকের ব্যাপারে অত্যন্ত রুচিশীল মানুষ ছিলেন। সুন্দর, দামী, মোলায়েম, বিভিন্ন রংগের ও নকশা করা কাপড়ের তৈরি পোশাক ছিল তাঁর অতি পছন্দের। নিজের বংশের লোক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও তিনি এ রকম কাপড় ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতেন। এর ফলে তাঁর পছন্দের কাপড় ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। আর এ কারণে বস্ত্র শিল্পের দারুণ উন্নতি ঘটে। মাস'উদী বলেন : তাঁর সময়ে ইয়ামন, কূফা ও ইসকান্দারিয়ায় রঙ্গিন ও উৎকৃষ্ট কাপড় তৈরি হতো। মানুষ সেই কাপড়ের জুব্বা, চাদর, পায়জামা, পাগড়ী ও টুপি পরতো।'[৬৪৭]

(৭) জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারে অবদান

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা ও শাস্ত্র নেই যার উন্নতি, প্রসার, বিন্যাস, লিপিবদ্ধকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উমাইয়্যা খলীফাদের অবদান লক্ষ্য করা যায় না।

কুরআন মাজীদ

কুরআন মাজীদ হলো সকল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। এ মহাগ্রন্থের বিন্যাস ও লিপিবদ্ধকরণের কাজ খিলাফতে রাশেদার আমলে সম্পন্ন হয়েছিল। তবে তখন তাতে নুকতা ও ই'রাব লাগানো হয়নি। এতে কুরআন পাঠ আরবদের জন্য বিশেষ কষ্টকর না হলেও অনারব মুসলমানদের জন্য ছিল দারুণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ইরাকে কুরআনের ভুল পাঠ চালু হওয়া লক্ষ্য করে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ সাথে সাথে তা প্রতিবিধানে তৎপর হন এবং একই আকৃতির বর্ণে নুকতা লাগান। এর পরেও ভুল হতে থাকলে পরবর্তীতে অন্যরা ই'রাব প্রয়োগ করেন।

তাফসীর

এ যুগেই তাফসীর লিপিবদ্ধ হয় এবং বড় বড় মুফাস্‌সিরের জন্ম হয়। তাফসীরের প্রথম লিখিত গ্রন্থটি হযরত সা'ঈদ ইবন জুবায়র (রহ)-এর এবং তিনি এ কাজটি করেন খলীফা 'আবদুল মালিকের অনুরোধে।

হাদীছ

হাদীছ লেখা ও গ্রন্থাবদ্ধ করার যে অনন্য গৌরব তাও বানূ উমাইয়্যাদের। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) জীবনীতে তার কিছু আলোচনা এসেছে।

---

৬৪৬. তারীখ আল-খুলাফা'-২১৮

৬৪৭. মুরূজ আয-যাহাব (নাফহুত তীব)-২/৬১১

আরবী ব্যাকরণ

আরবী ব্যাকরণ লেখার প্রাথমিক কাজও এ যুগে হয়। আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী যিয়াদ ইবন আবীহ্'র নিকট ইল্‌ম নাহু'র মূল নীতিগুলো লেখার অনুমতি চান। যিয়াদ প্রথমে অনুমতি না দিলেও কিছু দিন পরে দেন।

ইতিহাস

ইতিহাস লেখা ও বিন্যস্ত করার কাজটির শুরু এবং আরবদের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয় এ যুগে। একদিকে সীরাত ও মাগাযী (রাসূলুল্লাহর সা.) ও সাহাবীদের জীবনী ও যুদ্ধ-বিগ্রহ) শাস্ত্রের বড় বড় 'আলিম, যেমন ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্, মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম আয-যুহ্রী, মূসা ইবন 'উকবা, 'আওয়ানা প্রমুখ এই শাস্ত্রের বিষয়বস্তু সংগ্রহ, বিন্যাস ও লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, অন্যদিকে বানূ উমাইয়্যা খলীফাদেরও ইতিহাসের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল। আল্লামা মাস'উদী তাঁর 'মুরূজ আয-যাহাব' গ্রন্থে হযরত মু'আবিয়ার (রা) প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি সর্বদা 'ঈশার নামাযের পর প্রথমে মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা, পরামর্শ করতেন। তারপর প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনাবলী শুনতেন। রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর শুয়ে পড়তেন। আবার উঠতেন এবং একই কাজ আরম্ভ হয়ে যেত। একাধিক ব্যক্তি ইতিহাসের পুস্তক হাতে করে নিয়ে তাঁকে শোনাতো।[৬৪৮] যখন এতেও তুষ্ট হলেন না তখন ইয়ামনের সান'আর 'উবাইদ ইবন শারিয়্যা নামক এই শাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞকে ডেকে আনেন এবং তাঁর মুখে ইতিহাসের বহু কাহিনী ও ঘটনা শোনেন। তিনি তা একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করান যা 'উবাইদ ইবন শারিয়্যার প্রতি আরোপ করা হয়।[৬৪৯]

খলীফা হিশামের আগ্রহ ও আনুকূল্যে আরবী সাহিত্য ভাণ্ডারে আরো অনেক রচনার সমাবেশ ঘটে। তাঁর জন্যই জাবালা ফার্সী ভাষার কিছু ইতিহাস গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। হিশাম নিজে "তারীখু মুলূক আল-ফুরস" আরবীতে অনুবাদ করান।

এ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে পারস্য সাম্রাজ্যের আইন-কানুন ও শাহান শাহে ইরানের জীবন চিত্র।

গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষান্তর

গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরবীতে অনুবাদ করার সূচনাও হয় উমাইয়্যা যুগে। ইবন আছাল হযরত মু'আবিয়ার (রা) জন্য গ্রীক ভাষায় রচিত বেশ কয়েকটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই ছিল কোন অনারব ভাষার গ্রন্থের আরবী অনুবাদ।

মারওয়ান ইবন হাকামের সময়ে মাসির জুওয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের একখানা গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। অনুবাদটি হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ)

---

৬৪৮. প্রাগুক্ত-২/৪২৭
৬৪৯. ইবন নাদীম, কিতাবুল ফিহ্‌রিস্ত-১৩২

সরকারী গ্রন্থাগারে পান এবং সেটির একাধিক কপি করে খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান।

বানূ উমাইয়্যা খান্দানে খালিদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়া ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁকে 'হাকীমু আলে মারওয়ান' (মারওয়ান বংশের মহাজ্ঞানী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। প্রথমে তিনি ছিলেন খিলাফতের অন্যতম দাবীদার। কিন্তু তাতে যখন সফলকাম হলেন না তখন রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে গবেষণার দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি মিরইয়ানূস নামক একজন রোমান রাহিবের নিকট থেকে এ জ্ঞান অর্জন করেন। এর পাশাপাশি যে সকল গ্রীক দার্শনিক মিসরে বসবাস করতেন এবং আরবী ভাষায় দক্ষ ছিলেন তাঁদের একটি দলকে দিমাশ্কে ডেকে আনেন। তাঁদের দ্বারা তিনি গ্রীক ও কিবতী ভাষায় রচিত অনেকগুলো রসায়ন শাস্ত্রের গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করান। ইবন খাল্লিকানের বর্ণনা মতে খালিদ নিজেও চিকিৎসা ও রসায়ন বিষয়ে অনেকগুলো গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করেন।[৬৫০] হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকের সময় পারস্যের ইতিহাস ছাড়াও কিছু গ্রীক গ্রন্থেরও আরবী অনুবাদ হয়। আলেকজাণ্ডারের জন্য লেখা দার্শনিক এ্যারিস্টটলের পুস্তিকাগুলোও এ সময় সালিম আরবীতে অনুবাদ করেন।

স্পেনের উমাইয়্যা শাসকরাও এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তাঁদের সময়ে স্পেনবাসী গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দেয়। তাঁদের সময়ে সেখানে চিন্তা-দর্শনের বড় বড় মনীষীর জন্ম হয়।

স্পেনের এই নতুন জ্ঞান চর্চা শুরু হয় হিজরী তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি এবং চতুর্থ শতকের মাঝামাঝিতে তা উন্নতির চূড়ান্তে পৌঁছে।

এরপর আমীর আল-হাকাম আল-মুসতানসির বিল্লাহ ইবন 'আবদির রহমান আন-নাসির লি দীনিল্লাহ বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানচর্চার দিকে সীমাহীন মনোযোগ দেন। তিনি মিসর ও বাগদাদ থেকে এ বিষয়ের অসংখ্য গ্রন্থ স্পেনে নিয়ে যান। 'আল্লামা ইবন সা'য়িদ আল-আন্দালুসী লিখেছেন :[৬৫১]

واستجلب من بغداد اؤ مصر وغيرهما من ديار المشرق عيون التأليف الجليلة والمصنفات الغريبة في العلوم القديمة والحديثة وجمع منها في بقية أيام أبيه ثم في مدة ملكه من بعده ماكاديضاهي ماجمعته ملوك بني العباس في الأزمان الطويلة وتهيأله ذلك لفرط محبتة للعلم وبعد همتـه فـي اكتساب الفضائل وسمو نفسه إلى التشبه باهل الحكمة من الملوك فكثر تحرك الناس في زمانه إلى قراءة كتب الأوائل وتعلم مذاهبهم.

---

৬৫০. প্রাগুক্ত-৩৩৮, ৩৯৭; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফয়াত আল-আ'লাম-১/১৬৮
৬৫১. ইবন সা'য়িদ আল-আন্দালুসী, তাবাকাত আল-উমাম-৬৬

'তিনি বাগদাদ, মিসর ছাড়াও প্রাচ্যের বিভিন্ন শহর থেকে পুরাতন ও নতুন জ্ঞানের বহু অনুপম গ্রন্থ সংগ্রহ করে স্পেনে নিয়ে যান। তিনি তাঁর পিতার অবশিষ্ট জীবনে এবং নিজের শাসনকালে এভাবে সংগ্রহ কাজ চালান। আব্বাসীয়রা বাগদাদে দীর্ঘ সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যত গ্রন্থ সংগ্রহ করেছে তাঁর এই সংগ্রহ তাঁদের সমকক্ষতা লাভ করেছে। জ্ঞানের প্রতি তাঁর সীমাহীন প্রীতি ও ভালোবাসা এবং মহত্ব ও মর্যাদা লাভের অভিলাষ তাঁর এই কর্ম তৎপরতার পিছনে কাজ করে। তিনি সেই সব রাজা-বাদশাদের মত হতে চান যাঁরা রাজা-বাদশা হওয়ার পাশাপাশি হাকীম বা মহাজ্ঞানীও ছিলেন। এর ফলে তাঁর যুগের লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের গ্রন্থাবলী পাঠের প্রতি ভীষণ মনোযোগী হয় এবং তাঁদের মত-পথ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়।'

শাসন ও রাজনীতি

বানূ উমাইয়্যা খলীফাদের জুলুম-অত্যাচার ও দমন-পীড়ন সম্পর্কে যত ঘটনা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ আছে, তা পাঠ করে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, তাঁরা সাধারণ মানুষের সুখ-সুবিধার প্রতি কোন রকম দৃষ্টি দেননি। তাঁরা কেবল নিজেদের ভোগ-বিলাসী জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসে এমন ধারণার বিপক্ষেও প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত মু'আবিয়া (রা) সম্পর্কে মাস'ঊদী 'মুরূজ আয-যাহাব' গ্রন্থে লিখেছেন : 'তিনি দৈনিক রাত-দিনে পাঁচ বার দরবারে বসতেন। এর মধ্যে একটি সময় কেবল দুর্বল, অসহায়দের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনতেন। এর নিয়ম ছিল, তাঁর চাকর মসজিদে একটি চেয়ার পেতে দিত, তিনি তাতে বসে যেতেন এবং ফৌজদারী মামলার শুনানী করতেন। দুর্বল, অসহায়, বেদুঈন, শিশু, বৃদ্ধ সব ধরনের মানুষ তাঁর সামনে আসতো। তারা বলতো, আমাদের উপর জুলুম করা হয়েছে। তিনি বলতেন, তাদেরকে সাহায্য কর। তারা বলতো, আমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, তিনি বলতেন, বিষয়টি তদন্তের জন্য তাদের সাথে লোক পাঠাও। তারা বলতো, আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করা হয়েছে। তিনি বলতেন, তাদের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখ। এভাবে যখন শুনানী শেষ হতো, আর কেউ না থাকতো তখন তিনি খলীফার আসনে গিয়ে বসতেন। দরবারী লোকেরা যখন নিজ নিজ পদ মর্যাদা অনুযায়ী আরাম করে বসে যেতেন তখন তিনি বলতেন, যে সকল মানুষ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না তাদের অভাব-অভিযোগের কথা আমাদের সামনে উপস্থাপন কর। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলতো, অমুক শহীদ হয়েছে। তিনি বলতেন, তার সন্তানদের জন্য ভাতা চালু কর। দ্বিতীয় জন বলতো, অমুক স্ত্রী-সন্তানদের ফেলে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তিনি বলতেন, তাদের দেখাশোনা কর, তাদেরকে দাও, তাদের প্রয়োজন পূর্ণ কর এবং তাদের সেবা কর। এরপর খাবার আসতো। সেই অবস্থায় তাঁর পেশকার উপস্থিত হতো, বিভিন্ন কাগজপত্র পাঠ করতো এবং তিনি নির্দেশ ও পরামর্শ দিতে থাকতেন। এভাবে সকল অভিযোগকারীর অভিযোগের সমাধান হয়ে যেতে।'

এরপর মাস'ঊদী হযরত মু'আবিয়ার (রা) শাসন ও রাজনীতি বিষয়ক অনেকগুলো ঘটনা

বর্ণনা করে শেষে লিখেছেন : 'তাঁর চরিত্র, তাঁর দান-অনুগ্রহ ও তাঁর বদান্যতা মানুষকে এত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে যে তারা নিজেদের আত্মীয়-পরিজনদের থেকেও তাঁকে বেশী পছন্দ করতো।'[৬৫২]

হযরত মু'আবিয়ার (রা) পরে 'আবদুল মালিক ও অন্যরা তাঁর চরিত্র, অভ্যাস ও শাসন পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। মাস'উদীর বর্ণনা অনুযায়ী যদিও তাঁরা হযরত মু'আবিয়ার (রা) মানে পৌঁছতে পারেননি তবে এটা স্বীকৃত সত্য যে :[৬৫৩]

كان عبد الملك بن مروان شديد اليقظة كثير التعاهد لولاته.

'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান ছিলেন অত্যন্ত সজাগ মস্তিষ্কের এবং তাঁর কর্মকর্তাদের প্রতি কঠোর পর্যবেক্ষক।'

যেমন একবার তিনি জানতে পারলেন যে, কোন একজন কর্মকর্তা কারো নিকট থেকে উপহার গ্রহণ করেছে। সাথে সাথে তাকে ডেকে এনে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

আল-ওয়ালীদ ছিলেন খলীফা 'আবদুল মালিকের পুত্র। 'আবদুল মালিক সবসময় তাঁর সন্তানদেরকে মহত্ব, দয়া, পরোপকার ও উন্নত নৈতিকতা অবলম্বনের জন্য উৎসাহ দিতেন। একবার তিনি তাঁর পুত্রদের সম্বোধন করে বলেন : 'আমার ছেলেরা! তোমাদের খান্দানটি একটি অভিজাত খান্দান। অর্থ-বিত্তের বিনিময়ে এর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে।'[৬৫৪] এমন শিক্ষার কারণেই আল-ওয়ালীদ শামবাসীদের অন্তরে প্রিয়তম খলীফার আসন লাভ করেন। 'আদাব আস-সুলতানিয়্যা' গ্রন্থে এসেছে :[৬৫৫]

كان الوليد من أفضل خلفائهم سيرة عند أهل الشام.

'আল-ওয়ালীদ নৈতিকতার দিক দিয়ে শামের অধিবাসীদের নিকট অন্য সকল উমাইয়্যা খলীফাদের চেয়ে ভালো ছিলেন।' তাঁর এমন প্রিয়পাত্র হওয়ার কারণ এই বলা হয়েছে যে, তিনি দিমাশ্কের জামি' মসজিদ, মদীনার মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা পুনঃনির্মাণ করান। কুষ্ঠরোগীদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে ভিক্ষা করার অপমান থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। তিনি প্রত্যেক পঙ্গুর জন্য একজন সেবক এবং প্রত্যেক অন্ধের জন্য একজন পথপ্রদর্শক নিয়োগ করেন। খলীফা সুলায়মান ইবন 'আবদিল মালিকের গৌরব ও গর্বের জন্য শুধু এতটুক বলাই যথেষ্ট হবে যে, হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার ভিত্তি মূলতঃ তাঁর সময়েই স্থাপিত হয়েছিল। মানুষের জবর-দখলকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে সকল মানুষকে অন্যায়ভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সময়মত নামায কায়েম করা, গান-বাজনা নিষিদ্ধ করা এবং হাজ্জাজের সকল কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা

---

৬৫২. মুরূজ আয-যাহাব (নাফহুত তীব)-২/৪২২, ৪২৩, ৪৩১
৬৫৩. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/১৮৬
৬৫৪. মুরূজ আয-যাহাব-২/২০০, ৫৩৭
৬৫৫. আদাব আস-সুলতানিয়্যা-১২৪

হয়। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযকে (রহ) স্বীয় পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেন এবং তাঁর সকল সৎ পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

অভিযোগ খণ্ডন

বানূ উমাইয়্যাদের রাষ্ট্র পরিচালন পদ্ধতি ও শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যত অভিযোগ আছে তার সংক্ষিপ্ত জবাবের জন্য আমরা খলীফা 'আবদুল মালিকের নিম্নের কথাগুলো তুলে ধরাই যথেষ্ট মনে করছি:

'কোথায় সেই সব মানুষ যাদেরকে 'উমার শাসন করতেন, আর কোথায় এই যুগের মানুষ? আমার ধারণা, রাজার আচার-আচরণ প্রজাদের পরিবর্তনের সাথে সাথে পাল্টাতে থাকে। যদি কেউ এ যুগে হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) রূপ ধারণ করে তাহলে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে তার বাড়ীতে চড়াও হবে, লুটপাট চালাবে এবং পরস্পর মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত হবে। এ কারণে শাসকের সেই রূপ ও রীতি ধারণ করা কর্তব্য যা তার যুগের জন্য উপযুক্ত।[৬৫৬] আর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

---

৬৫৬. ইবন সা'দ, তাবাকাত-৫/২৭৩

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-ইয়া'কূবী, তারীখ (বৈরূত : দারু সাদির)
২. আহমাদ মা'মূর আল-'উসায়রী, আ'জামু 'উজামা' আল-মুসলিমীন মিন কুল্লি কারানিন (আদ-দাম্মাম : মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতানিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯)
৩. আবুল হাসান 'আলী আল-হুসায়নী আন-নাদবী, রিজালুল ফিক্র ওয়াদ দা'ওয়াহ্ ফী আল-ইসলাম (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯)
৪. ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখ আল-ইসলাম (বৈরূত : দারুল উন্দুলুস, ৭ম সংস্করণ, ১৯৬৪)
৫. আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল হাকাম, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (মিসর : আল-মাতবা'আতুর রহমানিয়্যা, ১৯২৭)
৬. ইবনুল জাওযী, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (মিসর : ১৩৩১)
৭. আহমাদ যাকী সাফওয়াত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৪৮)
৮. 'আবদুল 'আযীয সায়্যিদুল আহ্ল, আল-খালীফাতু আয-যাহিদ (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৫৩)
৯. আস-সুয়ূতী, তারীখ আল-খুলাফা' (মিসর, ১৩৫১)
১০. আল-ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ (মিসর : আল-মাতবা'আতু আস-সালাফিয়্যা, ১৩৪৬)
১১. আল-ফাখরী, আল-আদাব আস-সুলতানিয়্যা ওয়াদ দুওয়াল আল-ইসলামিয়্যা (কায়রো : ১৯২৭)
১২. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাব আল-আগানী (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ১৯৮৬)
১৩. আল-জাহিজ, আল-বায়ান ওয়া আত-তাবয়ীন (বৈরূত : দারুল ফিক্র সংস্করণ-৪)
১৪. ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়া (বৈরূত : দারুল মা'রিফা)
১৫. 'আবদুর রহমান আশ-শারকাবী, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-'আরাবী)
১৬. আন-নাওবী, তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা)
১৭. ইবন 'আবদিল বার, জামি'উ বায়ান আল-'ইলম ওয়া ফাদলিহি (বৈরূত : দারুল ফিক্র)
১৮. আল-হাকিম, আল-মুসতাদরিক (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-'আরাবী)
১৯. আবূ নু'আয়ম আল-ইসফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাত আল-আসফিয়া' (বৈরূত : দারুল কিতাব আল-'আরাবী)
২০. ইবন হাজার, তাকরীব আত-তাহ্যীব (বৈরূত : দারুল মা'রিফা)
২১. আয-যাহ্বী, তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম (কায়রো : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭)
২২. খায়রুদ্দীন আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, সংস্করণ-৪, ১৯৭৯)
২৩. খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ, খুলাফা' আর-রাসূল (বৈরূত : দারুল জায়ল, ২০০০)
২৪. 'আবদুস সাত্তার আশ-শায়খ, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয খামিসু আল-খুলাফা' আর রাসূল (দিমাশ্ক : দারুল কালাম)

Contents

২৫. মুহাম্মাদ আল-খাদারী বেক, তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা (মি...
মাকতাবা আত-তিজারিয়্যা আল-কুবরা, ১৯৬৯)

২৬. ড. আবদুর রহমান আল-বাশা, সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন (কায়রো : দারুল আদাব আল-ইসলামী)

২৭. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা (বৈরূত : দারু সাদির)

২৮. আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ (বৈরূত : দারু ইয়াহ্ইয়া আত-তুরাছ আল-ইসলামী)

২৯. আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা' (বৈরূত : আল-মুআস-সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-৭, ১৯৯০)

৩০. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান (মিসর : মাকতাবাতু আন-নাহ্দা আল-মিসরিয়্যা, ১৯৪৮)

৩১. আহমাদ যাকী সাফওয়াত, জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব (বৈরূত : আল-মাকতাবা আল-'ইলমিয়্যা)

৩২. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৮৫)

৩৩. 'আবদুল মুন'ইম আল-হাশিমী, 'আসরুত তাবি'ঈন (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, সংস্করণ-৩, ২০০০)

৩৪. মু'ঈন উদ্দীন আহমাদ নাদবী, তাবি'ঈন (ভারত : মাতবা'আ মা'আরিফ, ১৯৫৬)

৩৫. রশীদ আখতার নাদবী, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (লাহোর : আহসান ব্রাদার্স, ১৯৫৮)

৩৬. ইবন 'আবদি রাব্বিহি আল-আন্দালুসী, আল-'ইকদ আল-ফারীদ (কায়রো : মাতবা'আতু লুজনা আত-তা'লীফ ওয়াত তারজামা, সংস্করণ-৩, ১৯৬৯)

৩৭. 'আবদুস সালাম নাদবী, সীরাতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (ভারত : মাতবা'আ মা'আরিফ, ১৯৪৬)

৩৮. 'আলী ফা'উর, সীরাতু 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (বৈরূত : দারুল হাদী, সংস্করণ-১, ১৯৯১)

৩৯. আবূ 'আলী আল-কালী, কিতাবুল আমালী (বৈরূত : দারুল আফাক আল-জাদীদা, ১৯৮০)

৪০. আল-মাস'উদী, মুরূজ আয-যাহাব (বৈরূত : দারুল মা'রিফা)

৪১. ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ (বৈরূত : দারু সাদির, ১৯৮৬)

৪২. ইবন তুগরা বারদী, আন-নুজূম আয-যাহিরা (দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যা, ১৩৪৮)

৪৩. আল-মাকরীযী, নাফহুত তীব (মিসর : ১৩০২)

৪৪. মুহাম্মাদ আল-মুবারাক, নিজাম আল-ইসলাম, আল-হুক্ম ওয়াদ দাওলা (দারুল ফিক্র)

৪৫. ড. ওয়াহ্বা আয-যুহাইলী, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (দিমাশ্ক : দারু কুতায়বা)

৪৬. আল-বালাযুরী, ফুতূহ আল-বুলদান (মিসর : মাতবা'আ আল-মাওসূ'আত, ১৯০১)

৪৭. আল-কিন্দী, উলাতু মিসর (বৈরূত)

৪৮. ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরূত : মকতাবাহ্ আল-মা'আরিফ; বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ১৯৮৩)

৪৯. ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জাম আল-বুলদান (বৈরূত : দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী)

৫০. মুহাম্মাদ ফুআদ 'আবদুল বাকী, আল-মু'জাম আল-মুফাহ্রাস লি-আলফাজ আল-কুরআন আল-কারীম (ইস্তাম্বুল : আল-মাকতাবা আল-ইসলামিয়্যা, ১৯৮৪)

৫১. আহমাদ যাকী সাফওয়াত, জামহারাতু রাসায়িল আল-'আরাব (বৈরূত : আল-মাকতাবা আল-'ইলমিয়্যা)

৫২. মুহিব্বুদ্দীন আত-তাবারী, আর-রিয়াদ আন-নাদিরা ফী মানাকিব আল-'আশারা (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, সংস্করণ-১, ১৯৮৪)

৫৩. সুয়ূতী, হুসনুল মুহাদারা (বৈরূত)

৫৪. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, খিলাফত ও মুলূকিয়াত (লাহোর)

৫৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয রহ. (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৭৬)

৫৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, তাবি'ঈদের জীবনকথা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২)

৫৭. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৯)

৫৮. আল-কুরআনুল কারীম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৬৮)

৫৯. আবুল আ'লা মওদূদী, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন (ঢাকা)

৬০. মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, তারীখে ইসলাম (বাংলা অনু.) (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫)

Contents
তাবি'ঈদের
জীবনকথা
[তৃতীয় খণ্ড]
ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

Contents
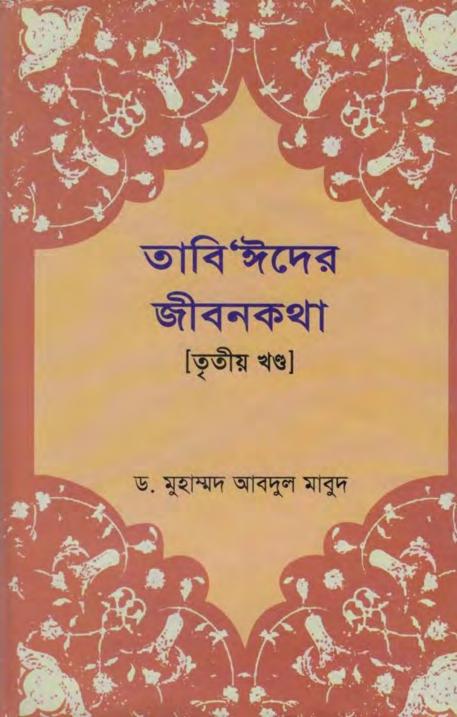
তাবি'ঈদের জীবনকথা
[৩য় খণ্ড]

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

প্রফেসর ও চেয়ারম্যান

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

Contents

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
প্রধান কার্যালয় :
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ফ্যাক্স : ৯৬৬০৬৪৭
সেল্স এণ্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

ISBN : 984-842-015-0 Set

প্রথম প্রকাশ
জুলাই : ২০০৮
রজব : ১৪২৯
শ্রাবণ : ১৪১৫

মুদ্রণ
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা।

বিনিময় : দুইশত টাকা

Tabieeder JibonKatha (Vol. III)

Written by Dr Muhammad Abdul Mabud and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Head Office 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition July 2008 Price Taka 200.00 only.

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল-হামদু লিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ রহমতে "তাবি'ঈদের জীবনকথা" বইটির ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এর ২য় খণ্ড প্রকাশিত হবার পর আমি বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়ি, তাই এ কাজ যথারীতি চালিয়ে যেতে পারিনি। তবুও মাঝে মধ্যে সময় বের করে এ কাজও অব্যাহত রাখি। এর মধ্যে "সুন্নাতু রাসূলিল্লাহ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শীর্ষক বইটির রচনার কাজও শেষ করি এবং তা বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এসব কারণে "তাবি'ঈদের জীবনকথা" ৩য় খণ্ড শেষ করতে বিলম্ব হয়। অবশেষে তা প্রকাশিত হচ্ছে, এজন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

৩য় খণ্ডে মোট একচল্লিশ (৪১) জন মহান তাবি'ঈর জীবনকথা এসেছে। তাঁরা সকলে উঁচু স্তরের সাহাবায়ে কিরামের (রা) বিশিষ্ট ছাত্র। তাঁরা তাঁদের মহান শিক্ষকদের নিকট থেকে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবন, কর্ম ও আদর্শ বিষয়ক অর্জিত জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্ম "তাবি' তাবি'ঈন"-এর নিকট পৌঁছে দিয়ে গেছেন। তাই কুরআন ও সুন্নাহ বিষয়ে কোন কিছু পড়াশোনা ও আলোচনা করতে গেলে এ গ্রন্থে আলোচিত ব্যক্তিদের নাম বার বার ঘুরে-ফিরে আসে। আমরা যখন আসহাবে রাসূল (সা) ও তাবি'ঈদের জীবনকথা রচনার পরিকল্পনা করি তখন সিদ্ধান্ত ছিল অতি সংক্ষেপে তাঁদের পরিচয় মানুষের নিকট তুলে ধরবো। আমাদের সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩য় খণ্ডের কাজটিও সম্পন্ন করেছি।

আমার এ লেখালেখির পিছনে যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেন তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ। তাঁর তাকীদ না থাকলে আমি হয়তো এতদূর এগুতে পারতাম না। আল্লাহ তাঁকে এর প্রতিদান দিন।

এ বইটির পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন এর ভুল-ত্রুটি আমার দৃষ্টিগোচর করেন। পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট আমার একান্ত কামনা, তিনি যেন আমাদের সকলকে তার মর্জি মত কাজ করার তাওফীক দান করেন।

জুন ৩০, ২০০৮

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা (রহ)

মুহাম্মাদ (রহ)-এর ডাকনাম আবুল কাসিম। পিতা হযরত 'আলী ইবন আবী তালিব (রা)। হযরত হাসান ও হুসাইন (রা)-এর বৈমাত্রেয় ভাই। হযরত 'আলী (রা) নবী-দুহিতা হযরত ফাতিমার (রা) ইনতিকালের পর কয়েকটি বিয়ে করেন। সেই বেগমদের একজন ছিলেন খাওলা।[১] রাসূলে কারীমের (সা) জীবনের শেষ দিকে একদিন 'আলী (রা) তাঁর সাথে বসে আছেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ওফাতের পর যদি আমার কোন পুত্র সন্তান হয় তাহলে আমি কি আপনার নামে তার নাম এবং আপনার উপনামে তার উপনাম রাখতে পারবো? রাসূল (সা) বললেন : হাঁ, পারবে।[২]

সময় গড়িয়ে চললো। একদিন রাসূল (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন এবং তার মাত্র ছয় মাস পর হাসান-হুসাইনের (রা) মা নবী-দুহিতা ফাতিমা (রা) পিতাকে অনুসরণ করে দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। অতঃপর 'আলী (রা) তাঁর জীবনের এক পর্যায়ে আরবের বানূ হানীফা গোত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি এ গোত্রের জা'ফার ইবন কায়স আল-হানাফিয়্যার কন্যা খাওলাকে বিয়ে করেন। এই খাওলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে এক পুত্র সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) পূর্ব অনুমতির ভিত্তিতে পিতা 'আলী (রা) সন্তানের নাম মুহাম্মাদ ও ডাকনাম আবুল কাসিম রাখেন। তবে মানুষ ফাতিমাতুয যাহ্‌রার দুই ছেলে হাসান ও হুসাইন (রা) থেকে তাঁকে পার্থক্য করার জন্য ডাকতে থাকে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা অর্থাৎ হানীফা বংশীয় মহিলার গর্ভজাত সন্তান মুহাম্মাদ। অতঃপর ইতিহাসে তিনি এ নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৩]

নাম ও কুনিয়াত নিয়ে ঝগড়া

একবার 'আলী ও তালহার (রা) মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে তালহা 'আলীকে লক্ষ্য করে বলেন : না, আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) উপর দুঃসাহস দেখিয়েছেন। নিজের ছেলের নাম ও উপনাম রাসূলুল্লাহর (সা) নামে রেখেছেন। অথচ রাসূল (সা) তাঁর পরে উম্মাতের কেউ যেন এমনটি (এক সাথে নাম ও উপনাম) না করে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে বলে গেছেন। জবাবে 'আলী বলেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করাই হলো দুঃসাহস অথচ আমি তো তেমন কিছু করিনি। তারপর তিনি কুরাইশ গোত্রের কয়েক ব্যক্তিকে ডেকে বলেন : তোমরা কোন কথার সাক্ষ্য দিবে? তাঁরা

---

১. আল-আ'লাম-৬/২৭০

২. আত-তাবাকাত-৫/৯২

৩. আল-আ'লাম-৬/২৭০; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-২৬৬

বললেন : আমরা সাক্ষ্য দিব যে, তিনি (রাসূল সা.) বলেছেন : আমার পরে অতি শীঘ্র তোমার একটি ছেলের জন্ম হবে এবং তুমি আমার নামে ও উপনামে তার নাম ও উপনাম রাখবে। আমার পরে আমার উম্মাতের আর কারো জন্য এমনটি করা হালাল (সঙ্গত) হবে না।[৪]

তবে হযরত খাওলার (রহ) বংশের ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মতভেদ আছে। অনেকে তাঁকে ইয়ামাম'র যুদ্ধ বন্দীদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] আবার অনেকে বলেছেন, তিনি সিন্ধু বংশোদ্ভূত। কেউ কেউ তাঁকে বানূ হানীফার দাসী বলেছেন।[৬] সঠিক এটাই যে, তিনি বানূ হানীফার এক সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবন হানাফিয়্যার জন্মের সময় সম্পর্কেও কিছুটা মতপার্থক্য আছে। একটি মতে দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ফারুকের (রা) খিলাফতের শেষের দিকে মাত্র দুই বছর বাকী থাকতে তাঁর জন্ম হয়। এই হিসেবে হিজরী ২১ সনের শেষ অথবা ২২ সনের প্রথম দিক হবে।[৭] অন্য একটি মতে খলীফা হযরত আবূ বাকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালের একেবারে শেষ দিকে তাঁর জন্ম হয়।[৮]

মুহাম্মাদ তাঁর মহান পিতার তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। শিক্ষা-দীক্ষা, ইবাদাত-বন্দেগীর নিয়ম-কানুন ও পার্থিব ভোগ-বিলাস বিমুখ জীবন-যাপনের নিয়ম-পদ্ধতি তাঁর কাছ থেকেই লাভ করেন। সেই সাথে পৈত্রিক সূত্রে লাভ করেন শক্তি, সাহস, বীরত্ব এবং অতুলনীয় বাগ্মিতা ও ভাষা দক্ষতা। পিতার প্রত্যক্ষ নজরদারিতে শৈশবেই তিনি একদিকে হয়ে ওঠেন একজন দক্ষ অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং অন্যদিকে রাতের অন্ধকারে যখন পৃথিবীর মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন হয়ে যান দুনিয়া বিরাগী একজন সাধক ও তাপস।

তাঁর শৈশবকালীন জীবনের কথা তেমন কিছু জানা যায় না। উটের যুদ্ধ থেকে তাঁকে দৃশ্যপটে দেখা যায়। এ সময় তাঁর বয়স খুব টেনে-টুনেও পনের/ষোল বছরের বেশি হবে না। পিতার সাথে তিনি যুদ্ধে যান এবং পিতা তাঁর হাতে সামরিক পতাকা তুলে দেন। আদ-দায়নাওয়ারী বলেন :[৯] "'আলী (রা) আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁর ডান ভাগের দায়িত্বে ছিলেন আল-আশতার এবং বাম ভাগের দায়িত্বে ছিলেন 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)। আর 'আলীর (রা) বাহিনীর সবচেয়ে বড় ঝাণ্ডাটি ছিল মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার হাতে।" এরপর থেকে তিনি পিতার সাথে সকল অভিযানে অংশ নেন। যুদ্ধের ময়দানে পিতা তাঁর কাঁধে এত কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করেন যা তাঁর অন্য দুই

---

৪. আত-তাবাকাত-৫/৯২
৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩৯৫
৬. আত-তাবাকাত-৫/৯১; তাবি'ঈন-৪০৫
৭. ওয়াফাইয়াতুল আ'য়ান-১/৪৫০
৮. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-২৬৭
৯. আল-আখবার আত-তিওয়াল-১৪৮

সৎ ভাই হাসান-হুসাইনের (রা) উপর করেননি। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তা, শক্তি ও সাহসের সাথে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো : আপনার পিতা আপনাকে যেরূপ কঠিন বিপদ-আপদের মুখে ঠেলে দেন তেমন তো আপনার অন্য দুই ভাই হাসান-হুসাইনকে দেন না– এর কারণ কি? বললেন : আমার অন্য দুই ভাই হলেন আমার পিতার দুই চোখের মত, আর আমি হলাম তাঁর দুই হাতের মত। তিনি তাঁর দুই হাত দ্বারা দুই চোখের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।[১০]

উটের যুদ্ধ

এ যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার পর 'আলী (রা) মুহাম্মাদকে সামনে এগোনোর নির্দেশ দেন। তিনি পতাকা হাতে নিয়ে নির্ভীকচিত্তে নির্দেশ পালন করে সামনে এগিয়ে যান। বসরাবাসীরা তাঁর প্রতি বর্শা ও তরবারি তাক করে ধরে। তখন তিনি একজন তরুণ। সামনে এগোবার সাহস হারিয়ে ফেলেন। 'আলী (রা) তাঁর হাত থেকে পতাকা নিয়ে নিজেই শত্রু বাহিনীকে আক্রমণ করেন। সহযোগী যোদ্ধারাও তাঁকে সহযোগিতা করেন। এরপর উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এরপর 'আলী (রা) আবার মুহাম্মাদের হাতে পতাকা তুলে দেন।[১১]

উটের যুদ্ধের এ ঘটনা মুহাম্মাদ আল-হানাফিয়্যা নিজেই বর্ণনা করেছেন এভাবে : যখন আমাদের সৈনিকরা কাতারবন্দী হলো তখন আমার আব্বা পতাকা আমার হাতে তুলে দিলেন। তারপর দু'বাহিনী মুখোমুখী হয়ে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হলো। আব্বা যখন আমার মধ্যে কিছুটা ভীতির ভাব লক্ষ্য করলেন তখন তিনি আমার হাত থেকে পতাকা নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। আমিও এগিয়ে গিয়ে এক বসরী সৈনিকের উপর আক্রমণ চালাই। সে আহত অবস্থায় চিৎকার করে বলতে থাকে আমি আবূ তালিবের ধর্মমতের উপর আছি। আমি তার কথা শুনে পরবর্তী আঘাত থেকে বিরত থাকি। তারা পরাজিত হওয়ার পর আব্বা ঘোষণা দিলেন, কেউ আহতদের হত্যা করবে না এবং রণক্ষেত্র থেকে পলায়নপর কারো পিছু ধাওয়া করবে না। যুদ্ধ শেষে প্রতিপক্ষ যে সকল ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করেছিল তা আমার আব্বা গনীমাতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হিসেবে সৈনিকদের মধ্যে যথারীতি বণ্টন করে দেন।[১২]

সিফ্ফীন যুদ্ধ

এ যুদ্ধ হয় 'আলী (রা) ও মু'আবিয়ার (রা) মধ্যে। উটের যুদ্ধের পর পরই সিফ্ফীন যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা এ যুদ্ধে তাঁর পিতার সাথে ছিলেন। সিফ্ফীন যুদ্ধের সূচনা পর্ব তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন : আমার আব্বা মু'আবিয়া (রা) ও শামবাসীদের সাথে যুদ্ধের কথা ভাবতেন

---

১০. ওয়াফাইয়াত আল-আ'য়ান-১/৪৪৯; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-২৬৮

১১. আল-আখবার আত-তিওয়াল-১৪৮-১৪৯; তাবি'ঈন-৪০৬

১২. আত-তাবাকাত-৫/৯৩

এবং ঝাণ্ডা তৈরি করে এই বলে কসম খেতেন যে, যুদ্ধের ময়দান ছাড়া এ ঝাণ্ডা খুলবো না। কিন্তু তাঁর সহচরগণ তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করে যুদ্ধের ব্যাপারে টালবাহানা করতেন। তাদের বিরোধিতা দেখে তিনি শেষ পর্যন্ত ঝাণ্ডা খুলে ফেলে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতেন। এভাবে তিনি চারবার ঝাণ্ডা বেঁধে আবার তা খুলে কাফ্ফারা আদায় করেন। ব্যাপারটি আমার মনোপুতঃ হলো না। আমি মিসওয়ার ইবন মাখরামাকে বললাম, আপনি আমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন, এ অবস্থায় তিনি কোথায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? আল্লাহর কসম! আমি এই লোকদের দ্বারা উপকার লাভের কোন আশা দেখছি না। মিসওয়ার বললেন, তিনি যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা করেই ছাড়বেন। আমি তাঁর সাথে কথা বলেছি। তিনি যাত্রার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।[১৩]

যুদ্ধ যখন কোনভাবে এড়ানো গেল না এবং 'আলী (রা) সিফ্ফীনের পথে যাত্রা করলেন তখন মুহাম্মাদও তাঁর সঙ্গী হলেন। 'আলী উটের যুদ্ধের মত সিফ্ফীন যুদ্ধের ঝাণ্ডাও তাঁর হাতে তুলে দেন।[১৪] এ যুদ্ধের ধারাবাহিকতা অনেক দিন যাবত বিদ্যমান ছিল। প্রথম দিকে বেশ কিছু দিন ধরে সম্মিলিতভাবে চূড়ান্ত যুদ্ধের পরিবর্তে উভয় পক্ষের একজন অথবা দু'জন করে ময়দানে এসে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হতো। একদিন মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা একজনকে সংগে নিয়ে ময়দানে উপস্থিত হন। শামী সৈনিকদের মধ্য থেকে 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'উমার মুকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসে এবং হুংকার ছেড়ে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার আহ্বান জানায়। দু'জনই ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ে। 'আলী (রা) এ দৃশ্য দেখে সামনে এগিয়ে গিয়ে মুহাম্মাদের পাশে দাঁড়ান। তিনি নিজের ঘোড়ার লাগামটি তার হাতে দিয়ে বলেন : এটি ধর। তারপর তিনি নিজে 'উবাইদুল্লাহর মুকাবিলার জন্য সামনে এগিয়ে যান। 'আলীকে (রা) দেখে 'উবাইদুল্লাহ একথা বলতে বলতে দূরে সরে যায় :[১৫]

مالى في مبارزتك من حاجة، إنما أردت ابنك.

"আমি আপনার সঙ্গে নয়, বরং আপনার ছেলের সঙ্গে লড়তে চাই!" 'উবাইদুল্লাহর চলে যাওয়ার পর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা পিতাকে বলেন, যদি আপনি আমাকে তার সাথে লড়ার সুযোগ দিতেন তাহলে আমার বিশ্বাস আমি তাকে হত্যা করতে পারতাম। 'আলী (রা) বলেন, আমারও তো সেই রকম বিশ্বাসই ছিল। তবে বিপদ থেকে মুক্ত ছিলে না। আমার ভয় হচ্ছিল, তোমার জীবন বিপণ্ন হয়ে না পড়ে। এরপর উভয় পক্ষের অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ দুপুর পর্যন্ত লড়তে থাকে; কিন্তু কোন পক্ষ অপর পক্ষকে পরাভূত করতে পারলো না।

এক পর্যায়ে 'আলী (রা) একটি শামী দলের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাঁকে নির্দেশ

---

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. আল-আখবার আত-তিওয়াল-১৭৫-১৭৬

দেন। তাঁকে একথাও বলেন যে, তাদের বক্ষে বর্শাঘাত করার পর হাত চালানো থেকে বিরত থাকবে। অর্থাৎ তরবারি দ্বারা তাদেরকে হত্যা করবে না। আমার পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করবে। তিনি পিতার এ আদেশ মেনে চলেন। 'আলী (রা) আরেকটি দলকে তাঁর সাহায্যের জন্য পাঠান। তারা মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নেতৃত্বে শামী সৈন্যদেরকে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেন।[১৬]

সিফ্‌ফীন যুদ্ধের অনেক সঙ্কটময় পর্যায়ে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা তাঁর অন্য দুই সৎ ভাই হাসান ও হুসাইনের (রা) সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁদের মহান পিতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। 'আলীর (রা) প্রতি যখন চারিদিক থেকে বৃষ্টির মত তীর-বর্শা নিক্ষেপ করা হচ্ছিল তখন মুহাম্মাদ তাঁর দুই ভাইয়ের সাথে নিজেদের দেহকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাঁকে অক্ষত রাখেন। যায়দ ইবন ওয়াহাব বলেন :[১৭]

فإني لأنظر إلى علي، وهو يمر نحو ربيعة ومعه بنوه : الحسن والحسين ومحمد، وإن النبل ليمر بين أذنيه وعاتقه وبنوه يقونه بأنفسهم.

"আমি 'আলীর প্রতি তাকিয়ে দেখছি, তিনি রাবী'আর দিকে যাচ্ছেন, আর তাঁর সাথে চলছেন তিন ছেলে হাসান, হুসাইন ও মুহাম্মাদ, তীর-বর্শা তাঁর দু'কান ও কাঁধের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, আর তাঁর ছেলেরা নিজেদের দেহ দিয়ে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন তিনি সিফ্‌ফীন যুদ্ধে যোগদান করেন তখন সদ্য কৈশর অতিক্রম করে যৌবনে পা রেখেছেন। তাই এ যুদ্ধের ভয়াবহতা তাঁর অন্তরে ভীষণ প্রভাব ফেলে। তিনি পরবর্তীতে সারা জীবন যুদ্ধ ও রক্তপাত এড়িয়ে চলেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের একটি বর্ণনা নিম্নরূপ :

আমরা সিফ্‌ফীনে গেলাম এবং মু'আবিয়ার বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলাম। যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে আমার ধারণা হলো, আমাদের এবং তাদের কেউ আর বেঁচে থাকবে না। বিষয়টি আমি খুব বড় মনে করলাম এবং আমার কাছে খুব দুঃখজনক মনে হলো। এসব যখন আমি ভাবছি, তখন শুনতে পেলাম কেউ যেন আমার পিছন থেকে চিৎকার করে বলছে :

"ওহে মুসলিম জনমণ্ডলী! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। ওহে জনমণ্ডলী! নারী ও শিশুদের রক্ষা করবে কে? কে রক্ষা করবে দীন-ধর্ম ও ইজ্জত-আবরু? কে লড়বে রোমান ও দায়লাম বাহিনীর বিরুদ্ধে? ওহে মুসলিম জনমণ্ডলী! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর!"

এরপর আমি প্রতিজ্ঞা করি, আজকের দিনের পর আর কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে তরবারি উঠাবো না।

---

১৬. আল-কামিল ফী আত-তারীখ-৩/২৬২

১৭. আল-আখবার আত-তিওয়াল-১৮২

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা সম্পর্কে হযরত 'আলীর (রা) অন্তিম উপদেশ

সিফ্‌ফীন যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পর হযরত 'আলী (রা) গুপ্ত ঘাতকের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি হাসান, হুসাইন ও মুহাম্মাদকে উপদেশ দান করেন।

আল-মাস'উদী হযরত 'আলীর (রা) সেই অন্তিম উপদেশ বর্ণনা করেছেন এভাবে :[১৮]

ثم دعا الحسن والحسين، فقال لهما : أوصيكما بتقوى الله وحده ولاتبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيئ منها، قولا الحــق وارحمـا اليتيـم، وأعينـا الضعيـف، وكونا للظالم خصماء وللمظلوم عَوْنًا، ولا تأخذكما فى الله لومة لائم.

"অতঃপর তিনি হাসান ও হুসাইনকে (রা) ডেকে বলেন : আমি তোমাদের দু'জনকে এক আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। দুনিয়া তোমাদের প্রত্যাশী হলেও তোমরা তার প্রত্যাশী হবে না, দুনিয়ার কোন কিছু না পেলে তার জন্য আফসোস করবে না, সর্বদা সত্য বলবে, ইয়াতীমের প্রতি দয়া করবে, দুর্বলকে সাহায্য করবে, যালিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, মাযলূমের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না।"

তারপর তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার দিকে তাকিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন :

هل سمعت ما أوصيت به أخويك.

"আমি তোমার দুই ভাইকে যে উপদেশ দিয়েছি তা কি শুনেছো?" তিনি হাঁ সূচক জবাব দিলে 'আলী (রা) বলেন :

أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقر أخويك وتزيين أمرهما، ولاتَقْطَعْنَ أمرًا دونهما.

"আমি তোমাকেও অনুরূপ উপদেশ দিচ্ছি। আরো উপদেশ দিচ্ছি, তোমার দুই ভাইকে সম্মান করবে, তাদের কাজে সমর্থন দেবে এবং তাদের সাথে পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করবে না।"

তিনি আবার হাসান-হুসাইনের (রা) দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন :

أوصيكما به، فإنه سيفكما وابن أبيكما، فأكرماه وأعرفا حقه.

"তোমাদের দু'জনকে আমি তার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি। সে তোমাদের দু'জনের অসি এবং তোমাদের পিতার সন্তান। তাঁকে ভালোবাসবে এবং তার অধিকারের প্রতি সচেতন থাকবে।"

হযরত হাসান ও হুসাইন (রা) দু'জনই তাঁদের ছোট ভাইয়ের প্রতি পিতার উপদেশের কথা স্মরণ রাখেন এবং কোন অবস্থাতেই তার প্রতি তাঁদের দায়িত্বের কথা বিস্মৃত

---

১৮. মুরূজ আয-যাহাব-১/৩৪১

হননি। হযরত হাসান (রা) মদীনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা তখন মদীনার বাইরে তাঁর খামারে অবস্থান করছিলেন। তাঁকে ডেকে পাঠানো হলো। তিনি এসে হযরত হাসানের (রা) ডান পাশে বসেন এবং হযরত হুসাইন (রা) বসেন বাম পাশে। হযরত হাসান (রা) চোখ মেলে তাঁদের দিকে তাকান। তারপর সহোদর ভাই হুসাইনকে (রা) লক্ষ্য করে বলেন : [১৯]

يا أخي أوصيك بمحمد أخيك خيرًا، فإنه جلده ما بين العينين.

"আমি তোমাকে তোমার ছোট ভাই মুহাম্মাদের সাথে সদাচরণের উপদেশ দিচ্ছি। সে আমাদের দু চোখের মধ্যবর্তী স্থানের ত্বকের মত অতি প্রিয়। অনুরূপভাবে তিনি মুহাম্মাদকে বলেন, "আমি তোমাকেও বলছি, প্রয়োজনের সময় হুসাইনের (রা) পাশে থেকে তাঁকে সাহায্য করবে।"

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে গভীর মিল-মুহাব্বাত ছিল। একবার কী যেন একটা কারণে মুহাম্মাদ ও হাসানের (রা) মধ্যে একটু ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং বড় ভাই হাসান একটু বিরক্ত হন। ছোট ভাই একটু ভেবে-চিন্তে ছোট্ট একটা চিঠিতে বড় ভাইকে লিখলেন : আল্লাহ আপনাকে আমার চাইতে বেশি মর্যাদাবান করেছেন। আপনার মা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহর (সা) কন্যা ফাতিমা (রা)। আর আমার মা বানূ হানীফার একজন মহিলা। আপনার নানা রাসূলুল্লাহ (সা)। আর আমার নানা জা'ফার ইবন কায়স।

অতএব, আমার এ পত্র আপনার হাতে পৌছানোর সাথে সাথে আমার নিকট এসে আমার সাথে একটা মীমাংসা করুন, যাতে সর্বক্ষেত্রে আমার উপর আপনার মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে।

পত্রটি হযরত হাসানের (রা) হাতে পৌছা মাত্র তিনি ছোট্ট ভাই মুহাম্মাদের বাড়ীতে ছুটে যান এবং তার সাথে আপোষ করে নেন।[২০]

আমীর মু'আবিয়ার (রা) হাতে বাই'আত

হযরত 'আলীর (রা) শাহাদাতের পর গোটা খিলাফতের কর্তৃত্ব হযরত মু'আবিয়ার (রা) হাতে চলে আসে। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর মান-মর্যাদা ও ঐক্য-সংহতির কথা চিন্তা করে হযরত 'মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকে মেনে নিয়ে তাঁর হাতে বাই'আত করেন। তিনি যে সততা ও আন্তরিকতার সাথে বাই'আত করেছেন হযরত মু'আবিয়া (রা) তা বুঝতে পারেন। তাঁর পক্ষ থেকে যে কোন রকম বিরোধিতা হবে না সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। আর তাই তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে মুহাম্মাদকে তাঁর সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানান। সে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি বিভিন্ন কারণে একাধিকবার দিমাশকে গিয়ে মু'আবিয়ার (রা) সাথে সাক্ষাৎ করেন।[২১]

---

১৯. আল-আখবার আত-তিওয়াল-২২১

২০. সুওয়ারুন মিন হায়াত-আত-তাবি'ঈন-২৬৫

২১. প্রাগুক্ত

ইয়াযীদকে খলীফা মেনে নেওয়ার ব্যাপারে হযরত হুসাইন (রা)-কে পরামর্শ

হযরত হাসান (রা)-এর পরে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা হযরত হুসাইনকে (রা) নিজের বড় ভাই বলে মানতেন। একজন বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান ভাই হিসেবে তাঁর সকল বিপদ-আপদ ও সমস্যার ক্ষেত্রে সব সময় তাঁর পাশে অবস্থান করেন। হযরত মু'আবিয়ার (রা) ওফাতের পরে ইয়াযীদের নির্দেশে মদীনার গভর্ণর ওয়ালীদ হযরত হুসাইনকে (রা) ইয়াযীদের প্রতি বাই'আতের আহ্বান জানায়। তিনি সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়ে যান এবং এক পর্যায়ে মদীনা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তখন মুহাম্মাদ ইবন হানাফিয়্যা বিনীতভাবে তাঁকে বলেন : ভাই! আপনি আমার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিত্ব। এ পৃথিবীতে এমন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই, আপনার চেয়ে আমি যার হিতাকাঙ্ক্ষী। আমার পরামর্শ হলো যতটুকু সম্ভব এ মুহূর্তে আপনি ইয়াযীদের প্রতি বাই'আত থেকে দূরে থাকুন এবং মদীনা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করুন। এখানে অবস্থান করেই বিভিন্ন অঞ্চলে গোপনে দূত পাঠিয়ে মানুষকে আপনার খিলাফতের প্রতি সমর্থনের আহ্বান জানান। যদি তারা আপনার প্রতি বাই'আত করে তাহলে তা হবে আমাদের জন্য বিজয়, আর যদি তারা আপনাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন মুসলিমের ব্যাপারে একমত হয়ে যায় তাহলে তাতে আপনার ধর্ম ও বুদ্ধিমত্তায় কোন ঘাটতি হবে না। আপনার সম্মান ও মর্যাদার উপরও তার কোন প্রভাব পড়বে না। অন্যদিকে যদি আপনি কোন নির্দিষ্ট শহর অথবা নির্দিষ্ট কোন স্থানে যান তাহলে আমার আশংকা হয়, সেখানকার মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল আপনার পক্ষ নেবে, কিন্তু অন্য দল হবে আপনার প্রতিপক্ষ। তারপর তাদের মধ্যে হবে ঝগড়া ও মারামারি। মাঝখানে পড়ে আপনি হবেন তাদের তীর-বর্শার লক্ষ্যবস্তু। অবস্থা যদি এমন পর্যায়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে বংশ মর্যাদা ও ব্যক্তিগত গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই উম্মাতের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিটি সবচেয়ে বেশি হেয় ও অপমানিত হবেন এবং তখন তাঁর রক্ত হবে সবচেয়ে সস্তা বস্তু।

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার এ পরামর্শ শুনে ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, তাহলে আমি কোথায় যাব? মুহাম্মাদ বললেন : মক্কায় চলে যান। সেখানে যদি আপনি নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে থাকতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই কোন একটি পথ বেরিয়ে আসবে। আর যদি অবস্থা খারাপ হয় তাহলে মরুভূমি ও পাহাড়ী অঞ্চলে চলে যাবেন। যতদিন খিলাফতের ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত না নেবেন ততদিন এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরতে থাকবেন। এই ঘোরাঘুরির মধ্যে আপনি কোন একটি মত ও সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। কারণ, আপনি যখন কোন অবস্থার মুখোমুখী হন তখন আপনার সিদ্ধান্তই হয় সঠিক এবং কাজেও হয়ে ওঠেন সতর্ক। একথা শুনে হযরত হুসাইন (রা) বলেন, তুমি খুব আবেগধর্মী উপদেশ দিয়েছো। আমি আশা করি তোমার মত সঠিক হবে।[২২]

---

২২. আল-কামিল ফী আত-তারীখ-২/১৫২

হযরত হুসাইন (রা) একটি সীমা পর্যন্ত তাঁর পরমার্শ মত কাজও করেন। তিনি মদীনা থেকে মক্কা চলে যান। পরে কূফাবাসীদের আমন্ত্রণে সেখান থেকে কূফার দিকে রওয়ানা হন। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তাই পথিমধ্যে কারবালায় হৃদয়বিদারক শাহাদাতের ঘটনাটি ঘটে। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা এই ঘটনায় তাঁর সাথে ছিলেন না।[২৩]

মুখতার ইবন আবী 'উবায়দ আছ-ছাকাফীর বিদ্রোহ এবং মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার সমর্থন

হযরত ইমাম হুসাইনের (রা) শাহাদাতের পর বানূ উমাইয়্যাদের বিপরীতে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) খিলাফতের দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ান। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে অনেকগুলো বছর দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলতে থাকে। এ সময় বানূ ছাকীফের মুখতার ইবন 'উবায়দ আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের পক্ষ অবলম্বন করেন। আসলে মুখতার ছিলেন একজন অখ্যাত-অজ্ঞাত ব্যক্তি। কোন এক অপরাধের কারণে এক সময় সে বানূ উমাইয়্যাদের হাতে শাস্তিও ভোগ করেছিলেন। পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও কর্তৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যেই মূলত তাঁর পক্ষে এসে দাঁড়ান এবং কিছু দিন তাঁর পাশে ছিলেন। কিন্তু যখন বুঝলেন এখানে তাঁর উদ্দেশ্য পূরণ হবার নয় তখন তিনি নিজেই ভাগ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তার মত একজন অতি সাধারণ মানুষের পক্ষে কারো সাহায্য ছাড়া সফল হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল, এজন্য সে হযরত হুসাইনের (রা) রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবীর আশ্রয় নেন। যেহেতু ঘটনাটি ছিল অতি সাম্প্রতিক সময়ের এবং বহু মুসলিম বেদনাহতও ছিলেন। এজন্য বহু সরল মুসলিম তার প্রতারণার জালে আবদ্ধ হন। ইমাম হুসাইনের (রা) রক্তের বদলার শ্লোগানের সাথে সাথে তিনি ইমাম হুসাইনের (রা) স্থলাভিষিক্ত হযরত ইমাম যাইনুল 'আবিদীনের (রহ) নিকট বহু হাদিয়া-তোহফা পাঠিয়ে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করে এই বলে যে, আপনি আমাদের ইমাম। আমাদের থেকে বাই'আত গ্রহণ করে আপনি আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। কিন্তু হযরত যাইনুল 'আবিদীন (রহ) তার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এ কারণে তিনি তার প্রতারণার ফাঁদে ধরা দেননি। অত্যন্ত অবজ্ঞার সাথে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শুধু তাই নয় বরং মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে জনগণের সামনে তার মিথ্যা, প্রতারণা ও পাপাচারের বর্ণনা দিয়ে বলেন, এ ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য আহলে বায়ত (নবী পরিবার)-কে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। তার কথা ও বাস্তবতার কোন মিল নেই।

এটা ছিল সেই সময়ের ঘটনা যখন বাই'আতের বিষয়টি নিয়ে 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) ও মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার (রহ) মধ্যে সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটেছিল। মুখতার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি ইমাম যাইনুল 'আবিদীনের

---

২৩. তাবি'ঈন-৪১০

নিকট থেকে হতাশ হয়ে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট যান। একথা ইমাম যাইনুল 'আবিদীন জানতে পেরে তাঁকে এই বলে সতর্ক করেন যে, আহলি বায়তের প্রতি মুখতারের ভালোবাসার দাবী শুধুমাত্র মানুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য। আসলে তার মুখের কথা, বাস্তবে তা ঠিক নয়। বরং সে আহলি বায়তের একজন দুশমন। আমার মত আপনারও উচিত হবে তার গোপন উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেওয়া। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা বিষয়টি নিয়ে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) সাথে আলোচনা করেন। তিনি সে সময় 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) দিক থেকে ভীষণ চাপ ও ভয়-ভীতির মধ্যে ছিলেন। এজন্য তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে বলেন, এ ব্যাপারে তুমি যাইনুল 'আবিদীনের পরামর্শে কান দেবে না।[২৪]

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাও মুখতারকে একজন ভালো মানুষ মনে করতেন না এবং মুখতারের উপর তাঁর মোটেও আস্থা ছিল না। কিন্তু যেহেতু 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) মুহাম্মাদকে বাই'আতের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করছিলেন, এ কারণে তিনি বাধ্য হয়ে তাঁর হাত থেকে বাঁচার জন্য মুখতারকে সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা এবং তার অভিভাবকত্ব গ্রহণের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হন।[২৫]

আহলি বায়তের (নবী বংশ) সমর্থকদের মূল কেন্দ্র ছিল ইরাক। এ কারণে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে অভিভাবক হিসেবে পাওয়ার পর মুখতার তাঁর অনুমতি নিয়ে ইরাক যাত্রা করে। যেহেতু তার উপর মুহাম্মাদের মোটেও আস্থা ছিল না এবং তাকে একজন ভালো মানুষ বলেও মনে করতেন না, এ কারণে তিনি নিজের একান্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবন কামিল আল-হামাদানীকে তার সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দেন। যাত্রার আগে তিনি গোপনে তাকে বলে দেন, মুখতার তেমন আস্থাভাজন ব্যক্তি নয়। এ কারণে তার সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। ইবন যুবাইর (রা) এ সকল কর্মকাণ্ডের কথা অবহিত ছিলেন না। তিনি তখনও মুখতারকে নিজের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করছিলেন।

এই সুযোগ গ্রহণ করে মুখতার তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, মক্কায় আমার অবস্থান করার চেয়ে ইরাকে থাকা আপনার জন্য বেশি কল্যাণকর হবে। এ কারণে আমি সেখানে যাচ্ছি। ইবন যুবাইর (রা) সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে অনুমতি দিলেন। মুখতার 'আবদুল্লাহ ইবন কামিলকে সঙ্গে নিয়ে ইরাক যাত্রা করলেন। 'উয়াইব নামক স্থানে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। মুখতার তাকে জিজ্ঞেস করেন, ইরাকে মানুষের মনোভাব কি? সে বলে, তাদের অবস্থা কাণ্ডারীবিহীন জাহাজের মত দোদুল্যমান। মুখতার বললো, আমি হবো তাদের কাণ্ডারী, তাদেরকে সঠিকভাবে চালাবো।[২৬]

আহলি বায়ত তথা নবী বংশ-প্রেমিক লোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল কূফায়। এ কারণে মুখতার সোজা কূফায় যান এবং নিজেকে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার

---

২৪. মুরূজ আয-যাহাব-১/৩৬৬

২৫. আত-তাবাকাত-৫/৯৮

২৬. প্রাগুক্ত

প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাঁর তাকওয়া-পরহেযগারীর প্রচার এবং সেই সাথে ইবন যুবাইরের (রা) নিন্দা ও সমালোচনা করতে আরম্ভ করেন। তিনি বলতে থাকেন, ইবন যুবাইর (রা) ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার একজন কর্মী। প্রথম দিকে তিনি তাঁর জন্য কাজ করেন, কিন্তু পরে নিজেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হাতিয়ে নেন। এজন্য মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে পাঠিয়েছেন। তাঁর নিজ হাতে ও কলমে লেখা প্রত্যয়ন পত্রও আমার সঙ্গে আছে। যাদের উপর তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস হতো তিনি তাদেরকে প্রত্যয়ন পত্রটি পাঠ করে শুনিয়ে দিতেন। মোটকথা, তাঁর এই চালাকির কারণে বহু নবী বংশ-প্রেমিক মানুষ তাঁর প্রতারণার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অচিরেই বিরাট একটি দল গোপনে তাঁর হাতে বাই'আত করে। তবে কিছু লোকের সন্দেহ হয়। তারা মক্কায় মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট যায় এবং তাঁর নিকট মুখতারের কথা কতটুকু সত্য তা জানতে চায়। তিনি মুখতারের দাবী সরাসরি স্বীকার বা অস্বীকার করতে পারছিলেন না। স্বীকার এজন্য করতে পারেননি যে, মুখতারের কথায় অনেক অতিরঞ্জন তথা মিথ্যাও ছিল। অন্যদিকে অস্বীকার করতে পারেননি এজন্য যে, তিনি তো মুখতারের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তবে তার সততা ও সত্যবাদিতায় তাঁর মোটেও আস্থা ছিল না। এ কারণে তিনি তাদেরকে এভাবে জবাব দেন : [২৭]

نحن حيث ترون محتسبون وما أحب أن لى سلطان الدنيا بقتل مؤمن بغير حق ولوددت أن الله انتصرلنا بمن شاء من خلقه، فاحذروا الكذابين وانظروا لأنفسكم ودينكم.

"আপনারা তো দেখছেন আমরা আহলি বায়ত ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ মানুষ হিসেবে বসে আছি। আমি অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের রক্ত ঝরিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হতে চাই না। তবে আমরা এ পসন্দ করি যে, আল্লাহ তাঁর যে বান্দা দ্বারা আমাদের সাহায্য করতে চান, করুন। অবশ্য তোমরা মিথ্যাবাদীদের থেকে সতর্ক থাকবে, তাদের প্রতারণা থেকে নিজেদের জীবন ও ধর্ম রক্ষা করবে।" একথা শুনে সেই লোকগুলো ইরাকে ফিরে যায়।
কূফায় তখন ইবরাহীম ইবন আশতার নাখা'ঈ ছিলেন একজন প্রভাবশালী আহলি বায়ত প্রেমিক ব্যক্তি। মুখতার তাঁকে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার একটি জাল চিঠি দেখিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেন। মুখতার সেই কাজটি সম্পন্ন করেন এভাবে : তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নামে ও ভাষায় ইবরাহীম আল-আশতারকে একটি চিঠি লেখেন। তারপর সেই চিঠিটি নিয়ে কূফায় ইবরাহীমের সাথে পূর্ব অনুমতি নিয়ে সাক্ষাৎ করেন। সংগে তাঁর অনুসারীদের আরো অনেকে ছিল। তারা ইবরাহীমের নিকট মুখতারের পরিচয় দিতে গিলে বলে; তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবার-পরিজনের বিশ্বাসভাজন

---

২৭. প্রাগুক্ত-৫/৯৯

ব্যক্তি। মুখতার ছিলেন একজন তুখোড় বক্তা। তিনি উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বলেন :[২৮]

إنكم أهل بيت قد اكرمكم الله بنصره آل محمد، وقد ركب منهم ما قد علمت، وحرموا ومنعوا حقهم وصاروا إلى ما رأيت، وقد كتب إليك المدى كتابا وهؤلاء الشهود عليه.

"আপনারা আহলি বায়তের লোক। মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের সাহায্যের দ্বারা আল্লাহ্ আপনাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আপনারা জানেন, তাদের প্রতি কেমন আচরণ করা হয়েছে। তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদের যে অবস্থা হয়েছে তা আপনি দেখছেন। মাহ্দী আপনাকে একটি চিঠি লিখেছেন এবং এরা হলো তার সাক্ষী।"

অতঃপর সেখানে উপস্থিত ইয়াযীদ ইবন আনাস আল-আসাদী, আল-আহ্মার ইবন শুমাইত আল-বাজালী, 'আবদুল্লাহ ইবন কামিল আশ শাকিরী ও আবূ 'উমারা কায়সান সমবেত কণ্ঠে বলে ঃ

نشهد أن هذا كتابه قد شهدناه حين دفعه إليه.

"আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি এটা তাঁর (মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার) চিঠি। এ চিঠি তাঁর (মুখতারের) হাতে অর্পণ করার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম।"

ইবরাহীম চিঠি নিয়ে পাঠ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এভাবে :[২৯]

أنا اول من يجيب وقد أمرنا بطاعتك وموازرتك.

"আমি হবো প্রথম সাড়াদানকারী ব্যক্তি। আমাদেরকে আপনার সাহায্য ও সহযোগিতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কূফা দখল ও ইমাম হুসাইনের (রা) হত্যাকারীদের হত্যা

ইবরাহীম নাখা'ঈর সমর্থন ও সহযোগিতায় মুখতারের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি এবার প্রকাশ্যে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। ইবন যুবাইরের (রা) পুলিশ অফিসার ইয়াস ইবন নাদার কিছুটা বিধি-নিষেধ ও কঠোরতা আরোপ করলে ইবরাহীম ইবন আশতার তাঁকে হত্যা করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন মুতী', যিনি ইবন যুবাইরের (রা) পক্ষ থেকে কূফার ওয়ালী ছিলেন, মুখতারের বিদ্রোহমূলক আচরণ দমনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। মুখতার ও ইবরাহীম সম্মিলিতভাবে ইবন মুতী'কে পরাজিত করেন। ইবন মুতী' তাঁদের হাত থেকে নিজের প্রাণ ভিক্ষা নিয়ে কূফা ত্যাগ করেন। অতঃপর সেখানে মুখতারের শাসন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩০]

---

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. আল-আখবার আত-তিওয়াল-২৫৭-৩০০; তাবি'ঈন-৪১৩

কূফায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর মুখতারের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। এখন তার ক্ষমতার দাপট দেখানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং তিনি হযরত হুসাইনের (রা) হত্যাকারীদের এবং তাদের সহযোগীদেরকে নির্মূল করা আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাদের হত্যা অভিযান শেষ করেন।

'উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের মাথা কেটে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা ও ইমাম যাইনুল 'আবিদীনের (রহ) নিকট পাঠান। মুখতারের ধোঁকা ও প্রতারণা সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও কাজটি এমন ছিল যে, তাঁরা আবেগাপ্লুত না হয়ে পারেননি। অবলীলাক্রমে তাঁদের অনেকের মুখ থেকে এ কাজের জন্য প্রশংসামূলক বাক্য উচ্চারিত হয়। তবে একথা সত্য যে, মুখতারের এ প্রতিশোধমূলক হত্যাযজ্ঞকে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা মোটেও সমর্থন করেননি। ইবন সা'দ বলেন :[৩১]

وكان ابن الحنفية يكره أمر المختار وما يبلغه عنه ولايحب كثيرا مما يأتي به.

"ইবনুল হানাফিয়্যা মুখতারের কর্মকাণ্ড এবং তাঁর সম্পর্কে যে সকল খবর আসতো তা মোটেও পছন্দ করতেন না।"

যাই হোক, হুসাইন (রা) হত্যাকারীদের নির্মূল করার পর মুখতার মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে এ চিঠিটি পাঠান :[৩২]

من المختار بن أبي عبيد الطالب بثأر محمد، أما بعد فإن الله تبارك وتعـالى لم ينتقم من قوم حتى يعذر إليهم، وإن الله قد أهلك الفسقة وأشياع الفسقة وقد بقيت بقايا أرجو أن يلحق الله أخرهم بأولهم.

"মুহাম্মাদের (সা) পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের দাবীদার মুখতার ইবন আবী 'উবায়দ। আল্লাহ কোন জাতি বা সম্প্রদায় থেকে বদলা নেন না যতক্ষণ না তাদের কৈফিয়াত শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ সকল পাপাচারী, পাপাচারীদের অনুসারীদের ধ্বংস করেছেন, আর যা অবশিষ্ট আছে আশা করি আল্লাহ তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম ব্যক্তির সাথে মিলিত করবেন।"

ইবন আল-হানাফিয়্যাকে আটক ও মুক্তি

'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) প্রথম দিকে নিজের বাই'আতের জন্য ইবন আল-হানাফিয়্যার উপর তেমন চাপ প্রয়োগ করেননি। কিন্তু যখন কূফাসহ অন্য কিছু স্থানে মুখতারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে ইরাকে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার বাই'আত গ্রহণকারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন ইবন আয-যুবাইর (রা) তাঁর দিক থেকে হুমকি অনুভব করতে থাকেন। আর তখন থেকেই

৩১. আত-তাবাকাত-৫/১০০

৩২. প্রাগুক্ত

তিনি ইবন আল-হানাফিয়্যা ও 'আবদুল্লাহ ইবন আল-'আব্বাসের (রা) উপর নিজের বাই'আতের জন্য প্রবল চাপ প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁরা বাই'আত করতে রাজী হননি। অবশেষে তাঁদেরকে তাদের পরিবার-পরিজনসহ একটি উপত্যকায় নজরবন্দী করা হয়। একটি বর্ণনা মতে ইবন আল-হানাফিয়্যাকে যমযম কূপের নিকটে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে তার পাশে জ্বালানী কাঠের স্তূপ করা হয়। তারপর ইবন সা'দের বর্ণনা মতে ইবন আয-যুবাইর (রা) তাদেরকে ধমক দেন এ ভাষায় : [৩৩]

والله لتبايعن أو لأحرقنكم بالنار فخافوا على أنفسهم.

"আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই বাই'আত করবে অথবা আমি অবশ্যই তোমাদের পুড়িয়ে মারব। ফলে তাঁরা প্রাণের আশংকা করেন।"

হুমকি দেওয়া হয় যে, যদি তিনি বাই'আত না করেন তাহলে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। এমন এক নাজুক অবস্থায় তিনি সুলাইম আবূ 'আমির মারফত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট তাঁর করণীয় কী সে সম্পর্কে জানতে চান। তিনি বলে পাঠান যে, কক্ষনো আনুগত্য স্বীকার করবে না, নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকবে। কিন্তু মক্কায় অবস্থান করে বাই'আতের অস্বীকৃতির উপর অটল থাকা অসম্ভব ছিল। এ কারণে তিনি মক্কা ছেড়ে কূফা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। মুখতার এ সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে মোটেই খুশী হতে পারলেন না। কারণ, ইবন আল-হানাফিয়্যা ইরাক পৌঁছালে তাঁর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। মূলতঃ মুখতার তো ইবন আল-হানাফিয়্যার নামটিই কেবল ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তাই তিনি তাঁর কূফা আগমন ঠেকানোর জন্য কূফাবাসীদেরকে বলতে শুরু করেন যে, 'মেহেদীর আলামত হলো, যখন তিনি তোমাদের এখানে আসবেন তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বাজারের মধ্যে তরবারি দিয়ে আঘাত করবে, কিন্তু তাতে মেহেদী মোটেই আহত বা ব্যথা পাবেন না। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা নিজের সম্পর্কে প্রচারিত এই অলৌকিক ক্ষমতার কথা জানতে পেরে কূফা যাওয়ার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন। তিনি আবূ তুফাইল 'আমির ইবন ওয়াছিলার মাধ্যমে স্বীয় ইরাকী অনুসারীদের নিকট নিজের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে দেন। 'আমির ইরাক পৌঁছে তথাকার অধিবাসীদের নিকট ইবন আল-হানাফিয়্যার বিস্তারিত অবস্থা তুলে ধরেন। অতঃপর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে মুক্ত করার জন্য মুখতার 'আবূ 'আবদিল্লাহ আল-জাদালীর নেতৃত্বে চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠান। যাত্রাকালে তিনি আবূ 'আবদিল্লাহকে বলেন, যদি বানূ হাশিম জীবিত থাকে তাহলে তাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা এবং তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করবে। আর যদি তাদেরকে হত্যা করা হয়ে থাকে তাহলে যেভাবে সম্ভব আলে যুবাইর তথা যুবাইর বংশের লোকদেরকে খতম করে ফেলবে।

'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) মধ্যে মুখতারের এই চৌকষ বাহিনীর প্রতিরোধ

---

৩৩. প্রাগুক্ত-৫/১০১

করার শক্তি ছিল না। এ কারণে একটি বর্ণনা মতে, তিনি মুখতারের বাহিনী মক্কা পৌছার পূর্বে দারুন নাদওয়া-তে গিয়ে অবস্থান নেন। তবে অপর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি কা'বার গিলাফের তলে আশ্রয় নেন। এদিকে ইরাকী বাহিনী মক্কা পৌছে জ্বালানী কাঠের স্তূপের মধ্য থেকে ইবন আল-হানাফিয়্যা ও ইবন 'আব্বাসকে উদ্ধার করে। এর মধ্যে ইবন আয-যুবাইরের লোকজন মক্কায় এসে যায়। তবে কোন সংঘাত-সংঘর্ষ হয়নি। ইরাকীদের পক্ষ থেকে আবূ 'আবদিল্লাহ আল-জাদালী ইবনুল হানাফিয়্যা ও ইবন 'আব্বাসকে (রা) বলেন, আপনারা অনুমতি দিলে আমরা ইবন আয-যুবাইরকে হত্যা করে মানুষকে এই আপদ থেকে মুক্তি দিতে পারি। কিন্তু ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, না, তাঁকে হত্যা করা যাবে না। কারণ আল্লাহ এই শহরে প্রাণী হত্যা হারাম ঘোষণা করেছেন। কেবল নবী কারীমের (সা) সম্মানে কয়েক ঘণ্টার জন্য এ নিষেধাজ্ঞা রহিত করা হয়। অন্যথায় না তাঁর পূর্বে অন্য কারো জন্য, আর না তাঁর পরে কখনো রহিত হয়েছে। যতটুকু হয়েছে, তাই যথেষ্ট। তোমরা আমাদেরকে মুক্ত করে নিয়ে যাও। অতঃপর ইরাকী সৈনিকরা তাঁদেরকে মুক্ত করে মিনায় নিয়ে যায়। কয়েক দিন তাঁরা সেখানে অবস্থান করে ইবন আয-যুবাইরের হাত থেকে বাঁচার জন্য তায়িফ চলে যান। সেখানে হজ্জ পর্যন্ত অবস্থান করেন।[৩৪]

হিজরী ৬৮ সনে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) তায়িফে ইনতিকাল করেন। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

আমীরুল হজ্জ

তখন সময়টি ছিল আন্তঃকলহ ও গৃহ বিবাদের। কমপক্ষে চার ব্যক্তি খিলাফাতের দাবীদার ছিলেন। সুতরাং সেই বছর চারজন আমীরের নেতৃত্বে হজ্জ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা তায়িফবাসীদের সংগে, 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) তাঁর অনুসারীদের সংগে, নাজদা ইবন 'আমির হারূরী খারিজীদের সংগে এবং বানূ উমাইয়্যারা শামবাসীদের সংগে হজ্জ আদায়ের জন্য মক্কায় আসে। চারটি চরম প্রতিদ্বন্দ্বী দলের একত্র সমাবেশ মোটেই বিপদমুক্ত ছিল না। মক্কার পবিত্র হারামে যে কোন সময় সংঘাত-সংঘর্ষের প্রবল সম্ভাবনা ছিল। বিষয়টি উপলব্ধি করে মুহাম্মাদ ইবন যুবাইর ইবন মুত'ইম (আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের ভাই নন, বরং ভিন্ন ব্যক্তি) স্বউদ্যোগে চারটি দলের প্রত্যেক নেতার নিকট যান এবং তাঁদেরকে সংযম ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন। প্রথমে তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট যান এবং তাঁকে বলেন : 'আবুল কাসিম! আল্লাহকে ভয় করুন। আমরা এখন পবিত্র শহরে পবিত্র স্থানে অবস্থান করছি। হাজীগণ কা'বা ঘরে আল্লাহর প্রতিনিধি ও মেহমানস্বরূপ। এজন্য তাঁদের হজ্জ বিনষ্ট করবেন না।' জবাবে ইবন আল-হানাফিয়্যা বলেন : আল্লাহর কসম! আমিও এটা চাই না। আমি কোন মুসলিমকে বাইতুল্লাহ-তে আসতে বাধা দিব না এবং আমার দলের

---

৩৪. প্রাগুক্ত-৫/১০১-১০২

কোন হাজীও তা করবে না। তবে আমি আত্মরক্ষার জন্য যা করার তা করবো। আর কেবল তখনই আমি খিলাফাতের দাবী করবো যখন দু'জন মানুষও আমার দাবীর বিরোধিতা করবে না। আমার দিক থেকে নিশ্চিন্তে থাকুন। আমাকে বাদ দিয়ে আপনি বরং 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) ও নাজদা হারূরীর নিকট যান এবং তাঁদের সাথে কথা বলুন। অতঃপর মুহাম্মাদ ইবন যুবাইর যান 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) নিকট এবং ইবন আল-হানাফিয়্যাকে যে কথা বলেছিলেন তাঁকেও একই কথা বলেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) জবাব দেন : 'আমার খিলাফাতের ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা' (ঐকমত্য) হয়ে গেছে। সকলে আমার বাই'আত করেছে। কেবল এই লোকগুলো (বানূ হাশিম) আমার বিরোধিতা করছে।' মুহাম্মাদ ইবন যুবাইর বললেন, যা কিছুই হোক, এ সময় আপনার হাত নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিৎ হবে। তিনি বলেন, ঠিক আছে, আমি আপনার কথা মত কাজ করবো। এরপর মুহাম্মাদ ইবন যুবাইর গেলেন নাজদা হারূরীর নিকট। নাজদা বললেন, আমরা সংঘাতের সূচনা করবো না। তবে যারা আমাদের সংগে লড়বে আমরা তার মুকাবিলা করবো। সবশেষে তিনি গেলেন বানূ উমাইয়্যাদের নিকট। তারা বললো, আমরা তো আমাদের পতাকার নিকট অবস্থান করছি। কেউ আগ বাড়িয়ে আমাদের সাথে সংঘর্ষে না জড়ালে আমরা আগে কাউকে আক্রমণ করবো না। মুহাম্মাদ ইবন যুবাইর বলেন, এই চারটি দলের পতাকার মধ্যে ইবন আল-হানাফিয়্যার পতাকাটি ছিল সবচেয়ে বেশি নিরাপদ ও প্রশান্ত। এভাবে মুহাম্মাদ ইবন যুবাইরের চেষ্টায় সে যাত্রায় একটা রক্তক্ষয়ী সংঘাত থেকে মুসলিম উম্মাহ রক্ষা পায়। এ বছর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা তাঁর চার হাজার সঙ্গী-সাথীসহ হজ্জ আদায় করেন।[৩৫]

মুখতারের সমাপ্তি এবং মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) প্রস্তাব

হিজরী ৬৮ সনে 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) ভাই মুস'আব ইবন আয-যুবাইর (রা) বড় বড় কয়েকটি যুদ্ধের মাধ্যমে মুখতারের হত্যা ও তাঁর শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। এ সকল যুদ্ধের সাথে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার কোন সম্পর্ক অথবা এর পিছনে কোন প্রকার ভূমিকা ছিল না।

মুখতারের পরিসমাপ্তির পর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে এমন আর কেউ ছিল না। এ কারণে 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) আবার তাঁর নিকট বাই'আতের তাকীদ দিতে আরম্ভ করেন এবং নিজের ভাই 'উরওয়াকে তাঁর নিকট পাঠান। তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে এই বার্তা পৌঁছে দেন যে, "আমার বাই'আত না করা পর্যন্ত আমি আপনাকে ছাড়ছি না। যদি বাই'আত না করেন তাহলে আবার নজরবন্দী করবো। যে ভয়ংকর মিথ্যাবাদীর সাহায্য ও সহযোগিতার উপর আপনার আশা-ভরসা ছিল আল্লাহ

---

৩৫. প্রাগুক্ত-৫/১০৩-১০৪

তাঁকে ধ্বংস করেছেন। এখন ইরাকসহ গোটা আরব আমার খিলাফাতের ব্যাপারে একমত হয়েছে। এ কারণে আপনিও আমার বাই'আত করুন। অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।"

ইবন আল-হানাফিয়্যা এই হুমকিমূলক বার্তা ধৈর্যসহকারে শোনেন। তারপর বলেন, 'আপনার ভাই 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) সম্পর্ক ছিন্ন এবং সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করার ব্যাপারে খুবই তাড়াহুড়োকারী, আর সেই সাথে আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারেও দারুণ উদাসীন। তিনি মনে করেন, দুনিয়াতে চিরকাল থাকবেন, এই কিছুদিন পূর্বেও যখন মুখতার তাঁর সহযোগী ছিল, তিনি আমার চেয়েও মুখতার ও তার কর্মকাণ্ডের বেশি স্বীকৃতি দানকারী ছিলেন। আল্লাহর কসম! আমি মুখতারকে না আমার আহ্বানকারী নিয়োগ করেছি, আর না তাকে সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করেছি। এই তো কিছুদিন আগের কথা, সে তো আমার চেয়েও 'আবদুল্লাহর (রা) বেশি অনুগত এবং অনুসারী ছিল। সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে বহু দিন যাবত তো তিনি এই ভয়ংকর মিথ্যাবাদীকে নিজের সংগে রেখেছিলেন। আর যদি সে মিথ্যাবাদী না হয় তাহলে আমার চেয়েও 'আবদুল্লাহর (রা) তা বেশি জানা থাকার কথা। আমি 'আবদুল্লাহর (রা) প্রতিপক্ষ নই। যদি তাই হতাম তাহলে তাঁর কাছাকাছি থাকতাম না, যারা আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাদের কাছে চলে যেতাম। কিন্তু আমি কারো আমন্ত্রণ গ্রহণ করিনি। আপনার ভাইয়ের আরেকজন প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান। তিনিও আপনার ভাইয়ের মত দুনিয়ার প্রত্যাশী। তিনি তাঁর শক্তি ও ক্ষমতাবলে আপনার ভাইয়ের ঘাড় চেপে ধরেছে। আমার মনে হচ্ছে আপনার ভাইয়ের নৈকট্যের চেয়ে 'আবদুল মালিকের নৈকট্য আমার জন্য স্বস্তিকর। 'আবদুল মালিক পত্র মারফত আমাকে তাঁর কাছে চলে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।"

উরওয়া প্রশ্ন করলেন : তাহলে সেখানে চলে যাচ্ছেন না কেন? জবাবে ইবন আল-হানাফিয়্যা বলেন : খুব শীঘ্র এ ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট ইসতিখারা (সঠিক ও মঙ্গলজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ) করবো। আমার এখান থেকে চলে যাওয়া আপনার ভাইয়ের পছন্দ হবে এবং এতে তিনি খুশী হবেন। 'উরওয়া বলেন : আমি আপনার বক্তব্য আমার ভাইকে জানাবো।

এই আলোচনার পর 'উরওয়া ফিরে গেলেন। ইবন আল-হানাফিয়্যার সমর্থক কিছু লোক 'উরওয়াকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু তিনি তাদেরকে শক্তভাবে বাধা দেন। এ কারণে 'উরওয়া সহীহ-সালামতে ফিরে যাওয়াতে তারা ভীষণ নাখোশ হয়। তারা ইবন আল-হানাফিয়্যাকে বলে : যদি আপনি আমাদের কথা শুনতেন তাহলে আমরা তার ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলতাম। ইবন আল-হানাফিয়্যা বলেন : কোন অপরাধে তোমরা তাঁকে হত্যা করতে? তিনি শুধু তাঁর ভাইয়ের দূত হিসেবে এসেছিলেন এবং আমাদের যিম্মায় ও নিরাপত্তায় ছিলেন। আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনার পর আমরা তাঁকে তাঁর ভাইয়ের নিকট ফেরত পাঠিয়েছি। তোমরা যে কথা বলছো তা তো প্রতারণা। আর প্রতারণার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। যদি আমি তোমাদের কথামত কাজ

করতাম তাহলে মক্কায় রক্ত ঝরতো। আর এই ব্যাপারে তোমরা আমার চিন্তাধারা সম্পর্কে অবহিত আছো। যদি সকল মুসলিম আমার খিলাফাতের ব্যাপারে একমত হয়ে যায় এবং একজন মাত্র মানুষ ভিন্নমত পোষণ করে তাহলেও আমি ঐ লোকটির সাথে যুদ্ধ করা সঙ্গত মনে করবো না।"

'উরওয়া ফিরে গেলেন এবং ভাইকে ইবন আল-হানাফিয়্যার বক্তব্য শোনালেন। সেই সাথে এ পরামর্শও দিলেন যে, আপনি তাঁর সঙ্গে আর বিবাদ না করে তাঁকে মুক্ত করে দিন। তিনি আমাদের এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা দূরে কোথাও চলে যাক। 'আবদুল মালিক তাঁর থেকে বাই'আত না নিয়ে তাঁকে শামে থাকতেই দেবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সকল মুসলিম 'আবদুল মালিকের খিলাফাতের ব্যাপারে একমত না হবে ততক্ষণ তিনিও তাঁর বাই'আত করবেন না। এমতাবস্থায় 'আবদুল মালিক তাঁকে হত্যা অথবা কারারুদ্ধ করবে। আর এতে আপনার উদ্দেশ্য তার দ্বারা পূর্ণ হবে। তাতে আপনি দায়মুক্ত থাকবেন। 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) তাঁর ভাইয়ের এ উপদেশ গ্রহণ করেন এবং ইবন আল-হানাফিয়্যার সাথে আর কোন বিবাদে গেলেন না।[৩৬]

'আবদুল মালিকের আমন্ত্রণ এবং ইবন আল-হানাফিয়্যার শাম গমন ও প্রত্যাবর্তন

'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরকে (রা) প্রতিহত করার উদ্দেশে 'আবদুল মালিক মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার সমর্থন লাভের আশায় বহুদিন আগে থেকে তাঁকে শামে চলে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে আসছিলেন। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট থেকে 'উরওয়ার ফিরে যারওয়ার পর 'আবদুল মালিক ইবন আল-হানাফিয়্যাকে আরেকটি পত্র পাঠান। পত্রটি নিম্নরূপ :[৩৬]

إنه قد بلغني أن بن الزبير قد ضيق عليك وقطع رحمك واستخف بحقك حتى تبايعه فقد نظرت لنفسك ودينك وأنت أعرف بـه حيث فعلت ما فعلت، وهذا الشام فانزل منه حيث شئت فنحن مكرموك وواصلوا رحمك وعافو حقك.

"আমি জেনেছি, আপনার বাই'আত আদায়ের জন্য 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন, আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, আপনার সম্মান ও অধিকার ভূলুণ্ঠিত করছেন। আপনি যা কিছু করেছেন তা আপনার জীবন ও দীনের প্রতি লক্ষ্য রেখে করেছেন। এই শাম আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত। এখানে আপনি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারবেন। আমরা আপনার সব ধরনের নিরাপত্তা, সম্মান ও অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করবো।"

আগে থেকেই মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা মক্কা থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজছিলেন। তাই এই চিঠি পেয়ে তিনি শামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রথমে আয়লায় পৌঁছেন।

---

৩৬. প্রাগুক্ত-৫/১০৫-১০৬: তাবি'ঈন-৪১৭-৪১৯

৩৬ . প্রাগুক্ত-৫/১০৭

তথাকার অধিবাসীরা তাঁর সকল সহযাত্রীসহ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। তাঁর প্রতি দারুণ বিনয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। অত্যন্ত সম্মানের সাথে তিনি সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। দু'চার দিনের মধ্যেই তিনি সেখানে "আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার" (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ)-এর কাজ শুরু করেন। তিনি মানুষকে বলতে থাকেন, তাঁর অনুসারীদের উপর এবং তাঁর উপস্থিতিতে যেন কেউ কারো উপর যুলম না করে। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার আয়লায় উপস্থিতি ও জনপ্রিয়তার কথা 'আবদুল মালিক জানতে পেরে শংকিত হলেন। তিনি তাঁর বিশেষ উপদেষ্টা কুবায়সা ইবন যুওয়াইব ও রাও'উ ইবন যানবা' জুযামীর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তারা বলেন, তাঁর বাই'আত গ্রহণ ছাড়া তাঁকে এত নিকটে অবস্থান করার অনুমতি দেওয়া ঠিক হবে না। হয় তিনি বাই'আত করবেন, না হয় তাঁকে আবার হিজাযে পাঠিয়ে দিন।

উপরোক্ত পরামর্শের ভিত্তিতে 'আবদুল মালিক মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে লেখেন :[৩৮]

إنك قدمت بلادى فنزلت فى طرف منها، وهذه الحرب بينى وبين ابن الزبير كما تعلم، وأنت لك ذكر ومكان، وقد رأيت أن لاتقيم فى سلطانى إلا أن تبايع لى، فإن بايعتنى فخذ السفن التى قدمت علينا من القلزم وهى مائة مركب فهى لك وما فيها، ولك ألفا ألف درهم أعجل لك منها خمسمائة ألف وألف ألف وخمسمائة ألف أتيتك مع ما أردت من فريضة لك ولولدك ولقراتبك ومواليك ومن معك، وإن أبيت فتحول عن بلدى إلى موضع.

"আপনি আমার দেশের একটি কোণে এসে অবস্থান নিয়েছেন। আপনি জানেন এখন আমার ও ইবন আয-যুবাইরের (রা) মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। আপনি একজন বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি। এ কারণে আমার ক্ষমতাধীন দেশে আমার বাই'আত ছাড়া আপনার অবস্থান আমার স্বার্থের পরিপন্থী। যদি আপনি বাই'আত করতে ইচ্ছুক হন তাহলে লোহিত সাগরে যে একশো জাহাজ ভর্তি দ্রব্যসামগ্রী এসেছে তা সবই এবং সেই সাথে আরো বিশ লাখ দিরহাম আপনাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হবে। তার মধ্যে পাঁচ লাখ এক্ষুণি দেওয়া হবে এবং পনেরো লাখ পরে পাঠানো হবে। এছাড়া আপনি যে পরিমাণ নির্ধারণ করবেন সেই অনুযায়ী আপনার নিকট আত্মীয়, দাস-দাসী এবং আপনার সংগী-সাথীদের ভাতা প্রদান করা হবে। আর যদি আপনি বাই'আত না করেন তাহলে এই মুহূর্তে আমার দেশ ছেড়ে আমার সীমানার বাইরে চলে যান।"

জবাবে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা লিখলেন :[৩৯]

---

৩৮. প্রাগুক্ত

৩৯. প্রাগুক্ত-৫/১০৮

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن علي إلى عبد الملك بن مروان، سلام عليك، فإني أحمد إليك الذى لا إله إلا هو، أما بعد فقد عرفت رأيي فى هذا الأمر قديما، وإني لست أسفهه على أحد، والله لو إجتمعت هذه الأمة عليّ إلا أهل الزرقاء ما قاتلتهم أبدا ولا اعتزلتهم حتى يجتمعوا. نزلت مكة فرارا مما كان بالمدينة فجاورت بن الزبير فأساء جوارى وأراد منى أن أبايعه فأبيت ذلك حتى يجتمع الناس عليك أو عليه، ثم أدخل فيما دخل الناس فأكون كرجل منهم، ثم كتبت إلى تدعونى إلى ما قبلك فأقبلت سائرا فنزلت في طرف من أطرافك، والله ما عندى خلاف ومعى أصحابى فقلنا بلاد رخيصة الأسعار وندنو من جوارك ونتعرض صلتك. فكتبت بما كتبت به ونحن منصرفون عنك إن شاء الله.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। মুহাম্মাদ ইবন 'আলীর পক্ষ থেকে 'আবদুল মালিকের প্রতি সালাম। সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। অতঃপর এই যে, খিলাফাতের ব্যাপারে আমার চিন্তাধারা সম্পর্কে আপনি পূর্বেই অবহিত আছেন। এ ব্যাপারে আমি কাউকে বোকা বানিয়ে ধোঁকা দিই না। আল্লাহর কসম! যদি গোটা মুসলিম উম্মাহ আমার খিলাফাতের ব্যাপারে একমত হয়ে যায় এবং কেবল যারকা' বাসীরা দ্বিমত পোষণ করে তাহলেও তাদের সংগে সংঘাতে যাব না। তাদেরকে ছেড়ে বিচ্ছিন্নও হয়ে যাব না, যতক্ষণ না তারা ঐকমত্যে আসে। মদীনায় অস্থিরতার কারণে মক্কায় চলে এসেছিলাম এবং 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের নিকটে অবস্থান করছিলাম। কিন্তু তিনি আমার সাথে সদাচরণ করেননি, আমার থেকে বাই'আত নিতে চেয়েছেন, কিন্তু অস্বীকার করেছি। বলেছি, যতক্ষণ আপনার ও তাঁর মধ্যেকার বিরোধে মুসলিম উম্মাহ কোন ঐকমত্যে না পৌঁছবে ততক্ষণ আমি বাই'আত করবো না। তারা যে সিদ্ধান্ত নিবে, আমিও তাদের সাথে থাকবো। এই অবস্থা এবং এমন টানাপোড়নের মধ্যে আপনি আমাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি সে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আপনার ক্ষমতাধীন দেশের একটি কোণায় এসে অবস্থান নিয়েছি। আল্লাহর কসম! আমার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন ইচ্ছা নেই। আমার সকল লোকজন আমার সংগেই ছিল। দেখলাম এ স্থানটি নিরিবিলি জীবন যাপনের জন্য উপযুক্ত। তাই মনে করলাম, ভালো হলো, আপনার নিকটে থেকে আপনার সাথে সম্পর্কের দ্বারা উপকৃত হবো। কিন্তু এখন আপনি যা লেখার তা লিখছেন। এ কারণে, ইনশাআল্লাহ আমরা আবার ফিরে যাব।"

এই জবাবী পত্রটি পাঠিয়ে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা নিজের সাত হাজার সঙ্গীর সামনে নিম্নের এই ভাষণটি দান করেন :[৪০]

---

৪০. প্রাগুক্ত

الله ولى الأمور كله وحاكمها، ماشـاء الله كـان ومـالا يشـاء لم يكـن، كـل مـاهو آت قريب، عجلتم بالأمر قبل نزوله، والذى نفسي بيده إن فى أصلابكم لمن يقـاتل مـع آل محمد ما يخفى على أهل الشرك أمر آل محمد وأمر آل محمـد مستأخر. والـذى نفس محمد بيده ليعودن فيكم كما بدأ الحمد لله الذى حقن دماءكم وأحـرز دينكـم! من أحب منكم أن يأتي مأمنه إلى بلده آمنا محفوظا فلينفعل.

"আল্লাহ সকল কাজ ও বিষয়ের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক। তিনি যা চান তাই হয়, আর যা না চান তা হয় না। যা কিছু হওয়ার তা অবশ্যই হবে। আপনারা খিলাফাতের ব্যাপারে সময়ের পূর্বেই খুব তাড়াহুড়ো করেছেন। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! আমাদের পশ্চাতে এমন সব জীবন উৎসর্গকারী মানুষ আছে যারা মুহাম্মাদ (সা)-এর বংশধরদের সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করবে। মুহাম্মাদ (সা)-এর বংশধরদের অধিকার অংশীবাদীদের জন্য ঢাকা থাকবে না। দেরীতে হলেও পূরণ হবে। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতের মুঠোয় আমার জীবন! যেভাবে এ খিলাফাত তোমাদের মধ্যে ছিল, একদিন আবার তোমাদের মধ্যে ফিরে আসবে। সেই আল্লাহর শোকর যিনি আপনাদের জীবন বাঁচিয়েছেন এবং আপনাদের দীনের হিফাযাত করেছেন। আপনাদের মধ্যে যারা নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে নিজ নিজ শহর ও আবাসস্থলে ফিরে যেতে পারবেন বলে মনে করেন, তারা যেতে পারেন।"

এই অনুমতির পর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার অধিকাংশ সঙ্গী চলে যায়। সাত হাজারে মধ্যে মাত্র নয় শো থেকে যায়। তাদেরকে সংগে নিয়ে তিনি মক্কায় ফিরে যান।[৪১]

আয়লা থেকে ফিরে আসার পর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার অবস্থা সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা এ রকম যে, তখন ছিল হজ্জের মওসুম। এ কারণে তিনি 'উমরার নিয়্যাতে ইহরাম বাঁধেন এবং কুরবানীর পশু সংগে নিয়ে সোজা মক্কায় পৌঁছেন। কিন্তু যখন হারামে প্রবেশ করতে যাবেন তখন 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) অশ্বারোহী সৈনিকরা বাধা দেয়। তিনি ইবন আয-যুবাইরের (রা) নিকট এ বার্তা পাঠান যে, আমি মক্কা থেকে যাওয়ার সময়ও যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হইনি এবং এখন ফেরার পরেও সে ইচ্ছা নেই। এ কারণে আমাদের পথ ছেড়ে দিন, আমরা বাইতুল্লাহ-তে যেয়ে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করি। হজ্জ আদায়ের পর আমরা এখান থেকে চলে যাব। কিন্তু ইবন আয-যুবাইর (রা) তাঁকে বায়তুল্লাহ'-য় যাওয়ার অনুমতি দেননি। তাই তিনি কুরবানীর পশুসহ মদীনায় চলে যান এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি মক্কায় পৌঁছে তাঁর মিনার শিবিরে অবস্থান নেন।

---

৪১. প্রাগুক্ত-৫/১০৯

দু'দিন পরেই ইবন আয-যুবাইর (রা) তাঁকে এ বার্তা পাঠান যে, এখান থেকে সরে যান, আমাদের কাছাকাছি থাকবেন না। এ বার্তা পেয়ে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা মন্তব্য করেন : 'যতক্ষণ আল্লাহ্ আমাদের জন্য কোন উপায় বের করে না দেন ততক্ষণ আমরা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক ধৈর্যধারণ করবো। আল্লাহর কসম! আমি এখনো পর্যন্ত তরবারি উঠানোর ইচ্ছা করিনি। যদি আমি তরবারি উঠাতাম তাহলে আমি একা হলেও এবং তাঁর সাথে তাঁর পুরো দল থাকলেও তিনি এভাবে আমার সাথে খেলতে পারতেন না। কিন্তু আমি তরবারি উঠাতে চাই না। ইবন আয-যুবাইর (রা) প্রতিবেশীকে দুঃখ দান থেকে বিরত হবেন না।" এরপর তিনি তায়িফ চলে যান। এর কয়েক মাস পরেই হিজরী ৭২ সনে যুল কা'দা মাসে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ মক্কা অবরোধ করে এবং ইবন আয-যুবাইরকে তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ নির্মমভাবে হত্যা করে।[৪২]

আরেকটি বর্ণনা এ রকমও আছে যে, হাজ্জাজ কর্তৃক 'আবদুল্লাহ্ ইবন আয-যুবাইর (রা) অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা মক্কাতেই ছিলেন। হাজ্জাজ তাঁর কাছেও 'আবদুল মালিকের বাই'আতের জন্য বার্তা পাঠায়। জবাবে তিনি হাজ্জাজকে বলে পাঠান : আমার মক্কায় অবস্থান, তায়িফ ও শাম সফরের অবস্থা আপনার জানা আছে। সব রকমের কষ্ট আমি এজন্য সহ্য করছি যে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কারো হাতে বাই'আত করতে চাই না যতক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের কোন একজনের ব্যাপারে জনগণ ঐকমত্যে না পৌঁছে। আমার মধ্যে বিরুদ্ধাচরণের কোন প্রেরণা নেই। কিন্তু আমি যখন দেখেছি খিলাফাতের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে মত পার্থক্য আছে তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যতক্ষণ সকলে কোন একজনের ব্যাপারে একমত না হবে ততক্ষণ এই বিষয় থেকে দূরে থাকবো। আল্লাহর এই শহরে, যার সম্মান ও মর্যাদা সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক, যেখানে একটি পাখীও নিরাপদ, সেখানে আমি আশ্রয় নিয়েছি। ইবন আয-যুবাইর (রা) আমার সাথে সদাচরণ করেননি, তাই আমি শামে চলে যাই। কিন্তু সেখানে 'আবদুল মালিকও আমার নৈকট্য চাননি। এ কারণে আমি আবার মক্কার হারামে চলে এসেছি। এখন যদি ইবন আয-যুবাইর (রা) নিহত হন এবং 'আবদুল মালিকের খিলাফাতের ব্যাপারে সকল মুসলমান একমত হয়ে যায় তাহলে আমি আপনার হাতে বাই'আত করে নিব। কিন্তু হাজ্জাজ বাই'আতের ব্যাপারে অপেক্ষা করতে মোটেই রাজী ছিলেন না। তিনি বার বার চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন, আর ইবন আল-হানাফিয়্যাও কোন না কোনভাবে এড়িয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে 'আবদুল্লাহ্ ইবন আয-যুবাইর (রা) নিহত হলেন। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার ছেলে হাসান বলেন :

لم يبايع أبى الحجاج.

"আমার পিতা হাজ্জাজের বাই'আত করেননি।"[৪৩]

---

৪২. প্রাগুক্ত

৪৩. প্রাগুক্ত--৫/১১০

'আবদুল মালিকের অনুকূলে বাই'আত

'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) নিহত হওয়ার পর 'আবদুল মালিক হাজ্জাজকে লিখলেন যে, "মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার মধ্যে বিরোধিতার কোন মানসিকতা নেই। তাই আশা করা যায় এখন তিনি তোমার কাছে এসে বাই'আত করে নিবেন। তাঁর সাথে নম্র ব্যবহার কর।" মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা নিজেও প্রথম থেকে বলে আসছিলেন যে, যখন কোন এক ব্যক্তির ব্যাপারে মুসলমানদের ঐকমত্য হয়ে যাবে তখন আমি তাঁকে মেনে নিব। অতএব 'আবদুল মালিকের ব্যাপারে সকলে একমত হওয়ার পর যখন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) তাঁর বাই'আত করেন তখন তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে বলেন, এখন তো বিষয়টি আর অমীমাংসিত নয়। সুতরাং আপনিও বাই'আত করে নিন। পূর্বেই এ ব্যাপারে তিনি সিদ্ধান্তে এসে গিয়েছিলেন, তাই এখন হাজ্জাজের হাতে বাই'আত করে খলীফা 'আবদুল মালিককে নিম্নের পত্রটি লেখেন :[৪৪]

بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من محمد بن علي أما بعد فاني لما رأيت الأمة قد اختلفت اعتزلتهم، فلما افضى هذا الأمر إليك و بايعك الناس كنت كرجل منهم أدخل في صالح ما دخلوا فيه، فقد بايعتك وبايعت الحجاج لك بعثت إليك ببيعتي، ورأيت الناس قد اجتمعوا عليك، ونحن نحب أن تؤمننا وتعطينا ميثاقا على الوفاء فإن العذر لاخير فيه، فإن أبيت فإن أرض الله واسعة.

"অতঃপর এই যে, সেই সময় যখন উম্মাতের মধ্যে খলীফার ব্যাপারে মত বিরোধ ছিল, আমি মানুষের থেকে দূরে ছিলাম। এখন, যখন আপনি খিলাফাত পেয়ে গেছেন এবং মুসলমানরাও আপনার বাই'আত করেছে, তখন আমিও এই দলে মিশে গেলাম। তারা যে কল্যাণের মধ্যে প্রবেশ করেছে আমিও তাতে প্রবেশ করলাম। আমি হাজ্জাজের হাতে আপনার বাই'আত করেছি এবং এখন এই লিখিত বাই'আত আপনাকে পাঠাচ্ছি। কারণ, আপনার খিলাফাতের ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা' হয়ে গেছে। এখন আমি চাই, আপনি মানুষকে নিরাপত্তা ও অঙ্গীকার পূরণের আশ্বাস দিন। প্রতারণার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। আর যদি এখনো আপনার মধ্যে দ্বিধা-সংশয় থাকে, অথবা থাকে অস্বীকৃতি, তাহলে জেনে রাখুন আল্লাহর এই যমীন খুবই প্রশস্ত।"

এ পত্র পাওয়ার পর 'আবদুল মালিক তাঁর বিশেষ উপদেষ্টা কুবায়সা ইবন যুওয়াইব ও রাও'উ ইবন যানবা' জুযামীর সংগে পরামর্শ করেন। তাঁরা বলেন : 'মুহাম্মাদ ইবন আল-

---

৪৪. প্রাগুক্ত-৫/১১১

হানাফিয়্যার উপর আজও আপনার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তিনি যখন ইচ্ছা তখন সংঘাত-সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারেন। এমতাবস্থায় তিনি যখন আপনার খিলাফাত মেনে নিয়ে বাই'আত করেছেন, তখন আমাদের পরামর্শ হলো, আপনি এক্ষুণি তাঁকে জান-মালের নিরাপত্তার অঙ্গীকার পত্র লিখে পাঠিয়ে দিন। সেই সাথে তাঁর সংগী-সাথীদের ব্যাপারেও তাঁর অঙ্গীকার আদায় করে নিন। তাঁদের এ পরামর্শের পর 'আবদুল মালিক যে পত্রটি লেখেন তা নিম্নরূপ :

"এখন আপনি আমার নিকট একজন প্রশংসা পাওয়ারযোগ্য, সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং ইবন আয-যুবাইরের (রা) চেয়েও অধিকতর নিকটতম ব্যক্তিত্ব। এ কারণে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে হাজির-নাজির জেনে অঙ্গীকার করছি যে, আপনাকে এবং আপনার সংগী-সাথীদের কাউকে এমন আচরণ ও কর্মের দ্বারা অস্থির করা হবে না যা আপনি মোটেই পছন্দ করেন না। আপনি আপনার নিজ শহরে ফিরে যান এবং যেখানে ইচ্ছা নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে অবস্থান করুন। আমি যতদিন জীবিত থাকবো আপনার এই প্রীতি ও শুভেচ্ছার কথা ভুলবো না এবং আপনাকে সাহায্যের ব্যাপারে কোন রকম কার্পণ্য করবো না।" এই পত্রের সাথে হাজ্জাজকেও একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি হাজ্জাজকে ইবন আল-হানাফিয়্যার সাথে সদাচরণের এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেন। এই আনন্দদায়ক সন্ধি ও সমঝোতার পর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা মদীনায় ফিরে যান এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সেখানে বসবাসের সুযোগ লাভ করেন।[৪৫]

শাম গমন ও 'আবদুল মালিকের সদাচরণ

কয়েক বছর পর মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা 'আবদুল মালিকের সাক্ষাৎ কামনা করে একটি পত্র লেখেন। তিনি সানন্দে তা মঞ্জুর করেন। সুতরাং মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা হিজরী ৭৮ সনে শাম সফর করেন। 'আবদুল মালিক হৃষ্টচিত্তে তাঁকে স্বাগতম জানান এবং তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক স্বীয় মহলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সঙ্গী-সাথীদের আতিথেয়তার জন্য শাহী ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। এক মাসেরও কিছু বেশি সময় তিনি দিমাশকে অবস্থান করেন। এ সময়ে মাঝে মাঝে তিনি 'আবদুল মালিকের সাথে মিলিত হতেন। দরবারে প্রবেশের ক্ষেত্রে শাহী খান্দানের লোকদের পরেই ছিল তাঁর স্থান। একদিন নিরিবিলিতে তিনি 'আবদুল মালিককে তাঁর মোটা অংকের ঋণের কথা বলেন। 'আবদুল মালিক তা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাঁর আরো কোন প্রয়োজন আছে কিনা তা জানতে চান। তিনি ঋণ পরিশোধ, আরো কিছু প্রয়োজন এবং নিজের সন্তানাদি, সঙ্গী-সাথী, চাকর-বাকর ও দাস-দাসীদের ভাতা নির্ধারণের কথাও তাঁকে বলেন। 'আবদুল মালিক দাস-দাসীদের ভাতা ছাড়া অন্য সকল প্রয়োজন ও দাবী পূরণ করেন। তারপর তাঁর একান্ত পীড়াপীড়িতে দাস-দাসীদের ভাতাও

৪৫. প্রাগুক্ত; তাবি'ঈন-৪২৪

নির্ধারণ করেন। তবে তাদের পরিমাণ কম রাখেন। শেষ পর্যন্ত ইবন আল-হানাফিয়্যার অত্যধিক চাপে 'আবদুল মালিক তাদেরও ভাতা বাড়িয়ে দেন। তিনি তাঁর সকল দাবী ও প্রয়োজন পূরণের প্রতিশ্রুতি আদায় করে মদীনায় ফেরেন। মৃত্যু পর্যন্ত খলীফা 'আবদুল মালিকের সাথে তাঁর এ সম্পর্ক অটুট ছিল।

মৃত্যু

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার মৃত্যু সন ও স্থান নিয়ে বিস্তর মত পার্থক্য আছে। সঠিক মতে তিনি হিজরী ৮১, খৃস্টাব্দ ৭০০ সনে মদীনায় ইনতিকাল করেন এবং বাকী' গোরস্তানে দাফন করা হয়। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইবন আয-যুবাইরের হাত থেকে বাঁচার জন্য কূফায় পালিয়ে যান এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন। তবে শী'আদের একটি উপদল কায়সানিয়্যা মনে করে, তিনি জীবিত আছেন, মৃত্যু বরণ করেননি।[৪৬]

পূর্ববর্তী বর্ণনার উপর একটি পর্যালোচনা

পূর্বে যা কিছু উপস্থাপন করা হয়েছে তা কেবল ইতিহাসের আলোকে তাঁর জীবনের ঘটনাগুলো তুলে ধরা হয়েছে। কোন রকম পর্যালোচনা করা হয়নি। কিন্তু এমন অনেক ঘটনা ও বিষয় আছে যা পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। অন্যথায় পূর্বে উল্লেখিত ঘটনাবলীর অনেকটা ইবন আল-হানাফিয়্যার জীবন চিত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। এখানে কয়েকটি ঘটনার কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

হযরত ইমাম হুসাইনের (রা) প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন হযরত ইমাম যাইনুল 'আবিদীন (রহ)। কিন্তু তিনি তাঁর পিতার শাহাদাতের পর পার্থিব ভোগ-বিলাস ও চাকচিক্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েন এবং ইমামত ও খিলাফাতের বিবাদ থেকে নিজেকে সযত্নে সম্পূর্ণ দূরে রাখেন। 'আলীর (রা) অনুসারীরা তাঁকে বহু ক্ষেত্রে টেনে আনতে চায়। কিন্তু তিনি এতো দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলেন যে কারো কোন আহ্বানে কখনো ঘরের বাইরে পা রাখেননি। তাঁর থেকে হতাশ হয়ে 'আলীর (রা) অনুসারীরা ইবন আল-হানাফিয়্যার কাঁধে এই কঠিন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়। এ কারণে খিলাফাত, ইমামত, আহলি বায়ত ও গায়র আহলি বায়তের প্রশ্ন এবং এর থেকে উদ্ভব বিভিন্ন 'আকীদা, চিন্তা-ভাবনা ও মাসয়ালা ইবন আল-হানাফিয়্যার ব্যক্তি সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় ইবন আল-হানাফিয়্যা এমন কিছু কাজ করেছেন এবং এমন কিছু 'আকীদা ও চিন্তা-ভাবনা তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে তাঁর নয়। এসব বিষয় পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে।

শী'আ আন্দোলন এবং আহলি বায়ত ও গায়র আহলি বায়ত (নবী পরিবার-নবী পরিবারের বাইরের লোক) ইত্যাদি বিষয়ের ভিত্তি পুরোটাই প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার উপর। এই দল নিজেদের আন্দোলন এবং উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এমন বহু 'আকীদা ও চিন্তা আহলি বায়তের প্রতি আরোপ করেছে। এ কারণে তিনি খিলাফাতের প্রতি দারুণ লোভী

---

৪৬. আত-তাবাকাত-৫/১১২; আল-আ'লাম-৬/২৭০; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩১৯

বলে চিত্রিত হয়েছেন। এর মধ্যে কিছু চিন্তা এমন আছে যা নিতান্তই বিভ্রান্তিকর, যা মানুষকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। এসব কথা ও চিন্তা যদি ঐ সকল মহান ব্যক্তির জীবদ্দশায় প্রকাশ পেত অথবা তাঁরা যদি অবগত হতেন তাহলে তার উদ্ভাবক ও প্রচারকদেরকে নিজেদের দল থেকে বের করে দিতেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, "ইসলামী খিলাফাত" যখন পার্থিব অন্যসব রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপ ধারণ করে তখন আহলি বায়তের মধ্যে খিলাফাত লাভ করার প্রেরণা অবশ্যই সৃষ্টি হয়েছে। অনেকাংশে তা সঠিকও ছিল। কারণ ইসলামী খিলাফাত ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যতক্ষণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর থাকে। ঠিক তেমনি তা গণতান্ত্রিক হবে যখন তা খিলাফাত থাকে। ব্যক্তি ও বংশগত রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপ লাভ করার পর তার দীনী অবস্থান আর অবশিষ্ট থাকে না। সে সময় যদি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতার উত্তরাধিকারীদের অন্তরে তা লাভ করার প্রেরণা সৃষ্টি হয়, অথবা কোন দল তাদের সাহায্যের জন্য উঠে দাঁড়ায় তাহলে তা দোষের কিছু হতে পারে না। কিন্তু আহলি বায়তের প্রেমিক ও সমর্থক বলে দাবীদারগণ ভ্রান্ত 'আকীদা বিশ্বাস আবিষ্কার করে ঐসব মহান ব্যক্তির প্রতি আরোপ করেছে। আসলে তারা ঐসব কথা ও বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা ছিলেন এমন একজন মহান তাওহীদবাদীর ('আলী রা.) বংশধর যিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণকারীদেরকে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে জ্বালিয়ে দেন। এ কারণে ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা তিনি কলুষিত হতেই পারেন না। এ ধরনের ভ্রান্ত কথা-বার্তা ও চিন্তা-ভাবনার কথা যখন তাঁর কানে আসতো, তিনি তা শক্তভাবে অস্বীকার করতেন। একবার তিনি জানতে পারলেন, মুখতারের অনুসারীরা প্রচার করছে যে, ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট কুরআন ছাড়াও অন্তরঙ্গ জ্ঞানের একটি অংশ আছে। একথা শুনে তিনি বিশেষভাবে একটি ভাষণ দেন। তিনি বলেন : "আল্লাহর কসম! এই গ্রন্থ ছাড়া অর্থাৎ কুরআন ছাড়া উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আর কোন জ্ঞান পাইনি।"

তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল অনেকে তাঁকে মাহদী বলে সালাম করতো। বলতো : সালামুন 'আলাইকা ইয়া মাহদী! জবাবে তিনি বলতেন, এই অর্থে আমি অবশ্যই মাহদী যে, আমি মানুষকে ভালো ও কল্যাণের পথ দেখাই। কিন্তু আমার নাম আল্লাহর নবীর নামে এবং আমার কুনিয়াত বা উপনাম নবীর কুনিয়াতের উপরে। এ কারণে তোমরা যখন সালাম করবে তখন মাহদীর পরিবর্তে বলবে : আস-সালামু 'আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ, অথবা আস-সালামু 'আলাইকা ইয়া আবাল কাসিম।

সাধারণ মানুষ কুরাইশ বংশের দু'টি শাখা-বানূ হাশিম ও বানূ উমাইয়্যার মর্যাদা পূজা-উপাসনার সীমা পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল। একটির ভিত্তি ছিল পার্থিব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এবং অন্যটির ছিল দীনী নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা এটাকে খুবই অপছন্দ করতেন। তিনি বলতেন :

أهل بيتين من العرب يتخذهما الناس أندادا مـن دون الله، نحـن وبنـو عمنـا هـؤلاء

يعني بني أمية.

"আমাদের কুরাইশ গোত্রের দু'টি শাখা– আমরা আহলি বায়ত ও বানূ উমাইয়্যাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে ফেলা হয়েছে।"

কোন কোন উপদল 'আলীকে (রা) আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দেয়। কিন্তু ইবন আল-হানাফিয়্যা তাঁকে একজন আল্লাহর বান্দা হিসেবেই দেখতেন। তিনি বলতেন :

ما أشهد على أحد بالنجاة ولأنه مـن أهـل الجنـة بعـد رسـول الله صلـى الله عليـه

وسلم، ولا على أبي ولدني. قال فنظر القوم إليه، قال : مـن كـان فـي النـاس مثـل

علي سبق له كذا سبق له كذا؟

"আমি রাসূলুল্লাহর (সা) পরে কোন মানুষের নাজাত ও তার জান্নাতী হওয়ার নিশ্চিত সাক্ষ্য দিতে পারিনে। এমনকি আমার পিতা 'আলী (রা) সম্পর্কেও, যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, নিশ্চিতভাবে বলতে পারিনে তিনি জান্নাতী।"[৪৭]

মুখতার আছ-ছাকাফীর পৃষ্ঠপোষকতার কারণ

একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার 'আকীদা বিশুদ্ধ ইসলামী 'আকীদার পরিপন্থী ছিল না। মুখতার আছ-ছাকাফীর প্রতারণার ফাঁদে আটকে যাওয়া বাহ্যত অগ্রহণযোগ্য মনে হয়। কিন্তু এটা ছিল মানব স্বভাবের দাবী। হযরত মু'আবিয়া (রা) আজীবন আহলি বায়তের অধিকার ও মর্যাদার প্রতি সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরে ইয়াযীদ থেকে নিয়ে 'আবদুল মালিকের সময় পর্যন্ত এই পরিবারের মহান ব্যক্তিবর্গের সাথে উমাইয়্যা খলীফাগণ যে আচরণ করেছেন তা খুবই নিষ্ঠুর ও অবমাননাকর। ইমাম হুসাইন (রা) ও নবী পরিবারের সকল সদস্যকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়, যা গোটা উমাইয়া শাসনের উপর এমন কলঙ্ক লেপন করেছে যা মোটেই উঠার নয়। এ অবস্থায় কেবল মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা নন, বরং বানূ হাশিমের সকল সদস্যের অন্তর উমাইয়্যাদের উপর ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। এছাড়া 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) ভীতি তাদের মাথার উপর চেপে বসেছিল। এমতাবস্থায় মুখতার ইমাম হুসাইনের রক্তের বদলা নেওয়ার দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ান এবং হুসাইনের (রা) হত্যাকারীদের তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে হত্যা করেন। তিনি বানূ উমাইয়্যা ও 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) মুকাবিলা করার জন্য মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যাকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করেন। এরূপ অবস্থায় যদি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা মানব স্বভাব অনুযায়ী অথবা অন্য কোন কল্যাণ চিন্তায় তাঁর দ্বারা প্রভাবিত

---

৪৭. আত-তাবাকাত-৫/৯৪; তাবি'ঈন-৪২৮

হয়ে থাকেন তাতে তেমন দোষের কিছু আছে বলে মনে হয় না। তারপরেও তিনি মুখতারকে কখনো বিশ্বাস করেননি। তাঁকে কার্যসিদ্ধির একটি হাতিয়ারের বেশি কিছু ভাবেননি। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় এসেছে যে, যখন মুখতার মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট ইরাক যাওয়ার অনুমতি চান তখন তিনি অনুমতি দেন। তবে তাঁর প্রতি বিশ্বাস না থাকায় 'আবদুল্লাহ ইবন কামিল হামাদানীকে তাঁর সাথে দিয়ে দেন। তাকে একথাও বলে দেন যে, মুখতার তেমন আস্থাভাজন ব্যক্তি নয়। অতএব তার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। অথবা যখন 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইরের (রা) পক্ষ থেকে তাঁর ভাই 'উরওয়া আসেন মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট বার্তা নিয়ে তখন তিনি 'উরওয়াকে বলেন, আমি না মুখতারকে আমার প্রচারক হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম, না সাহায্যকারী হিসেবে, অথবা যখন মুখতারের কথা ও বক্তৃতা-ভাষণে কিছু ইরাকীর সন্দেহ হয় এবং তারা তাঁর কথার সত্যতা যাঁচাইয়ের জন্য মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার নিকট যায় তখন তিনি তাদেরকে বলেন : এটা আমরা পছন্দ করি যে, আল্লাহ তার যে বান্দা দ্বারা চেয়েছেন, আমাদের সাহায্য করেছেন। তবে তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের থেকে সতর্ক থাকবে এবং তাদের থেকে নিজেদের জীবন ও নিজেদের দীনের হিফাযাত করবে।[৪৮]

তবে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার মধ্যে গোত্রীয় টান ও খিলাফাত লাভের সহজাত প্রবণতা অবশ্যই ছিল। আর এই প্রবণতাকে উসকে দেওয়ার পিছনে কাজ করে বানূ উমাইয়্যাদের লাগামহীন আচরণ ও স্বৈরাচারী কর্মপদ্ধতি। 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) ও 'আবদুল মালিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার উপর 'আবদুল্লাহর (রা) বাড়াবাড়িমূলক শক্তি প্রয়োগ এই প্রবণতাকে আরো শক্ত ও চাঙ্গা করে দেয়। কিন্তু তার জন্য বাস্তবে তিনি কোন চেষ্টা করেননি। বরং সব সময় একথাই বলতে থাকেন যে, আমি খিলাফাত অবশ্যই চাই। তবে তা এ অবস্থায় যে, তাতে একজন মুসলমানও ভিন্নমত পোষণ করবে না। উমাইয়্যাদের বিপরীতে তাঁর এ অবস্থান কোনভাবেই অসঙ্গত ও অযৌক্তিক বলা যাবে না।

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার অনুসারী একটি দল

যদিও মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা শী'আ সম্প্রদায়ের "ইছনা 'আশরিয়া" উপ-দলের ইমাম নন এবং তাঁদের সকল ইমাম নবী দুহিতা হযরত ফাতিমার (রা) বংশধর, তথাপি শী'আদের একটি উপ-দল হযরত হুসাইনের (রা) পরে তাঁকেই ইমাম বলে মানে। এই দলটির নাম "কায়সানিয়া"। তারা বিশ্বাস করে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা মৃত্যু বরণ করেননি, বরং তিনি তাঁর চল্লিশজন ভক্ত-অনুসারীসহ মদীনা থেকে সাত দিনের দূরত্বে "রিদাবী" পাহাড়ে গমন করেন এবং এখনো সেখানে বিদ্যমান আছেন। একটি বাঘ ও একটি চিতা তাঁদেরকে পাহারা দিচ্ছে এবং তাঁদের পিপাসা নিবৃত্তির জন্য একটি মধু ও

---

৪৮. প্রাগুক্ত-৫/৯৯, ১০৬

একটি পানির ঝর্ণা প্রবাহমান আছে। এই নির্জন স্থানে আল্লাহ তাঁদের খাদ্য সরবরাহ করেন। একদিন তিনি এ পৃথিবীতে ফিরে আসবেন এবং আদল-ইনসাফে পূর্ণ করে দেবেন। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার পরে তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[৪৯]

এই "কায়সানিয়্যা" সম্প্রদায়ের জন্ম কূফায় মুখতার আছ-ছাকাফীর পৃষ্ঠপোষকতায়। তাদের বিশ্বাসের মূল কথা হলো, পিতা 'আলীর (রা) পরে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা হলেন ইমাম। তাদের বিশ্বাস মতে তাদের ইমামগণ আল্লাহর জ্ঞানের অধিকারী হন, তাই ইবন আল-হানাফিয়্যাও এ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দু'ভাই আল-হাসান ও আল-হুসাইন (রা) তাঁকে গূঢ় রহস্যের জ্ঞান দেন এবং ব্যাখ্যা ও বাতিনী জ্ঞানও দান করেন।[৫০] তাদের একটি শাখা বিশ্বাস করে যে, 'আলী, আল-হাসান ও আল-হুসাইন (রা) ও ইবন আল-হানাফিয়্যা (রহ) সকলে নবী। তারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে। সুতরাং ইবন আল-হানাফিয়্যা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। তবে তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মত পার্থক্য আছে যে, তিনি পিতা 'আলীর (রা) মৃত্যুর পর সরাসরি উত্তরাধিকার সূত্রে ইমাম হন, না তাঁর দু'ভাই আল-হাসান ও আল-হুসাইনের (রা) মাধ্যমে হন? আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবন মূসা আন-নাওবাখতী (২৩২/৮১৭) বলেন :[৫১]

وفرق قالت بإمامة محمد بن الحنفية، لأنه كان صاحب راية أبيه يوم البصرة دون أخويه، وداعى (المختار) أن محمد بن الحنفية أمره بذلك وأنه الإمام بعد أبيه، وكان يقول إن محمد بن الحنفية وصى علي بن أبي طالب، وأنه الإمام المختار قيمه وعامله.

"কয়েকটি উপদল মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার ইমামতের কথা বলে। কারণ বসরার যুদ্ধের দিন (উটের যুদ্ধ) তাঁর দু'ভাই নন, তিনিই তাঁর পিতার ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন। আল-মুখতার দাবী করেন, তিনি যে তাঁর পিতার পরে ইমাম, সে কথা বলতে তিনি তাকে আদেশ করেছেন। আল-মুখতার একথাও বলতেন যে, মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা 'আলী (রা) ইবন আবী তালিবের অছি, তাঁর নির্বাচিত ইমাম, দায়িত্বশীল ও শাসক।"

আশ-শাহ্‌রাস্তানী বলেন, প্রাচীন পারস্যের অগ্নি উপাসক, ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্যবাদ, প্রাচীন কালের দার্শনিক ও মূর্তি পূজকদের চিন্তা দর্শনের উপর ভিত্তি করে কায়সানিয়্যারা তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে।[৫২]

---

৪৯. ওয়াফাইয়াত আল-আ'য়ান-১/৪৫; ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখ আল-ইসলাম-১/৪০৫

৫০. আশ-শাহ্‌রাস্তানী, কিতাব আল-মিলাল ওয়া আন-নিহাল-২/১৯৬-১৯৮

৫১. কিতাবু ফিরাক আশ-শী'আ-২০-২১

৫২. আল-মিলাল ওয়া আন-নিহাল-২০২

জ্ঞান ও বিজ্ঞতা

মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা ছিলেন হযরত 'আলীর (রা) মত জ্ঞানের সাগরতুল্য পিতার সন্তান। এ কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে জ্ঞানের ঐশ্বর্য লাভ করেন। ইবন সা'দ লিখেছেন :[৫৩]

"তিনি একজন বড় জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।" ইবন হিব্বান তাঁকে তাঁর বংশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৫৪]

কিন্তু তাঁর জ্ঞানের বিস্তারিত বিবরণ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তিনি বলতেন :[৫৫]

الحسن والحسين أفضل مني وأنا أعلم منهما.

"হাসান ও হুসাইন আমার চেয়ে উত্তম। তবে আমি তাঁদের চেয়ে বেশি জানি।"

হাদীস

হাদীসের জ্ঞান তিনি লাভ করেন তাঁর সম্মানিত পিতা 'আলীর (রা) নিকট থেকে। তাছাড়া আর যাঁদের নিকট থেকে এ জ্ঞান অর্জন করেন তাঁরা হলেন : 'উসমান ইবন 'আফফান, 'আম্মার ইবন ইয়াসির, মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান, আবূ হুরাইরা ও 'আবদুল্লাহ ইবন আল-'আব্বাস (রা)। অনেক মুহাদ্দিছের মতে তাঁর সূত্রে বর্ণিত হযরত 'আলীর (রা) হাদীছগুলির সনদই সর্বাধিক শক্তিশালী।[৫৬]

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের পরিধি অনেক বিস্তৃত। তাঁর চার পুত্র : ইবরাহীম, হাসান, 'আবদুল্লাহ ও 'আওন; ভাতিজা মুহাম্মাদ ইবন 'উমার ইবন 'আলী (রা), ভাইয়ের পৌত্র মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন হাসান (রা), ভাগিনা 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আকীল এবং অন্যদের মধ্যে 'আতা' ইবন আবী রাবাহ, মিনহাল ইবন 'আমর, মুহাম্মাদ ইবন কায়স ইবন মাখরামা, মুনযির ইবন ইয়া'লা, মুহাম্মাদ ইবন বাশীর হামাদানী, সালিম ইবন আবী আল-জা'দ ও 'আমর ইবন দীনার তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে উদারভাবে গ্রহণ করেন।[৫৭]

মূল্যবান উক্তি

তাঁর কিছু মূল্যবান উক্তি সূক্ষ্ম ভাব সমৃদ্ধ ও শিক্ষাপ্রদ। তিনি বলতেন : "যার অন্তর তার নিজের দৃষ্টিতে সম্মানিত তার দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোন মূল্যই থাকে না। যে ব্যক্তি তার জীবন যাপনে সঙ্গীদের সাথে মানিয়ে চলতে পারে না সে বুদ্ধিমান নয়। আল্লাহ জান্নাতকে তোমাদের প্রাণের বিনিময়ে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং অন্য কোন

---

৫৩. আত-তাবাকাত-৫/৯৪

৫৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩১৬

৫৫. আল-আ'লাম-৬/২৭০

৫৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩১৫

৫৭. প্রাগুক্ত; ড. হাসান ইবরাহীম হাসান-১/২৫৩

কিছুর বিনিময়ে তা বিক্রি করো না। যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না তা ব্যর্থ হয়ে যায়।"[৫৮]

'ইবাদাত-বন্দেগী

তিনি যেমন একজন বড় মাপের 'আলিম ছিলেন তেমনি ছিলেন একজন বড় 'আবিদ ব্যক্তি। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি ছিলেন একেবারেই উদাসীন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন, তিনি 'ইলম ও ইবাদাত দুটিতেই ছিলেন চূড়ান্ত পর্যায়ের মানুষ।[৫৯]

মায়ের খিদমত

তিনি মায়ের খিদমতে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। নিজ হাতে তাঁর চুলে খিজাব লাগাতেন, চিরুনী করতেন ও খোপা বাঁধতেন। একদিন ঘর থেকে বেরিয়ে মানুষের সামনে এলে দেখা গেল তাঁর হাতে মেহেদীর ছাপ। একজনের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, আমি মায়ের চুলে খিজাব লাগাচ্ছিলাম।[৬০]

দৈহিক শক্তি ও সাহস

আসাদুল্লাহ আল-গালিব 'আলীর (রা) যথার্থ উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি। 'ইলমের সাথে শক্তি ও সাহসও উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। এত শক্তিশালী ছিলেন যে, লৌহ বর্ম দু'হাতে ধরে ফেঁড়ে ফেলতেন। হযরত 'আলীর (রা) একটি বর্ম একটু লম্বা ছিল। একদিন তিনি বর্মটি মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার হাতে দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, এই বেশি অংশটুকু কম করে দাও। তিনি এক হাতে বর্মটি ধরে অন্য হাতে বেশি অংশটুকু ধরে এক টানে দু'টুকরো করে ফেলেন। দৈহিক শক্তিতে 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর (রা) ছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষ। একথা তাঁর সামনে কেউ উঠালে তিনি রাগে কাঁপতে থাকতেন। আল্লামা যিরিক্‌লী তাঁর শক্তি ও সাহসের কথা বলেছেন এভাবে :[৬১]

أحد الأبطال الأشداء فى صدر الاسلام.

"ইসলামের প্রাথমিক যুগের একজন শক্ত-কঠিন বীর।"

أخبار قوته وشجاعته كثيرة.

"তাঁর শক্তি ও বীরত্বের কাহিনী অনেক।"

একবার রোমান সম্রাট খলীফা হযরত মু'আবিয়াকে (রা) লিখলেন, আমাদের এখানকার রাজা-বাদশারা বিভিন্ন জিনিস আদান-প্রদান করেন এবং প্রত্যেকে তার নিজ নিজ দেশের অভিনব ও বিস্ময়কর জিনিস পাঠিয়ে অন্যকে অভিভূত ও বিস্মিত করে থাকেন এবং

---

৫৮. মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়া-১৩২

৫৯. শাযারাত আয-যাহাব-১/৮৯

৬০. আত-তাবাকাত-৫/৮৮

৬১. আল-আ'লাম-৬/২৭০

গৌরব বোধও করেন। আপনার অনুমতি পেলে আমরাও তেমন আদান-প্রদান করতে পারি। হযরত মু'আবিয়া (রা) সম্মতি জানিয়ে তাঁকে তেমন কিছু পাঠানোর অনুমতি দেন। রোমান সম্রাট বিস্ময়কর দু'জন পুরুষ মানুষ মু'আবিয়ার (রা) নিকট পাঠান। তাদের একজন ছিল অত্যধিক লম্বা ও অত্যধিক মোটা। যেন জঙ্গলের কোন সুউচ্চ বৃক্ষ অথবা বিশাল আকৃতির কোন অট্টালিকা।

অন্যজন ছিল অত্যধিক শক্তিশালী এবং পাথরের মত শক্ত ও কঠিন। যেন একটা হিংস্র জন্তু। তাদের সাথে পাঠানো একটি পত্রে তিনি বলেন, আপনার সাম্রাজ্যে লম্বায় ও শক্তিতে এ দু'ব্যক্তির সমকক্ষ কেউ আছে কি? মু'আবিয়া (রা) 'আমর ইবন আল-'আসকে (রা) বললেন : লম্বায় তার মত একজনকে পেয়েছি, বরং তার চেয়ে একটু বেশি লম্বা হবে। আর সে হলো কায়স ইবন সা'দ ইবন 'উবাদা। তবে শক্তিমান ব্যক্তিটির ব্যাপারে আমি আপনার মতামত কামনা করছি।

'আমর বললেন : এই ব্যাপারটির জন্য দু'জন উপযুক্ত মানুষ আছেন। তবে দু'জনই এখন আপনার থেকে দূরে আছেন। তাঁরা হলেন 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর ও মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা (রা)।

মু'আবিয়া (রা) বললেন : মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা দূরে নয়, কাছেই আছেন।

'আমর বললেন : আপনি কি মনে করেন তাঁর মত মর্যাদাবান ব্যক্তি এভাবে প্রকাশ্যে মানুষের সামনে একজন রোমানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রাজী হবেন? মু'আবিয়া (রা) বললেন : তিনি যদি দেখেন এতে ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে তাহলে শুধু এতটুকু নয়, বরং এর চেয়ে বেশি করবেন।

হযরত মু'আবিয়া (রা) কায়স ইবন সা'দ ও মুহাম্মাদ উভয়কে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা উপস্থিত হলেন। বৈঠক বসলো। এক পর্যায়ে কায়স ইবন সা'দ তাঁর একটি পায়জামা বিরাট বপুধারী রোমান পালোয়ানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সেটি তাকে পরতে বলেন। রোমান পালোয়ান সেটি পরলে তার বুকের উপরি ভাগ পর্যন্ত পৌঁছে। এ অবস্থা দেখে উপস্থিত লোকেরা হাসিতে ফেটে পড়ে।

অন্যদিকে মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা দোভাষীকে বললেন : আপনি রোমান পালোয়ানকে বলুন, সে ইচ্ছা করলে বসে থেকে আমার দিকে একটি হাত বাড়িয়ে দিক এবং আমি দাঁড়িয়ে তাকে উঠানোর চেষ্টা করি। হয় আমি তাকে টেনে তুলবো, অথবা সে আমাকে টেনে বসিয়ে দেবে। অথবা এর বিপরীতটাও হতে পারে অর্থাৎ আমি বসে থাকবো, আর সে দাঁড়িয়ে আমাকে উঠানোর চেষ্টা করবে। রোমান পালোয়ান বসে থাকতে চাইলো। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা একটানে তাকে দাঁড়িয়ে দিলেন। রোমান ব্যক্তি মুহাম্মাদকে বসাতে ব্যর্থ হলো। এতে তার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলো। সে এবার দাঁড়িয়ে মুহাম্মাদকে বসা অবস্থা থেকে উঠাতে চাইলো। মুহাম্মাদ বসলেন এবং রোমান লোকটির হাত ধরে এমন জোরে টান দিলেন যে, মনে হলো তার হাতটি কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তিনি তাকে মাটিতে বসিয়ে দিলেন।[৬২]

---

৬২. ওয়াফায়াত আল-আ'য়ান-১/৪৪৯; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-২৭৪

এভাবে বিশাল দেহের অধিকারী-পালোয়ানদ্বয় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে দেশে ফিরে গেল।

অবয়ব-আকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদ

তিনি মধ্যমাকৃতির ছিলেন। শেষ বয়সে মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। চুলে মেহেদীর খিজাব লাগাতেন। "খুয" নামক এক প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করতেন। মাথায় কালো পাগড়ী ধারণ করতেন এবং হাতে আংটি পরতেন। আবূ ইদরীস একদিন তাঁকে খিজাব লাগানো অবস্থায় দেখে প্রশ্ন করেন : আপনার পিতা 'আলী (রা) কি খিজাব লাগাতেন? বললেন : না। তবে আমি এটা করি স্ত্রীদের নিকট নিজেকে যুবক হিসেবে প্রকাশ করার জন্য।[৬৩]

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি

তিনি একাধিক বিয়ে করেন। সেই স্ত্রী ও দাসীদের গর্ভে জন্ম নেয়া বহু সন্তানের জনক তিনি। সন্তানদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ : ১. আবূ হাশিম, ২. 'আবদুল্লাহ, ৩. হামযা, ৪. 'আলী, ৫. জা'ফার আল-আকবর– এ পাঁচজন একজন দাসীর গর্ভের সন্তান। ৬. হাসান- কায়স ইবন মাখরামা ইবন আল-মুত্তালিবের কন্যা জামাল-এর গর্ভজাত। ৭. ইবরাহীম– মুসরি'আ ইবন 'আব্বাদ ইবন শায়বান-এর গর্ভজাত। ৮. কাসিম, ৯. 'আবদুর রহমান- এ দু'জন বাররা বিনত 'আবদির রহমান ইবন হারিছ আল-মুত্তালিবীর গর্ভজাত। ১০. জা'ফার আল-আসগার, ১১. 'আওন, ১২. 'আবদুল্লাহ আল-আসগার– এ তিনজন হযরত জা'ফার ইবন আবী তালিবের পৌত্রী উম্মু কুলছুমের গর্ভজাত এবং ১৩. 'আবদুল্লাহ ও ১৪. রুকাইয়া– এ দু'জন একজন দাসীর গর্ভের সন্তান।[৬৪]

ইবন সা'দ তাঁর সন্তানদের পরিচয় দান করতে গিয়ে বলেন :[৬৫]

والحسن بن محمد، وكان من ظرفاء بني هاشم وأهل العقل منهم وهو أول من تكلم في الإرجاء.

"মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার ছেলে আল-হাসান ছিলেন বানূ হাশিমের সুরসিক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। তিনি 'ইরজা' মতবাদের প্রথম প্রবক্তা।"

---

৬৩. আত-তাবাকাত-৫/১১৪

৬৪. ওয়াফায়াত আল-আ'য়ান-১/৪৫৩

৬৫. আত-তাবাকাত-৫/৯২

যাইনুল 'আবিদীন 'আলী ইবন হুসাইন (রা)

হযরত 'আলী ইবন হুসাইনের (রা) 'কুনিয়াত' বা ডাকনাম আবুল হাসান এবং 'লকব' বা উপাধি যাইনুল 'আবিদীন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) অত্যন্ত আদরের দৌহিত্র হযরত হুসাইনের (রা) কনিষ্ঠ পুত্র এই 'আলী। কারবালায় নবুওয়াতী উদ্যান তছনছ হওয়ার পর এই একটি মাত্র ফুল অবশিষ্ট ছিল যার মাধ্যমে দুনিয়াতে সাইয়্যিদ বংশের সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে এবং হযরত হুসাইনের (রা) নাম বিদ্যমান থাকে। তাঁর পিতৃকুলের শাজারা-ই-নসব (বংশধারা) সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল এবং চন্দ্রের চেয়েও দীপ্তিমান। তবে মাতৃকুলের শাজারা-ই-নসবের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ মত পার্থক্য আছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে তিনি ছিলেন পারস্যের শেষ সম্রাট ইয়াযদাগুরদের দৌহিত্র।

বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে ইয়াযদাগুরদের পরাজয় হয় তখন আরো যুদ্ধ বন্দীদের সাথে তাঁর তিন মেয়েও বন্দী হয়। হযরত 'উমার (রা) অন্যান্য বন্দীদের মতো তাদেরকেও বিক্রির নির্দেশ দেন। কিন্তু হযরত 'আলী (রা) খলীফার সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, এই তিন শাহযাদীর সাথে অন্য সাধারণ মানুষের কন্যাদের সাথে যে আচরণ করা হয়, তেমন করা সঙ্গত হবে না। তিনি প্রস্তাব দেন তাদের মূল্য নির্ধারণ করা হোক এবং সেই মূল্যে যে কিনতে চায়, কিনে নিবে। সম্ভবতঃ হযরত 'আলী (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) একটি হাদীছের ভিত্তিতে এমন কথা বলেন। হাদীছটি এই ঃ ارْحَمُوْا عزيز قوم ذلّ - "কোন কাওম বা জাতির সম্মানিত ব্যক্তি হেয় ও অপমানিত হলে তোমরা তার প্রতি দয়া দেখাবে।" 'উমার (রা) 'আলীর (রা) প্রস্তাবে রাজী হন। তিন শাহযাদীর একটা দাম নির্ধারণ করা হয় এবং তিনজনকেই 'আলী (রা) নিজে ক্রয় করেন। অতঃপর একজনকে হযরত আবূ বকরের (রা) ছেলে মুহাম্মাদকে, আরেকজনকে হযরত 'উমারের (রা) ছেলে হযরত 'আবদুল্লাহকে (রা) এবং তৃতীয়জনকে নিজের ছেলে হযরত হুসাইনকে (রা) দান করেন। এই তিন শাহযাদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন যথাক্রমে হযরত কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, হযরত সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) ও হযরত 'আলী ইবন হুসাইন (রা)।

ইবন কুতাইবা (মৃত্যু ২৭৬ হি) যাইনুল 'আবিদীনের মা'কে সিন্ধুর এবং আল-ইয়া'কূবী কাবুলের[১] মেয়ে এবং তার নাম সুলাফা অথবা গাযালা বলে উল্লেখ করেছেন।[২] ইবন সা'দ গাযালা নামটিকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি কোন বংশধারা উল্লেখ করেননি। তবে ইয়াযদাগুরদের শাহী বংশধারার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইবন কুতাইবার বর্ণনাটি বিভিন্ন

---

১. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৩

২. ইবন কুতাইবা, আল মা'আরিফ-৫৪

দিক দিয়ে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন অনেকে। আল্লামা শিবলী নু'মানী (রহ) বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তাঁর বর্ণনাটি ভিত্তিহীন বলে মত দিয়েছেন। তবে এসব বর্ণনা দ্বারা একথাটি স্পষ্ট হয় যে, তিনি কোন অনারব মহিলা ছিলেন।[৩] আল-ইয়া'কূবী তার মায়ের নাম "হারার" বলেছেন। ইয়াযদাগুরদের যে কন্যাটিকে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দৌহিত্র হযরত হুসাইন ইবন 'আলীর (রা) হাতে সমার্পণ করা হয় তার ফার্সী নাম ছিল "شَاهِ زَنَانْ শাহে যিনানা।" দাসী হিসাবে হযরত হুসাইনের সাথে যুক্ত হওয়ার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন নিষ্ঠাবতী মুসলমানে পরিণত হন। পৌত্তলিক জীবনের সকল সম্পর্ক জীবন থেকে মুছে ফেলেন। এমনকি "শাহে যিনানা" (নারীদের রাণী) নামটি পরিত্যাগ করে "غَزَالَة - গাযালা" নাম ধারণ করেন। হযরত হুসাইন (রা) তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন এবং পরবর্তীতে উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এভাবে গাযালা একজন চমৎকার স্বামী লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি এক পুত্র সন্তানের মা হন এবং পিতা-মাতা তাঁদের শিশু সন্তানের নাম রাখেন তার মহান দাদা 'আলী ইবন আবী তালিবের (রা) নামে 'আলী ইবন আল হুসাইন (রা)। সন্তান প্রসবের পর মা "গাযালা" জ্বরে আক্রান্ত হন এবং তাতেই ইনতিকাল করেন। শিশু আলী মায়ের আদর ও স্নেহ-মমতা থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হন। একজন দাসী তাঁকে মাতৃ স্নেহে লালন-পালন করেন। জীবনে তাকেই তিনি মা বলে জানেন।

একটু বুদ্ধি হলে তাঁকে শিক্ষার প্রতি মনোযোগী করে তোলা হয়। এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড আগ্রহও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রথম শিক্ষালয়টি ছিল নিজ গৃহ। তেমনি প্রথম ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাঁর মহান পিতা হযরত হুসাইন ইবন 'আলী (রা)। তাঁর দ্বিতীয় শিক্ষালয়টি ছিল মদীনার পবিত্র মাসজিদে নববী। এই মাসজিদ তখন সব সময় জীবিত সাহাবা ও বড় বড় তাবি'ঈন কিরামের (রহ) পদচারণায় মুখর থাকতো। তাঁরা মাসজিদের এখানে ওখানে হালকা করে সাহাবায়ে কিরামের (রা) সন্তানদেরকে কুরআন শিখাতেন, ইসলামী বিধি-বিধানের তত্ত্বজ্ঞান দান করতেন, তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ, সীরাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী শোনাতেন এবং সেই সাথে আরবী কবিতা ও ভাষা সাহিত্যের জ্ঞানও দান করতেন। সাথে সাথে তাঁরা তাঁদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা, ভয়-ভীতির বীজও রোপন করতেন। এভাবে তাঁরা সত্য-সঠিক পথের অনুসারী বা 'আমল 'আলিমে পরিণত হতেন।

'আলী ইবন হুসাইনের (রা) মন মস্তিষ্কে আল কুরআন বিষয়টি যেভাবে স্থান পায় সেভাবে শিক্ষার অন্য কোন বিষয় স্থান পায়নি। সেই শৈশব থেকে আল কুরআনের ভয়-ভীতি ও আযাবের আয়াত পাঠ করে তার দেহে আবেগ অনুভূতি যেভাবে আন্দোলিত হতো তেমন আর কোন ব্যাপারে হতো না। জান্নাতের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত পাঠের সময় এতই আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়তেন যে, কল্পনায় যেন জান্নাতে পৌঁছে যেতেন। আর জাহান্নামের

৩. তারীখ আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৩; তাবি'ঈন-২৯৩

ইবন যিয়াদ : তোমার নাম কি?

যাইনুল 'আবিদীন : 'আলী

'আলী নামটি শুনে ইবন যিয়াদ বললো : আল্লাহ কি 'আলীকে হত্যা করেনি? তিনি চুপ থাকলেন, ইবন যিয়াদ একটু ধমকের সুরে বললো : আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছো না কেন?

– আমার আরেকটি ভাইয়ের নাম 'আলী ছিল। মানুষ তাকে হত্যা করেছে।

ইবন যিয়াদ : মানুষ নয়, বরং আল্লাহ তাকে হত্যা করেছে।

ইমাম যাইনুল 'আবিদীন চুপ থাকলেন। ইবন যিয়াদ একই কথা আবারো বললো। এবার যাইনুল 'আবিদীন নিম্নের আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করেন :

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا.

"আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু হয়নি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়।"

"আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু তার মেয়াদ অবধারিত।"[৯]

এ জবাব শুনে ইবন যিয়াদ বললো, তুমিও ঐসব লোকদের মতো। তারপর সে যাইনুল 'আবিদীনকে হত্যার নির্দেশ দেয়। তখন তিনি ইবন যিয়াদের নিকট জানতে চান, এই মহিলাদেরকে কার দায়িত্বে দিয়ে যাবে? যাইনুল 'আবিদীনের ফুফু হযরত যায়নাব তাঁর প্রতি এ অন্যায় নির্দেশ শুনে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি যাইনুল 'আবিদীনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ইবন যিয়াদকে লক্ষ্য করে বললেন, যদি তাকে হত্যা করতে চাও তাহলে তার সাথে আমাকেও হত্যা কর। তবে ইমাম যাইনুল 'আবিদীনের উপর ভীতি ও শঙ্কার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তিনি অত্যন্ত স্থির চিত্তে নির্ভীকভাবে বললেন, আমাকে যদি হত্যা করতেই হয় তাহলে এসব মহিলাদের সঙ্গে কমপক্ষে এমন একজন লোক দাও যে তাদেরকে নিরাপত্তার সাথে স্বদেশে পৌঁছে দেবে। তাঁর এমন দৃঢ়তা লক্ষ্য করে ইবন যিয়াদ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। ইতোমধ্যে আল্লাহ ইবন যিয়াদের অন্তরে দয়া ও করুণা সৃষ্টি করেন। অতঃপর সে আহ্লি বাইতের অসহায় নারী-শিশুদের সঙ্গে থাকার জন্য ইমাম যাইনুল 'আবিদীনকে ছেড়ে দেয়।[১০]

শামে উপস্থিতি ও ইয়াযীদের সাথে আলোচনা

ইবন যিয়াদ আহ্লি বাইত (রা) তথা নবী পরিবারের জীবিত সদস্যদেরকে দিমাশকে

---

৯. সূরা আয-যুমার-৪২; সূরা আলে 'ইমরান-১৪৫

১০. তাবাকাত-৫/১৫৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/৭০-৭১

ইয়াযীদের নিকট পাঠিয়ে দেয়। তাঁদেরকে ইয়াযীদের সামনে হাজির করা হয়। তিনি ইমাম আল হুসাইনের (রা) ছিন্ন মাথা দেখে যাইনুল 'আবিদীনকে বলেন, 'আলী! যা কিছু তুমি দেখছো তা সবই তোমার পিতার কর্মফল। তিনি আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, আমার অধিকারের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখিয়েছেন এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ে ঝগড়া করেছেন।

জবাবে ইমাম যাইনুল 'আবিদীন (রা) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন :[১১]

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَافِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ.

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করবার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহর পক্ষে ইহা খুবই সহজ।"

পাশেই বসা ছিল ইয়াযীদের ছেলে খালিদ। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বলেন, খালিদ তুমি এর জবাব দাও। কিন্তু সে জবাব দিতে পারলো না। তখন ইয়াযীদ বললেন, তুমি এ আয়াতটি পড় :[১২]

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ.

"তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃত কর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করে দেন।"

এই বৈঠকে জনৈক শামী ব্যক্তি অভিমত ব্যক্ত করে যে, এসব কয়েদী আমাদের জন্য হালাল। হযরত যাইনুল 'আবিদীন (রহ) বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি যদি মারাও যাও তবুও তোমার জন্য হালাল নয়। যতক্ষণ তুমি আমাদের দীন-ধর্ম থেকে বেরিয়ে না যাও। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় কোন মুসলমান বন্দী নারী কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয়। ইয়াযীদ উক্ত শামী ব্যক্তিকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দেন।[১৩]

ইয়াযীদ আহ্‌লি বাইতের সাথে সাক্ষাতের পর তাঁদেরকে শাহী মহল "সার্‌রা"তে থাকার ব্যবস্থা করেন। এসব সম্মানিত মহিলাগণ তাঁর আত্মীয়া ছিলেন। এ কারণে তিন দিন পর্যন্ত ইয়াযীদের শাহী মহলে শোক ও মাতম বিরাজ করে। যতদিন তাঁরা সেখানে ছিলেন ইয়াযীদ তাঁদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেন। যাইনুল 'আবিদীনকে সংগে নিয়ে একই দস্তরখানে বসে আহার করতেন।[১৪]

মদীনায় প্রত্যাবর্তন এবং ইয়াযীদের অঙ্গীকার

ইয়াযীদের শাহী মহলে কিছুদিন থাকার পর যখন আহ্‌লি বাইত কিছুটা সুস্থ ও স্বাভাবিক

---

১১. সূরা আল-হাদীদ-২২

১২. সূরা আশ-শূরা-৩০

১৩. তারীখ আত-তাবারী-৭/৩৭৬

১৪. প্রাগুক্ত

হলেন তখন ইয়াযীদ একদিন যাইনুল 'আবিদীনকে বললেন, "তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে এখানে থাকতে চাও, থাকতে পার। আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবো, তোমাদের সকল অধিকার পূরণ করবো। আর ফিরে যেতে চাইলে যেতে পার। আমি তোমাদের সংগে ভালো আচরণ করতে থাকবো।" যাইনুল 'আবিদীন (রহ) ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।[১৫]

তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী ইয়াযীদ তাঁদেরকে সরকারী সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে নিরাপদে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। বিদায় বেলা তিনি যাইনুল 'আবিদীনকে বলেন : "ইবন মারজানার উপর আল্লাহর অভিশাপ! আমি যদি উপস্থিত থাকতাম তাহলে আল হুসাইন (রা) যে দাবী করতেন, মেনে নিতাম। এভাবে তাঁর প্রাণ হরণ করতাম না। তাতে আমার নিজের ও আমার সন্তানদের জীবন চলে গেলেও পরোয়া করতাম না। যাই হোক, আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হয়েছে। আগামীতে যখনই তোমাদের কোন কিছুর প্রয়োজন হবে সংগে সংগে আমাকে লিখে জানাবে।"[১৬]

মদীনায় অবস্থান এবং নির্জনতা অবলম্বন

আপনজনদের শাহাদাত বরণ, বাড়ী-ঘরের বিধ্বস্ত অবস্থা এবং নিজের অসহায়ত্ব যাইনুল 'আবিদীনের অন্তরকে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় যে, মদীনায় ফেরার পর তিনি একেবারেই নির্জনতা অবলম্বন করেন এবং পরবর্তী কোন ধরনের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। যে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলামূলক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। ইয়াযীদও সব সময় তাঁর প্রয়োজন ও সুখ-সুবিধার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) বিদ্রোহ এবং যাইনুল 'আবিদীনের সম্পর্কহীনতা

হযরত ইমাম আল হুসাইনের (রা) শাহাদাত বরণের পর হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হিজাযের অধিবাসীরা তাঁর আনুগত্যের বাই'আত করে। মক্কা ও মদীনাবাসীরা এই দুই স্থান থেকে উমাইয়াদের নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের তাড়িয়ে দেয়। ইয়াযীদ হারামাইনের অধিবাসীদেরকে সতর্ককরণের জন্য মুসলিম ইবন 'উকবার নেতৃত্বে একদল দুঃসাহসী সৈন্য পাঠান। যাইনুল 'আবিদীনকে (রহ) কোন রকম বিরক্ত না করার জন্য বাহিনীর অধিনায়ককে তিনি সতর্ক করে দেন। মদীনাবাসীরা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। মদীনায় অসংখ্য মানুষ মারা যায়, ইয়াযীদের বাহিনী কয়েকদিন ধরে মদীনায় লুটতরাজ চালায়। এই যুদ্ধে যাইনুল 'আবিদীন (রহ) ও তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা কোন রকম অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা মদীনা ছেড়ে 'আকীকে চলে যান। মদীনাতুর রাসূলকে বিরাণভূমিতে পরিণত করে

---

১৫. তাবাকাত-৫/১৫৭

১৬. আত-তাবারী-৭/৩৭৯

মুসলিম ইবন 'উকবা 'আলীকে বাররাবীজ নিয়ে আসলেন যেখানে যাইনুল 'আবিদীন (রহ) অবস্থান করছিলেন। যাইনুল 'আবিদীন মুসলিমের উপস্থিতির খবর পেয়ে নিজেই তার সাথে সাক্ষাতের জন্য যান। সংগে নিয়ে যান চাচাতো ভাই আবু হাশিম 'আবদুল্লাহ ও হাসান (রহ) ইবন মুহাম্মাদ ইবন হানাফিয়্যাকে। মুসলিম অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে তার সাথে মিলিত হয়। তাঁকে নিজের পাশে বসিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করে এবং বলে, আমীরুল মু'মিনীন আমাকে আপনার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।" জবাবে যাইনুল 'আবিদীন (রহ) বলেন, "আল্লাহ তাঁকে ভালো প্রতিদান দিন।" মুসলিম তাঁর সংগের ছেলে দুইটির পরিচয় জিজ্ঞেস করে। যাইনুল 'আবিদীন (রহ) বলেন, "তাঁরা আমার চাচাতো ভাই।" তাদের সাথে মিলিত হতে পেরে মুসলিম সন্তোষ প্রকাশ করে। এই আনন্দদায়ক সাক্ষাৎকারের পর যাইনুল 'আবিদীন (রহ) ফিরে যান।

মুখতার আছ-ছাকাফীর বিদ্রোহ এবং যাইনুল 'আবিদীনের সম্পর্কহীনতা

এ সময় উচ্চাভিলাষী ও পাপাচারী মুখতার আছ-ছাকাফী রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে আহ্লি বাইতের প্রতি ভালোবাসার নামে হযরত হুসাইনের (রা) রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায়। হাজার হাজার মানুষ তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। সে তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যাইনুল 'আবিদীনের নিকট মোটা অংকের সম্মানী পাঠিয়ে বলে, "আপনি আমাদের ইমাম। আমাদের নিকট থেকে বাই'আত গ্রহণ করুন।" কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য যাইনুল 'আবিদীনের জানা ছিল। এ কারণে তিনি তার এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সোজা মাসজিদে নববীতে গিয়ে এই মুখতারের বিকৃতি, পাপাচার ও নাস্তিকতার রাজ-রহস্য ফাঁস করে দেন। তিনি জনগণকে লক্ষ্য করে বলেন : সে শুধু মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য আহ্লি বাইতকে হাতিয়ার হিসাবে নিয়েছে। এভাবে যাইনুল 'আবিদীনের কাছ থেকে হতাশ হয়ে মুখতার এবার মুহাম্মাদ ইবন হানাফিয়্যার নিকট ধর্ণা দেয়। তিনি তার ধোঁকার জালে আটকা পড়েন। যাইনুল 'আবিদীন তাঁকে সতর্ক করে বলেন, "আহ্লি বাইতের প্রতি ভালোবাসা– এ তার মুখের কথা, অন্তরের কথা নয়। আহ্লি বাইতকে যাঁরা ভালোবাসেন তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এ তার মিথ্যা শ্লোগান। আসলে আহ্লি বাইতের ভালোবাসার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই; বরং সে আহ্লি বাইতের একজন দুশমন। তাই আমার মতো আপনারও উচিত হবে তার রহস্য ফাঁস করে দেওয়া।" মুহাম্মাদ ইবন হানাফিয়্যা বিষয়টি নিয়ে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাসের (রা) সংগে আলোচনা করলেন। যেহেতু কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনায় মুসলিম বিশ্বের সকল আহ্লি বাইত-প্রেমিক, বিশেষতঃ বানু হাশিমের অন্তর থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল, তাই ইবনুল 'আব্বাস (রা) মুখতারের সহযোগী হলেন এবং ইবন হানাফিয়্যাকে যাইনুল 'আবিদীনের কথা মানতে নিষেধ করলেন।

---

১৭. ইবন সা'দের তাবাকাতে নামটি মুসরিফ ইবন 'উকবা এসেছে।

১৮. মাসউদী, মুরূজ আয-যাহাব-২/৪৭৯-৪৮০

এরপর বানূ উমাইয়্যা ও 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের (রা) সাথে অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। ইমাম যায়নুল 'আবিদীন সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে দূরে থাকেন। মুখতার নিহত হওয়ার পরও তিনি তাকে অভিশাপ দিতেন। আল্লামা যাহাবী বর্ণনা করেছেন, 'আলী ইবনুল হুসাইন (রহ) কা'বার দরজায় দাঁড়িয়ে মুখতারকে অভিশাপ দিতেন। এক ব্যক্তি একদিন বললো, 'আপনি এমন এক ব্যক্তিকে অভিশাপ দিচ্ছেন যে আপনাদের খান্দানের ভালোবাসায় জীবন দান করেছে।" তিনি বললেন : "সে ছিল মিথ্যাবাদী, আল্লাহ ও রাসূলের (সা) প্রতি মিথ্যা আরোপ করতো।"[১৯]

একটি বর্ণনায় জানা যায়, তাঁর এমন নির্জনতা অবলম্বন এবং সবকিছু এড়িয়ে চলা সত্ত্বেও প্রথম দিকে খলীফা 'আবদুল মালিক তাঁর দিক থেকে খিলাফতের দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানোর আশংকা করতেন। তাই তিনি তাঁকে শামে চলে যেতে বাধ্য করেন। ইমাম যুহ্‌রী (রহ) তাঁর পক্ষ থেকে 'আবদুল মালিকের নিকট সাফাই পেশ করে বলেন, "যাইনুল 'আবিদীনের ব্যাপারে আপনার ধারণা অমূলক। রাত-দিন তিনি কেবল নিজেকে নিয়ে এবং আল্লাহর 'ইবাদতে মশগুল থাকেন। তিনি কোন ঝগড়া-বিবাদে জড়াবেন না।" যুহ্‌রীর এই সুপারিশের ভিত্তিতে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।[২০]

সম্ভবতঃ এটা 'আবদুল মালিকের খিলাফতের দায়িত্ব লাভের প্রথম দিকের ঘটনা। পরবর্তীকালে দুইজনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মারওয়ান ও 'আবদুল মালিক উভয়ে তাঁকে খুব সমীহ করতেন। ইমাম যুহ্‌রী বলেন, "যাইনুল 'আবিদীন তাঁর খান্দানের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সদাচারী ও অনুগত ছিলেন। মারওয়ান ও 'আবদুল মালিক উভয়ে আহলি বাইতের মধ্যে তাঁকেই বেশী ভালোবাসতেন।"[২১]

মৃত্যু

তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে বেশ মতপার্থক্য আছে। আল্লামা যাহাবী হিজরী ৯৪ সনের রাবী' উল আওয়াল মাসের কথা বলেছেন। আল-ইয়া'কূবী হিজরী ৯৯ মতান্তরে ১০০ সনের কথা উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আটান্ন (৫৮) বছর। মদীনায় ইনতিকাল করেন এবং আল-বাকী' গোরস্তানে চাচা হযরত আল হাসান (রা) ও দাদা হযরত 'আব্বাসের (রা) পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।[২২]

মহত্ত্ব ও মর্যাদা

তিনি যে খান্দানের সন্তান ছিলেন সেটি ছিল দীনী ইল্‌ম তথা ধর্মীয় জ্ঞানের উৎসস্থল। তাঁর মহান দাদা ছিলেন 'ইল্‌ম ও 'আমল (জ্ঞান ও কর্ম)-এর "মাজমা' আল-বাহরাইন" তথা দুই সাগরের সঙ্গমস্থল। এ কারণে ইল্‌ম ছিল তাঁর ঘরের সম্পদ। কিন্তু পারিপার্শ্বিক

---

১৯. তাবাকাত-৫/১৫৮
২০. মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৫
২১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৭৫
২২. আল-ইয়া'কূবী, তারীখ-২/৩০৩; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফইয়াত আল-আ'য়ান-১/৩২১

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনায় তিনি এমন ভগ্ন হৃদয় এবং দুনিয়ার সকল জিনিসের প্রতি এমন বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েন যে, জ্ঞান চর্চাও যেন ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর জ্ঞানগত যোগ্যতা প্রকাশ হতে পারেনি। তবে জ্ঞানের জগতে তাঁর উঁচু মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত। ইমাম যুহ্‌রী (রহ) বলতেন, "মদীনায় আমি তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কাউকে পাইনি।" ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, "প্রতিটি জিনিসে তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সকলে একমত।[২৩]

হাদীছ

বিখ্যাত হাফিজে হাদীছদের মধ্যে যদিও তাঁকে গণ্য করা হয় না তা সত্ত্বেও হাদীছ হিফ্‌জ তথা স্মৃতিতে ধারণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। ইবন সা'দ বলেছেন :[২৪]

كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليًا رفيعًا.

"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত আমানতদার, বহু হাদীছের ধারণকারী, অত্যুচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।"

হাদীছের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন মহান পিতা হযরত আল হুসাইন (রা), চাচা হযরত আল হাসান (রা), দাদা ইবনুল 'আব্বাস (রা), নানী উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা), উম্মু সালামা (রা), সাফিয়্যা (রা), রাসূলুল্লাহর (সা) আযাদকৃত দাস আবূ রাফি' (রা), তাঁর ছেলে 'উবাইদুল্লাহ (রা), হযরত 'আয়িশার (রা) দাস যাকওয়ান (রা), আবূ হুরাইরা (রা), মিসওয়ার ইবন মাখরামা ও সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) নিকট থেকে।[২৫]

হাদীছ শাস্ত্রে বর্ণনার সনদসমূহের মধ্যে একটি সনদকে 'সিলসিলাতুয যাহাব' বা সোনার চেইন বলা হয়। আর সেটা হলো যে সনদের ধারাবাহিকতায় তাঁর মহান দাদা, পিতা ও তিনি আছেন। আবূ বকর ইবন শাইবা বলেন, "যুহ্‌রীর ঐ সকল বর্ণনা যা 'আলী ইবনুল হুসাইন (যাইনুল 'আবিদীন), তাঁর মহান পিতা ও দাদার সিলসিলায় বর্ণিত হয়েছে, তাই হলো সর্বাধিক সঠিক ও বিশুদ্ধ সনদ।[২৬]

ছাত্র-শিষ্য

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের পরিধি অনেক ব্যাপক। তাঁর ছেলেদের মধ্যে মুহাম্মাদ, যায়দ, 'আবদুল্লাহ ও 'উমার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সাধারণ রাবীদের মধ্যে আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান, তাঊস ইবন কায়সান, ইমাম যুহ্‌রী আবুয যানাদ, 'আসিম ইবন 'উমার ইবন কাতাদা, 'আসিম ইবন 'উবায়দিল্লাহ, কা'কা' ইবন হাকীম, যায়দ ইবন আসলাম,

---

২৩. তাহ্‌যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৪৩

২৪. তাবাকাত-৫/১৬৪

২৫. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/৩০৪; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৭৫

২৬. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/৩০৫

হাকাম ইবন 'উতবা, হাবীব ইবন আবী ছাবিত, আবুল আসওয়াদ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রহমান, মুসলিম আল-বাত্তীন, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, হিশাম ইবন 'উরওয়া, 'আলী ইবন যায়দ ইবন জাদ'আন ও আরো অনেকে।[২৭]

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। ইমাম যুহ্‌রী বলতেন, "আমি 'আলী ইবনুল হুসাইনের (রা) চেয়ে বড় কোন ফকীহ্ দেখিনি।"[২৮] ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর মনীষার বড় সনদ এই যে, মদীনার বিখ্যাত সাত ফকীহ্‌র পরেই ছিল তাঁর স্থান।[২৯]

জ্ঞানগর্ভ কথা

তাঁর বিভিন্ন কথা তাঁর জ্ঞানগর্ভ পূর্ণতার দর্পণ এবং উপদেশ ও নীতিকথার পাঠ হিসাবে গণ্য করা হয়। তিনি বলতেন, "আমার ঐ দাম্ভিক ও অহঙ্কারীদের দেখে বিস্ময় হয় যারা গতকালও ছিল এক ফোঁটা নিকৃষ্ট পানি এবং আগামীকাল হবে মৃত। আর ঐ ব্যক্তিকে দেখে অবাক হই যে আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করে। অথচ তাঁরই সৃষ্টি তার সামনে বিদ্যমান। আর সেই ব্যক্তিকে দেখে আমার বিস্ময় লাগে যে কিয়ামতের দিন দ্বিতীয় - বার সৃষ্টির কথা অস্বীকার করে। অথচ প্রথম সৃষ্টি তার সামনে রয়েছে। আর সেই ব্যক্তির জন্য বিস্ময় লাগে যে একটি অস্থায়ী বাসস্থানের জন্য কাজ করে, আর স্থায়ী বাসস্থানকে পরিত্যাগ করে। প্রিয়জনদের হারানোই প্রমাণ করে সে একজন মুসাফির। হে আল্লাহ! আপনি আমার বাহ্যিক অবস্থাকে মানুষের দৃষ্টিতে ভালো দেখিয়ে আমার অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে খারাপ করে দেন– এ ব্যাপারে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! যখন আমি কোন খারাপ কাজ করেছি, আপনি আমার সাথে ভালো আচরণ করেছেন। ভবিষ্যতে আমি যদি এমন করি, আপনিও আমার সাথে তেমনই করবেন। কিছু মানুষ ভয়ে আল্লাহর 'ইবাদাত করে। এ হলো দাসের 'ইবাদাত। আর কিছু মানুষ জান্নাতের লোভে 'ইবাদাত করে। এ হলো ব্যবসায়ীদের 'ইবাদাত। কিছু মানুষ কেবল আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য 'ইবাদাত করে। এটাই হলো মুক্ত-স্বাধীন মানুষের 'ইবাদাত।"[৩০]

তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ বলেন, আমার পিতা আমাকে উপদেশ দিতেন যে, "পাঁচ প্রকার মানুষের সাথে কখনো থাকবে না।" আমি প্রশ্ন করলাম, "তারা কারা?" বললেন, "ফাসিকের (পাপাচারী) সাথে। সে তোমাকে এক লোকমা বরং তার চাইতেও কম মূল্যে বিক্রি করে দেবে।" আমি জানতে চাইলাম, "তার চাইতেও কম কি জিনিস হতে পারে?" বললেন, "এক লোকমার আশা করা, কিন্তু তাও পেল না।" আমি জিজ্ঞেস করলাম :

---

২৭. প্রাগুক্ত

২৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬৫

২৯. আ'লাম আল-মুওক্কি'ঈন-১/২৬

৩০. মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৩

"দ্বিতীয় প্রকার কারা?" বললেন, "বখীল। যে জিনিসটির তোমার বেশী প্রয়োজন হবে সে তোমার নিকট থেকে সেটি দূরে সরিয়ে দেবে।" জিজ্ঞেস করলাম, "তৃতীয় প্রকার কারা?" বললেন, "মিথ্যাবাদী। সে মরীচিকার মতো তোমাকে নিকটকে দূর এবং দূরকে নিকটবর্তী করে দেখাবে।" জিজ্ঞেস করলাম, "চতুর্থ কারা?" বললেন, "নির্বোধ। সে তোমার উপকার করতে চাইবে, কিন্তু উল্টো তোমার ক্ষতি করে বসবে।" জিজ্ঞেস করলাম, "পঞ্চম প্রকার কারা?" বললেন, "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। আল্লাহর কিতাবে আমি তাকে তিনটি স্থানে অভিশপ্ত পেয়েছি।"

তিনি আরো বলতেন, "ঐ ব্যক্তি কেমন করে তোমার বন্ধু হতে পারে, যদি তুমি তোমার প্রয়োজনের জন্য তার থলি থেকে কিছু নিতে চাও, আর সে খুশী হয়ে না দেয়?"[৩১]

তিনি বলতেন : কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে– মর্যাদাবান ব্যক্তিগণ ওঠো! কিছু লোক উঠে দাঁড়াবে, তখন তাদেরকে বলা হবে : তোমরা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাও। তখন ফেরেশতারা তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলবে : তোমাদের এমন সম্মান ও মর্যাদা কিসের জন্য? তারা বলবে : দুনিয়াতে যখন কেউ আমাদের সাথে মূর্খের মতো আচরণ করেছে, আমরা তখন তাদের সাথে বিচক্ষণ ব্যক্তির মতো আচরণ করেছি। যখন আমরা অত্যাচারিত হয়েছি, ধৈর্য ধারণ করেছি। আমাদেরকে কেউ ব্যথা দিলে আমরা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ফেরেশতারা বলবে : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, আমলকারীদের জন্য এ অতি উত্তম প্রতিদান। এরপর ঘোষক ঘোষণা দেবে : ধৈর্যশীলগণ ওঠো! কিছুলোক উঠে দাঁড়াবে। তাদেরকে বলা হবে, বিনা হিসাবে তোমরা জান্নাতে চলে যাও। ফেরেশতারা তাদের সামনে এসে বলবে : তোমাদের ধৈর্যের ধরন কেমন ছিল? তারা বলবে : আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে আমরা ধৈর্য ধরেছি। তেমনিভাবে আমরা ধৈর্য ধরেছি আল্লাহর অবাধ্যতার ব্যাপারে। তারা বলবে : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, আমলকারীদের জন্য এ এক চমৎকার প্রতিদান। এরপর ঘোষক ঘোষণা দেবে : আল্লাহর প্রতিবেশীরা ওঠো! কিছু লোক উঠে দাঁড়াবে। সংখ্যায় এরা হবে সবচেয়ে কম। তাদেরকে বলা হবে : তোমরা কি আল্লাহর প্রতিবেশী হয়েছিলে? তারা বলবে : আল্লাহর ভালোবাসায় আমরা এক সাথে বসতাম, আলোচনা করতাম, দেখা-সাক্ষাৎ করতাম। তারা বলবে : তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, এ অতি চমৎকার প্রতিদান!

তিনি আরো বলতেন : যারা দীনের বিনিময়ে দুনিয়াকে চায় তারা কতই না খারাপ সম্প্রদায়! আর সেই সম্প্রদায় অতি নিকৃষ্ট যারা কিছু কাজ করে এবং তার দ্বারা দুনিয়া প্রত্যাশা করে।[৩২]

চারিত্রিক গুণাবলী

তাঁর চরিত্র ছিল একটি আলোকিত প্রদীপের মতো যা থেকে অন্যরা পথ দেখতো। তিনি

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. আল-ইয়া'কূবী, তারীখ-২/৩০৩-৩০৪

ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) স্বভাব-আখলাকের প্রতিচ্ছবি। বানূ হাশিম খান্দানে তাঁর চাইতে উত্তম আর কেউ তাঁর সময়ে ছিলেন না।[৩৩]

আল্লাহ্-ভীতি

তাঁর অন্তর সর্বদা আল্লাহ্-ভীতিতে পরিপূর্ণ থাকতো। অনেক সময় আল্লাহর ভয়ে অচেতন হয়ে পড়তেন। ইবন 'উয়াইযা বলেন, একবার 'আলী ইবনুল হুসাইন (রা) হজ্জে গেলেন। ইহরাম বেঁধে যখন বাহনের পিঠে উঠে বসলেন তখন আল্লাহর ভয়ে তাঁর সারা দেহ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যায় এবং এমনভাবে কাঁপতে থাকেন যে মুখ থেকে "লাব্বাইক" পর্যন্ত বের হলো না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি "লাব্বাইক" উচ্চারণ করছেন না কেন? বললেন : আমার ভয় হচ্ছে এই ভেবে যে, আমি লাব্বাইক বলবো, আর সেদিক থেকে জবাব আসে "লা লাব্বাক"। অর্থাৎ আমি হাজির বলবো, আর জবাবে তিনি না বলেন, তোমার হাজিরা গ্রহণযোগ্য নয়। লোকেরা বললো "লাব্বাইক বলা তো জরুরী। মানুষের চাপাচাপিতে উচ্চারণ করলেন। কিন্তু যেই না মুখ থেকে "লাব্বাইক" বের হলো, অমনি বেহুঁশ হয়ে বাহনের পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। এমনকি যখন জোরে বাতাস বইতো এবং রাতের অন্ধকার নেমে আসতো তখন আল্লাহর 'আযাবের ভয়ে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতেন।[৩৪]

'ইবাদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনা

তাঁর শিরা-উপশিরায় ঐ সকল মহান ব্যক্তির পবিত্র রক্ত বহমান ছিল, অসির নীচেও যাঁদের 'ইবাদাত-বন্দেগী ছুটতে পারেনি। এ কারণে তিনিও ছিলেন একজন দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত 'আবিদ ব্যক্তি। হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহ) ছিলেন একজন উঁচু স্তরের 'আবিদ ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ ব্যক্তি। তিনি বলতেন : 'আলী ইবনুল হুসাইনের (রা) চাইতে বেশী আল্লাহ-ভীরু মানুষ আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ ছিল 'ইবাদাত। রাত-দিনের বেশীরভাগ সময় তাঁর কাটতো 'ইবাদাতে। বলা হয়েছে রাত-দিনে এক হাজার রাক'আত নামায আদায় করতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। আর এমন 'ইবাদাতের কারণেই তাঁর লকব বা উপাধি হয়ে যায় 'যাইনুল 'আবিদীন' বা 'আবিদ ব্যক্তিদের সৌন্দর্য ও শোভা। সফর অথবা বাড়ীতে অবস্থান কোন অবস্থায় "কিয়ামুল লাইল" বা রাত্রিকালীন নামায বাদ পড়তো না।[৩৫]

'ইবাদাতে ঐকান্তিকতার অবস্থা এমন ছিল যে, নামাযে তাঁর সারা দেহে কম্পন শুরু হয়ে যেত। 'আবদুল্লাহ ইবন সালমান বলেন, যখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন তখন তাঁর দেহে কম্পন শুরু হয়ে যেত। লোকেরা জানতে চাইলো আপনার এমন অবস্থা হয় কেন?

---

৩৩. তাহ্যীবুল আসমা'-১/৩৪৩

৩৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৭/৩০৬

৩৫. আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৩; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৫ মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৭

বললেন, তোমরা কি জান আমি কোন সত্তার সামনে দাঁড়াই এবং কার সাথে গোপন কথা বলি?[৩৬]

তাঁর এমন আল্লাহ-ভীতি ও 'ইবাদাত-বন্দেগী দেখে মানুষ তাঁকে "যাইনুল 'আবিদীন" ('ইবাদাতকারীদের শোভা ও সৌন্দর্য) উপাধিতে ভূষিত করে। আর সেই উপাধির তলে তাঁর আসল নামটি হারিয়ে যায়। একাগ্রচিত্তে দীর্ঘ সিজদায় নিমগ্ন থাকার কারণে মদীনাবাসীরা তাঁকে "সাজ্জাদ" বলে অভিহিত করতো। পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ মন এবং অন্তঃকরণের জন্য মানুষ তাঁকে "আয-যাকী" অভিধায় ভূষিত করে।[৩৭]

হযরত যাইনুল 'আবিদীন (রহ) বিশ্বাস করতেন, 'ইবাদাতের মগয তথা সারবস্তু হলো দু'আ। তাই প্রায়ই তিনি কা'বার গিলাফ আঁকড়ে ধরে কায়মনোবাক্যে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে দু'আ করতে পসন্দ করতেন। এ অবস্থায় বহুবার একাগ্রচিত্তে নিম্নের কথাগুলো বলতে শোনা গেছে :[৩৮]

رَبِّ لَقَدْ أَذَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ مَاأَذَقْتَنِي وَأَوْلَيْتَنِي مِنْ إِنْعَامِكَ مَاأَوْلَيْتَنِي فَصِرْتُ أَدْعُـوْكَ آمِنًا مِنْ غَيْرِ وَجَلٍ وَاَسْأَلُكَ مستأنِسًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، رَبِّ إِنِّى أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ تَوَسُّلَ من اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ إِلَى رَحْمَتِكَ وَضَعُفَتْ قُوَّتُه عَنْ أَدَاءِ حُقُوْقِكَ.

فَاقْبَلْ مِنِّى دُعَاءَ الْغَرِيْقِ الْغَرِيْبِ الَّذِىْ لاَيَجِدُ لإِنْقَاذِهِ إِلاَّ أَنْتَ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِيْنَ.

"প্রভু হে! আপনি আপনার দয়া-অনুগ্রহের স্বাদ যতটুকু গ্রহণ করার তা আমাকে করিয়েছেন এবং যতটুকু দান ও করুণা আমার প্রতি করার তা আপনি করেছেন। সুতরাং নিঃসঙ্ক চিত্তে ও নির্ভীকভাবে আপনাকে ডাকতে এবং আপনার নিকট চাইতে পারছি। প্রভু হে! আপনার দয়া-অনুগ্রহের তীব্র মুখাপেক্ষী এবং আপনার অধিকার পূরণে অক্ষম ব্যক্তির বিনয়ের মতো বিনীতভাবে আপনার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি। আত্মীয়-স্বজন থেকে বহু দূরে পানিতে নিমজ্জমান ব্যক্তি, যাকে উদ্ধার করার একমাত্র আপনি ছাড়া আর কেউ নেই, তার দু'আ কবুল করার মতো আমার দু'আও আপনি কবুল করুন! ইয়া আকরামাল আকরামীন!"

একবার প্রখ্যাত তাবি'ঈ তাউস ইবন কাইসান (রহ) তাঁকে কা'বার ছায়ায় মৃত্যুর মুখোমুখি ব্যক্তির মতো অস্থিরভাবে পায়চারী করতে, অসুস্থ ব্যক্তির মতো কাঁদতে এবং অসহায় আশ্রয় প্রার্থীর মতো প্রার্থনা করতে দেখেন। তিনি অপেক্ষায় থাকেন। তাঁর দু'আ ও কান্না থামলে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেন : "হে আল্লাহর রাসূলের (সা) বংশধর! একটু আগের অবস্থায় আমি আপনাকে দেখেছি। অথচ আপনার এমন তিনটি বৈশিষ্ট্য

---

৩৬. তাবাকাত-৫/১৬০

৩৭. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৩৪২

৩৮. প্রাগুক্ত

আছে যা আপনাকে সকল ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দিবে।" যাইনুল 'আবিদীন (রহ) প্রশ্ন করলেন :

"তাউস, সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কি?"

তাউস : প্রথমটি হলো আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) বংশধর। দ্বিতীয়টি হলো, আপনার জন্য আপনার দাদা রাসূলুল্লাহর (সা) সুপারিশ। তৃতীয়টি হলো আল্লাহর রহমত।

যাইনুল 'আবিদীন বললেন : তাউস! আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিম্নের এই বাণীটি শুনার পর থেকে আমি আর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমার রক্ত-সম্পর্কের দ্বারা নিরাপত্তাবোধ করি না। আল্লাহ বলেন :[৩৯]

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُوْنَ.

"যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নিবে না।"

আর আমার দাদার সুপারিশের যে কথা বললেন, সে সম্পর্কে তো আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :[৪০]

وَلاَيَشْفَعُوْنَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُوْنَ.

"তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।"

আর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের রহমত, সে সম্পর্কে তিনিই বলেছেন :[৪১]

إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।"[৪২]

তার একাগ্রতার অবস্থা এমন ছিল যে, নামায অবস্থায় অন্য কোন কিছুর খবর থাকতো না। একবার যখন সিজদায় ছিলেন তখন পাশেই কোথাও আগুন লাগে। লোকেরা "ইয়া ইবন রাসূলিল্লাহ"– "হে আল্লাহর রাসূলের বংশধর" বলে ডাকতে থাকে, কিন্তু তিনি সিজদা থেকে মাথা তুললেন না। এক পর্যায়ে আগুন নিভে যায়। পরে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : কোন জিনিস আপনাকে আগুনের ব্যাপারে এত উদাসীন করে দিয়েছিল? বললেন : অন্য আগুন। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন।[৪৩]

তিনি ও সুলাইমান ইবন ইয়াসার প্রতিদিন মসজিদে নববী ও রাসূলে কারীমের (সা) কবরের মধ্যবর্তী স্থানে অপরাহ্ন বেলা পর্যন্ত হাদীছ চর্চা ও আল্লাহর যিকরে মশগুল

---

৩৯. সূরা আল-মু'মিনূন-১০১

৪০. সূরা আল-আম্বিয়া-২৮

৪১. সূরা আল-আ'রাফ-৫৬

৪২. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন : ৩৪৩-৩৪৪

৪৩. মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৩

থাকতেন। উঠার সময় 'আবদুল্লাহ্ ইবন আবী সালামা কুরআনের একটি সূরা শুনাতেন। কুরআন শুনার পর দু'আ করতেন।[৪৪]

হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) বলেন :[৪৫]

"ما رأيت قط أفضل من عليّ بن الحسين، وما رأيته قط إلا مقتُّ نفسـى، مـا رأيتـه ضاحكا يومًا قط."

"আমি 'আলী ইবন আল-হুসাইনের (রা) চাইতে ভালো মানুষ আর কখনো দেখিনি। যখনই তাঁকে দেখেছি, আমি নিজেকে তিরস্কার করেছি। আমি তাঁকে কোন দিন কখনো হাসতে দেখিনি।"

আবূ খালিদ আল-কাবুলী বলেন, আমি 'আলী ইবন আল-হুসাইনকে (রা) বলতে ঃ শুনেছি :[৪৬]

مـن عـفَّ عـن محـارم الله كـان عـابدًا، ومـن رضـى بقسـم الله كـان غنيـا، ومـن أحسن مجاورة من جاوره كان مسلما، ومن صاحب الناس بما يُحـبُّ أن يصـاحبوه به كان عدلاً.

"যে আল্লাহর হারামকৃত জিনিস থেকে সংযত থাকলো, সে-ই 'আবিদ। আর যে আল্লাহর ভাগ-বন্টনে খুশী থাকলো, সেই ধনী। যে তার প্রতিবেশীর সাথে ভালো আচরণ করলো, সে-ই মুসলিম। আর যে কোন ব্যক্তির সাথে উঠা-বসা করে এবং তার কাছ থেকে যেমন আচরণ আশা করে তেমন আচরণ যদি সেও করে তাহলে সে হবে একজন ন্যায়পরায়ণ মানুষ।"

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার বা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারকে এত গুরুত্ব দিতেন যে, এ ব্যাপারে কোন রকম গাফলাতি বা উদাসীনতাকে কিতাবুল্লাহর প্রতি উদাসীনতা বলে গণ্য করতেন। তিনি বলতেন, আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারকে যে ছেড়ে দেয় প্রকৃতপক্ষে সে ঐ ব্যক্তির মতো যে কিতাবুল্লাহকে পিছনে ফেলে রাখে। তবে শর্ত হলো যদি সে নিজের নিরাপত্তার জন্য না ছাড়ে। লোকেরা জানতে চাইলো, নিরাপত্তার অর্থ কি? বললেন, যখন কোন অত্যাচারী ও খোদাদ্রোহী শাসকের বাড়াবাড়ির ভয় হয়।[৪৭]

---

৪৪. তাবাকাত-৫/১৬০

৪৫. আল-ইয়া'কূবী, তারীখ-২/৩০৩

৪৬. প্রাগুক্ত

৪৭. তাবাকাত-৫/১৬০

ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অঢেল সম্পদ দান করেছিলেন। তাঁর ছিল একটি লাভজনক ব্যবসা। আর ছিল কৃষি খামার। তাঁর দাসেরা এগুলো পরিচালনা ও দেখাশুনা করতো। এ দু'টি উৎস থেকে তিনি প্রচুর অর্থ আয় করতেন। বিত্ত-বৈভব তাঁর মধ্যে কোন রকম গর্ব-অহঙ্কার সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি বরং এ সম্পদকে আখিরাতের কামিয়াবীর বাহনে পরিণত করেন। সুতরাং তাঁর এই সম্পদ একজন সৎকর্মশীল বান্দাহর জন্য উৎকৃষ্ট সম্পদে পরিণত হয়। গোপনে মানুষকে দান করা ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কাজ।

ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ, দানশীলতা এবং সাগরের মতো উদারতা ছিল তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর রাস্তায় তিনি অকৃপণ হাতে ব্যয় করতেন। ফকীর-মিসকীন ও অভাবীদের অভাব দূর করার জন্য তাঁর দানের হাত সব সময় প্রসারিত থাকতো। মদীনার কত গরীব পরিবার যে তাঁর উদার সাহায্যে জীবন ধারণ করতো তা অজ্ঞাত রয়ে গেছে। কারণ, কেউ কখনো তা জানতে পারেনি। তাঁর মৃত্যুর পর জানা গেছে, গোপনে তিনি এক শো পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতেন।[৪৮]

গোপনীয়তা রক্ষার জন্য তিনি নিজে রাতের অন্ধকারে ঐ সকল বাড়ীতে গিয়ে দান-সদকা পৌঁছে দিতেন। মদীনায় তখন এমন অনেক মানুষ ছিল যাদের জীবিকার বাহ্যিক কোন উপায়-উপকরণ ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর জানা যায় যে, তিনি ঐ সকল বাড়ীতে রাতের অন্ধকারে যেতেন এবং সাহায্য-সামগ্রী দিয়ে আসতেন।

খাদ্য-সামগ্রীর বস্তা নিজের পিঠে উঠিয়ে অভাবীদের গৃহে পৌঁছে দিতেন। মৃত্যুর পর যখন গোসল দেওয়া হচ্ছিল তখন তাঁর দেহে নীল রংয়ের বড় দাগ দেখা যায়। কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, তা ছিল আটার বস্তা বহনের দাগ। সেই আটা তিনি রাতের অন্ধকারে অভাবী মানুষের বাড়ীতে পৌঁছে দিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর মদীনাবাসীরা বলতো, গোপনে দান-খয়রাত করা যাইনুল 'আবিদীনের (রহ) রক্তের সাথে ছিল। সাহায্যপ্রার্থীদের তিনি অত্যন্ত সম্মান করতেন, যখন কোন প্রার্থী আসতো তখন তিনি– "আমার পাথেয়কে আখিরাতের দিকে বহনকারী, মারহাবা"– বলে তাকে স্বাগতম জানাতেন। নিজে উঠে গিয়ে প্রার্থীকে সাহায্য দিতেন। বলতেন, দান-খয়রাত প্রার্থীর হাতে পৌঁছার পূর্বে আল্লাহর হাতে পৌঁছে যায়।[৪৯]

জীবনে দুইবার নিজের সকল অর্থ-বিত্তের অর্ধেক করে আল্লাহর রাস্তায় দান করেন। পঞ্চাশ দীনারের একটি পোশাক মাত্র এক মওসুম পরে বিক্রী করে দিতেন এবং সেই অর্থ দান করতেন।

হালাল রুযি খাওয়ার ব্যাপারে এত গুরুত্ব দিতেন যে, হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সম্পর্ক অথবা নামের দ্বারা এক দিরহাম পরিমাণও ফায়দা উঠানো পসন্দ করতেন না।[৫০]

---

৪৮. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৩৪৩

৪৯. আল-ইয়া'কূবী-২/৩০৩; মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৪

৫০. তাবাকাত-৫/১৬০-১৬২

দাস-দাসী মুক্ত করা ছিল তাঁর আরেকটি প্রিয় কাজ। আর এ কাজের জন্য তিনি সেকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কোন দাস-দাসীর আচরণে সন্তুষ্ট হলে যেমন তাকে মুক্ত করে দিতেন তেমনি মুক্ত করতেন কারো আচরণে অসন্তুষ্ট হলেও। বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর জীবনে এক হাজার দাস মুক্ত করেন। এক বছরের অধিক সময় তিনি কোন দাস-দাসীর সেবা গ্রহণ করতেন না। সাধারণতঃ 'ঈদুল ফিতরের রাতেই অধিক হারে দাস-মুক্তির কাজটি করতেন। এ রাতে তিনি তাদেরকে বলতেন, তোমরা কিবলামুখী হয়ে এ কথাগুলো বলো :

اللهُمَّ اغفِرْ لِعَلِيِّ بْنِ الحسين.

"হে আল্লাহ! তুমি 'আলী ইবন হুসাইনকে (রা) ক্ষমা কর।"

তারপর তাদেরকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দান করে মুক্ত করে দিতেন। এভাবে তারা এক সাথে দুইটি 'ঈদের আনন্দ উপভোগ করতো।[৫১]

তাঁর একজন দাস বর্ণনা করেছেন। একদিন তিনি আমাকে একটি প্রয়োজনে পাঠালেন। আমার ফিরতে দেরী হলো। এজন্য তিনি আমাকে চাবুক দিয়ে একটি আঘাত করলেন। আমি কেঁদে ফেললাম। তাঁর প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হলাম। কারণ, এর আগে এভাবে আমাকে কেউ কোনদিন মারেনি। আমি তাঁকে বললাম : 'আলী ইবন হুসাইন! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। আমাকে একটি কাজে পাঠিয়েছেন, আমি সে কাজ করেছি! তারপরও আমাকে মারলেন? আমার এ কথা শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন : তুমি এখান থেকে সোজা মসজিদে নববীতে যাবে, দুই রাক'আত নামায পড়বে, তারপর বলবে : হে আল্লাহ! তুমি 'আলী ইবন হুসাইনকে ক্ষমা করে দাও। এ কাজ করার পর আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি মুক্ত ও স্বাধীন।

আমি তাঁর কথা মতো মসজিদে গেলাম এবং তাঁর ক্ষমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করলাম। সেখান থেকে আমি যখন তাঁর বাড়ীতে আবার এসেছি তখন আমি একজন মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ।[৫২]

ধৈর্য ও সহনশীলতা

ধৈর্য ও সহনশীলতায় পিতা হযরত হুসাইনের (রা) মতই ছিলেন। খিলাফতে রাশিদার পর একমাত্র হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের (রহ) স্বল্পকালীন খিলাফতকাল ছাড়া গোটা উমাইয়্যা শাসনকালটি ছিল বানূ হাশিম, বিশেষতঃ হযরত 'আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের জন্য নানা রকম বিপদ-আপদ এবং লাঞ্ছনা ও অবমাননার সময়কাল। এ সময়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হযরত 'আলীকে (রা) প্রকাশ্যে গালি দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়, তাঁর বংশধরদের হত্যা করা হয় এবং জীবিতদেরকে সর্বদা ভয়-ভীতির মধ্যে

---

৫১. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৩৪৮

৫২. প্রাগুক্ত-৩৪৬

রাখা হয়। এ কারণে হযরত যাইনুল 'আবিদীন (রহ) সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সযত্নে দূরে থাকা সত্ত্বেও হয়রানি ও অপমান-লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পেতেন না। অনেক সময় বহু কটু কথা, অশ্রাব্য গালি ও অশালীন মন্তব্য তাঁকেও শুনতে হতো। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সবই হজম করে ফেলতেন। তাঁর এই সহনশীলতার ফলে যে লোকটি তাঁকে গালি দিত অনেক সময় সে লজ্জিত হতো। তাই তিনি যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে পথ চলতেন তখন সেই লোকটিও তাঁর সঙ্গী হতো এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতো, ভবিষ্যতে আমার মুখ থেকে এমন কথা আপনি আর শুনতে পাবেন না।

অনেক সময় এমনও হতো যে, বাজে কথা যে বলতো তিনি তার প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করতেন না। অনেক বেয়াদব ও বাচাল এমনও বলতো যে, আপনাকে ক্ষ্যাপানোর জন্য আমি এসব কথা বলছি। জবাবে তিনি বলতেন, আমি উপেক্ষা করছি।

যদি কখনো জবাব দিতেন তাহলে সেই অশোভন উক্তিকারী তা শুনে লজ্জিত হতো। একবার তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন, পথে এক ব্যক্তি তাঁকে গালি দিতে শুরু করলো। তাঁর দাস ও চাকর-বাকররা লোকটির দিকে ধেয়ে গেল। তিনি তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার যে সকল গুণ তোমার অজানা তা তুমি যা বলছো তার চাইতে অনেক ভালো। তোমার কোন প্রয়োজন থাকলে বল আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। এমন জবাব শুনে লোকটি ভীষণ লজ্জিত হয়। তিনি নিজের জামাটি খুলে তাকে দান করেন। সেই সাথে এক হাজার দিরহামও দেন। তাঁর এমন আচরণে লোকটি এতখানি মুগ্ধ হয় যে, এরপর থেকে যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হতো অসঙ্কোচে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো–

أَشْهَدُ أنك من أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) বংশধর।"[৫৩]

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, জনৈক ব্যক্তি আপনার সম্পর্কে নিন্দা-মন্দ কথা বলে। তিনি লোকটিকে সংগে করে সেই ব্যক্তির নিকট গেলেন। আর এই লোকটি মনে করলো যে তিনি তাকে সাহায্য করার জন্য সাথে নিয়েছেন। নিন্দাকারীর নিকট পৌঁছে তিনি বললেন, আমার সম্পর্কে তুমি যা কিছু বলেছো তা যদি সত্য ও সঠিক হয় তাহলে আল্লাহ যেন আমাকে মাফ করেন। আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।[৫৪]

ক্ষমা ও উপেক্ষা

তাঁর চরম দুশমন, তাঁর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষে যাদের অন্তর পরিপূর্ণ এবং যাদের কারণে তিনি অনেক দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, সুযোগ পেয়েও তিনি কোন বদলা নেননি। মদীনার ওয়ালী হিশাম ইবন ইসমা'ঈল তাঁকে এবং গোটা আহ্‌লি বাইতকে নানাভাবে

---

৫৩. প্রাগুক্ত : ৩৪১-৩৪২

৫৪. মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৭

ভীষণ কষ্ট দিত। প্রকাশ্যে হযরত 'আলীকে (রা) গালি দিত। তার বিভিন্ন অপকর্মে বিরক্ত হয়ে খলীফা আল-ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক তাকে অপসারণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, তাকে জনসমাবেশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হোক এবং মানুষ নিজ নিজ বদলা গ্রহণ করুক। হিশাম নিজেই বলেছে আমার সবচাইতে বেশী ভয় ছিল 'আলী ইবন হুসাইনের (রা) বদলা গ্রহণের। কিন্তু তিনি তাঁর ছেলে ও সমর্থকদের আমার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিতে বারণ করে দেন। তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ বললেন, আল্লাহর কসম! সে আমাদের সাথে খুব খারাপ আচরণ করেছে, আর আমরা এমন একটি সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি বললেন, আমরা তাঁকে আল্লাহর যিম্মায় ছেড়ে দিলাম। তাঁর এ কথার পর আর কেউ হিশাম সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। এতে হিশাম যাইনুল 'আবিদীনের (রহ) একজন গুণমুগ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত হন।[৫৫]

স্বভাবগতভাবে তিনি খুব নরম মেজাযের ছিলেন। রূঢ়তা ও রুক্ষতা তাঁর মধ্যে মোটেও ছিল না। জীব-জন্তুকেও কখনো মারা তো দূরের কথা ধমকও দিতেন না। হিশাম ইবন 'উরওয়া বলেন, 'আলী জন্তুর পিঠে চড়ে মক্কায় গিয়ে আবার ফিরে আসতেন। এই দীর্ঘ সফরে কখনো নিজের বাহন জন্তুটিকে মারতেন না।

মানুষের প্রীতি ও ভক্তি-শ্রদ্ধা

তাঁর এমন ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমা, উদারতা, দয়া ও নম্রতার ফলে মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা স্থায়ী হয়ে যায়। তিনি কোথাও বের হলে তাঁকে পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে ব্যস্ততা শুরু হয়ে যেত। এ প্রসঙ্গে খলীফা হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকের সংগে তাঁর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। হিশাম ইবন 'আবদিল মালিক তখনো খিলাফতের মসনদে আসীন হননি। তখন একবার শামের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সংগে নিয়ে হজ্জে গেলেন। কা'বার তাওয়াফ শেষ করে হাজরে আসওয়াদ চুমু দেওয়ার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে এত ভীড় ছিল যে বহু চেষ্টা করেও সক্ষম হলেন না। বাধ্য হয়ে ইচ্ছা ত্যাগ করলেন।

ভীড়ের দৃশ্য দেখার জন্য নিকটেই তাঁর জন্য একটি চেয়ার পেতে দেওয়া হয়। তিনি বসে বসে ভীড়ের দৃশ্য অবলোকন করছেন। এমন সময় ইমাম যাইনুল 'আবিদীন আসলেন এবং তাওয়াফ শেষ করে হাজরে আসওয়াদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখা মাত্র আপনা থেকেই স্থানটি ফাঁকা হয়ে গেল। তিনি অতি সহজেই হাজরে আসওয়াদে চুমু দিলেন। এ দৃশ্য দেখে একজন শামী ব্যক্তি হিশামকে জিজ্ঞেস করলো! এ ব্যক্তি কে যাঁর প্রতি মানুষের অন্তরে এত ভীতি ও শ্রদ্ধা? যাইনুল 'আবিদীনকে হিশাম ভালোই করে চিনতেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতি শামবাসীদের উৎসুক্য দূর করার জন্য না চেনার ভান করে বললেন : আমি তাকে চিনি না। পাশেই ছিলেন তৎকালীন 'আরবের বিখ্যাত কবি ফারাযদাক। তিনি ছিলেন আহ্‌লি বাইতের একজন ভক্ত। হিশামের এমন উপেক্ষায় তিনি

---

৫৫. তাবাকাত-৫/১৬৩

আহত হন। বলেন : হিশাম না চিনলেও আমি তাঁকে চিনি। শামের লোকটি জানতে চাইলো, তিনি কে? কবি ফারাযদাক তাৎক্ষণিকভাবে হযরত যাইনুল 'আবিদীনের পরিচয় ও প্রশংসায় একটি কাসীদা রচনা করে ফেলেন। সেই বিখ্যাত কাসীদার কিছু অংশ নিম্নরূপ :[৫৬]

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته   والبيت يعرفه والحِلُ الحرم

هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله   بجده أنبياء اللهِ قد ختموا

وليس قولك : من هذا؟ بضائره   العرب تعرف من أنكرت والعجم

ما قال : لا، قطُّ إلا فى تشهده   لولا التشهدُ كانت لاؤه هم

يُغضى حياءً ويغضَى من مهابته   فما يُكلَّمُ إلا حين يبتسم

يكاد يُمْسِكُهُ ـ عرفان راحته   ركن الحطيم إذا ماجاء يستلم

ينشقُّ ثوبُ الدجى عن نور غرته   كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلَمُ

من معشرٍ حُبُّهم دين، وبُغضُهم   كفر، وقُربهم مَنْجًى ومعتصم.

"এ সেই ব্যক্তি যাঁর পদচারণা ও পদক্ষেপকে বাতহা উপত্যকা চেনে। মক্কার কা'বা ঘর, হারামের অধিবাসী ও মক্কার বাইরের লোকেরাও চেনে।

তুমি যদিও তাঁকে না জানার ভান করছো, তিনি তো ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মাদ (সা)-এর বংশধর। তাঁরই দাদার মাধ্যমে আল্লাহর নবীদের আগমনের ধারা সমাপ্ত হয়েছে।

তোমার এ প্রশ্ন : "এ কে?"– তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি যাঁকে চেননা বলছো, আরব-আজমের সবাই তাঁকে চেনে।

একমাত্র নামাযের ভিতরে তাশাহ্‌হুদ-এর মধ্যের "লা" (না) ছাড়া আর কখনো তিনি "লা" বলেন না। যদি তাশাহ্‌হুদ না থাকতো তাহলে তাঁর "লা"ও "না'আম" (হাঁ) হয়ে যেত।

লজ্জা-শরমে তিনি দৃষ্টি অবনত রাখেন এবং মানুষ তাঁর সামনে তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে তাঁর প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধের কারণে। তিনি যখন একটু হাসেন কেবল তখনই কথা বলা যায়।

যখন তিনি হাজরে আসওয়াদ চুমু দিতে যান তখন হাতীম (হাজরে আসওয়াদের পাশের কা'বার অংশ বিশেষ)-এর খুঁটি তাঁর হাত চিন্‌তে পেরে তাঁকে প্রায় আটকে রাখতে চায়।

---

৫৬. ড: 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-১/৬৬২; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন : ৩৪৯-৩৫২

তাঁর কপালের দীপ্তিতে অন্ধকারের পর্দা বিদীর্ণ হয়ে যায়। যেমন সূর্যের আলোতে অন্ধকার দূর হয়।

তিনি এমন বংশের যাঁদের ভালোবাসা হলো দীন ও ধর্ম, আর তাঁদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরী কাজ। তাঁদের নৈকট্য হলো মুক্তি ও শক্তভাবে আঁকড়ে থাকা।"

কাসীদাটি শুনে হিশাম কবি ফারাযদাকের উপর ভীষণ ক্ষেপে যান এবং তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। আর এদিকে ইমাম যাইনুল 'আবিদীন তাঁদের প্রতি ভালোবাসার প্রতিদান হিসাবে ফারাযদাককে বারো হাজার দিরহাম দান করেন। কিন্তু কবি বিনয়ের সাথে সেই অর্থ এই বলে ফেরত দেন যে, আমি কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টির জন্য মাদাহ বা প্রশংসা করেছি। প্রতিদান বা পুরস্কারের লোভে নয়। ইমাম যাইনুল 'আবিদীন (রহ) আবার সে অর্থ তাঁর নিকট একথা বলে ফেরত পাঠান যে, আমরা আহ্লি বাইত কাউকে কিছু দান করলে তা আর ফেরত নিই না। আল্লাহ তোমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। তিনি তোমাকে আরো প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তোমার এ চেষ্টা কবুল করুন। এরপর ফারায়দাক সে অর্থ গ্রহণ করেন।[৫৭]

গর্ব-অহঙ্কারের প্রতি ঘৃণা

এত উঁচু মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভীষণ নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। গর্ব-অহঙ্কারকে দারুণ ঘৃণা করতেন। বলতেন, আমি গর্বিত-অহঙ্কারী মানুষকে দেখে বিস্মিত হই, গতকাল যে ছিল এক ফোঁটা নিকৃষ্ট পানি এবং আগামীকাল যে মৃতে পরিণত হবে। এমন বিনীতভাবে চলতেন যে, চলার সময় হাত দু'টি হাঁটুর আগে যেতে পারতো না।[৫৮]

সাম্য ও সমতা

বংশীয় আভিজাত্য দূর করা এবং সাম্য ও সমতার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তিনি নিজের এক মেয়েকে তাঁর এক দাসের সাথে বিয়ে দেন এবং এক দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নিজে তাঁকে বিয়ে করেন। খলীফা 'আবদুল মালিক একথা অবগত হয়ে একটি চিঠিতে তাঁকে তিরস্কার করেন। জবাবে তিনি 'আবদুল মালিককে লেখেন: হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বাস্তব জীবন তোমাদের জন্য আদর্শ। তিনি হযরত সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াইকে (রা)- যিনি দাসী ছিলেন, মুক্তি দিয়ে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। অন্যদিকে নিজের দাস যায়দ ইবন হারিছাকে (রা) মুক্তি দিয়ে তাঁর সাথে ফুফাতো বোন যায়নাব বিন্ত জাহাশকে (রা) বিয়ে দেন।[৫৯]

আহ্লি বাইতের ভালোবাসার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থার উপদেশ

অনেক আহ্লি বাইতের প্রেমিক বলে দাবীদার তাদের বাড়াবাড়িমূলক আচরণের মাধ্যমে

---

৫৭. মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৬

৫৮. প্রাগুক্ত

৫৯. তাবাকাত-৫/১৫৯

আহ্লি বাইতকে ধুলার ধরণী থেকে আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডলে নিয়ে যায়। হযরত ইমাম যাইনুল 'আবিদীন এ ধরনের ভ্রান্ত অসংযত প্রেমকে ভীষণ অপসন্দ করতেন। তিনি তাদেরকে এমন কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতেন। বলতেন : 'তোমরা ইসলাম নির্ধারিত সীমার মধ্যে আমাদেরকে ভালোবাস। আল্লাহর কসম! তোমরা আমাদের সম্পর্কে এত অতিরঞ্জিত কথা বলে থাক যা অনেকের নিকট আমাদেরকে অপ্রিয় করে দিয়েছে।" কখনো বলতেন : "আল্লাহর ওয়াস্তে ইসলাম বিঘোষিত সীমার মধ্যে আমাদেরকে মুহাব্বত কর। তোমাদের মুহাব্বত তো আমাদের গ্লানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৬০]

তিনজন খলীফায়ে রাশেদা-এর প্রতি সুধারণা

নিজের সত্যপন্থী পূর্বসূরীদের মত আবূ বকর, 'উমার ও 'উসমান (রা)– তিন খলীফার প্রতি ইমাম যাইনুল 'আবিদীনও সুধারণা পোষণ করতেন। তাঁদের নিন্দা-মন্দ ও সমালোচনা শোনা মোটেই পসন্দ করতেন না। কেউ তাঁদের সম্পর্কে কোন অশোভন উক্তি করলে তিনি নিজের বৈঠক থেকে তাঁকে বের করে দিতেন। একবার ইরাক থেকে কয়েক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে। তাদের ধারণা ছিল, তিনিও তাঁদের মত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। আর তাই তারা তাঁর সামনে তিন খলীফা সম্পর্কে অশোভন উক্তি করে বসে। তিনি কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন :[৬১]

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَه اُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ.

"এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী।"

এ আয়াতে মুহাজিরদের মহত্ত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতটির প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কি প্রথম পর্বের এই মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদেরকে তাঁদের ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, যারা এসব কিছুর বিনিময়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তাঁর রাসূলের (সা) সাহায্য করে?

ইরাকীরা বললো! না, আমরা তাঁদের কেউ নই। তারপর ইমাম যাইনুল 'আবিদীন (রহ) আয়াতটির দ্বিতীয় অংশ পাঠ করলেন :[৬২]

---

৬০. প্রাগুক্ত-৫/১৫৮

৬১. সূরা আল-হাশর-৮

৬২. প্রাগুক্ত-৯

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَاهَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَيَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ؛ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে, তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তারা তাঁদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।"

এ আয়াতে আনসারদের মর্যাদা ও গুণাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতটি তিলাওয়াতের পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা মুহাজিরদের আগমনের পূর্ব থেকে মদীনায় বসবাস করতেন, তারপর ঈমান আনেন এবং যাঁরা হিজরাত করে তাঁদের এখানে আসেন তাঁদেরকে মুহাব্বত করেন?

ইরাকীরা বললো, আমরা তাঁদেরও অন্তর্ভুক্ত নই। তিনি বললেন : তোমরা নিজেরাই স্বীকার করছো, তোমরা ঐ দুইটি দলের একটিরও অন্তর্ভুক্ত নও। এখন আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা এই দলটিরও নও যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالإِيْمَانِ وَلاَتَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।"

তোমরা যখন এই তিনটি ইসলামী দলের কোন একটির মধ্যেও নেই তখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধ্বংস করুন। আমার এখান থেকে বেরিয়ে যাও। হযরত 'উসমান (রা) সম্পর্কে তিনি বলতেন, আল্লাহর কসম! তাঁকে অন্যায়ভাবে শহীদ করা হয়েছে।[৬৩]

দৈহিক অবয়ব ও আকৃতি

তিনি সুন্দর অবয়ব ও আকৃতির ছিলেন। দেহ থেকে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়তো। কাঁধ পর্যন্ত বাবরী ছিল। কপালের সিঁথি বেরিয়ে থাকতো। কখনো কালো, আবার কখনো লাল– দুই রকম খিজাবই ব্যবহার করতেন।[৬৪]

---

৬৩. মুখতাসার সাফওয়াতিস সাফওয়াহ্-১৩৪; তাবাকাত-৫/১৬০

৬৪. তাবাকাত-৫/১৬০

পোশাক-পরিচ্ছদ

অতি সুন্দর ও দামী পোশাক পরতেন। জোব্বা ও চাদর ব্যবহার করতেন। একেকটি চাদরের মূল্য পঞ্চাশ দীনার পর্যন্ত হতো। এই দামী দামী চাদরগুলো মাত্র এক মওসুম ব্যবহার করে বিক্রী করে দিতেন এবং সেই অর্থ গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। শীতকালে শীত প্রধান অঞ্চলের "সুমূর" নামক এক প্রকার জন্তুর কোমল পশম বিশিষ্ট চামড়ার পোশাক পরতেন। সাদা, কালো, লাল, হলুদ সকল প্রকার রং তাঁর পসন্দ ছিল। গোলাকৃতির মাথাওয়ালা জুতো পরতেন।[৬৫]

সুরুচি ও পরিচ্ছন্নতা

সুরুচি ও পরিচ্ছন্নতা ছিল তাঁর স্বভাবগত। কোন রকম অপরিচ্ছন্নতা ও নোংরামী মোটেই সহ্য করতে পারতেন না, অনেক জিনিস পসন্দ না হলেও মানুষের কথা চিন্তা করে মেনে নিতেন। আবূ জা'ফার বর্ণনা করেছেন, একবার 'আলী ইবন হুসাইন (রা) বাইতুল খালা বা পায়খানায় গেলেন। এক ব্যক্তি হাত ধোয়ার পানি নিয়ে দরজায় দাড়িয়ে ছিল। পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর বললেন : আমি পায়খানার মধ্যে এমন জিনিস দেখেছি যা আমাকে সন্দেহে ফেলে দিয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো : সেই জিনিস কি? বললেন : দেখলাম ময়লার উপর মাছি বসে এবং তা উড়ে এসে মানুষের গায়ে পড়ে। এ কারণে আমি ইচ্ছা করেছিলাম পায়খানায় যাওয়ার জন্য একটি বিশেষ পোশাক তৈরি করবো। কিন্তু পরে চিন্তা করে বললেন, যে জিনিস মানুষের সাধ্যের মধ্যে না হয় তা আমারও করা উচিত হবে না।[৬৬]

---

৬৫. প্রাগুক্ত-৫/১৬২

৬৬. প্রাগুক্ত

'আমর ইবন দীনার (রহ)

হযরত 'আমর ইবন দীনারের (রহ) কুনিয়াত বা ডাকনাম ছিল আবূ মুহাম্মাদ। বাযান 'আজমীর আযাদকৃত দাস ছিলেন। হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালে হিজরী ৪৫/৪৬ সনে অথবা তার কাছাকাছি সময়ে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন।[১]

তাঁর সম্মান ও মর্যাদা

জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি মক্কার শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে হাদীছের হাফিয, ইমাম ও মক্কার হারামের ইমাম অভিধায় ভূষিত করেছেন।[২] তিনি বলেন ঃ[৩]

أحد الأعلام وشيخ الحرم فى زمانه.

–তিনি তাঁর সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ও মক্কার হারামের শায়খ তথা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর মহত্ত্ব, নেতৃত্ব ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলে একমত। তিনি ছিলেন তাবি'ঈন শ্রেণীর ইমাম।[৪] আল-হাকেম তাঁর "আল-মুযাক্কী আল-আখবার" গ্রন্থে বলেছেন ঃ

هو من كبار التابعين. – তিনি শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের একজন।[৫]

'ইলমে হাদীছে তাঁর স্থান

তিনি হাদীছের একজন বড় হাফিয ছিলেন, ইবন সা'দ বলেন ঃ[৬]

كان عمرو ثقة ثبتًا كثير الحديث.

–'আমর ছিলেন বিশ্বস্ত, সুদৃঢ় ও বহু হাদীছ স্মৃতিতে ধারণ ও বর্ণনাকারী। সাহাবীদের মধ্যে ইবন 'উমার, ইবন 'আব্বাস, ইবন যুবাইর, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, আবূ হুরাইরা, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, আবুত তুফায়ল, সায়িব ইবন ইয়াযীদ, আনাস ইবন মালিক (রা) প্রমুখের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনেন। তাবি'ঈদের মধ্যে

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৩০০; আসরুত তাবি'ঈন-৪৪৭
২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৩
৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৩০০
৪. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২৭
৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/৫০০
৬. তাবাকাত-৫/৪৮০

সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, সা'ঈদ ইবন আয-যুবাইর, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ, তাউস, 'আতা, মুহাম্মাদ ইবন 'আলী, মুজাহিদ, আবূ মুলাইকা, সুলাইমান ইবন ইয়াসার, ওয়াহাব ইবন 'উতবা, যুহ্‌রী, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) প্রমুখ সহ বিখ্যাত তাবি'ঈদের বড় একটি দলের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনেন ও বর্ণনা করেন।[৭]

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল অতি ব্যাপক ও গভীর। সমকালীন আলিমদের সম্মিলিত জ্ঞান তিনি নিজের বুকে ধারণ করেন। বিখ্যাত তাবি'ঈ তাউস (রহ) তাঁর ছেলেকে বলতেন ঃ[৮]

إذا قدمت مكة يابني فعليك بعمرو بن دينار، فإن أذنه كانت قمعًا للعلماء.

–ছেলে, যখন তুমি মক্কায় যাবে, 'আমর ইবন দীনারের সাথে অবশ্যই সাক্ষাৎ করবে। কারণ, তাঁর কান 'আলিমদের বশীভূত।

তাঁর বর্ণিত হাদীছের স্থান

হাদীছ বিশারদদের নিকট তাঁর বর্ণিত হাদীছের স্থান অনেক উর্ধ্বে। ইমাম যুহ্‌রী বলতেন, আমি উঁচু মানের হাদীছের ক্ষেত্রে এই শায়খ তথা বিজ্ঞ ব্যক্তির চাইতে আর কাউকে দেখিনি। সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না একবার সা'দকে জিজ্ঞেস করেন, হাদীছের ক্ষেত্রে আপনি সব চাইতে শক্ত ও দৃঢ়পদ কাদেরকে দেখেছেন? বললেন, 'আমর ইবন দীনার ও কাসিম ইবন 'আবদির রহমানকে। ইবন 'উয়ায়না ও 'আমর ইবন জারীর তাঁকে– "বিশ্বস্ত, দৃঢ়পদ, সত্যবাদী ও বহু হাদীছের ধারক"– বলতেন।[৯]

রিওয়ায়াত বিল মা'না বা হাদীছের ভাব ও অর্থ বর্ণনা

হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তা সত্ত্বেও শ্রুত মূল শব্দসহ হাদীছ বর্ণনা করা জরুরী মনে করতেন না। তিনি নিজের ভাষায় শ্রুত হাদীছের অর্থ ও ভাব বর্ণনা করতেন।[১০] হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞানের কারণে তিনি এর একজন নির্ভরযোগ্য সূত্রে পরিণত হন। এ শাস্ত্রের আগ্রহী ছাত্ররা মানুষের নিকট জিজ্ঞেস করে করে তাঁর বর্ণিত হাদীছ লিখতেন। সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না বলেন, আইয়ূব আস-সিখ্‌তিয়ানী আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'আমর ইবন দীনার অমুকের সূত্রে কোন হাদীছ বর্ণনা করেছেন? আমি তাঁকে হাদীছটি বলে দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, আপনি কি হাদীছটি লিখতে চান? বলতেন, হাঁ।[১১]

---

৭. প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১১৩

৮. তাবাকাত-৫/৪৭৯; তাহযীব আত-তাহযীব-৮/২৯

৯. তাবাকাত-৫/৪৮০

১০. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৮/৩০

১১. তাবাকাত-৫/৪৮০

তাঁর ছাত্র-শিষ্য

তাঁর ব্যাপক জ্ঞান তাঁর ছাত্র-শিষ্যের গণ্ডিকে ভীষণ প্রশস্ত করে দেয়। তাঁর সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন ছাত্র হলেন ঃ ইমাম জা'ফার আস-সাদিক, আবূ কাতাদা, মিসওয়ার, ইবন আবী নাজীহ, হাম্মাদ, সুফইয়ান (রহ) ও আরো অনেকে।[১২]

ফিক্হ

ফিক্হ শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। কুরআন ও সুন্নাহ্তে গবেষণা করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও আইন-কানুন বের করার ক্ষেত্রে তাঁর ছিল যেমন ইজতিহাদের বিশেষ যোগ্যতা, তেমনি ছিল স্বকীয়তাও। ইমাম নাওবী (রহ) লিখেছেন, তিনি মাযহাবপন্থীদের অনুকরণীয় একজন বড় মুজতাহিদ ছিলেন।[১৩] প্রায় তিরিশ বছর যাবত ফাতওয়া দেন। তৎকালীন অনেক বড় বড় আলিম তাঁকে তাউস, 'আতা ও মুজাহিদের (রহ) মতো শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের উপর প্রাধান্য দিতেন। ইবন আবী দীনার তো তাঁকে উল্লেখিত তিনজনের চাইতেও বড় ফকীহ (ফিক্হ বিশারদ) বলতেন।

ما رأيت أحدا أفقه من عمرو بن دينار، لاعطاء ولا طاووسا ولا مجاهدا.[১৪]

–আমি 'আমর ইবন দীনারের চাইতে বড় ফকীহ্ আর কাউকে দেখিনি। 'আতা, তাউস ও মুজাহিদ কাউকে না।

সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না বলতেন ঃ[১৫]

ما كان عندنا أحد أفقه من عمرو بن دينار، ولا أعلم ولا أحفظ منه.

–আমাদের দৃষ্টিতে 'আমর ইবন দীনারের চাইতে বড় ফকীহ্, বড় 'আলিম এবং বড় হাফিযে হাদীছ আর কেউ ছিলেন না।

সতর্কতা

অত্যধিক সতর্কতার কারণে তিনি হাদীছ ও ফিক্হ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়িল লেখালেখি পসন্দ করতেন না। বলতেন, মানুষ আমাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। আমরা তার উত্তর দিলে তারা তা পাথরে খোদাই করার মতো লিখে নেয়। হতে পারে আজ যে সিদ্ধান্ত আমরা দিলাম, আগামীকাল তা প্রত্যাহার করে নিয়ে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। তখন পূর্বের ভুল সিদ্ধান্তটি লিখিত থেকে গেল।[১৬] একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বললো, সুফইয়ান আপনার নিকট থেকে যা কিছু শোনে তা লিখে রাখে। একথা শুনে

---

১২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩০

১৩. তাহ্যীবুল আসমা'-১/২৭; তাহ্যীবুত তাহ্যীব-৮/৩০

১৪. তাহ্যীবুল আসমা'-১/২৭

১৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৩; 'আসরুত তাবি'ঈন-৪৪৭

১৬. তাবাকাত-৫/৪৮০

তিনি কাঁদতে থাকেন। তারপর বলেন, যে ব্যক্তি আমার কথা লেখে সে আমার প্রতি বড় যুলুম করে।[১৭] তিনি বলতেন ঃ[১৮]

أُحَرِّجُ على من يكتب عني، فما كتبت عن أحد شيئًا، كنت أحفظ.

–আমার থেকে কেউ কিছু লিখে রাখুক তা আমি পসন্দ করি না। আমি কারো কাছ থেকে কিছু লিখিনি। আমি মুখস্থ করতাম।

একদিন তিনি তাঁর মেধাবী ছাত্র সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়নার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিয়ে বলেন ঃ[১৯]

مثلك حفظت الحديث وكنت صغيرا.

–আমিও ছোট অবস্থায় তোমার মতো হাদীছ মুখস্থ করেছি।

একবার এক ব্যক্তি কোন একটি জিনিস সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করে। তিনি কোন জবাব দিলেন না। প্রশ্নকারী বললো, জিনিসটির ব্যাপারে আমার অন্তরে একটু সন্দেহ আছে। এ কারণে আপনার নিকট থেকে একটি জবাব পেতে চাই। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম! তোমার অন্তরে আবূ কুবায়স পাহাড় পরিমাণ সন্দেহ থাকার পরিবর্তে আমার অন্তরে একটি পশম পরিমাণ সন্দেহ থাকা আমার কাছে বেশী অপসন্দনীয়। অর্থাৎ আমার জবাব দানের পর আমার অন্তরে সামান্য সন্দেহ হোক তার চাইতে তোমার অন্তরে পাহাড় পরিমাণ সন্দেহ বিদ্যমান থাকুক, সেটাই আমার পসন্দ।[২০]

তাঁর 'ইবাদাত-বন্দেগী

তিনি একজন ভীষণ 'আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। রাতের বেশীর ভাগ 'ইবাদাত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করতেন। সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না (রহ) বলেন ঃ[২১]

كان عمرو بن دينار قد جزّأ الليل ثلاثة أجزاء، ثلثا ينام وثلثا يدرس حديثه وثلثا يصلي.

–'আমর ইবন দীনার রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে নিতেন। এক ভাগে ঘুমোতেন, এক ভাগে হাদীছ বর্ণনা করতেন এবং আরেক ভাগ নামাযে অতিবাহিত করতেন।

জামা'আতে নামায আদায়ের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান

তিনি জামা'আতে নামায আদায়ের প্রতি এত গুরুত্ব দিতেন যে, বার্ধক্যে যখন শক্তিহীন

---

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৩০১

১৯. প্রাগুক্ত-৫/৩০৭

২০. তাবাকাত-৫/৪৮০

২১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৩০২; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৩

হয়ে পড়েন তখনও নিজের বাসস্থান থেকে বেশ দূরে মসজিদেই নামায আদায় করতেন। সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না (রহ) বলেন, তিনি জীবনের কোন পর্যায়ে মসজিদে যাওয়া-আসা বন্ধ করেননি। গাধার পিঠে বসিয়ে তাঁকে মসজিদে আনা হতো। বার্ধক্যের একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন কোন বাহন ছাড়া চলতেই পারতেন না তখন আমি সব সময় তাঁকে মসজিদে যাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকতে দেখতাম। আমার বয়স কম হওয়ার কারণে আমি তাঁকে বাহনের পিঠে উঠিয়ে দিতে পারতাম না। তবে কিছু দিন পর উঠিয়ে দিতে পারতাম। তাঁর বাসস্থান মসজিদ থেকে দূরে ছিল।[২২]

ইসলামী সেবামূলক কাজের বিনিময়ে কোন কিছু না নেয়া

তিনি সেবামূলক কোন কাজের বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা ভালো মনে করতেন না। এ জাতীয় সকল কাজ তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতেন। তৎকালীন খলীফা একবার তাঁর ইচ্ছার কথা এভাবে ব্যক্ত করেন যে, আমি আপনার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেই, আর আপনি নিশ্চিন্ত মনে ফাতওয়ার দায়িত্বটি পালন করে যান। তিনি এ প্রস্তাবে রাজী হননি। কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই পূর্বে যে রকম দায়িত্ব পালন করছিলেন, সেভাবে পালন করতে থাকেন।[২৩]

আল-ওয়াকিদী বলেছেন, 'আমর ইবন দীনার হিজরী ১২৬ সনে আশি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।[২৪]

---

২২. তাবাকাত-৫/৪৭৯

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১১৩

রাবী'আ ইবন ফাররূখ আর-রায় (রহ)

হিজরী ৫১ সনের কথা। মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী তখন ইসলামের সুমহান বিশ্বাস ও বাণী বহন করে দিক্‌বিদিক ছড়িয়ে পড়েছে, বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের দিকে তাঁদের দয়া ও মমতাভরা হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁরা জনপদের পর জনপদে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসছে। বিজয়ী সেনাপতি, সিজিস্তান বিজয়ী ও খুরাসানের আমীর মহান সাহাবী আর-রাবী' ইবন যিয়াদ আল-হারিছী (রা) তাঁর বাহিনীসহ রণাঙ্গনে অবস্থান করছেন। সংগে আছেন তাঁর সাহসী দাস ফাররূফ।

সিজিস্তান ও তার আশে-পাশের অঞ্চলসমূহ বিজয়ের পর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন 'সায়হূন'[১] নদী পার হবেন এবং 'মা ওয়ারা আন-নাহ্‌র' নামে পরিচিত অঞ্চলে ইসলামী ঝাণ্ডা উড্ডীন করবেন। অভিযানের তোড়জোড় শুরু করলেন এবং এর জন্য সৈন্য, রসদপত্র, অস্ত্রশস্ত্র যা কিছু প্রয়োজন সংগ্রহ করে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এক সময় অভিযান শুরু হলো। ভয়াবহ যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করে সামনে এগিয়ে চললেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী নদী পার হলো। তখন তাদের সামনে বিশাল তুর্কিস্তান, চীন ও মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সায়হূন নদী পার হয়ে নিজেদের অবস্থান একটু শক্ত করে সেনাপতি রাবী' ইবন যিয়াদ (রা) নিজে নদীর পানি দ্বারা ওযু করেন এবং সৈনিকদেরকেও ওযু করতে নির্দেশ দেন। তারপর সকলে এই বিজয় ও সাফল্যের জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের শুকরিয়া আদায় করেন দু'রাক'আত নামায আদায়ের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, সায়হূন নদী পার হওয়ার সময় যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয় তাতে সেনাপতির দাস ফাররূফ দারুণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। এতে সেনাপতি রাবী' (রা) ভীষণ খুশী হন। নদী পার হওয়ার পর দাসকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেন। তাই শোকরানা নামায আদায়ের পর তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তির ঘোষণা দেন। গনীমাতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে বড় একটি অংশ এবং নিজের সম্পদ থেকেও প্রচুর অর্থ-সম্পদ তাঁকে দান করেন।

এই যুদ্ধের মাত্র দু'বছর পর মহান সেনাপতি রাবী' ইবন যিয়াদ (রা) ইনতিকাল করেন। মনীবের মৃত্যুর পর বীর যুবক ফাররূফ মদীনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গনীমাতে তাঁর অংশের বিপুল অর্থ-সম্পদ, আর সেই সাথে মনীবের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদ নিয়ে একদিন মদীনার দিকে যাত্রা করেন।

ফাররূফ মদীনায় ফিরে আসলেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় তিরিশ বছর। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা মদীনার অলিতে-গলিতে আলোচিত হচ্ছে। মানুষের মনকাড়া চেহারা,

---

১. সায়হূন একটি বিশাল নদী। সমরকন্দের পরে তুর্কিস্তান সীমান্তে প্রবাহিত।

সুস্বাস্থ্য ও পূর্ণ যৌবনের অধিকারী এক ব্যক্তি তিনি। মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ জন্য একটি বাড়ী বানানো ও বিয়ে করার কথা ভাবলেন। মদীনার মধ্যম ধরনের একটি বাড়ী কিনলেন। তারপর নিজের সমবয়সী শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী ও দীনদার এক মহিলাকে বিয়ে করলেন।

নতুন বাড়ীতে নব বধূর সাথে অতি সুখেই দিন কাটছিল। আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল তাঁদের জীবন। কিন্তু যে যুবক বেড়ে উঠেছে অশ্বের পিঠে ও তরবারির ছায়ায় এবং যার ঘুম ভেঙ্গেছে শত্রুর রণ হুংকারে, এত আনন্দময় জীবন তাঁর ভালো লাগার কথা নয়। এ জীবন তাঁর সৈনিক জীবনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারলো না। তিনি আবার রণাঙ্গনে ফিরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ও শাহাদাতের তীব্র বাসনা সব সময় তাঁকে স্ত্রীর ভালোবাসা ও পরিবারের আকর্ষণ ছিন্ন করার জন্য তাগাদা দিতে লাগলো। তাঁকে আরো ব্যাকুল করে তুলতো যখন মদীনার রাস্তা-ঘাটে চলার সময় বিভিন্ন রণাঙ্গনের বিজয়ের খবর তাঁর কানে আসতো।

ফাররূখের মনের অবস্থা যখন এমন পর্যায়ে তখন তিনি এক জুম'আর দিনে মসজিদে নববীতে গেছেন নামায আদায় করতে। খতীব সাহেব মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর গুরুত্বের কথা বলে সকলকে জিহাদে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করলেন। সেই সাথে বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের কথাও ঘোষণা করলেন। মদীনা থেকে বিভিন্ন রণাঙ্গনগামী বাহিনীসমূহের যে কোন একটিতে নাম লিখানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি ঘরে ফিরে আসলেন। এক সময় সুযোগ মত স্ত্রীকে তাঁর এ সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। স্ত্রী বললেন :

–আবূ 'আবদির রহমান! আপনি আমাকে এবং আমার গর্ভে আপনার যে সন্তান রয়েছে তাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? মদীনায় আপনি একজন বহিরাগত। এখানে আপনার আত্মীয়-স্বজন ও গোত্র-গোষ্ঠীর কেউ নেই।

বললেন : আমি তোমাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হিফাযতেই ছেড়ে যাচ্ছি। গনীমাতের অংশে আমি যে সম্পদ পেয়েছি তার থেকে তিরিশ হাজার দীনার জমা রেখেছি, তা তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি এ অর্থ সংরক্ষণ করবে, ব্যবসায় খাটিয়ে আরো বৃদ্ধি করবে। আর এর থেকেই তোমার নিজের ও আমাদের সন্তানের জন্য খরচ করতে থাকবে। এর মধ্যে আমি আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসবো অথবা আল্লাহ আমাকে শাহাদাত দান করবেন।

এভাবে স্ত্রীকে রাজি করিয়ে তাঁকে আল্লাহ ও রাসূলের হিফাযতে রেখে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে স্বামী বিচ্ছেদ-ব্যথায় কাতর স্ত্রী কিছুদিন পরে চাঁদের মত সুন্দর ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। সন্তান পেয়ে দারুণ খুশী হলেন এবং তার পিতার বিচ্ছেদ-ব্যথা ভুলে গেলেন। তিনি এই শিশু সন্তানের নাম রাখেন 'রাবী'আ'। শৈশবেই তার কথা ও কাজে মেধা ও বুদ্ধির প্রকাশ ঘটতে থাকে। মা তার শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সে লেখা ও পড়ায় দক্ষ

হয়ে ওঠে। এরপর সে কুরআন হিফ্য করে। তাঁর কুরআন তিলাওয়াত হয় অতি চমৎকার। তাঁর তিলাওয়াত শুনে মনে হতো এখনই যেন তা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) উপর নাযিল হচ্ছে। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) বহু হাদীছও মুখস্থ করেন। আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। দীনী 'ইলমের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ বুৎপত্তিও লাভ করেন। মা তার ছেলের সুশিক্ষার জন্য তার পিতার রেখে যাওয়া অর্থ থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। শিক্ষকদেরকে উচ্চ হারে ভাতা ও মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন দিতেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলের কিছু সাফল্য দেখলে তিনি শিক্ষকদেরকেও সেই হারে উপহার দিতেন। এভাবে তিনি স্বামীর অনুপস্থিতিতে অতি যত্নের সাথে ছেলেকে গড়ে তোলেন।

সুশিক্ষা নিয়ে ছেলে বড় হচ্ছে। মা ছেলের পিতার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় দিন গুনতে থাকেন। কবে আসবেন তিনি, যখন প্রাণপ্রিয় ছেলেকে তাঁর হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু তাঁর এ প্রতীক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। ফাররূখের ফেরার সময় আর হয় না। এদিকে তাঁর সম্পর্কে নানা কথা শোনা যেতে থাকে। যেমন, অনেকে বলতে থাকে তিনি শত্রু বাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছেন, আবার কেউ কেউ বলতে থাকে তিনি এখনো জিহাদের ময়দানে আছেন। অন্যদিকে রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসা একদল মুজাহিদ বলতে থাকে, তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন। যে শাহাদাতের তীব্র বাসনা তিনি আজীবন লালন করেছেন। রাবী'আর মা শেষ কথাটিই বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন এবং দুঃখ-বেদনায় ভীষণ কাতর হয়ে পড়েন। তারপর এক সময় স্বাভাবিক হয়ে তাঁর জন্য আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দু'আ করেন।

রাবী'আ তখন কৈশর পেরিয়ে যৌবনে পা রেখেছেন। তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর মাকে বললেন : আল্লাহর ইচ্ছায় রাবী'আ তো এখন বেশ লেখা-পড়া শিখেছে। সে তার সংগীদের ডিঙ্গিয়ে কুরআন হিফ্য করেছে এবং হাদীছও বর্ণনা করা শুরু করেছে। এখন তার কোন একটি পেশা বেছে নিয়ে তাতে দক্ষ হওয়া উচিত হবে। তাহলে কিছু ভালো আয়-রোজগার করতে পারবে এবং আপনারা স্বচ্ছল জীবন যাপন করতে পারবেন। মা বললেন : আমি আল্লাহর কাছে চাই, তিনি যেন তার জন্য এমন কিছু নির্বাচন করে দেন যাতে তার পার্থিব জীবনে সুন্দর জীবিকা এবং পরকালীন জীবনে সুখ-শান্তির ব্যবস্থা হয়। রাবী'আ নিজের জন্য জ্ঞানচর্চাকে বেছে নিয়েছে। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ছাত্র ও শিক্ষক হয়েই থাকবে।

রাবী'আ নিজের জন্য যে পথ বেছে নেন, কোন রকম দ্বিধা-সংশয় ও জড়তা-অলসতা ছাড়াই সেই পথে চলতে থাকেন। মদীনার মসজিদে জ্ঞান চর্চার মজলিস ও আসরসমূহে অংশ গ্রহণ চলতে থাকে অবিচ্ছিন্নভাবে। তখনও যে সকল মহান সাহাবী জীবিত ছিলেন, তাঁদের নিকট, বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহর (সা) খাদিম হযরত আনাস ইবন মালিকের (রা) আসরে অংশ গ্রহণ করতেন। প্রথম শ্রেণীর মহান তাবি'ঈ, যেমন সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, মাকহূল আশ-শামী, সালামা ইবন দীনার (রহ) প্রমুখের দারসের মজলিসেও বসতেন। জ্ঞান চর্চায় তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করতে লাগলেন। তাঁর এমন শ্রম ও সাধনা

দেখে অনেকে তাঁর প্রতি দয়া-ও সহানুভূতি প্রকাশ করতো। জবাবে তিনি বলতেন, আমি শিক্ষকদের মুখে শুনেছি :

إِنَّ الْعِلْمَ لاَ يُعْطِيْكَ بَعْضَهُ إِلاَّ إِذَا أَعْطَيْتَهُ نَفْسَكَ كُلَّهَا.

"জ্ঞানের কিছু অংশ তোমাকে কেবল তখনই দান করা হবে যখন তুমি তাকে নিজের সবটুকু দান করবে।"

এরপর তাঁর নাম ও খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র ও গুণমুগ্ধের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। প্রতিটি দিন তাঁর কাটে একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। দিনের একটি অংশ কাটে বাড়ীতে মায়ের সাথে এবং অপর অংশ কাটে মসজিদে নববীর জ্ঞান চর্চার হালকা ও মজলিসসমূহে। একই নিয়ম ও রীতিতে চলতে থাকেন দিনের পর দিন।

গ্রীষ্মের এক চন্দ্রালোকিত রাতে একজন অশ্বারোহী মুজাহিদ মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করলেন। বয়স তাঁর ষাটের দশকের শেষ প্রান্তে। তিনি অশ্বের পিঠে বসেই সোজা তাঁর বাড়ীর দিকে যাচ্ছেন। তিনি জানেন না, এত দিন তাঁর বাড়ীটি ঠিক আছে, না কালের করাল গ্রাসে পরিণত হয়েছে। প্রায় তিরিশ বছর পর বা তার কাছাকাছি সময় হবে, তিনি সেই বাড়ী ছেড়ে যান। তিনি চলছেন, আর মনে মনে ভাবছেন তাঁর সেই যুবতী স্ত্রী ও তার গর্ভের সন্তানের কথা। তিনি ভাবছেন, সেই সন্তানটি কি ছেলে হয়েছিল, না মেয়ে? সে কি জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, না মৃত? জীবিত থাকলে বর্তমানে তার অবস্থা কি? বুখারা, সমরকন্দ ও তার আশে-পাশের অঞ্চলসমূহে জিহাদে যাওয়ার সময় জীবনের প্রথম ভাগে প্রাপ্ত গনীমাতের যে বিপুল পরিমাণ অর্থ স্ত্রীর হাতে দিয়ে যান, সে কথাও মনে মনে ভাবছেন।

মদীনার রাস্তাঘাট এখনো পূর্বের মত মানুষের চলাচলে সরব। মসজিদে নববীতে সবেমাত্র 'ঈশার সালাত শেষ হয়েছে। কিন্তু তিনি যাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন তাদের কেউ তাঁকে চেনে না। কেউ তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করছে না, এমনকি তাঁর উন্নত জাতের অশ্বটি ও কাঁধে ঝোলানো তরবারিটির দিকেও তাকাচ্ছে না। তখন ইসলামী বিশ্বের শহরগুলোতে মানুষ সদ্য রণাঙ্গন থেকে আগত মুজাহিদদের এমন দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ অশ্বারোহীকে পথচারীরা মোটেই গুরুত্ব না দেওয়ায় তিনি ভীষণ দুঃখ পেলেন। নানা কথা তাঁর মনে উঁকি দিচ্ছে। এভাবে ভাবনার সাগরে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ এক সময় তিনি নিজের বাড়ীর সামনে এসে পড়েন। বাড়ীর বাইরের দরজাটি খোলা ছিল। আনন্দের আতিশয্যে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি নেওয়ার কথা ভুলে গিয়ে অশ্ব হাঁকিয়ে সোজা বাড়ীর ভিতরের আঙ্গিনায় পৌঁছে যান।

আঙ্গিনায় মানুষের উপস্থিতি বুঝতে পেরে বাড়ীর মালিক দোতলা থেকে উঁকি দিয়ে চাঁদের আলোতে দেখতে পান, একজন সশস্ত্র ব্যক্তি ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তিনি মনে করলেন,

হয়তো ডাকাতির উদ্দেশ্যে সে ঢুকেছে। গৃহ-স্বামীর যুবতী স্ত্রী আগন্তুক লোকটির দৃষ্টির আড়ালে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটি লক্ষ্য করছেন। গৃহ-স্বামী রাগে-উত্তেজনায় খালি পেয়ে নীচে নেমে আসেন এবং হুংকার ছেড়ে বলেন : 'ওরে আল্লাহর দুশমন! রাতের অন্ধকারে আমার বাড়ীতে ডাকাতি করতে চাস?' –তিনি লোকটিকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিজের আস্তানায় আক্রান্ত বাঘের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। দু'জনের ধস্তা-ধস্তি ও হাঁক-ডাকে চারিদিক থেকে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। আগন্তুক লোকটিকে তারা ঘিরে ফেলে এবং যুবক গৃহ-স্বামী তাঁকে ধরে বেঁধে ফেলেন। চিৎকার করে তিনি বলতে থাকেন : ওহে আল্লাহর দুশমন! তোকে আমি ছাড়বো না। তোকে আমি কাজীর নিকট সোপর্দ করবো।

লোকটি বললো : আমি আল্লাহর দুশমন নই। আমি কোন অপরাধ করিনি। এতো আমার বাড়ী, এ বাড়ী আমার কেনা। বাড়ীর দরজা খোলা দেখে আমি ঢুকে পড়েছি। তারপর তিনি উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে বলেন : ভায়েরা! আমার কথা একটু শুনুন! এ বাড়ী আমার, নিজের অর্থে এটি আমি কিনি। ভায়েরা! আমি ফাররূখ। প্রতিবেশীদের মধ্যে এমন কেউ কি জীবিত নেই যে ফাররূখকে চেনে? যে ফাররূখ তিরিশ বছর পূর্বে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছিল? গৃহ-স্বামীর মা ঘুমিয়ে ছিলেন। বাড়ীর আঙ্গিনায় শোরগোল শুনে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। উপর তলার জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখতে পান, তাঁর স্বামী দাঁড়িয়ে। আনন্দ ও বিস্ময়ে তাঁর কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন : তাঁকে ছেড়ে দাও। রাবী'আ! ছেড়ে দাও। আমার ছেলে! ছেড়ে দাও। ইনি তোমার পিতা। আমার প্রতিবেশী ভায়েরা! আল্লাহ আপনাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন। আপনারা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যান।

তারপর স্বামীকে লক্ষ্য করে বলেন, আবূ 'আবদির রহমান! এতক্ষণ আপনি যার সঙ্গে ধস্তা-ধস্তি করছিলেন, সে আপনার কলিজার টুকরো ছেলে।

কথাগুলো কানে যেতেই ফাররূখ দ্রুত রাবী'আর দিকে এগিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। রাবী'আও ফাররূখকে জড়িয়ে ধরে তাঁর হাত, মাথা, মুখে ও কাঁধে চুম দিতে থাকেন। প্রতিবেশীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিতা-পুত্রের এ মিলন দৃশ্য অবলোকন করে নিজ নিজ বাড়ীর দিকে চলে গেল।

রাবী'আর মা নীচে নেমে আসলেন এবং স্বামীকে সালাম করলেন। তিরিশ বছর যাবত যাঁর সংগে কোন যোগাযোগ নেই, তাঁর সাথে যে এই পৃথিবীতে আবার দেখা হবে তা তিনি কখনো ধারণাই করতে পারেননি।

ফাররূখ তাঁর স্ত্রীর পাশে বসলেন। নিজের কথা বলতে লাগলেন, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু স্ত্রী সেসব কথা শোনার দিকে তেমন মন নেই। স্বামীকে ফিরে পাওয়া ও ছেলের সাথে পিতার সাক্ষাতের সব আনন্দ একটা ভয় ম্লান করে দিচ্ছে। তাঁর ভয় হচ্ছে, কখন না জানি তিনি তাঁর রেখে যাওয়া বিপুল অঙ্কের অর্থের কথা জিজ্ঞেস করে বসেন এবং কোথায় কিভাবে তা খরচ করা হয়েছে তা জানতে চান!

যাবার সময় তিনি বলে যান, হিসেব করে প্রয়োজন মত খরচ করবে। এখন তো সেই অর্থের কিছুই অবশিষ্ট নেই। একথা শোনার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া কি হবে এবং তিনি কি তাঁর কথা বিশ্বাস করবেন? তিনি তো সে অর্থ তাঁর ছেলের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় করেছেন। ছেলের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ কি তিরিশ হাজার দীনারে পৌঁছবে? তিনি কি বিশ্বাস করবেন তাঁর ছেলের হাত বর্ষণরত মেঘের চেয়েও উদার? তাঁর ছেলের হাতে একটি দীনার ও দিরহামও থাকে না? গোটা মদীনা জানে, সে তাঁর বন্ধুদের জন্য হাজার হাজার দিরহাম খরচ করে।

রাবী'আর মা যখন এসব চিন্তায় নিমগ্ন তখন পাশে বসা তাঁর স্বামী বললেন : রাবী'আর মা! আমি তোমার জন্য আরো চার হাজার দীনার নিয়ে এসেছি। এখন পূর্বে রেখে যাওয়া দীনারগুলো বের কর এবং তার সাথে এগুলো মিলিয়ে রেখে দাও। তারপর এ অর্থ দিয়ে আমরা একটি বাগিচা অথবা ভূমি ক্রয় করবো। তাতে উৎপাদিত ফসল দ্বারা আমরা আমাদের বাকী জীবন স্বাচ্ছন্দে কাটিয়ে দেব।

রাবী'আর মা কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। স্বামী আবার তাগাদা দিয়ে বললেন : ওঠো তো, দেখি সেই অর্থ কোথায় রেখেছো? তার সাথে এইগুলো মিলিয়ে রাখি। তিনি বললেন : দীনারগুলো যেখানে রাখা উচিত সেখানেই রেখেছি। অল্প কিছুদিন পরেই আমি তা বের করবো ইনশাআল্লাহ।

মুআয্যিনের আযান ধ্বনি স্বামী-স্ত্রীর কথা বন্ধ করে দিল। ফাররূখ ওযু করার জন্য উঠে গেলেন। ওযু শেষ করে দ্রুত দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন : রাবী'আ কোথায়? বাড়ীর সবাই বলে উঠলো : আযানের প্রথম তাকবীর শোনা মাত্র সে মসজিদে চলে গেছে। আপনি জামা'আত পাবেন বলে আমাদের মনে হয় না।

ফাররূখ মসজিদে পৌঁছে দেখলেন, ইমাম সাহেব এই মাত্র নামায শেষ করেছেন। তিনি একাকী নামায আদায় করেন। তারপর এক পা, দু'পা করে রাসূলে কারীমের (সা) কবর শরীফের দিকে এগিয়ে যান এবং সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দুরূদ ও সালাম পেশ করেন। সেখান থেকে পবিত্র 'রাওজা'র'[২] দিকে যান দু'রাক'আত নামায আদায়ের জন্য। এ বাসনা তিনি দীর্ঘকাল চেপে রেখেছেন নিজের অন্তর মাঝে। একটি স্থান বেছে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন, তারপর অন্তর খুলে হাত উঠিয়ে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন।

তিনি মসজিদ থেকে বের হতে যাবেন, তখন দেখলেন মসজিদের আঙ্গিনায় বিশাল এক 'ইল্মী মজলিস (জ্ঞান চর্চার আসর)। জ্ঞান চর্চার এমন আসর তিনি জীবনে আর কোন দিন দেখেননি। মানুষ শায়খকে কেন্দ্র করে একের পর এক সারি দিয়ে গোলাকৃতিতে বসে আছে। আঙ্গিনায় পা ফেলার জায়গা নেই। চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখেন, সেখানে পাগড়ী পরিহিত অনেক বয়স্ক শায়খ ও বহু সম্মানিত ব্যক্তিও বসে আছেন। তাঁদের

---

২. রাসূলুল্লাহর (সা) কবর ও তাঁর মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান। (সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৪৯)

পোশাক দেখেই বুঝা যাচ্ছে তাঁরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ। বহু যুবক হাঁটু গেড়ে বসে আছে, হাতে তাদের কলম। শায়খের মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি কথা এমনভাবে লিখে নিচ্ছে যেন ছড়ানো মুক্তো তারা কুড়াচ্ছে। অতি মূল্যবান জিনিস যেভাবে সংরক্ষণ করা হয় সেভাবে তারা তাদের দফতরসমূহে শায়খের বাণী সংরক্ষণ করছে। শায়খ যেখানে বসে আছেন মানুষের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ। তারা সকলে নিরব-নিথর। শায়খের থেকে যারা দূরে তাদের নিকট শায়খের বাণী পৌঁছে দিচ্ছে একটু দূরে দূরে দাঁড়ানো একদল মুবাল্লিগ। তাঁরা শায়খের প্রতিটি কথা ধীরে ধীরে একটি একটি করে বাক্য জোরে জোরে উচ্চারণ করে দূরবর্তীদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে। ফাররূখ শায়খকে দেখার জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু সক্ষম হলেন না। কারণ, তাঁর অবস্থান তো মজলিসের শেষ প্রান্তে।

শায়খের চমৎকার বাচনভঙ্গি, অগাধ জ্ঞান ও বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি দেখে তিনি ভীষণ মুগ্ধ। তিনি আরো বিস্মিত তাঁর প্রতি মানুষের বিনয় ও ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখে।

অল্প কিছুক্ষণ পর শায়খ তাঁর মজলিস ভেঙ্গে দিয়ে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। শ্রোতারাও উঠে দাঁড়িয়ে হুড়মুড় করে তার দিকে এগিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরলো। তারপর তারা সকলে শায়খের পিছে পিছে গিয়ে তাঁকে মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

ফাররূখ তাঁর পাশে বসা লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো : অনুগ্রহ করে বলুন তো এ শায়খের পরিচয় কি? লোকটি বিস্ময়ের সুরে বললো : কি ব্যাপার, আপনি কি মদীনায় থাকেন না? বললেন : হাঁ, আমি মদীনায় থাকি। লোকটি বললো : মদীনায় এমন একজনও কি আছে যে, এই শায়খকে চেনে না? ফাররূখ বললেন : আমি যে তাঁকে চিনিনে এজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি প্রায় তিরিশ বছর মদীনার বাইরে ছিলাম। এই গতকাল মাত্র ফিরেছি। লোকটি বললো : ঠিক আছে, আমার কাছে কিছুক্ষণ বসুন, আমি আপনাকে শায়খ সম্পর্কে বলছি। তারপর লোকটি বললো : এই মাত্র যে শায়খের কথা শুনেছেন তিনি নেতৃস্থানীয় তাবি'ঈদের একজন এবং মুসলিম উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম। তিনি মদীনার মুহাদ্দিছ, ফকীহ এবং ইমাম। যদিও তিনি বয়সে একজন তরুণ।

ফাররূখ বললেন : মাশাআল্লাহ! লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

লোকটা বলতে লাগলো : আপনি তো দেখেছেন, তাঁর মজলিসে সমাবেশ ঘটে মালিক ইবন আনাস, আবূ হানীফা আন-নু'মান, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, 'আবদুর রহমান ইবন 'আমর আল-আওযা'ঈ, আল-লায়ছ ইবন সা'দ (রহ) ও আরো অনেকের।

ফাররূখ কিছু বলতে চাইলেন। তবে লোকটি তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়ে আবার বলতে লাগলেন : উপরন্তু তিনি একজন উন্নত চরিত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। দারুণ বিনয়ী ও দানশীল। মদীনাবাসীরা এমন উদার দানশীল মানুষ খুব কমই দেখেছে। দুনিয়ার ভোগ-ঐশ্বর্যের প্রতি উদাসীনতা এবং পরম আল্লাহ নির্ভরতা তাঁর চরিত্রের একান্ত বৈশিষ্ট্য।

ফাররূখ বললেন : কিন্তু তাঁর নামটি তো বললেন না। লোকটি বললো : ও, হাঁ, তাঁর নাম রাবী'আতুর রা'য়।

ফাররূখ উচ্চারণ করলেন : রাবী'আতুর রা'য়!

লোকটি বললো : হাঁ, তাঁর নাম রাবী'আ। তবে মদীনার 'আলিম ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ তাঁর নামের সাথে আর-রা'য় যোগ করে রাবী'আতুর রা'য় বলে থাকেন। কারণ, কোন মাসয়ালায় যখন তারা কুরআন ও সুন্নাহ্তে সরাসরি কোন সমাধান খুঁজে পান না তখন তাঁরা রাবী'আর শরণাপন্ন হন। তিনি কিয়াসের মাধ্যমে এমন চমৎকার সমাধান দেন যে, সকল শ্রেণীর মানুষ সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

ফাররূখ বললেন : কিন্তু আপনি তো তাঁর পিতার নাম বললেন না।

লোকটি বললো : তিনি রাবী'আ ইবন ফাররূখ।

অর্থাৎ তাঁর পিতার নাম ফাররূখ। তবে তাঁর কুনিয়াত বা ডাকনাম আবূ 'আবদির রহমান।

তাঁর পিতা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগের পর তাঁর জন্ম হয়। মা-ই তাঁকে লালন-পালন ও লেখাপড়া শেখান। নামাযের কিছুক্ষণ আগে আমি মানুষের মুখে শুনেছি গত রাতে তিনি বাড়ী ফিরেছেন।

এতটুকু শোনার পর ফাররূখের দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। লোকটি এর কারণ বুঝতে পারলো না। ফাররূখ বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন। বাড়ীতে পৌঁছার পর রাবী'আর মা তাঁর চোখে পানি দেখে জিজ্ঞেস করেন : রাবী'আর আব্বা! আপনার কী হয়েছে?

বললেন : আমার কিছুই হয়নি, আমি ভালো আছি। মসজিদে আমার ছেলেকে জ্ঞান ও মর্যাদার যে আসনে আমি দেখেছি, এর আগে তেমন আর কাউকে দেখিনি।

সুযোগ বুঝে এবার রাবী'আর মা বললেন : সেই তিরিশ হাজার দীনার এবং আপনার ছেলের জ্ঞান ও মর্যাদার এই উচ্চাসন লাভ-এর কোনটি আপনার বেশি প্রিয়?

ফাররূখ বললেন : আল্লাহর কসম! দুনিয়ার সকল সম্পদ আমার হাতে থাকার চেয়ে ছেলের এই অবস্থানই আমার বেশি প্রিয়।

রাবী'আর মা বললেন : যে অর্থ আপনি রেখে গিয়েছিলেন তা সবই আমি আপনার এই ছেলের পিছনে ব্যয় করেছি। আমি যা করেছি তাতে কি আপনি খুশী?

বললেন : হাঁ, আমি দারুণ খুশী।[৩]

রাবী'আর পরিচয়

রাবী'আর ডাকনাম আবূ 'উছমান, উপাধি আর-রায়। পিতা আবূ 'আবদির রহমান ফাররূখ। তিনি বানূ তাইম ইবন আল-জাররাহ-এর দাস ছিলেন। এই দাসের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে রাবী'আ পরবর্তীকালে জ্ঞানের জগতের উচ্চাসন অলঙ্কৃত করেন। একটি বর্ণনা মতে তাঁর পিতা বানূ মাররা গোত্রের আল-হুদাইর শাখার দাস ছিলেন।[৪]

---

৩. প্রাগুক্ত-১৩৫-১৫৪; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৪-১৬৫

৪. তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৬

তিনি ছিলেন মদীনার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম তাবি'ঈ। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতা 'আলিম-মুহাদ্দিছগণ কর্তৃক স্বীকৃত ছিল। ইমাম নাওবী (রহ) লিখেছেন, তাঁর মহত্ত্ব, মর্যাদা, জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠতার ব্যাপারে 'আলিম ও মুহাদ্দিছগণ একমত।[৫] ইমাম আয-যাহাবী (রহ) বলেন :[৬]

كان إماما حافظا فقيها مجتهدا بصيرا بالرأى ولذلك يقال له ربيعة الرأى.

"তিনি ছিলেন একাধারে হাদীছের হাফিজ, ফকীহ, মুজতাহিদ এবং বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। আর এ কারণে তাঁকে রাবী'আতুর রায় বা যুক্তিবাদী রাবী'আ বলা হয়। খতীব আল-বাগদাদী বলেন :[৭]

كان فقيها عالما حافظا للفقه والحديث.

"তিনি ছিলেন একজন ফকীহ, 'আলিম এবং ফিক্‌হ ও হাদীছের হাফিজ।" ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, 'আবদুল্লাহ আল-'ইজলী, আবূ হাতিম ও আন-নাসাঈ তাঁকে "ছিকা" বা বিশ্বস্ত বলেছেন। আর ইয়া'কূব ইবন শায়বা তাঁকে মদীনার মুফতী ও অত্যন্ত দৃঢ়পদ ব্যক্তি বলেছেন।[৮]

শিক্ষা

পিতার রেখে যাওয়া তিরিশ হাজার দীনার রাবী'আর মা তাঁর ছেলের শিক্ষার পিছনে ব্যয় করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। এ কারণে খুব দ্রুত শিক্ষা জীবন শেষ করেন। যৌবনের সূচনাতেই সেকালে প্রচলিত সকল শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হন। মাত্র ছাব্বিশ/সাতাশ বছর বয়সে তাঁর খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মানুষের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের উৎসে পরিণত হন।

হাদীছ

হযরত রাবী'আর (রহ) যে খ্যাতি তা প্রধানতঃ তাঁর ফিকহ্ শাস্ত্রে অতুলনীয় দক্ষতার কারণে। তবে তিনি হাদীছেরও একজন প্রথম শ্রেণীর হাফিজ ছিলেন। তাঁর স্মৃতিতে হাদীছ ধারণের ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। আল্লামা ইবন সা'দ তাঁকে বিশ্বস্ত ও বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী বলেছেন। খতীব আল-বাগদাদী তাঁকে ফিকহ্ ও হাদীছের হাফিজ বলেছেন। আল্লামা যাহাবী বলেছেন, তিনি একজন ইমাম ও হাফিজে হাদীছ ছিলেন।[৯] হাদীছ বিষয়ে তাঁর অসামান্য দক্ষতা তার সমকালীনদের নিকট স্বীকৃত ছিল। একবার 'আবদুল 'আযীয ইবন আবী সালামা ইরাক গেলেন। ইরাকীরা তাঁকে বললো,

---

৫. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১/১৫৯
৬. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৫৭
৭. তারীখু বাগদাদ-৮/৪২১; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৫৭
৮. তাহ্‌যীব আল-কামাল-৬/১৬৪
৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৩/২৫৮; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৫৭

আপনি কি রাবী'আ আর-রায় বা যুক্তিবাদী রাবী'আর হাদীছসমূহ শুনেছেন? তিনি বললেন, তোমরা যাঁকে যুক্তিবাদী রাবী'আ বলছো, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর চেয়ে সুন্নাহ বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞ আর কাউকে দেখিনি।[১০] ইবনুল মাজেশূন বলেন :[১১]

ما رأيت أحدًا أحفظ لسنة من ربيعة.

'আমি রাবী'আর চেয়ে সুন্নাহ অধিক স্মৃতিতে ধারণকারী আর কাউকে দেখিনি।' বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ ছিলেন রাবী'আর বিশেষ ছাত্র। তিনি তাঁর উস্তাদ রাবী'আর জীবদ্দশায়ই একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি স্বীয় উস্তাদের অনুপস্থিতিতে হাদীছের দারস দিতেন।[১২] এ দ্বারাও অনুমান করা যায় হাদীছ শাস্ত্রে হযরত রাবী'আর (রহ) স্থান কী ছিল।

সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে হযরত আনাস ইবন মালিক ও সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা) এবং তাবি'ঈদের মধ্যে হানজালা ইবন কায়স, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, ইবন আবী লায়লা, আ'রাজ, মাকহূল, 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (রহ) প্রমুখ মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন।

অন্যদিকে ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ, তাঁর ভাই ইবন 'আবদি রাব্বিহি, সুলায়মান আত-তায়মী, মালিক, শু'বা, সুফইয়ান ছাওরী, সুফইয়ান ইবন 'উয়াইনা, হামাদ ইবন সালামা, লাইছ আওযা'ঈ, সুলায়মান ইবন বিলাল, ইসমা'ঈল ইবন জা'ফার, আনাস ইবন দামরা (রহ) প্রমুখের মত বড় বড় মুহাদ্দিছ তাঁর ছাত্র ছিলেন।[১৩]

ফিক্হ

ফিক্হ শাস্ত্রে ছিল হযরত রাবী'আর (রহ) বিশেষ ব্যুৎপত্তি। তিনি ছিলেন এ শাস্ত্রের একজন ইমাম ও মুজতাহিদ এবং খ্যাতিতে তাঁর সমকালীন অন্য সকলকে অতিক্রম করে যান। তাঁর ফিক্হ বিষয়ে দক্ষতার ক্ষেত্রে তাঁর স্বভাবগত যোগ্যতা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তিনি দারুণ মেধাবী ও প্রতিভাবান ছিলেন। ইয়াহইয়া সা'ঈদ বলেন, আমি তাঁর চেয়ে বেশি সঠিক বুদ্ধির মানুষ আর দেখিনি।[১৪] এই অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিমত্তা তাঁর মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা সৃষ্টি করে দেয়। সুতরাং কিয়াস ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান বের করতে পারঙ্গম ছিলেন। এ কারণে তাঁকে যুক্তি ও বুদ্ধিবাদী অভিধায় ভূষিত করা হয়।[১৫]

ফিক্হ শাস্ত্রে এমন দক্ষতার কারণে তৎকালীন জ্ঞানের নগরী মদীনার ইফতার মসনদে আসীন হন। মুস'আব আয-যুবায়রী বলেন :

---

১০. তারীখু বাগদাদ/৮/৪২৪; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৬
১১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৮; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-১৩৫
১২. তারীখু বাগদাদ-৮/৪২৩
১৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/২৫৮; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৬
১৪. তারীখু বাগদাদ-৮/৪২৩; তাবি'ঈন-১২০
১৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৭

هو صاحب الفتوى بالمدينة. كان يجلس إليه وجوه الناس.

"তিনি মদীনার একজন মুফতী ছিলেন। বহু সম্মানীয় ব্যক্তি তাঁর ফাতওয়ার মজলিসে বসতেন।"[১৬]

আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর প্রথম খলীফা আবুল 'আব্বাস আস-সাফ্ফাহ্ তাঁকে ডেকে নিয়ে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেন। ইমাম মালিক (রহ) ছিলেন তাঁর বিশেষ ছাত্র। প্রিয় উস্তাদের ইনতিকালের পর তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় :[১৭]

ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة بن أبى عبد الرحمن.

"এখন ফিক্হর মিষ্ট-মাধুর্য চলে গেল।" ইমাম আ'জম আবূ হানীফার (রহ) মত শ্রেষ্ঠ ফকীহ এবং যুক্তি ও কিয়াস প্রয়োগকারী ব্যক্তিও রাবী'আর মজলিসে হাজির হতেন এবং তাঁর কথা ও সিদ্ধান্তসমূহ বুঝার চেষ্টা করতেন।[১৮]

ফাতওয়া দানে তাঁর সতর্কতা

ইজতিহাদ, যুক্তি ও কিয়াস প্রয়োগে এত ক্ষমতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কোন মাসয়ালায় যুক্তি ও কিয়াস প্রয়োগের ক্ষেত্রে দারুণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কোন হাদীছের ভিত্তিতে ছাড়া জবাব দেওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না। 'আবদুল 'আযীয ইবন আবী সালামা বলেন, তিনি যখন অন্তিম রোগ শয্যায় তখন আমি একদিন তাঁকে বললাম আমরা আপনার নিকট থেকে বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান পেয়ে থাকি। অনেক সময় এমন হয় যে, মানুষ এমন সব মাসয়ালা জিজ্ঞেস করে যে বিষয়ে আমাদের নিকট কোন হাদীছ থাকে না, আর আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, উক্ত মাসয়ালায় আমাদের সিদ্ধান্ত তাদের সিদ্ধান্ত থেকে উত্তম হবে, এমন অবস্থায় আমরা কি আমাদের বুদ্ধি ও যুক্তির ভিত্তিতে ফাতওয়া দিয়ে দেব? আমার কথা শুনে তিনি অন্যের সাহায্য নিয়ে উঠে বসলেন, তারপর বললেন : 'আবদুল 'আযীয, তোমাদের জন্য আফসোস! কোন মাসয়ালায় জ্ঞান ছাড়া জবাব দানের চেয়ে এটাই উত্তম যে তোমরা মূর্খ অবস্থায় মৃত্যু বরণ কর। কথাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন।[১৯]

তাঁর সমকালীন মনীষীদের মূল্যায়ন

হযরত রাবী'আর (রহ) সমকালীনদের মধ্যে তাঁর জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ছিল। 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উমার বলতেন : هو صاحب معضلاتنا وعالنا وأفضلنا. "রাবী'আ ছিলেন আমাদের সকল জট উন্মোচনকারী, আমাদের 'আলিম এবং আমাদের সবার চেয়ে

---

১৬. প্রাগুক্ত-১/১৫৮; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৬

১৭. তারীখু বাগদাদ-৮/৪২৬; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৭

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. তাহ্যীব আত-তাহযীব-৩/২৫৯; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৪, টীকা-১

উত্তম।"[২০] মু'আয ইবন মু'আয বলেন, সাওয়ার ইবন 'আবদিল্লাহ বলতেন, আমি রাবী'আর চেয়ে বড় কোন 'আলিমকে দেখিনি। আমি বললাম : হাসান 'আল-বসরী ও ইবন সীরীনকেও দেখেননি? বললেন : হাসান ও ইবন সীরীনকেও না।[২১] ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ বলতেন :[২২]

ما رأيت أحدًا أفطن من ربيعة بن عبد الرحمن.

"আমি রাবী'আ ইবন 'আবদির রহমানের চাইতে বেশি তীক্ষ্মধী আর কাউকে দেখিনি।"

ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ যদিও তাঁর অন্যতম সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন, তবে বয়সে উভয়ে সমান ছিলেন। তিনিও দারস (পাঠ দান) ও ফাতওয়া দিতেন। তবে রাবী'আর (রহ) উপস্থিতিতে কখনো দারস দিতেন না।[২৩] সমকালীনদের মধ্যে তাঁর সমপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গও ছিলেন। তাঁর শায়খগণও তাঁর অগাধ জ্ঞানের কথা অকপটে স্বীকার করতেন। তাঁর শায়খ কাসিম ইবন মুহাম্মাদ; যখন তাঁকে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হতো তখন যদি কুরআন ও হাদীছে তার জবাব পেয়ে যেতেন, নিজেই বলে দিতেন। অন্যথায় প্রশ্নকারীকে রাবী'আর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলেন, তিনি ছিলেন একজন "ছিকা" বা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী।[২৪] ইমাম মালিক বলেন : কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ও সালিম ইবন 'আবদিল্লাহর (রহ) মৃত্যুর পর তাঁদের দু'জনের কাজের দায়িত্ব রাবী'আর উপর অর্পিত হয়।[২৫]

তাঁর দারসের মজলিস

তাঁর দারসের মজলিসে অসংখ্য মানুষের সমাগম হতো। মজলিসটি অত্যন্ত প্রশস্ত হতো। তাতে মদীনার বড় বড় 'আলিম, সরকারী কর্মকর্তা ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও শরীক হতেন। ইমাম মালিক, ইয়াহইয়া আনসারী, ইমাম আওযা'ঈ, শু'বা (রহ) প্রমুখের মত ব্যক্তিবর্গও সেখান থেকে ফায়দা হাসিল করতেন। খতীব আল-বাগদাদী বলেন, একবার গুনে দেখা গেল চল্লিশজন বড় বড় পাগড়ীধারী ব্যক্তি তার দারসের মজলিসে উপস্থিত আছেন।[২৬]

তাঁর ভোগ-বিলাস বিমুখ জীবন ও ইবাদাত-বন্দেগী

এত জ্ঞান ও বুদ্ধির সাথে সাথে তিনি একজন বড় 'আবিদ ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ ব্যক্তি ছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'আবদুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলাম বলেন :[২৭]

---

২০. তারীখু বাগদাদ-৮/৪২৩; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৬
২১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৭
২২. তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৬
২৩. তারীখু বাগদাদ-৮/৪২৩; তাবি'ঈন-১২২
২৪. তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৬
২৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৮
২৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/২৫৯
২৭. তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৭

مكث ربيعة دهرا طويلا عابدا يصلى الليل والنهار صاحب عبادة ثم نزع ذلك إلى أن جالس القوم فجالس القاسم فنطق بلب وعقل. وكان القاسم إذ سئل عن شئ، قال : سلوا هذا ـ لربيعة ـ قال : فان كان شيئا فى كتاب الله أخبرهم به القاسم أوفى سنة نبيه وإلا قال : سلوا هذا لربيعة ـ أو سالم.

"রাবী'আ একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইবাদাত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকেন। রাত-দিন নামায পড়তেন। কিন্তু পরে যখন দারসের মজলিসে, বিশেষতঃ কাসিম ইবন মুহাম্মাদের মজলিসে বসতে লাগলেন তখন যুক্তি ও বুদ্ধির সাথে কথা বলা আরম্ভ করলেন। কাসিমকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, এটা রাবী'আকে জিজ্ঞেস কর। প্রশ্নের জবাবটি যদি কিতাবুল্লাহ অথবা নবীর সুন্নাহতে পাওয়া যেত তাহলে তিনি বলে দিতেন, অন্যথায় বলতেন, রাবী'আ অথবা সালিমকে জিজ্ঞেস কর।"

ধন-সম্পদের প্রতি নির্মোহ ভাব

তিনি ধন-সম্পদ ও অর্থ-বিত্তের প্রতি দারুণ নির্মোহ স্বভাবের ছিলেন। খলীফা ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদের কোন প্রকার দান-অনুগ্রহ গ্রহণ করাও পছন্দ করতেন না। একবার সম্ভবতঃ বিচারকের দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতায় খলীফা আবুল 'আব্বাস আস-সাফ্ফাহ-এর নিকট যান। তিনি তাঁকে সম্মানী হিসেবে কিছু অর্থ দিতে চান। তিনি বিনয়ের সাথে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। অতঃপর সাফ্ফাহ তাঁকে দাসী ক্রয় করার নাম করে পাঁচ হাজার দিরহাম দিতে চান, তিনি তাও গ্রহণ করেননি।[২৮] অপরদিকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। উদার হস্তে দান করতেন। বন্ধু-বান্ধব, তাদের ছেলে-মেয়ে এবং সাধারণ প্রার্থীদের জন্য তাঁর অর্থ-সম্পদ ছিল নিবেদিত।[২৯] ইবন ওয়াহাব বলেন :[৩০]

إن ربيعة كان من الأجواد أنفق على إخوانه أربعين ألف دينار.

'রাবী'আ ছিলেন একজন অন্যতম দানশীল ব্যক্তি। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য তিনি চল্লিশ হাজার দীনার ব্যয় করেন।'

বাগ্মিতা

রাবী'আ ছিলেন একজন বাগ্মী ব্যক্তি। চমৎকার প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতেন। তিনি যখন কথা বলতেন শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনতো। কথাও বলতেন বেশি। তিনি বলতেন :[৩১]

---

২৮. তারীখু বাগদাদ-৮/৪২৫; ইবন কুতায়বা : আল-মা'আরিফ-২১৭

২৯. তাহযীব আল-কামাল-৬/১৬৭; তারীখু বাগদাদ-৮/৪২৪

৩০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৭

৩১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১০২

الساكت بين النائم والأخرس.

"চুপচাপ ব্যক্তির অবস্থান ঘুমন্ত ও বোবা ব্যক্তির মধ্যবর্তী স্থানে।"

তিনি সব সময় কথা বলতেন। একদিন নিজের মজলিসে বসে কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় একজন মরুবাসী বেদুঈন এসে বসে এবং দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ তাঁর মিষ্টি-মধুর কথা শুনতে থাকে। রাবী'আ বুঝলেন, লোকটি তাঁর বাগ্মিতায় জাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সেকালে বেদুঈনদের অলঙ্কারমণ্ডিত ভাষা- বিশুদ্ধতা সর্বজন স্বীকৃত ছিল। সম্ভবতঃ রাবী'আ তার মুখ থেকে নিজের ভাষার প্রশংসা শোনার জন্য তাকে প্রশ্ন করেন : তোমাদের নিকট ভাষা-অলঙ্কারের সংজ্ঞা কি? সে জবাব দেয় : অল্প কথায় ভাব প্রকাশ করা। রাবী'আ আবার তাকে প্রশ্ন করেন : বাগ্মিতার অক্ষমতা কাকে বলে? বেদুঈন জবাব দেয় : যাতে আপনি নিজে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তার এমন চমৎকার জবাব শুনে রাবী'আ লজ্জা পেলেন।[৩২]

আল্লাহ বলেন :[৩৩]

اَللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ.

'আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি 'আরশে সমাসীন হন।'

সেকালে আল্লাহর 'আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টি নিয়ে দার্শনিক বিতর্কের সৃষ্টি করা হয়। যেমন, তিনি তাঁর সৃষ্টির মত মুজাস্সাম বা দেহ বিশিষ্ট কিনা, তিনি স্থান-কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ কিনা ইত্যাদি। এ বিতর্ক পরবর্তীতে অনেক দিন পর্যন্ত চলে। একবার রাবী'আর (রহ) নিকট আল্লাহর 'আরশে সমাসীন হওয়ার বিষয়টির ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তিনি বলেন :[৩৪]

الإستواء غير مجهول وللكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق.

"সমাসীন হওয়ার বিষয়টি অজানা নয়, তবে তার প্রকৃতিটা বোধগম্য নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকেই রিসালাত হয় এবং রাসূলের দায়িত্ব পৌঁছানো, আর আমাদের কর্তব্য বিশ্বাস করা।"

---

৩২. প্রাগুক্ত; ওয়াফায়াত আল-আ'য়ান-১/১৮৩

৩৩. সূরা আস-সাজদা-৪; আল-ফুরকান-৫৯

৩৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৮

মৃত্যু

তাঁর মৃত্যু সন ও স্থান নিয়ে একটু মত পার্থক্য আছে। হাফিজ আবূ বাকর ইবন ছাবিত বলেন, প্রথম আব্বাসীয় খলীফা আবুল 'আব্বাস আস-সাফ্ফাহ্ তাঁকে কাজী হিসেবে নিয়োগ দানের জন্য আল-আনবারে ডেকে পাঠান। তিনি সেখানে যান। তাই বলা হয় তিনি সেখানে মৃত্যু বরণ করেন। ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন ও আবূ দাউদ আল-আনবারে তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছেন। ইবন সা'দ বলেন, আল-ওয়াকিদী আমাকে যে তথ্য দিয়েছেন সে মতে তিনি হিজরী ১৩৬ সনে মদীনায় ইনতিকাল করেন। আর তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে এরূপ কথাই বলেছেন ইবরাহীম ইবন আল-মুনযির, ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর, ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন ও আরো অনেকে। তবে ইবন হিব্বান তাঁর 'আছ্-ছিকাত' গ্রন্থে হিজরী ১৩৩ এবং আল-রাজী ইমাম আল-বুখারীর সূত্রে হিজরী ১৪২ সনে তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছেন।[৩৫]

---

৩৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/২২৪; সাফওয়াতুস সাফওয়া-২/৮৩-৮৬; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/১৬৭; আল-মা'আরিফ-২১৭

ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ (রহ)

ইয়াহইয়ার (রহ) পিতার নাম সা'ঈদ এবং দাদা কায়স (রা) ইবন 'আমর আল-আনসারী। ডাকনাম আবূ সা'ঈদ।[১] মদীনার বিখ্যাত আনসার গোত্র বানূ নাজ্জারের সন্তান। ইবন আল-মাদীনী তাঁর ডাকনাম আবূ নাসর বলেছেন।[২] তাঁর দাদা কায়স (রা) ছিলেন একজন বদরী সাহাবী।[৩] ইবন সা'দ বলেন, তাঁর মা ছিলেন 'উম্মু ওয়ালদ'।[৪] উল্লেখ্য যে, মনীবের সন্তান জন্মদাত্রী দাসীকে বলে 'উম্মু ওয়ালাদ' বা সন্তানের মা। ইসলামী বিধান মতে এরূপ দাসীকে বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা যায় না।

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞান ও মনীষায় তিনি ছিলেন সমকালীন বিশিষ্ট তাবি'ঈদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জ্ঞানের প্রগাঢ়তার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর বিশ্বস্ততা, শ্রেষ্ঠতা এবং ইমাম হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে সকলের ইজমা' বা ঐকমত্য আছে।[৫] ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে হাদীছের হাফিজ ও শায়খুল ইসলাম বলে উল্লেখ করেছেন।[৬]

হাদীছ

ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ (রহ) সেই যুগের একজন মহান ব্যক্তিত্ব যখন সাহাবায়ে কিরামের (রা) পুণ্যময় যুগ শেষ হতে চলেছিল। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যাঁরা তখনো জীবিত ছিলেন তাঁদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ গ্রহণে কোন রকম ত্রুটি করেননি। সাহাবা ও উঁচু স্তরের তাবি'ঈন কিরামের মধ্যে যাঁদের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনেন ও যাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেন তাঁদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন হলেন : আনাস ইবন মালিক (রা), সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন রাবী'আ, আবূ উমামা সাহল ইবন হুনায়ফ, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর আস-সিদ্দীক (রা), আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান, 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র (রা) সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহ) প্রমুখ।[৭]

---

১. আল-বুখারী, আত-তারীখ আল-কাবীর-৮/২৯৮
২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৭; তাহ্যীব আল-কামাল-১১/১৯৪
৩. আত-তারীখ আল-কাবীর-৮/২৯৮
৪. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/১০৬
৫. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৫৪
৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩৬
৭. তাহ্যীব আল-কামাল-১১/১৯৪; ২০/১০৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৪৬৮

উল্লেখিত মহান ব্যক্তিদের উদারতা ইয়াহইয়াকে হাদীছের একজন শ্রেষ্ঠ হাফিজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইবন সা'দ বলেন :

كان ثقة كثير الحديث حجة ثبتا.

"তিনি ছিলেন অতি বিশ্বস্ত বহু হাদীছের ধারক-বাহক, হুজ্জাত (দলীল-প্রমাণ) ও দৃঢ়পদ।"[৮] 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক (রহ) তাঁকে হাদীছের শ্রেষ্ঠ হাফিজদের মধ্যে গণ্য করতেন। মদীনার দু'ব্যক্তি এমন ছিলেন, যাঁদের দ্বারা মাদীনাতুর রাসূল (রাসূলের নগরী)-এর সকল সুন্নাহ্ সংরক্ষিত হয়। তাঁদের একজন আয-যুহরী ও অন্যজন ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ। সে সময় যদি এ দু'মনীষীর জন্ম না হতো তাহলে হয়তো বহু সুন্নাহ্ হারিয়ে যেত।[৯] ইবন 'উয়ায়না (রহ) বলেন :[১০]

كان محدثوا الحجاز : ابن شهاب ويحيى بن سعيد وابن جريج يجيئون بالحديث على وجهه.

"হিজাযের মুহাদ্দিছ ছিলেন ইবন শিহাব, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ ও ইবন জুরায়জ। তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে হাদীছ সংগ্রহ করতেন।" আবদুর রহমান ইবন আবী হাতিম তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও ইমাম আয-যুহ্রীর সমকক্ষ মনে করতেন।[১১] সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) বলেন : মদীনাবাসীদের নিকট ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদের স্থান ছিল আয-যুহ্রীর উপরে।[১২] ইয়াহইয়া আল-কাত্তান বলতেন :[১৩]

هو مقدم على الزهرى، أختلف على الزهرى ولم يختلف عليه.

"তিনি (ইয়াহইয়া) আয-যুহ্রীর উপর প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কারণ, আয-যুহ্রীর ব্যাপারে মানুষের মতপার্থক্য আছে, কিন্তু তাঁর ব্যাপারে নেই।"

'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক (রহ) বলেন, সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ্) বলতেন :[১৪]

حفاظ الناس أربعة : إسماعيل بن أبى خالد وعاصم الأحول ويحيى بن سعيد الأنصارى وعبد الملك بن أبى سليمان.

"মানুষের মধ্যে হাদীছের হাফিজ চারজন : ইসমা'ঈল ইবন আবী খালিদ, 'আসিম আল-আহওয়াল, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী ও 'আবদুল মালিক ইবন আবী সুলায়মান।" অপর একটি বর্ণনায় তিনজনের কথা এসেছে। তাতে 'আসিম আল-

---

৮. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/১৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৭

৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৪৭৪

১০. আত-তারীখ আল-কাবীর-৮/২৯৮; তাহ্যীব আল-আসমা'-২/১৭

১১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৭

১২. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/১০৭

১৩. প্রাগুক্ত-২০/১০৯; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৭

১৪. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/১০৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৪৭২

আহওয়ালের নামটি নেই। 'আলী আল-মাদীনী বলেন : উঁচু স্তরের তাবি'ঈদের পরে মদীনায় ইবন শিহাব, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ, আবুয যানাদ ও বুকাইর ইবন 'আবদি'র চেয়ে বেশি জানা ব্যক্তি কেউ নেই।[১৫]

জারীর ইবন 'আবদিল হামীদ বলেন : আমি তাঁর চেয়ে বেশি ধীশক্তি সম্পন্ন মানুষ আর দেখিনি।[১৬]

ইসমা'ঈল ইবন ইসহাক আল-কাজী বলেন, আমি 'আলী ইবন আল-মাদীনীকে একথা বলতে শুনেছি যে, যাঁরা সাহীহ হাদীছের ধারক-বাহক, অতিশয় বিশ্বস্ত এবং যাঁদের বর্ণিত হাদীছ দোষ-ত্রুটিমুক্ত তাঁরা হলেন : বসরার আইউব, কূফার মানসূর, মদীনার ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ এবং মক্কার 'আমর ইবন দীনার।[১৭]

ইমাম আল-বুখারী (রহ) 'আলী ইবন আল-মাদীনীর সূত্রে বলেন, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা প্রায় তিনশো (৩০০)।[১৮] তবে ইয়াযীদ ইবন হারূন বলেন :[১৯]

حفظت ليحيى بن سعيد ثلاثة آلاف حديث فمرضت فنسيت نصفها.

"আমি ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদের তিন হাজার হাদীছ মুখস্থ করি। তারপর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে অর্ধেক ভুলে যাই।"

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) বলতেন :[২০]

يحيى بن سعيد أثبت الناس. - "ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দৃঢ়পদ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।"

ছাত্র-শিষ্যবৃন্দ

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের পরিধি অনেক বিস্তৃত। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন হলেন : হিশাম ইবন 'উরওয়া, হুমায়দ আত-তাবীল, ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন উসামা, ইবন জুরায়জ, আল-আওযা'ঈ, মালিক ইবন আনাস, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, হাম্মাদ, লাইছ, 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক, শু'বা, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-উমাবী (রহ) প্রমুখ হাদীছ বিশারদ। সকলে তাঁর বিশ্বস্ততা, মনীষা ও জ্ঞানের জগতে নেতৃত্বের কথা বলেছেন।[২১] ইমাম আয-যুহ্রী, ইবন আবী যি'ব, শু'বা, মালিক ইবন আনাস, হাম্মাদ,

---

১৫. প্রাগুক্ত
১৬. তাহ্যীব আল-আসমা'-২/১৭
১৭. তাহ্যীব আল-কামাল-২/১০৮
১৮. প্রাগুক্ত-২০/১০৬
১৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৪৭৪
২০. তাহ্যীব আল-আসমা'-২/১৭
২১. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/১০০-১০৬

সুফইয়ান আছ-ছাওরী, 'আবদুল 'আযীয আল-মাজিশূন, লাইছ ইবন সা'দ, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না প্রমুখের মত সর্বজন স্বীকৃত হাদীছ বিশারদ তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২২]

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন, একবার মদীনা থেকে আমাদের নিকট আইউব আস-সাখতিয়ানী আসলেন। আমরা বললাম, মদীনায় আপনি কাকে স্থলাভিষিক্ত করে এসেছেন? বললেন :[২৩]

ما خلفت بها أحدا أفقه من يحيى بن سعيد الأنصارى.

"ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারীর চেয়ে বড় কোন ফকীহকে আমি মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে আসিনি।"

ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞানের বড় সনদ এই যে, তিনি মাদীনাতুর রাসূলের, যা সেই সময়ে ফকীহ্‌দের আকর বলে খ্যাত ছিল, কাজী ছিলেন।[২৪] মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদের সময়ে হজ্জ মওসুমে মক্কার মাসজিদুল হারামে ঘোষক চিৎকার করে ঘোষণা করতো :[২৫]

لايفتى الحاج فى المسجد إلا يحيى بن سعيد وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس.

"ইয়াহইয়া সা'ঈদ, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ও মালিক ইবন আনাস– এ তিনজন ছাড়া আর কেউ হাজীদেরকে ফাতওয়া দিতে পারবে না।" হাম্মাদ আল-'আজলী বলেন :[২৬]

كان يحيى بن سعيد رجلا صالحا فقيها ثقة.

"ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ, ফকীহ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি।"

কাজীর পদে

প্রথমে তিনি মদীনার কাজী ছিলেন।[২৭] আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূর তাঁকে 'কাজী আল-কুজাত' তথা প্রধান কাজীর সুউচ্চ পদে নিয়োগ দান করেন। মতান্তরে তাঁকে হাশিমিয়ার কাজী নিয়োগ করা হয়। একথাও বর্ণিত আছে যে, বাগদাদের কাজীর পদেও তিনি নিয়োগ লাভ করেন।[২৮]

বিভিন্ন বিষয়ে মুফতী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতপার্থক্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও সহনশীল। তিনি বলতেন :[২৯]

---

২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৪৬৯

২৩. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২০/১০৭; তাহ্‌যীব আল-আসমা'-২/১৭

২৪. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৩৭

২৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৪৭৪

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. আত-তারীখ আল-কাবীর-৮/২৯৮

২৮. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২০/১০২; তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/১৫৩

২৯. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৩৯

أهل العلم أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون فيحلل هذا ويحرِّم هذا، فلايعيب على هذا ولاهذا على هذا.

"জ্ঞানী ব্যক্তিরা অত্যন্ত উদার ও প্রশস্ত মনের মানুষ। বিভিন্ন মাসয়ালায় মুফতীদের সব সময় মতপার্থক্য হয়ে থাকে। একজন এটাকে হালাল বললে অন্যজন হারাম বলেন। তবে কেউ কারো প্রতি কখনো দোষারোপ করেন না।" বর্তমানকালে ইসলামী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে সামান্য বিষয় নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে যখন একজন আরেকজনকে হেয় ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যান তখন ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদের উপরোক্ত কথাটি সকলের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে।

আর্থিক অবস্থা

মদীনায় অবস্থানকালে তাঁর আর্থিক অবস্থা দারুণ অসচ্ছল হয়ে পড়েছিল। ভীষণ টানাটানির মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছিলেন। ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, জীবনের এমন একটি সংকীর্ণ পর্যায়ে খলীফা মানসূর তাঁকে কাজী হিসেবে নিয়োগ দান করেন। অতঃপর তাঁর অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হয়। তিনি ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হন।[৩০] তবে মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী বলেন ভিন্ন কথা। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। খলীফা মানসূর তাকে কাজী নিয়োগ করলেন। তারপরেও তাঁর অবস্থার কোন পরিবর্তন হলো না। এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন : যার এ 'নাফ্স' বা আত্মা একটি, অর্থবিত্ত তার অবস্থা পরিবর্তন করতে পারে না।[৩১]

মালিক ইবন আনাস বলতেন, একমাত্র ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ ছাড়া আমাদের এখান থেকে যিনিই ইরাক গেছেন তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কেবল তিনি যে অবস্থায় গেছেন সেই অবস্থায় ফিরে এসেছেন।

তিনি অত্যন্ত আল্লাহ নির্ভর মানুষ ছিলেন। পার্থিব কোন প্রয়োজনে মানুষের নিকট চাওয়ার মানসিকতা তাঁর মোটেই ছিল না। তিনি নিজের জীবনের একটি ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, একবার আমি আফ্রিকা থাকাকালে পার্থিব কিছু প্রয়োজন অনুভব করলাম এবং তা পূরণের জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট দু'আ করলাম। তারপর আমি আমার এ কাজের জন্য লজ্জিত হলাম। মনে মনে বললাম : আমার এ দু'আ যদি আখিরাতের কোন প্রয়োজনের জন্য হতো তাহলে কতনা সুন্দর হতো! বিষয়টি আমি আমার এক বন্ধুকে বললাম। তিনি বললেন : তোমার এ কাজকে খারাপ মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ, দু'আর অসীলায় আল্লাহ তাঁর কোন বান্দার প্রয়োজন পূরণ করে দিতে পারেন। আর এ দু'আর অনুমতি তাকে দান করা হয়েছে।[৩২]

---

৩০. প্রাগুক্ত-১/১৩৮

৩১. সিয়ারু আ'লাম আনু-নুবালা'-৫/৪৭৫

৩২. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/১১০

জারীর ইবন 'আবদিল হামীদ বলেন : একবার আমি ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদকে জিজ্ঞেস করলাম : আপনি যে সকল সাহাবী ও তাবি'ঈর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, আবূ বাকর, 'উমার, 'উছমান ও 'আলী (রা) সম্পর্কে তাঁদের মতামত কী ছিল? বললেন : আবূ বাকর ও 'উমারের (রা) মর্যাদার ব্যাপারে তাঁদের কোন মতপার্থক্য ছিল না। তাঁদের মতের ভিন্নতা ছিল 'উছমান ও 'আলীর (রা) ব্যাপারে।[৩৩]

সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে হিজরী ১৪৩ সনে তিনি হাশিমিয়ায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল সত্তরের উর্ধ্বে।[৩৪]

---

৩৩. প্রাগুক্ত-২০/১০৭

৩৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৪৭৫; আত-তারীখ আল-কাবীর-৮/২৯৮; তাহ্যীব আল-কামাল-২০/১০০

ইসমা'ঈল ইবন আবী খালিদ আল-আহমাসী (রহ)

ইসমা'ঈলের ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। পিতার ডাকনাম আবূ খালিদ, তবে তাঁর আসল নামের ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। যেমন : সা'দ, হুরমুয ও কাছীর। তিনি কূফার আল-বাজালা গোত্রের আল-আহমাস শাখার দাস ছিলেন, তাই তাঁকে 'আল-আহমাসী আল-কূফী' বলা হয়। ইসমা'ঈলের চার ভাই হলেন : আশ'আছ, খালিদ, সা'ঈদ ও আন-নু'মান।[১] ইবন সা'দের বর্ণনামতে তিনি মোট ছয়জন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁদের সূত্রে বর্ণনাও করেছেন। সেই মহান সাহাবীগণ হলেন : তাঁর পিতা আবূ খালিদ, আনাস ইবন মালিক, 'আবদুল্লাহ ইবন আবী আওফা, আবূ কাবিল, আবূ জুহায়ফা ও 'আমর ইবন আল-হুওয়ায়রিছ (রা)।[২] তবে আবূ নু'আঈমের বর্ণনামতে তিনি বারো জন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন।[৩] 'আলী আল-মাদানী বলেন :

رأى أنسًا روية ولم يسمع منه.

"তিনি আনাসকে একবার দেখেন, তবে তাঁর মুখ থেকে কোন হাদীছ শোনেননি।"[৪] তিনি পেশায় ছিলেন 'طَحَّان'- শস্য চূর্ণকারী বা পেষণকারী।[৫]

জ্ঞান ও মনীষা

তিনি একজন উঁচু স্তরের তাবি'ঈ ছিলেন। ইমাম আশ-শা'বী (রহ) বলেন :

إسماعيل هذا يزد رد العلم ازد رادا.

"এই ইসমা'ঈল জ্ঞান একবারেই গিলে ফেলেন।" অপর একটি বর্ণনামতে তিনি বলেন : ابن أبى خالد يشرب العلم شربًا. – "ইবন আবী খালিদ (ইসমা'ঈল) জ্ঞান একবারেই পান করেন।"[৬] ইমাম আন-নাওবী (রহ) বলেন : তাঁর শ্রেষ্ঠতা, মর্যাদা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে।"[৭]

হাদীছ

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর স্থান অনেক উঁচুতে। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) বলেন : كان حجة

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-২/১৫৬
২. আত-তাবাকাত-২/২৪০
৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/২৯২
৪. আত-তাহ্যীব-১/২৫৫
৫. তাহ্যীব আল-কামাল-২/১৫৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৩
৬. প্রাগুক্ত
৭. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১২১

متقنا مكثرا عالما. —"তিনি ছিলেন (হাদীছ শাস্ত্রের) একজন হুজ্জাত বা দলীল-প্রমাণতুল্য, দারুণ দক্ষ ও বহু হাদীছ ধারণ ও বর্ণনাকারী 'আলিম।"[৮] ইমাম সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) বলেন : হাফিজে হাদীছ মাত্র চারজন। ইসমা'ঈল তাঁদের একজন। অন্যরা হলেন : 'আবদুল মালিক ইবন আবী সুলায়মান, 'আসিম আল-আহওয়াল ও ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী।[৯] অপর একটি বর্ণনায় তিনজনের কথা এসেছে। তাতে 'আসিম আল-আলওয়াল বাদ পড়েছেন।[১০] আবু হাতিম আস-সিজিস্তানী ইমাম আশ-শা'বীর (রহ) সংগী-সাথীদের কাউকে ইসমা'ঈলের উপর প্রাধান্য দিতেন না।[১১] তাঁর সততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, লোকে তাঁকে "মীযান" (তুলাদণ্ড) বলতো।[১২] আহমাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-'ইজলী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন :[১৩]

"كوفي، تابِعِيٌّ، ثقة، وكان رجلا صالحا، وسمع من خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طحانا."

"তিনি কূফার অধিবাসী, একজন তাবি'ঈ ও অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন সৎকর্মশীল মানুষ। রাসূলুল্লাহর (সা) পাঁচজন সাহাবীর মুখ থেকে হাদীছ শুনেছেন। পেশায় তিনি একজন "তাহ্হান" বা শস্য চূর্ণকারী।" মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-মাসিলী বলেন :[১৪]

"حجة إذا لم يكن اسماعيل حجَّةً فمن يكون حجة."

"তিনি একজন হুজ্জাত তথা দলীল-প্রমাণতুল্য মানুষ। তিনি যদি হুজ্জাত না হন, তবে হুজ্জাত হবে কে?"

সাহাবী ছাড়া অন্য যাঁদের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং যাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্য থেকে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো :

ইসমা'ঈল ইবন 'আবদির রহমান আস-সুদ্দী, ভাই আশ'আছ ইবন আবী খালিদ, 'আমর ইবন হুরায়ছ-এর দাস আসবাগ, আল-হারিছ ইবন শুবায়ল আল-আহমাসী, হাকীম ইবন জাবির আল-আহমাসী, ভাই খালিদ ইবন আবী খালিদ, যাকওয়ান ইবন আবী সালিহ আস-সাম্মান, যুবায়র ইবন 'আদী, যির্রু ইবন হুবায়শ আল-আসাদী, যায়দ ইবন

---

৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৫৩
৯. আত-তাবাকাত-২/২৪০
১০. তাহ্যীব আল-কামাল-২/১৫৮
১১. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/২৯১
১২. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/১২১
১৩. তাহ্যীব আল-কামাল-২/১৫৮, ১৫৯
১৪. প্রাগুক্ত

ওয়াহাব আল-জুহানী, ভাই সা'ঈদ ইবন আবী খালিদ, সালামা ইবন কুহায়ল, শুবায়ল ইবন 'আওফ আল-আহমাসী, তালহা ইবন আল-'আলা' আল-আহমাসী, তালহা ইবন মুসার্‌রিফ, 'আমির আশ-শা'বী, 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবী আওফা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'ঈসা, 'আবদুল্লাহ আল-বাহী, 'আবদুর রহমান ইবন 'আয়িয, 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, 'আতা' ইবন আস-সায়িব, 'আমর ইবন হুরায়ছ আল-মাখযূমী, আবূ ইসহাক 'আমর ইবন 'আবদিল্লাহ আস-সুবা'ঈ, কায়স ইবন আবী হাযিম, মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা), আবূ দাউদ আল-আ'মা, আবূ বাকর ইবন 'উমারা, পিতা আবূ খালিদ আল-আহমাসী ও আরো অনেকে।

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাঁর সনদে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন হলেন :

ইবরাহীম ইবন হুমায়দ আর-রুআসী, জারীর ইবন 'আবদিল হামীদ, জা'ফার ইবন 'আওন, হাফ্‌স ইবন গিয়াছ, আল-হাকাম ইবন 'উতায়বা, আবূ উসামা হাম্মাদ ইবন উসামা, খালিদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-ওয়াসিতী, যায়িদা ইবন কুদামা, যুহায়র ইবন মু'আবিয়া, সা'দান ইবন ইয়াহইয়া আল-লাখমী, সা'ঈদ ইবন আন-নাদর আল-কূফী, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, শুরাইক ইবন 'আবদিল্লাহ আন-নাখা'ঈ, শু'বা ইবন আল্‌-হাজ্জাজ, 'আব্‌বাদ ইবন আল-'আওয়াম, 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক, 'আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, 'উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা, 'ঈসা ইবন ইউনুস, মালিক ইবন মিগওয়াল, মুহাম্মাদ ইবন বিশর আল-'আবদী, আবূ মু'আবিয়া মুহাম্মাদ ইবন খাযিম আদ-দারীর, মুহাম্মাদ ইবন খালিদ আল-ওয়াহ্‌বী, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ আল-ওয়াসিতী, মারওয়ান ইবন মু'আবিয়া আল-ফাযারী, মু'তামির ইবন সুলায়মান, হুশায়ম ইবন বাশীর, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান, ইয়াযীদ ইবন হারূন (রহ) ও আরো অনেকে।[১৫]

ইবন আল-মাদানীর মতে ইসমা'ঈলের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা তিনশো– একথা ইমাম আল-বুখারী বলেছেন।[১৬] তবে আল-'ইজলীর বর্ণনামতে পাঁচশো'র কাছাকাছি।[১৭]

'ইলমের সাথে তাঁর মধ্যে 'আমলও ছিল। ইমাম আয-যাহাবী বলেন :[১৮]

وكان من العلماء العاملين.

'তিনি ছিলেন বা-'আমল তথা আমলকারী 'আলিমদের একজন।' ইবন হিব্বান বলেন : তিনি ছিলেন একজন সৎকর্মশীল ও সত্যনিষ্ঠ শায়খ বা জ্ঞানী ব্যক্তি।[১৯]

---

১৫. প্রাগুক্ত-২/১৫৭-১৫৮; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১/২৯১

১৬. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২/১৫৯; তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/১৩১

১৭. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১/২৯৩

১৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৫৪

১৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১/২৯২

ইসলামের ইতিহাসে আলিমদের এ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, তাঁরা তাঁদের জ্ঞানকে জীবিকা ও অর্থ উপার্জনের উপায় ও উপকরণে পরিণত করেননি। ইসমা'ঈলও তাঁর অর্জিত জ্ঞান কোন পেশায় পরিণত করেননি। আটা পেষার চাক্‌কি ঘুরিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।[২০]

হিজরী ১৪৫, মতান্তরে ১৪৬ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[২১]

---

২০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৫৩; তাহ্‌যীব আল-কামাল-২/১৫৯

২১. প্রাগুক্ত; আল-বা[illegible] ওয়াত তাবয়ীন-৩/১২৯, টীকা-৭।

'ইকরিমা মাওলা 'আবদিল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা)

হযরত 'ইকরিমা (রহ) মরক্কোর বারবার বংশোদ্ভূত এবং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) একজন প্রতিভাবান দাস। প্রথমে তিনি হুসায়ন ইবন আল-হুর আল-'আনবারীর দাসত্বে ছিলেন এবং হুসায়ন তাঁকে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসকে (রা) দান করেন। 'ইকরিমার বয়স তখন অল্প। এ কারণে তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন এবং তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কল্যাণে এত উঁচু মানে উন্নীত হন যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব অনেক বড় বড় মুক্ত-স্বাধীন 'আলিমের জন্য ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'ইকরিমার ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ।[১]

শিক্ষা

হযরত 'ইকরিমার মধ্যে স্বভাবগতভাবে জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা ও আগ্রহ-উদ্দীপনা ছিল। তিনি প্রত্যেকটি জিনিস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তিনি বলেন, যখন আমি বাজারে যেতাম এবং কোন কথা শুনতাম তখন আমার জন্য জ্ঞানের পঞ্চাশটি দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যেত।[২] এমন উপযুক্ত স্বভাব-প্রকৃতির সাথে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) মত জ্ঞানের সাগর ও স্নেহশীল মনিবও তিনি পেয়ে যান। তিনি অত্যধিক শ্রম ও সাধনা ব্যয় করে তাঁকে শিক্ষা দেন।[৩] জ্ঞানের প্রতি 'ইকরিমার পিপাসা এত তীব্র ছিল যে, সারা জীবনেও পরিতৃপ্ত হননি। একাধারে চল্লিশ বছর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন।[৪] তিনি বলতেন ঃ

طلبت العلم أربعين سنة، وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار.

'আমি চল্লিশ বছর জ্ঞান অর্জন করেছি। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) গৃহে অবস্থান কালেও আমি দরজায় বসে ফাতওয়া দিতাম।'[৫]

জ্ঞান ও মনীষা

তাঁর ব্যক্তিগত উৎসাহ-উদ্যোগ এবং মনিব হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) তদারকিতে তিনি জ্ঞানের সাগরে পরিণত হন। ইবন সা'দ লিখেছেন : তিনি জ্ঞানের সমুদ্রসমূহের মধ্যে একটি সমুদ্র ছিলেন।[৬] ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে حَبْرُ الْعَالَمِ তথা বিশ্বের তত্ত্বজ্ঞানীর

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১৩/১৬৩

২. তাবাকাত-৫/২১৩

৩. প্রাগুক্ত; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান-১/৩১৯

৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৪

৫. তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৬৬

৬. তাবাকাত-৫/২১৬

উপাধিতে উল্লেখ করেছেন।[৭] তাঁর সময়ে কোন দাস তো দূরের কথা অভিজাত ঘরের সন্তানদেরও কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তাফসীর, হাদীছ, ফিক্‌হ তথা সকল ইসলামী জ্ঞানে তিনি ইমাম পদ-মর্যাদা লাভ করেন।

তাফসীর

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) তাফসীরের এত বড় 'আলিম ছিলেন যে, খুব কম সংখ্যক সাহাবীই এ ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষতা দাবী করতে পারতেন। তিনি ছিলেন 'রঈসুল মুফাস্‌সিরীন বা মুফাস্‌সিরগণের নেতা। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ ও শ্রম দিয়ে 'ইকরিমাকে তাফসীরের জ্ঞান দান করেন।[৮] নিজের সীনা থেকে সকল জ্ঞান তাঁর সীনায় স্থানান্তর করেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) ছাত্রদের মধ্যে তাফসীরের জ্ঞানে একজনও তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। 'আব্বাস ইবন মুস'আব আল-মারূযী বলেন, ইবন 'আব্বাসের ছাত্রদের মধ্যে তাফসীরে 'ইকরিমা সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন।[৯] কাতাদা (রহ) বলতেন, সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী তাবি'ঈ হলেন চারজন। তাঁদের মধ্যে 'ইকরিমা তাফসীরের সবচেয়ে বড় 'আলিম। ইমাম শা'বী (রহ) বলতেন, 'ইকরিমার চেয়ে কিতাবুল্লাহর (কুরআন) বেশি জ্ঞান রাখে এখন তেমন কেউ বিদ্যমান নেই। 'ইকরিমা যতক্ষণ বসরায় থাকতেন, ততক্ষণ হাসান আল-বসরী (রহ) তাফসীর বর্ণনা করতেন না।[১০]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) জীবদ্দশাতেই 'ইকরিমা একজন বড় মুফাস্‌সির হয়ে যান। ইবন 'আব্বাস (রা) মাঝে মাঝে তাঁর পরীক্ষাও নিতেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ জবাব শুনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। একবার তিনি নিম্নের এ আয়াতটি পাঠ করেন :[১১]

لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا.

'আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন অথবা কঠোর শাস্তি দেবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন?'

তারপর বলেন, এই আয়াতে যে লোকদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, আমাদের জানা নেই তারা মুক্তি পেয়েছে না ধ্বংস হয়েছে। 'ইকরিমা অতি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করে দেন যে, তারা মুক্তি পেয়েছে। ইবন 'আব্বাস (রা) এত খুশী হন যে, তাঁকে একটি চাদর পরিয়ে দেন।[১২]

---

৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৮৩

৮. তাবাকাত-৫/২১২

৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/২৬৫; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৩/১৬৭

১০. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/২৬৬

১১. সূরা আল-আ'রাফ-১৬৪

১২. তাবাকাত-৫/২১৪; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৩/১৬৮

তাফসীরের দারস

হযরত মুজাহিদ ও সা'ঈদ ইবন জুবায়রের মত বিদ্যান ব্যক্তিগণ তাঁর থেকে তাফসীর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতেন। তাঁরা দু'জন তাঁকে প্রশ্ন করতেন, 'ইকরিমা তার জবাব দিতেন।

তাঁদের প্রশ্ন শেষ হওয়ার পর নিজের পক্ষ থেকে তিনি আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করতেন।[১৩] তারই অনুগ্রহ ও কল্যাণে মুজাহিদ তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম হয়ে যান। আবূ হাতিমকে 'ইকরিমা ও সা'ঈদ জুবায়র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এঁদের মধ্যে তাফসীর বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী কে? তিনি বলেন, ইবন 'আব্বাসের (রা) ছাত্ররা সকলে 'ইকরিমার মুখাপেক্ষী।[১৪]

হাদীছ

তাঁর বিশেষ অধীত বিষয় ছিল হাদীছ। এ বিষয়ে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান। এ শাস্ত্রের বেশিরভাগ জ্ঞান তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে লাভ করেন। তাছাড়া আরো অনেক সাহাবীর নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন। যেমন : হযরত 'আলী, আবূ হুরায়রা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, 'উকবা ইবন 'আমির, হাজ্জাজ ইবন 'আমর ইবন গারমিয়া, মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান, সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, ইয়া'লা ইবন উমাইয়্যা, জাবির, আবূ কাতাদা, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা সিদ্দীকা, হামনা বিনত জাহাশ (রা) ও আরো অনেকে।[১৫]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) বর্ণিত হাদীছ যা প্রায় কয়েক হাজার অতিক্রম করেছে, তার অধিকাংশ 'ইকরিমার সূত্রে পাওয়া। এর দ্বারা এ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতা অনুমান করা যায়। ইবন সা'দ তাঁকে "كثير الحديث" তথা বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী বলেছেন।[১৬] শাহ্র ইবন হাওশাব বলতেন, প্রত্যেক জাতির একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি (حَبْرٌ) থাকেন, আর এই উম্মাতের সেই বিদগ্ধ ব্যক্তি হলেন ইবন 'আব্বাসের দাস 'ইকরিমা।[১৭]

হাদীছ অন্বেষণকারীদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি

তাঁর ব্যক্তি সত্তাটি ছিল অসংখ্য মানুষের কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে তারা সমবেত হতো। হাদীছ অন্বেষণকারীরা দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর থেকে উপকার লাভের আশায় সেখানে ভীড় জমাতো। কোথাও ভ্রমণের সময় যে পথে তিনি যেতেন, আশে-পাশে উৎসাহী ছাত্র-

---

১৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৭/২৬৬; তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৬৯

১৪. তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৭৯

১৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৭/২৬৬; তাবি'ঈন-২৮২

১৬. তাবাকাত-৭/২১৬

১৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৭/২৬৫

জনতার ভীড় জমে যেত। আইউব বলেন, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম 'ইকরিমা পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন তাঁর সাথে আমি সাক্ষাৎ করবো। ঘটনাক্রমে একদিন বসরার বাজারে পেয়ে গেলাম। তাঁর চারপাশে মানুষের প্রচণ্ড ভীড়। আমি ভীড় ঠেলে নিকটে গেলাম। কিন্তু ভীড়ের কারণে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। এমতাবস্থায় আমি তাঁর বাহনের পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। মানুষ যা কিছু জিজ্ঞেস করছিল তিনি তাঁর জবাব দিচ্ছিলেন, আর আমি তা স্মৃতিতে ধারণ করছিলাম। আইউব আরো বলেন, একবার 'ইকরিমা আমাদের এখানে আসলেন। মানুষের এত ভীড় জমে গেল যে, বাধ্য হয়ে তাঁকে ঘরের ছাদে নিয়ে বসাতে হলো।[১৮]

'ইকরিমার সমালোচনা

তাঁর মনীষা ও মহত্ত্বের এ সকল বর্ণনার পাশাপাশি 'আসমা' আর-রিজাল' (চরিত-অভিধান)-এর গ্রন্থাবলীতে তাঁর সম্পর্কে সমালোচনামূলক এমন কিছু মন্তব্য দেখা যায় যাতে তাঁর বর্ণিত হাদীছের যথার্থতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হয়। সেই মন্তব্যগুলো নিম্নরূপ :

১. আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়াঈলী বলতেন, 'ইকরিমার মধ্যে বোধ-বুদ্ধি একটু কম ছিল। যখন তাঁর নিকট এমন কোন হাদীছ জিজ্ঞেস করা হতো যা তিনি দু'ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেছেন, তখন তা এক ব্যক্তির দিকে আরোপ করতেন, আবার অন্য সময় আরেক ব্যক্তির দিকে। কিন্তু এ কোন দোষের বিষয় নয়, কারণ একটি বর্ণনা দু'জন রাবীর নিকট থেকে শুনে থাকলে যে কোন একজনের প্রতি অথবা উভয়ের প্রতি আরোপ করে বর্ণনা করার স্বাধীনতা তাঁর আছে। এতে তাঁর বোধ-বুদ্ধির স্বল্পতা প্রমাণ হয় কিভাবে?

২. আবূ খালাফ আল-খারারীজী আল-বাক্কারী বর্ণনা করেন, তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারকে (রা) বলতে শুনেছেন যে, তিনি তাঁর দাস নাফি'কে বলতেন : নাফি'! আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার প্রতি এমন মিথ্যা আরোপ করবে না যেমন 'ইকরিমা 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের প্রতি করে থাকে।[১৯]

৩. জারীর ইবন 'আবদিল হামীদ ইয়াযীদ ইবন আবী যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের পুত্র 'ইকরিমাকে তাঁর পিতার প্রতি মিথ্যা আরোপ করার অপরাধে শাস্তি দিতেন।

৪. হিশাম ইবন সা'দ 'আতা' খুরাসানী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিবকে বললাম, 'ইকরিমার ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহরাম অবস্থায় হযরত মায়মূনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি বললেন, তিনি মিথ্যা বলেছেন।

৫. কাতার ইবন খলীফা বলেন, আমি 'আতা'কে বললাম, 'ইকরিমা বলে থাকেন যে, মোজার উপর মাসেহ করার নিয়মকে কুরআনের হুকুম বাতিল ও রহিত করেছে। 'আতা'

---

১৮. তাবাকাত-৫/২১৩; তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৭০

১৯. তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৭৩

বললেন, তিনি মিথ্যা বলেছেন। আমি 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন, তোমরা মোজার উপর মাসেহ কর, তা তোমরা পায়খানা থেকে বের হও না কেন।

৬. ইসরাঈল 'আবদুল করীম আল-জাযারী থেকে বর্ণনা করেছেন। 'ইকরিমা ভূমি ইজারা দেওয়াকে মাকরূহ বলেন। তিনি সা'ঈদ ইবন জুবায়রের সংগে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। সা'ঈদ বললেন, 'ইকরিমা মিথ্যা বলেছে।[২০]

৭. উহাইব ইবন খালিদ ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 'ইকরিমাকে মিথ্যাবাদী বলতেন।

৮. ইবরাহীম ইবন মুনযির মা'আন ইবন 'ঈসা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইমাম মালিক (রহ) 'ইকরিমাকে বিশ্বস্ত মনে করতেন না। তিনি তাঁর সূত্রে কোন কিছু বর্ণনা করতে নিষেধ করতেন। এ ধরনের আরো কিছু বর্ণনা তাঁর সম্পর্কে পাওয়া যায়।[২১]

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের পর্যালোচনা

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহের একটিও নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ, প্রথমত সনদের ধারাবাহিকতা নেই, দ্বিতীয়ত বর্ণনাসমূহের রাবীগণও নির্ভরযোগ্য নয়।

আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়াঈলীর মধ্যে ছিল শী'আ 'আকীদা-বিশ্বাসের প্রভাব।[২২] যদিও শী'আ হওয়া অগ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ নয়। কিন্তু খারিজীদের কিছু চিন্তা-বিশ্বাস 'ইকরিমার প্রতি আরোপিত ছিল। এমতাবস্থায় 'ইকরিমা সম্পর্কে একজন শী'আর বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।

দ্বিতীয় বর্ণনার রাবী আবূ খালাফ ইয়াহইয়া ইবন আল-বাক্কার রিজাল শাস্ত্রবিদদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে একজন অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।[২৩] তৃতীয় বর্ণনার একজন রাবী ইয়াযীদ এবং তিনি শী'আ। তাছাড়া তিনি নিজেই 'ইকরিমার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[২৪] এমতাবস্থায় তাঁর বর্ণনা তাঁর কাজের পরিপন্থী হয়ে যায়। তৃতীয় বর্ণনার রাবী জারীর ইবন 'আবদিল হামীদও খুব বেশি বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি নন।[২৫] চতুর্থ বর্ণনার রাবী হিশাম ইবন সা'দের বর্ণনাসমূহ গ্রহণযোগ্যতার মান পর্যন্ত পৌঁছে না। সতর্ক মুহাদ্দিছগণ তাঁর কোন বর্ণনা গ্রহণ করতেন না।[২৬]

পঞ্চম বর্ণনায় কাতার ইবন খলীফা অনেক বিশেষজ্ঞের মতে নির্ভরযোগ্য নন।[২৭] ষষ্ঠ

---

২০. প্রাগুক্ত-১৩/১৭৪

২১. উল্লেখিত বর্ণনাগুলো 'তাহ্যীব আত-তাহ্যীব' গ্রন্থের ৭ম খণ্ডে 'ইকরিমার জীবনীতে দ্রষ্টব্য।

২২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১২/১১

২৩. প্রাগুক্ত-১১/২৭৯

২৪. প্রাগুক্ত-১১/৩২৯

২৫. প্রাগুক্ত-২/৭৬

২৬. প্রাগুক্ত-৭/২১৩

২৭. প্রাগুক্ত-৮/৩০২

বর্ণনার রাবী ইসরাঈল একেবারেই একজন অখ্যাত মানুষ। তাছাড়া তাঁর বর্ণনায় যে ভিত্তিতে 'ইকরিমাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে তার অবস্থা এই যে, যদিও সহীহ বর্ণনায় এসেছে যে রাসূলুল্লাহর (সা) সময়কালে ভূমির ইজারাপ্রথা ছিল, কিন্তু অনেক সাহাবীর তা জানা না থাকার কারণে তা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) যদিও জানতেন যে, রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় ভূমির ইজারা চালু ছিল, কিন্তু কোন কোন সাহাবীর তা না জানা থাকার কারণে জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল; এ কারণে তিনিও এই ধারণায় ইজারা গ্রহণ ছেড়ে দেন যে, হয়তো এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) নিষেধের কথা তিনি শোনেননি। এমতাবস্থায় 'ইকরিমার ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। সপ্তম বর্ণনায় উহাইব ইবন খালিদ একজন দুর্বল (ضعيف) রাবী। আর অষ্টম বর্ণনায় ইবরাহীম ইবন মুনযিলের বর্ণনা বিতর্কিত।[২৮]

মোটকথা 'ইকরিমার প্রতি অভিযোগ সম্বলিত এ সকল বর্ণনার কোনটাই গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাছাড়া এ সকল বর্ণনার বিপরীতে এত বেশি বর্ণনা আছে যে, তা থাকতে 'ইকরিমাকে অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

'আলিম ও মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্য

ইসহাক ইবন 'ঈসা আত-তাব্বা' বর্ণনা করেন। আমি মালিক ইবন আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) এই কথাটি জানা আছে– "আমার প্রতি সেই রকম মিথ্যা আরোপ করবে না যে রকম 'ইকরিমা ইবন 'আব্বাসের প্রতি আরোপ করে থাকে?" মালিক বললেন, না। এ ব্যাপারে কিছু জানা নেই। অবশ্য সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব তাঁর দাস বুরদকে এমন বলতেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, সা'ঈদ ইবন জুবায়র অন্যদের মুখে শোনা 'ইকরিমার কিছু বর্ণনায় সন্দেহ প্রকাশ করতেন। কিন্তু যখন খোদ তাঁর মুখে বর্ণনাটি শুনতেন তখন তাঁর সেই সন্দেহ দূর হয়ে যেত। আবূ ইসহাক বলেন, আমি একবার সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে একথা বলতে শুনেছি যে, তোমরা 'ইকরিমার এমন সব হাদীছ বর্ণনা কর, যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম তাহলে সম্ভবতঃ তা বর্ণনা করতেন না। ঘটনাক্রমে কিছুক্ষণ পরে সেখানে 'ইকরিমা এসে উপস্থিত হন এবং তিনি সেই হাদীছগুলো বর্ণনা করেন। উপস্থিত সকলে চুপ করে শোনেন। সা'ঈদও কিছু বললেন না। 'ইকরিমা চলে যাওয়ার পর লোকেরা সা'ঈদ ইবন জুবায়রকে জিজ্ঞেস করে : আবূ 'আবদিল্লাহ! কী ব্যাপার, আপনি চুপ থাকলেন কেন? বললেন : 'ইকরিমা সঠিক বর্ণনা করেছেন। সকল মুহাদ্দিছ তাঁর সত্যবাদিতা ও অগাধ জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করেছেন। হযরত 'আতা' ও সা'ঈদ ইবন জুবায়র উভয়ে বিনা দ্বিধায় তাঁর সকল হাদীছ গ্রহণ করতেন। হাবীব আবী ছাবিত বলেন, একবার 'ইকরিমা ও 'আতা' গেলেন সা'ঈদের নিকট এবং তাঁকে হাদীছ শোনালেন। যখন 'ইকরিমা হাদীছ শুনিয়ে উঠে গেলেন তখন আমি তাঁদের দু'জনকে প্রশ্ন

---

২৮. প্রাগুক্ত-১১/১৭০; ১/১৬৭

করলাম : 'ইকরিমা যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার কোন অংশে আপনাদের অস্বীকৃতি আছে? তাঁরা বললেন : না।[২৯]

হযরত সা'ঈদ ইবন জুবায়র (রহ) যিনি নিজেই একজন বড় 'আলিম ছিলেন, 'ইকরিমাকে নিজের চেয়েও বড় 'আলিম বলে মানতেন। তাবি' তাবি'ঈনের মধ্যে ইবন জুরায়জ ছিলেন একজন অতি উঁচু স্তরের মুহাদ্দিছ। তিনি 'ইকরিমার এত গুণমুগ্ধ ছিলেন যে, একবার ইয়াহইয়া ইবন আইউব আল-মিসরীকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি 'ইকরিমা থেকে কিছু লিখেছো? তাঁরা বললেন : না। ইবন জুরায়জ বললেন, তাহলে তো তোমরা দুই তৃতীয়াংশ 'ইলম (জ্ঞান) বিনষ্ট করে ফেলেছো।[৩০] কাতাদা (রহ) চার ব্যক্তিকে বড় 'আলিম বলে মানতেন, তাঁদের মধ্যে একজন 'ইকরিমা। মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (রহ) হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) সকল হাদীছ 'ইকরিমার সূত্রে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল 'ইকরিমার বর্ণনাসমূহকে দলীল-প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন। ইবন মা'ঈন বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে 'ইকরিমাকে সা'ঈদ ইবন জুবায়রের সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর প্রতি ইবন মা'ঈনের এত প্রবল ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর সম্পর্কে কোন রকম খারাপ ধারণা পোষণ করা মোটেই সহ্য করতেন না। তিনি বলতেন, যখন আমি কোন ব্যক্তিকে 'ইকরিমা ও হাম্মাদ ইবন সালামার দোষ-ত্রুটি আলোচনা করতে দেখি তখন তার মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে আমার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ইবন আল-মাদীনী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) দাসদের মধ্যে 'ইকরিমার চেয়ে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। 'ইকরিমা জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন। ইমাম বুখারী বলতেন, আমাদের সকল সংগী-সাথী 'ইকরিমার বর্ণনা দ্বারা দলীল-প্রমাণ গ্রহণ করেন। ইমাম নাসাঈ তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন। ইবন আবী হাতিম বলেন, আমি আমার পিতাকে প্রশ্ন করলাম : 'ইকরিমা কেমন? জবাব দিলেন : ছিকা বা বিশ্বস্ত। আবার প্রশ্ন করলাম! তাঁর হাদীছসমূহ কি দলীল-প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য? বললেন : হাঁ, যখন তিনি বিশ্বস্ত রাবীদের থেকে বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ ও ইমাম মালিক (রহ) তাঁর হাদীছসমূহ নয়, বরং তাঁর নিজের মতামতকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁদেরকে প্রশ্ন করা হয় : 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) অন্য দাসদের অবস্থা কি? তাঁরা বলেন : 'ইকরিমা তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার অধিকারী। এই স্থানে তাঁর কোন হাদীছ বর্ণনার প্রয়োজন নেই। বিশ্বস্ত রাবীগণ তাঁর থেকে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা সবই সহীহ বা সঠিক। হাদীছের ইমামগণ তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করতে নিষেধ করেননি। সহীহ হাদীছের সংকলনকারীগণ তাঁর বর্ণনাসমূহকে তাঁদের সহীহ গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশ করেছেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব এর চেয়েও উন্নত যে, আমি তাঁর হাদীছসমূহ প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করি।[৩১]

---

২৯. তাবাকাত-৫/২১৩; তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৭০

৩০. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৭/২৬৬

৩১. প্রাগুক্ত-৭/২৬৬-২৭০

ইবন মুন্দাহ বলেন, শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের বিশাল একটি সংখ্যা এবং তাবি' তাবি'ঈগণ 'ইকরিমাকে ন্যায়নিষ্ঠ বলেছেন, তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তার একক বর্ণনা দ্বারা আল্লাহর সিফাত, সুন্নাহ ও বিভিন্ন আহকামের দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর থেকে তিনশো'র অধিক মানুষ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাদের সত্তর (৭০) জনের অধিক উঁচু পর্যায়ের তাবি'ঈ। এ এমন মর্যাদা যা অন্য কোন তাবি'ঈ অর্জন করতে পারেননি। যে সকল ইমাম তাঁর সমালোচনা করেছেন তাঁরাও তাঁর থেকে হাদীছ গ্রহণ এড়াতে পারেননি। তাবি'ঈদের যুগ থেকে নিয়ে ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসা'ঈর যুগ পর্যন্ত সকল ইমাম তাঁর সহীহ বর্ণনাসমূহ গ্রহণ করে তা ছাবিত, সাকীম ও সাহীহ (صحيح ও ثابتٌ، سقيم) তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যুগের পর যুগ ধরে ইমামের পর ইমামগণ তাঁর বর্ণিত হাদীছসমূহকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বিখ্যাত চার মাযহাবের মহান ইমামগণ তাঁর হাদীছসমূহ দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহ) তাঁর সম্পর্কে সুধারণা রাখতেন না, তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর হাদীছ গ্রহণ করেছেন। চুলচেরা সমালোচনার পর তাঁর মূল্যায়ন করে তাঁকে ন্যায়নিষ্ঠ বলেছেন।[৩২]

আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন নাসর আল-মুরূযী বলেন, 'ইকরিমার হাদীছসমূহ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণের ব্যাপারে হাদীছের সকল 'আলিমের ইজমা' আছে। আমাদের যুগের সকল শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ, যেমন : আহমাদ ইবন হাম্বল, ইবন রাহুওয়াইহ, ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন, আবূ ছাওর প্রমুখের এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে। আমি তাঁর বর্ণনাসমূহ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে ইবন রাহুওয়াইহ-এর নিকট জিজ্ঞেস করি। তিনি আমার প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, আমাদের মতে 'ইকরিমা সারা পৃথিবীর ইমাম। কিছু লোক ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈনকে একই প্রশ্ন করে। তিনিও এমন প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করেন।[৩৩]

জাবির ইবন যায়দ বলতেন, 'ইকরিমা হলেন মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি। যার মধ্যে জ্ঞানের সুগন্ধি অনুভব করার সামান্যতম শক্তি আছে তার ইয়াযীদ ইবন আবী যিয়াদের কথার (পূর্বে উল্লেখিত) উপর নির্ভর করা উচিত নয়। ইয়াযীদ ইবন আবী যিয়াদ এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি নন। আর একজন সমালোচিত ব্যক্তির কথা দ্বারা একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি সমালোচিত ও দোষী হতে পারেন না। 'ইকরিমা এমন ব্যক্তি যাঁর জ্ঞানের ঝর্ণাধারা থেকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা পরিতৃপ্ত হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে হাদীছ ও ফিক্‌হের প্রসার ঘটিয়েছেন। তাঁর মধ্যে কিছু কৌতুকপ্রিয়তা ছাড়া মন্দ কোন কিছুর কথা আমার জানা নেই।

মোটকথা, পূর্বে আলোচিত কিছু দুর্বল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা ছাড়া সকল 'আলিম ও মুহাদ্দিছ 'ইকরিমার মহত্ত্ব, মনীষা ও সত্যবাদিতার ব্যাপারে এ রকম মত পোষণ করেছেন। তাঁর সত্যবাদিতার অনস্বীকার্য সাক্ষ্য এই যে, খোদ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা),

---

৩২. প্রাগুক্ত-৭/৫২

৩৩. প্রাগুক্ত-৭/২৭২-২৭৩

যাঁর আশ্রয়ে তিনি বেড়ে ওঠেন, তাঁর জ্ঞানের উপর এতখানি আস্থা ছিল যে, তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন, 'ইকরিমা আমার সূত্রে যা বর্ণনা করবে তোমরা তা সত্য বলে জানবে।[৩৪] সে আমার নামে মিথ্যা বলবে না। এখানে যে পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো তাতে জ্ঞানের জগতে হযরত 'ইকরিমার (রহ) সুউচ্চ আসন ও মর্যাদার ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

তাঁর ছাত্র

জ্ঞানের জগতে তাঁর যে সুউচ্চ আসন ছিল তা তাঁর ছাত্র সংখ্যা দ্বারা বুঝা যায়। অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন ইমাম পর্যায়ের। ছাত্রদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ হবে, তাই কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্রের নাম এখানে উপস্থাপন করা হলো :

ইবরাহীম নাখা'ঈ, জাবির ইবন যায়দ, ইমাম শা'বী, আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ, আবুয যুবায়র, কাতাদা, সাম্মাক ইবন হারব, 'আসিম আল-আহওয়াল, হুসায়ন ইবন 'আবদির রহমান, আইউব, খালিদ, দাঊদ ইবন আবী হিন্দ, 'আসিম ইবন বাহদালা, 'আবদুল কারীম আল-জাযারী, হুমায়দ আত-তাবীল, মূসা ইবন 'উকবা, 'আমর ইবন দীনার, 'আতা' ইবন সায়িব, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব, আবূ ইসহাক আশ-শায়বানী, হিশাম ইবন হাস্সান, ইয়াহইয়া ইবন কাছীর, হাকাম ইবন 'উয়ায়না, খাসীফ আল-জাযারী, দাঊদ ইবন আল-হুসায়ন, 'আতা' আল-খুরাসানী, 'আতা' ইবন আস-সায়িব, 'আতা' আল-'আওফী, 'আবদুল কারীম আবূ উমাইয়্যা আল-বাসরী, 'আবদুল মালিক ইবন আবী বাশীর আল-মাদায়িনী, 'উছমান ইবন সা'দ আল-কাতিব, 'উছমান ইবন গিয়াছ আল-বাসরী (রহ) ও আরো অনেকে।[৩৫]

ফিক্হ

হযরত 'ইকরিমার (রহ) মূল বিষয় ছিল হাদীছ। তবে তিনি ফিক্হ শাস্ত্রেও সুদক্ষ ছিলেন। ইবন হিব্বান বলেন, 'ইকরিমা তাঁর সময়ে ফিক্হ ও কুরআনের অন্যতম বড় 'আলিম ছিলেন।[৩৬] ফিক্হ বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতার বড় সনদ এই যে, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁকে ফাতওয়া দানের অনুমতি দান করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, ইবন 'আব্বাস (রা) আমাকে ফাতওয়া দিতে বলেন। আমি দু'বার অপারগতা প্রকাশ করে বলি যে, যদি এ যুগের মানুষ পূর্ববর্তী যুগের সত্যনিষ্ঠ মানুষদের মত হতো তাহলে আমার কোন আপত্তি থাকতো না। আমার এ আপত্তির কথা শুনেও তিনি জোর দিয়ে বলেন, কোন ব্যক্তি জরুরী কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে তা বলে দেবে। আর কেউ অহেতুক প্রশ্ন করলে তার জবাব দেবে না। এই কর্ম-পদ্ধতিতে তোমার

---

৩৪. প্রাগুক্ত-৭/২৬৫; তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৬৮

৩৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৭/২৬৪; তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৬৪

৩৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৭/২৭১

দুই-তৃতীয়াংশ বোঝা হালকা হয়ে যাবে।[৩৭] ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর মনীষা ও পাণ্ডিত্য এতখানি স্বীকৃত ছিল যে, যখন তিনি বসরায় যেতেন এবং যতদিন সেখানে অবস্থান করতেন ততদিন পর্যন্ত হাসান আল-বসরী (রহ) ফাতওয়া দিতেন না।[৩৮] তাঁর ইনতিকালের পর মানুষের মুখে মুখে একথাটি উচ্চারিত হতো : ফিক্‌হ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন।[৩৯]

তাঁর সমকালীন জ্ঞানী-গুণীরা বিভিন্ন মাসয়ালার ক্ষেত্রে তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করে তাঁর কাছেই জানতে চাইতেন। 'আমর ইবন দীনার বলেন, জাবির ইবন যায়দ কয়েকটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার জন্য আমাকে 'ইকরিমার নিকট পাঠালেন এবং আমাকে একথাও বললেন যে, ইবন 'আব্বাসের (রা) এ দাস জ্ঞানের সাগর। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করবে।[৪০]

মাগাযী

মাগাযী হলো হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবন-ইতিহাস। বিশেষত তাঁর সময়ের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস। হাদীছ ও ফিক্‌হ ছাড়াও ইতিহাসেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। মাগাযী শাস্ত্রে একজন বিশিষ্ট 'আলিম ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর এত জ্ঞান ছিল যে, যখন মাগাযীর বর্ণনা দিতেন তখন সাবলীল ভাষায় শ্রোতাদেরকে যেন যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে উপস্থিত করতেন। সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না বলেন, 'ইকরিমা যখন মাগাযী বর্ণনা করতেন তখন শ্রোতাদের মনে হতো তারা যেন মুজাহিদদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাঁদেরকে দেখছে।[৪১]

কাতাদা (রহ) বলতেন :[৪২]

كان أعلم التابعين أربعة : كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام.

'তাবি'ঈদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি চারজন : হজ্জের আহকাম ও 'ইবাদাত বিষয়ক জ্ঞানে 'আতা' ইবন আবী রাবাহ; তাফসীর বিষয়ক জ্ঞানে সা'ঈদ ইবন জুবায়র, সীরাতুন নবী (সা) বিষয়ক জ্ঞানে 'ইকরিমা এবং হালাল-হারাম বিষয়ক জ্ঞানে আল-হাসান সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।'

---

৩৭. প্রাগুক্ত
৩৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৮৪
৩৯. তাবাকাত-৫/২১৬
৪০. প্রাগুক্ত-৫/২১৩
৪১. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/২৬৬; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৩/১৬৮
৪২. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৩/১৬৮

ওফাত

হিজরী ১০৫, মতান্তরে ১০৬ অথবা ১০৭ সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইমাম যাহাবীর মতে হিজরী ১০৭ সনে মদীনায় তাঁর মৃত্যু হয়। একটি বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি আফ্রিকার কায়রোয়ানে ইনতিকাল করেন। তবে এ বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়।[৪৩]

কিছু সন্দেহের অপনোদন

কিছু বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত 'ইকরিমার একটু ঝোঁক ছিল খারিজীদের সাফরিয়্যা ও 'ইবাদিয়্যা সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি এবং নাজদা খারিজীর সাথে তার গভীর সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল। এমনকি নাজদা তাঁর নিকট ছয় মাস পর্যন্ত অবস্থানও করেছিল। মরক্কোর খারিজীরা তাঁর নিকট জ্ঞান অর্জন করেছে।[৪৪] তবে এ সকল বর্ণনার সবই সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ।

তাবাকাতে ইবন সা'দ, যেটি সবচেয়ে প্রাচীন সূত্র বলে স্বীকৃত, তাতে শুধু এ বাক্যটি পাওয়া যায় :[৪৫]

يظن أنه يرى رأى الخوارج – 'ধারণা করা হয় যে, তিনি খারিজীদের মত পোষণ করতেন।' এ বর্ণনার ভিত্তি যে কতটুকু শক্ত তা "يظن" অর্থাৎ ধারণা ও অনুমান শব্দ প্রয়োগের দ্বারা বুঝা যায়। কিছু মানুষ তো এ বর্ণনাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই 'আজলী বলেন, তিনি একজন মাক্কী তাবি'ঈ, বিশ্বাসযোগ্য এবং খারিজী মত পোষণের যে অভিযোগ তার প্রতি আরোপ করা হয় তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।[৪৬]

এ সকল বর্ণনা ছাড়া যুক্তি দ্বারাও প্রমাণ করা যায় যে, খারিজীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক থাকতে পারে না। কারণ, তিনি লালিত-পালিত হন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, আর তিনি ছিলেন খারিজীদের প্রবল প্রতিপক্ষ। 'ইকরিমার প্রথম মনিব হুসায়ন ইবন আল-হুর আল-আম্বরও ছিলেন আহলি বায়ত তথা নবী-পরিবারের ভক্ত। এমতাবস্থায় খারিজী চিন্তা-বিশ্বাসের দিকে তাঁর ঝোঁক থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। অপর দিকে শী'আ মত-বিশ্বাসের দিকে ঝোঁক প্রবণতার কথা যদি তাঁর সূত্রে বর্ণিত হতো তাহলে তা অধিক যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারতো।

বিভিন্ন বর্ণনা পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, হযরত 'ইকরিমা মুসলিম জনসাধারণের মত খারিজীদের ব্যাপারে কঠোর মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি তাদের সাথে লৌকিক ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতেন। যেহেতু এ কাজ মুসলিম জনসাধারণের কর্ম-পদ্ধতির বিপরীতে ছিল এবং জনগণ তা পছন্দ করতোনা, এ কারণে তাঁর খারিজী হওয়ার কথাটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটাও হতে পারে যে, বিশেষ কোন

---

৪৩. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৮৪; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৩/১৮১

৪৪. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৩/১৭৮

৪৫. প্রাগুক্ত-১৩/১৮০; তাবাকাত-৫/২১৬

৪৬. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৭/২৭০

মাসয়ালায় তাঁর মতামত খারিজীদের মতামতের সাথে মিলে যায়, এ কারণে তিনি খারিজী হিসেবে প্রসিদ্ধি পান। অন্যথায় এই গোমরাহ্ দলের সাথে তাঁর কোন রকম সম্পর্ক ছিল না।

দেশ ভ্রমণে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। সারা জীবনই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করেছেন। পূর্বে সমরকন্দ থেকে পশ্চিমে মিসর তথা আফ্রিকার প্রান্তসীমা পর্যন্ত ছিল তাঁর ভ্রমণের পরিধি।[৪৭]

তাঁর আল-মাগরিব তথা মরক্কো সফরের কারণ সম্পর্কে আবুল আসওয়াদ বলেছেন এভাবে :[৪৮]

كنت أول من سَبَّب لعكرمة الخروج إلى المغرب، وذلك أني قدمت من مصر إلى المدينة، فلقيني عكرمة وسألني عن أهل المغرب فاخبرته بغفلتهم، قال : فخرج إليهم.

"ইকরিমার আল-মাগরিব যাত্রার প্রথম কারণ আমি। আর তা হলো আমি মিসর থেকে মদীনায় আসি এবং 'ইকরিমা আমার সাথে দেখা করেন। তিনি আল-মাগরিববাসীদের সম্পর্কে আমার নিকট জানতে চাইলেন। আমি তাদের অমনোযোগিতা ও গাফলতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। অতঃপর তিনি (মদীনা থেকে) আল-মাগরিববাসীদের দিকে বেরিয়ে পড়লেন।'

ইবন বুকাইর বলেন, 'ইকরিমা আল-মাগরিব যাওয়ার পথে মিসর আসেন। তিনি নিজের বাড়ির পাশে একটি বাড়ি দেখিয়ে বলতেন, 'ইকরিমা এই বাড়িতে অবস্থান করেন এবং এখান থেকে আল-মাগরিবের দিকে বেরিয়ে পড়েন।[৪৯]

তাঁর বসরা গমনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন আইউব এভাবে : 'আমি 'ইকরিমার খ্যাতির কথা শুনে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তাঁর কাছে যাওয়ার ইরাদা করছিলাম। একদিন আমি বসরার বাজারে বসে আছি, এমন সময় এক ব্যক্তি গাধায় চড়ে সেখানে আসলেন। লোকেরা আমাকে বললো, ইনিই 'ইকরিমা। লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরলো। আমিও উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে পারলাম না। আমার সব প্রশ্ন যেন ভুলে গেলাম। আমি তাঁর গাধার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের সকল প্রশ্ন ও তাঁর উত্তর শুনতে ও মুখস্থ করতে লাগলাম। আইউব আরো বলেন, তাঁর পাশে মানুষের এত ভীড় হয় যে, তা সামলাতে তাঁকে একটি ঘরের ছাদের উপর বসানো হয়। এই বসরা ভ্রমণকালে সেখানে আইউব, সুলায়মান আত-তায়মী, ইউনুস ইবন 'উবায়দ তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন।[৫০]

---

৪৭. প্রাগুক্ত

৪৮. তাহ্যীব আল-কামাল-১৩/১৭২

৪৯. প্রাগুক্ত

৫০. প্রাগুক্ত

তিনি খুরাসান ও সমরকন্দেও যান। আল-মুগীরা ইবন মুসলিম বলেন, খুরাসানে তাঁর হজ্জ বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করা হয়। আবুত তায়্যিব মূসা ইবন ইয়াসার বলেন, আমি 'ইকরিমাকে গাধায় চড়ে সমরকন্দ থেকে আসতে দেখেছি। সেই গাধার পিঠে ঝোলানো রেশমভরা দু'টি বস্তা ছিল, যা সমরকন্দের শাসক তাঁকে দিয়েছিলেন। সংগে একটি দাসও ছিল। আবুত তায়্যিব আরো বলেন, আমি এই সমরকন্দেই তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শুনেছি। এখানে একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি হারামাইন (মক্কা-মদীনা) ছেড়ে এই খুরাসান-সমরকন্দে এসেছেন কেন? তিনি বলেন, প্রয়োজনই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।[৫১]

আসলে তিনি সাধারণ মানুষের দান-উপহার গ্রহণ করতেন না, বরং আমীর-উমারাদের থেকেই গ্রহণ করতেন। একবার তাঁর মাথায় একটি পুরাতন জীর্ণ পাগড়ী দেখে এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, আপনি এই পাগড়ীটি বাদ দিন, আমাদের অনেক পাগড়ী আছে, তার থেকে একটি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি সেটা পরবেন। বললেন :

أنا لا أخذ من الناس شيئًا إنما اخذ من الأمراء.

'আমি সাধারণ মানুষের নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণ করিনে। গ্রহণ করি কেবল আমীর-উমারাদের থেকে।'

ইবরাহীম ইবন ইয়া'কূব বলেন, আমি আহমাদ ইবন হাম্বলের নিকট জানতে চাইলাম যে, 'ইকরিমা কি আল-মাগারিবের 'বারবার' সম্প্রদায়ের নিকট গিয়েছিলেন? বললেন : হাঁ। তিনি খুরাসানের আমীর-উমারাদের নিকট গিয়ে তাঁদের দান-অনুগ্রহ গ্রহণ করতেন।[৫২]

খালিদ ইবন আবী 'ইমরান বলেন, ইবন 'আব্বাসের (রা) দাস 'ইকরিমা একটা মেলার মৌসুমে আমাদের আফ্রিকাতে আসেন এবং একটি বল্লম হাতে নিয়ে বলেন, আমি মেলায় যাব, ডানে-বামে যাকে পাব এই বল্লম দিয়ে পেটাবো। তিনি মেলায় যান এবং মেলায় অংশ গ্রহণকারীদের প্রতিরোধের মুখে পড়েন।[৫৩]

---

৫১. প্রাগুক্ত-১৩/১৭৬

৫২. প্রাগুক্ত-১৩/১৭২, ১৭৬

৫৩. প্রাগুক্ত-১৩/১৭২

'আবদুল্লাহ ইবন 'আওন (রহ)

হযরত 'আবদুল্লাহর ডাকনাম আবূ 'আওন। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন দুর্‌রা আল-মুযানীর দাস ছিলেন। জারিফ প্লাবনের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি কূফার শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের মধ্যে ছিলেন। ইমাম আছ-ছাওরী বলতেন, আমি আইউব, ইউনুস, তায়মী এবং 'আওনের মত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের একটি শহরে একত্রে আর কোথাও দেখিনি।[২]

হাদীছ

হযরত 'আবদুল্লাহ সকল ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তবে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) হাদীছের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও আকর্ষণ এবং তাতে তিনি এক বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেন। ইবন সা'দ বলেন :[৩]

كان ثقة كثير الحديث.

"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, বহু হাদীছের ধারক-বাহক ও বর্ণনাকারী।" তিনি তাঁর যুগের সকল বড় মুহাদ্দিছের জ্ঞান আত্মস্থ করেন। ইবন 'আদী বলেন, ইবন 'আওন এমন সব সনদবিশিষ্ট হাদীছ সংরক্ষণ করেন যা তাঁর অন্য কোন সঙ্গী-সাথী করতে পারেননি। মদীনার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছগণের মধ্যে তিনি হযরত সালিম, কাসিম; বসরার মুহাদ্দিছগণের মধ্যে হযরত হাসান আল-বাসরী, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন; কূফার মুহাদ্দিছগণের মধ্যে ইমাম শা'বী, ইমাম নাখা'ঈ; মক্কার মুহাদ্দিছগণের মধ্যে হযরত 'আতা', মুজাহিদ; শামের মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মাকহূল ও রাজা' ইবন হায়ওয়া (রহ) থেকে হাদীছ শোনেন।[৪] এভাবে তিনি তৎকালীন সকল হাদীছ চর্চার কেন্দ্রগুলোর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছগণের হাদীছসমূহ লাভ করেন। এছাড়া আরো বহু 'আলিমের নিকট থেকে ফায়দা হাসিল করেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন : ছুমামা ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আনাস, আনাস ইবন সীরীন, যিয়াদ ইবন যুবায়র, 'আব্দুর রহমান ইবন আবী বাকরা, মূসা ইবন আনাস ইবনে মালিক, হিশাম ইবন যায়দ ইবন আনাস, সা'ঈদ ইবন জুবায়র, নাফি' (রহ) প্রমুখ।[৫] এ সকল মহান ব্যক্তির সাহচর্য ও উদারতায় তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেন তার পরিধি অত্যন্ত

---

১. তাবাকাত ইবন সা'দ-৭/২৫

২. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৫/৩৪৭

৩. তাবাকাত-৭/২৪

৪. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৫/৩৪৭' তাহ্‌যীব আল-কামাল-১০/৩৯৬

৫. প্রাগুক্ত

বিস্তৃত। ইবন মাহদী বলেন, ইরাকে ইবন 'আওনের চেয়ে সুন্নাহ্র বড় 'আলিম আর কেউ ছিলেন না।[৬] 'উছমান আল-বাত্তী বলতেন, আমার এ দুচোখ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আওনের মত আর কাউকে দেখেনি।[৭]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক (রহ) বলতেন, আমি সাক্ষাতের পূর্বে যে সকল ব্যক্তির কথা শুনেছিলাম তাঁদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আওন, রাজা' ইবন হায়ওয়া ও সুফইয়ান ছাড়া অবশিষ্ট সকলকে সাক্ষাতের পর নিম্নমানের পেয়েছি। তবে ইবন 'আওনের সাথে সাক্ষাতের পর মন চাইতো, চিরদিনের জন্য তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই এবং মরণ পর্যন্ত পৃথক না হই।[৮] একবার হিশাম ইবন হাস্সান একটি হাদীছ বর্ণনা করেন। একজন জিজ্ঞেস করলো : হাদীছটি আপনি কার নিকট থেকে শুনেছেন? জবাব দিলেন : এমন ব্যক্তির নিকট থেকে যার সমকক্ষ আর কাউকে আমার চোখ দেখেনি। তিনি হাসান আল-বাসরী ও মুহাম্মাদ ইবন সীরীনকেও ব্যতিক্রম বলেননি।[৯]

হাদীছ বর্ণনায় ভীতি ও সতর্কতা

এত গভীর ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি হাদীছ বর্ণনায় দারুণ সতর্ক ছিলেন। মানুষকে হাদীছ শোনাতে হবে এই ভয়ে রাস্তা-ঘাটে বের হওয়া বন্ধ করে দেন। বাক্কার ইবন মুহাম্মাদ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আওন আমাকে বললেন : ভাতিজা! মানুষ আমার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। এখন আমি প্রয়োজনেও ঘর থেকে বের হতে পারিনে। বাক্কার বলেন, তাঁর এ কথার অর্থ এই ছিল যে, মানুষ তাঁর কাছে হাদীছ জিজ্ঞেস করতো।[১০] তা সত্ত্বেও তিনি হাদীছ বর্ণনার দ্বার একেবারে রুদ্ধ করে দেননি। আলিমগণের স্বীকৃত ও সত্যায়িত হাদীছ তিনি বর্ণনা করতেন। বাক্কার বলেন, ইবন 'আওন কুফাতেই সর্বাধিক জ্ঞান অর্জন করেন এবং তা মুহাম্মাদের সামনে উপস্থাপন করেন। মুহাম্মাদ তা শুনে যে হাদীছের ব্যাপরে একমত ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, ইবন 'আওন তাই বর্ণনা করেন এবং অবশিষ্টগুলো বাদ দেন।[১১]

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বড় বড় ইমামও আছেন। যেমন : আ'মাশ, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, শু'বা (রহ) প্রমুখ। সাধারণ ছাত্রদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : দাউদ ইবন আবী হিন্দ, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, 'আব্বাদ ইবন আল-'আওয়াম, হাশীম, ইয়াযীদ ইবন যুরায়'ই, ইবন 'আলিয়্যা, বিশর

---

৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৩৪৮
৭. তাহ্যীব আল-কামার-১০/৩৯৬
৮. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৩৪৮
৯. তাবাকাত-৭/২৭
১০. প্রাগুক্ত-৭/২৫
১১. প্রাগুক্ত-৭/২৭

ইবন মুফাদ্দাল, মু'আয, ইয়াযীদ ইবন হারূন, আবূ 'আসিম, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-আনসারী (রহ) ও আরো অনেকে।[১২]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

জ্ঞানের চেয়েও তিনি তাঁর তাকওয়া-পরহেযগারী, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীতে বেশি দীপ্তিমান ছিলেন। ইবন হিব্বান বলেন, ইবাদত-বন্দেগী, তাক্ওয়া-পরহেযগারী, সুন্নাতের অনুসরণ এবং বিদ'আতীদের প্রতি কঠোরতার ব্যাপারে তিনি সমকালীনদের মধ্যে অন্যতম নেতা ছিলেন।[১৩]

'আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে কঠোরতা

'আকীদার ব্যাপারে তিনি সাহাবায়ে কিরামের (রা) পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন 'আকীদা-বিশ্বাসের অনুসারী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কম-বেশি করাকে দারুণ অপছন্দ করতেন। আর যারা এমন করতো তাদের তিনি সালামও করতেন না।[১৪] একবার তাঁর সামনে 'কদর' বিষয়ে আলোচনা হলে তিনি বললেন, এই 'আকীদার বয়সের চেয়ে আমার বয়স বেশি। আমি সা'ঈদ আল-জুহানী ও সানওয়াইহ ব্যতীত পূর্ববর্তীদের কেউ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন বলে শুনিনি মূলত এ একটি মন্দ চিন্তা।[১৫]

'ইবাদত

তাঁর তাক্ওয়া-পরহেযগারী ও ইবাদত-বন্দেগীর মাত্রা মুহাম্মাদ ইবন সীরীনকেও হার মানিয়ে দেয়। কুররা বলেন, আমরা মুহাম্মাদ ইবন সীরীনের আল্লাহ-ভীতি দেখে অবাক হতাম, কিন্তু 'আবদুল্লাহ ইবন আওন তাঁকেও হার মানান।[১৬] তাঁর প্রতিদিনের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল 'ইবাদত। ফজরের নামাযের পর কিবলামুখী হয়ে বসে যিকর করতেন। সূর্যোদয়ের পর ইশরাকের নামায আদায় করে মানুষের সামনে আসতেন। প্রত্যেক রাতে কয়েক শো রাক'আত নফল নামায পড়তেন। কোন কারণে কোন রাতে যদি তা আদায় করতে না পারতেন তাহলে দিনে তা পূরণ করতেন।[১৭] বাড়ীর সীমানার মধ্যে একটি বিশেষ মসজিদ ছিল। মাগরিব ও 'ঈশা ছাড়া বাকী তিন ওয়াকতের নামায নিজের ছেলে, ভাই এবং উপস্থিত লোকদের নিয়ে এই মসজিদে পড়তেন। জুম'আ ও দু'ঈদের নামাযকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। গোসল করে সুন্দর রুচিসম্মত পোশাক পরে খোশবু লাগাতেন। কখনো বাহনে চড়ে, আবার কখনো পায়ে হেঁটে মসজিদে যেতেন। জুম'আর নামায আদায় করার পরই ঘরে ফিরে যেতেন এবং সুন্নাত-নফল নামায ঘরেই আদায়

---

১২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৩৪৭' তাহ্যীব আল-কামাল-১০/৩৯৬

১৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৩৪৮

১৪. তাবাকাত-৭/২৫

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. শাযারাত আয-যাহাব-১/২৩০; তাহযীব আল-কামাল-১০/৩৯৮

১৭. তাবাকাত-৭/২৫

করতেন। রমযান মাসে 'ইবাদতের মাত্রা অনেক বেড়ে যেত। ফরয নামায জামা'আতের সাথে আদায়ের পর ঘরে ফিরতেন। নির্জনে ইবাদত করতেন এবং নির্জনে বসে বসে- الْحَمْدُ لله رَبَّنَا এই যিকরে মশগুল থাকতেন।[১৮] একদিন পর একদিন করে সারা বছর রোযা রাখতেন এবং আমরণ এই নিয়মের ভিন্নতা হয়নি।[১৯]

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর (আল্লাহর পথে জিহাদ) উদ্দেশ্যে বিশেষ যত্নে একটি উষ্ট্রী পালতেন এবং সেটাকে খুবই ভালোবাসতেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে তাঁর অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমানদের সাথে কোন একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং একজন রোমান সৈনিকের সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করেন।[২০]

আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধি ব্যতীত দুনিয়ার আর কোন কিছুর প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। বাক্কার ইবন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, ইবন 'আওন না কারো সাথে রসিকতা করতেন, আর না করতেন কারো সাথে তর্ক-বিতর্ক। কবিতা আবৃত্তিও করতেন না। তিনি কেবল আত্মপরিশুদ্ধির কাজেই নিয়োজিত থাকতেন।[২১]

উপকার করে গোপন রাখা

কারো কোন উপকার করে তা প্রকাশ করা খারাপ মনে করতেন। বাক্কার ইবন মুহাম্মাদ বলেন, ইবন 'আওন কারো প্রতি অনুগ্রহ বা সদাচরণ করলে এত গোপনে করতেন যে, কেউ জানতে পারতো না। অন্যের নিকট তা প্রকাশ করা খুবই খারাপ বলে বিশ্বাস করতেন।[২২]

কসম পরিহার

তিনি কসম খাওয়া ভালো কাজ বলে মনে করতেন না। কখনো সত্য কসমও খেতেন না। বাক্কার ইবন মুহাম্মাদ বলেন, আমি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একটা দীর্ঘ সময় তাঁর সাথে ছিলাম। এ সময়ের মধ্যে কখনো তাঁকে সত্য-মিথ্যা কোন রকম কসম খেতে দেখিনি।[২৩]

নৈতিক চরিত্র

তিনি অত্যন্ত বিনম্র, বিনয়ী ও উত্তম চরিত্রের মানুষ ছিলেন। কোন অবস্থাতে তাঁর মুখ থেকে কোন অশালীন কথা বের হতো না। বাক্কার বলেন, আমি ইবন 'আওনের চেয়ে বেশি জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এমন কোন মানুষ দেখিনি। তিনি নিজের দাস-দাসী, এমন

---

১৮. প্রাগুক্ত
১৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৩৪৮
২০. তাবাকাত-৫/২৮
২১. প্রাগুক্ত
২২. প্রাগুক্ত
২৩. প্রাগুক্ত

কি ছাগল-মুরগীকে পর্যন্ত কখনো গালি দিতেন না। জিহাদের যে উষ্ট্রীকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন তার পিঠে একবার পানি বোঝাই করে আনার জন্য দাসকে নির্দেশ দেন। সে নির্দয়ভাবে উষ্ট্রীর মুখে পেটায় এবং তাতে চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লোকেরা ধারণা করলো যে, দাসের এ আচরণে তিনি অবশ্যই ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু যখন উষ্ট্রীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়লো তখন দাসকে শুধু এতটুকু বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। তুমি পেটানোর জন্য উষ্ট্রীর মুখমণ্ডল ছাড়া দেহের আর কোন অংশ কি পাওনি? তারপর তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দেন।[২৪] দারুণ সহনশীল ছিলেন। যাদের হাতে তিনি দৈহিকভাবে নির্যাতিত হতেন তাদেরকেও নিন্দা মন্দ করতেন না। একবার তিনি একজন আরব মহিলাকে বিয়ে করলেন। বিলাল ইবন আবী বুরদা তাঁকে এ জন্য চাবুক মারে যে, দাস হয়ে আরব মহিলাকে বিয়ে করেছে। বাক্কার বলেন, আমি এ ঘটনার পরেও ইবন 'আওনের মুখে বিলাল সম্পর্কে একটি কথাও শুনিনি। একবার কিছু লোক বললো, বিলাল আপনার সঙ্গে দারুণ অসদাচরণ করেছে। জবাবে বললেন ঃ একজন মানুষ মজলুম হয়, কিন্তু সেই ঐ যুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নিজেই শেষে জালিম হয়ে যায়। তোমাদের মধ্যে কেউই আমার চেয়ে বেশি বিলালের প্রতি কঠোর নও। কিন্তু আমি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নিজেই জালিম হতে পারবো না।[২৫]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি ভালোবাসা

হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) তিনি সীমাহীন ভালোবাসতেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আশা ছিল স্বপ্নে অন্তত একবার তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করা। আল্লাহ তাঁর এ নেক আশা পূর্ণ করেন। মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পূর্বে স্বপ্নের মধ্যে এই দীদার সম্পন্ন হয়। এই ঘটনায় তিনি এতই আবেগ আপ্লুত হন যে, ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে যান এবং খুশীর আতিশয্যে মাটিতে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পান। কিন্তু একটি মহা সৌভাগ্যের স্মৃতিকে ধরে রাখার মানসে সেই আঘাতের কোন চিকিৎসা করাননি।[২৬]

ওফাত

অবশেষে এই আঘাত তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে এই রোগের সকল কষ্ট সহ্য করেন। বাক্কার ইবন মুহাম্মাদ বলেন, রোগগ্রস্ত অবস্থায় তিনি বাঘের চেয়েও বেশি ধৈর্য ও সহনশীল ছিলেন। এ সময় মুখ থেকে একটি অভিযোগমূলক শব্দও উচ্চারিত হয়নি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত তিনি সচেতন ছিলেন। আমার ফুফু উম্মু মুহাম্মাদ বিনৃত আবদিল্লাহর কথামত আমি ইবন 'আওনের অন্তিম মুহূর্তে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে তাঁকে শুনিয়েছিলাম। আমি মৃত্যুর সময় তাঁর চেয়ে বেশি

---

২৪. প্রাগুক্ত-৭/২৮

২৫. প্রাগুক্ত-৭/২৫; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৩৪৮

২৬. তাবাকাত-৭/২৫

বুদ্ধিমান আর কাউকে দেখিনি। যতক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল ততক্ষণ কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর যিক্‌র করতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সকল সমস্যার সমাধান করে দেন। হিজরী ১৫১ সনের রজব মাসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।[২৭] জানাযায় এত বেশি লোকের সমাগম হয় যে, মসজিদের মূল ভবনসহ গোটা আঙ্গিনা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। মিহরাবে খাটিয়ায় লাশ রেখে সালাতুল জানাযা আদায় করা হয়। জানাযার নামায পড়ান জামীল ইবন মাহফূজ আল-আযদী।[২৮]

উত্তরাধিকার

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আওনের (রহ) কোন নগদ অর্থ ছিল না। দু'টি বাড়ী ছিল যার এক-পঞ্চমাংশ নিকটতম আত্মীয়-বন্ধুদের অনুকূলে অসীয়াত করে যান। দশ হাজারের কিছু বেশি দিরহামের ঋণ ছিল। তা পরিশোধ করার পর তার অসীয়াত পূরণ করা হয়।[২৯]

অত্যন্ত সুদর্শন মানুষ ছিলেন। মোঁচ এত ঘন ছিল না। তবে ছাঁটতেন। পরিচ্ছন্ন রুচি ও মেজাজের ছিলেন। কোমল ও পাতলা কাপড়ের সুন্দর পোশাক পরতেন। খুব বেশি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। পূর্ণ পোশাকে ঘর থেকে বের হতেন। ওজু ও আহারের সময় খাদিম রুমাল এগিয়ে দিত, তা দিয়ে তিনি হাত-মুখ মুছে ফেলতেন। রসুনসহ দুর্গন্ধ জাতীয় খাবার খুবই অপছন্দ করতেন। যে খাবারে রসুন থাকতো তা স্পর্শ করতেন না। একবার দাসী খাবার তৈরি করে সামনে আনে। তিনি রসুনের গন্ধ পেয়ে দাসীকে জিজ্ঞেস করেন। সে স্বীকার করে। অত্যন্ত সহনশীল প্রকৃতির ছিলেন তাই নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে শুধু এতটুকু বলেন যে, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন! এ খাবার আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও।[৩০]

---

২৭. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১০/৩৯৭-৩৯৮

২৮. প্রাগুক্ত; তাবাকাত-৭/২৯-৩০; তাবি'ঈন-২৪৬

২৯. তাবাকাত-৭/৩০

৩০. প্রাগুক্ত-৭/৩৬; তাবি'ঈন-২৪৬

ইয়াস ইবন মু'আবিয়া (রহ)

বর্তমান সৌদি আরবের নাজদ-এর অন্তর্গত আল-ইয়ামামা প্রদেশে হিজরী ৪৬ সনে ইয়াস ইবন মু'আবিয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে পরিবারের সাথে বসরায় চলে যান এবং সেখানে বেড়ে ওঠেন ও শিক্ষা লাভ করেন। জীবনের প্রথম ভাগে মাঝে মাঝে দিমাশকে গেছেন। তাঁর সময়ে জীবিত মহান সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও উঁচু স্তরের তাবি'ঈদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। শৈশবেই তাঁর মধ্যে প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও সৌভাগ্যের লক্ষণ দেখা যায়। তখনই তাঁর মেধা ও মননের কথা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।[১]

ইয়াস-এর ডাকনাম আবূ ওয়াছিলা এবং পিতার নাম মু'আবিয়া ইবন কুবরা। ইয়াস তাঁর যুগের একজন বিখ্যাত কাজী ছিলেন।

হাদীছ ও ফিক্হ

হাদীছ বর্ণনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। তার অর্থ এ নয় যে, এ ক্ষেত্রে তাঁর কোন অবদান নেই। ইবন সা'দ বলেছেন, তিনি অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২] তিনি পিতা মু'আবিয়া, আনাস ইবন মালিক, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, সা'ঈদ ইবন জুবায়র, আবূ মিযলায (রহ) প্রমুখের নিকট থেকে হাদীছ শোনেন। আইয়ূব, দাঊদ ইবন আবী হিন্দ, হুমাইদ আত-তাবীল, হাম্মাদ শা'বান, শু'বা, মু'আবি ইবন 'আবদিল কারীম (রহ) প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাঁর ছাত্র। ফিক্হ ছিল তাঁর বিশেষ অধীত বিষয়। এ শাস্ত্রে তাঁর ছিল বিশেষ অবস্থান। তাঁর জীবনীকারগণ তাঁকে ফকীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

কাজী হিসেবে দায়িত্ব পালন

ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অত্যধিক যোগ্যতার কারণে উমাইয়্যা শাসনামলে বসরার কাজী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তাঁর নিয়োগ লাভের পর হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। হযরত হাসানকে (রহ) দেখে তিনি কাঁদতে শুরু করেন।[৪] উল্লেখ্য যে, হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) তাঁকে বসরার কাজী নিয়োগ করেন।[৫]

তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধা, বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। ইবন সা'দ লিখেছেন ঃ

---

১. সুওয়ারুল মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৬৮-৬৯

২. আত-তাবাকাত-৭/৫

৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৯০

৪. আত-তাবাকাত-৭/৫

৫. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৯৮, টীকা নং-১

كان عاقلا من الرجال فطنا ؟ –তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ মানুষ। প্রখ্যাত তাবি'ঈ হযরত ইবন সীরীনের (রহ) সামনে তাঁর প্রসঙ্গে কোন কথা উঠলে বলতেন, তিনি তো একজন বাস্তব বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর সমকালীন লোকেরা বলতো, প্রত্যেক শতকে একজন অতি বড় বুদ্ধিমান মানুষের জন্ম হয়। এই শতকের সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি হলেন ইয়াস ইবন মু'আবিয়া (রহ)।[৬] ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী লিখেছেন, তাঁর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা প্রবাদে পরিণত হয়। যেমন বিখ্যাত কবি আবূ তাম্মামের একটি শ্লোকে এসেছে।[৭]

إقدام عمرو في شجاعة غنتر + في حلم أحنف في ذكاء إياس

'(প্রশংসিত ব্যক্তি আহমাদ ইবন আল-মু'তাসিম) ছিলেন, সাহসী পদক্ষেপে 'আমর ইবন মা'দিকারিব, বীরত্ব-সাহসিকতায় গানতার, ধৈর্য-সহনশীলতায় আহনাফ ইবন কায়স ও বুদ্ধি-বিচক্ষণতায় ইয়াস। অন্য একটি বর্ণনায় في سماحة حاتم (বদান্যতায় হাতিম তাঈ) এসেছে।

বিচার কাজের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনেকটা নির্ভর করে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার উপর। এ কারণে ইয়াস ছিলেন উমাইয়া যুগের শ্রেষ্ঠ ও সফল বিচারকদের একজন। তাঁর প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার বহু চমকপ্রদ ঘটনা সীরাতের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার বুদ্ধিমত্তার কয়েকটি ঘটনা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

একবার এক বিচার কাজের প্রয়োজনে চারজন মহিলা তাঁর আদালতে উপস্থিত হয়। তিনি তাদেরকে দেখামাত্র বলে দেন, এই চারজনের একজন গর্ভবতী, একজন তাঁর শিশু-সন্তানকে দুধ পান করায়, একজন বিবাহিত এবং একজন কুমারী। উপস্থিত লোকেরা খোঁজ নিয়ে জানতে পেল, তাঁর ধারণা সঠিক। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কিসের ভিত্তিতে এ অনুমান করলেন? বললেন, গর্ভবতী মহিলাটি যখন কথা বলছিল তখন তার কাপড় পেট থেকে উঠে যাচ্ছিল, যে শিশুকে দুধ পান করায় তার বুক দুলছিল, বিবাহিত যে, সে চোখে চোখ রেখে কথা বলছিল এবং কুমারী চোখ নীচু করে কথা বলছিল, আর আমি এসব আলামত দ্বারাই তাদের অবস্থা বুঝতে পেরেছিলাম।[৮]

একবার এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির নিকট কিছু অর্থ গচ্ছিত রাখে। যখন সে তার অর্থ ফেরত চায়, সে গচ্ছিত রাখার কথা অস্বীকার করে। অর্থের মালিক ইয়াসের আদালতে মামলা দায়ের করে। ইয়াস লোকটিকে বলেন, তুমি এখন চলে যাও এবং বিষয়টি গোপন রাখ। বিবাদী যেন বিষয়টি কোনভাবে জানতে না পারে যে, তুমি আমার নিকট এসেছিলে। দুদিন পরে আবার আসবে। এভাবে বাদীকে ফিরিয়ে দিয়ে ইয়াস বিবাদীকে

---

৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৯০

৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৪/৭৯; শাযারাত আয যাহাব-১/১৬০

৮. ইবন আল-জাওযী, আত-তুরুক আল-হিকমিয়্যা-২৮-২৯; তাবি'ঈন-৫০

ডেকে পাঠান। সে উপস্থিত হলে তাকে বলেন, আমার নিকট অনেক অর্থ এসে গেছে, তোমার ঘরটি বেশ মজবুত। তাই আমি আমার কিছু অর্থ তোমার নিকট আমানত রাখতে চাই। সে বলে, ঠিক আছে রাখুন। ইয়াস বললেন, এত অর্থ রাখার জন্য কোন স্থান নির্ধারণ করে বহন করার জন্য লোক সঙ্গে করে আবার এসো। লোকটি চলে গেলে ইয়াস বাদীকে ডেকে এনে বললেন, এবার তুমি তোমার আমানতদারের নিকট যেয়ে তোমার অর্থ ফেরত চাও। যদি দেয় তাহলে তো ভালো, অন্যথায় বলবে, আমার সম্পদ ফিরিয়ে দাও, নইলে আমি কাজী ইয়াসকে বলবো। একথার পর লোকটি তার অর্থ ফিরিয়ে দেয়। এরপর পূর্বের কথামতো লোকটি ইয়াসের নিকট আসে অর্থ নেওয়ার জন্য। কাজী ইয়াস তাঁকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে বিদায় দেন।[৯]

যৌবনে ইয়াস একাগ্রচিত্তে জ্ঞান ও গবেষণায় মেতে ওঠেন এবং অল্প কালের মধ্যে এতখানি পাণ্ডিত্য ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন যে, অনেক বড় বড় শায়খ তাঁর নিকট এসে তাঁর ছাত্রের খাতায় নাম লেখাতে শুরু করেন। তখনও কিন্তু তিনি একজন তরুণ।

একবার 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান বসরা ভ্রমণে গেলেন। তখনও তিনি খলীফা হননি। ইয়াসের তখন দাড়ি-গোঁফ গজায়নি। একদিন 'আবদুল মালিক দেখেন, তরুণ ইয়াস আগে আগে চলছেন, আর পিছনে পিছনে তাঁকে অনুসরণ করছেন সবুজ জোব্বা-পাগড়ী পরিহিত লম্বা দাড়িওয়ালা চারজন কারী। এ দৃশ্য দেখে 'আবদুল মালিক বললেন, আফসোস এই লম্বা দাড়িওয়ালা লোকদের জন্য! তাদের কেউ একজন সামনে না গিয়ে এই যুবককে সামনে দিয়েছে? তারপর তিনি ইয়াসকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ওহে নও-জোয়ান! তোমার বয়স কত?

ইয়াস বললেন ঃ আল্লাহ আমীরকে দীর্ঘজীবি করুন! আমার বয়স উসামা ইবন যায়দের (রা) সেই বয়সের সমান যখন রাসূল (সা) তাঁকে একটি বাহিনীর অধিনায়ক করেন, আর সেই বাহিনীতে ছিলেন আবু বাকর ও উমার (রা)।

জবাব শুনে 'আবদুল মালিক বলেন ঃ ওহে নও-জোয়ান! তুমি সামনে চল, তুমি সামনে চল। আল্লাহ তোমাকে আরো বরকত, আরো সমৃদ্ধি দান করুন![১০]

একবার মানুষ রমযানের চাঁদ দেখার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে ফাঁকা ময়দানে গেছে। তাঁদের মধ্যে মহান সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিকও (রা) আছেন। তখন তিনি বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত। বয়স প্রায় একশো বছরের কাছাকাছি। মানুষ আকাশে তন্ন তন্ন করে কিছুই দেখতে পেল না। কিন্তু আনাস (রা) আকাশের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে থেকে এক সময় বলতে লাগলেন! আমি নতুন চাঁদ দেখেছি। এই যে এখানে। হাত দিয়ে ইশারা করেও দেখাতে লাগলেন। কিন্তু কেউ কিছু দেখতে পেল না। পাশেই ইয়াস ছিলেন। তিনি হযরত আনাসের (রা) দিকে তাকিয়ে দেখেন, তাঁর ভ্রূর একটি লম্বা পশম

---

৯. প্রাগুক্ত-২৯

১০. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৭১

তাঁর চোখের উপর ঝুলে পড়েছে। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অনুমতি নিয়ে হাত দিয়ে সেই পশমটি সরিয়ে ভ্রূটি সমান করে দেন। তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন! এখন কি চাঁদ দেখতে পাচ্ছেন, হে আল্লাহর রাসূলের সাহাবী? আনাস (রা) আবার আকাশের দিকে তাকালেন এবং বলতে লাগলেন ঃ না, আমি তো চাঁদ দেখছি না, আমি তো দেখছি না।[১১]

হযরত ইয়াসের জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ মেধার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাঁর নিকট ছুটে আসতে থাকে ইল্ম ও দীন (জ্ঞান ও ধর্ম) বিষয়ে তাদের নানা প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান জানার উদ্দেশ্যে। অনেকে আবার আসে কূট-বিতর্কে জড়িয়ে তাঁকে অক্ষম করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। বর্ণিত হয়েছে, একবার এক আঞ্চলিক নেতা তাঁর মজলিসে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করে ঃ আবূ ওয়াছিলা! নেশা উদ্রেককারী বস্তু সম্পর্কে আপনার মত কি? বললেন ঃ সবই হারাম।

লোকটি বললো ঃ হারাম হওয়ার কারণ কি? কিছু খোরমায় পানি ঢেলে তা গরম করা ছাড়া তো তাতে আর কিছু মেশানো হয়নি। পানি ও খোরমা দুটি জিনিসই তো হালাল। তাহলে তা হারাম হবে কেন?

ইয়াস বললেন ঃ ওহে নেতাজি! আপনার বক্তব্য কি শেষ হয়েছে?

লোকটি বলল ঃ হয়েছে।

ইয়াস বললো ঃ যদি আমি এক অঞ্জলী পানি আপনার শরীরে ছুড়ে মারি তাতে কি আপনি কষ্ট পাবেন?

নেতা বললেন ঃ না।

ইয়াস বললেন ঃ যদি আমি এক মুট ধুলি আপনার দেহে ছুড়ে মারি তাতে কি আপনি কষ্ট পাবেন?

নেতা বললেন ঃ না।

ইয়াস বললেন ঃ যদি এক মুট ভূষি ছুড়ে মারি?

নেতা বললেন ঃ তাতেও আমি কষ্ট পাব না।

ইয়াস বললেন ঃ যদি আমি এই জিনিসগুলো ভালো করে এক সাথে মিশিয়ে রোদে শুকিয়ে শক্ত করে নেই এবং আপনার দেহে ছুড়ে মারি তাতে কি আপনি কষ্ট পাবেন?

নেতা বললেন ঃ হাঁ, কষ্ট পাব। আপনি আমাকে শেষ করে দিলেন।

ইয়াস বললেন ঃ মদের বিষয়টিও এমন।

যখন তার বিভিন্ন উপাদান বিশেষ প্রক্রিয়ায় একত্র করা হয়েছে তখন তা নেশা উদ্রেককারী বস্তুতে পরিণত হয়ে হারাম হয়ে গেছে।[১২]

---

১১. প্রাগুক্ত-৭২

১২. প্রাগুক্ত-৭৩-৭৪; তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৭২

ছোট বেলায় তিনি একটি মকতবে এক ইয়াহূদী শিক্ষকের নিকট অংক শিখতেন। একদিন ইয়াসের উপস্থিতিতে সেই শিক্ষকের নিকট তার কয়েকজন ইয়াহূদী বন্ধু আসলো। তারা বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। ইয়াস চুপ করে এমনভাবে শুনলেন যেন তিনি কিছুই বোঝেন না, কিছুই জানেন না। আলোচনার এক পর্যায়ে শিক্ষক তার বন্ধুদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা কি মুসলমানদের এই বিশ্বাসের ব্যাপারে অবাক হবে না যে, তারা জান্নাতে পানাহার করবে কিন্তু মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না? কথাটি শোনামাত্র ইয়াস আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ উস্তাদ! আপনারা যে বিষয়ে আলোচনা করছেন সে সম্পর্কে আমাকে কিছু কথা বলার অনুমতি দেবেন কি?

উস্তাদ বললেন ঃ হাঁ, বল।

ইয়াস বললেন ঃ এ পৃথিবীতে আমরা যা কিছু পানাহার করি তা সবই কি মল-মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়?

উস্তাদ বললেন ঃ না।

ইয়াস প্রশ্ন করলেন ঃ তাহলে যা বের হয় না তা কোথায় যায়?

উস্তাদ বললেন ঃ দেহের খাদ্য হিসেবে ক্ষয় হয়ে যায়।

ইয়াস বললেন ঃ পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু খায় তার কিছু অংশ যদি দেহের খাদ্য হিসেবে ক্ষয় হয়ে যেতে পারে তাহলে জান্নাতে সব কিছু খাদ্য হিসেবে ক্ষয় হলে তাতে অবাক হওয়ার কি আছে?

উস্তাদ তাঁর হাতটি ইয়াসের পিঠের উপর রেখে বললেন ঃ বালক! আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন। মতান্তরে উস্তাদ তাঁকে বলেন, তুমি একটা শয়তান।[১৩]

হযরত ইয়াস ইবন মু'আবিয়া (রহ) কাজী হওয়ার পর মাঝে মধ্যে এমন সব পরিবেশ-পরিস্থিতির মুখোমুখী হন যেখানে তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও অভিনব কর্মপন্থার প্রকাশ ঘটে। তিনি তাঁর অতুলনীয় মেধা ও কর্মকৌশলের সাহায্যে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করেন। একবার দুব্যক্তি একটি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তাঁর নিকট এলো। একজন দাবী করলো সে অন্যজনের নিকট কিছু অর্থ গচ্ছিত রেখেছিল। কিন্তু যখন সে তার অর্থ ফেরৎ চায় সে তা দিতে অস্বীকার করে।

ইয়াস বিবাদীর নিকট গচ্ছিত রাখার বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে, যদি আমার প্রতিপক্ষের কোন প্রমাণ থাকে, সে যেন তা উপস্থাপন করে। তা না হলে আমাকে কসম করে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। লোকটির ভাবগতিক দেখে ইয়াস শঙ্কিত হলো এই ভেবে যে, সে গচ্ছিত অর্থের পুরোটাই হজম করে ফেলতে চাচ্ছে। এজন্য তিনি বাদীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ কোন্ জায়গায় বসে তার কাছে অর্থ আমানত রেখেছিলে?

---

১৩. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৬৯-৭০ তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৭৩

বললো ঃ অমুক জায়গায়।

ইয়াস ঃ সেখানে কি কি আছে?

বললো ঃ একটি বড় গাছ আছে। তার নিচে বসে আমরা কিছু খাবার খাই, তারপর যাওয়ার সময় আমি আমার অর্থ তার হাতে তুলে দিই।

ইয়াস ঃ তুমি সেই গাছের নিচে যাও। হতে পারে সেখানে গেলে তোমার মনে পড়বে তোমার অর্থ তুমি কোথায় রেখেছো বা ফেলে এসেছো। তারপর ফিরে এসে সেখানে কি দেখলে তা আমাকে জানাবে।

লোকটি চলে গেল। ইয়াস বিবাদীকে বললেন ঃ তোমার বন্ধু ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি আমার এখানে বস। তারপর তিনি অন্য দুজন বাদী-বিবাদীর দিকে মনোযোগী হলেন এবং তাদের বক্তব্য শুনতে লাগলেন। তবে ফাঁকে ফাঁকে আড় চোখে পাশে বসা পূর্বের বিবাদীকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। যখন তিনি বুঝলেন লোকটি নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হয়ে গেছে তখন হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করেন ঃ যেখানে সে তোমার হাতে তার অর্থ তুলে দিয়েছিল তুমি কি মনে কর এতক্ষণে সে সেখানে পৌঁছে গেছে? লোকটি কোন রকম ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই বলে উঠলো ঃ অসম্ভব। জায়গাটি বহু দূরে।

সাথে সাথে ইয়াস বলে উঠলেন ঃ ওরে আল্লাহর দুশমন! অর্থ গ্রহণের কথা অস্বীকার করছো, অথচ যেখান থেকে তা গ্রহণ করেছো সে স্থানটি চেন? আল্লাহর কসম! তুমি একজন মিথ্যাবাদী, গাদ্দার।

ঘটনার আকস্মিকতায় লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল এবং অর্থ আত্মসাতের কথা স্বীকার করলো। ইয়াস তাকে কারারুদ্ধ করেন এবং তার নিকট থেকে সকল অর্থ আদায় করে বাদীকে ফেরত দেন।[১৪]

আরেকবার একই ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটে। বিবাদমান দুব্যক্তি তাঁর নিকট আসে বিচারের জন্য। তিনি তখন কাজী। ঘটনাটি হলো দুটি 'কাতীফা' নিয়ে। 'কাতীফা' হলো মখমলের রুমাল যা আরবরা মাথার উপর রেখে দুদিক দুকাঁধের উপর ছেড়ে দেয়। তার মধ্যে একটি হলো সবুজ রংয়ের, নতুন ও দামী। আর অন্যটি ছিল লাল রংয়ের পুরানো ও কম মূল্যের।

বাদী বললো ঃ আমি একটি হাউজে গোসলের জন্য গেলাম। আমার অন্য কাপড়-চোপড়ের সাথে সবুজ রুমালটিও হাউজের পাশে রেখে হাউজে নামলাম। আমার প্রতিপক্ষ আমার পরে আসলেন এবং তিনিও তার একটি লাল রুমাল ও অন্য কাপড়-চোপড় আমার কাপড়ের পাশে রেখে হাউজে নামলেন। কিন্তু তিনি গোসল সেরে আমার আগে হাউজ থেকে উঠে গেলেন। তিনি তাঁর কাপড় পরলেন এবং আমার সবুজ রুমালটি মাথায় ফেলে দুকাঁধের উপর ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। আমি তাঁর পরই হাউজ থেকে উঠলাম এবং আমার রুমালটি না দেখে পিছু ধাওয়া করে তাঁকে ধরলাম এবং রুমালটি ফেরৎ চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন ঃ রুমালটি তার। আমি আমার রুমালটি ফেরৎ চাই।

---

১৪. আত-তুরুক আল-হিকমিয়্যা-২৯; তাহ্‌যীব আল-কামাল-২/৩৭৯

ইয়াস বিবাদীকে বললেন ঃ তোমার বক্তব্য কি? লোকটি বললো ঃ এটি আমার রুমাল এবং আমার হাতেই আছে।

ইয়াস বাদীকে বললেন ঃ তোমার কি কোন সাক্ষী-প্রমাণ আছে?

লোকটি বললো ঃ না। কোন সাক্ষী প্রমাণ নেই।

এবার ইয়াস তাঁর দারোয়ানকে একটি চিরুনী আনতে বললেন। চিরুনী আনলে তিনি বাদী-বিবাদী উভয়ের মাথায় ভালো করে চিরুনী করলেন। তাতে একজনের মাথা থেকে লাল পশমী রুমালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বের হলো এবং অন্যজনের মাথা থেকে বের হলো সবুজ পশমের অংশ। বিষয়টি তিনি বুঝে ফেললেন এবং নতুন সবুজ রুমালটি বাদীকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।[১৫]

তবে ইয়াসের এত মেধা, চিন্তাশক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা থাকা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে অন্যের যুক্তির কাছে হেরে গেছেন। এ রকম একটি ঘটনার কথা তিনি নিজেই এভাবে বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ কখনো আমার উপর বিজয়ী হতে পারেনি। আর তা হলো আমি যখন বসরার কাজী তখন এক ব্যক্তি আমার নিকট এসে সাক্ষ্য দিল যে, অমুক বাগানটির মালিক অমুক। তারপর সে বাগানটির চৌহদ্দি বর্ণনা করলো।

আমি তার কাছে জানতে চাইলাম ঃ বাগানে গাছের সংখ্যা কত?

সে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবলো। তারপর মাথা সোজা করে আমাকে প্রশ্ন করলো ঃ আমাদের মাননীয় কাজী সাহেব এই এজলাসে কত বছর ধরে বসেন?

বললাম ঃ এত বছর।

সে বললো ঃ যে ঘরে আপনার এজলাস হয় সে ঘরের ছাদের কড়িকাঠের সংখ্যা কত?

বললাম ঃ আমার তো তা জানা নেই। আমি তার যুক্তির কাছে হেরে গেলাম। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম।[১৬]

ইয়াস বলতেন ঃ[১৭]

لو جلست علي باب واسط لم يمربي أحد إلا أخبرتكم

"আমি যদি ওয়াসিত নগরের প্রধান প্রবেশ দ্বারে বসি তাহলে আমার পাশ দিয়ে যেই অতিক্রম করুক আমি তার কাজ ও পেশা কি তা তোমাদেরকে বলতে পারবো।"

আবুল হাসান আল-মাদায়িনী বলেন, একদিন ইয়াস কোন কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত তিন মহিলাকে দেখলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন ঃ এদের মধ্যে এটি গর্ভবতী, এটি স্তন্যদানকারিণী এবং এটি কুমারী, একথা শুনে এক ব্যক্তি মহিলা তিনজনের নিকট গেল এবং তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে ইয়াসের কথার সত্যতা পেল। তখন ইয়াসকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ এ কথা আপনি কীভাবে জানলেন? বললেন ঃ তারা যখন ভয় পেয়েছে তখন

---

১৫. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২/৩৭৯

১৬. সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৭৬

১৭. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২/৩৮৬

অতি স্বাভাবিকভাবে তাদের নিজ নিজ হাত তাদের দেহের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে পৌঁছে গেছে, আর আমি তা দেখেই তাদেরকে চিনে ফেলেছি। স্তন্যদানকারী তার হাত তার দু'স্তনের উপর রেখেছে, গর্ভবতী তার পেটের উপর এবং কুমারী তার তল পেটের নীচে রেখেছে।[১৮]

আল-আসমা'ঈ বলেন, ইয়াস একদিন একজন অপরিচিত লোককে দেখে ডাক দেন ঃ ওহে ইয়ামামার অধিবাসী ব্যক্তি! সে বললো ঃ আমি ইয়ামামার লোক নই। তিনি এবার ডাকলেন ঃ ওহে আল-আদাখার অধিবাসী! লোকটি বললো ঃ আমি আদাখার লোক নই। এবার তিনি ডাকলেন ঃ ওহে দারিয়্যার অধিবাসী! লোকটি তাঁর নিকট এগিয়ে গেল। তিনি তার পরিচয় জানতে চাইলেন। সে বললো ঃ আমার জন্ম ইয়ামামায়, বড় হয়েছি আদাখায় এবং পরে দারিয়্যায় চলে গিয়েছি।[১৯]

হুমাইদ আত-তাবীল বলেন, ইয়াস ইবন মু'আবিয়া কাজীর দায়িত্ব গ্রহণের পর হাসান আল-বাসরী (রহ) সাক্ষাৎ করতে আসেন। তাঁকে দেখে ইয়াস কাঁদতে শুরু করেন। হাসান জিজ্ঞেস করেন ঃ কাঁদছেন কেন? ইয়াস এই হাদীছটি উল্লেখ করেন ঃ[২০]

القضاة ثلاثة، إثنان في النار وواحد في الجنة

–"কাজী তিন প্রকার ঃ দুই প্রকার জাহান্নামী এবং এক প্রকার জান্নাতী হবে।" হাসান বলেন ঃ আল্লাহ দাউদ ও সুলায়মানের (আ) বিচার কাজের বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে দাউদের ভুলের জন্য তিরস্কার তো করেননি। তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন এ আয়াত ঃ[২১]

وَدَاودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْث إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، وَكُلاًّ اتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا.

"এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত সম্পর্কে; তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল সম্প্রদায়ের কোন মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার।

অতঃপর আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।"

এ আয়াতে আল্লাহ সুলায়মানের প্রশংসা করেছেন, তবে দাউদের নিন্দা করেননি।[২২]

---

১৮. প্রাগুক্ত-২/৩৮৩

১৯. প্রাগুক্ত-২/৩৮৪

২০. আবূ দাউদ, কিতাব আল-আকাদিয়্যাতি, বাব ঃ আল-কাদী ইউখতিউ, হাদীছ নং ৩৫৭৩; আত-তিরমিযী, কিতাব আল-আহকাম (১৩২২); ইবন মাজা, কিতাব আল-আহকাম (২৩১৫)

২১. সূরা আল-আম্বিয়া'-৭৮-৭৯

২২. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৭৬

কাজীদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা

কোন বিভাগ বা শাখার লোকের তার নিজের বিভাগ বা শাখার সমপেশার লোকদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা বিশেষ যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়। ইয়াস তাঁর সমকালীন সকল মুফতী ও কাজীর দোষ-ত্রুটি ও উত্তম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। হাবীব ইবন শুহাইদ বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি ইয়াসের নিকট আসে এবং তার একটি মামলার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য কার কাছে যাবে সে ব্যাপারে তাঁর মতামত চায়। তিনি বলেন, তুমি যদি এর সঠিক ফয়সালা চাও তাহলে 'আবদুল মালিক ইবন ইয়া'লার নিকট যাও। সঠিক অর্থে তিনি একজন কাজী। আর যদি শুধু ফাতওয়া নিতে চাও তাহলে হাসান আল-বাসরীর নিকট যাও। তিনি আমার পিতার ও আমার উসতাদ। আর যদি সন্ধি ও চুক্তি করতে চাও তাহলে হুমাইদ আত-তাবীলের নিকট যাও। তাঁর সন্ধির পদ্ধতি এ রকম যে, তিনি তোমাকে বলবেন, তুমি তোমার অধিকার কিছু নিয়ে কিছু ছেড়ে দাও। আর যদি মামলাবাজি করতে চাও তাহলে সালিহ্ আদ-দাওসীর নিকট যাও। তিনি তোমাকে বলবেন, প্রতিপক্ষের অধিকার সম্পূর্ণ অস্বীকার কর এবং নিজের যতটুকু অধিকার তার চেয়ে বেশি দাবী কর। আর যারা উপস্থিত ছিল না তাদেরকে সাক্ষী মান।[২৩]

পরিচ্ছন্ন 'আকীদা-বিশ্বাস এবং বিদ'আতীদের সাথে তর্ক-বাহাছ

এত প্রখর মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আকীদার ক্ষেত্রে কোন রকম নতুনত্ব ও সংযোজন-বিয়োজন ভীষণ অপছন্দ করতেন। যারা এমন করতো তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান করতেন। তিনি বিদ'আতী, বিশেষ করে কাদরিয়্যাদের সাথে তর্ক-বাহাছ করতেন। কাদরিয়্যাদের 'আকীদা হলো, আল্লাহ আদিল বা ন্যায়বিচারক। এতটুকু পরিমাণ তো সঠিক ছিল। তবে এই মূলনীতির ভিত্তিতে যে সকল কর্ম দৃশ্যতঃ যুল্‌ম ও অন্যায় বলে মনে হয় তা আল্লাহর প্রতি আরোপ করতো না। এ ব্যাপারে তারা এত বাড়াবাড়ি করতো যে, আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতাও অস্বীকার করা হতো। একবার কাদরিয়্যাদের সাথে তাঁর তর্ক-বাহাছ হয়। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, যুল্‌ম কাকে বলে? তারা বলে, কারো এমন কোন জিনিস নিয়ে নেওয়া যা তার নেওয়ার অধিকার নেই। তিনি বললেন, সব জিনিসই তো আল্লাহর, অর্থাৎ সব জিনিসই যখন আল্লাহর তখন তার কোন কাজকে যুল্‌ম বলা সঠিক নয়।[২৪]

তাঁর কিছু বাণী খুবই মনোমুগ্ধকর। তিনি বলতেন ঃ যার মধ্যে কোন দোষ নেই সে নির্বোধ। একজন জিজ্ঞেস করে ঃ আপনার মধ্যে কি দোষ আছে? বললেন ঃ অতিরিক্ত কথা বলা।[২৫] তিনি বলতেন, আমি মানুষের সকল গুণ পরীক্ষা করেছি। তার মধ্যে সত্য কথা বলাকে শ্রেষ্ঠ গুণ হিসেবে পেয়েছি।[২৬]

---

২৩. প্রাগুক্ত-২/৩৭৫; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১/৩৯০

২৪. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১/৩৯২

২৫. আত-তাবাকাত-৭/৫

২৬. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১/৩৯১

যে সকল বাগ্মী, খতীব, ফকীহ্ ও আমীর উমারা অনর্গল কথা বলতেন; কিন্তু খুব কমই ভুল করতেন তাঁদের একটি বর্ণনা আল-জাহিজ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ইয়াসের নামটিও তিনি উল্লেখ করেছেন। কূফার কাজী 'আবদুল্লাহ ইবন শুবরামা (মৃত্যু-১৪৪ হি.) একবার হযরত ইয়াসের অতি কথনের কারণে বলেন ঃ[২৭]

أنا أنت لا نتفق، أنت لا تشتهي أن تسكت وأنا لا أشتهي أن أسمع.

"আমি ও আপনি একমতে পৌছাতে পারবো না। আপনি চুপ করতে চান না, আর আমি শুনতে চাই না।'

একবার তিনি অতি সাধারণ বেশ-ভূষায় দিমাশকের মসজিদে কুরায়শদের একটি আসরে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত লোকেরা তাঁকে চিনতে না পেরে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ভাব দেখালো। যখন তারা চিনতে পারলো তখন ক্ষমা চাওয়ার সূরে তাঁকে বললো! অপরাধ আমাদের ও আপনার উভয়ের সমান। কারণ, আপনি এসেছেন একজন রিক্ত-নিঃস্ব দরিদ্রের পোশাক পরে। তবে আমাদের সাথে কথা বলেছেন একেবারে রাজা-বাদশাদের ভাষায়।[২৮]

আল-জাহিজ বলেন, আমি দেখেছি মানুষ ইয়াস ইবন মু'আবিয়ার একটি জবাব খুবই পছন্দ করে। আর তা হলো, একবার তাঁকে বলা হলো, আপনি আপনার কথার কারণে নিজেই একটা বিস্ময় হয়ে গেছেন, এছাড়া আপনার মধ্যে আর কোন দোষ নেই। তিনি প্রশ্ন করেন ঃ আমার কথা আপনাদেরকে বিস্মিত করে? লোকেরা বললো ঃ হাঁ, বিস্মিত করে। তিনি বললেন ঃ আমি যা বলি এবং আমার কথা শুনে আপনারা যে বিস্মিত হন সে জন্য আমি নিজেই সর্বাধিক বিস্মিত হওয়ার উপযুক্ত।[২৯] লোকেরা একদিন তাঁকে বললো ঃ মানুষ আপনার বুদ্ধিমত্তায় বিস্মিত। তিনি বললেন ঃ মানুষ বিস্মিত না হলে আমি তার দ্বারা বিচার কাজ করতাম না।[৩০]

একবার তাকে বলা হলো, বেশি কথা বলা ছাড়া আপনার মধ্যে আর কোন দোষ নেই। তিনি জানতে চাইলেন, আমার যেসব কথা আপনারা শোনেন তা কি সঠিক না ভুল? বলা হলো ঃ সঠিক। তখন তিনি বলেন ঃ فالزيادة من الخير خير. ভালোর আধিক্য তো ভালো।[৩১]

ইমাম আল-আসমা'ঈ বর্ণনা করেছেন, 'উমার ইবন হুবায়রা যখন ইয়াসকে কাজী হিসেবে নিয়োগ দিতে চাইলেন তখন ইয়াস বললেন : আমি এ পদের যোগ্য নই। প্রশ্ন করা হলো : কেন? বললেন ঃ প্রথমত: আমার ভাষার জড়তা, দ্বিতীয়ত: আমি দেখতে অসুন্দর, কুৎসিত এবং তৃতীয়ত: লোহার মত শক্ত প্রকৃতির। ইবন হুবায়রা বললেন : কঠোরতা চাবুক সোজা করে দেবে। আর আপনি যে অসুন্দর, তাতে কি হয়েছে, আমি

---

২৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৯৮, ২/৩১৫

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৮৮

৩১. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৯৯

তো আপনার দ্বারা কাউকে সুন্দর করতে চাচ্ছিনা। আর ভাষার যে জড়তার কথা বলছেন, তা আপনি তো আপনার মনের কথা প্রকাশ করছেন।

আল-জাহিজ বলেন : আসলে ইয়াসের যদি জড়তা থাকতো তাহলে তিনি বেশি কথা বলা পরিহার করতেন। আর একারণে আমরা এমন কাউকে জানি না যিনি ইয়াসের ভাষা জড়তার কথা বলেছেন। বরং এর বিপরীতটি দেখা যায়। তাঁর প্রতি বেশি কথা বলার দোষারোপ করা হয়।[৩২] 'উতবা ইবন 'উমার বলেছেন, আমি বহু মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি যে, তা প্রায় একে অপরের কাছাকাছি। ব্যতিক্রম দেখেছি কেবল হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ও ইয়াস ইবন মু'আবিয়ার ক্ষেত্রে। অন্যদের তুলনায় তাঁদের দু'জনের বুদ্ধির পাল্লা ভারী পেয়েছি।[৩৩]

একবার এক ব্যক্তি ইয়াসকে জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনি বিচার কাজে দ্রুততা করেন কেন? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন ঃ তোমার একটি হাতে আঙ্গুল কয়টি? বললো ঃ পাঁচটি। ইয়াস বললেন ঃ খুব দ্রুত জবাব দিয়েছো। লোকটি বললো ঃ যে জেনে বুঝে হত্যা করে সে তো দ্রুত স্বীকার করে না।

ইয়াস বললেন ঃ তোমার প্রশ্নের এটাই আমার জবাব।[৩৪]

তিনি প্রায়ই জাহিলী ও ইসলামী যুগের বিখ্যাত কবি আন-নাবিগা আল-জা'দীর (রা) নিম্নের শ্লোকটি আওড়াতেন ঃ[৩৫]

أبى لى البلاءُ وأنى امرؤ إذا ما تَبَيَّنْتُ لم أرتب.

'বিপদ-আপদ আমাকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমি এমন একজন পুরুষ, যখন তা পরীক্ষা করেছি, ভীত-কম্পিত হইনি।

ইয়াস ইবন মু'আবিয়া বলেছেন ঃ আমি প্রতারক নই এবং কোন প্রতারক আমার সাথে প্রতারণা করতে পারবে না।[৩৬]

তিনি যখন অল্প বয়সী একজন তরুণ তখন একবার শামে যান। সেখানে তাঁর একজন অতি বৃদ্ধ শত্রুর দেখা পান এবং তাকে নিয়ে খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের একজন কাজীর দরবারে হাজির হন। কাজী তাঁকে বললেন ঃ আপনি এই বৃদ্ধকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন, লজ্জা করে না? ইয়াস বললেন ঃ সত্য এই বৃদ্ধের চেয়েও বড়। কাজী ধমকের সুরে বললেন ঃ চুপ করুন। ইয়াস বললেন ঃ তাহলে আমার যুক্তি-প্রমাণ তুলে ধরবে কে? কাজী বললেন ঃ আমার মনে হয় না আপনি সত্য বলেছেন। এই এজলাসে উপস্থিত হওয়ার পর থেকে অসত্য বলে যাচ্ছেন। ইয়াস বললেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এ কি সত্য, না অসত্য? কাজী বললেন ঃ সত্য, কা'বার প্রভুর শপথ! সত্য। কাজী বললেন ঃ আমার ধারণা আপনি একজন যালিম। ইয়াস বললেন ঃ কাজীর ধারণা

---

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. প্রাগুক্ত-১/১০০, ২৭৫

৩৪. প্রাগুক্ত

৩৫. কিতাব আল-হাওয়ান-৩/৪৯৫

৩৬. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১০১

সত্য হলে আমি ঘর থেকে বের হতাম না। এরপর কাজী উঠে খলীফা 'আবদুল মালিকের দরবারে ঢুকলেন এবং সব ঘটনা খুলে বললেন। 'আবদুল মালিক বললেনঃ তার বিষয়টি এখনই নিষ্পত্তি করে তাকে শাম থেকে বের করে দিন। অন্যথায় সে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে।[৩৭] আল-জাহিজ বলেন, খলীফা আবদুল মালিক ইয়াসের তরুণ বয়সে যখন তাঁকে নিয়ে এত ভীত ছিলেন তখন তার পরিণত বয়সের অবস্থা কেমন ছিল।[৩৮]

সর্বশেষ আল-জাহিজ তাঁর সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন এভাবে ঃ[৩৯]

وجمله القول فـي إيـاس أنـه كـان مـن مفـاخر مضـر، ومـن مقدمـي القضـاة، وكـان فقيه البدن، دقيق المسلك في الفطـن، وكـان صـادق الحـرس نقابًـا، وكـان عجيـب الفراسة ملهمًا، وكان عفيف الطعم، كريم المداخـل والشـيم، وجيـها عنـد الخلفـاء، مقدمًا عند الأكفاء.

"ইয়াস সম্পর্কে সার্বিক কথা হলো, তিনি মুদার গোত্রের অন্যতম গৌরব ও অগ্রবর্তী কাজী। তিনি ছিলেন দৈহিক গঠন তথা প্রকৃতিগতভাবে ফকীহ্ ও সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁর আন্দাজ-অনুমান সত্যে পরিণত হতো, দূরদর্শিতাও ছিল বিস্ময়কর। তিনি ছিলেন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বস্তু আহারকারী উত্তম স্বভাব ও চরিত্রের মানুষ। খলীফাদের নিকট সম্মানীয় ও সমকক্ষদের নিকট প্রাধান্যপ্রাপ্ত।"

ইয়াস বলেছেন ঃ[৪০]

البخل قيد والغضب جنون والسكر مفتاح الشر.

"কার্পণ্য একটি বন্ধন, ক্রোধ একটি পাগলামি এবং মদমত্ততা সকল অপকর্মের চাবিকাঠি।"

একবার আবান ইবন আল-ওয়ালীদ-ইয়াসকে বললেন ঃ আমি আপনার চেয়ে বেশি ধনী। ইয়াস বললেন ঃ না, আপনার চেয়ে আমি বেশি ধনী। আবান বললেন ঃ তা কিভাবে হয়। আমার এত এত সম্পদ আছে। আপনার তো তা নেই। ইয়াস বললেন ঃ তাহলে কি হবে। আপনার আয় আপনার ব্যয়ের অতিরিক্ত নয়। কিন্তু আমার ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি।[৪১]

একদিন খলীফা উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করলেন। সারা রাত চোখের পাতা বুজলো না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে কাটালেন। দিমাশকের তীব্র ঠাণ্ডার সেই রাতটি কাটালেন বসরায় একজন কাজী নিয়োগের চিন্তায়। সেই কাজী

---

৩৭. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৭২-৩৭৩; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৭০

৩৮. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/১০১

৩৯. প্রাগুক্ত

৪০. প্রাগুক্ত-১/১৯৫

৪১. প্রাগুক্ত-৪/৯১; তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৮৫

এমন হবেন যিনি আল্লাহর নাযিলকৃত কুরআনের বিধান অনুযায়ী মানুষের মাঝে 'আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন এবং সত্যের ব্যাপারে কারো রাগ-বিরাগের পরোয়া করবেন না।

কাজী নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'উমারের দৃষ্টি দু'ব্যক্তির উপর নিবদ্ধ হল, যারা সব দিক দিয়ে সমতায় দৌড় প্রতিযোগী দু'অশ্বের মত ছিলেন। দীনের তত্ত্ব জ্ঞানে, সত্যের উপর দৃঢ়তায়, চিন্তার ঔজ্জ্বল্যে এবং দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতায় উভয়ে ছিলেন সমান সমান। যখনই তিনি একজনকে কোন একটি বৈশিষ্ট্যের দরুন প্রাধান্য দিচ্ছিলেন তখনই অন্যজন তাঁর একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য বলে মনে করছিলেন।

এভাবে রাত কেটে গেল। সকালে তিনি ইরাকের ওয়ালী 'আদী ইবন আরত্বাতকে ডেকে পাঠালেন। 'আদী তখন দারুল খিলাফা দিমাশকে অবস্থান করছিলেন। তিনি 'আদীকে বললেন ঃ আপনি ইয়াস ইবন মু'আবিয়্যা আল-মুযানী ও কাসিম ইবন রাবী'আ আল-হারিছী, মতান্তরে বাকর ইবন 'আবদিল্লাহকে ডেকে তাদের সঙ্গে বসরার বিচার বিষয়ে কথা বলুন এবং তাঁদের একজনকে তথাকার কাজী নিয়োগ করুন।

আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ মত 'আদী ইবন আরতাত ইয়াস ও কাসিমকে ডেকে বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশমত আমি আপনাদের দু'জনের যে কোন একজনকে বসরার কাজী নিয়োগ করতে চাই। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? তখন দু'জনের প্রত্যেকে অপরজন সম্পর্কে বললেন ঃ এ পদের জন্য আমার চেয়ে তিনি বেশি উপযুক্ত। এরপর তাঁর মহত্ব, মর্যাদা, জ্ঞান ও ফিক্হ বিষয়ে পারদর্শিতার কথা তুলে ধরেন।

'আদী বললেন ঃ এ ব্যাপারে আপনারা নিজেরা একটি সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত আমার এ সভা থেকে উঠতে পারবেন না।

ইয়াস বললেন ঃ মাননীয় আমীর! আপনি কাসিম ও আমার সম্পর্কে ইরাকের দু'জন সর্বজন মান্য ফকীহ হাসান আল-বাসরী ও মুহাম্মাদ ইবন সীরীনকে (রহ) জিজ্ঞেস করুন। আমাদের দু'জনের মূল্যায়নের ব্যাপারে তাঁরাই যোগ্যতম ব্যক্তি।

আসলে কাসিম ও তাঁদের দু'জনের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তাঁদের সাথে ইয়াসের তেমন যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল না। তাই কাসিম মনে করলেন, ইয়াসের এ প্রস্তাব নিজেকে বাঁচানোর একটি কৌশলমাত্র। কারণ আমীর হাসান আল-বাসরী ও মুহাম্মাদ ইবন সীরীনের সাথে পরামর্শ করলে তাঁরা অবশ্যই তাঁর নামটিই সমর্থন করবেন। তাই মোটেই দেরী না করে তিনি আমীরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ মাননীয় আমীর! আমার ও তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। সেই আল্লাহর নামের কসম যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, ইয়াস আল্লাহর দীনের ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশি পারদর্শী ও বিচার বিষয়ে অধিক জ্ঞানী। আমার এ কথায় আমি যদি মিথ্যাবাদী হই, তাহলে একজন মিথ্যাবাদীকে বিচারকের পদে নিয়োগ দেওয়া আপনার জন্য বৈধ হবে না। আর আমি সত্যবাদী হলে যোগ্যতম ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া সঙ্গত হবে না।

এবার ইয়াস আমীরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ জনাব, আপনি এক ব্যক্তিকে কাজীর পদে নিয়োগদানের জন্য ডেকে এনেছেন এবং তাঁকে যেন জাহান্নামের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি মিথ্যা শপথ করে তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিলেন। একটু পরেই আবার তাওবা করে নিবেন। কিন্তু তিনি তো মুক্তি পেয়ে গেলেন।

জবাবে 'আদী ইবন আরতাত তাঁকে বললেন ঃ আপনার মত যিনি এ কথাটি বুঝতে পারেন তিনিই কাজী হওয়ার উপযুক্ত। অতঃপর তিনি ইয়াসকে বসরার কাজী নিয়োগ করেন।[৪২]

মৃত্যু

ইয়াস ইবন মু'আবিয়ার (রহ) বয়স যখন ৭৬ (ছিয়াত্তর) বছরে পৌছালো তখন একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি ও তাঁর পিতা দু'জন দু'টি ঘোড়ার পিঠে আরোহী হয়েছেন এবং উভয়ে নিজ নিজ ঘোড়া দাবড়ান। কিন্তু কেউ কাউকে পিছনে ফেলতে পারলেন না; বরং দু'জনই পাশাপাশি থাকেন। তাঁর পিতা মু'আবিয়া ৭৬ (ছিয়াত্তর) বছর বয়সে মারা যান।

এ ঘটনার পর একদিন রাতে ইয়াস ঘুমানোর জন্য বিছানায় শুয়ে পরিবারের লোকদের ডেকে বলেন ঃ তোমরা কি জান এটা কোন্ রাত?

তারা বললো ঃ না, জানি না।

তিনি বললেন ঃ এ রাতে আমার পিতা তাঁর জীবনপূর্ণ করেন।

রাত পোহালে সকাল বেলায় পরিবারের লোকেরা বিছানায় তাঁকে মৃত দেখতে পান।

হিজরী ১২২ সনে তিনি বসরায়, মতান্তরে ওয়াসিত-এর 'আবদাসা নামক পল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৩]

ইয়াসের মা মৃত্যুবরণ করলে তিনি শোকে কাতর হয়ে ভীষণ কান্নাকাটি করেন। লোকেরা যখন সান্ত্বনা দিত, তিনি বলতেন ঃ[৪৪]

كان لى بابان مفتوحان من الجنة، فاغلق احدهما.

"আমার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা ছিল। এখন একটি বন্ধ হয়ে গেল।"

---

৪২. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৭৫; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন-৬৫-৬৮

৪৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৯; আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-১/৯৮; সাওয়ারুন মিন হায়াত আত তাবি'ঈন-৭৮-৭৯

৪৪. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৩৮৯, ৩৯২

কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবূ বকর (রা)

হযরত কাসিমের (রহ) ডাকনাম আবূ মুহাম্মাদ, মতান্তরে আবূ 'আবদির রহমান।[১] তিনি হযরত আবূ বাকর সিদ্দীকের (রা) পুত্র মুহাম্মাদের (রহ) সন্তান। তাঁর মা 'সাওদা' ছিলেন 'উম্মু ওয়ালাদ'। 'উম্মু ওয়ালাদ'-এর শব্দগত অর্থ সন্তানের মা। ইসলামের পরিভাষায় যে দাসী মনিবের ঔরসজাত সন্তান জন্ম দেয় তাকে বলা হয় উম্মু ওয়ালাদ। এমন দাসীকে আর কোনভাবে হস্তান্তর করা যায় না। যাই হোক কাসিমের মা সাওদা দাসী হলেও তিনি ছিলেন বিশ্বের এক অভিজাত ঘরের কন্যা। যুদ্ধবন্দী হিসেবে তৎকালীন বিশ্বের রীতি অনুযায়ী দাসীতে পরিণত হন।

মাদায়েন বিজয়ের পর পারস্য সম্রাট ইয়াযদিগুরদ-এর তিন কন্যা মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন। তাদেরকে মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন না করে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। 'আলী (রা) তাঁদের তিনজনকে ক্রয় করেন এবং তিনজন মুসলিম যুবকের হাতে তাদের একজন করে তুলে দেন। একজনকে দেওয়া হয় রাসূলুল্লাহর (সা) দৌহিত্র আল-হুসাইন ইবন 'আলীকে এবং এখানে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন যায়নুল 'আবিদীন; দ্বিতীয়জনকে লাভ করেন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর (রা) এবং তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ। তৃতীয়জনকে লাভ করেন 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) এবং তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (রা)। ইয়াযদিগুরদের তিন কন্যার এ তিন সন্তান তাদের পরিণত বয়সে নৈতিকতা, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতায় সর্বজনমান্য ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।[২]

কাসিম জ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষতায় মদীনার মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন। ইবন সা'দ তাঁকে মদীনার মনীষীদের দ্বিতীয় তাবকায় (স্তর) উল্লেখ করেছেন।[৩]

ইয়াতীম অবস্থা এবং ফুফুর নিকট লালিত-পালিত

হযরত 'উছমানের (রা) বিরুদ্ধাচরণ ও শাহাদাতের ঘটনায় মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরের (রা) নামটি ইসলামের ইতিহাসে বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তিনি হযরত উছমানের (রা) প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। এমনকি হযরত উছমানের (রা) হত্যাকারীদের মধ্যে তাঁর নামটিও উচ্চারিত হয়। 'উছমানের (রা) শাহাদাতের পর তিনি আলীর (রা) পক্ষ অবলম্বন করেন। হযরত 'আলী ও হযরত মু'আবিয়ার (রা) মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয় তাতে

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১৫/১৮৬

২. 'আসরুত তাবি'ঈন-৮১

৩. তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/১৮৬

মুহাম্মাদ 'আলীর (রা) একজন উদ্যমী সহযোগী হিসেবে তাঁর পাশে দাঁড়ান। হযরত 'আলী (রা) তাঁকে মিসরের ওয়ালী নিয়োগ করেন। যখন হযরত মু'আবিয়ার (রা) পক্ষ থেকে হযরত 'আমর ইবন আল-'আস (রা) মিসরে সামরিক অভিযান চালান তখন মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা) নিহত হন। কাসিম তখন অল্প বয়সী শিশু। এ কারণে তাঁর ফুফু উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসেন এবং অত্যন্ত স্নেহ-মমতায় তাঁকে গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে হযরত কাসিম তাঁর শৈশবকালীন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলতেন, আমাদের ফুফু-আম্মা 'আয়িশা (রা) 'আরাফার রাতে আমাদের মাথা ন্যাড়া করে দিতেন এবং মাথায় টুপি পরিয়ে মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন। পরের দিন সকালে আমাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন। তিনি আরো বলতেন, ফুফু-আম্মা নিজ হাতে আমাকে ও আমার ছোট্ট বোনকে খাওয়াতেন। তবে আমাদের সাথে খেতেন না। আমরা খাওয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকতো তাই খেতেন। মা যেমন অতি আদরে তার শিশু সন্তানকে দুধ পান করায় তেমনি তিনিও আমাদের আদর করে খাওয়াতেন। আমাদেরকে গোসল করাতেন, মাথায় চিরুনী করে পরিষ্কার সাদা কাপড় পরিয়ে দিতেন। ভালো কাজ কী তা শেখাতেন, ভালো কাজ করার জন্য উৎসাহিত করতেন ও প্রশিক্ষণ দিতেন। আর মন্দ কাজ কী তাও শেখাতেন এবং তা থেকে বিরত থাকার কথা বলতেন। আমি সন্তানের প্রতি তাঁর চেয়ে বেশি যত্নশীল, তাঁর চেয়ে বেশি স্নেহশীল কোন পিতা-মাতাকে কখনো দেখিনি।

তিনি তাঁর এই স্নেহশীল ফুফুকে আম্মা বলে ডাকতেন। পরবর্তীকালে যখন তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করতেন তখন বলতেন ঃ আমার আম্মা আয়িশা (রা) আমাকে বলেছেন, অথবা আমার আম্মা 'আয়িশার (রা) নিকট শুনেছি। তিনি বলতেন, তাঁর চেয়ে সুন্দর করে কথা বলতে এবং তাঁর চেয়ে বিশুদ্ধ ও মিষ্টভাষী কোন পুরুষ বা নারীকে তাঁর আগে পরে কখনো আমি দেখিনি।[৪]

জ্ঞান ও মনীষা

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) এমন বিদুষী মহিলা ছিলেন যে, তাঁর একজন নগণ্যতম সেবকও জ্ঞান ও কর্মের উচ্চাসন অলঙ্কৃত করেন। কাসিম ছিলেন তাঁর অতি স্নেহের সন্তানতুল্য। তাঁর আদর-যত্নে লালিত-পালিত হয়ে তিনি 'ইল্ম ও 'আমল দু'সাগরের সংযোগস্থলে পরিণত হন। ইবন সা'দ লিখেছেন, তিনি উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ফকীহ, ইমাম, শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছ ও আল্লাহ্ ভীরু মানুষ ছিলেন।[৫] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তিনি একজন অতি উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন তাবি'ঈ। তাঁর বিশ্বস্ততা ও ইমাম হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে সকলে একমত।[৬]

---

৪. আত-তাবাকাত-৫/১৩৯; 'আসরুত তাবি'ঈন-৭৩

৫. আত-তাবাকাত-৫/১৪৩

৬. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৫৫

তাফসীর

ইসলামী জ্ঞানের সকল শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল। তবে আল্লাহর কালামের তাফসীরের ব্যাপারে ছিলেন খুবই সতর্ক। চরম সতর্কতার কারণে তিনি কুরআনের তাফসীর করতেন না। এ কারণে মুফাস্সির হিসেবে তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেননি।[৭]

হাদীছ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) ব্যক্তি সত্তাটিই ছিল হাদীছের অন্যতম উৎসস্থল। হযরত কাসিম (রহ) এই উৎস থেকে প্রাণ ভরে পরিতৃপ্ত হন। তাছাড়া অন্য সাহাবায়ে কিরাম থেকেও হাদীছ শোনেন। যেমন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), আবূ হুরায়রা (রা) ও আরো অনেকে। তিনি নিজেই বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট বসতাম, তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) ও আবূ হুরায়রার (রা) নিকটও বসতাম। তাঁদের নিকট থেকে আমি সর্বাধিক উপকার লাভ করেছি। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট এমন জ্ঞান, খোদাভীরুতা এবং এমন দুর্লভ তথ্য ছিল যা আর কারো নিকট থেকে অর্জন করা সম্ভব ছিল না।[৮] এ সকল ব্যক্তি ছাড়াও তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার, মু'আবিয়া, 'আবদুল্লাহ ইবন খাব্বাব, রাফি' ইবন খাদীজ, আসলাম মাওলা 'উমার (রা) প্রমুখ মহান সাহাবীর নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন।[৯] এ সকল মহান ব্যক্তিবর্গের কল্যাণে তিনি একজন বিশিষ্ট হাফিজে হাদীছে পরিণত হন। ইবন সা'দ তাকে كثير الحديث – বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী বলেছেন।[১০] ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে হাফিজে হাদীছগণের ইমাম ও নেতা বলে উল্লেখ করেছেন। আবুয যানাদ বলতেন, আমি কাসিমের চেয়ে সুন্নাহর বড় 'আলিম কাউকে দেখিনি।[১১] তিনি বিশেষভাবে হযরত 'আয়িশার (রা) হাদীছের হাফিজ ছিলেন। খালিদ ইবন বাযযায বলেন, 'আয়িশার (রা) হাদীছের তিনজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা হলেন কাসিম, 'উরওয়া ও 'আমর (রহ)।[১২]

তাঁর বর্ণনাসমূহের মান

মুহাদ্দিছগণ হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে তাঁর বর্ণনাসমূহকে খাঁটি সোনার মত মনে করেছেন। ইবন মা'ঈন বলেন, "عبيد الله بن عمر عن قاسم عن عائشة" সনদের এই ধারাটি খাঁটি সোনার শিকলের মত।[১৩]

---

৭. আত-তাবাকাত-৫/১৩৯

৮. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৫৫

৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/১৩৩

১০. আত-তাবাকাত-৫/১৩৯

১১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৫৬

১২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩৩৪; তাবি'ঈন-৩৭৬

১৩. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৫৫

হাদীছের পঠন-পাঠন

প্রত্যেক রাতে ঈশার নামাযের পর তিনি এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা এক সাথে হাদীছের পঠন-পাঠন করতেন। হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক ছিলেন। বর্ণনার ক্ষেত্রে অর্থ নয়, বরং মূল শব্দে হাদীছ বর্ণনা জরুরী বলে মনে করতেন। এই সতর্কতার কারণে তিনি হাদীছ লেখা-লেখি পছন্দ করতেন না।[১৪]

'আবদুল্লাহ ইবন 'আওন বলেন ঃ[১৫]

كان القاسم وابن سيرين ورجاء بن حيوة يحدثون بالحديث على حروفة، وكان الحسن وابراهيم والشعبى يحدثون بالمعاني.

'আল-কাসিম, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন ও রাজা' ইবন হায়ওয়া হাদীছ (রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে উচ্চারিত) বর্ণ ও শব্দে বর্ণনা করতেন। অন্যদিকে হাসান আল-বাসরী, ইবরাহীম আন-নাখা'ঈ ও আশ-শা'বী (নিজেদের শব্দ ও বর্ণে) হাদীছের অর্থ ও ভাব বর্ণনা করতেন।

তাঁর ছাত্র-শিষ্য

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেক বড় বড় ইমাম ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন ঃ 'আবদুর রহমান ইবন কাসিম, ইমাম শা'বী, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার, সা'ঈদ আল-আনসারীর পুত্র ইয়াহইয়া, সা'ঈদ ইবন আবী মুলায়কা, নাফি' মাওলা ইবন 'উমার, ইমাম যুহরী, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উমার, আইউব, মালিক ইবন দীনার (রহ) প্রমুখ। তাঁর এ সকল প্রতিভাবান ছাত্র তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৬]

ফিক্হ

ফিক্হ ছিল হযরত কাসিমের (রহ) বিশেষ অধীত বিষয়। এ বিষয়ে তিনি একজন ইমাম ও মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁর ফিক্হ বিষয়ে দক্ষতা ও উৎকর্ষতার সবচেয়ে বড় সনদ এই যে, তিনি ছিলেন মদীনার বিখ্যাত সাত ফকীহর একজন।[১৭] ফিক্হর জ্ঞানও তিনি অর্জন করেন ফুফু হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকা, ইবন 'উমার ও ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট থেকে। তিনি বলতেন, আবূ বাকর ও 'উমারের (রা) সময়ে হযরত 'আয়িশা (রা) স্বতন্ত্রভাবে ফাতওয়া দিতেন এবং আমি তাঁর সাথে থাকতাম।[১৮] সেই সময়ের সকল

---

১৪. আত-তাবাকাত-৫/১৪০

১৫. তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/১৮৮

১৬. প্রাগুক্ত-১৫/১৮৫; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩৩৩

১৭. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৫৫

১৮. প্রাগুক্ত

আলিম তাঁর ফিক্হ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের কথা স্বীকার করেছেন। আবিয যানাদ বলতেন, আমি কাসিমের চেয়ে বড় কোন ফকীহ্কে দেখিনি।[১৯] ইমাম মালিক (রহ্) বলতেন, কাসিম এই উম্মাতের ফকীহ্গণের মধ্যে ছিলেন।[২০]

ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে সতর্কতা

ফিক্হ বিষয়ে এত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীছের মত ফাতওয়া দানে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সে বিষয়ে কথা বলা অথবা কোন মাসয়ালার জবাব দেওয়া খুবই খারাপ মনে করতেন। বলতেন, আল্লাহর ফরয হুকুমগুলো জানার পর কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকার পরও কথা বলার চেয়ে কোন মানুষের মূর্খ থাকা অনেক ভালো। কোন মাসয়ালা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান না থাকলে সোজা নিজের অজ্ঞতার কথা জানিয়ে দিতেন। একবার তাঁকে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। শুধু স্পষ্ট ও সহজ প্রশ্নের জবাব দিতেন। যে সব মাসয়ালার জবাব নিজের মতের ভিত্তিতে দিতেন, তাতে স্পষ্ট বলে দিতেন যে, এটা আমার মত, এ কথা বলছিনা যে, এটাই সত্য।[২১]

দারসের আসর

হযরত কাসিমের (রহ) মদীনার মসজিদে নববীতে একটি হালকায়ে দারস বা পাঠদানের আসর ছিল। তাঁর ও সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) একই আসর ছিল। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র 'আবদুর রহমান এবং সালিমের ভাই 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) এই আসরে বসতেন, তাঁদের পরে এই স্থানে ইমাম মালিকের আসর বসতে থাকে। স্থানটি ছিল হযরত রাসূলে কারীমের (সা) কবর ও মিম্বারের মাঝামাঝি স্থানে হযরত 'উমারের (রা) সম্মুখে। কাসিম সকাল বেলায় দারস ও ইফতার এই স্থানে এসে দু'রাক'আত নামায আদায়ের পর আসরে বসে যেতেন। এ সময় মানুষের যা কিছু প্রশ্ন করার, করতো।[২২]

সমকালীনদের তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি

তাঁর সময়ের অনেক বড় বড় 'আলিম ও বিদগ্ধ ব্যক্তি তাঁর মনীষা ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আনসারী বলতেন, আমরা মদীনায় এমন কোন ব্যক্তিকে পাইনি যাঁকে কাসিমের উপর প্রাধান্য দেওয়া যায়। আবুয যানাদ বলতেন, কাসিম তাঁর যুগে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানের অধিকারী মানুষ ছিলেন, আইউব সাখতিয়ানী বলতেন, আমি কাসিমের চেয়ে উত্তম মানুষ আর দেখিনি।[২৩]

---

১৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৫; 'আসরুত তাবি'ঈন-৭২

২০. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩৩৪

২১. আত-তাবাকাত-৫/১৩৯

২২. প্রাগুক্ত-১/১৪০

২৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ

বিনয় ও সমকালীন 'আলিমদের প্রতি সম্মান

জ্ঞানের এত উঁচু স্তরে অবস্থান করা সত্ত্বেও নিজের শ্রেষ্ঠত্বের কোন অনুভূতিই তাঁর ছিল না। তিনি নিজের চেয়ে কম মর্যাদার সমকালীনদেরকেও ভীষণ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মুখ থেকে কখনো তাদের সম্পর্কে এমন কোন শব্দ বা বাক্য উচ্চারিত হতো না যাতে বিন্দুমাত্র তাদের অসম্মান হয়। এমন সতর্কতার কারণে তিনি কোন কোন স্থানে সঙ্কটজনক অবস্থায় পড়ে যেতেন। একবার একজন মরুচারী বেদুঈন তাঁকে প্রশ্ন করলো ঃ আপনি বড় 'আলিম, না সালিম? এই প্রশ্নের জবাবদানে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যান। যদি প্রকৃত সত্য কথাটি বলে দিতেন তাহলে নিজের মুখে নিজের প্রশংসা হয়ে যেত, আর যদি বলতেন সালিম বড় 'আলিম তাহলে অসত্য কথা হয়ে যেত। এ কারণে প্রথমে সুবহানাল্লাহ পাঠ করে এড়িয়ে যেতে চান। কিন্তু বেদুঈন যখন আবার জিজ্ঞেস করলো তখন তিনি বললেন, সালিম আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর।[২৪]

নৈতিক চরিত্র

হযরত কাসিমের (রহ) যে স্তরের 'ইল্ম ছিল, সেই স্তরের 'আমলও ছিল। তাঁর ব্যক্তি সত্তাটি ছিল সকল নৈতিক গুণাবলীর সমাবেশস্থল। তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন পুরুষ হযরত আবূ বাকরের (রা) প্রতিরূপ ছিলেন। যুবায়র বলতেন, আমি আবূ বাকরের (রা) সন্তানদের মধ্যে এই কাসিমের চেয়ে বেশি তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাউকে পাইনি।[২৫]

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল আযীয (রহ) তাঁর অগাধ জ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষতার কথা অকপটে স্বীকার করতেন। তিনি বলতেন, খিলাফতের কর্তৃত্ব যদি কাসিমের হাতে থাকতো তাহলে কত না ভালো হতো। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলতেন, খিলাফতের বিষয়টি যদি আমার এখতিয়ারে থাকতো তাহলে আমি কাসিমকে খলীফা বানাতাম। খলীফা 'উমারের (রহ) এ কথা তাঁর কানে পৌঁছলে তিনি বিস্ময়ের সাথে বলেন, আমি যখন আমার পরিবার চালাতে পারি না, সেখানে এই উম্মাতের দায়িত্ব পালন কেমন করে সম্ভব।[২৬] 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের (রহ) সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ ও লৌকিকতা বিবর্জিত। কাসিম ছিলেন স্বল্পভাষী চুপচাপ স্বভাবের মানুষ। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) খলীফা হলেন, তখন মদীনাবাসীরা বললো, এবার কুমারী কাসিম কথা বলবেন।[২৭]

খলীফা 'উমার ইবন 'আযীযের (রহ) সাথে আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদের অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। 'উমার তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। হিজরী ৮৬ সনে উমাইয়্যা খলীফা 'আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক খলীফা

---

২৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩৩৪; তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/১৮৮; 'আসরুত তাবি'ঈন-৭৩

২৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩৩৪

২৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৫৯

২৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩৮৫

হন। তিনি হিজরী ৮৭ সনের ২৩ রাবিউল আউয়াল হিশাম ইবন ইসমা'ঈলকে মদীনার ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করে তদস্থলে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযকে নিয়োগ দান করেন। মদীনায় পৌঁছে তিনি মারওয়ান ভবনে ওঠেন। যুহরের নামাযের পর মদীনার তৎকালীন দশজন বিখ্যাত ফকীহ্ ও 'আলিমকে ডেকে পাঠান। তাঁরা হলেন ঃ 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র, আবূ বাকর ইবন সুলায়মান ইবন আবী খায়ছামা, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'উদ, আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমান ইবন আল-হারিছ, সুলায়মান ইবন ইয়াসার, আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আমর, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির ইবন রাবী'আ ও খারিজা ইবন যায়দ (রহ)। তাঁরা উপস্থিত হলে 'উমার তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে নিম্নের কথাগুলো বলেন ঃ

'আমি আপনাদেরকে এমন এক কাজের জন্য ডেকেছি যাতে আপনারা আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাবেন এবং সত্যের সহযোগী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবেন। আমি আপনাদের পরামর্শ ছাড়া কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই না। এ কারণে আপনারা কেউ কারো উপর যুল্ম-অত্যাচার করছে এমন খবর পেলে আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে অবশ্যই অবহিত করবেন।

তাঁর এ ভাষণ শোনার পর উপস্থিত ফকীহ্ 'আলিমগণ তাঁর মঙ্গল কামনা করতে করতে ফিরে যান। কাসিম ইবন মুহাম্মাদ 'উমারের ভাষণ শেষে মন্তব্য করেন ঃ

"اَلْيَوْمَ يَنْطِقُ مَنْ كَانَ لاَ يَنْطِقُ" 'যারা কথা বলতে পারতো না এখন তারা কথা বলতে পারবে।[২৮]

মদীনার ওয়ালী থাকাকালে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয যে অক্ষয় কীর্তিগুলো সম্পাদন করেন তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ। খলীফা 'আবদুল মালিক এ মসজিদ সম্প্রসারণ করে পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ নেন, কিন্তু মদীনাবাসীদের অসহযোগিতার কারণে তা ব্যর্থ হয়। খলীফা ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিক এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং তিনি মসজিদটিকে সম্পূর্ণ নতুন কাঠামো ও শৈলীতে নির্মাণ করতে চান। দিমাশকের জামি' মসজিদ নির্মাণ শেষ করে তিনি হিজরী ৮৮ সনে 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযকে লিখলেন, মসজিদে নববী নতুন করে নির্মাণ করতে হবে এবং এর আশে-পাশে আযওয়াজে মুতাহ্হারাত অর্থাৎ হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পূতঃপবিত্র বেগমদের যে সকল হুজরা ও অন্যান্য বাড়ি-ঘর আছে অর্থের বিনিময়ে সেগুলো অধিগ্রহণ করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খলীফার এ আদেশ বাস্তবায়ন করেন।

পত্র পেয়ে 'উমার মসজিদের আশে-পাশের বাড়ি-ঘরের মালিকদের ডেকে খলীফার পত্রটি

---

২৮. আল কামিল ফী আত-তারীখ-৪/৫২৬; জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-২/২১০; তাবি'ঈদের জীবনকথা-২/৩২৫-৩৬

পাঠ করে শোনান। তাঁরা অর্থের বিনিময়ে নিজেদের মালিকানা ছেড়ে দিতে রাজি হন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয পুরাতন মসজিদ, উম্মাহাতুল মু'মিনীনের হুজরাসমূহ ও আশে-পাশের বাড়ি-ঘর ভাংতে আরম্ভ করেন। তখন এ কাজে তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ, আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমান (রহ)সহ মদীনার বিশিষ্ট ফকীহগণ। তাঁরা সকলে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের হুজরাসমূহ মসজিদের মধ্যে ঢুকিয়ে নতুন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।[২৯]

তাকওয়া-পরহেজগারী

তাকওয়া-পরহেজগারীর দিক দিয়েও তিনি ছিলেন একজন শীর্ষস্থানীয় তাবি'ঈ। ইবন সা'দ তাঁকে একজন খোদাভীরু উত্তম তাবি'ঈ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ বলেছেন। ইবন হিব্বান তাঁকে নেতৃস্থানীয় তাবি'ঈ এবং তাঁর যুগের একজন উত্তম তাবি'ঈ বলে গণ্য করেছেন।[৩০]

বার্ধক্যে ও হজ্জের সময় মিনায় পাথর মারার জন্য পায়ে হেঁটে যেতেন। রাবী'আ ইবন 'আবদির রহমান বলেন, কাসিম যখন অতিরিক্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তখন তিনি তাঁর অবস্থানস্থল থেকে বাহনের পিঠে চড়ে মিনা পর্যন্ত আসতেন। পরে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে পাথর মারার জন্য যেতেন। পাথর মেরে মসজিদ পর্যন্ত হেঁটে যেতেন। তারপর সেখান থেকে বাহনের পিঠে চড়ে অবস্থানস্থলে ফিরতেন।[৩১]

ধন-ঐশ্বর্যের প্রতি অমুখাপেক্ষী মনোভাব

পার্থিব ধন-ঐশ্বর্যের প্রতি এতই উদাসীন ও মুখাপেক্ষীহীন ছিলেন যে, প্রিয়জনের কোন অনুগ্রহ-উপঢৌকনও গ্রহণ করতেন না। সুলায়মান ইবন কুতায়বা বলেন, একবার 'উমার ইবন 'উবায়দিল্লাহ আমার হাতে এক হাজার দীনার দিয়ে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) ও কাসিম ইবন মুহাম্মাদের নিকট পাঠান। ইবন 'উমার (রা) তাঁর অংশের দীনারগুলো গ্রহণ করেন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এই বলে যে, 'উমার ইবন 'উবায়দ-আত্মীয়তার সম্পর্কের হক আদায় করেছেন। এ সময়ে এ অর্থের আমার খুব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কাসিম ইবন মুহাম্মাদ তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এ কথা তাঁর বেগম সাহেবা জানতে পেরে বলেন, 'উমার ইবন 'উবায়দুল্লাহর সাথে আমাদের (স্বামী-স্ত্রী) দু'জনের সম্পর্ক সমান সমান। কাসিম যদি তাঁর চাচাতো ভাই হন, তাহলে আমিও তো তাঁর ফুফাতো বোন হই। তাঁর এ কথার পর আমি তাঁর হাতেই এ অর্থ তুলে দিই।[৩২]

সত্যের স্বীকৃতি

এমন সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, নিজের পিতার কোন ভুলকে তিনি ভুল বলে স্বীকার করতেন এবং তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করতেন। পূর্বেই এসেছে যে, তাঁর

---

২৯. আল-কামিল ফী আত-তারীখ-৪/৫৩২; তাবি'ঈদের জীবন কথা-২/৩৭-৩৮

৩০. আত-তাবাকাত-৫/১৪১

৩১. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/৫৫; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৮/৩৩৫

৩২. আত-তাবাকাত-৫/১৪১

পিতা মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর (রা) আমীরুল মু'মিনীন হযরত 'উছমানের (রা) ভীষণ বিরোধী ছিলেন এবং বিদ্রোহীদের সাথে খলীফার গৃহ অভ্যন্তরেও ঢুকে পড়েছিলেন। হযরত কাসিম (রহ) পিতার এ কাজকে একটা মারাত্মক ভুল বলে স্বীকার করতেন এবং তাঁর জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! 'উছমানের (রা) ব্যাপারে আমার পিতার অপরাধকে ক্ষমা করে দিন।[৩৩]

ওফাত

তাঁর মৃত্যুসন নিয়ে একটু মতপার্থক্য আছে। হিজরী ১০৬ থেকে ১১২ সনের মধ্যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন একথা নিশ্চিতভাবে জানা যায়। তখন তাঁর বয়স ৭০ অথবা ৭২ (সত্তর/বাহাত্তর) বছর।[৩৪] বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত দেহ নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হয়েছেন। বাহনের পিঠে চড়ে তালবিয়া পাঠ করতে করতে পথ চলছেন। সাথে বেগম সাহেবা আছেন, ছেলে বাহনটি হাঁকাচ্ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাথায় তীব্র ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন। এক সময় বুঝলেন তাঁর জীবনকাল শেষ হয়ে এসেছে। আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করলেন। তারপর কাগজ কলম নিয়ে একজনকে অসীয়াত লিখতে বললেন। লেখক তাঁর বলার আগেই লিখে ফেললেন, "কাসিম ইবন মুহাম্মাদ অসীয়াত করছেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।" কাসিম (রহ) এ লেখাটুকু শুনে বললেন, যদি আমি আজকের পূর্বে এই সাক্ষ্য না দিয়ে থাকি তাহলে আমি একজন দারুণ হতভাগ্য। তারপর তিনি বলেন ঃ[৩৫]

يا بنى إذا أنا متُّ فكفِّنِي بثيابى التى كنت أصلى فيها : قميصي وإزارى وردائـى، فذالك كان كفن جدك أبى بكر، ثمَّ سوِّ عليَّ لَحْدِى والْحَقْ بأهلك، وإيَّـاكم أن تقفوا على قبرى وتقولوا كان وكان فما كنت شيئًا.

'আমার ছেলে ঃ আমি যখন মারা যাব তখন আমি যে কাপড় পরে সালাত আদায় করি তা দিয়েই আমার কাফন বানাবে। আর তা হলো আমার জামা, লুঙ্গি ও চাদর। এ ছিল তোমার দাদা আবূ বাকরের (রা) কাফন। তারপর তোমরা আমাকে আমার কবরে শুইয়ে মাটি চাপা দিয়ে পরিবার-পরিজনের নিকট চলে যাবে। খবরদার, আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এমন বলবে না যে, তিনি এমন ছিলেন, এমন ছিলেন। আসলে আমি কিছুই ছিলাম না।'

পুত্র একবার বললেন, আপনি কি দু'খানা নতুন কাপড় পছন্দ করেন না? বললেন, আবূ বাকরকেও তিন কাপড়ে কাফন পরানো হয়েছিল। তাছাড়া মৃতদের চেয়ে জীবিতদেরই নতুন কাপড়ের প্রয়োজন বেশি।

---

৩৩. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান-১/৪১৮

৩৪. তাহযীব আল-কামাল-১৫/১৮৫

৩৫. 'আসরুত তাবি'ঈন-৮২

এই অসীয়াতের পর তিনি মক্কা-মদীনার মাঝে "কুদাইদ" নামক স্থানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেখান থেকে তিন মাইল দূরে "মুশাল্লাল" নামক স্থানে কবর দেওয়া হয়।[৩৬]

মৃত্যুকালে তিনি নগদ এক লাখ দিরহাম রেখে যান। তার মধ্যে একটি দিরহামও অবৈধ উপার্জনের ছিল না।[৩৭]

শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।[৩৮] দাড়ি ও মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল, তাতে মেহেদীর খিজাব লাগাতেন। রূপোর আংটি পরতেন এবং তাতে নিজের নাম খোদাই করা ছিল। মার্জিত রঙ্গিন পোশাক পরতেন। জুব্বা, পাগড়ী, চাদর ও অন্যান্য কাপড় সাধারণত "খুয" সূতার হতো। এ ছাড়া আরো দামী পোশাকও পরতেন। পাগড়ী কালো হতো। জাফরানী রং বেশি পছন্দ ছিল। তাছাড়া সবুজ রংও ব্যবহার করতেন।

---

৩৬. আত-তাবাকাত-৫/১৪৩

৩৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৫

৩৮. তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/১৮৯

ইয়াহইয়া ইবন ইয়া'মার আল-বাসরী (রহ)

ইয়াহইয়া (রহ) তাবি'ঈদের মধ্যবর্তী স্তরের মানুষ। ইমাম আয-যাহাবীর মতে এই স্তরের পুরোধা হলেন প্রখ্যাত মনীষী হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ)। ইয়াহইয়ার ডাকনাম আবূ সুলায়মান, মতান্তরে আবূ 'আদী ও আবূ সা'ঈদ। বসরার অধিবাসী এবং 'আদওয়ান গোত্রের সন্তান।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

কুরআন, হাদীছ, ফিক্‌হ, ভাষা ও সাহিত্যের বিশাল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কুরআনের একজন বিশিষ্ট 'আলিম ছিলেন। ইবন সা'দ তাঁকে কুরআন বিশেষজ্ঞ বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

হাদীছ

তিনি হাদীছের হাফিজ ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে হাফিজ ও লেখক তাবি'ঈদের তৃতীয় তাবকায় (স্তরে) তাঁর জীবনী সন্নিবেশ করেছেন।[৩] সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে হযরত 'উছমান, 'আলী, 'আম্মার ইবন ইয়াসির, আবূ যার আল-গিফারী, আবূ হুরায়রা, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, সুলায়মান ইবন সুরাদ, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা), জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, নু'মান ইবন বাশীর (রা) প্রমুখের মত উঁচু স্তরের মনীষীদের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৪] তবে ইমাম আবূ দাউদ বলেন, তিনি হযরত আয়িশা (রা) থেকে হাদীছ শোনেননি। তাই ইমাম আয-যাহাবী (রহ) ইমাম আবূ দাউদের নিকট প্রশ্ন রেখেছেন।

فما الظن بالذين قبلها؟ - 'আয়িশার (রা) পূর্ববর্তী যাঁরা তাঁদের সম্পর্কে ধারণা কি? অর্থাৎ 'উছমান, 'আলী (রা), যাঁরা 'আয়িশার (রা) বহু পূর্বে ইনতিকাল করেছেন তাঁদের নিকট থেকেও কি ইয়াহইয়া শোনেননি?[৫]

ইয়াহইয়া ইবন 'আকীল, সুলায়মান আত-তায়মী, 'আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা, কাতাদা মাওলা ইবন 'আব্বাস (রা), 'আতা' আল-খুরাসানী, রাকীন ইবন রুবা'য়, 'আবদুল্লাহ ইবন কুলাইব সাদূসী, আযরাক ইবন কায়স, ইসহাক ইবন সুওয়াইদ, আবুল মুনীব

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৭১; তাহ্‌যীব আল-কামাল-৩২/৫৩

২. তাবাকাত ইবন সা'দ-৭/১০১

৩. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৭১

৪. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১১/৩২৫; তাহ্‌যীব আল-কামাল-৩২/৫৪

৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৭৫

'উবাইদুল্লাহ, 'উমার ইবন 'আতা' ইবন আবিল খাওলা (রহ) প্রমুখ ব্যক্তি তাঁর খ্যাতিমান ছাত্র। তাঁরা সকলে তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৬]

ফিক্হ

ফিক্হ বিষয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে একজন ফকীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতার বড় প্রমাণ হলো তিনি মারব-এর কাজীর পদ অলঙ্কৃত করেন।[৭]

ভাষা, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র

নিছক ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি ভাষা-সাহিত্যেও তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আরবী ব্যাকরণের "নাহূ" ও আরবী ভাষায় ছিল তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্য।[৮] নাহূর জ্ঞান তিনি অর্জন করেন এই শাস্ত্রের উদ্ভাবক আবুল আসওয়াদ আদ-দুওয়ায়লীর নিকট থেকে।[৯] ভাষায় তাঁর প্রচণ্ড দখল ছিল। তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের বিশুদ্ধ ভাষী ও অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ।[১০] 'আবদুল মালিক ইবন 'উমাইর বলেন ঃ

فصحاء الناس ثلاثة : موسى بن طلحة ويحيى بن يعمر و قبيصة بن جابر

"বিশুদ্ধভাষী মানুষ তিনজন ঃ মূসা ইবন তালহা, ইয়াহইয়া ইবন ইয়া'মার ও কাবীসা ইবন জবির।" ইবন হিব্বান তাঁর 'আছ-ছিকাত' গ্রন্থে বলেন ঃ

كان من فصحاء أهل زمانه وأكثرهم علما باللغة مع الورع الشديد.

'তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম বিশুদ্ধভাষী এবং ভাষা জ্ঞানে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। আর সেই সাথে ছিল তাঁর মধ্যে দারুণ আল্লাহ-ভীতি।'[১১]

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ তাঁকে বসরা থেকে বের করে দিলে কুতায়বা ইবন মুসলিম স্বাগতম জানান এবং খুরাসানের রাজধানী "মারব"-এর কাজী নিয়োগ করেন।[১২] সেখানে আদালত ভবন ছিল এবং এজলাসও বসতো। তা সত্ত্বেও তিনি বিচার প্রার্থীদের সুবিধার জন্য পথে-ঘাটে চলতে-ফিরতে মানুষের সাধারণ ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করে দিতেন। মূসা ইবন ইয়াসার বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবন ইয়া'মারকে বাজারে, রাস্তা-গলিতে মানুষের ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা করতে দেখেছি। অনেক সময় এমনও হতো যে, তিনি বাহনের পিঠে কোথাও যাচ্ছেন, তখন বাদী-বিবাদী এসে সামনে দাঁড়াতো। তিনি থেমে তাদের বক্তব্য শুনে ফয়সালা করে দিতেন।[১৩]

---

৬. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/৩২৫; তাহ্যীব আল-কামাল-৩২/৫৪

৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৫; তাবাকাত-৭/১০১

৮. প্রাগুক্ত

৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/৩০৫

১০. শাজারাত আয-যাহাব-১/১৭৬

১১. তাহ্যীব আল-কামাল-৩২/৫৫

১২. প্রাগুক্ত

১৩. তাবাকাত ইবন সা'দ-৭/১০১

একটি অক্ষয় কীর্তি

তাঁর জীবনের একটি অক্ষয় কীর্তি যা কিয়ামাত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে তা হলো আল-কুরআনের বর্ণমালায় "নুকতা" প্রদান করা। উল্লেখ্য যে, এর পূর্বে আরবী বর্ণমালার কোন বর্ণে "নুকতা" ছিল না। সাধারণ মানুষ ও অনারবদের কুরআন পাঠ সহজীকরণের জন্য ইয়াহইয়া ইবন ইয়া'মার সর্বপ্রথম আল-কুরআনের সমআকৃতির বর্ণমালায় "নুকতা" লাগিয়ে পার্থক্য সূচিত করেন। হারূন ইবন মূসা বলেন ঃ أول من نقط المصاحف يحى بن يعمر –'ইয়াহইয়া ইবন ইয়া'মার প্রথম ব্যক্তি যিনি মাসহাফে নুকতা প্রদান করেন।'[১৪]

আহলি বায়তের সাথে সম্পর্ক

আহ্‌লি বায়ত তথা হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বংশধরদের প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। কোন রকম বাছ-বিছার ছাড়াই তাঁদেরকে অন্য সকলের উপর প্রাধান্য দিতেন। তবে কাউকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করতেন না। একবার হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ তাঁকে বলেন, আপনি বিশ্বাস করেন হাসান ও হুসায়ন (রা) রাসূলুল্লাহর বংশধর। আপনাকে হয় এ বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে, নতুবা প্রমাণ পেশ করতে হবে। তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ[১৫]

وَمِنْ ذُرِّيَّتِه دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ، وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰ وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ، كُلٌّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

"তাঁর (ইবরাহীম) বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও (দান করি)। আর এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, 'ঈসা এবং ইলইয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। তারা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত।"

তারপর বলেন, এই আয়াতে 'ঈসাকে ইবরাহীমের বংশধর বলা হয়েছে। সময়ের এত দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও কেবল মাতৃকুলের সম্পর্কের কারণে যদি 'ঈসা (আ) ইবরাহীমের বংশধর হতে পারেন তাহলে হাসান ও হুসায়ন (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) দৌহিত্র হয়ে তাঁর বংশধর হতে বাধা কোথায়? তাঁর এ যুক্তিতে হাজ্জাজ সন্তুষ্ট হন।[১৬]

হিজরী ১১৯, মতান্তরে ১২০ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[১৭] তবে খলীফা ইবন খায়্যাত তাঁর তারীখে হিজরী ৮০ সনের পরে এবং ৯০ সনের আগে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের সাথে ইয়াহইয়ার জীবনী আলোচনা করেছেন।[১৮]

---

১৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৫

১৫. সূরা আল-আন'আম-৮৪-৮৫

১৬. শাজারাত আয-যাহাব-১/১৭৬

১৭. তাবি'ঈন-৫১৪

১৮. তাহ্‌যীব আল-কামাল-৩২/৫৫

আইউব ইবন আবী তামীমা আস-সাখতিয়ানী (রহ)

হযরত আইউবের ডাকনাম আবূ বাকর এবং পিতার নাম কায়সান। কিন্তু তিনি আবূ তামীমা ডাকনামে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন। আইউব 'আনযা গোত্রের দাসত্বের রশি গলায় নিয়ে বেড়ে ওঠেন। তাঁর বাসস্থান ছিল বসরার বানূ আল-হারীশে।[১]

তার মাহাত্ম্য ও মনীষা

তিনি যদিও দাস ছিলেন, তবে 'ইল্ম ও 'আমলের জগতের মুকুটধারী ছিলেন। আল্লামা ইবন সা'দ লিখেছেন ঃ[২]

كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا فِي الْحَدِيْثِ جَامِعًا عَدْلاً وَرَعًا كَثِيْرَ الْعِلْمِ حُجَّةً.

"হাদীছে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, বহুগুণের সমাহার, ন্যায়নিষ্ঠ, আল্লাহভীরু, বহু জ্ঞানের অধিকারী দলিল-প্রমাণ সদৃশ মানুষ।"

ইমাম নাওবী লিখেছেন, তার মহত্ত্ব, নেতৃত্ব, অগ্রগামিতা, মুখস্থ শক্তি, বিশ্বাসযোগ্যতা, জ্ঞানের ব্যাপকতা, উপলব্ধি ক্ষমতা এবং উঁচু মর্যাদার ব্যাপারে সকলে একমত।[৩] ইবনুল 'ইমাদ-আল-হাম্বলী তাঁকে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় 'আলিম বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

শ্রেষ্ঠ 'আলিমগণের স্বীকৃতি

তাঁর সমকালীন সকল বড় 'আলিম তাঁর জ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষতা ও মহত্ত্বের কথা স্বীকার করেছেন। প্রখ্যাত তাবি'ঈ শু'বা তাঁকে "সায়্যিদুল 'উলামা"– 'আলিমদের নেতা অভিধায় ভূষিত করতেন। ইবন 'উয়ায়না বলতেন, আমি ৮৬ (ছিয়াশি) জন তাবি'ঈর সাক্ষাৎ লাভ করেছি, কিন্তু তাঁদের কাউকে আইউবের সমতুল্য পাইনি। হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন, আমার যে সকল মুহাদ্দিছ ও 'আলিমের কাছে বসার সুযোগ হয়েছে, আইউব তাঁদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সুন্নাতের বেশি অনুসরণকারী। তাঁকে শীর্ষস্থানীয় 'আলিম গণ্য করা হতো। হিশাম ইবন 'উরওয়া বলতেন, বসরায় আইউবের মত দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ) তাঁকে বসরার নওজোয়ানদের নেতা বলতেন। ইবন 'আওন বলতেন, মুহাম্মাদ ইবন সীরীনের ওফাতের পর আমাদের সামনে এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাঁর স্থান পূরণ করার জন্য কে আছে? কিন্তু আমরা এমনিতেই জবাব পেয়ে গেলাম যে, আইউব আছেন। হিশাম ইবন 'উরওয়া বলেন, আমি বসরায় আইউবের মত আর কাউকে দেখিনি।[৫]

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-২/৪০৪

২. তাবাকাতু ইবন সা'দ-৭/১৪

৩. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৩১

৪. শাজারাত আয-যাহাব-১/১৮০

৫. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৩২; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩১, তাহ্যীব আল-কামাল-২/৪০৭

হাদীছ

তিনি বসরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছ ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী লিখেছেন, তিনি ছিলেন হাফিজ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। হাদীছের জ্ঞান তিনি লাভ করেন বড় বড় তাবি'ঈদের নিকট থেকে। 'উমার ইবন সালামা জারমী, আবূ রাজা' 'আতারুদী, আবূ 'উছমান নাহ্দী, আবুশ শা'ছা' জাবির ইবন যায়দ, হাসান আল-বাসরী, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ, নাফি' ইবন আবী মুলায়কা, ইবন মুনকাদির, হুমায়দ ইবন বিলাল, আবূ কিলাবা আল-জারমী, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, 'আবদুর রহমান ইবন কাসিম, 'ইকরিমা, আতা' (রহ) প্রমুখ 'আলিমদের নিকট থেকে হাদীছ শোনেন এবং তাঁদের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন।[৬] হাদীছে তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতা এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৮০০ (আটশো) এবং কোন কোন বর্ণনা মতে ২০০০ (দু'হাজার) এ পৌছে।[৭] মু'আল্লা ইবন মানসূর বলেন, আমি ইসমা'ঈল ইবন 'উলায়্যার নিকট বসরার হাফিজে হাদীছ কারা তা জানতে চাইলাম। তিনি এই লোকগুলোর নাম উল্লেখ করলেন ঃ আইউব, ইবন 'আওন, সুলায়মান আত-তায়মী, হিশাম আদ-দাস্তুওয়ায়ী ও সুলায়মান ইবন আল-মুগীরা (রহ)।[৮]

ইমাম মালিক, সুফইয়ান ছাওরী, ইবন 'উয়ায়না, ইবন 'উল্লবা, মা'মার, আ'মাশ, কাতাদা, শু'বা (রহ) প্রমুখের মত শ্রেষ্ঠ 'আলিম ও ইমাম তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। আল-মিয্যী তাঁর বিখ্যাত ৫৫ জন ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৯]

হাদীছ শাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের নিকট তাঁর বর্ণিত হাদীছের স্থান

অবস্থা ও গুণগত দিক দিয়ে তাঁর বর্ণনাসমূহের যে মর্যাদা ও স্থান ছিল তা কয়েকজন মুহাদ্দিছের মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায়। তাঁর বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে আবূ হাতিমের ধারণা ছিল, তাঁর মত ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা ও যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন নেই।[১০] মুহাম্মাদ ইবন সীরীন তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত বলেছেন। মুসলিম ইবন আকয়াস বলেন, আমি ইবন সীরীনকে জিজ্ঞেস করলাম, অমুক অমুক হাদীছ আপনার নিকট কে বর্ণনা করেছে? বললেন ঃ বিশ্বস্ত, বিশ্বস্ত ব্যক্তি আইউব।[১১] ইবন আল-মাদীনী, নাসাঈ, ইবন খায়ছামা প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাঁর বর্ণনাসমূহকে অতি উঁচু মর্যাদার বলে মনে করতেন। আর শু'বা তো তাঁর ঐ সকল বর্ণনাকে যাতে আইউবের নিজেরই সন্দেহ হতো, অন্যদের নিশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত বর্ণনাসমূহের উপর প্রাধান্য দিতেন। একবার তিনি আইউবের

---

৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩১

৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৯৭-৩৯৮; তাহ্যীব আল-কামাল-২/৪০৬

৮. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৪০৭

৯. প্রাগুক্তি-২/৪০৫-৪০৬; তাহ্যীব আল-কাসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৩২

১০. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৪০৮

১১. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৩১-১৩২

কাছে একটি হাদীছ সম্পর্কে জানতে চান। তিনি বলেন, এতে আমার সন্দেহ আছে। শু'বা বললেন, আপনার সন্দেহ আমার নিকট অন্যদের দৃঢ় প্রত্যয়ের চেয়েও পছন্দনীয়।[১২]

ফিক্হ শাস্ত্রেও তাঁর পূর্ণ দক্ষতা ছিল। শু'বা তাঁকে "সায়্যিদুল ফুকাহা"– ফকীহদের নেতা বলতেন।[১৩] কিন্তু চরম সতর্কতার কারণে ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পায়নি।

সতর্কতা

এমন মুহাদ্দিছ ও ফকীহ্সুলভ দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীছ বর্ণনা এবং ফিক্হ সংক্রান্ত মাসয়ালা বলার ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন, প্রশ্নের জবাব দানের ক্ষেত্রে আমি আইউব ও ইউনুছের চেয়ে অন্য কাউকে বেশি অজ্ঞতা প্রকাশ করতে দেখিনি। জবাব দিলেও তার আগে প্রশ্নকারীর স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা করে দেখতেন যে, সে তাঁর জবাবটি যথাযথভাবে মানুষের নিকট উপস্থাপন করতে পারবে কিনা। হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন, যখন কোন ব্যক্তি আইউবের নিকট কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো তখন তার মুখ থেকে প্রশ্নটি আবার শুনতে চাইতেন। যদি তা হুবহু পূর্বের মত হতো তাহলে জবাব দিতেন, আর যদি দ্বিতীয়বার কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে ফেলতো তাহলে জবাব দিতেন না। জবাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতেন না, বরং শুধুমাত্র হাদীছ ও সুন্নাহ্র বিধান বলে দিতেন। যদি সে বিষয়ে কোন হাদীছ তাঁর কাছে না থাকতো তাহলে নিজের অজ্ঞতার কথা জানিয়ে দিতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি কোন একটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তিনি সাফ বলে দেন, এ বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। প্রশ্নকারী বললো, কিয়াস ও যুক্তির ভিত্তিতে আপনার মতটি বলুন। বলেন, আমার কোন মতও নেই।[১৪]

নিজের মতামতকে তিনি একটি বাতিল জিনিস বলে মনে করতেন। এক ব্যক্তি একবার তাঁকে বললো, আপনি কোন মাসয়ালায় নিজের মতামত প্রকাশ করেন না কেন? তিনি উপমার মাধ্যমে জবাব দেন যে, এক ব্যক্তি গাধাকে প্রশ্ন করে, তুমি জাবর কাট না কেন? জবাবে গাধা বলে, এই বাতিল ও অসার বস্তু চিবাতে আমার ভালো লাগে না।[১৫]

জ্ঞানের অহঙ্কারের ভীতি ও সাবধানতা

মানুষ যখন কোন সম্মানজনক অবস্থান অথবা মর্যাদাবান স্তরে পৌঁছে যায় তখন আত্মতুষ্টি ও অহঙ্কার থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য খুবই কষ্টকর। এ জন্য আইউব সব সময় ভীত থাকতেন। তিনি বলতেন, কোন্ মানুষ এর থেকে মুক্ত হতে পেরেছে? যখন কোন ব্যক্তি

---

১২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৯৮

১৩. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৩১; তাহ্যীব আল-কামাল-২/৪০৬

১৪. তাবাকাতু ইবন সা'দ-৭/১৪

১৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩১; তাবি'ঈন-৫৫

হাদীছ বর্ণনা করে এবং তার ভিত্তিতে সে মানুষের হৃদয়ে একটি স্থান করে নেয় তখন তার অন্তরে কিছু জিনিস, যেমন ঃ আত্মতুষ্টি, অহমিকা, গর্ব-অহঙ্কার ইত্যাদির উদয় ঘটে।[১৬]

কিন্তু তিনি এই পঙ্কিলতা থেকে নিরাপদ ছিলেন। জ্ঞানের এটাও একটা ঔদ্ধত্য যে, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতা অন্যের কাছে প্রকাশ হতে দেয় না। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি অনেক প্রশ্নকারীকে সাফ বলে দিতেন যে, এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। কাউকে বলতেন, অন্য কোন 'আলিমকে জিজ্ঞেস কর।[১৭]

জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে তাঁর আচরণ

জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে তিনি ভীষণ ভালোবাসতেন এবং তাদেরকে সম্মানও করতেন। তার অবস্থা অতি সাধারণই হোক না কেন। রাবী' ইবন মুসলিম বলেন, একবার আমি আইউব আস-সাখতিয়ানীর সফরসঙ্গী ছিলাম। আমরা যখন আবতাহ উপত্যাকায় তখন একজন অতি সাধারণ পোশাক পরা মোটা মানুষের সাথে দেখা হয়। সে আইউবকে খুঁজছিল। আমি তাঁকে বললাম, একজন সাধারণ মানুষ আপনাকে খুঁজছে। তিনি লোকটিকে দেখামাত্র দৌড়ে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন। লোকটির পরিচয় নিয়ে জানা যায়, তিনি প্রখ্যাত 'আলিম তাবি'ঈ হযরত সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ (রহ)।[১৮]

'ইবাদত-বন্দেগী

হযরত আইউবের মধ্যে যে স্তরের জ্ঞান ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল আল্লাহ-ভীতি ও দুনিয়ার ভোগ-বিমুখতা। ইমাম মালিক (রহ) বলেন, তিনি ছিলেন একজন 'আমলকারী 'আলিম, ভীষণ আল্লাহ-ভীরু 'আবিদ এবং সৎ মানুষ।[১৯] জীবনে চল্লিশ বার হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।[২০] কিন্তু তিনি নিজের সকল ইবাদত-বন্দেগী গোপন করার চেষ্টা করতেন। বলতেন, এসব কাজ প্রকাশ্যে করার চেয়ে গোপনে করাই উত্তম।[২১] সারা রাত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন, কিন্তু মানুষের নিকট তা গোপন করার উদ্দেশ্যে প্রত্যুষে এমন জোরে আওয়ায করতেন যাতে সবাই মনে করে তিনি এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন।[২২]

রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি গভীর ভালোবাসা

হযরত রাসূলে কারীমের প্রতি এত উৎসর্গিত প্রাণ ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ

---

১৬. তাবাকাত-৭/১৪
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. প্রাগুক্ত
১৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৫৯
২০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩১
২১. তাবাকাত-৭/১৬
২২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩১

শুনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতেন। তাঁর সেই কাঁদা দেখে অন্যদের দয়া হতো।[২৩] ইমাম মালিক (রহ) বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তাঁর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিমাণ দেখে আমি তাঁর নিকট থেকে হাদীছ লিখতে আরম্ভ করি।[২৪] হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইত্তেবা' ও অনুসরণের ক্ষেত্রেও ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন, আমি যে সকল লোকের নিকট বসেছি তাদের সবার চেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে বেশি সুন্নাতের অনুসারী আইউবকে পেয়েছি।[২৫]

খ্যাতির প্রতি অনীহা ও দুনিয়াদার মানুষ থেকে দূরে থাকা

হযরত আইউবের মধ্যে পূর্বে উল্লেখিত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান থাকার কারণে তিনি মানুষের দর্শনস্থলে পরিণত হন। কিন্তু তিনি দুনিয়া, দুনিয়াদার মানুষ এবং খ্যাতি ও নাম-কাম থেকে সর্বদা পালানোর চেষ্টা করতেন। কোন জনসমাবেশ ও মানুষের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য পথ চলতে গিয়ে সাধারণ পরিচিত ও সোজা পথ বাদ দিয়ে অপরিচিত ঘুর-প্যাচের দীর্ঘ পথে চলতেন। হাম্মাদ-ইবন যায়দ বলেন, পথ চলার সময় আইউব আমাকে দূরের পথে নিয়ে যেতেন। আমি যখন তাঁকে নিকটের পথের কথা বলতাম তখন তিনি বলতেন, আমি অমুক স্থানের মজলিস থেকে দূরে থাকতে চাই। আরেকটি বর্ণনায় হাম্মাদ বলেন, তিনি আমাকে এমন সব রাস্তায় নিয়ে যেতেন যে, সেই রাস্তা তালাশ করা দেখে বিস্মিত হতাম। একাজ করতেন শুধু মানুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য। কিন্তু এ পথেও যখন কারো সামনে পড়ে যেতেন তখন নিজেই প্রথমে সালাম করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণে মানুষ তাঁর সালামের জবাবে অনেক কথা বাড়িয়ে বলতো। এভাবে তাঁকে সম্মান করাও তিনি পছন্দ করতেন না। এ কারণে তাঁদের জবাব শুনে বলতেন, আল্লাহ তুমি ভালো করে জান, আমি এটা চাইনি; এ আমার ইচ্ছা নয়।[২৬]

মানুষের দৃষ্টি এড়াতে অধিকাংশ সময় অন্য কাউকে নিজের সাথে চলার অনুমতি দিতেন না। শু'বা বলেন, অনেক সময় আমি আমার প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে যেতে চাইতাম, কিন্তু তিনি অনুমতি দিতেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছোট ছোট গলি পথে এদিক ওদিক পেঁচিয়ে যেতেন, যাতে লোকে চিনতে না পারে।[২৭] আর এ কারণে সে যুগে তাঁর স্তরের লোকদের প্রচলিত পোশাক তিনি ছেড়ে দেন। সে যুগের তাপস ও দুনিয়া বিরাগী লোকদের চাদরের প্রান্ত একটু উপরে উঠানো থাকতো। এ ছিল তাঁদের তাপস্য ও বৈরাগ্যের চিহ্ন। এ কারণে তিনি তাঁর চাদর নীচে ছেড়ে দিয়ে চলতেন। মা'বাদ বলেন, আমি আইউবের জামার প্রান্ত লম্বা দেখে প্রতিবাদ করি। তিনি বলেন, আবূ 'উরূবা! পূর্ববর্তী যুগে প্রান্ত ঝুলিয়ে চলা প্রসিদ্ধ ছিল, আর এখন প্রসিদ্ধি গুটিয়ে চলাতে।[২৮]

---

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৪৯

২৫. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/১৩৩

২৬. তাবি'ঈন-৫৭

২৭. তাবাকাত-৭/১৫-১৬

২৮. প্রাগুক্ত

বিত্তবানদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকা

তিনি সব সময় বিত্তবান ও ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী ব্যক্তিদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকতেন। এমনকি খলীফা ও আমীর-উমারাদের কেউ তাঁর বাড়িতে আসা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, আমার ছেলে বাকর আমার সবচেয়ে প্রিয়। তাকে আমি দাফন করে দিতে পারি, তবু খলীফাদের কেউ আমার কাছে আসা পছন্দ করি না। উমাইয়্যা বংশের ইয়াযীদ ইবন আল-ওয়ালীদ ছিলেন আইউবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যখন তিনি খলীফা হলেন তখন আইউব দু'আ করলেন এই বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْسِهٖ ذِكْرِىْ 'হে আল্লাহ! তাঁর মন থেকে আমার কথা ভুলিয়ে দাও।'[২৯]

প্রফুল্ল ও মিষ্টি স্বভাব

পূর্বের আলোচনা থেকে কেউ যেন মনে না করে যে, তিনি গোঁমড়া মুখ ও রুক্ষ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। মূলতঃ তিনি নিজেকে লুকানোর জন্যই মানুষের সাথে মেলামেশা পছন্দ করতেন না। অন্যথায় তিনি ছিলেন দারুণ প্রফুল্ল ও মিষ্টি স্বভাবের মানুষ। হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন, আমি আইউবের চেয়ে বেশি আর কাউকে মানুষের সাথে হাসি মুখে ও অন্তর খুলে মিশতে দেখিনি।[৩০] কেউ অসুস্থ হলে অথবা কারো মৃত্যু হলে তিনি রোগীকে দেখতে এবং মৃতের আপনজনকে সান্ত্বনা দিতে যেতেন। তখন মনে হতো সেই ব্যক্তি তাঁর দৃষ্টিতে অত্যন্ত সম্মানিত। এ রকম অবস্থায় তিনি অতি সাধারণ মানুষের বাড়িতেও উপস্থিত হতেন। ইয়া'লা ইবন হাকাম নামক একজন দাস তাঁর মহল্লায় থাকতো। সে শুধু তার মাকে রেখে মারা যায়। তিনি তার বাড়িতে একাধারে তিন দিন যান এবং দরজায় গিয়ে বসতেন।[৩১]

ওফাত

হিজরী ১৩১ সনে বসরায় 'তাউন' রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ (তেষট্টি) বছর।[৩২] একটি লাল চাদর তিনি বহু দিন পূর্ব থেকে কাফনের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। তিনি সেটি ইহরাম অবস্থায় এবং রমজানের তিরিশ তারিখ রাতে জড়াতেন। মৃত্যুর পূর্বে চাদরটি চুরি হয়ে যায়।[৩৩]

তাঁর মাথায় একটি জটা ছিল। বছরে একবার এবং সাধারণতঃ হজ্জের সময় মুড়ে ফেলতেন। শেষ বয়সে মাথা ও দাড়ির চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে লাল খিজাবও লাগাতেন।[৩৪]

---

২৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩১

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. তাবাকাত-৭/১৬

৩২. তাহ্যীব আল-কামাল-২/৪০৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩২

৩৩. তাবাকাত-৭/১৬-১৭

৩৪. তাবি'ঈন-৫৯

তিনি ছিলেন আল্লাহর একজন অতি প্রিয় বান্দা। আল্লাহ্ তাঁর দু'আ সাথে সাথে কবুল করতেন। এমন কয়েকটি ঘটনা সীরাতের গ্রন্থাবলীতে দেখা যায়। যেমন ইবন 'আকীল 'শামায়িল আয-যুহ্হাদ' গ্রন্থে বলেছেন, একবার আইউব একটি কাফেলার সাথে মক্কা যাচ্ছেন। পথিমধ্যে মরুভূমিতে পানি সংকট দেখা দিল। সহযাত্রীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তিনি একটি স্থানে হাত দিয়ে একটি বৃত্তের মত রেখা টানলেন। তারপর দু'আ করলেন। সাথে সাথে সেখানে একটি পানির ঝর্ণা সৃষ্টি হলো। লোকেরা পান করলো এবং তাদের পশুগুলোকেও পান করালো। প্রয়োজন শেষ হলে তিনি আবার সেই বৃত্তের উপর হাত ঘোরালেন এবং ঝর্ণাটি বন্ধ হয়ে গেল। এ রকম আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা 'আবদুল ওয়াহিদ ইবন যায়দ বর্ণনা করেছেন।[৩৫]

---

৩৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৩২

জাবির ইবন যায়দ (রহ)

হযরত জাবিরের (রহ) ডাকনাম আবূ আশ-শা'ছা'। পিতার নাম যায়দ। আযদ গোত্রের সন্তান এবং বসরার অধিবাসী।[১] উমান মতান্তরে বসরার 'আল-জাওফ' নামক স্থানের সাথে সম্পর্ক বুঝানোর জন্য তাঁকে 'আল-জাওফী' বলা হয়।[২]

জ্ঞান ও মনীষা

হযরত জাবির (রহ) বহু 'আলিম সাহাবীর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তবে হাবরুল উম্মাহ্ (উম্মাতের মহাজ্ঞানী) হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) সাহচর্যে সবচেয়ে বেশি অবস্থান করেন। এ কারণে তাঁকে "সাহিবু ইবন আল-আব্বাস" অর্থাৎ ইবন আল-আব্বাসের (রা) সাথী বলা হতো।[৩] এই সাহচর্যের কল্যাণে তিনি বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হন এবং তাঁর সময়ের একজন বিশিষ্ট 'আলিম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে "أحد الأعلام" বা "বিশিষ্টজনদের একজন" বলেছেন।[৪] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর বিশ্বস্ততা, দৃঢ়তা ও সুউচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে সকলে একমত। তিনি ছিলেন তাবি'ঈ ইমাম ও ফকীহদের মধ্যে একজন।[৫]

কুরআন

কুরআন, হাদীছ, ফিক্হ তথা সকল ইসলামী জ্ঞানে তিনি সমান পারদর্শিতা অর্জন করেন। 'উলূমুল কুরআন বা কুরআন বিষয়ক বিবিধ জ্ঞানে ছিলেন বিশেষভাবে পারদর্শী। তাঁর মহান শিক্ষক হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা), যিনি নিজেও একজন শ্রেষ্ঠ কুরআন বিশেষজ্ঞ ছিলেন, বলেন :[৬]

لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما عما فى كتاب الله.

"বসরাবাসীরা যদি জাবির ইবন যায়দের কথা মেনে নেয় তাহলে কিতাবুল্লাহর (কুরআন) মধ্যে যা কিছু আছে সে বিষয়ে তাদের জ্ঞান অনেক প্রশস্ত হয়ে যাবে।"

হাদীছ

তিনি হাদীছেরও একজন বড় হাফিজ ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে হাদীছের বিশিষ্ট

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭২

২. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-৩/২৮৬

৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩

৪. প্রাগুক্ত

৫. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৪২

৬. তাহ্যীব আল-কামাল-৩/২৮৬

'আলিমদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৭] হাদীছের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র, হাকাম ইবন 'আমর আল-গিফারী, আমীর মু'আবিয়া (রা) প্রমুখের মত শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণের নিকট থেকে। তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে 'আমর ইবন দীনার, ইয়া'লা ইবন মুসলিম, আইউব আস-সাখতিয়ানী, 'আমর ইবন জুরহুম (রহ) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৮]

ফিক্হ

ফিক্হ বিষয়েও তাঁর পূর্ণ দক্ষতা ছিল। ইমাম নাওবী (রহ) তাঁকে তাবি'ঈ ইমাম ও ফকীহদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৯] সাহাবা (রা) ও তাবি'ঈন কিরাম (রহ) ফিক্হ বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতার কথা স্বীকার করেছেন। দাহহাক আদ-দাব্বী বলেন, একবার হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) তাওয়াফের মধ্যে জাবির ইবন যায়দের দেখা পান। তখন তিনি জাবিরকে লক্ষ্য করেন বলেন :[১০]

يا جابر إنك من فقهاء البصرة وإنك تُستفتى فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فان لم تفعل هلكت وأهلكت.

"ওহে জাবির! তুমি বসরার একজন অন্যতম ফকীহ্ এবং তুমি মানুষের জিজ্ঞাসার জবাবে ফাতওয়া দিয়ে থাক। তবে কখনো স্পষ্টভাষী কুরআন ও কার্যকর সুন্নাহ ব্যতীত ফাতওয়া দেবে না। এমনটি না করলে তুমি নিজেও ধ্বংস হবে এবং অন্যদেরকেও ধ্বংস করবে।"

হাম্মাদ ইবন যায়দ বলেন :[১১]

سئل أيوب هل رأيت جابر بن زيد؟ قال : نعم، كان لبيبًا لبيبًا وجعل يعجب من فقهه.

"আইউবকে জিজ্ঞেস করা হল : আপনি কি জাবির ইবন যায়দকে দেখেছেন? বললেন : হাঁ, দেখেছি। তিনি ছিলেন একজন প্রজ্ঞাবান মানুষ। তারপর উচ্ছ্বসিতভাবে তাঁর ফিক্হ বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন।"

ইয়াস ইবন মু'আবিয়া ছিলেন বসরার বিখ্যাত কাজী। তিনি বলেন :[১২]

أدركت أهل البصرة ومفتيهم جابر بن زيد.

---

৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩
৮. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-২/৩৮
৯. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/১৪২
১০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৩
১১. প্রাগুক্ত; আত-তাবাকাত-৭/১৩১
১২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭২

"আমি বসরাবাসী ও তাদের মুফতী জাবির ইবন যায়দকে পেয়েছি।" অপর একটি বর্ণনামতে তিনি বলেন, জাবির ছাড়া বসরাবাসীদের সত্যিকার কোন মুফতী ছিল না।[১৩]

হযরত হাসান আল-বাসরীর (রহ) অনুপস্থিতিতে জাবির ফাতওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করতেন।[১৪]

হযরত জাবির (রহ) কোন এক কারণে একবার কারারুদ্ধ হন। ধারণা করা হয় যে, হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের যুলুম-অত্যাচারের শিকারে পরিণত হন তিনি। তাঁর জ্ঞানের উপর বসরাবাসীদের এত আস্থা ছিল যে, তারা তাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর লাভের জন্য কারাগারে তাঁর নিকট ছুটে যেত। কাতাদা বলেন, জাবির কারারুদ্ধ হলেন। সে সময় হিজড়ের উত্তরাধিকারের বিষয়ে একটি সমস্যা দেখা দিলে লোকেরা কারাগারে তাঁর নিকট সমাধান চেয়ে পাঠালো। তিনি বললেন, তোমরা তো বেশ ভালো। আমাকে কারাগারে আটক রেখেছো, আবার আমার নিকট ফাতওয়াও চাচ্ছো। অতঃপর তিনি জবাব পাঠিয়ে দেন।[১৫] বসরাবাসীদের কেউ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট কোন কিছু জানতে চাইলে বলতেন : تسألوني عن شئ وفيكم جابر بن زيد - তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছো, অথচ তোমাদের মধ্যে তো জাবির ইবন যায়দ আছে।[১৬]

হযরত জাবিরের ব্যক্তি সত্তাটি ছিল বহু জ্ঞানের সমাহার, তিনি তাঁর যুগের একজন খুব বড় 'আলিম ছিলেন। 'আমর ইবন দীনার বলতেন :[১৭]

ما رأيت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زير.

"আমি জাবির ইবন যায়দ অপেক্ষা ফাতওয়া বিষয়ে অধিক জানে এমন কাউকে দেখিনি।" তাঁর মৃত্যুর পর হযরত কাতাদার (রহ) মুখ থেকে বার বার উচ্চারিত হচ্ছিল : اليوم دفن علم الأرض - "আজ পৃথিবীর জ্ঞান দাফন হয়ে গেল।"[১৮]

জ্ঞান গ্রন্থাবদ্ধকরণ

সেই যুগের কিছু মহান ব্যক্তির মত তিনিও জ্ঞান গ্রন্থাবদ্ধ করা পছন্দ করতেন না। 'আমর ইবন দীনার বলেন, কিছু লোক জাবির ইবন যায়দকে বললো, মানুষ আপনার মুখ থেকে যা শোনে তা লিখে ফেলে। একথা শুনে তিনি "ইন্না লিল্লাহ" উচ্চারণ করে বলেন, তারা লিখে ফেলে? তাঁর অনীহা দেখে তাঁর ছাত্রদের অনেকে লেখা ছেড়ে দেয়।[১৯]

---

১৩. আত-তাবাকাত-৭/১৩১

১৪. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-২/৩৮

১৫. আত-তাবাকাত-৭/১৩১

১৬. তাহ্‌যীব আল-কামাল-৩/২৮৬

১৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৭৩; আত-তাবাকাত-৭/১৩১

১৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৭৩

১৯. আত-তাবাকাত-৭/১৩৬

এত জ্ঞান-গরীমার সাথে চারিত্রিক বহু গুণ ও বৈশিষ্ট্যে তিনি বিভূষিত ছিলেন। ভালো কাজের বিপরীতে দুনিয়ার যে কোন সুখ-সম্পদের কোন রকম গুরুত্ব তাঁর কাছে ছিল না। তিনি বলতেন, ষাট বছর জীবন পূর্ণ হতে চলেছে। এই দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছু পেয়েছি, আল্লাহর বহু অনুগ্রহ লাভ করেছি। কিন্তু এই ভালো কাজ ছাড়া অবশিষ্ট যা কিছু আমি করেছি এবং এ সকল সুখ-সম্পদ আমার জুতার থেকেও হেয় ও তুচ্ছ। মুহাম্মাদ ইবন হুসায়ন বলতেন, আল্লাহ জাবিরের প্রতি দয়া করুন! তিনি দিরহামের বিপরীতেও একজন মুসলিম ছিলেন।[২০]

একটি অপবাদ ও তাঁর সম্পর্কহীনতা

চরমপন্থী খারিজী সম্প্রদায়ের একটি উপদলের নাম 'ইবাদিয়া'।[২১] তাদের কিছু লোক তাঁর কাছে আসা-যাওয়া করতো। এ কারণে তাঁর সম্পর্কে কিছু মানুষের এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এই সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক আছে অথবা কমপক্ষে তাদের চিন্তা-দর্শন দ্বারা তিনি কিছুটা প্রভাবিত। কিন্তু তাদের এ ধারণা সবই অমূলক ও ভিত্তিহীন ছিল। ইবাদিয়াদের সাথে তাঁর উঠা-বসা ছিল ঠিক, তবে তাদের চিন্তা-দর্শনের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি তাঁর জীবনে বার বার এবং শেষ জীবনে অন্তিম রোগ শয্যায়ও ইবাদিয়াদের চিন্তা-বিশ্বাসের সাথে তাঁর সম্পর্কহীনতার কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন। তাঁর অন্তিম সময়ে যখন অবস্থা একেবারেই খারাপ হয়ে পড়ে তখন ছাবিত আল-বানানী তার কাছে জানতে চান, আপনার কোন ইচ্ছা আছে কি? বললেন : হাসান আল-বাসরীকে এক নজর দেখতে চাই। সে সময় হাসান আল-বাসরী (রহ) সরকারের কোপদৃষ্টিতে ছিলেন। তাই গ্রেফতার এড়াতে আবূ খলীফা নামক এক ব্যক্তির গৃহে আত্মগোপন করে ছিলেন। তাঁকে জাবিরের ইচ্ছার কথা জানানো হলো। সাথে সাথে তিনি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু ছাবিত তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন, বের হলে গ্রেফতার হওয়ার ভয় আছে। তিনি জবাব দিলেন : আল্লাহ আমাকে শত্রুর দৃষ্টি থেকে রক্ষা করবেন। তিনি নিষেধ উপেক্ষা করে তখনই রাতের অন্ধকারে জাবিরের নিকট পৌঁছেন। জাবিরের একা উঠে বসার শক্তি ছিল না। তাই অন্যের সাহায্য নিয়ে উঠে বসেন। হাসান আল-বাসরী (রহ) তাঁকে কালিমা তায়্যিবা পড়ার তালকীন দেন এবং তিনি কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করেন। তারপর তিনি ইবাদিয়াদের বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য জাবিরের কাছে জিজ্ঞেস করেন, ইবাদিয়াদের সাথে তোমার সম্পর্কের প্রকৃতিটি কেমন ছিল?

---

২০. প্রাগুক্ত-৭/১৩৪

২১. 'আবদুল্লাহ ইবন ইবাদ-এর অনুসারীদেরকে 'ইবাদিয়া' বলা হয়। উমাইয়্যা খলীফা মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদের সময় তারা বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে এবং 'তাবালা' নামক স্থানে 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আতিয়্যা তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। (আশ-শাহরিস্তানী, আল-মিলাল ওয়া আন-নিহাল-১৩৪)

জাবির বলেন, আমি আল্লাহর কাছে তাদের ব্যাপারে দায়মুক্তি চাই। হাসান আল-বাসরী (রহ) আবার প্রশ্ন করেন : তাদের ব্যাপারে তোমার ধারণা কি? জাবির তাদের সাথে নিজের সম্পর্কহীনতার কথা প্রকাশ করেন। তখন জাবিরের একান্তই অন্তিমদশা। এ কারণে হাসান আল-বাসরী (রহ) তাঁকে বিদায় দেওয়ার জন্য সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু তখনো জাবিরের জীবনকাল শেষ হয়নি। তাই হযরত হাসান (রহ) সুবহে সাদিক হওয়ার পর নামাযে জানাযার ভঙ্গিতে চারটি তাকবীর উচ্চারণ করে জাবিরের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন। তারপর অন্ধকারেই নিজের অবস্থান স্থলে ফিরে যান।[২২] আর এ রোগেই হযরত জাবির (রহ) ইনতিকাল করেন।

ওফাত

ইমাম আহমাদ, আল-ফাল্লাস ও বুখারীর মতে তিনি হিজরী ৯৩ সনে ইনতিকাল করেন। পক্ষান্তরে আল-ওয়াকিদী ও ইবন সা'দের মতে তাঁর মৃত্যু সন হিজরী ১০৩ এবং আল-হায়ছাম ইবন 'আদীর মতে হিজরী ১০৪।[২৩]

---

২২. আত-তাবাকাত-৭/৩২

২৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১.৭৩; তাহ্যীব আল-কামাল-৩/২৮৭ .

আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (রহ)

তাঁর পূর্ণ নাম আবূ 'আমর আল-আসওয়াদ এবং পিতার নাম ইয়াযীদ। তাঁর দশম ঊর্ধ্বতন পুরুষ "নাখা'"-এর প্রতি আরোপ করে তাঁকে নাখা'ঈ বলা হয়। কূফার অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন "মুখাদরাম" ব্যক্তি ছিলেন। যাঁরা জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ লাভ করেন তারা হলেন 'মুখাদরাম'।[১] তিনি ছিলেন প্রখ্যাত তাবি'ঈ 'আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদের ভাই, 'আলকামা ইবন কায়সের ভাতিজা, ইবরাহীম আন-নাখা'ঈর মামা এবং 'আবদুর রহমান ইবন আল-আসওয়াদের পিতা। তিনি 'আলকামা ইবন কায়সের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন।[২]

জ্ঞান-মনীষা ও 'ইবাদত-বন্দেগীর দিক থেকে আল-আসওয়াদকে কূফার বিশিষ্ট 'আলিমদের মধ্যে গণ্য করা হয়। ইমাম যাহাবী তাঁকে ইমাম, ফকীহ, তাপস, দুনিয়া বিরাগী ও কূফার 'আলিম বলেছেন।[৩] ইমাম নাওবী লিখেছেন, তাঁর বিশ্বস্ততা ও মহত্ত্বের ব্যাপারে সকলে একমত।[৪]

হাদীছ

হাদীছের বিশিষ্ট হাফিজ ছিলেন। হযরত আবূ বাকর, 'উমার, 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, 'আয়িশা সিদ্দীকা, হুযায়ফা, আবূ মাহযূরা, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, মু'আয ইবন জাবাল, বিলাল ইবন রাবাহ (রা) প্রমুখের মত উঁচু পর্যায়ের সাহাবীর সুহবত এবং তাঁদের থেকে হাদীছ শোনার সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত 'উমার (রা) ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। উল্লেখিত মহান ব্যক্তিবর্গের সকলের সূত্রে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৫]

ছাত্র-শিষ্য

তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করে তাঁর নিজ পরিবারের সকল সদস্য বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিতে পরিণত হন। যেমন : তাঁর ভাগ্নে ইবরাহীম নাখা'ঈ, ভাই 'আবদুর রহমান ও তাঁর পিতার চাচাতো ভাই 'আলকামা। এই 'আলকামা তো তৎকালীন জ্ঞানের জগতের উজ্জ্বল তারকাতুল্য ছিলেন। তাছাড়া অন্যদের মধ্যে 'আম্মারা ইবন 'উমায়র, আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ, আবূ বুরদা ইবন আবূ মূসা, মুহারিব ইবন দাছারা, আশ'আছ ইবন

---

১. 'আসরুত তাবি'ঈন-২৭৪

২. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-২/২৫১

৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪২

৪. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১২২

৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৩৪২; তাহ্যীব আল-কামাল-২/২৫১

আবিশ শা'ছা' (রহ) ও আরো অনেকে তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শুনেছেন। ফিক্‌হ শাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি একজন ফকীহ্ ছিলেন। ইমাম যাহাবী, ইবন হাজার 'আসকিলানী এবং আরো অনেকে তাঁর ফিক্‌হ বিষয়ে ব্যুৎপত্তির কথা স্বীকার করেছেন।[৬]

'ইবাদত-বন্দেগী ও দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা

'ইল্‌মের চেয়েও তাঁর 'আমল যথা : আল্লাহ্‌ভীতি, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ স্বভাব, 'ইবাদত-বন্দেগী ছিল বেশি সুন্দর। তাবি'ঈদের মধ্যে আটজন মহান ব্যক্তি ছিলেন 'ইবাদত-বন্দেগী এবং দুনিয়া বিরাগী স্বভাবের জন্য সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন : আর-রাবী' ইবন খুছায়ম, 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ আত-তামীমী, উয়াইস আল-কারানী, হারাম ইবন হায়্যান, মাসরূক ইবন আল-আজদা', আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ, আবূ মুসলিম আল-খাওলানী ও আল-হাসান আল-বাসরী (রহ)।[৭] এই তালিকায় আল-আসওয়াদের নামটিও আছে। ইমাম যাহাবী লিখেছেন, তিনি 'ইবাদতের ক্ষেত্রে খুব উঁচু পর্যায়ের ছিলেন।[৮] মনীষীগণ উপরোক্ত আট 'আবিদের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন :[৯]

إن الأسود بن يزيد هو نظير مسروق فى الجلالة والعلم والثقة والسّن، يضرب بعبادتهما المثل.

"মহত্ত্ব, জ্ঞান, বিশ্বস্ততায় ও বয়সে আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ ছিলেন মাসরূক ইবন আল-আজদা'র সমকক্ষ। তাঁদের দু'জনের 'ইবাদতের দ্বারা দৃষ্টান্ত দেয়া হয়।"

নামায

তাঁর জীবনের প্রধান কাজ ছিল নামায আদায় করা। প্রতিদিন সাত শো রাক'আত নফল নামায আদায় করতেন।[১০] সব সময় প্রথম ওয়াকতেই নামায আদায় করতেন। এ ব্যাপারে এত গুরুত্ব দিতেন যে, তিনি যে কাজে বা যে কোন অবস্থায় থাকতেন না কেন নামাযের সময় হওয়ার সাথে সাথে সবকিছু ছেড়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁর সফর সঙ্গীরা বলেছেন, সফর অবস্থায় যত বন্ধুর পথই অতিক্রম করুন না কেন নামাযের সময় হওয়ার সাথে সাথে বাহনের পিঠ থেকে নেমে নামায আদায় করে নিতেন। তারপর আবার সামনে এগোতেন।[১১]

---

৬. প্রাগুক্ত

৭. 'আসরুত তাবি'ঈন-৭৩১-৭৩৩

৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৪৩

৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৫০-৫১

১০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৪৩

১১. আত-তাবাকাত-৬/৪৭; 'আসরুত তাবি'ঈন-২৭৫

রোযা

রোযার প্রতিও তাঁর প্রবল আগ্রহ ও মনোযোগ ছিল। প্রায় সব সময় রোযা রাখতেন। প্রচণ্ড গরমের দিনেও রোযা ছাড়তেন না, যখন লাল উটের মত শক্তিশালী এবং তীব্র গরম সহ্য করা প্রাণীও গরমের তীব্রতায় বেহাল অবস্থা হয়ে যেত। সফরেও রোযার ধারাবাহিকতায় কোন রকম ছেদ পড়তো না। অনেক সময় এমন হতো যে, সফরের কষ্ট এবং পিপাসার তীব্রতায় তাঁর চেহারা বিবর্ণ এবং জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত, তবুও তিনি রোযা ছাড়তেন না। এত কঠোর 'ইবাদতের কারণে একটি চোখ নষ্ট হতে চলে, দেহ শুকিয়ে হালকা-পাতলা হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'আলকামা ইবন মারছাদ তাঁকে দেখতে আসেন। পিছন থেকে তাঁর দেহ মৃদু স্পর্শ করে বলেন :

يا أبا عبد الرحمن لم تعذب هذا الجسد؟

"ওহে আবূ 'আবদির রহমান! এই দেহকে এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন?"

তিনি জবাব দিলেন :

أريد راحة هذا الجسد يا أخا الإسلام، يا أبا شبل الجِدَّ الجِدَّ.

'ওহে ইসলামের ভাই, আমি এই দেহকে শান্তি দিতে চাই। আবূ শাবল! ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।"[১২]

হজ্জ

তাঁর হজ্জ আদায়ের সংখ্যা দেখে বুঝা যায় তাঁর মধ্যে হজ্জ করার আগ্রহ কী পরিমাণ ছিল। জীবনের এমন কোন বছর হয়তো ছিল না যে বছর হজ্জ করেননি। তাঁর হজ্জ ও 'উমরার সম্মিলিত সংখ্যা সত্তর থেকে আশি (৭০-৮০) হবে। মায়মূন ইবন হামযা বলেন: আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ জীবনে আশিটি হজ্জ ও 'উমরা করেন। তবে দু'টি এক সাথে নয়, পৃথকভাবে। তাঁর পুত্র 'আবদুর রহমানও পিতার মত পৃথকভাবে আশিটি হজ্জ ও 'উমরা করেন।[১৩] কখনো কখনো আগ্রহের আতিশয্যে কূফা থেকেই ইহরাম বেঁধে–

لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ لَبَّيْـكَ، لَاشَـرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

ধ্বনি দিতে দিতে যাত্রা করে মক্কায় পৌঁছতেন। তবে সব সময় এমন করতেন না, বরং বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে তাঁর ইহরাম বাঁধার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ রাতে মক্কায় প্রবেশ করতেন। বায়তুল্লাহর তাওয়াফের সাথে ছিল গভীর আবেগের সম্পর্ক। এ ব্যাপারে তিনি ভীষণ কঠোরও ছিলেন। কেউ যদি হজ্জ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করতো তাহলে সে মারা গেলে তার জানাযার নামায পড়তেন না।[১৪]

---

১২. প্রাগুক্ত

১৩. তাহ্যীব আল-কামাল-২/২৫২

১৪. আত-তাবাকাত-৬/৪৭-৪৮

কুরআন তিলাওয়াত

কুরআন ছিল তাঁর আবাসে-প্রবাসে দিন-রাতের একান্ত সঙ্গী। কুরআন তিলাওয়াত ছিল তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস। রমযান মাসে তিলাওয়াতের আগ্রহ আরো বেড়ে যেত। মাগরিব ও 'ঈশার মাঝের সময়টুক শুয়ে থাকতেন। তারপর উঠে নামায আদায় করে সারা রাত তিলাওয়াত করতেন। এক মাসে দু'রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। আর অন্য মাসে প্রতি ছয় রাতে একবার।[১৫]

মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও হৃদ্যতার সম্পর্ক

আজকাল আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতের সামান্য ভিন্নতার কারণে সব রকম সামাজিক কর্মকাণ্ডেও মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই আল-আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদের মত মহান ব্যক্তিদের আদর্শ আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য। মতের ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁরা পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট রাখতেন। আল-আসওয়াদ হযরত 'উমারের (রা) সাহচর্যে বেশিদিন থাকার কারণে তাঁর অনুসারী ছিলেন। অন্যদিকে 'আলকামা ছিলেন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) শাগরিদ ও অনুসারী। কিন্তু তাঁরা দু'জন যখন মিলিত হতেন তখন তাদের মধ্যে মোটেও মতপার্থক্য দেখা যেত না।[১৬]

ওফাত

হিজরী ৭৫ মতান্তরে ৭৪ সনে তিনি কূফায় ইনতিকাল করেন।[১৭] অন্তিম রোগশয্যায় কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাসে কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। যখন বিছানায় একা পাশ-ফেরাতে পারতেন না তখন ভাগ্নে ইবরাহীম নাখা'ঈর সাহায্য নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকেন। আত্মীয়-বন্ধুরা বললেন : আবূ 'আবদির রহমান! এমন অস্থির হচ্ছেন কেন? বললেন : কেন হবো না? আল্লাহ যদি আমাকে ক্ষমাও করে দেন, তাহলেও আমি যে পাপ করেছি তার জন্য তো আমাকে লজ্জা পেতে হবে।[১৮] একেবারে শেষ মুহূর্তে বলেন, আমাকে কালেমায়ে তায়্যিবার তালকীন দাও, যাতে আমার মুখ থেকে বের হওয়া শেষ কথাটি হয়- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ - "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"[১৯]

জীবনের শেষ দিকে তাঁর দাড়ি ও মাথার চুল সাদা হয়ে যায়। খিজাব লাগাতেন। চূড়া ওয়ালা টুপি পরতেন, কালো রংয়ের পাগড়ী পরতেন, যার প্রান্ত পিছনের দিকে ছাড়া থাকতো।[২০]

---

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. প্রাগুক্ত; 'আসরুত তাবি'ঈন-২৭৬

১৭. তাহ্যীব আল-কামাল-২/২৫২

১৮. 'আসরুত তাবি'ঈন-২৭৬

১৯. আত-তাবাকাত-৬/৫০

২০. প্রাগুক্ত-৬/৫৯

আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান (রা)

হযরত 'আবদুল্লাহর (রহ) ডাকনাম আবূ সালামা এবং এ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাই অনেকে আবূ সালামা তাঁর আসল নাম বলে মনে করেছেন। তাঁর পিতা মক্কার কুরায়শ গোত্রের বানূ যুহরা শাখার প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) এবং মাতা তুমাদির বিন্‌ত আল আসবাগ। তুমাদির ছিলেন দিমাশকের সন্নিকটে দাওমাতুল জান্দালে বসবাসরত বানূ কাল্‌ব গোত্রের কুদা'আ শাখার সন্তান। বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবীর (সা) জীবনকাল লাভ করেন। তিনি হলেন কাল্‌ব গোত্রের প্রথম মহিলা যাঁর বিয়ে হয় মক্কার কুরায়শ গোত্রের কোন পুরুষের সাথে।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

হযরত 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) ছিলেন 'আশারা মুবাশ্‌শারার (জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন) অন্যতম সদস্য। এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তিনি কত উঁচু মাপের ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। আবূ সালামা এমন মহান পিতার 'ইল্‌ম ও 'আমল (জ্ঞান ও কর্ম)-এর পরিবেশে অত্যন্ত স্নেহ-আদরে লালিত-পালিত হয়ে বেড়ে ওঠেন। পিতার জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলেন এবং অচিরেই সমকালীনদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিতে পরিণত হন। অনেক 'আলিম তাঁকে মদীনার সাত ফকীহ্‌র মধ্যে গণ্য করেছেন। তবে এটা সর্বজন গৃহীত মত নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর নামটি উচ্চারিত হওয়া তাঁর যোগ্যতার একটি বড় প্রমাণ। জ্ঞানের জগতে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা এবং তাঁর ইমাম হওয়ার ব্যাপারে 'আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে। ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, আবূ সালামার ইমাম হওয়া এবং তাঁর সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে সকলে একমত।[২]

হাদীছ

তিনি পিতা হযরত 'আবদুর রহমান ইবন আওফের (রা) নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। তাছাড়া উঁচু স্তরের আরো অনেক সাহাবীর (রা) নিকট থেকেও তিনি তাঁর জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটান। যেমন: হযরত 'উছমান, তালহা, 'উবাদা ইবন আস-সামিত, আবূ কাতাদা, আবুদ দারদা', উসামা ইবন যায়দ, হাস্‌সান ইবন ছাবিত, রাফি' ইবন খাদীজ, ছাওবান, নাফি' ইবন আল-হারিছ, 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম, আবূ হুরায়রা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, আনাস ইবন মালিক, জাবির, মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান, উম্মুল

---

১. তাহ্‌যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-২১/২৬৯; তাবি'ঈন-৫৩৪

২. তাহ্‌যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত

মু'মিনীন 'আয়িশা সিদ্দীকা, উম্মু সালামা (রা) ও আরো অনেকে। উঁচুস্তরের বহু তাবি'ঈর নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন। তাঁদের তালিকা অনেক দীর্ঘ।[৩]

উপরে উল্লেখিত মহান ব্যক্তিবর্গের অনুগ্রহ ও অবদান তাঁকে হাদীছের ইমামের পদে অধিষ্ঠিত করে। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন :[৪]

كان من كبار أئمة التابعين غزير العلم ثقة عالما.

"তিনি ছিলেন তাবি'ঈ ইমামদের অন্যতম, অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী, বিশ্বস্ত 'আলিম ব্যক্তি।"

ইবন সা'দ বলেন : كان ثقة فقيهًا كثير الحديث.

"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, সুদৃঢ়, ফকীহ ও বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী।" তিনি আবূ সালামাকে মদীনার 'আলিমদের দ্বিতীয় স্তরে উল্লেখ করেছেন।[৫]

আবূ সালামার (রহ) স্মৃতির ভাণ্ডারে বহু হাদীছ থাকার কথা শ্রেষ্ঠ 'আলিমগণ স্বীকার করেছেন। ইমাম যুহরী (রহ) বলেন, ইবরাহীম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন কারিজ আমাকে বলতেন যে, তোমাদের মধ্যে দু'ব্যক্তির চেয়ে হাদীছের অন্য কোন বড় 'আলিম আমি দেখিনি। একজন 'উরওয়া ইবন যুবায়র এবং অন্যজন আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান।[৬] ইমাম যুহরী আরো বলেন :[৭]

أربعة من قريش وجدتهم بحورا : عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الله.

"আমি চার ব্যক্তিকে জ্ঞানের সাগর রূপে পেয়েছি। তাঁরা হলেন : 'উরওয়া ইবন যুবায়র, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, আবূ সালামা ও 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ।"

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

তাঁর সুযোগ্য ছাত্রদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এখানে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম উপস্থাপন করা হলো : ইমাম শা'বী, 'আবদুর রহমান আল-আ'রাজ, 'আররাক ইবন মালিক, 'আমর ইবন দীনার, আবূ হাযিম, আবূ সালামা ইবন দীনার, যুহরী, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, ইয়াহইয়া ইবন আবী কাছীর, মুহাম্মাদ ইবন 'আমর, সালিম আবুন্ নাদর, আবুয্ যানাদ, সা'দ ইবন ইবরাহীম আল-কাজী (রহ) ও আরো অনেকে।[৮]

---

৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১২/১১৫; তাহ্যীব আল-কামাল-২১/২৬৯

৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৩

৫. আত-তাবাকাত-৫/১১৬; তাহ্যীব আল-কামাল-২১২৭১

৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১২/১১৬

৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৩

৮. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-আসমা'-১/২৪১

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ শাস্ত্রে আবূ সালামার স্থান এত উঁচুতে ছিল যে, অনেকে তাঁকে মদীনার সাত ফকীহর অন্যতম বলেছেন। ইবন সা'দ তাঁকে ফকীহ বলেছেন।[৯] এই উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট থেকে তিনি ফিক্‌হর জ্ঞান অর্জন করেন। সুযোগ্য শিক্ষকের যোগ্য ছাত্র হিসেবে গভীর অনুধ্যান ও সূক্ষ্ম অনুধাবন ক্ষমতা অর্জন করেন। বিভিন্ন মাসয়ালায় মহান শিক্ষকের সাথে যুক্তি-তর্কে অবতীর্ণ হতেন। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষককে নিজের মতে আনতে সক্ষম হন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন :[১০]

كان أبو سلمة يتفقّه ويناظر ابن عباس رض ويراجعه.

"আবূ সালামা ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট থেকে ফিক্‌হর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন, তাঁর সাথে যুক্তি-তর্কে অবতীর্ণ হতেন এবং তাঁকে তাঁর মত থেকে সরিয়ে নিজের মতে নিয়ে আসতেন।"

ইমাম যুহরী মনে করেন, ইবন 'আব্বাসের (রা) সাথে এই মতপার্থক্যের কারণে তিনি তাঁর অগাধ জ্ঞানের অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত থেকে গেছেন।[১১]

বিচারকের পদে

হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালে তৎকালীন মদীনার ওয়ালী সা'ঈদ ইবন আল-'আস তাঁকে মাদীনাতুর রাসূলের কাজীর পদে নিয়োগ দেন। কিন্তু পরবর্তীতে ওলট-পালটের কারণে এ পদে থাকতে পারেননি। সা'ঈদ ইবন আল-'আসের অপসারণ এবং তদস্থলে মারওয়ানের যোগদানের পর আবূ সালামাকে কাজীর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।[১২]

ওফাত

খলীফা ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিকের খিলাফতকালে হিজরী ৯৪ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। তবে ১০৪ হিজরীতে ৭২ বছর বয়সে তাঁর ইনতিকাল হয় বলে ভিন্ন একটি বর্ণনায় এসেছে।[১৩]

হযরত আবূ সালামা (রহ) ছিলেন একজন সুদর্শন চেহারার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মানুষ। 'আবদুল্লাহ ইবন আবী ইয়া'কূব আদ-দাববী বলেন : আবূ সালামা ছিলেন দীপ্তিমান চেহারার মানুষ। তাঁর চেহারার সেই দীপ্তি ছিল রোমান সম্রাটদের স্বর্ণমুদ্রার দীপ্তির মত। শেষ জীবনে মাথার চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে তিনি মেহদীর খিযাব লাগাতেন।

---

৯. আত-তাবাকাত-৫/১১৬
১০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬৩
১১. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২১/২৭২
১২. আত-তাবাকাত-৫/১১৫
১৩. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২১/২৭২; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬৩

কাতাদা ইবন দি'আমা আস-সাদূসী (রহ)

আবুল খাত্তাব কাতাদার পিতার নাম দি'আমা। তিনি হিজরী ৬১ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ঊর্ধ্বতন ৮ম পুরুষ সাদূস-এর নাম অনুসারে তিনি সাদূসী নামে পরিচিত। তিনি শ্রেষ্ঠ 'আলিম তাবি'ঈদের একজন। জ্ঞানের সাথে কাতাদার স্বভাবগত একটা সম্পর্ক ছিল। তাঁর মধ্যে জ্ঞান অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত একই রকম ছিল। মাতারুল ওয়াররাক বর্ণনা করেছেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত তিনি একজন জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্র ছিলেন।[১] তিনি ছিলেন জন্মান্ধ।[২]

তাঁর স্মৃতিশক্তি

জ্ঞান অন্বেষণের তীব্র আকাঙ্ক্ষার সাথে তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তি লাভ করেন। কোন কিছু একবার শুনলে চিরদিনের জন্য তা স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়ে যেত। একবার একটি হাদীছ শোনার পর আর কখনো কোন মুহাদ্দিছের নিকট তা দ্বিতীয়বার শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। একবার যে কথা তার কানে ঢুকেছে তা চিরকালের জন্য অন্তর-ভাণ্ডারে সংরক্ষিত হয়ে গেছে।[৩] তাঁর স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে বিস্ময়কর সব ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন একটি ঘটনা 'ইমরান ইবন 'আবদিল্লাহ বর্ণনা করেছেন। একবার কাতাদা প্রখ্যাত তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) নিকট গেলেন এবং কিছুদিন সেখানে অবস্থানও করেন। এ সময় তিনি সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের নিকট প্রাণ খুলে হাদীছ শুনতে চাইতেন এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতেন। একদিন সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এ পর্যন্ত তুমি আমার নিকট যত কথা জানতে চেয়েছো তা কি সব তোমার মনে আছে? তিনি হাঁ সূচক জবাব দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলো এভাবে বলতে আরম্ভ করলেন : আমি আপনার নিকট একথা জানতে চেয়েছি, আপনি এ জবাব দিয়েছেন। আমি এই প্রশ্ন করেছি, আপনি এই বলেছেন, আর হাসান আল-বাসরী (রহ) এই জবাব দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের নিকট থেকে শোনা সব হাদীছ তাঁকে শুনিয়ে দেন। সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) তাঁর এই প্রখর স্মৃতিশক্তি দেখে ভীষণ অবাক হলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, আল্লাহ তোমার মত মানুষ সৃষ্টি করেছেন তা আমার কল্পনায়ও ছিল না।[৪]

---

১. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩৫০

২. তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/২২৪

৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৯

৪. তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/২২৭

জ্ঞান ও মনীষা

এমন আগ্রহ, আবেগ, জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রখর স্মৃতিশক্তি তাঁকে কুরআন, তাফসীর, হাদীছ, ফিক্‌হ, ভাষা, সাহিত্য, আরবদের প্রাচীন ইতিহাস, বংশবিদ্যা ইত্যাদিসহ সেই যুগের সকল ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞানের সাগরে পরিণত করে।[৫] আল্লামা নাওবী লিখেছেন, তাঁর মাহাত্ম্য ও জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সকলে একমত।[৬]

কুরআন

তিনি কুরআনের হাফিজ ছিলেন। ভালো মুখস্থ ছিল। বড় বড় সূরাগুলো পাঠের সময় একটি শব্দেও ভুল করতেন না। মা'মার বলেন, একবার কাতাদা সা'ঈদ ইবন 'আরূবাকে না দেখে সূরা আল-বাকারা শোনান এবং একটি হরফেও কোন ভুল করেননি। শোনানোর পর তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমি ঠিক মত মুখস্থ রেখেছি? তিনি বললেন, হাঁ। সুফইয়ান ইবন 'উয়ানা বলেন : কাতাদা জাবির ইবন 'আবদিল্লাহর (রা) সহীফা থেকে মুখস্থ করতেন। তিনি তা সুলায়মান আল-ইয়াশকুরীর নিকট থেকে নকল করেন।[৭]

তাফসীর

কুরআনের তাফসীরের তিনি একজন বড় 'আলিম ছিলেন। কুরআনের আয়াতের তাফসীর ও তাবীলের ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত। নিজেই বলতেন, কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যে সম্পর্কে আমি কিছু না কিছু শুনিনি। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলতেন, কাতাদা তাফসীরের একজন বড় 'আলিম ছিলেন।[৮] ইবন হিব্বান বলেন, তিনি কুরআনের সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন। ইবন নাসের উদ্দীন তাঁকে মুফাসসিরুল কিতাব বলেছেন।[৯]

হাদীছ

কাতাদার জ্ঞান চর্চার মূল বিষয় ছিল হাদীছ। এ বিষয়ে তাঁর অবস্থান ছিল অতি উঁচুতে। ইবন সা'দ লিখেছেন, হাদীছে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন ও প্রমাণ সদৃশ্য। আল্লামা যাহাবী তাঁকে হাফিজ ও আল্লামা নামে অভিহিত করেছেন।[১০] তাঁকে ইরাকের সবচেয়ে বড় হাফিজে হাদীছ গণ্য করা হতো। সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব বলতেন, কাতাদার চেয়ে বড় ইরাকের কোন হাফিজে হাদীছ আমাদের এখানে আসেননি। সুফইয়ান বলতেন, দুনিয়ায় কাতাদার সমতুল্য কেউ ছিল না। বাকর ইবন 'আবদিল্লাহ আল-মুযানী

---

৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৯০-১১০

৬. তাবি'ঈন-৩৮৫

৭. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৫/২২৮

৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৯

৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৮/৩৫৫; শাযারাত আয-যাহাব-১/১৫৩

১০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৯

বলতেন, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বড় হাফিজে হাদীছ এবং এমন ব্যক্তিকে দেখতে চায় যিনি হাদীছ যেভাবে শুনেছেন হুবহু সেভাবে বর্ণনা করেন, তাহলে তার কাতাদাকে দেখা উচিত।

ما رأيت الذى هو أحفظ منه ولا أجدر أن يؤدى الحديث كما سمعه.

"আমি এমন কাউকে দেখিনি যে তার চেয়ে হাদীছ ভালো মুখস্থকারী এবং তার চেয়ে ভালো হুবহু বর্ণনাকারী।"[১১]

'আবদুর রহমান ইবন মাহদী বলতেন, কাতাদা ছিলেন হুমায়দ-এর মত পঞ্চাশ ব্যক্তি থেকেও বড় হাফিজে হাদীছ।[১২] ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বলতেন, কাতাদা বসরাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হাফিজ ছিলেন। যা কিছু শুনতেন মুখস্থ করে নিতেন। একবার তাঁর সামনে জাবিরের সহীফা (পুস্তিকা) পাঠ করা হয়। একবার শুনেই তা মুখস্থ হয়ে যায়।[১৩] ইবন হিব্বান তাঁকে তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় হাফিজে হাদীছ গণ্য করেছেন। সুলায়মান তায়মী ও আইউব সাখতিয়ানীর মত মড় মুহাদ্দিছগণ তাঁর হাদীছের মুখাপেক্ষী ছিলেন এবং তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করতেন।[১৪]

শিক্ষকবৃন্দ

কাতাদার আসল ও প্রধান শায়খ ছিলেন হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ)। বেশির ভাগ তাঁরই ঝর্ণাধারা থেকে জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত করেন। বারো বছর তাঁর সাহচর্যে কাটান। তিনি বলতেন, আমি বারো বছর যাবত হাসান আল-বাসরীর (রহ) মজলিসে বসেছি এবং তিন বছর তাঁর সাথে ফজরের নামায আদায় করেছি। আমার মত মানুষ তাঁর মত উঁচু মাপের মানুষের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছে। তিনি ছিলেন হাসান আল-বাসরীর (রহ) যোগ্যতম ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। আবূ হাতিম বলতেন, হাসান আল-বাসরীর (রহ) সবচেয়ে বড় সঙ্গীদের মধ্যে কাতাদা একজন।[১৫]

হাসান আল-বাসরী (রহ) ছাড়াও সে যুগের একদল শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনেন। তাঁদের মধ্যে যেমন সাহাবায়ে কিরাম (রা) ছিলেন, তেমনি ছিলেন তাবি'ঈন কিরাম। যেমন : আনাস ইবন মালিক, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, 'ইমরান ইবন হুসায়ন (রা), সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, 'ইকরিমা, আবূ বুরদা ইবন আবী মূসা, শা'বী, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উতবা ইবন মাস'ঊদ, মুতাররিফ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন শিখখীর, হাসান আল-বাসরী, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ, 'আমর ইবন দীনার, মাসরূক ইবন

---

১১. তাহযীব আল-কামাল-১৫/২২৭

১২. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৫৭-৫৮

১৩. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/১১০

১৪. তাহযীব আত-তাহযীব-৮/৩৫৫; তাবি'ঈন-৩৮৬

১৫. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৫৮

আওস, মুসলিম ইবন ইয়াসার (রহ) প্রমুখ। জামাল উদ্দীন আল-মিয্যী শতাধিক শায়খের নাম উল্লেখ করেছেন।[১৬]

তাঁর এ বিশেষ যোগ্যতা ছিল যে, যে মুহাদ্দিছের নিকটই তিনি গেছেন, অল্পদিনের মধ্যে তাঁর সকল জ্ঞান আত্মস্থ করে ফেলেছেন। একবার সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) নিকট কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং এ সময়ে তিনি তাঁকে এত প্রশ্ন করেন যে তিন দিনের মধ্যে তিনি শংকিত হয়ে তাঁকে বলেন, তুমি এখন যাও, আমার সকল জ্ঞান তুমি শূন্য করে ফেলেছো।[১৭]

তাঁর শিষ্য-শাগরিদ

তাঁর যোগ্যতার কারণে তিনি মানুষের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হন। অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু মানুষ তাঁর দারসের মজলিস থেকে পরিতৃপ্ত হয়েছে। তাদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ হবে। এখানে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাত্রের নাম তুলে ধরা হলো : আইউব সাখতিয়ানী, সুলায়মান তায়মী, জারীর ইবন হাযিম, শু'বা, মিস'আর, আবূ বিলাল রাসিবী, মাতারুল ওয়াররাক, হাম্মাম ইবন ইয়াহইয়া, 'আমর ইবন হারিছ আল-মিসরী, শায়বান নাহবী, সাল্লাম ইবন আবিল মুতী', সা'ঈদ ইবন আবী 'উরূবা, আবান ইবন ইয়াযীদ আল-'আত্তার, হুসায়ন ইবন যাকওয়ানা, হাম্মাদ ইবন সালামা, আওযা'ঈ, 'আমর ইবন ইবরাহীম 'আবদী, 'ইমরান আল-কাত্তান, সালিহ আল-মুররী, 'আসিম ইবন সুলায়মান আল-আহওয়াল, সুলায়মান আল-আ'মাশ, হুমাইদ আত-তাবীল, সা'ঈদ ইবন আবী 'আরূবা (রহ) প্রমুখ।[১৮]

ফিক্হ

ফিক্হ শাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। ইবন হিব্বান লিখেছেন, তিনি কুরআন ও ফিক্হর বড় 'আলিমদের একজন ছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ) তাফসীর ও হাদীছে দক্ষতার সাথে ফিক্হতেও তাঁর পারদর্শিতার কথা বলতেন।[১৯] বসরার জামা'আতে ইফতার অন্যতম সদস্য ছিলেন।[২০]

যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত দানের ক্ষেত্রে সতর্ক

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তিনি ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে দারুণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কোন বিষয়ে জানা না থাকলে নিজের অজ্ঞতার কথা সাফ বলে দিতেন। নিজের মতের উপর ভিত্তি করে কোন মাসয়ালার জবাব দিতেন না। আবূ হিলাল বলেন, একবার আমি কাতাদার নিকট একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলাম।

---

১৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩৮১; তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/২২৪-২২৬

১৭. তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/২২৭

১৮. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩৫২

১৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৮/৩৫৫; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৯

২০. আ'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/২৭

তিনি সাফ বলে দিলেন আমি জানিনে। বললাম, নিজের যুক্তির ভিত্তিতে বলে দিন। বললেন : আমি চল্লিশ বছর যাবত নিজের মতের ভিত্তিতে কোন জবাব দিইনি। যখন তিনি একথা বলেন তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছর। তবে আবূ আওয়ানা বলেন, কাতাদা বলতেন, আমি তিরিশ বছর যাবত নিজের মত ও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে কোন ফাতওয়া দিইনি।[২১]

কাতাদার মত ব্যাপক মনীষা খুব কম তাবি'ঈর মধ্যে ছিল। তিনি কেবল দীনী 'ইল্‌মের 'আলিম ছিলেন না, বরং সে যুগে প্রচলিত বিভিন্ন বিষয় যেমন : আরবী ভাষা, সাহিত্য, আরব জাতির ইতিহাস, বংশ বিদ্যা প্রভৃতিরও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আবূ 'উমার বলেন, তিনি একজন বংশ বিদ্যাবিশারদ ছিলেন।[২২]

আবূ 'উবায়দা বলেন, বানূ উমাইয়্যাদের পক্ষ থেকে প্রতিদিন কোন না কোন ব্যক্তি কাতাদার নিকট ইতিহাস, কবিতা, বংশ বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে কিছু না কিছু জানার জন্য আসতো। ইবন নাসেরুদ্দীন তাঁর ব্যাপক মনীষার মূল্যায়ন করেছেন। এভাবে :[২৩]

أبو الخطاب الضرير الأكمه مفسر الكتاب آية فى الحفظ امامًا فى النسب رأسًا فى العربية واللغة وأيام العرب.

'অন্ধ আবুল খাত্তাব আল-কিতাবের মুফাসসির, মুখস্থ শক্তিতে একটি নিদর্শন, বংশ বিদ্যায় ইমাম, আরবী ভাষা, সাহিত্য ও আরবের যুদ্ধ-বিগ্রহের জ্ঞানে নেতৃস্থানীয়।'

ইবন সা'দ তাঁকে বসরার তৃতীয় তাবকার (স্তর) মুহাদ্দিছগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

ওফাত

হিজরী ১১৭, মতান্তরে ১১৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন। আবূ হাতিম বলেন, হাসান আল-বাসরীর (রহ) মৃত্যুর সাত বছর পরে তিনি ওয়াসিত নগরে তা'উনে (প্লেগ) আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৬ অথবা ৫৭ বছর। তবে তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের বিস্তর মতভেদ আছে।[২৪]

---

২১. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৫/২২৮

২২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৯

২৩. শাযারাত আয-যাহাব-১/১৯৩

২৪. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৫/২৩২-২৩৩

ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্ (রহ)

হযরত ওয়াহাবের (রহ) ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :[১]

وهب بن منبه الحافظ أبو عبد الله الصنعانى عالم أهل اليمن.

"ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ একজন হাফিজ, ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। তিনি সান'আর অধিবাসী এবং ইয়ামনবাসীদের একজন 'আলিম।" তিনি অনারব বংশোদ্ভূত। পারস্য সম্রাট কিস্‌রা আঁ নওশেরওয়ান যখন সায়ফ যী ইয়াযিনের নেতৃত্বে হাবশায় অভিযান চালান তখন ওয়াহাবের পিতা মুনাব্বিহ পারস্যের হারাত থেকে ইয়ামনে আসেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার মত অন্য যারা বাইরে থেকে ইয়ামনে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে ইতিহাসে তারা "আবনা" (أبناء) নামে প্রসিদ্ধ।[২] এ কারণে আল্লামা আয-যিরিকলী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :[৩]

وهب بن منبه الأبناوى والصنعانى – ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ আবনা' বংশোদ্ভূত, সান'আর অধিবাসী। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে তাঁর পিতা মুনাব্বিহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু সন নিয়ে কিছুটা মত পার্থক্য আছে। তবে প্রসিদ্ধ মতে হিজরী ৩৪, খ্রীস্টাব্দ ৬৫৪ সনে ওয়াহাব ইয়ামনের সান'আয় জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরী ১১৪, খ্রীস্টাব্দ ৭৩২ সনে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৪] তাঁরা ছিলেন চার ভাই : ওয়াহাব, মা'কিল, হাম্মাম ও গায়লান। ওয়াহাব সবার বড় ও গায়লান সবার ছোট ছিলেন। অপর একটি বর্ণনায় মাসলামা নামে তাঁর আরেক ভাইয়ের নাম জানা যায়।[৫]

জ্ঞান ও মনীষা

ইসলামী জ্ঞানে তিনি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। তবে একেবারে অপরিচিতও ছিলেন না। অন্য অনেক ধর্মের গ্রন্থাবলীর একজন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাই 'আলিম তাবি'ঈনের মধ্যে তাঁরও একটা বিশেষ স্থান ছিল। আয-যিরিকলী বলেন, তিনি বিভিন্ন ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ থেকে বহু কাহিনীর বর্ণনাকারী এবং পূর্ববর্তীদের বহু কাহিনীর একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিত।[৬] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তিনি একজন উঁচু

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০০

২. আল-মাগাযী আল-উলা ওয়া মুয়াল্লিফূহা-২৭; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৯/৪৮৯

৩. আল-আ'লাম-৮/১২৫

৪. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০০-১০১

৫. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৯/২৮৮, ৫০১-৫০২

৬. আল-আ'লাম-৮/১২৫

মর্যাদাসম্পন্ন তাবি'ঈ। তাঁর বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তার ব্যাপারে সকলে একমত। আল-'ইজলী বলেন :[৭]

كان ثقة تابعيا على قضاء صنعاء – 'তিনি একজন বিশ্বস্ত, তাবি'ঈ ব্যক্তি, সান'আর কাজীর পদে আসীন ছিলেন।' 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের সময় তিনি কাজী ছিলেন। খলীফা ইবন খায়্যাত তাঁকে ইয়ামনীদের দ্বিতীয় তাবকায় (স্তরে) এবং ইবন সা'দ তৃতীয় তাবকায় স্থান দিয়েছেন। আবূ যুরআ ও আন-নাসাঈ (রহ) তাঁকে 'ছিকা' (বিশ্বস্ত) বলে প্রত্যয়ন করেছেন।[৮]

হাদীছ

বহু সাহাবীর নিকট থেকে তিনি হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, আবূ হুরায়রা, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, আনাস ইবন মালিক, নু'মান ইবন বাশীর (রা) প্রমুখ সাহাবীর সূত্রে তাঁর বর্ণনা পাওয়া যায়। তাবি'ঈদের মধ্যে তাউস ইবন কায়সান, 'আমর ইবন দীনার, 'আমর ইবন শু'আয়ব, তাঁর ভাই হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ (রহ) প্রমুখের নিকট থেকে তিনি হাদীছ শোনেন।[৯]

তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : তাঁর দু'পুত্র 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রহমান, ভাতিজা 'আবদুস সামাদ ও 'আকীল, দৌহিত্র ইদরীস ইবন সিনান এবং অন্যদের মধ্যে 'আমর ইবন দীনার, সিমাক ইবন ফাদল, ইসরাঈল আবূ মূসা (রহ) ও আরো অনেকে।[১০]

বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে তাঁর পাণ্ডিত্য

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি অন্য ধর্মের গ্রন্থসমূহের একজন খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ পারদর্শী সেকালে আর কেউ ছিলেন না। ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তিনি প্রাচীন গ্রন্থসমূহের জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।[১১]

ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন :[১২]

كان ثقة واسع العلم ينظر بكعب الأخبار فى زمانه.

"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর যুগে তাঁকে কা'ব আল-আহবারের সমকক্ষ বলে মানা হতো।"

---

৭. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৪৯
৮. তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৪৮৮; তাবি'ঈন-৫০৩
৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১৯/৪৮৭
১০. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৪৪
১১. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/১৪৯
১২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০১

উল্লেখ্য যে, এই কা'ব আল-আহবার ছিলেন একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি। আহলি কিতাবের শ্রেষ্ঠ 'আলিমগণের একজন। হযরত আবূ বাকরের (রা) খিলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে ইয়ামন থেকে মদীনায় আসেন।

ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ সম্পর্কে একথাও প্রচলিত আছে যে, তিনি ইহূদী বংশোদ্ভূত। প্রাচীন আরবী গ্রন্থসমূহে ছড়িয়ে থাকা অধিকাংশ ইহূদী উপাখ্যানসমূহের উৎস তিনি। প্রাচীন গ্রীক, সুরইয়ানী, ও হিমইয়ারী ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন এবং দুর্বোধ্য প্রাচীন লেখা যা কেউ পাঠ করতে পারতো না, তিনি তা সহজে খুব সুন্দরভাবে পাঠ করতেন।[১৩] ইয়ামনী আহলি কিতাব, যাদের সংখ্যা সে সময় দক্ষিণ আরবে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাদের সাথে ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহর ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক ছিল এবং সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি ইহূদী ও খ্রীস্টানদের পবিত্র গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করেন।

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি বিরানব্বই (৯২) খানা আসমানী গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তার মধ্যে এমন কয়েকখানি ছিল যে সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান খুবই অপ্রতুল। দাঊদ ইবন কায়স বলেন : তিনি বলতেন, আমি বিরানব্বই খানা গ্রন্থ পাঠ করেছি যার সবগুলোই আসমানী। বাহাত্তর (৭২) খানা গির্জায় এবং মানুষের হাতে আছে। আর বিশ (২০) খানার জ্ঞান খুব কম সংখ্যক লোকেরই আছে। কোন কোন বর্ণনায় একথা এসেছে যে, তিনি এমন তিরিশখানা গ্রন্থ পাঠ করেন যা তিরিশ জন নবীর উপর নাযিল হয়েছিল।[১৪]

যাই হোক না কেন, একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তিনি অতীতের আসমানী গ্রন্থসমূহের একজন বড় 'আলিম ছিলেন এবং এ বিষয়ের বিখ্যাত দু'জন বিশেষজ্ঞ কা'ব আল-আহবার ও 'আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) সামষ্টিক জ্ঞান তাঁর একক সত্তার মধ্যে পুঞ্জিভূত করেন। নিজের জ্ঞানের জন্য তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ও ছিল। যেমন তিনি বলেন :[১৫]

يقولون عبد الله بن سلام أعلم أهل زمانه، وكعب أعلم أهل زمانه. أفرأيت من جمع علمهما؟ يعني نفسه.

"লোকেরা বলে থাকে 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, কা'ব তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। তুমি কি দেখেছো কে এই দু'জনের জ্ঞান জমা করেছে? মূলত সেই ব্যক্তি যে তিনি নিজে সে কথা বলতে চেয়েছেন।"

কেউ কেউ "কাদরিয়া" মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তাঁর প্রতি দোষারোপ করেছেন এবং পরবর্তীতে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, সে কথাও বলেছেন। তাঁরা দাবী করেন,

---

১৩. জাওয়াদ 'আলী তারীখ আল-'আরাব কাবলাল ইসলাম-১/৮৪

১৪. আত-তাবাকাত-৫/৩৯২

১৫. তাহ্যীব আল-কামাল-১/৪৮৯

এ বিষয়ে তিনি একখানা পুস্তক রচনা করেন; অতঃপর অনুতপ্ত হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন :[১৬]

كنت أقول بالقدر حتى قرأت بضعة وسبعين كتابا من كتب الأنبياء فى كلها : من جَعَل إلى نفسه شيئًا من المشيئة فقد كفر. فتركت قولى.

"আমি "কাদর" বা ইচ্ছার স্বাধীনতার কথা বলতাম। অবশেষে নবীদের সত্তরের অধিক গ্রন্থ পাঠ করলাম। তার সবগুলোতে আছে, যে কেউ ইচ্ছার কোন কিছু নিজের দিকে আরোপ করবে, কাফির হয়ে যাবে। অতঃপর আমি আমার কথা ত্যাগ করি।"

বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং কঠোরতার মুখোমুখি হতে হয়।

ইতিহাস

ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ (রহ) একজন বড় ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস গ্রন্থ প্রণেতা। আরবী ভাষায় সংকলক ও গ্রন্থ রচনার সূচনা হয় মূলত উমাইয়্যা যুগে। এ ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ড. 'উমার ফাররূখ বলেন :[১৭]

ولقد عَرَفَ العصر الأموى تدوينا بمعنى التأليف منسوبا إلى وهب بن مُنَبِّه فى الأخبار، وإلى محمد بن عبد الرحمن العامرى (ت ١٢٠هـ) الفقه، وإلى محمد بن مسلم الزهرى (ت ١٢٤هـ) فى الحديث، ولكن لم يصل إلينا شيئ من تدوين ذلك العصر.

"উমাইয়্যা যুগ যে লিপিবদ্ধকরণ তথা গ্রন্থ রচনার সাথে পরিচিত হয়, ইতিহাস বিষয়ে তা ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহর প্রতি আরোপ করা হয়। আর ফিক্‌হ ও হাদীছে তা আরোপ করা হয় যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রহমান আল-'আমিরী (মৃ. ১২০ হি.) ও মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম আয-যুহ্‌রীর (মৃ. ১২৪ হি.) প্রতি। তবে সে যুগের লেখা কোন কিছু আমাদের নিকট পৌঁছেনি।"

ঐতিহাসিক জুরজী যায়দান বলেন :[১৮]

ثم اشتغلوا فى تدوين التاريخ خصوصا المغازى، وأقدم ماوصل إلينا خبره من كتبهم فى هذا الموضوع كتاب ألفه وهب بن مبنه صاحب الأخبار والقصص... فألف كتابا فى الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وأشعارهم وقصصهم. قال ابن خلكان انه شاهده بنفسه واثنى عليه.

---

১৬. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯১

১৭. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-১/৩৭৯

১৮. জুরজী যায়দান, তারীখ আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী-২/৫৮; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াত আ'য়ান-২/১৮০

"অতঃপর তাঁরা ইতিহাস, বিশেষতঃ মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস) রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ বিষয়ে সর্বপ্রাচীন যে গ্রন্থটির কথা আমাদের নিকট পৌঁছেছে তা হলো ইতিহাস ও কাহিনী বিশেষজ্ঞ ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ রচিত গ্রন্থটি।... তিনি ইয়ামনের হিময়ার রাজ বংশের মুকুটধারী রাজন্যবর্গ, তাঁদের ইতিহাস, কবিতা ও উপাখ্যান বিষয়ে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইবন খাল্লিকান বলেন, তিনি সে গ্রন্থটি দেখেছেন এবং সেটির প্রশংসাও করেছেন।"

বিখ্যাত "কাশ্ফুজ জুনূন" গ্রন্থের রচয়িতা হাজী খলীফা বলেন, ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ মাগাযী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধ-বিগ্রহের তথ্য সংগ্রহ করেন। তবে সীরাতের প্রাচীন গ্রন্থসমূহে সীরাতুন নাবীর বর্ণনাকারীদের সাথে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি।[১৯]

ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ বর্ণিত হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খুব অল্প তথ্যই আমাদের নিকট পৌঁছেছে। Schott Reinhardt কৃত সংকলনে Papyrus-এর উপর লেখা ছোট্ট একটি টুকরো C. H-Becker লাভ করেন। তাতে বায়'আতে 'আকাবার উল্লেখ আছে। লেখাটি জার্মানীর Heidelberg-এ সংরক্ষিত আছে।[২০]

ইবন ইসহাক ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ থেকে ফায়ামিউন ও সালিহ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে নাজরানে খৃস্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটির উপসংহারে ইবন ইসহাক বলেছেন :

فهذا حديث وهب بن منبه عن أهل نجران. – 'এই হলো নাজরানবাসীদের সম্পর্কে ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহের বক্তব্য।'[২১]

বিভিন্ন মূল সূত্রসমূহে ওয়াহাবকে "ছিকা" বা বিশ্বস্ত বলা হয়েছে। কিন্তু বর্ণনাকারীগণ অতি অল্প ক্ষেত্রেই তাঁর বর্ণনা গ্রহণের জন্য আগ্রহী হয়েছেন। পক্ষান্তরে মদীনার অন্য বর্ণনাকারীদের নিকট থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যা ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ তাঁর ভাই হাম্মাম থেকে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, এই হাম্মাম একজন দীর্ঘজীবি মানুষ ছিলেন এবং প্রায় ১৩০ বছর জীবন লাভ করেন।[২২]

ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ (রহ) একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের উল্লেখিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের কারণে তিনি আরো বিচক্ষণ ও 'ইবাদতকারী হয়ে যান। তিনি সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে কাটাতেন। একাধারে বিশ বছর 'ঈশার নামাযের ওজুতে ফজরের নামায আদায় করেন। এত কোমল প্রকৃতির ছিলেন যে, জীবনে কাউকে কখনো কটু কথা বলেননি বা গালি দেননি।[২৩]

---

১৯. আল-মাগাযী আল-উলা ওয়া মুয়াল্লিফূহা-৩০-৩৪

২০. মুকাদ্দিমা, আল-মাগাযী আল-উলা-২২

২১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩১-৩৪

২২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০১; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৫০২

২৩. প্রাগুক্ত

আধ্যাত্মিকতায় তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। তাঁর থেকে সংঘটিত কিছু অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আবূ কাছীর ইবন 'উবায়েদ একবার তাঁর সাথে 'সা'দা' নামক স্থানে একজনের বাড়িতে যান এবং রাত্রি যাপন করেন। রাতে বাড়ির সকল বাতি নিভিয়ে দেওয়ার পর সকলে শয্যা গ্রহণ করে। গভীর রাতে গৃহকর্তার মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে ওয়াহাবের ঘরে আলো। সে তার পিতাকে বিষয়টি অবহিত করে। পিতা জানালার ছিদ্রপথে উঁকি দিয়ে দেখে তাঁর পা দু'টি এত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে যেন সূর্যের আলোর শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়ছে। সকালে গৃহকর্তা ওয়াহাবকে বললেন : গত রাতে আমি আপনাকে এমন এক অবস্থায় দেখেছি যা আর কাউকে কখনো সে অবস্থায় দেখিনি। তিনি জানতে চাইলেন, কী অবস্থায় দেখেছেন? তিনি বললেন : আমি আপনাকে সূর্যের আলো থেকেও উজ্জ্বল আলোর মধ্যে দেখেছি। তাঁর কথা শুনে ওয়াহাব বললেন : যা দেখেছেন গোপন রাখুন।[২৪]

'আবদুস সামাদ ইবন মা'কিল বলেন, একবার ওয়াহাবকে বলা হলো, ওহে আবূ 'আবদিল্লাহ : আপনি স্বপ্ন দেখে আমাদের নিকট বর্ণনা করেন এবং তা সবই সত্যে পরিণত হয়। তিনি বললেন : এখন আর সে অবস্থায় নেই। যেদিন আমি কাজীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছি সেদিন থেকে সেই অবস্থাটি চলে গেছে।[২৫]

যাই হোক না কেন, একথা সত্য যে, কা'ব আল-আহবারের মত ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বহু ভিত্তিহীন ইহূদী উপাখ্যান ছড়িয়ে পড়েছে।

সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তাঁর বহু জ্ঞানগর্ভ কথা পাওয়া যায়। নিম্নে তার কিছু তুলে ধরা হলো :

একবার তিনি 'আতা' আল-খুরাসানীকে বলেন :[২৬]

كان العلماءُ قبلنا قد استَغْنَوْا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكـانوا لايلتفتـون إلى دنيـاهم، وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم فى علمهم، فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا عِلْمَهُمْ رغبةً فى دنياهم، وأصبح أهل الدنيا قد زهـدوا فـى علمـهم لـمارأوْا مـن سوء موضعه عندهم.

"আমাদের পূর্ববর্তীকালের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ নিজেদের জ্ঞান নিয়ে অন্যদের দুনিয়া থেকে মুখাপেক্ষীহীন থাকতেন। তাঁরা অন্যদের দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি দিতেন না। আর দুনিয়াদার লোকেরা জ্ঞানীদের জ্ঞানচর্চার পিছনে তাদের দুনিয়া ব্যয় করতো। আমাদের আজকের দিনের জ্ঞানীরা যখন দুনিয়াদার লোকদের দুনিয়া পাওয়ার লোভে তাদের জ্ঞান ব্যয় করেন তখন দুনিয়াদার লোকেরা জ্ঞানীদের এই নিকৃষ্ট অবস্থান প্রত্যক্ষ করে তাদের

---

২৪. তাহযীব আল-কামাল-১৯/৪৯০

২৫. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯১

২৬. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯২

দুনিয়া জ্ঞানীদের জ্ঞানচর্চার পিছনে ব্যয় করা ছেড়ে দিয়েছে।" তিনি একবার মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণে তিনি বলেন :[২৭]

احفظوا عنى ثلاثا : إيَّاكم وهوى متَّبَعًا، وقرين سوء وعجائب المرء بنفسه.

"আমার এই তিনটি কথা মনে রাখবে : অনুসৃত প্রবৃত্তি, খারাপ বন্ধু ও আত্ম-তুষ্টি– এই তিনটি জিনিস থেকে তোমরা দূরে থাকবে।"

আবদুস সামাদ বলেন, আমি ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহকে বলতে শুনেছি :[২৮]

دعِ المِراءَ وَالجِدال من أمرك، فإن لن يعجز أحد رُجلين : رجلٌ هو أعلمُ منك. فكيف تُعادى وتُجادل من هو أعلم منك؟ ورجلٌ أنت أعلم منه فكيف تعادى من أنتَ أعلمُ منه ولايُطيعُك؟ قلع عن ذلك.

"তোমার কোন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ পরিহার কর। কারণ দুই ব্যক্তিকে কখনো পরাভূত করা যায় না। এক ব্যক্তি যে তোমার চেয়ে বেশি জানে। যে তোমার চেয়ে বেশি জানে তার সাথে তুমি কিভাবে ঝগড়া ও শত্রুতা করবে? আরেক ব্যক্তি যার থেকে তুমি বেশি জান। সুতরাং তুমি যার থেকে বেশি জান, অথচ সে তোমাকে মানে না, তার সাথে তুমি ঝগড়া ও শত্রুতা করবে কিভাবে? সুতরাং তা থেকে বিরত থাক।"

আবূ সাল্লাম ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[২৯]

اَلعِلْمُ خَلِيْلُ الْمُؤْمِـنِ، وَالْحِلْمُ وَزِيْرُهُ. وَالْعَقْـلُ دَلِيْلُـهُ، وَالْعَمَلُ قَيِّمُـهُ، وَالصَّبْرُ أَمِيْرُ جُنُوْدِهِ، وَالرِّفْقُ أَبُوْهُ، وَاللِّيْنُ أَخُوْهُ.

"জ্ঞান মু'মিন ব্যক্তির বন্ধু, বিচক্ষণতা তার মন্ত্রী, বুদ্ধিমত্তা তার নির্দেশিকা, কর্ম তার তত্ত্বাবধায়ক, ধৈর্য তার বাহিনীর পরিচালক, দয়া-সহানুভূতি তার পিতা এবং কোমল আচরণ তার ভাই।"

তিনি সব সময় বলতেন :

المؤمن ينظر ليَعْلَمَ ويسكت، ويتكلم ليفهم، ويخلو ليغنم.

"মু'মনি ব্যক্তি দেখে শেখার জন্য এবং চুপ থাকে, কথা বলে বুঝার জন্য এবং নির্জনতা অবলম্বন করে সাফল্য লাভের জন্য।"

তিনি আরো বলেন :

الإيمان عُرْيان، ولباسه التقوى، وزينته الحياء، ومالُهُ الْفِقْهُ.

২৭. প্রাগুক্ত

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. প্রাগুক্ত

"ঈমান হলো একেবারে খোলামেলা পবিত্র বিষয়, তার পোশাক হলো আল্লাহভীতি, তার সাজ-শোভা হলো লজ্জা-শরম এবং তার সম্পদ হলো বিজ্ঞতা।"

একবার তিনি তাঁর এক সঙ্গীকে বললেন :[৩০]

ألا أعلّمك علمًا لايتعايا الفقهاءُ فيه؟ قال : بلى. قال : إن سُئِلْتَ عن شيء عندك فيه عِلْمٌ فأخبر بعلمك، وإلا فقل : لا ادرى.

"আমি কি তোমাকে এমন একটি জ্ঞান শিক্ষা দেব যে ব্যাপারে ফকীহগণ অক্ষম হননি? সে বললো : হা, দিন। বললেন : যদি কেউ তোমাকে এমন কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করে যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞানে আছে, তাহলে তুমি তোমার জ্ঞান অনুযায়ী তাকে অবহিত করবে, অন্যথায় বলবে : আমি জানিনে।"

'আমর ইবন 'আমির আল-বাজালী বলেন, ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ বলতেন :

ثلاثٌ كُنَّ فيه أصاب البرَّ : سخاوة النفس، والصبر على الأذى، وطيبُ الكلام.

"তিনটি জিনিস যার মধ্যে থাকবে সে সৎ গুণের অধিকারী হবে : অন্তরের উদারতা, কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ এবং মিষ্টি কথা বলা।"

'আব্বাস ইবন ইয়াযীদ বলেন, ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ বলতেন :

استكثر من الإخوان ما استطعت، فإنك إن استغنيتَ عنهم لم يَضُرُّوكَ وَإنْ إحْتَجْتَ إليهم نعفوك.

"যথা সম্ভব বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। তুমি যদি তাদের মুখাপেক্ষী না হও তাতে তারা তোমার কোন ক্ষতি করবে না, আর মুখাপেক্ষী হলে তারা তোমার উপকার করবে।"

তিনি বলতেন :

إذا اسمعت الرجل يمدحُك بما ليسَ فيك، فلا تَأْمَنْهُ أن يذُمَّكَ بما ليس فيك.

"যখন কোন ব্যক্তিকে তোমার মধ্যে নেই এমনগুণের কথা বলে তোমার প্রশংসা করতে শুনবে তখন তোমার মধ্যে নেই এমন দোষের কথা বলে তোমাকে নিন্দা না করার ব্যাপারেও তাকে আস্থাভাজন মনে করবে না।"

'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক বলেন, একবার এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললো, মানুষ এখন যেসব কাজ করছে, তাতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, তাদের সাথে আর মেলামেশা করবো না। তিনি বললেন না, এমন করবে না। মানুষ তোমার কাছে আসবে, তুমিও তাদের কাছে যাবে, তাদের তোমার কাছে প্রয়োজন আছে, তোমারও তাদের কাছে প্রয়োজন আছে। তবে তুমি তাদের মধ্যে থাকবে বধির শ্রোতা, অন্ধ চক্ষুষ্মান এবং নিরব বক্তা হিসেবে।

---

৩০. প্রাগুক্ত

জা'ফার ইবন বুরকান বর্ণনা করেন, ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্ বলতেন : সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য, যার নিজের দোষ তার ভাইয়ের দোষ চর্চা থেকে বিরত রেখেছে। সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে অক্ষম হওয়ার পূর্বে আল্লাহর কাছে নত হয়েছে। সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে কোন রকম পাপ-পঙ্কিলতা ছাড়া অর্জিত অর্থ-সম্পদ থেকে সাদাকা করে। সুসংবাদ ক্ষতিগ্রস্ত ও অক্ষমদের জন্য। সুসংবাদ তার জন্য যে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ লোকদের সাথে বসে। সুসংবাদ তার জন্য সুন্নাহ্ যাকে ধারণ করেছে, সুতরাং সে তার সীমা অতিক্রম করে না।"

আল-হায়ছাম ইবন 'আদী বলেন, ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্ বলতেন : "নির্বোধ ব্যক্তি যখন কথা বলে তখন তার নির্বুদ্ধিতা তাকে লজ্জিত করে, যখন চুপ থাকে তখন তার এই অক্ষমতাই তাকে লজ্জিত করে। কাজ করলে বিকৃত করে, পরিত্যাগ করলে বিনষ্ট করে। তার নিজের জ্ঞান যেমন তাকে সাহায্য করে না, তেমনি অন্যের জ্ঞানও তার কোন উপকারে আসে না। মা মনে করে তার সন্তানের মৃত্যু হয়েছে, স্ত্রী মনে করে স্বামীহারা হয়েছে। তার প্রতিবেশী তার থেকে একাকীত্ব কামনা করে, তার বন্ধুরা তার থেকে নির্জনতা অবলম্বন করে।" এরপর তিনি কবি মিসকীন আদ-দারিমীর নিম্নের শ্লোকগুলো আবৃত্তি করতেন।[৩১]

اتّقِ الأحمقَ أن تصحبه + إنما الأحمقُ كالثوب الخلَق

كلّمَا رَقّعتَ منه جانبًا + حركته الريحُ وهنًا فانخرق

أو كَصَدْع في زجاج فاحش + هل ترى صدْ ع زجاج يتفق

وإذا جالستَه في مجلس + أفسدَ المجلس منه بالخُرق

وإذا نَهنَهْتَه كي يرعوى + زاد جهلاً وتَمَادى في الحُمق.

"বোকা লোকের সাহচর্য থেকে দূরে থাক। বোকা লোক জীর্ণ পোশাকের মত। তুমি তার কোন একদিকে তালি লাগালে, বাতাসের দোলায় তার দুর্বল অংশ আবার ফেটে যাবে। অথবা সে কাঁচে ভাঙ্গনের মত। তুমি কি কাঁচের ভাঙ্গন জোড়া লাগতে দেখেছো? তুমি তার সাথে কোন সমাবেশে বসলে, সে তার বোকামী দ্বারা সমাবেশ নষ্ট করে দেবে। সতর্ক করার জন্য যদি তুমি তাকে নিষেধ কর তাহলে তার মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে এবং নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্তে পৌঁছাবে।"

তিনি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির চরিত্রের দশটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যেমন : বিচক্ষণতা, জ্ঞান, সঠিক পথপ্রাপ্ত হওয়া, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হওয়া, সকল পঙ্কিলতা থেকে নিজকে সংরক্ষণ করা, লজ্জা-শরম, গাম্ভীর্য, সর্বদা কল্যাণের উপর থাকা, মন্দ ও অকল্যাণ প্রত্যাখ্যান করা এবং যারা অকল্যাণের উপর থাকে তাদেরকে ঘৃণা করা, উপদেশ দানকারীর উপদেশ গ্রহণ ও তার আনুগত্য করা।" তারপর তিনি প্রত্যেকটি

৩১. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯৩-৪৯৪

বৈশিষ্ট্য থেকে বের হওয়া দশটি করে শাখা বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩২]

তিনি ছিলেন একজন সুরসিক ও উদার মনের মানুষ। সহজে রাগতেন না। ইবন 'আয়্যাশ বলেন, একবার আমি ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহর সাথে বসে আছি। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে ওয়াহাবকে বললো– আমি অমুক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনলাম, সে আপনাকে গালি দিচ্ছে। তার কথা শুনে ওয়াহাব রাগের সাথে বললেন :

أما وجد الشيطان رسولاً غيرك؟

"শয়তান কি তোমাকে ছাড়া আর কোন রাসূল (দূত) পায়নি?'

আমি সেখানে বসে থাকতেই সেই গালি দানকারী লোকটি আসে এবং সালাম দেয়। ওয়াহাব সালামের জবাব দিয়ে তার সাথে হাত মিলান এবং হাসিমুখে তার হাত ধরে নিজের পাশে বসান। বর্ণিত হয়েছে, চল্লিশ বছরের মধ্যে তিনি প্রাণ আছে এমন কোন কিছুকে গালি দেননি।[৩৩]

তিনি সাধারণত রাগতেন না, তবে অন্যায় কোন কিছু দেখলে রেগে যেতেন। সিমাক ইবন আল-ফাদল বলেন, একবার আমরা 'উরওয়া ইবন মুহাম্মাদের নিকট বসা ছিলাম। ওয়াহাব ছিলেন 'উরওয়ার পাশেই। এ সময় কিছু লোক এসে তাদের এলাকার শাসকের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ তুলে ধরলো। তার মধ্যে কিছু মন্দ কথাও ছিল। ওয়াহাব 'উরওয়ার হাতে থাকা লাঠিটি কেড়ে নিয়ে অভিযুক্ত শাসনকর্তার মাথায় সজোরে আঘাত করেন। তাতে তার মাথা কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। ওয়াহাবের এমন রাগ দেখে উরওয়া হাসতে হাসতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন। তারপর বলেন, আমরা রেগে যাই বলে আবূ 'আবদিল্লাহ ওয়াহাব দোষারোপ করেন, আর এখন তিনিই এভাবে রেগে গেলেন? বললেন : আমি না রেগে পারি কি করে? যিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার স্রষ্টা তিনিই তো রেগে যান। তিনি বলেন :

فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰهُمْ أَجْمَعِيْنَ.

"যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করলো, আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং ডুবিয়ে দিলাম তাদের সকলকে।[৩৪]

আল-জা'দ ইবন দিরহাম বলেন :[৩৫]

مَا كَلَّمْتُ عالما قط إلا غضب، وحل حَبْوَته غير وهب بن منبه.

"আমি যখনই কোন 'আলিমের সাথে কথা বলেছি তাকে রেগে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে দেখেছি। কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ।"

---

৩২. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯৮-৫০১

৩৩. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯০, ৪৯৩

৩৪. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯১

৩৫. প্রাগুক্ত-১৯/৪৯০

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (রহ)

মুহাম্মাদ-এর ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ, মতান্তরে আবূ বাকর এবং পিতার নাম ইসহাক। দাদা ইয়াসার ছিলেন 'আয়নুত তামার (عين التمر)-এর যুদ্ধবন্দীদের একজন। মুস'আব ইবন 'আবদিল্লাহ আয-যুবায়রী তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :[১]

يسار مولى عبد الله بن قيس، جد محمد بن إسحاق صاحب "المغازى" من سبى عين التمر، وهو أول سبى دخل المدينة من العراق.

"'আবদুল্লাহ ইবন কায়সের দাস ও 'আল-মাগাযী' রচয়িতা মুহাম্মাদ ইবন ইসহাকের দাদা ইয়াসার ছিলেন 'আয়নুত তামার-এর একজন যুদ্ধবন্দী। তিনি মদীনায় প্রবেশকারী ইরাকের প্রথম যুদ্ধবন্দী।" সম্ভবতঃ এ কারণে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি কায়স ইবন মাখরামা ইবন মুত্তালিব ইবন 'আবদু মান্নাফের দাস ছিলেন। ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তিনি ইবন ইসহাক নামে প্রসিদ্ধ। হিজরী ৮৫, খ্রীস্টাব্দ ৭০৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় বেড়ে ওঠেন। এ কারণে 'আল-মাদানী' বলা হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) মহান সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিকের দর্শন লাভে ধন্য হন। তিনি বলতেন :[২]

رأيت أنس بن مالك وعليه عمامة سوداء، والصبيان يشتدون ويقولون : هذا رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، لايموت حتى يلقى الدجال.

"আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) দেখেছি এমন অবস্থায় যে, তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি এবং শিশু-কিশোররা তাঁকে নিয়ে কোরাস করে গাইছে : ইনি নবীর (সা) একজন সাহাবী, দাজ্জালকে না দেখে মৃত্যুবরণ করবেন না।"

ইবন ইসহাক ছিলেন শ্রেষ্ঠ 'আলিম তাবি'ঈদের একজন। বিশেষতঃ তিনি মাগাযী ও সীরাত শাস্ত্রের একজন ইমাম ছিলেন। সীরাত অর্থ জীবনী এবং মাগাযী অর্থ যুদ্ধ-বিগ্রহ। তবে আল-মাগাযী ও আস-সীরাহ্ বলতে সাধারণত রাসূলে কারীমের (সা) জীবন চরিত ও তাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস বুঝায়।

তিনি ছিলেন মদীনার অধিবাসী। ইমাম যুহরীর (রহ) অন্যতম ছাত্র এবং মদীনাবাসী আরব ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রবীণতম ব্যক্তি। হাদীছ চর্চা ও বর্ণনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। পরবর্তীকালে 'আসিম ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন আবী বাকর ও যুহরীর (রহ) ন্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ 'আলিমগণের মজলিসে বসে জ্ঞানের পরিধি আরো বৃদ্ধি করেন। তিনি

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১৬/৭৩

২. প্রাগুক্ত-১৬/৭০; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৭২-১৭৩

তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহে এ তিনজনসহ অন্য মুহাদ্দিছদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বর্ণনা করেছেন। একমাত্র মদীনাবাসী প্রায় একশো রাবী (বর্ণনাকারী)-এর নাম উল্লেখ করেছেন যাঁদের নিকট থেকে তিনি তাঁর রচনাবলীর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন।

হিজরী ১১৫, খ্রীস্টাব্দ ৭৩৩ সনে ইবন ইসহাক ইসকান্দারিয়া যান এবং সেখানে ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব (মৃ. ১২৮/৭৪৫)-এর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন। এই ইয়াযীদ মিসরে সর্বপ্রথম হাদীছ চর্চার সূচনা করেন। এরপর ইবন ইসহাক আবার মদীনায় ফিরে আসেন। হি. ১২৩, খ্রীস্টাব্দ ৭৪১ সনে তাঁর শিক্ষক ইমাম যুহরীর সাথে কোন এক সাক্ষাতের সময় তিনি প্রিয় ছাত্র ইবন ইসহাককে উপস্থিত 'আলিমদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৩২/৭৪৯ সনে মদীনায় সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়নার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারপর তিনি মদীনা ত্যাগ করে যথাক্রমে কূফা, আল-জাযীরা, রায় ও বাগদাদে যান।

বাগদাদেই তিনি আমরণ অবস্থান করেন। 'আব্বাসীয় খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূরের খিলাফতকালে (১৩৬-১৫৮/৭৫৪-৭৭৫) আল-জাযীরার ওয়ালী ছিলেন (১৪২/৭৫৯) আল-'আব্বাস ইবন মুহাম্মাদ আল-'আব্বাসী। ইবন ইসহাক জাযীরায় অবস্থানকালে তাঁর সাথেও যোগাযোগ করেন।

ইমাম মালিক (রহ)সহ আরো কিছু 'আলিম তাঁর কিছু দোষ-ত্রুটির কথা বলে কঠোর সমালোচনা করেছেন। তবে দু'একজন ছাড়া অন্য সকল ইমাম ও হাদীছ বিশারদ তাঁর মুখস্থ শক্তি ও ধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে আস্থা ব্যক্ত করেছেন। আবূ যার'আ আবদুর রহমান ইবন 'আমর বলেন, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক এমন এক ব্যক্তি যাঁর থেকে হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে সুফইয়ান আছ-ছাওরী, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, হাম্মাদ ইবন যায়দ, হাম্মাদ ইবন সালামা, ইবনুল মুবারক, ইবরাহীম ইবন সা'দ (রহ) প্রমুখের মত 'আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীবের মত উঁচু স্তরের 'আলিম তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাদীছ বিশারদগণ তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সত্যবাদী ও সৎ মানুষ হিসেবে পেয়েছেন।[৩]

'আলিমদের স্বীকারোক্তি

শু'বা তাঁকে "আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীছ" (হাদীছ শাস্ত্রে বিশ্বাসীদের আমীর) বলতেন।[৪] লোকেরা যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করে যে, আপনি মুহাম্মাদ ইবন ইসহাককে এমন অভিধায় ভূষিত করেন কী কারণে? জবাবে তিনি বলেন : তাঁর মুখস্থ শক্তির কারণে।[৫] ইয়াযীদ ইবন হারূন বলতেন, যদি আমার হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকতো তাহলে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাককে মুহাদ্দিছগণের আমীর বানাতাম :

لو كان لى سلطان لأمّرت ابن اسحاق على المحدثين.

---

৩. তারীখু বাগদাদ-১/২২৪

৪. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৬/৭৮, ৮১; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৭৩

৫. তারীখু বাগদাদ-১/২২৪; তাবি'ঈন-৩৯৯

আবূ মু'আবিয়া তাঁকে أحفظ الناس (মানুষের মধ্যে সর্বাধিক হাদীছ মুখস্থকারী), ইয়াহইয়া ইবন মা'ঈন "ছিকা" (বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য) ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল "حسن الحديث" বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর বর্ণিত হাদীছ সাহীহ পর্যায়ের নয়, বরং তার পরবর্তী হাসান পর্যায়ের।[৬] আলী ইবন আল-মাদীনী বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছের কেন্দ্র ছিলেন ছয় ব্যক্তি, পরে এই ছয়জনের জ্ঞান বারোতে স্থানান্তরিত হয়। তাঁদের একজন হলেন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক :

قال علي بن المديني مَدَار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة، فذكرهم،
ثم قال : فصار علم الستَّةَ عند اثني عشر، أحدهم محمد بن اسحاق.[৭]

ইমাম যুহরীর কর্ম-পদ্ধতি

ইমাম যুহরী (রহ) ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাকের উস্তাদ। ছাত্রের জ্ঞানের উপর তাঁর এত পরিমাণ আস্থা ছিল যে, তিনি বলতেন :[৮]

لا يزال بالمدينة علم جمٌّ ما كان فيهم ابن اسحاق.

"যতদিন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক আছে ততদিন মদীনাবাসীদের মধ্যে জ্ঞান থাকবে।" তিনি যখন মদীনার বাইরে কোথাও যেতেন তখন মুহাম্মাদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। একবার তিনি মদীনার বাইরে কোথাও যাওয়ার ইরাদা করলেন। জ্ঞান পিপাসুদের অনেকে তাঁর সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি এই নও-জোয়ান ইবন ইসহাককে তোমাদের মধ্যে রেখে যাচ্ছি। তাঁর এই স্থলাভিষিক্তি যুহরীর (রহ) শিষ্য-শাগরিদদের মধ্যে স্বীকৃত ছিল। এ কারণে যুহরীর মৃত্যুর পর তাঁর বর্ণনাসমূহের সত্যায়নের জন্য মানুষ ইবন ইসহাকের নিকট যেত।[৯] ইবন 'উয়াইনা বলেন, ইবন ইসহাকের প্রতি কেউ কোন দোষারোপ করেছে এমন কাউকে আমি দেখিনি।[১০]

ইমাম যুহরী (রহ) তাঁর বাড়ীর দারোয়ানকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, ইবন ইসহাক যখনই আসবে তাকে যেন ঢুকতে দেওয়া হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যুহরীর নিকট ইবন ইসহাকের স্থান কী ছিল। একবার ইবন ইসহাক নিয়মের চেয়ে একটু দেরীতে আসলেন। যুহরী (রহ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : কোথায় ছিলে? ইবন ইসহাক বললেন : দারোয়ানদের কারণে কেউ কি আপনার নিকট আসতে পারে? যুহরী সাথে সাথে দারোয়ানকে ডেকে বলেন দেন, ইবন ইসহাক যখনই আসুক তাকে ঢুকতে বাঁধা দেবে না।[১১]

---

৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৭৩
৭. তারীখু বাগদাদ-১/২২৪; তাহ্যীব আল-কামাল-১৬/৭৪
৮. প্রাগুক্ত
৯. ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান-১/৪৮৪; তাবি'ঈন-৩৯৯
১০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৭৩
১১. তারীখু বাগদাদ-১/২১৯; তাহ্যীব আল-কামাল-১৬/৭৪

ইমাম মালিক ও হিশামের সমালোচনা এবং তার কারণ

মনীষীদের এত প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ সত্ত্বেও ইবন ইসহাক ইমাম মালিক ও হিশামের কঠোর সমালোচনার মুখোমুখীও হয়েছেন। বিশেষতঃ তাঁর সম্পর্কে ইমাম মালিকের মতামত ছিল অত্যন্ত কঠোর। এমনকি তিনি তাঁর সম্পর্কে অনেক অশোভন শব্দও ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি একবার ইবন ইসহাক সম্পর্কে বলেন : انظروا إلى دجال من الدجاجلة 'তোমরা দাজ্জালদের মধ্য থেকে একজন দাজ্জালকে দেখ।' এ বাক্যে তিনি মুহাম্মাদ ইবন ইসহাককে দাজ্জাল বলেছেন। হিশামও তাঁকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন না। তবে মুহাদ্দিছগণ নিজেরাই তাঁদের দু'জনের এমন কঠোর সমালোচনার কারণ বলে দিয়েছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ মোটামুটি এ রকম :

হাদীছ গ্রহণে ইমাম মালিক এত কঠোর এবং যাচাই-বাছাইয়ে তাঁর নীতিমালা এত উঁচুমানের ছিল যে, কারো মধ্যে সামান্য দোষ-ত্রুটি দেখলে তিনি তার সমালোচনায় অতি কঠোর শব্দ উচ্চারণে কোন রকম দ্বিধা করতেন না। খতীব আল-বাগদাদী লিখেছেন, কিছু 'আলিম এ রকম বলেছেন যে, সত্যনিষ্ঠ, দীনদার, মুত্তাকী, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ইমাম মালিকের এমন কঠোর ভাষা প্রয়োগের জন্য সমকালীন বহু 'আলিম তাঁরও সমালোচনা করেছেন।[১২] ইবরাহীম ইবন আল-মুনযির বলেন : ইবন আবী যি'ব, 'আবদুল 'আযীয আল-মাজিশূন, ইবন আবী হাযিম ও মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক– এঁদের প্রত্যেকে মালিক ইবন আনাসের সমালোচনা করেছেন। তবে সবচেয়ে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক। তিনি বলতেন :[১৩]

ائتوني ببعض كتبه حتى أبين عيوبه، أنا بيطار كتبه.

"তোমরা তাঁর কিছু বই আমার কাছে নিয়ে এসো, যাতে আমি তাঁর কিছু দোষ-ত্রুটির বর্ণনা দিতে পারি। আমি তাঁর পুস্তকসমূহের চিকিৎসক।" এই প্রেক্ষাপটে ইমাম মালিক যদি ইবন ইসহাক সম্পর্কে কিছু রূঢ় শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন তাতে তাঁর নির্ভরযোগ্যতায় বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারে না।

তৃতীয় কারণ এই যে, ইবন ইসহাক গাযওয়া বা রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা গ্রহণের ব্যাপারে তেমন বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতেন না। এ কারণে ইমাম মালিক তাঁর আল-মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) বিষয়ক বর্ণনার সমালোচনা করতেন। তবে আল-মাগাযী ছাড়া ইবন ইসহাক বর্ণিত অন্যসব হাদীছের সাথে এই সমালোচনার কোন সম্পর্ক ছিল না। ইবন হিব্বান বলেন, ইমাম মালিক একবার মাত্র ইবন ইসহাক সম্পর্কে রূঢ় শব্দ প্রয়োগ করেন। তারপর তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর সাথে আচরণ করতেন। ইমাম মালিক তাঁর হাদীছের কারণে নয়, বরং মাগাযীর কারণে তাঁর সমালোচনা করতেন। কারণ, ইবন ইসহাক খায়বারসহ আরো কিছু যুদ্ধের বিবরণ ইয়াহূদীদের নও-মুসলিম সন্তানদের নিকট

---

১২. তারীখু বাগদাদ-১/২২৩

১৩. ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান-১/৪৮৩; তাহ্যীব আল-কামাল-১৬/৭৬; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১৭৩

থেকে শুনে গ্রহণ করতেন। আর তারা আবার সেই সব বিবরণ দিত তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষের সূত্রে। যদিও ইবন ইসহাক এসব বর্ণনা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতেন না। তবে ইমাম মালিক পরম বিশ্বাসভাজন ও আস্থাশীল ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কোন বর্ণনা গ্রহণ করা মোটেই সমীচীন মনে করতেন না।[১৪]

কিছু 'আলিম বলেছেন, ইমাম মালিকের সমালোচনা মাগাযীর জন্য নয়, বরং তাঁর 'আকীদার (বিশ্বাস) জন্য ছিল। 'আবদুর রহমান ইবন 'আমর আন-নাসরী বলেন, আমি দুহাইমের সামনে ইবন ইসহাক সম্পর্কে ইমাম মালিকের সমালোচনার প্রসঙ্গটি উঠালাম। তিনি বললেন, এটা হাদীছের কারণে ছিল না, বরং তা এজন্য ছিল যে, ইমাম মালিক ইবন ইসহাককে কাদরিয়াদের আকীদায় বিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করতেন।[১৫] যাই হোক, উপরে উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা এতটুকু জানা গেছে যে, ইবন ইসহাকের অগ্রহণযোগ্যতা ও দুর্বলতা ইমাম মালিকের কঠোর সমালোচনার কারণ ছিল না। এর কারণ ছিল অন্য কিছু। এ কারণে এ সমালোচনার প্রভাব ইবন ইসহাক বর্ণিত হাদীছের উপর পড়তে পারে না। এজন্য ইমাম মালিক ছাড়া অন্য সকল ইমাম ও 'আলিম তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। এমনকি ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ), যিনি 'আকীদার ক্ষেত্রে কঠোরতার ব্যাপারে ইমাম মালিক থেকে কোন অংশে কম ছিলেন না, ইবন ইসহাকের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের (রহ) পুত্র আবদুল্লাহ একবার মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক সম্পর্কে এক ব্যক্তির একটি জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন, আমার পিতা তাঁর বর্ণনাসমূহ যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করতেন এবং মুসনাদে স্থান দিতেন। তবে সুনানের ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতেন না।

ইমাম মালিকের (রহ) পরে ইবন ইসহাকের কঠোর সমালোচকদের মধ্যে দ্বিতীয় আরেকটি নাম হিশাম। তাঁর এমন অবস্থানের রহস্য হলো, ইবন ইসহাক হিশামের স্ত্রী ফাতিমা বিনত মুনযিরের সূত্রে কিছু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলতেন, আমার স্ত্রী ফাতিমা একজন পর্দানশীন মহিলা, তার নয় বছর বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন বেগানা পুরুষ তাঁকে দেখেনি। তাহলে ইবন ইসহাক তার থেকে হাদীছ শোনেন কিভাবে? তবে অনেক মুহাদ্দিছের মতে শুধু একথার ভিত্তিতে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাকের বর্ণনাসমূহকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করা সঠিক নয়। কারণ, তিনি তো পর্দার আড়াল থেকে শুনে থাকতে পারেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) হিশামের এ বক্তব্য বর্ণনার পর মন্তব্য করেছেন এ ভাষায় :[১৬]

وقوله وهی بنت تسع غلط بین لأنها أكبر من هشام بثلاث عشرة سنة وكان أخذ

---

১৪. তাহযীব আত-তাহযীব-৯/৪৫

১৫. তারীখু বাগদাদ-১/২২৪; তাহযীব আল-কামাল-১৬/৭৭

১৬. তাহযীব আত-তাহযীব-৯/৩৯, ৪০

ابن إسحاق عنها وقد جاوزت الخمسين وقد روى عنها أيضا غير محمد بن إسحاق من الغرباء محمد بن سوقة.

"হিশাম যে তাঁর স্ত্রী নয় বছর বয়সের কথা বলেন, তা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, হিশামের চেয়ে তাঁর স্ত্রী তের বছরের বড়। ইবন ইসহাক যখন তাঁর নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করেন তখন হিশামের স্ত্রীর বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে। ইবন ইসহাক ছাড়াও মুহাম্মাদ ইবন সূকা'র মত বেগানা পুরুষরাও তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।"

ইবন হিব্বান তাঁর "الثقات" গ্রন্থে বলেন :[১৭]

تكلم فيه رجلان هشام ومالك، فأما قول هشام فليس مما يجرح به الانسان وذلك أن التابعين سمعوا من عائشة من غير أن ينظروا إليها، وكذلك ابن إسحاق كان يسمع من فاطمة والستر بينهما مسبل.

"মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক সম্পর্কে ইমাম মালিক ও হিশাম– দু'ব্যক্তিই কথা বলেছেন। তবে হিশামের কথায় কোন মানুষ অভিযুক্ত হতে পারে না। কারণ, অসংখ্য তাবি'ঈ উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) প্রতি দৃষ্টিপাত না করে পর্দার আড়াল থেকে তাঁর কথা শুনতেন। একইভাবে ইবন ইসহাকও ফাতিমার কথা শুনে থাকবেন।"

'আলী ইবন আল-মাদীনী বলেন :[১৮]

الذى قال هشام ليس بحجة، لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها.

"হিশাম যা বলেছেন তা কোন দলীল হতে পারে না। সম্ভবতঃ তিনি (ইবন ইসহাক) তাঁর স্ত্রীর নিকট অপ্রাপ্ত বয়সে গিয়েছেন এবং তাঁর থেকে হাদীছ শুনেছেন।

ইবন ইসহাকের শায়খগণ

ইবন ইসহাক ছিলেন ইমাম যুহরীর (রহ) খাস শাগরিদ। তবে তিনি ছাড়া আরো অনেক শায়খের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। যেমন তাঁর শায়খদের মধ্যে তাঁর পিতা ইসহাক, চাচা মূসা, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আমর, মু'আইদ ইবন কা'ব ইবন মালিক, মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আত-তায়মী, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর (রা), মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার ইবন যুবায়র, 'আসিম ইবন 'আমর ইবন কাতাদা, 'আব্বাস ইবন সাহ্ল ইবন সা'দ, ইবন মুনকাদির, মাকহূল, ইবরাহীম ইবন 'উকবা, হুমায়দ আত-তাবীল, সালিম আবী আন-নাদার, সা'ঈদ মুকরী, সা'ঈদ ইবন আবী হিন্দ, আবূ আয-যানাদ, 'আবদুর রহমান ইবন আসওয়াদ আন-নাখা'ঈ, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ, 'ইকরিমা ইবন খালিদ, 'আলা' ইবন 'আবদির রহমান, 'আমর ইবন শু'আয়ব,

---

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. তাহ্যীব আল-কামাল-১৬/৭৮

নফি', আবূ জা'ফার আল-বাকির, ফাতিমা বিন্ত আল-মুনযির (রহ) প্রমুখের মত বড় আলিমগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জামাল উদ্দীন আল-মিযযী তাঁর ১২২ (একশত বাইশ) জন শায়খের নাম উল্লেখ করেছেন।[১৯]

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের তালিকা অতি দীর্ঘ। এখানে কিছু বিশিষ্ট ছাত্র যাঁরা তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো :

জারীর ইবন হাযিম, 'আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ ইবন 'আওন, ইবরাহীম ইবন সা'দ, শু'বা ইবন আল-হাজ্জাজ, ইবন 'উয়ায়না, ইবন মু'আবিয়া, 'আবদুল্লাহ ইবন ইদরীস, আবূ 'আওয়ানা, 'আবদুল আ'লা আশ-শামী, 'আবদুহু ইবন সুলায়মান, জারীর ইবন 'আবদিল হামীদ, যিয়াদ আল-বাক্কা'ঈ, হাম্মাদ ইবন যায়দ, সালামা ইবন আল-ফাদল, মুহাম্মাদ ইবন সালামা আল-হাররানী, ইউনুস ইবন বুকাইর, ইয়াযীদ ইবন হারূন, আহমাদ ইবন খালিদ, ইয়া'লা ইবন উবায়দ, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-উমাবী, ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব আল-মিসরী, ইউনুস ইবন বুকাইর আশ-শায়বানী, ইয়া'লা ইবন 'উবায়দ আত-তানাফুসী, হারূন ইবন মূসা আন-নাহবী, 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারাক (রহ) ও আরো অনেকে।[২০]

সীরাত ও মাগাযী

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাকের অধ্যয়নের আসল ক্ষেত্র ছিল মাগাযী ও সীরাত শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের তিনি একজন ইমাম ছিলেন। ইমাম যাহাবী বলেন :[২১]

كان أحد أوعية العلم حبرا فى معرفة المغازى والسير.

'তিনি মাগাযী ও সীরাত বিদ্যায় ছিলেন একজন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি।'

ইমাম শাফি'ঈ (রহ) বলতেন, কেউ যদি মাগাযী শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চায় তাকে ইবন ইসহাকের মুখাপেক্ষী হতে হবে।[২২] খতীব বাগদাদী লিখেছেন, তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি এই বিদ্যার দিকে দৃষ্টি দেন এবং এত সমৃদ্ধি ঘটান যে, তাঁর পরে আর কেউ তাতে কোন কিছু সংযোজন করতে পারেননি। তিনি আমীর-উমারা ও শাসক শ্রেণীর দৃষ্টি ফলাফল শূন্য ও অর্থহীন কিস্‌সা-কাহিনী থেকে প্রকৃত ইতিহাসের দিকে ফিরিয়ে দেন। এভাবে তিনি সর্বপ্রথম ইতিহাস চর্চার রুচি সৃষ্টি করেন। শাসকদের রুচির পরিবর্তন ঘটানো, অর্থহীন গ্রন্থ ও কিস্‌সা-কাহিনীর চর্চা থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) মাগাযী, সুন্নাহ এবং বিশ্বের উৎপত্তির ইতিহাসের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া

---

১৯. প্রাগুক্ত-১৬/৭২; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৭২; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যব-৯/৩৯

২০. প্রাগুক্ত

২১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৭৩

২২. তারীখু বাদগাদ-১/২১৫

ছাড়া আর কোন কিছুই যদি তিনি না করতেন তাহলে এই একটি মাত্র কাজ তাঁর পথিকৃৎ ও শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবজনক আসন লাভের জন্য যথেষ্ট ছিল। তাঁর পরে আরো অনেকে এই শাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু কেউ তাঁর সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি।[২৩] যে ইমাম যুহরীর নিকট থেকে তিনি এ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন, তিনিও এ ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন।[২৪]

ইতিহাস

যদিও মাগাযী ও সীরাত ইতিহাসেরই একটি শাখা, তবে ইবন ইসহাক সাধারণ ইতিহাসেরও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। খতীব বাগদাদী বলেন, তিনি সীরাত, মাগাযী, আরবের অতীত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঘটনাবলী, মানব জাতির উৎপত্তি এবং নবীদের কিস্সা-কাহিনীরও 'আলিম ছিলেন।[২৫]

আল-মাগাযী বিষয়ে লেখালেখির সূচনা হয় কখন?

এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, হিজরী প্রথম শতকে 'তাদবীনে হাদীছ' তথা হাদীছ লেখালেখির কাজ শুরু হয় এবং দ্বিতীয় শতকে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। হাদীছ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণের সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীও লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। এগুলোকে পৃথকভাবে 'আল-মাগাযী' নামে বিন্যস্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি দেখা দিতে পারে তা হলো, সীরাত ও মাগাযী লেখার সূচনা হলো কীভাবে? এ শাস্ত্রটি কি হাদীছ শাস্ত্রের সাথে অথবা পৃথকভাবে গড়ে ওঠে? এ ব্যাপারে প্রাচ্যবিদদের ধারণা হলো, হাদীছ শাস্ত্র ছিল একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় এবং সীরাত ও মাগাযী ছিল তারই একটি অংশ বিশেষ। তবে কিছু মুসলিম ঐতিহাসিকের রয়েছে ভিন্ন মত। তাঁরা বলেন ঃ সীরাত ও মাগাযীর উৎপত্তি হয় সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে এবং হাদীছ শাস্ত্রের পাশাপাশি স্বতন্ত্রভাবে তা উন্নতি লাভ করে। সম্ভবতঃ এ মতপার্থক্যের কারণ হলো, প্রাথমিক যুগে সীরাত ও মাগাযী লেখকরা হাদীছ শাস্ত্রেরও আলিম ছিলেন এবং তাঁদেরকেও 'মুহাদ্দিছ' বলা হতো। তাঁরা হাদীছ ও মাগাযী বিষয়ক তথ্য একই রকম গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সাথে সংগ্রহ করতেন। সীরাত ও মাগাযী বিষয়ক তথ্য প্রথম থেকেই সংগ্রহ করার ঝোঁক সাহাবা ও তাবি'ঈদের মধ্যে ছিল। সুতরাং তাঁরা এ বিষয়ের তথ্য হাদীছ থেকে স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রহ করেন। একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে, সীরাত ও মাগাযীর রাবীগণের যদিও হাদীছে পারদর্শিতা ছিল, তবে তাঁদের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা খুবই কম। মুহাদ্দিছ হিসেবেও তাঁরা তেমন খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি।[২৬]

---

২৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৪৪

২৪. তারীখু বাগদাদ-১/২১৯; তাবি'ঈন-৪০৩

২৫. প্রাগুক্ত

২৬. ড. মাহমুদুল হাসান, আরবূঁ মে তারীখ নিগারী কি নাশ্ ও নামা (ইসলাম আওর আসরে জাদীদ, খণ্ড-১. ১৯৬৭)

তাঁর রচনাবলী

তিনি ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইবন নাদীম বলেন ঃ[২৭]

وله من الكتب، كتاب الخلفاء رواه عنه الأموى، كتاب السيرة والمبتداء والمغازى.

'তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ আছে। 'কিতাবুল খুলাফা' গ্রন্থটি তাঁর থেকে 'উমাবী বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আছে 'কিতাবুস সীরাহ্ ওয়াল মুবতাদা ওয়াল মাগাযী।'

তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রাচীনতম রচনাটি হলো সীরাত গ্রন্থটি। বহুকাল যাবত গ্রন্থটি দুস্প্রাপ্য। তবে এ গ্রন্থের সকল বর্ণনা এখনো বিদ্যমান আছে। ইবন হিশামের সীরাতের সবচেয়ে বড় উৎস এই সীরাত। এ কারণে তাঁর সকল বর্ণনা এতে সংরক্ষিত হয়েছে। ইবন হিশামের বর্তমান সীরাত গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে ইবন ইসহাকের সীরাতের সংক্ষিপ্ত রূপ।

ইবন ইসহাক তাঁর এই গ্রন্থটি আব্বাসীয় খলীফা আল-মাহদীর ছেলের জন্য লেখেন। একবার তিনি খলীফা আল-মাহদীর দরবারে যান। তখন সেখানে খলীফার এক ছেলেও উপস্থিত ছিল। খলীফা নিজের ছেলের প্রতি ইঙ্গিত করে ইবন ইসহাককে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি একে চেনেন? তিনি বলেন : আমীরুল মু'মিনীনের ছেলে। খলীফা অনুরোধ করেন, তিনি যেন তাঁর এ ছেলের জন্য এমন একখানি গ্রন্থ রচনা করেন যাতে আদমের সৃষ্টি থেকে তাঁর সময় পর্যন্ত পৃথিবীর সকল ঘটনার বিবরণ থাকে। এই নির্দেশ অনুযায়ী তিনি এক বৃহদাকৃতির গ্রন্থ রচনা করে খলীফার সামনে উপস্থাপন করেন। গ্রন্থটির কলেবর দেখে তিনি বলেন, এ তো অনেক বড় গ্রন্থ। এটাকে একটু সংক্ষিপ্ত করুন। তিনি সেটা সংক্ষেপ করেন। প্রথম গ্রন্থটি খলীফা আল-মাহদীর গ্রন্থাগারে রাখা হয়।[২৮] তবে ইবন সা'দ বলেন, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক হীরায় আব্বাসীয় খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূরের নিকট আসেন এবং তাঁর জন্যই তিনি "আল-মাগাযী" রচনা করেন।[২৯]

তাঁর সীরাত ও মাগাযী

খলীফা আল-মানসূর ১৪৬/৭৬৩ সনে নতুন রাজধানী বাগদাদে যাওয়ার পূর্বে হীরায় অবস্থানকালে ইবন ইসহাক তাঁর আল-মাগাযী গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত করে তাঁর নিকট পাঠান। এ বর্ণনা দ্বারা কোনভাবেই বুঝা যায় না যে, তিনি কোন খলীফার নির্দেশে তাঁর আল-মাগাযী রচনা করেন। তাছাড়া তাঁর রাবী (বর্ণনাকারী)-দের তালিকা দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মদীনা ও মিসরে অবস্থানকালে যে সকল হাদীছ সংগ্রহ করেন তারই ভিত্তিতে আল-মাগাযী সংকলন করেন। তিনি কোন ইরাকী রাবীর নাম উল্লেখ

---

২৭. ইবন নাদীম, আল-ফিহ্রিস্ত-১৩৬

২৮. তারীখু বাগদাদ-১/২২১

২৯. তাবাকাত-৭/২৭; তাহ্যীব আল-কামাল-১৬/৮১

করেননি। এতেও স্পষ্ট হয় যে, তিনি শেষ বারের মত মদীনা ত্যাগের পূর্বে গ্রন্থখানির রচনা সমাপ্ত করেন।[৩০]

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ইবন ইসহাকের আল-মাগাযী গ্রন্থখানা অথবা সঠিক অর্থে তাঁর অংশ বিশেষ 'আরবী খিযানা' তথা গ্রন্থ ভাণ্ডার থেকে হারিয়ে যাওয়া এবং ৫০৬/১১১২ সনে লিখিতভাবে তাঁর অংশ বিশেষ ফাসের 'কারাবী' খিযানায় প্রাপ্তি, গ্রন্থখানা সম্পর্কে আমাদের সার্বিক অবগতির ক্ষেত্রে একটি শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। তবে ইবন হিশাম (মৃ. ২১৮/৮২৮) 'সীরাতুন্নাবী (সা)' নামে ইবন ইসহাকের গ্রন্থখানা সংক্ষেপে করে একটি মহৎ কাজ সম্পাদন করেন।

তিনি ইবন ইসহাকের অন্যতম প্রসিদ্ধ ছাত্র 'বাক্কাঈ' (মৃ. ১৮৩/৭৯৯)-এর বর্ণনা থেকে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাবারীসহ ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা অংশসমূহ জোড়া দিয়ে মূল গ্রন্থটির পদ্ধতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট চিত্র অংকনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

ইবন ইসহাকের মূল গ্রন্থে ইবন হিশাম যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তা তিনি 'সীরাতুন্নাবী'র ভূমিকায় স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। যেমন আদম (আ) থেকে ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত আহলি কিতাবদের ইতিহাস তিনি পরিত্যাগ করেছেন। আমাদের মহানবীর (সা) প্রত্যক্ষ উর্ধ্বতন পুরুষগণ ছাড়া ইসমা'ঈলের (আ) বংশধরদের আলোচনা বাদ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি ইবন ইসহাক বর্ণিত এমন সব কাহিনী বাদ দিয়েছেন যাতে নবী কারীম (সা) সম্পর্কে কোন কথা নেই, সে কাহিনীর আল-কুরআনে কোন ইঙ্গিত নেই এবং গ্রন্থে বর্ণিত অন্য কোন ঘটনার সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক নেই। গ্রন্থটির সংক্ষিপ্তকরণই এ বাদ দেওয়ার প্রধান কারণ। অন্যান্য কারণেও আরো কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন। যেমন কিছু প্রাচীন আরবী কবিতা যা পণ্ডিতদের নিকট অপরিচিত, কিছু তথ্য যা ব্যক্তি বিশেষের জন্য পীড়াদায়ক অথবা তাদের প্রতি পাঠকের মধ্যে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া কিছু তথ্য ইবন ইসহাকের গ্রন্থে ছিল কিন্তু বাক্কাঈ তা ভুলে গেছেন, ফলে ইবন হিশাম তা পাননি।

ইবন হিশাম বহু কিছু সংশোধন এবং আরব বংশ পরিচয় ও ভাষার ক্ষেত্রে অনেক কিছু সংযোজনও করেছেন। সে সবের প্রতি যথাস্থানে ইঙ্গিতও করেছেন। তবে তিনি মূল পাঠে কোন রকম পরিবর্তন করেননি। যেখানে তিনি কোন কিছু পরিবর্তন ও সংক্ষিপ্ত করেছেন বা বাদ দিয়েছেন সেখানে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তবে ইবন হিশামের সংক্ষিপ্তকরণের ফলে জ্ঞানের জগতে যে ক্ষতি হয়েছে তা আমরা পুষিয়ে নিতে পারি প্রাচীন আরবী গ্রন্থরাজির বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ইবন ইসহাকের গ্রন্থখানির অংশ বিশেষ একত্র করে পাঠের মাধ্যমে। ইমাম আত-তাবারী তাঁর বিখ্যাত তারীখ ও তাফসীর

---

৩০. আল-মাগাযী আল-উলা ওয়া মুয়াল্লিফূহা-৭৫-৮১

গ্রন্থদ্বয়ে ইবন ইসহাকের সীরাত গ্রন্থের 'আল-মুবতাদা' (সূচনাপর্ব) অধ্যায়ের পরিচ্ছেদগুলোর বহু অংশ বিশ্ববাসীর জন্য সংরক্ষণ করেছেন। অন্যদিকে আল-আযরুকী তাঁর 'আখবারু মাক্কাহ' গ্রন্থে ইবন হিশাম কর্তৃক বাদ দেওয়া অনেক খবরই ধরে রেখেছেন। ইবন হিশামের ভূমিকার মাধ্যমে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আল-মাগাযী অধ্যায় থেকে যা বাদ পড়েছে তা অতি সামান্য, পক্ষান্তরে 'আল-মুবতাদা' অধ্যায় থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ বাদ পড়েছে। তবে এ ক্ষতি পূরণ করার ক্ষেত্রে আত-তাবারীর অবদান অন্য সকলকে অতিক্রম করে গেছে।

যদি আমরা বিভিন্ন গ্রন্থে সংরক্ষিত বিক্ষিপ্ত অংশসমূহের প্রতি যত্নবান হই, তাহলে ইবন ইসহাকের গ্রন্থটির নিম্নের চিত্র দেখতে পাই। ইবন ইসহাক তাঁর 'আল-মাগাযী' প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত একটি পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন এবং তা তিনটি বিষয় বস্তুতে বিন্যাস করেছেন। যেমন :

১. আল-মুবতাদা

২. আল-মাব'আছ

৩. আল-মাগাযী

১. আল-মুবতাদা

এ অধ্যায়ে ইবন ইসহাক জাহিলী যুগের আরবের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। তিনি এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু চারটি পরিচ্ছেদে সাজিয়েছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে প্রাক-ইসলামী যুগের ওহী, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইয়ামনের ইতিহাস, তৃতীয় পরিচ্ছেদে আরবগোত্রসমূহ ও তাদের মূর্তি পূজা এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমাদের মহানবী (সা)-এর প্রত্যক্ষ পূর্ব পুরুষ ও মক্কার ধর্মসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ের সনদের উপর নির্ভরতা খুবই কম।

২. আল-মাব'আছ

এ অধ্যায়ে ইবন ইসহাক দু'টি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে নবী কারীমের (সা) মাক্কী জীবন এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হিজরাত ও মদীনায় প্রথম বছরের কর্মতৎপরতার বিবরণ এসেছে। মাব'আছ অধ্যায়ে যে বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষণীয় তা হলো পূর্ববর্তী অধ্যায়ের তুলনায় সনদের আধিক্য এবং বিশেষভাবে ইবন ইসহাকের মাদানী শিক্ষকদের বর্ণনার উপর নির্ভরতা, যা তিনি সন ভিত্তিক বিন্যাস করেছেন।

এ অংশে সনদ ছাড়া অথবা সনদ সহকারে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনার পাশাপাশি মদীনার বিভিন্ন গোত্রের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) বিখ্যাত চুক্তিগুলো, যা মদীনার সামাজিক বিধি-বিধান নামে আখ্যায়িত, সে সম্পর্কে ইবন ইসহাক সংগৃহীত দলিল-প্রমাণাদি পাওয়া যায়। এতে আরো পাওয়া যায় একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা, যার কিছু অংশে রয়েছে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের নাম, কিছু অংশে হাবশার মুহাজিরদের ও প্রথম যুগের আনসারদের নাম ইত্যাদি। এভাবে দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হয়েছে।

৩. আল-মাগাযী

ইবন ইসহাক তাঁর আল-মাগাযীতে মদীনায় মুশরিক গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে নবী কারীমের (সা) প্রথম যুদ্ধের আহ্বান থেকে তাঁর ওফাত পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এ অংশে তিনি মহানবীর (সা) অন্তিম রোগ ও ওফাতের বিবরণ ছাড়া আর কিছু বিস্তারিত বর্ণনা করেননি। তবে এ অংশে সব কিছুই সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধগুলো বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। আলোচ্য বিষয়ের সারকথা ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। আল-মাগাযীতে নামের তালিকার সংখ্যাও অনেক। যেমন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, নিহত, আহত ও বন্দী ব্যক্তিবর্গের তালিকা। অনুরূপ তালিকা দিয়েছেন উহুদ, খন্দক, খায়বার, মূতাসহ বিভিন্ন যুদ্ধেরও। হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজিরদেরও ভিন্ন একটি তালিকা তিনি দিয়েছেন।

একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইবন ইসহাক তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় অংশের নামে সম্পূর্ণ গ্রন্থটির নামকরণ করেন– আল-মাগাযী। এরপর নামটির এত প্রসিদ্ধি ঘটে যে, পরবর্তীকালে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাত লেখক তাঁদের রচিত রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনীকে এ নামে নামকরণ করেছেন।

ইবন ইসহাকের আল-মাগাযী যে এক বিরাট কর্মকাণ্ড সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বিভিন্ন বর্ণনা ও খবর সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি তাঁর সবটুকু শ্রম ব্যয় করেছেন। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সকল রাবী ও সূত্রের উল্লেখসহ সকল খবর লিপিবদ্ধ করেছেন। এ গ্রন্থে ইবন ইসহাকের সংকলন ও বিন্যাসের অসাধারণ ক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনিই সর্বপ্রথম সীরাত বিষয়ক ঘটনাবলী ইতিহাসের পদ্ধতিতে একের পর এক সাজান। তাঁর পূর্বে আর কেউ এমনভাবে সাজাননি। এসব কারণে তিনি সীরাত ও মাগাযী রচনায় পথিকৃতের স্থান দখল করে আছেন। আবূ আহমাদ ইবন 'আদী বলেন :[৩১]

وقد روى "المغازى" إبراهيم بن سعد وسلمة بن الفضل ومحمد بن سلمة ويحيى بن سعيد الأموى وسعيد بزيغ وجرير بن حازم وزياد البكائى وغيرهم. وقد روى عنه "المتبدأ" و"المبعث"،ولو لم يكن لابن اسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لايحصل منها شئ إلى الاشتغال بمغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومبتدأ الخلق لكانت هذه فضيلة سبق بها ابن إسحاق، ثم من بعده صنفها قوم آخرون فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها.

"তাঁর থেকে "আল-মাগাযী" বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবন সা'দ, সালামা ইবন আল-ফাদল, মুহাম্মাদ ইবন সালামা, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-উমাবী, সা'ঈদ ইবন বাযীগ, জারীর ইবন হাযিম, যিয়াদ আল-বাক্কাঈ ও আরো অনেকে। তিনি "আল-মুবতাদা" ও

৩১. তাহ্যীব আল-কামাল-১৬/৮২

"আল-মাব'আছ" আল-বাক্কাঈ থেকে বর্ণনা করেছেন। কোন কিছুই অর্জিত হয় না–এমন সব গ্রন্থ পাঠের ব্যস্ততা থেকে রাজা-বাদশাদেরকে সরিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) আল-মাগাযী, আল-মাব'আছ ও আল-মুবতাদা (পৃথিবীর সূচনা) পাঠের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজটি ছাড়া আর কোন কিছুই যদি ইবন ইসহাক না করতেন, তাহলেও এই একটি মাত্র কাজের জন্য তিনি সকলকে অতিক্রম করে যেতেন। তাঁর পরে আরো অনেকে এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু কেউই তাঁর সমকক্ষতা লাভ করতে সক্ষম হননি।'

ইবন ইসহাক তাঁর আল-মাগাযী গ্রন্থে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোত্র-গোষ্ঠী ও জাতির নামে বহু আরবী কবিতা সন্নিবেশ করেছেন। তাঁর সমকালীন ও পরবর্তীকালের বসরা ও কূফার আরবী ভাষা-সাহিত্যের পণ্ডিতগণ সেসব কবিতার অধিকাংশ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে মত প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীকালে ইবন হিশাম বসরা-কূফার পণ্ডিতদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে সেসব কবিতার সত্যাসত্য যাচাই করেছেন এবং অধিকাংশ বাদ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হিজরী তৃতীয় শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী সাহিত্য বিশারদ মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম আল-জামহী (মৃ. ২৩২) যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা উপস্থাপন করে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। তিনি বলেন :[৩২]

وكان ممن هجن الشعر وأفسده وحمل منه كل غثاء محمد بن اسحاق، وكان من علماء الناس بالسير فقبل الناس عنه الأشعار، ويعتذر منها ويقول لا علم لى بالشعر انما أوتى به فاحمله، ولم يكن ذلك له عذرًا، فكتب فى السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرًا قط وأشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود، أفلا يرجع إلى نفسه فيقول من حمل هذا الشعر ومن أداه منذ ألوف من السنين والله يقول (وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى) وقال فى عاد (فهل ترى لهم من باقية) وقال (وعادًا وثمود والذين من بعدهم لايعلمهم الا الله).

'যারা আরবী কবিতার ক্ষতি ও ধ্বংস করেছে এবং কবিতার নামে সব আবর্জনা ও জঞ্জাল গ্রহণ করেছে, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক তাদের অন্যতম। তিনি একজন সীরাত বিশেষজ্ঞ। লোকেরা তাঁর নিকট থেকে আরবী কবিতা গ্রহণ করেছে। তিনি আপত্তি করে বলতেন : কবিতা সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। আমার নিকট কবিতা আনা হয়, আর তা গ্রহণ করি। এটা তাঁর জন্য কোন কৈফিয়ত হতে পারে না। তিনি তাঁর সীরাত গ্রন্থে এমন সব লোকের কবিতা সন্নিবেশ করেছেন যারা কখনো কোন কবিতা বলেনি। পুরুষদের কবিতা ছাড়াও মহিলাদের কবিতাও সংকলন করেছেন। এ পর্যন্ত তিনি থেমে থাকেননি, বরং 'আদ ও ছামূদ জাতি পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন। তিনি কি নিজে কখনো চিন্তা করেননি,

৩২. তাবাকাতু ফুহুল আশ-শু'আরা'-৭-৮

এসব কবিতা কারা এতদিন ধারণ করেছে এবং হাজার হাজার বছর ধরে কে বা তা সংরক্ষণ করেছে? আল্লাহ বলেন : তিনিই প্রথম 'আদকে ধ্বংস করেছেন এবং ছামূদকে এমনভাবে নির্মূল করেছেন যে, তাদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখেননি। 'আদ জাতি সম্পর্কে অন্যত্র বলেন : তুমি কি এখনো তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাবে? তিনি আরো বলেন : তোমাদের কাছে কি সেই জাতিসমূহের অবস্থার বিবরণ আসেনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে? নূহের জাতি, 'আদ-ছামূদ এবং তাদের পরবর্তীকালের বহু জাতি যাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।'

কাদরিয়া মতবাদ

কোন কোন বর্ণনায় জানা যায় যে, ইবন ইসহাক কাদরিয়া মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আরবী 'কদর' শব্দ হতে 'কাদরিয়া' কথাটি এসেছে। 'কদর' মানে শক্তি। এই সম্প্রদায়ের চিন্তাবিদরা মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যে ও কর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন বলে তারা কাদরিয়া নামে পরিচিত। তবে তিনি কাদরিয়া মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না বলেও অনেকে বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন নুমাইর বলেন, ইবন ইসহাক কাদরিয়া ছিলেন বলে দোষারোপ করা হয়, অথচ এই মতবাদের সাথে তাঁর দূরতম সম্পর্কও ছিল না।[৩৩]

মৃত্যু

প্রথম জীবনে তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। পরে এখান থেকে কূফা, জাযীরা, রায় প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করতে থাকেন। সর্বশেষ বাগদাদে যান এবং সেখানে হিজরী ১৫১, খ্রী. ৭৬৮, মতান্তরে ১৫২ অথবা ১৫৩ সনে ইনতিকাল করেন। খলীফা হারূন আর-রাশীদের মা খায়যুরানের কবরস্তানে সমাহিত হন।[৩৪]

---

৩৩. তারীখু বাগদাদ-১/২২২; তাহ্যীব আল-কামাল-১৬/৭৮

৩৪. তাবাকাত-৭/২৭' তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৭৩; আল-আ'লাম-৬/২৮

মুজাহিদ ইবন জাবর (রহ)

হযরত মুজাহিদ (রহ)-এর ডাকনাম আবুল হাজ্জাজ। তিনি কায়স ইবন আস-সায়িব আল-মাখযূমীর আযাদকৃত দাস ছিলেন।[১] তাঁর পিতার নাম জাবর ও জুবায়র দু'রকম বর্ণিত হয়েছে।[২]

তিনি একজন দাস হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানের জগতের সম্রাট ছিলেন। জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ইমাম পদ মর্যাদার অধিকারী। ইবন সা'দ লিখেছেন :[৩]

كان فقيها عالمًا ثقةً كثير الحديث.

'তিনি ছিলেন একজন ফকীহ, 'আলিম, বিশ্বস্ত ও বহু হাদীছের ধারক-বাহক।' ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে জ্ঞানের ভাণ্ডার বলেছেন।[৪] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর মহত্ত্ব ও ইমাম হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য আছে।[৫] তাফসীর, হাদীছ, ফিকহসহ সকল ইসলামী জ্ঞানে তিনি ইমাম পদ মর্যাদা লাভ করেন।

'ইল্‌মুল কিরাআত ও তাফসীর

আল-কুরআনের পঠন-পাঠনও একটি শাস্ত্র, যাকে عِلْمُ الْقِرَاءَةِ বা কিরাআত শাস্ত্র বলা হয়। এটা 'উলূম আল-কুরআনের একটি শাখা। এ শাস্ত্রে কুরআন পাঠের যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতি পঠিত হয়। তিনি এই 'ইল্‌মুল কিরাআত ও তাফসীর শাস্ত্রের সে যুগের একজন খ্যাতিমান 'আলিম ছিলেন। তাফসীরের জ্ঞান তিনি অর্জন করেন মুসলিম উম্মাহ্‌র জ্ঞানের সাগর হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) নিকট থেকে। পূর্ণ তিরিশ বার তিনি তাঁকে কুরআন শোনান ও তাফসীর শোনেন।[৬] এত মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে এ কাজ করতেন যে, প্রত্যেক সূরা পাঠ করে থেমে যেতেন, তারপর সূরা ও বিভিন্ন আয়াতের শানে নুযূলসহ নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিতেন।[৭] তাঁর এমন মনোযোগ, অধ্যবসায় ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) মত মহান মুফাস্‌সিরে কুরআনের (কুরআন ভাষ্যকার) নিকট শিক্ষার কল্যাণে তিনি একজন উঁচু স্তরের মুফাস্‌সিরে পরিণত হন। খাসীফ বলেন, মুজাহিদ তাফসীরের সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন।[৮] হযরত কাতাদা

১. আত-তাবাকাত-৫/৪৬৬
২. আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা-৩/৪৮৫-৪৮৬ (জীবনী নং ৮৩৬৩); 'আসরুত তাবি'ঈন-৪৫৭
৩. আত-তাবাকাত-৫/৪৬৬
৪. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯২
৫. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/৮৩
৬. আত-তাবাকাত-৫/৪৬৬
৭. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/৪৩; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯২
৮. তাহ্‌যীব আল-আসমা'-১/৮৩

(রহ) বলতেন, সেই সময়ের জীবিত সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে মুজাহিদ সবচেয়ে বড় 'আলিম।[৯] পবিত্র কুরআনের একজন বিখ্যাত কারীও ছিলেন তিনি।[১০] সুফইয়ান আছ-ছাওরী বলতেন, তোমরা মুজাহিদ, সা'ঈদ ইবন জুবায়র, 'ইকরিমা ও আদ-দাহ্হাক ইবন মুযাহিম- এই চারজনের নিকট থেকে কুরআনের তাফসীর গ্রহণ করবে।[১১]

হাদীছ

তিনি হাদীছের একজন অতি প্রসিদ্ধ 'আলিম ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে মুফাস্সির ও হাদীছের হাফিজ, ইবন সা'দ كثير الحديث – বহু হাদীছের ধারক-বাহক এবং ইমাম নাওবী (রহ) হাদীছের ইমাম বলেছেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) তাঁর স্মৃতি শক্তির দারুণ প্রশংসা করতেন। বলতেন, হায়, নাফি'র মুখস্থ শক্তি যদি তোমার মত হতো![১২]

হযরত 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-আ'স, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, আবূ হুরায়রা, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, রাফি' ইবন খাদীজ, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা সিদ্দীকা, জুওয়ায়রিয়া বিনত আল-হারীছ, উম্মু হানী (রা) প্রমুখের মত শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের নিকট থেকে তিনি হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। তাছাড়া তাবি'ঈদের মধ্যে 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, তাউস, 'আবদুল্লাহ ইবন সায়িব, 'আবদুল্লাহ ইবন সানজারা, 'আবদুর রহমান ইবন সাফওয়ান, 'উমার ইবন আসওয়াদ, মুওয়াররিক আল-'আজলী, আবূ 'আয়্যাশ আয-যারকী, আবূ 'উবায়দা ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন মাসউদ (রহ) প্রমুখের নিকট থেকেও তিনি হাদীছ শোনেন।[১৩]

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের গণ্ডি অনেক প্রশস্ত। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : আইউব আস-সিখতিয়ানী, 'আতা', 'ইকরিমা ইবন 'আওন, 'আমর ইবন দীনার, আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ, আবুয যুবায়র মাক্কী, কাতাদা, হাবীব ইবন আবী ছাবিত, হাসান ইবন 'আমর, সালামা ইবন কাহয়াল, সুলায়মান আল-আহওয়াল, সুলায়মান আল-আ'মাশ, মুসলিম, আল-বাতীন, তালহা ইবন মুসরিফ, 'আবদুল্লাহ ইবন কাছীর (রহ) ও আরো অনেকে।[১৪]

ফিক্হ

ফিক্হ শাস্ত্রেও তিনি একজন ইমাম ও মুজতাহিদ পর্যায়ের ব্যক্তি ছিলেন।[১৫] ইমাম যাহাবী, ইবন হাজার, ইমাম নাওবী (রহ) সকলে তাঁর ফিক্হ বিষয়ে পারদর্শিতার

---

৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯২
১০. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/৪৪
১১. 'আসরুত তাবি'ঈন-৪৫৬, ৪৫৯
১২. শাজারাত আয-যাহাব-১/১২৫
১৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/৪২
১৪. প্রাগুক্ত
১৫. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৮৩

ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর দক্ষতার জন্য এ সনদই যথেষ্ট যে, সে কালের জ্ঞানের নগরী মক্কার শ্রেষ্ঠ মুফতীদের মধ্যে তিনিও একজন।[১৬]

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জ্ঞান চর্চা

জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য পার্থিব উপকার প্রাপ্তির আশা থেকে একেবারে মুক্ত থাকে না। কিন্তু হযরত মুজাহিদের জ্ঞান চর্চা সব রকম চাওয়া-পাওয়ার আশা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। সালামা ইবন কুহায়ল বলেন, 'আতা', তাউস ও মুজাহিদ– এই তিনজন ছাড়া আমি এমন কাউকে পাইনি যার জ্ঞান চর্চা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।[১৭]

জ্ঞানের সাথে তাঁর মধ্যে আল্লাহ-ভীতি ও দুনিয়া বিরাগী মনোভাব পূর্ণমাত্রায় ছিল। ইবন হিব্বান বলেন, মুজাহিদ ছিলেন একজন ফকীহ, আল্লাহ-ভীরু, তাপস ও দুনিয়া বিরাগী মানুষ।[১৮]

দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহীনতা

আজীবন তিনি দুনিয়ার কাছে অপরিচিত ও তার সাথে সম্পর্কহীন থেকে গেছেন। পার্থিব ভোগ-বিলাস বা কোন জিনিসের প্রতি তাঁর মন কখনো আসক্তি বোধ করেনি। সব সময় চিন্তাক্লিষ্ট ও বিষণ্ন থাকতেন। আ'মাশ বলেন, মুজাহিদকে আমরা যখনই দেখতাম, বিষণ্ন দেখতাম। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে এই বিষণ্নতার কারণ জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) আমার হাত মুট করে ধরে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার হাত ধরে বলেছেন, 'আবদুল্লাহ! দুনিয়াতে এমনভাবে থাক যেন মনে হয় তুমি কোন মুসাফির অথবা কোন পথিক।[১৯]

সরল ও সাদাসিধে জীবন

বাহ্যিক চাকচিক্য ও সাজ-শোভার প্রতি এতই বেপরোয়া ছিলেন যে, প্রথম দৃষ্টিতে তাঁর ও একজন অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা দুঃসাধ্য ছিল। আ'মাশ বলেন, যখন আমি মুজাহিদকে তাঁর বাহ্যিক অবস্থায় দেখতাম তখন তাঁকে একজন অতি তুচ্ছ মানুষ মনে হতো।

বাহ্যিক বেশভূষায় কোন সহিস বলে ধারণা হতো। মনে হতো তার গাধা হারিয়ে গেছে এবং সে অস্থির ও উদ্ভ্রান্তের মত তা তালাশ করছে। তবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর যে সম্মান ও মর্যাদা ছিল তাতে কোন হেরফের হতো না। তিনি যখন কথা বলতেন তখন তাঁর মুখ থেকে যেন মুক্তো ঝরতো।[২০] অনেক বড় বড় সাহাবী তাঁকে সম্মান ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে

---

১৬. ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/২৬

১৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১/৪২; তারীখু ইবন 'আসাকির-১৬/১২৯

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. শাজারাত আয-যাহাব-১/১২৫

২০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৪৫৩

দেখতেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) মত মহান ব্যক্তি তাঁর বাহনের জিনের আংটা চেপে ধরে তাঁকে উঠা-নামায় সাহায্য করতেন। তিনি বলতেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) সাহচর্য পেয়েছি। আমি চাইতাম তাঁর সেবা করতে, কিন্তু উল্টো তিনিই আমার সেবা করতেন।[২১]

হযরত মুজাহিদের (রহ) ভ্রমণ করা ও পৃথিবীর বিস্ময়কর বস্তু ও নিদর্শনসমূহ দেখার দারুণ শখ ছিল। তিনি বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখতেন। তিনি বাবেলে যান কুরআনে বিধৃত হারূত-মারূতের ঘটনাটির স্থান পরিদর্শনের জন্য।[২২]

ওফাত

মৃত্যুর সন সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা আছে। হিজরী ১০২ মতান্তরে ১০৩ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। নামাযে সিজদা অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি সত্তর (৭০), মতান্তরে আশি (৮০) বছর জীবন লাভ করেন।[২৩]

---

২১. প্রাগুক্ত; তারীখু ইবন 'আসাকির-১৬/১২৯

২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৪৫৫

২৩. আত-তাবাকাত-৫/৪৬৬; 'আসরুত তাবি'ঈন-৪৬৫

মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন হুসায়ন আল-বাকির (রহ)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দৌহিত্র হযরত হুসায়নের (রা) পৌত্র মুহাম্মাদের ডাকনাম আবূ জা'ফার এবং উপাধি আল-বাকির। তাঁর পিতা ইমাম যায়নুল 'আবিদীন 'আলী ইবন হুসায়ন (রা) এবং মাতা হযরত ইমাম হাসানের (রা) কন্যা উম্মু 'আবদিল্লাহ।[১] সুতরাং ইমাম হুসায়ন ও ইমাম হাসান (রা) যথাক্রমে তাঁর মহান দাদা ও নানা। পিতৃ ও মাতৃ উভয়কুলের দিক দিয়ে তাঁর ধমনীতে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পবিত্র রক্ত বহমান ছিল। হিজরী ৫৭ সনের সফর মাসে তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। এই হিসাবে কারবালায় হযরত ইমাম হুসায়নের (রা) মর্মান্তিকভাবে শাহাদাত বরণের সময় তিনি তিন/চার বছরের শিশু মাত্র।[২]

জ্ঞান ও মনীষা

হযরত বাকির ছিলেন সেই খনির রত্ন ও রাতের বাতি যার কল্যাণে সারা পৃথিবীতে 'ইল্‌ম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর তিনি ইমাম যায়নুল 'আবিদীনের (রহ) মত জ্ঞানের দু'সাগরের মোহনা সমতুল্য পিতার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। বংশীয় ঐতিহ্যের প্রভাব ছাড়াও তাঁর মধ্যে স্বভাবগতভাবে জ্ঞান অর্জনের প্রবল আগ্রহও ছিল। এ সকল কারণ সম্মিলিতভাবে তাঁকে তাঁর যুগের একজন শীর্ষ স্থানীয় 'আলিমে পরিণত করে। তিনি স্বীয় অগাধ জ্ঞানের কারণে "বাকির" অভিধায় ভূষিত হন।[৩] আরবী باقر শব্দটি بقر থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বিদীর্ণ করা, ফেঁড়ে ফেলা। তিনি 'ইল্‌ম তথা জ্ঞানকে বিদীর্ণ করে তার মূল ও অভ্যন্তরীণ গোপন রহস্য অবগত হন, তাই তাঁকে باقر (বাকির) বলা হয়।[৪]

অনেক 'আলিম মনে করতেন তাঁর মহান পিতার জ্ঞানের চেয়েও তাঁর জ্ঞান অনেক ব্যাপক ছিল। মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির বলেন, যতদিন আমি মুহাম্মাদকে না দেখেছি ততদিন মনে করতাম, এমন কোন 'আলিম নেই যাঁকে 'আলী ইবন হুসায়ন যায়নুল 'আবিদীনের (রহ) উপর প্রাধান্য দেওয়া যায়।[৫] তিনি তাঁর সময়ে তাঁর পুরো খান্দানের নেতা ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন : كان سيد بنى هاشم فى زمانه - 'তিনি তাঁর সময়ে বানূ হাশিমের নেতা ছিলেন।'[৬] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তিনি একজন অতি

---

১. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৭/৭৩

২. ওয়াফইয়াত আল-আ'ইয়ান-১/৪৫০

৩. তাহ্‌যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৮৭

৪. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১২৪

৫. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৯/৩৫০

৬. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১২৪

সম্মানিত তবি'ঈ ও শ্রেষ্ঠ ইমাম ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সকলে একমত। মদীনার ফকীহ ও ইমামগণের মধ্যে তিনি পরিগণিত।[৭] ইমাম যাহাবী তাঁকে শীর্ষস্থানীয় দৃঢ়পদ ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।[৮]

হাদীছ

হাদীছ তো তাঁর নিজ গৃহের সম্পদ। এ কারণে এর সবচেয়ে বেশী অধিকার ছিল তাঁর। ইবন সা'দ বলেছেন :[৯] كان ثقة كثير العلم والحديث – 'তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, বহু জ্ঞান ও হাদীছের ধারক-বাহক।' এই জ্ঞান তিনি অর্জন করেন পারিবারিক পরিমণ্ডলে নিজ বংশের ঊর্ধ্বতন পুরুষদের নিকট থেকে। যেমন : পিতা ইমাম যায়নুল 'আবিদীন, নানা হাসান, দাদা হুসায়ন ইবন 'আলী, মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যা, দাদার চাচাতো ভাই 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা) প্রমুখ মহান ব্যক্তিবর্গের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে পরোক্ষভাবে অর্জন করেন। অর্থাৎ তাঁদের সূত্রে তাঁর সকল বর্ণনা "মুরসাল"। নিজ পরিবারের বাইরে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, 'আবদুল্লাহ ইবন আবী রাফি', হারমালা, 'আতা' ইবন ইয়াসার, ইয়াযীদ ইবন হুরমুয, আবু মুররা (রহ) প্রমুখের নিকট থেকেও ফায়দা হাসিল করেন।[১০]

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

সেই সময়ের বড় বড় ইমাম যেমন : আবান ইবন তাগলিব আল-কূফী, জাবির ইবন ইয়াযীদ আল-জু'ফী, হাজ্জাজ ইবন আরতাত, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আতা', আওযা'ঈ, আল-আ'মাশ, ইবন জুরাইজ, ইমাম যুহরী, 'আমর ইবন দীনার, আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ (রহ) প্রমুখের মত শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ এবং তাবি' তাবি'ঈনের বড় একটি দল তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করেন।[১১]

ফিক্হ শাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ইবন আল-বারকী তাঁকে ফকীহ ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলেছেন।[১২] মনীষীগণ তাঁকে মদীনার তাবি'ঈ ফকীহ ও ইমামদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[১৩]

'ইবাদত-বন্দেগী

তিনি সেই সব মহান ব্যক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়ে বেড়ে ওঠেন

---

৭. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৮৭

৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৪

৯. আত-তাবাকাত-৫/২২৮; তাহ্যীব আল-কামাল-১৭/৭৪

১০. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩৫০; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৭৩

১১. প্রাগুক্ত

১২. প্রাগুক্ত

১৩. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/৮৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৪

যাঁদের জীবনের প্রধান কাজই ছিল 'ইবাদত-বন্দেগী করা, আর যে পরিবেশে তিনি জন্মের পর চোখ মেলে তাকান সেখানে সর্বক্ষণ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের যিক্‌র ও তাসবীহ-তাহমীদের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হতে থাকতো। এ কারণে 'ইবাদতের সেই প্রাণশক্তি তাঁর মধ্যেও অনুপ্রবেশ করেছিল। রাত-দিন দেড়শো রাক'আত নফল নামায আদায় করতেন।[১৪] অতিরিক্ত সিজদার কারণে কপালে স্পষ্ট দাগ পড়ে গিয়েছিল। তবে সেটা তেমন গভীর ছিল না।[১৫]

হযরত আবূ বকর ও 'উমারের (রা) প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

নিজের পূর্বপুরুষ ও অন্যান্য মহান ব্যক্তির মত হযরত আবূ বকর ও 'উমারের (রা) প্রতিও ছিল তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ। জাবির বলেন, একবার আমি মুহাম্মাদ ইবন 'আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বংশের কেউ কি আবূ বকর ও 'উমারকে (রা) গালি দিতেন? বললেন, না। আমি তাঁদেরকে ভালোবাসি এবং তাঁদের মাগফিরাতের দু'আ করি। 'ঈসা ইবন দীনার আল-মুয়ায্‌যিনের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি তাঁকেও এরূপ জবাব দেন এবং তাঁদের দু'জনকে ভালোবাসতে ও তাঁদের জন্য দু'আ করতে বলেন।[১৬]

সালিম ইবন আবী হাফসা বলেন, আমি ইমাম আল-বাকির ও তাঁর পুত্র জা'ফার আস-সাদিকের নিকট আবূ বকর ও 'উমারের (রা) ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি, তিনি বলেন, সালিম! আমি তাঁদেরকে ভালোবাসি এবং তাঁদের দুশমনদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা দু'জন ছিলেন পথপ্রদর্শক ইমাম। আমাদের পরিবারের সকলকে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে দেখেছি।[১৭]

বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা

কিছু দল-উপদল এমন সব ভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাস ঐ সকল মহান ব্যক্তিবর্গের প্রতি আরোপ করেছে যার সাথে তাঁদের বিন্দু মাত্র সম্পৃক্ততা ছিল না। দীনী বিষয়ে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন ইসলামী আকীদা ছাড়া আর কোন রকম নতুন আকীদা তাঁরা পোষণ করতেন না। জাবির বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবন 'আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের আহ্‌লি বায়তের মধ্যে কেউ কি এমন ধারণা পোষণ করতেন যে, কোন পাপ শিরক? বললেন, না। আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম; তাদের কেউ কি পুনর্জীবনের প্রবক্তা ছিলেন? বললেন, না।[১৮]

ওফাত

তিনি হামিয়্যা নামক স্থানে ইনতিকাল করেন এবং লাশ মদীনায় এনে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সন নিয়ে মত পার্থক্য আছে। হিজরী ১১৪, ১১৫, ১১৭ ও ১১৮

---

১৪. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১২৪

১৫. আত-তাবাকাত-৫/২৩৬

১৬. প্রাগুক্ত; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৭/৭৫

১৭. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৯/৩৫১; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৭/৭৪

১৮. আত-তাবাকাত-৫/২৩৬

সনের কথা বর্ণিত হয়েছে।[১৯] কত বছর জীবন লাভ করেন সে সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা মতে ৫৮ বছর এবং অন্যটি মতে ৭৩ বছর। তবে দ্বিতীয়টি যে সত্য নয় তা নিশ্চিত করে বলা যায়। কারণ হিজরী ৫৭ সনে যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সে ব্যাপারে সকলে একমত।[২০]

সেই হিসাবে প্রথম বর্ণনাটি অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। কারণ তখন তাঁর বয়স ৫৮ থেকে ৬১ বছরের মধ্যে হয় এবং কোনভাবেই ৭৩ বছর হয় না।

সন্তানাদি

ইমাম আল-বাকির (রহ) অনেকগুলো সন্তান রেখে যান। জা'ফার ও 'আবদুল্লাহ ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) দৌহিত্রী উম্মু ফারওয়ার (রহ) গর্ভজাত; ইবরাহীম ছিলেন উম্মু হাকীম বিনত উসায়দের গর্ভজাত; 'আলী ও যায়নাব ছিলেন এক দাসীর গর্ভজাত এবং উম্মু সালামা আরেক দাসীর গর্ভজাত ছিলেন। তাঁদের সকলের মধ্যে জা'ফার, যিনি আস-সাদিক উপাধি প্রাপ্ত, সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং তিনি তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।[২১]

ইমাম আল-বাকির সুন্দর বেশ-ভূষা পছন্দ করতেন। 'খুয' নামক এক প্রকার রেশমের মূল্যবান কাপড় ব্যবহার করতেন। সাদা ও রঙ্গীন দু'ধরনের পোশাকই ব্যবহার করতেন। পশমী বুটিদার কাপড়ও পরতেন। চুল ও দাড়িতে খিজাব লাগাতেন।[২২]

---

১৯. ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান-১/৪৫০; আত-তাবাকাত-৫/২৩৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৪

২০. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৩৫১; তাহ্যীব আল-কামাল-১৭/৭৫

২১. আত-তাবাকাত-৫/২৩৮

২২. প্রাগুক্ত; তাবি'ঈন-৪৫১

মাকহূল আদ-দিমাশকী (রহ)

হযরত মাকহূলের (রহ) কুনিয়াত তথা ডাকনাম দু'টি : আবূ 'আবদিল্লাহ ও আবূ আইউব। তাঁর বংশ ও জন্মভূমি সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবন সা'দ তাঁকে কাবুলের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন।[১] ইবন হাজার কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যার একাংশের দ্বারা জানা যায় তিনি একজন অনারব বংশোদ্ভূত এবং তাঁর পিতার নাম সোহরাব। আর ইবন হাজারের বর্ণনার কিছু অংশের দ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি মিসরীয় ছিলেন, আর কিছু বর্ণনা দ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি একজন আরব এবং হুযালী গোত্রের মানুষ।[২]

তবে শেষের দু'টি বর্ণনা অর্থাৎ হুযালী ও মিসরীয় হওয়া অবশ্যই সঠিক নয়। কারণ তাঁর অনারব বংশোদ্ভূত হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। তাঁর হুযালী ও মিসরীয় হওয়া এজন্য প্রসিদ্ধ যে, তিনি তাঁর জীবনের কিছু দিন হুযালী গোত্রের এক ব্যক্তির দাসত্বে ছিলেন এবং কিছুকাল মিসরে অবস্থান করেন।

এ ব্যাপারে ইমাম নাওবীর (রহ) বর্ণনাটি অধিক যুক্তিভিত্তিক ও সঠিক বলে প্রতিভাত হয়। তিনি তাঁকে অনারব বংশোদ্ভূত ও কাবুলের লোক বলেছেন। সুতরাং তার বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মাকহূলের (রহ) উর্ধ্বতন বংশধারা এ রকম :[৩]

مكحول بن زيد يا ابن ابى مسلم شهراب بن شاذل بن سند بن شزدان بن يردك بن يغوث بن كسرى كابلي ودمشقي.

এ বর্ণনা দ্বারা বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে যে সমন্বয়টি পাওয়া যায় তা হলো– তিনি অনারব বংশোদ্ভূত, জন্মভূমি কাবুল এবং দিমাশকে বসবাসকারী ছিলেন। আল-মিয্যী বলেন : দিমাশকের 'আল-আহাদ' বাজারের পাশে তাঁর বাড়ি ছিল।[৪]

তাঁর জীবনের প্রথম পর্বের ইতিহাস হলো, তিনি 'আমর ইবন সা'ঈদ ইবন আল-'আসের দাস ছিলেন। 'আমর তাঁকে হুযালী গোত্রের এক মহিলাকে দান করেন। এই দ্বিতীয়জনের দাসত্বের কারণে তাঁর সম্পর্ক আরোপের ক্ষেত্রে দু'টি বর্ণনা হয়ে গেছে। একটি হলো তিনি 'আমর ইবন সা'ঈদের দাস ছিলেন, আর দ্বিতীয়টি হলো, তিনি ছিলেন হুযালী গোত্রের দাস। দু'টি বর্ণনাই সঠিক। তিনি নিজেই তাঁর দাসত্ব জীবনের সূচনা সম্পর্কে বলেছেন, "আমি 'আমর ইবন সা'ঈদ ইবন আল-'আসের দাস ছিলাম। পরে তিনি

১. আত-তাবাকাত-৭/১৬১
২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/২৯০; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৩৫৬
৩. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১১৩
৪. তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৩৫৬

আমাকে হুযালী গোত্রের এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেন।"[৫] কথাটি যুক্তিভিত্তিক এজন্য যে, 'আমরের পিতা সা'ঈদ হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে কাবুলের সীমান্তবর্তী এলাকায় অভিযান চালিয়ে জয় করেন।[৬] এটাই যুক্তিসিদ্ধ যে, এই অভিযানের সময় মাকহূল যুদ্ধবন্দী হিসেবে সা'ঈদের অধিকারে আসেন। আর একথার সমর্থন পাওয়া যায় খোদ মাকহূলের একটি বর্ণনাতে। তিনি বলেন, আমি এক সময় সা'ঈদের দাস ছিলাম।[৭] পরে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি তাঁর পুত্র 'আমরের অধিকারে এসে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক।

মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনযির শাক্কার বলেন : মাকহূলের মূল হলো হারাতের। তাঁর পিতার নাম আবূ মুসলিম শোহ্রাব ইবন শাযিল। দাদা শাযিল হারাতের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কাবুলের এক রাজার মেয়ে বিয়ে করেন। স্ত্রীকে সন্তান সম্ভাবা অবস্থায় রেখে তিনি মারা যান এবং স্ত্রী পিতৃগৃহে চলে যান। সেখানে শোহরাবের জন্ম হয়। শোহরাব কাবুলে বেড়ে ওঠেন এবং সেখানে বিয়ে করেন। অতঃপর সেখানে মাকহূলের জন্ম হয়। একটু বড় হলে তিনি মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন এবং সা'ঈদ ইবন আল-'আসের হাতে অর্পিত হন। এভাবে তিনি দাসত্বের জালে জড়িয়ে পড়েন। সা'ঈদ ইবন আল-'আস আবার তাঁকে হুযাইল গোত্রের এক মহিলার হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেন। পরে এই মহিলা মাকহূলকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন।[৮]

জ্ঞান অর্জনের জন্য ইসলামী বিশ্ব ভ্রমণ

মুসলমানরা যে দাসদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে দাসত্বের নিকৃষ্ট জীবন থেকে বের করে পূর্ণতা ও উৎকর্ষতার শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে দিত, মাকহূল তাঁর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবন শুরু হয়েছে দাসত্বের মাধ্যমে এবং অবশেষে তিনি শামের জ্ঞানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হন। জ্ঞান অন্বেষণে তাঁর স্বভাবগত আগ্রহ ছিল। এ কারণে দাসত্বের জীবনেই তিনি জ্ঞান অর্জনে মনোযোগী হন। পরে দাসত্ব থেকে মুক্তির পর তৎকালীন গোটা ইসলামী বিশ্বের সকল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি বলেন, যখন আমি দাসত্ব থেকে মুক্ত হই তখন মিসরের সকল জ্ঞান আত্মস্থ করে ফেলি।[৯] আর যতক্ষণ না আমার মধ্যে এ প্রত্যয় জন্মেছে যে, এখানকার সকল জ্ঞান আমি ধারণ করে ফেলেছি ততক্ষণ সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য পা বাড়াইনি।[১০]

মিসরের জ্ঞান ভাণ্ডার শূন্য করার পর তিনি মদীনায় যান এবং সেখান থেকে যান ইরাকে।

---

৫. আত-তাবাকাত-৭/১৬১

৬. ফুতূহ আল-বুলদান-৩২২

৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৭

৮. তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৩৫৮

৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৮

১০. আত-তাবাকাত-৭/১৬০

এ দু'স্থানের জ্ঞানের সকল ঝর্ণাধারা থেকে পরিতৃপ্ত হওয়ার পর যান শামে। তথাকার জ্ঞানী-গুণীদের নিকট থেকে স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ করেন। মোটকথা, তিনি জ্ঞান অন্বেষণে ইসলামী দুনিয়ার প্রতিটি কোণে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি নিজেই বলেন : طفت الأرض كلها في طلب العلم. – 'আমি জ্ঞানের অন্বেষণে গোটা পৃথিবী চষে বেড়িয়েছি।'[১১]

জ্ঞান অর্জনে তাঁর প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা-সাধনা তাঁকে জ্ঞানের জগতের এমন শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে দেয় যেখানে তাঁর সমকালীনদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই পৌঁছাতে পেরেছিলেন। ইমাম যুহরী (রহ) বলতেন; 'আলিম তো মাত্র চারজন। তাঁদের মধ্যে একজন মাকহূল। অন্য তিনজন হলেন : মদীনার সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, কূফার 'আমির আশ-শা'বী এবং বসরার হাসান আল-বাসরী।[১২] ইবন ইউনুস বলেন, মাকহূল একজন ফকীহ ও 'আলিম ছিলেন। তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলে একমত।[১৩] ইবন 'আম্মার বলতেন, তিনি শামের অধিবাসীদের ইমাম ছিলেন।[১৪] হাদীছ ও ফিক্‌হ উভয় শাস্ত্রে তিনি ইমাম মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

সুলায়মান ইবন মূসা বলতেন : আমাদের কাছে 'ইল্‌ম যখন হিজাযের যুহ্‌রী থেকে, 'ইরাকের হাসান আল-বাসরী থেকে, আল-জাযীরার মায়মূন ইবন মিহ্‌রান থেকে এবং শামের মাকহূল থেকে আসলো, আমরা তা গ্রহণ করলাম। সা'ঈদ ইবন 'আবদিল 'আযীয বলেন, হিশামের খিলাফাতকালে এ চারজনই ছিলেন মানুষের 'আলিম।[১৫]

হাদীছ

তিনি হিজায, ইরাক, মিসর, শামসহ জ্ঞান চর্চার সকল কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে তথাকার মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ শোনেন। স্মৃতি শক্তি এত প্রখর ছিল যে, যা কিছু শোনেন সবই বক্ষে ধারণ ও সংরক্ষণ করেন।[১৬] এ কারণে তিনি তাঁর সময়ের একজন বড় হাফিজে হাদীছে পরিণত হন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে তাবি'ঈদের তৃতীয় স্তরের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭]

তাঁর শিক্ষকবৃন্দ

তিনি তাঁর সময়ের প্রায় সকল বড় 'আলিমের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। এ কারণে তাঁর শিক্ষকদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। কোন দেশ তা থেকে বাদ পড়েনি। সেই

---

১১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৮; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৩৫৯

১২. প্রাগুক্ত

১৩. তাহ্‌যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১১৪

১৪. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/২৯১

১৫. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৩৬০

১৬. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৮

১৭. প্রাগুক্ত-১/১০৭

তালিকার মধ্যে বিশাল সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামের নামও আছে। তাঁদের মধ্যে আনাস ইবন মালিক, আবূ হিন্দ দারী, ওয়াছিলা ইবন আসকা', আবূ উমামা, 'আবদুর রহমান ইবন গানাম, আবূ জান্দাল ইবন সুহায়ল (রা) প্রমুখের নিকট থেকে সরাসরি হাদীছ শুনেছেন।[১৮] আর উবাই ইবন কা'ব, ছাওবান, 'উবাদা ইবন ছাবিত, আবূ হুরায়রা, আবূ ছা'লাবা খুশানী, 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা) থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের নাম বাদ দিয়ে তিনি নিজেই সরাসরি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।[১৯] বিশিষ্ট তাবি'ঈদের মধ্যে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, মাসরূক, জুবায়র ইবন নাদীর, কুরায়ব, আবূ মুসলিম, আবূ ইদরীস খাওলানী, 'উরওয়া ইবন যুবায়র, 'আবদুল্লাহ ইবন মুহায়রীয, 'আম্বাসা ইবন আবী সুফইয়ান, ওয়াররাদ কাতিব, মুগীরা, কুছায়্যির মুররা, উম্মুদ দারদা' (রহ) প্রমুখ থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন।[২০]

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের গণ্ডি অত্যন্ত প্রশস্ত। বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া হলো : ইমাম যুহরী, হুমায়দ আত-তাবীল, মুহাম্মাদ ইবন 'আজলান, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আলা', সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ মুহারিবী, মূসা ইবন ইয়াসার, ইমাম আওযা'ঈ, সা'ঈদ ইবন 'আবদিল 'আযীয, 'আলা' ইবন আল-হারিছ, ছাওর ইবন ইয়াযীদ, আইউব ইবন মূসা, মুহাম্মাদ ইবন রাশিদ মাকহূলী, মুহাম্মাদ ইবন ওয়ালীদ যুবায়দী, বারদ ইবন সিনান, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আওফ, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, উসামা ইবন যায়দ লায়ছী, নাখীর ইবন সা'দ, সাফওয়ান ইবন 'আমর, ছাবিত ইবন ছাওবান (রহ) ও আরো অনেকে।[২১]

ফিক্হ ও ফাতওয়া

হাদীছ স্মৃতিতে ধারণের সাথে সাথে তিনি ফিক্হ শাস্ত্রের একজন ইমাম ও মুজতাহিদ ছিলেন। আবূ হাতিম বলতেন, আমি শামে মাকহূলের চেয়ে বড় কোন ফকীহ দেখিনি।[২২] সাঈদ ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁকে ইমাম যুহরীর চেয়েও বড় ফকীহ বলে মনে করতেন।[২৩] ইফতার ক্ষেত্রে ছিল তাঁর বিশেষ দক্ষতা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি। সা'ঈদ ইবন 'আবদিল 'আযীয বলেন, তাঁর যুগে ইফতার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে বেশী সূক্ষ্ম দৃষ্টি আর কারো ছিল না।[২৪]

---

১৮. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/১১৩

১৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/২৯০

২০. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/১১৩; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৩৫৭

২১. প্রাগুক্ত

২২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১০৮

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/২৯১; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৩৬০

সতর্কতা

তিনি ফাতওয়া দানের ক্ষেত্রে ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। নিজের মতের ভিত্তিতে যদি কোন মাসয়ালার জবাব দিতেন তাহলে স্পষ্টভাবে সে কথা বলে দিতেন যে, এটা আমার মত। সঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে।[২৫]

ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর মনীষা ও উৎকর্ষতার বড় প্রমাণ এই যে, সেই যুগে যখন গ্রন্থ রচনার সূচনাও হয়নি তখন তিনি ফিক্‌হ বিষয়ে দু'টি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ দু'টির নাম : ১. কিতাবুস সুনান, ২. কিতাবুস মাসায়িল।[২৬]

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়

জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সাথে নৈতিক উৎকর্ষতায়ও বিভূষিত ছিলেন। আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা– এ দু'টি গুণ তাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেছিল। যা কিছু তাঁর হাতে আসতো সবই আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। সা'ঈদ ইবন 'আবদিল 'আযীয বলেন, মাকহূলের ভাতা নির্ধারিত ছিল। তিনি সেই অর্থ আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে ব্যয় করতেন।[২৭] একবার দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার বড় অঙ্কের অর্থ তাঁর হাতে আসে। তিনি সেই অর্থও আল্লাহর পথে জিহাদে ব্যয় করেন। তিনি একজন মুজাহিদকে তাঁর একটি ঘোড়ার মূল্য হিসেবে পঞ্চাশ স্বর্ণ মুদ্রা দিতেন।[২৮]

একটি সন্দেহের নিরসন

হযরত মাকহূল (রহ) সম্পর্কে একটা সাধারণ প্রসিদ্ধি ছিল যে, তিনি 'কাদরিয়া' মতবাদে বিশ্বাসী। এর সমর্থনে কিছু বর্ণনাও পাওয়া যায়। কিন্তু সঠিক বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে জানা যায়, এই ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস থেকে তিনি পরিচ্ছন্ন ছিলেন। ইমাম আওযা'ঈ (রহ) তাঁর একজন বিশিষ্ট ছাত্র বলেন, যতটুকু শোনা যায়, তাবি'ঈদের মধ্যে দুই ব্যক্তি হাসান আল-বাসরী ও মাকহূল (রহ) কাদরিয়া মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু আমি ব্যাপক অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার পর জেনেছি এই প্রসিদ্ধি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।[২৯] তাঁর আরেকজন ছাত্র সা'ঈদ ইবন 'আবদিল 'আযীযও তাঁর এই ভ্রান্ত মতবাদের বিশ্বাস থেকে মুক্ত থাকার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে মতভেদ আছে। হিজরী ১১২, ১১৩ এবং ১১৮ সনের কথা বর্ণিত হয়েছে।[৩০]

---

২৫. শাজারাত আয-যাহাব-১/১৪৬

২৬. ইবন নাদীম, আল-ফিহ্‌রিস্ত (মিসর সংস্করণ)-৩১৮; তাবি'ঈন-৪৮৯

২৭. আত-তাবাকাত-৭/১৬১

২৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১০৮

২৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/২৯১; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৩৬০

৩০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১৮/৩৬০; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৩৬০

মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির (রহ)

কুরায়শ বংশের বানূ তায়ম শাখার সন্তান মুহাম্মাদ (রহ)। তাঁর ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। পিতা আল-মুনকাদির ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আল-হুযায়র।[১] তাঁর অপর দু'ভাই আবূ বাকর ইবন আল-মুনকাদির ও 'উমার ইবন আল-মুনকাদির।

আল-মুনকাদির ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) মামা। একদিন তিনি 'আয়িশার (রা) কাছে গিয়ে নিজের প্রয়োজনের কথা বলে কিছু অর্থ সাহায্য চাইলেন। তিনি বললেন, আমার হাতে কিছু অর্থ আসার কথা আছে, আসলে পাঠিয়ে দেব। এরপর দশ হাজার দিরহাম 'আয়িশার (রা) হাতে আসে এবং তিনি সাথে সাথে তা আল-মুনকাদিরের নিকট পাঠিয়ে দেন। মুনকাদির সেই অর্থ দিয়ে একটি দাসী কেনেন। সেই দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তাঁর তিন ছেলে : মুহাম্মাদ, আবূ বাকর ও 'উমার।[২]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা চর্চায় তিনি অতি উঁচু স্তরের মানুষ ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে আল-ইমাম ও শায়খুল ইসলাম (ইসলামের জ্ঞান-বৃদ্ধ ব্যক্তি) বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন :

مجمع على ثقته وتقدمه فى العلم والعمل وهو من طبقة عطاء لكنه تأخر موته.

"তাঁর বিশ্বস্ততা এবং 'ইল্ম ও 'আমলে অগ্রবর্তিতার ব্যাপারে সকলের ঐক্যমত আছে। তিনি 'আতা'র স্তরের মানুষ, তবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে দেরীতে।"[৩] ইবন হাজার আল-আসকিলানী (রহ) তাঁকে শীর্ষস্থানীয় ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

কিরাআত

আল-কুরআনের একজন বিশিষ্ট কারী ছিলেন। ইমাম মালিক (রহ) বলেন : "كان سيد القراء - তিনি ছিলেন কারীদের নেতা।"

হাদীছ

হাদীছের একজন বিখ্যাত হাফিজ ছিলেন। আল-হুমায়দী বলেন : ابن المنكدر حافظا - ইবন আল-মুনকাদির একজন হাফিজ।[৫] তিনি সাহাবা ও তাবি'ঈন কিরামের বড় একটি

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৭
২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/৪৭৩; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৩৬৫
৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৭
৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৯/১২৭
৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৭

দলের নিকট থেকে হাদীছ শোনেন। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবূ আইউব আল-আনসারী, আনাস ইবন মালিক, জাবির, আবূ উমামা ইবন সাহ্ল, রাবী'আ ইবন 'আবদিল্লাহ, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র, আবূ কাতাদা, সাফীনা, 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা) এবং তাবি'ঈদের মধ্যে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবী রাফি', 'উরওয়া ইবন যুবায়র, মু'আয ইবন 'আবদির রহমান আত-তায়মী, সা'ঈদ ইবন 'আবদির রহমান ইয়ারবূ', আবূ বাকর ইবন সুলায়মান (রহ) প্রমুখের সূত্রে তিনি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৬] তাঁর কিছু মুরসাল হাদীছ আছে। কিন্তু হাদীছের 'আলিমগণ মনে করেন, তাঁর মুরসাল হাদীছ অন্য অনেকের মারফূ' হাদীছের চেয়েও নির্ভরযোগ্য।[৭] ইবন 'উয়ায়না বলেন :

كان من معادن الصدق ويجتمع اليه الصالحون. – "তিনি ছিলেন সত্য ও সততার খনিসদৃশ। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁর কাছে সমবেত হতেন।" তিনি আরো বলেন, কেউ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (রাসূল সা. বলেছেন) বলেছেন, আর সকলে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিয়েছেন, একমাত্র তিনি ছাড়া এমন আর কাউকে আমি দেখিনি।[৮] ইবরাহীম বলতেন, তিনি মুখস্থ শক্তি, দৃঢ়তা ও দুনিয়া বিরাগী মনোভাবের চূড়ান্ত পর্যায়ের মানুষ ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন ইল্‌মে হাদীছে "হুজ্জাত" (দলিল-প্রমাণ) স্তরের ব্যক্তি।[৯]

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন ও তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন : তাঁর পুত্র ইউসুফ ও আল-মুনকাদির, ভাতিজা ইবরাহীম ও 'আবদুর রহমান এবং অন্যদের মধ্যে 'আমর ইবন দীনার, ইমাম যুহ্‌রী, আইউব, আনাস ইবন 'উবায়দ, সালামা ইবন দীনার, জা'ফার ইবন মুহাম্মাদ সাদিক, মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি', সা'দ ইবন ইবরাহীম, সুহায়ল ইবন আবী সালিহ, ইবন জুরায়জ, 'আলী ইবন যায়দ, মূসা ইবন 'উকবা, হিশাম ইবন 'উরওয়া, ইয়াহ্ইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী (রহ) ও আরো অনেকে।[১০]

ফিক্‌হ

তিনি ফিক্‌হ ও ফাতওয়ায় পারদর্শী ছিলেন। মদীনার তাবি'ঈ মুফতীগণের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হতো।[১১]

---

৬. প্রাগুক্ত; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৯/৪৭৩

৭. তাবি'ঈন-৪৬৩

৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১২৭; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৯/৩৬৫

৯. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৯/৪৭৫

১০. প্রাগুক্ত-৯/৪৭৪; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৯/২৬৪-২৬৫

১১. ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/২৬

তাকওয়া-পরহিযগারী

তাঁর মধ্যে তাকওয়া-পরহিযগারী ও দুনিয়া বিরাগী মনোভাব চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। নফ্স বা আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য তিনি অত্যন্ত কঠিন অনুশীলন করতেন। একাধারে চল্লিশ বছর নানাভাবে নফ্সের পরিশুদ্ধির কাজ করেন। তিনি নিজেই বলেন : كابدت نفسى أربعين سنة حتى استقامت – "আমি চল্লিশ বছর যাবত আমার নফ্সকে কষ্ট দিয়েছি, অতঃপর সে সোজা হয়।"[১২] ইমাম মালিক বলতেন, তিনি উঁচু স্তরের 'আবিদ ও যাহিদ (দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ত) মানুষ ছিলেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী বলেন, তাঁর বাড়ীটি ছিল সত্যনিষ্ঠ ও 'আবিদ (সাধক) ব্যক্তিদের ঠিকানা।[১৩]

খাওফে খোদা বা আল্লাহর ভয় তাঁর অন্তরের গভীরে শিকড় গেঁড়েছিল। কুরআনের বিশেষ বিশেষ আয়াত যখন তিলাওয়াত করতেন তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ধারা জারি হয়ে যেত। এক রাতে তাহাজ্জুদ নামাযে ব্যাকুল হয়ে কাঁদলেন। সকালে ভাইয়েরা তাঁর এমন কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন : এ আয়াতটি পাঠের পর আমার এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় :

وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ. (الزمر : ٤٧)

"এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি।"

তাঁর মরণ সময় ঘনিয়ে এলে তিনি ভীষণ ভীত-শংকিত হয়ে পড়েন। বলেন, 'আমি এ আয়াতকে ভয় পাচ্ছি। আমি ভয় পাচ্ছি, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার সামনে এমন কিছু প্রকাশ হয়ে পড়বে যার কল্পনাও আমি কখনো করিনি। হাদীছের ব্যাপারেও তাঁর অবস্থা এমন ছিল। ইমাম মালিক বলেন : যখন কেউ তাঁর কাছে কোন হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো তখন তিনি কেঁদে ফেলতেন।[১৪]

হজ্জ আদায়ের ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী ও আবেগপ্রবণ ছিলেন। ঋণগ্রস্ত হয়েও হজ্জ করতেন। একবার কেউ একজন প্রতিবাদের সুরে বলে, আপনি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় হজ্জ আদায় করেন কেন? বললেন, হজ্জই ঋণ পরিশোধের সবচেয়ে বড় উপায় ও সহায়ক। হজ্জে একাকী যেতেন না। স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে সকলকে নিয়ে যেতেন। বলতেন, তাদেরকে আল্লাহর সামনে উপস্থাপনের জন্য নিয়ে যাই। তাকে দেখলে অন্যের নফ্সও পরিশুদ্ধ হতো। ইমাম মালিক বলেন, আমি যখন আমার অন্তরে কাঠিণ্য অনুভব করতাম তখন গিয়ে মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদিরকে দেখতাম। এর প্রভাব এই হতো যে, কয়েকদিন পর্যন্ত নফ্স আমার নিকট খুব অপ্রিয় থাকতো।[১৫]

---

১২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৭
১৩. শাজারাত আয-যাহাব-১/১৭৮
১৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৭
১৫. শাজারাত আয-যাহাব-১/১৭৮

জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনার নিকট সবচেয়ে ভালো কাজ কি? বললেন, মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট করা। আবার জিজ্ঞেস করে, সবচেয়ে প্রিয় জগত কোনটি? বললেন : বন্ধুদের সাথে আদান-প্রদান করা। আল-ওয়াকিদী বলেন : তিনি হিজরী ১৩০ সনে ইনতিকাল করেন।[১৬] একথা মুহাম্মাদ ইবন সা'দও বলেছেন। তবে হারূন ইবন মুহাম্মাদ আল-ফারবীর সূত্রে ইমাম আল-বুখারী হিজরী ১৩১ সনের কথা বলেছেন। সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না বলেন, তিনি সত্তর (৭০) বছরের উপরে জীবন লাভ করেন। শেষ জীবনে মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল, তাই মেহেদীর খিজাব লাগতেন।[১৭]

---

১৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৮

১৭. তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/২৬৬

মুসলিম ইবন ইয়াসার (রহ)

ইসলাম সাম্য ও সমতার ধর্ম। এতে উঁচু-নীচু, দাস-মনিবের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। এখানে সম্মান ও আভিজাত্যের মাপকাঠি হলো তাকওয়া ও 'আমল। এর নজীর ইসলামের ইতিহাসে সর্বত্র পাওয়া যায়। তেমনই একটি দৃষ্টান্ত মুসলিম ইবন ইয়াসার। তাঁর ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত তালহা ইবন 'উবায়দিল্লাহ, মতান্তরে 'উছমান ইবন 'আফ্ফানের (রা) দাস ছিলেন।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

হযরত তালহা (রা) ছিলেন "আশারা মুবাশ্শারা" অর্থাৎ জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন মানুষের একজন। তাঁর ব্যক্তি সত্তাটি ছিল 'ইল্ম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের দুই সাগরের সঙ্গম স্থলের মত। তাঁর দাসত্বের কল্যাণে এবং রাসূলুল্লাহর (সা) শহর মদীনায় অবস্থানের সুযোগে মুসলিমও 'ইল্ম ও 'আমলের ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। ইবন সা'দ বলেন :[২] كان مسلم ثقةً فاضلاً عابدًا وَرعًا – "মুসলিম ছিলেন বিশ্বস্ত, জ্ঞানী, তাপস ও আল্লাহভীরু।" ইবন আওন বলেন, সেই সময়ে মুসলিমের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হতো না।[৩]

হাদীছ

মদীনায় অবস্থানের কারণে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) মত উম্মাতের শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং আবুল আশ'আছ সান'আনী, হামরান ইবন আবান (রহ) প্রমুখের নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ লাভ করেন। আর ছাবিত আল-বানানী, ইয়া'লা ইবন হাকীম, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, আইউব সাখতিয়ানী, আবূ নাদরা ইবন কাতাদা, সালিহ, আবুল খায়ল, মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি', 'আমর ইবন দীনার, আবান ইবন আবী' 'আয়্যাম (রহ) প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন।[৪]

ফিক্হ শাস্ত্রেও তিনি অতি উঁচু স্থানের অধিকারী ছিলেন। খলীফা ইবন খায়্যাত বলেন : তিনি বসরার সেই পাঁচজন ফকীহ্র মধ্যে গণ্য ছিলেন যাঁদেরকে তাঁদের যুগের ফকীহ বলে মানা হতো।[৫]

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১৮/৯৫; তাবি'ঈন-৪৭৮

২. আত-তাবাকাত-৭/১৩৭; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৯৫

৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/১৪০

৪. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৯৪

৫. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৯৩; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৯৫

নৈতিক গুণাবলী

'ইল্‌মের তুলনায় তাঁর 'আমল ছিল বেশী। ইবন সা'দ তো তাঁকে একজন 'আবিদ ও আল্লাহ্ ভীরু বলেছেন। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি বসরার ইবাদতকারী মহান ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন।[৬]

তিনি মনে করতেন, আল্লাহর প্রতি ঈমানের জন্য অপরিহার্য হলো তাঁর অপছন্দের সকল কথা-কাজ পরিহার করা। তিনি বলতেন, আমার বুঝে আসে না যে, বান্দা যদি আল্লাহর অপছন্দের সবকিছু ছেড়ে না দেয় তাহলে তার ঈমান কোন কাজে আসবে?[৭]

নামাযে আগ্রহ ও একাগ্রতা

তাঁর নামাযে এক বিশেষ অবস্থা ও তন্ময়ভাবের সৃষ্টি হতো। তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন এমন মনে হতো যে, তাঁর ওপর আলোকধারা নামছে। ইবন 'আওন বলেন, যখন তিনি নামাযের মধ্যে থাকতেন তখন তাঁকে প্রাণহীন কাঠের মত মনে হতো, শরীর ও কাপড়-চোপড় একটুও নড়াচড়া করতো না। নামাযরত অবস্থায় যত মারাত্মক ও ভয় পাইয়ে দেওয়ার মত অবস্থার সৃষ্টি হোক না কেন সে ব্যাপারে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়াই থাকতো না। একবার তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় পাশেই আগুন লাগে এবং অল্পক্ষণ পরে নিভেও যায়; কিন্তু তিনি মোটেও টের পাননি।[৮]

অসুস্থতার কারণে মানুষ যখন একেবারেই অপারগ হয়ে যায় সে সময় ছাড়া আর কোন অবস্থায় বসে নামায আদায় করা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার জনৈক ব্যক্তি নৌকায় বসে বসে নামায আদায়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন, এ আমার মোটেই পছন্দ নয় যে, কোন রোগ ছাড়া আল্লাহ্ আমাকে বসা অবস্থায় নামাযে দেখুক। নামাযের দিকে আহ্বানের এত গুরুত্ব দিতেন যে, যদি বহু দূর থেকেও আযানের ধ্বনি কানে ভেসে আসতো, সেই মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন। একবার তিনি কোন এক মসজিদ থেকে ফিরছেন। কিছু দূর যাওয়ার পর আযানের ধ্বনি কানে ভেসে এলো। তিনি আবার সেই মসজিদে ফিরে গেলেন। মুয়াযযিন জিজ্ঞেস করলো, আপনি আবার ফিরে এলেন কেন? বললেন : তুমিই তো ফিরিয়ে আনলে।[৯]

মসজিদের খিদমত ছিল তাঁর বিশেষ কাজ। মসজিদে তিনি বাতি জ্বালাতেন। এ কারণে লোকেরা তাঁকে مسلم المُصْبِحُ (বাতি প্রজ্জ্বলনকারী মুসলিম) বলতো।[১০]

সুন্নাহর অনুসরণ

সুন্নাহর অনুসরণের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। অতি মামুলি ধরনের সুন্নাতও ছুটে যেতে পারতো না। শুধু একটি সুন্নাতের অনুসরণ হবে এ চিন্তায় জুতাপরা অবস্থায় নামায আদায় করতেন। তিনি বলতেন, জুতা খোলা আমার জন্য খুবই সহজ কাজ, কিন্তু

---

৬. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/১৪১

৭. আত-তাবাকাত-৭/১৩৬

৮. প্রাগুক্ত-৭/১৩৫

৯. প্রাগুক্ত-৭/১৩৬

১০. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/১৪০; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৯৫

শুধুমাত্র সুন্নাতের অনুসরণ হবে এ চিন্তায় জুতো পরা অবস্থায় নামায আদায় করি। হযরত রাসূলে কারীম (সা) খোরমা দিয়ে ইফতার করতেন। এ কারণে খোরমা দিয়েই তাঁর ইফতার হতো।[১১]

কুরআনের প্রতি সম্মান

আল্লাহর কিতাব আল-কুরআনের প্রতি এত বেশী সম্মান প্রদর্শন করতেন যে, যে হাত দিয়ে কুরআন ধরতেন সে হাত দিয়ে নাজাসাতের স্থান স্পর্শ করতেন না। বলতেন, আমি ডান হাত দিয়ে যৌনাঙ্গ স্পর্শ করা খারাপ কাজ মনে করি। কারণ, ঐ হাত দিয়ে আমি কুরআন ধরি।

রিয়া তথা প্রদর্শনীমূলক মনোভাবকে তিনি মূর্খতা ও শয়তানের মন্ত্র বলে মনে করতেন। বলতেন, তোমরা আত্মপ্রদর্শনী থেকে দূরে থাক। কারণ, তা একজন 'আলিমকে মূর্খের পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং তার মাধ্যমেই শয়তান ভুল পথে চালিত করে।[১২]

তিনি অত্যন্ত ধীর-স্থির ও সহনশীল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। রাগের সময়ও মুখ থেকে অসমীচীন কথা উচ্চারিত হতো না। কখনো কাউকে গালি দেননি। সর্বাধিক উত্তেজিত অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে যে কথাটি উচ্চারিত হতো তা হলো : "এখন আমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নাও।" একথা উচ্চারিত হলে মানুষ বুঝে যেত তিনি তাঁর রাগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন।

এত ধীর-স্থির ও ধৈর্য-সহনশীল হওয়ার কারণে সকল হৈ-হাঙ্গামা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে তিনি দারুণ অপছন্দ করতেন। সে সময় মুহাম্মাদ ইবন আল-আশ'আছের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাতে অনেক উঁচু স্তরের তাবি'ঈ জড়িয়ে পড়েন। অন্যদের মত মুসলিমও তাতে অংশ গ্রহণ করেন। তবে তিনি কারো উপর তরবারি উঠাননি। শুধু এই অংশ গ্রহণের জন্য পরবর্তীতে অনুশোচনায় জর্জরিত হন। আবূ কিলাবা বলেন, একবার মক্কার সফরে আমি ও মুসলিম এক সাথে ছিলাম। তখন একদিন তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-আশ'আছের বিদ্রোহের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন : আলহামদু লিল্লাহ, আমি এই বিশৃঙ্খলায় না একটি তীর ছুড়েছি, না তরবারি চালিয়েছি, আর না একটি বর্শা নিক্ষেপ করেছি। আমি বললাম, কিন্তু আপনি বলুন তো, ঐ সকল লোকদের পরিণতি কি হবে যারা আপনাকে সারিতে দাঁড়ানো দেখে বলেছিল, মুসলিম ইবন ইয়াসার এই যুদ্ধে আছেন এবং তিনি কোন অন্যায় কাজে যুক্ত হতে পারেন না এবং এই বিশ্বাসে তারা যুদ্ধ করে মারা গেছে? আমার একথা শুনে তিনি ব্যাকুলভাবে কাঁদতে থাকেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে আমি লজ্জিত হলাম, তাঁকে এমন কথা বলার জন্য।[১৩]

ওফাত

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) খিলাফতকালে হিজরী ১০০ অথবা ১০১ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[১৪]

---

১১. আত-তাবাকাত-৭/১৩৬

১২. প্রাগুক্ত

১৩. প্রাগুক্ত-৭/১৩৭

১৪. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৯৫

মিস‘আর ইবন কিদাম (রহ)

হযরত মিস‘আরের (রহ) ডাকনাম আবূ সালামা। পিতা কিদাম ইবন জুহাইর। কুরায়শ গোত্রের আল-‘আমিরী শাখার সন্তান এবং কূফার অধিবাসী।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

তিনি জ্ঞান ও ধর্মচর্চা উভয় দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ তাবি‘ঈদের মধ্যে ছিলেন। ইয়া‘লা বলেন :[২] كان مسعر قد جمع العلم والورع - "মিস‘আর জ্ঞান ও ধার্মিকতার সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন।" ইরাকে তাঁর সমকক্ষ ‘আলিম খুব কমই ছিলেন। হিশাম ইবন ‘উরওয়া (রহ) বলেন, মিস‘আর ও আইউবের চেয়ে উত্তম কেউ আমাদের এখানে আসেনি।[৩] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদার ব্যাপারে সকলে একমত।[৪]

হাদীছ

তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীছ ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে একজন হাফিজ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ ‘আলিম বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবন বিশর বলেন :[৫] كان عند مسعر نحو ألف حديث فكتبتها سوى عشرة - "মিস‘আরের নিকট প্রায় এক হাজার হাদীছ ছিল। আমি দশটি ছাড়া সবই লিখেছি।" তিনি ‘আমর ইবন সা‘ঈদ নাখা‘ঈ, আবূ ইসহাক আস-সুবায়‘ঈ, সা‘ঈদ ইবন ইবরাহীম, ছাবিত ইবন ‘উবায়দুল্লাহ আল-আনসারী, ‘আবদুল মালিক ইবন নুমাইর, হিলাল ইবন জানাব, হাবীব ইবন আবী ছাবিত, ‘আলকামা ইবন মারছাদ, কাতাদা, মা‘আন ইবন ‘আবদির রহমান, মিকদাম ইবন শুরায়হ, আল-আ‘মাশ, ‘আদী ইবন ছাবিত, আল-হাকাম ইবন ‘উতায়বা (রহ)সহ বিশাল সংখ্যক মুহাদ্দিছের নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন।[৬]

তাঁর বর্ণিত হাদীছের মান

তাঁর বর্ণনাসমূহের বিশুদ্ধতার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, হযরত শু‘বার মত বিখ্যাত মুহাদ্দিছ তাবি‘ঈ বলেন :[৭]

كنا نسمي المصحف من اتقانه. - "তাঁর দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের কারণে আমরা

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৮৮; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৫১
২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৮৯
৩. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/১১৪
৪. তাহ্‌যীব আল-আসমা’ ওয়াল লুগাত-১/৮৯
৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৮৮
৬. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/১১৩; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৫১
৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৮৮

মিস'আরকে মাসহাফ বলতাম।" তাঁর ব্যক্তি সত্তা ছিল হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের মাপকাঠি। এ কারণে তাঁর উপাধি হয়ে যায় "মীযান" বা পাল্লা।[৮] আল-খুরায়বী বলেন :[৯]

ما من أحد الا وقد أخذ عليه إلا مسعر.

"খুব কম মুহাদ্দিছ এমন পাওয়া যাবে যাঁদের বর্ণনাসমূহ কোন না কোনভাবে সমালোচিত হয়নি। তবে মিস'আর এর ব্যতিক্রম।" হাদীছের ইমামগণ সন্দেহ ও মত পার্থক্যের স্থানে তাঁরই শরণাপন্ন হতেন। সুফইয়ান আছ-ছাওরী (রহ) বলেন, যখন হাদীছের কোন বিষয়ে আমাদের মধ্যে মত পার্থক্য হতো তখন আমরা মিস'আরকে জিজ্ঞেস করতাম।[১০] ইবরাহীম ইবন সা'দ বলতেন, যখন কারো ব্যাপারে সুফইয়ান ও শু'বার মধ্যে মত পার্থক্য হতো তখন তাঁরা মীযান মিস'আরের নিকট যেতেন।

হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর এত জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও তিনি হাদীছ বর্ণনায় খুব বেশী সাবধানতা অবলম্বন করতেন। তিনি এ দায়িত্ব পালনে এত ভয় পেতেন যেন তাঁর মাথার উপর কাঁচের বোঝা রয়েছে। একটু অসতর্ক হলেই তা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে। ইবন 'উয়ায়না বলেন, আমি মিস'আরকে একথা বলতে শুনেছি :[১১]

وددت أن الحديث كان قوارير على رأسي فسقطت فتكسرت.

আমি চেয়েছি, হাদীছ যদি আমার উপর কাঁচের বোঝার মত হতো, যা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে যায়। অর্থাৎ কারো মাথায় কাঁচের বোঝা থাকলে সে যেমন তা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কায় থাকে, তাই সব সময় সাবধানতা অবলম্বন করে। তেমনি তিনি হাদীছকে কাঁচ মনে করেছেন এবং সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। তাঁর এমন মাত্রাতিরিক্ত সাবধানতা সন্দেহের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। আবূ নু'আইম বলেন, মিস'আর তাঁর হাদীছসমূহের ব্যাপারে বড় সন্দেহপরায়ণ ছিলেন। তবে তিনি কোন ভুল করতেন না। আল-আ'মাশ বলতেন, মিস'আরের শয়তান তাঁকে দুর্বল করে তাঁর মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে থাকে।[১২]

তাঁর এই সন্দেহ তাঁর হাদীছসমূহের মান এত বাড়িয়ে দেয় যে, হাদীছ বিশারদগণ তাঁর সন্দেহকে দৃঢ় প্রত্যয়ের মর্যাদা দিতেন। লোকেরা আ'মাশকে বললো, মিস'আর তো তাঁর নিজের বর্ণিত হাদীছসমূহে সন্দেহ পোষণ করেন। তিনি তাদেরকে বলেন : شكه كيقين غيره – "তার সন্দেহ অন্যদের দৃঢ় প্রত্যয়ের মত।" এমন কথা ইমাম আল-ওয়াকী'ও বলেছেন। তবে ইয়াহইয়া আল-কাত্তান বলেন : ما رأيت أثبت من مسعر ـ – "আমি মিস'আরের চেয়ে বেশী বিশ্বস্ত ও আস্থাশীল আর কাউকে দেখিনি।"[১৩]

---

৮. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/১১৪
৯. প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৮
১০. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৮৯
১১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৯
১২. তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৫১
১৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৮

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি যদিও কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না, তবুও কূফার মুফতীগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন।[১৪]

দারসের আসর

মসজিদে তাঁর দারসের আসর ছিল। সালাত আদায়ের পর নিয়ম অনুযায়ী মসজিদে বসে যেতেন এবং হাদীছ শুনতে আগ্রহী লোকেরা বৃত্তাকারে তাঁর চার পাশে বসে যেতেন।[১৫] তাঁর সূত্রে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, মুহাম্মাদ ইবন বিশর, ইয়াহইয়া ইবন আদম, আবূ নু'আইম, খাল্লাদ ইবন ইয়াহইয়া, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক, ইয়াযীদ ইবন হারূন, শু'বা আল-হাজ্জাজ, মালিক ইবন মিগওয়াল, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, মুহাম্মাদ ইবন বিশর (রহ) ও আরো অনেকে।[১৬]

'ইবাদত-বন্দেগী

তাঁর মা ছিলেন একজন উঁচুস্তরের 'আবিদা। তাঁর পুণ্যময় তত্ত্বাবধানের গভীর প্রভাব পড়ে ছেলের উপর। মা সব সময় মসজিদে সালাত আদায় করতেন। মা ও ছেলে দু'জন অধিকাংশ সময় এক সাথে মসজিদে যেতেন। একটা পশমী চাদর মিস'আর হাতে করে নিতেন এবং মসজিদে পৌঁছে সেটা মা'র বসার জন্য বিছিয়ে দিতেন। তার ওপর দাঁড়িয়ে মা সালাত আদায় করতেন। আর মিস'আর সামনের সারিতে চলে যেতেন এবং সালাত শেষ করে একটি স্থানে বসে যেতেন। তাঁকে ঘিরে হাদীছের জ্ঞান অর্জনে উৎসাহী ছাত্ররা বসে যেত। তিনি তাঁদেরকে হাদীছ শোনাতেন। এর মধ্যে তাঁর মা 'ইবাদত ও যিক্‌র-আযকার শেষ করতেন। আর মিস'আর তাঁর দার্‌স (পাঠদান) শেষ করে মা'র কাছে এসে তাঁর চাদরটি উঠিয়ে মাকে সংগে নিয়ে ঘরে ফিরতেন। তাঁর মাত্র দু'টি ঠিকানাই ছিল; ঘর অথবা মসজিদ।[১৭] অতিরিক্ত 'ইবাদতের কারণে কপালে দাগ হয়ে গিয়েছিল। খালিদ ইবন 'আমর বলেন :[১৮]

رأيت مسعرًا كأن جبهته ركبة عنز من السجود.

"আমি মিস'আরকে দেখেছি, অতিরিক্ত সিজদার কারণে তাঁর কপাল ছাগলের হাঁটুর মত হয়ে গেছে।"

---

১৪. ই'লাম আল-মুওয়াক্‌কি'ঈন-১/২৮

১৫. আত-তাবাকাত-৬/২৫৩

১৬. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৮৮; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৫২

১৭. আত-তাবাকাত-৬/২৫৩-২৫৪

১৮. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৮৮

প্রতিদিন অর্ধেক কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ বলেন :[১৯]

كان أبى لا ينام إلا أن يقرأ نصف القرآن.

"আমার আব্বা অর্ধেক কুরআন পাঠ না করে ঘুমোতেন না।"

তিনি কোন একটি স্তরে পৌঁছে থেমে যেতেন না। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার ধাপ সর্বদাই উন্নত থেকে উন্নততর হতে থাকতো। মা'আন বলেন :[২০]

ما رأيت مسعرا إلا يزداد كل يوم خيرا.

"আমি মিস'আরকে প্রতি দিনই শুভ ও কল্যাণে কেবল উন্নতিই করতে দেখেছি।" তিনি 'ইবাদত-বন্দেগী, আধ্যাত্মিক সাধনা ও নৈতিক গুণাবলীতে এমন উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে যান যে, তাঁর জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে মানুষের কোন সন্দেহ ছিল না। যেমন আল-হাসান ইবন 'আম্মারা বলেন :[২১]

إن لم يدخل الجنة مثل مسعر فإن أهل الجنة لقليل.

"যদি মিস'আরের মত মানুষ জান্নাতে না যান তাহলে তো জান্নাতবাসীদের সংখ্যা অতি অল্পই হবে।"

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন আল-মুবারক (রহ) অথবা তাঁর মত অন্য কেউ হযরত মিস'আরের (রহ) আদত-অভ্যাস ও নৈতিক গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে একটি কবিতায় তা তুলে ধরেন। তার দু'টি চরণ নিম্নরূপ :[২২]

من كان ملتمسا جليسا صالحا + فليأت حلقة مسعر بن كدام

فيها السكينة والوقار وأهلها + أهل العفاف وعليه الأقوام.

"কেউ যদি সৎ সঙ্গী সন্ধান করে, সে যেন মিস'আর ইবন কিদামের আসরে আসে।

সেখানে আছে প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য এবং এর সদস্যরা হলো পূতঃপবিত্র এবং জাতির উঁচু স্তরের মানুষ।"

পার্থিব ধন-ঐশ্বর্যের প্রতি উদাসীনতা

দুনিয়া ও এর শান-শওকতের প্রতি একেবারেই উদাসীন ও বেপরোয়া ছিলেন। রাষ্ট্রীয় কোন পদের প্রতি কখনো চোখ তুলে তাকাননি। একবার মহা প্রতাপশালী আব্বাসীয় খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূর তাঁকে কোন একটি অঞ্চলের ওয়ালীর পদে নিয়োগ দিতে চান। তিনি বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা তো আমাকে দুই দিরহামের বাজার করারও যোগ্য মনে করে না। তারা বলে, আমরা তোমার দুই দিরহামের কিছু ক্রয় করাও

---

১৯. প্রাগুক্ত-১/১৮৯; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/১০৪

২০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৯

২১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৮৮

২২. প্রাগুক্ত-১/১৮৯-১৯০

পছন্দ করিনে। আর আপনি আমাকে ওয়ালীর পদে নিয়োগ দিতে চান? আল্লাহ্ আপনাকে ঠিক কাজ করার শক্তি দিন। আপনার সংগে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে, তাই আমি কিছু বলতে পারছি। খলীফা আবূ জা'ফার তাঁর এই আপত্তি মেনে নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।[২৩]

তিনি অত্যন্ত প্রফুল্ল স্বভাবের মানুষ ছিলেন। অন্যের আবেগ-আগ্রহের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাতেন। কেউ যখন তাঁকে একটি হাদীছ শোনাতো যা তাঁর আগেই জানা থাকতো তখন কেবল সেই লোকটির সন্তুষ্টি ও হাদীছের মর্যাদার খাতিরে চুপ করে শুনে যেতেন, যেন হাদীছটি তিনি পূর্বে কখনো শোনেননি।[২৪]

ওফাত

তিনি হিজরী ১৫৫ মতান্তরে ১৫৩ সনে কূফায় ইনতিকাল করেন।[২৫]

মুস'আব ইবন আল-মিকদাম বলেন : আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) স্বপ্নে দেখলাম। সুফইয়ান রাসূলের (সা) একটি হাত ধরে আছেন এবং এ অবস্থায় দু'জন কা'বা তাওয়াফ করছেন। সুফইয়ান রাসূলকে (সা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! মিস'আর কি মৃত্যু বরণ করেছেন? বললেন : হাঁ, তাঁর মৃত্যুতে আসমানবাসীরা সুসংবাদ লাভ করেছে।[২৬]

---

২৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/১০৪; প্রাগুক্ত-১/১৮৯

২৪. আত-তাবাকাত-৬/২৫৩

২৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৯০; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৫১

২৬. তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৫৪

মুতার্‌রিফ ইবন 'আবদিল্লাহ্ ইবন আশ-শিখ্‌খীর (রহ)

হযরত আবূ 'আবদিল্লাহ মুতার্‌রিফের (রহ) বংশধারা এরূপ :

مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير بن عوف بن كعب بن وفدان بن الحريش بـن كعـب بن ربيعة بن عامر بن صعصه.

'আবদুল্লাহ তাঁর পিতা ও আশ-শিখ্‌খীর দাদা। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় তাঁর জন্ম। কিন্তু অল্প বয়স অথবা দূরে অবস্থানের কারণে মহানবীর সাক্ষাৎ ও সাহচর্যের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থেকে যান।[১] ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল্লাহ্ আশ-শিখ্‌খীর ও হানী ইবন 'আবদিল্লাহ আশ-শিখ্‌খীর তাঁর দু'ভাই।[২]

জ্ঞান অর্জন

জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর ছিল তীব্র আবেগ ও আগ্রহ। জ্ঞানের গুণ-ফযীলতকে 'ইবাদতের গুণ-ফযীলতের উপর প্রাধান্য দিতেন।[৩] এই প্রবল আগ্রহ ও আবেগ তাঁকে জ্ঞানীদের উচ্চাসনে বসায়। খোদাভীতি, ভদ্রতা, শিষ্টাচারিতা তথা যাবতীয় নৈতিক গুণ ও উৎকর্ষে ছিলেন আদর্শ স্থানীয়। ইবন সা'দ বলেন, তাঁর ব্যক্তি সত্তায় খোদাভীতি, মহৎ গুণ, বর্ণনা ক্ষমতা, প্রজ্ঞা ও সাহিত্য প্রতিভা ইত্যাদি গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি তাঁকে বসরার মনীষীদের তৃতীয় তবকায় স্থান দিয়েছেন।[৪] ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি 'ইল্‌ম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের চূড়া সমতুল্য ছিলেন। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণে মানুষের অন্তরে বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৫]

হাদীছ

তাঁর সময়ে বিশাল সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম (রা) জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁদের জ্ঞানের ঝর্ণাধারা থেকে পরিতৃপ্ত হন। হযরত 'উছমান, 'আলী, আবূ যার, 'আম্মার ইবন ইয়াসির, 'আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্‌ফাল, 'উছমান ইবন আবিল 'আস, 'ইমরান ইবন হুসাইন, মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান (রা) প্রমুখ উঁচু মর্যাদার সাহাবায়ে কিরামের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান লাভে যাঁরা ধন্য হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হলেন : তাঁর ভাই আবুল 'আলা' ইয়াযীদ, ভাতীজা 'আবদুল্লাহ্

---

১. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/১৭৪
২. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/১৪৩
৩. আত-তাবাকাত-৭/১০৩
৪. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/১৪৩
৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬৫

ইবন হানী এবং হাসান আল-বসরী, হুমায়দ ইবন হিলাল, আবূ নাসর, গায়লান ইবন জারীর, সা'ঈদ ইবন আবী হিন্দ, মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি', আবুত তায়য়াহ, ছাবিত আল-বানানী, 'আবদুল কারীম ইবন রুশাইদ, সা'ঈদ আল-হারীরী, আবূ সালামা, সা'ঈদ ইবন ইয়াযীদ (রহ) ও আরো অনেকে।[৬] ফিক্হ শাস্ত্রেও তাঁর পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন বসরার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফতী।[৭]

তাঁর এই জ্ঞান ও মনীষার তুলনায় তাঁর আমল, পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি নির্মোহ ভাব এবং খোদাভীরুতার পাল্লা ভারী ছিল। ইবন সা'দ তাঁকে অত্যধিক আল্লাহ ভীরু লোকদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন।[৮] 'আজলী তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ এবং সত্যনিষ্ঠ মানুষ বলেছেন। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি ছিলেন বসরার একজন 'আবিদ ও যাহিদ (তাপস ও দুনিয়া বিরাগী) মানুষ।[৯]

দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা পরিহার

তাঁর এমন দুনিয়া বিরাগী মনোভাব ও আল্লাহ ভীরুতার কারণে তিনি সব ধরনের হৈ-হাঙ্গামা ও বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলাকে দারুণ ভয় করতেন। এ জাতীয় কাজকে তিনি একটা পরীক্ষা বলে মনে করতেন। বলতেন, ফিতনা-ফাসাদ পথ প্রদর্শনের জন্য নয়, বরং ঈমানদার ব্যক্তিকে তার নিজের নফসের সংগে সংঘাত-সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়ার জন্য মাথা তুলে দাঁড়ায়। তাঁর জীবনকালে বড় বড় বিপ্লব ও ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু তিনি সবকিছু থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে রেখেছেন। সাধারণতঃ ফিতনা-ফাসাদের সময় তিনি সে স্থান ত্যাগ করে কোন অজ্ঞাত স্থানে চলে যেতেন। যদি যাওয়ার সুযোগ না পেতেন তাহলে ঘরে চুপ করে বসে থাকতেন। এমনকি জুম'আ ও জামা'আতের জন্যও বের হতেন না। 'উকবা বলেন, আমি মুতাররিফের ভাই ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, ফিতনা বা বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো তখন মুতাররিফ কী করতেন? তিনি বললেন, ঘরের অভ্যন্তরে একেবারে নির্জনবাস অবলম্বন করতেন।

আর যতদিন বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলার অগ্নিশিখা প্রশমিত না হতো ততদিন তিনি মানুষের জুম'আ ও জামা'আতে শরীক হতেন না। অন্যদেরকেও তিনি এই ফিতনা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন। হযরত কাতাদা (রহ) বলেন, যখন কোন ফিতনা-ফাসাদ দেখা দিত তখন মুতাররিফ মানুষকে তাতে জড়িত হতে বাধা দিতেন এবং নিজে কোথাও পালিয়ে যেতেন। হাসান আল-বাসরীও মানুষকে বাধা দিতেন, তবে তিনি স্থান ত্যাগ করতেন না। এ কারণে মুতাররিফ তাঁর সম্পর্কে বলতেন, হাসান আল-বাসরী সেই ব্যক্তির মত যে মানুষকে প্লাবন থেকে সতর্ক করে, কিন্তু নিজে তার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে।[১০]

---

৬. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/১৭২; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/১৪৩
৭. ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/৬৭
৮. আত-তাবাকাত-৭/১০৩
৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১০/১৭৩
১০. আত-তাবাকাত-৭/১০৩

চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতার কারণে তিনি সেই সব সংঘাত-সংঘর্ষের অবস্থা সম্পর্কেও কোন কিছু জানতে চাইতেন না। 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবায়র (রা) ও বানূ উমাইয়্যাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাঁর সময়ে হয়। তিনি এই বিরোধের কথা কারো কাছে কিছুই জানতে চাইতেন না। মানুষ যেহেতু তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে অবহিত ছিল এ কারণে তারাও তাঁর সামনে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করতো না।[১১]

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ও 'আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে 'আবদুর রহমান ইবন আল-আশ'আছ যে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন তাতে অনেক বড় বড় সাহাবী অংশ গ্রহণ করেন। মানুষ মুতার্‌রিফকেও অংশ গ্রহণের জন্য চাপ দিতে থাকে, কিন্তু তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন : তোমরা যে জিনিসে অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছো তা কি "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ থেকেও উত্তম হবে?" লোকেরা বললো : না। তিনি বললেন, তাহলে আমি ধ্বংসের মধ্যে পতিত হওয়া এবং সম্মান ও মর্যাদা অর্জনের মধ্যে জুয়া খেলতে চাই না। অর্থাৎ সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ যুদ্ধে জড়াতে চাই না। শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন তাঁর পছন্দ ছিল। বলতেন, শান্তি ও নিরাপদ জীবন লাভ করে শুকরিয়া আদায় করা বিপদ-মুসীবতে ধৈর্য ধারণের চেয়ে আমার নিকট বেশী পছন্দের।[১২] আল-'ইজলী' বলেন, ইবন আল-আশ'আছের ফিত্‌না থেকে বসরার মাত্র দু'ব্যক্তি রক্ষা পেয়েছিলেন। তারা হলেন : মুতার্‌রিফ ও মুহাম্মাদ ইবন সীরীন।[১৩]

'আকীদা-বিশ্বাস

'আকীদার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন এবং তা সংরক্ষণের জন্য ভীষণ যত্নবান ছিলেন। একবার খারিজীদের একটি উপদল তাঁর নিকট আসে এবং তাদের আকীদাসমূহ গ্রহণ করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানায়। তিনি তাদেরকে বলেন, যদি আমার দু'টি অন্তর থাকতো তাহলে একটিতে তোমাদের 'আকীদাসমূহ স্থান দিতাম এবং অন্যটি সংরক্ষণ করতাম। তোমরা যা বলছো তা যদি সঠিক হতো তাহলে দ্বিতীয়টি দিয়ে তোমাদের অনুসরণ করতাম। আর যদি ভুল হতো তাহলে একটি ধ্বংস হলেও অন্যটি তো রক্ষা পেত। কিন্তু অন্তর তো মাত্র একটি। এ কারণে আমি তাকে ধোঁকা ও প্রতারণার কাজে লাগাতে পারিনে।[১৪]

যদিও তিনি একজন বড় দুনিয়া বিরাগী খোদাভীরু মানুষ ছিলেন, তাই বলে অদৃষ্টবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কর্মবাদী মানুষ। এ পৃথিবী কার্যকারণ– বিশ্ব বলে জানতেন। তাই বলতেন, এটা বৈধ নয় যে, কোন ব্যক্তি কোন উঁচু স্থান থেকে নিজেকে নীচে ফেলে দিয়ে বলে যে, আল্লাহ আমার তাকদীর এভাবেই নির্ধারণ করেছেন। বরং মানুষের উচিত

---

১১. প্রাগুক্ত-৭/১০৪

১২. প্রাগুক্ত

১৩. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/১৪৩

১৪. আত-তাবাকাত-৭/১০৪; তাবি'ঈন-৪৮৪

বেঁচে থাকা এবং চেষ্টা করা। যদি সকল সতর্কতা ও চেষ্টা-সাধনা সত্ত্বেও তার কোন ক্ষতি হয় অথবা তার উপর কোন বিপদ আপতিত হয় তাহলে তাকে আল্লাহর তাকদীর বলে বিশ্বাস করা উচিত। আল্লাহর তাকদীর ছাড়া কোন বিপদ-মুসীবত আপতিত হতে পারে না।[১৫] এ কারণে তিনি "তাঊন" (প্লেগ) জাতীয় কোন মহামারী দেখা দিলে জনসমাগমের স্থান থেকে দূরে সরে যেতেন।[১৬]

তাঁর এমন কিছু কথা আছে যা গভীর ভাব ও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলতেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে 'আকল তথা বুদ্ধির চেয়ে ভালো আর কোন জিনিষ দেয়া হয়নি। মানুষের বুদ্ধি তাঁর যুগ ও কাল অনুযায়ী হয়। নিজের খাবার এমন ব্যক্তিকে খাওয়াবে না যার খাওয়ার রুচি নেই।[১৭] অর্থাৎ অহেতুক কোন কিছু বিনষ্ট করবে না।

পার্থিব জাঁকজমক

এ পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষের খাদ্য-খাবারের জন্য যা কিছু দান করেছেন তা ভোগ করা তিনি দোষের কিছু মনে করতেন না। বিশাল ধন-সম্পদ তিনি লাভ করেছিলেন। তাই তিনি বেশ জাঁকজমক ও সম্মানের জীবন যাপন করতেন। ইমাম যাহাবী (রহ) লিখেছেন, মুতাররিফ একজন নেতা ও উঁচু মর্যাদার মানুষ ছিলেন। অতি উন্নত মানের পোশাক পরতেন, শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের দরবারে যাতায়াত করতেন।[১৮] তবে তাঁর এই বাহ্যিক জাঁকজমক তাঁর নৈতিক মানের উপর কোন রকম প্রভাব ফেলতো না। গায়লান ইবন জারীর বলেন, 'তিনি বারানুস (برانس) নামক এক প্রকার টুপি ও মাতারিফ (مطارف) নামক এক বিশেষ ধরনের দামী চাদর পরতেন। ঘোড়ায় চড়তেন এবং শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারী আমীর-উমারাদের নিকট যেতেন। তবে তাঁর এই শান-শওকতের জীবনধারা সত্ত্বেও তুমি তাঁর নিকট গেলে তোমার অন্তর ও দৃষ্টিতে প্রশান্তির ভাব সৃষ্টি হবে।'[১৯]

ওফাত

হিজরী ৯৫ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[২০] মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। তিনি পুত্রকে ডেকে কুরআনের অসীয়াতের আয়াতটি পাঠ করে শোনান। পুত্র দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে ডাক্তার ডেকে আনে। ডাক্তারকে দেখে বলেন : তিনি কে? পুত্র বলে : ডাক্তার। তিনি ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বলেন : আমি কঠোরভাবে নিষেধ করছি, আমাকে যেন ঝাড়-ফুঁক করা না হয়, আমার

---

১৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৪

১৬. আত-তাবাকাত-৭/১০৫

১৭. প্রাগুক্ত-৭/১০৪

১৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৫

১৯. আত-তাবাকাত-৭/১০৫

২০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৫; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/১৪৪

গায়ে যেন তাবীজ-কবজ ঝোলানো না হয়। তারপর পুত্রকে কবর তৈরির নির্দেশ দেন। সে নির্দেশমত কবর তৈরি করে। তারপর তিনি বলেন, আমাকে কবরের নিকট নিয়ে চলো। সেখানে নেয়া হয়। তিনি কবরের পাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করে, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে দু'আ করেন। তারপর ঘরে ফিরে এসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[২১]

তিনি বলতেন :[২২]

إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيما لاموت فيه.

'এই মৃত্যু বিত্ত-বৈভবের মালিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তালাশ কর যাতে মৃত্যু নেই।'

গায়লান ইবন জারীর বলেন, একবার কোন একটি ব্যাপার নিয়ে এক ব্যক্তির সাথে মুতার্‌রিফের কিছু কথা কাটাকাটি হয়। লোকটি মুতার্‌রিফের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। সাথে সাথে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে যায় এই বদ-দু'আ :

اللهم إن كان كاذبًا فأمته. – 'হে আল্লাহ! যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার মরণ দাও।' লোকটি সেখানেই ঢলে পড়ে এবং মারা যায়। ব্যাপারটি যিয়াদের দরবার পর্যন্ত গড়ালো। যিয়াদ তাঁকে বললেন : আপনি লোকটিকে মেরে ফেললেন? মুতার্‌রিফ বললেন : না, আমি মারিনি। তবে আমার দু'আ তার নির্ধারিত সময়ের সাথে মিলে গেছে।[২৩]

---

২১. আত-তাবাকাত-৭/১০৬; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬৪

২২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬৫

২৩. প্রাগুক্ত-১/৬৪; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/১৪৫-১৪৬

মায়মূন ইবন মিহ্‌রান (রহ)

হযরত মায়মূনের (রহ) ডাকনাম আবূ আইউব। পিতা মিহ্‌রান ছিলেন বানূ নাসর ইবন মু'আবিয়ার মুকাতিব দাস। যে দাস নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ মনিবকে দিয়ে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে বলে মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় তাকে মুকাতিব দাস বলে। মায়মূন হিজরী ৪০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। কূফার আয্‌দ গোত্রের এক মহিলার দাস হিসেবে তাঁর জীবন শুরু হয়। পরবর্তীতে ঐ মহিলা তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। কূফায় বেড়ে ওঠেন এবং পরবর্তীতে 'রাক্কা' চলে যান। একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) এক প্রশ্নের জবাবে মায়মূন বলেন, আমার মা ছিলেন আয্‌দ গোত্রের দাসী, আর বাবা ছিলেন বানূ নাসর ইবন মু'আবিয়ার মুকাতিব। আমার জন্মের সময়ও তিনি মুকাতিব ছিলেন। কাছীর ইবন হিশাম বলেন, সা'ঈদ ইবন জুবায়রের মেয়ে ছিলেন মায়মূনের স্ত্রী।[১]

জাযীরায় অবস্থান

দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের পর দীর্ঘদিন কূফাতেই অবস্থান করেন। হিজরী ৮০ সনে যখন 'আবদুর রহমান ইবন আল-আশ'আছের বিদ্রোহের কারণে কূফায় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন তিনি কূফা ছেড়ে জাযীরায় চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।[২]

বায়তুল মাল রক্ষকের পদে

মুহাম্মাদ ইবনে মারওয়ান যখন খুরাসানের ওয়ালী তখন তিনি তথাকার বায়তুল মালের রক্ষকের পদে মায়মূনকে নিয়োগ করেন।

খারাজের পদে

বায়তুল মালের রক্ষণাবেক্ষণের ধারাবাহিকতায় অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি যথেষ্ট বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ কারণে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁকে আল-জাযীরার খারাজ (খাজনা-ট্যাক্স) বিষয়ক দফতরের দায়িত্ব দেন এবং তাঁর পুত্র 'উমারকে উক্ত দফতরের হিসাব রক্ষকের পদে নিয়োগ করেন। স্বভাবগতভাবেই মায়মূন সব ধরনের রাষ্ট্রীয় পদ, বিশেষতঃ অর্থ বিষয়ক দায়িত্ব দারুণ অপছন্দ করতেন। তবে সে সময় তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারেননি। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। খলীফা 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁর

---

১. তাহ্‌যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১৮/৫৪৫-৫৪৬

২. প্রাগুক্ত-১৮/৫৪৬

পদত্যাগ গ্রহণ করেননি। তিনি মায়মূনকে লেখেন, এই পদের দায়িত্ব তো এতটুকুই যে, বৈধ পন্থায় অর্থ আদায় করবে এবং বৈধ খাতগুলোতে তা ব্যয় করবে। এ কাজে পদ ত্যাগের কি কারণ থাকতে পারে? আর একটু কষ্ট হলেই যদি মানুষ সবকিছু ছেড়ে দেয় তাহলে দীন ও দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা টিকবে কেমন করে।[৩] 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) এ লেখা পেয়ে তিনি পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নেন এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এ পদে বহাল থেকে দায়িত্ব পালন করেন।

'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) পরবর্তী খলীফা ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের খিলাফতকালের প্রথম কিছুদিন তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু এ কাজ তাঁর স্বভাবগতভাবেই অপছন্দ ছিল। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের পীড়াপীড়িতে তা এই ভিত্তিতে মেনে নেন যে, তাঁর সময়ের রাষ্ট্রীয় সেবা মূলতঃ ইসলামের সেবা ছিল। তবে তাঁর পরে যখন খিলাফতের সকল বিভাগ পার্থিব রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপ ধারণ করে তখন তিনি বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করেন। ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের সময়ে যে দিনগুলো এ দায়িত্ব পালন করেন তার জন্য আফসোস করতেন। তিনি বলতেন, আমি অন্ধ হয়ে যেতাম তাও আমার জন্য ভালো ছিল, যদি না আমি 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) ও অন্যদের দেয়া পদ গ্রহণ করতাম।[৪]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞান মনীষায় তিনি শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ ও আল-জাযীরার উচ্চ পর্যায়ের 'আলিমদের মধ্যে ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ইমাম, নেতা ও আল-জাযীরার 'আলিম বলেছেন।[৫] তাঁর সমকালীন 'আলিমদের মধ্যে তাঁর জ্ঞানগত মর্যাদা স্বীকৃত ছিল। আবুল মালীহ বলতেন, আমি মায়মূনের চেয়ে উত্তম কাউকে পাইনি।[৬] সুলায়মান ইবন মূসা বলেন, সেই আমলে চারজনকে বড় 'আলিম বলে মানা হতো। মায়মূন ইবন মিহ্‌রান তাঁদের একজন। অন্য তিনজন হলেন : মাকহূল, হাসান আল-বাসরী ও আয-যুহ্‌রী।[৭]

হাদীছ

তিনি হাদীছের হাফিজ ছিলেন। ইবন সা'দ বলেন : كان ثقة قليل الحديث. – 'তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, অল্প সংখ্যক হাদীছের ধারক-বাহক।' সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনি হযরত 'আবূ হুরায়রা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র, সা'ঈদ ইবন জুবায়র, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা), উম্মুদ দারদা' (রা) এবং তাবি'ঈদের মধ্যে হযরত নাফি' মাওলা ইবন 'উমার, মাকসাম মাওলা ইবন

---

৩. প্রাগুক্ত-১৮/৫৪৯-৫৫০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৫/৭৪

৪. আত-তাবাকাত-৭/১৭৭-১৭৮; 'আসরুত তাবি'ঈন-৫২৫

৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৮

৬. প্রাগুক্ত

৭. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/৩৯১; 'আসরুত তাবি'ঈন-৫২২

'আব্বাস (রা), ইয়াযীদ ইবন 'আসিম (রহ) প্রমুখের নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন।[৮]

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

হুমায়দ আত-তাবীল, আইউব আস-সাখতিয়ানী, জা'ফার ইবন বারকান, জা'ফার ইবন ওয়াহশিয়্যা, হাবীব ইবন শাহীদ, 'আলী ইবন হাকাম আন-নাবানী, হাকাম ইবন 'উতায়বা, আবূ ফারওয়া, ইয়াযীদ ইবন সিনান, হাজ্জাজ ইবন তামীম, সালিম ইবন আবিল মুহাজির, আবুল মালীহ (রহ) প্রমুখ তাঁর কীর্তিমান ছাত্র। আবূ 'আরূবা আল-হাররানী তাঁকে আল-জাযীরার তাবি'ঈদের ১ম স্তরে স্থান দিয়েছেন।[৯]

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ শাস্ত্রে তিনি আল-জাযীরার সকল 'আলিমের মধ্যে বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিলেন। ইবন সা'দ তাঁকে আল-জাযীরার সকল অধিবাসীদের মধ্যে ফিক্‌হ ও ফাতওয়ায় শীর্ষ স্থানের অধিকারী বলেছেন।[১০] ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর দক্ষতার সবচেয়ে বড় সনদ এই যে, হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) মত বিচক্ষণ খলীফা আল-জাযীরার খারাজ বিভাগের দায়িত্বের পাশাপাশি কাজীর দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পণ করেন।[১১]

জ্ঞানের পাশাপাশি উন্নত নৈতিকতার অধিকারী ছিলেন। শরী'আত নিষিদ্ধ বস্তু ও বিষয় থেকে দূরে থাকার প্রতি দারুণ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর পুত্র বলেন, আব্বা মধ্যপন্থা থেকে বেশি রোযা-নামায করতেন না। তবে আল্লাহর অবাধ্যতাকে ভীষণ অপছন্দ করতেন।[১২] মাঝে মাঝে রাত-দিনে হাজার রাক'আত নফল নামাযও আদায় করতেন। একবার সতের দিনে সতের হাজার রাক'আত নফল নামায আদায় করেন। ১৮তম দিনে পেটে কোন ক্ষতের কারণে ইনতিকাল করেন।[১৩]

বিনীত ও বিনম্রভাব

এত বিনয় ও বিনম্র ছিলেন যে, কোন প্রকার অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার ভাব ফুটে ওঠে এমন আচরণ মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলে, আবূ আইউব! যতদিন আল্লাহ আপনাকে জীবিত রাখবেন ততদিন মানুষ সুখে থাকবে। এর জবাবে তিনি বলেন, এমন কথা উচ্চারণ করবে না। মানুষ ততদিন পর্যন্ত সুখে থাকবে যতদিন তারা তাদের প্রভুকে (রব) ভয় করতে থাকবে।[১৪]

---

৮. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/৩৯০; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯৮; তাহযীব আল-কামাল-১৮/৫৪৫

৯. প্রাগুক্ত

১০. আত-তাবাকাত-৭/১৭৮

১১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯৮

১২. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/৩৯১

১৩. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯৮; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৫৫৪

১৪. প্রাগুক্ত

হযরত 'আলীর (রা) উপর হযরত 'উছমানকে (রা) প্রাধান্য দান

জীবনের প্রথম পর্বে তিনি হযরত 'উছমানের (রা) বিপরীতে হযরত 'আলীকে (রা) প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) মুখে একটি যুক্তি শোনার পর তিনি হযরত 'উছমানের (রা) শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা হয়ে যান। একবার 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এমন দু'ব্যক্তির মধ্যে কাকে বেশি পছন্দ কর, যাদের একজন অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করেছেন এবং অন্যজন দ্রুততা করেছেন রক্তপাতের ব্যাপারে? প্রশ্নাকারে এ যুক্তি শোনার পর তিনি তাঁর পূর্বের বিশ্বাস থেকে সরে আসেন।[১৫] হযরত 'উছমানের (রা) বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল, তাঁর খিলাফতকালে বায়তুল মালের অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় হয়নি, আর হযরত 'আলীর (রা) সময়ে গৃহ যুদ্ধের সূচনা হয়।

মেয়ের বিয়ে

মায়মূন ইবন মিহ্‌রান প্রথম যৌবনেই বিয়ে করেন এবং বিয়ের পরেই প্রথমে এক কন্যার পিতা হন। পিতা-মাতা অতি আদরে মেয়েকে গড়ে তোলেন। জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও দীনী পরিবেশে বেড়ে ওঠায় তার মধ্যেও সৎ গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। মেয়েটির বিয়ের বয়স হলো। বহু অভিজাত ঘরের বিত্তশালী যুবক বিয়ের পয়গাম পাঠাতে লাগলো। মায়মূন মেয়ের বর হিসেবে আভিজাত্য ও বিত্ত-বৈভবকে মোটেও গুরুত্ব দিলেন না। তিনি গুরুত্ব দিলেন পাত্রের সত্যনিষ্ঠতা ও আল্লাহ্ ভীতিকে। এমন একজন দরিদ্র পাত্রকেই তিনি মেয়ের জন্য নির্বাচন করেন। একজন বিত্তশালী অভিজাত যুবক বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তাকে পরীক্ষার জন্য বলেন : আমার মেয়ে তো প্রচুর সোনা-রূপো পছন্দ করে। সাথে সাথে সে জবাব দেয়, আমার তা আছে। মায়মূন একটু হেসে বলেন : আমি আমার মেয়ের জন্য এমন পাত্র নির্বাচন করতে পারিনে।[১৬]

তাঁর একটি তৎক্ষণিক মন্তব্য

তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী মানুষ। সত্য কথা বলতে কোন রকম ইতস্তত করতেন না। একদিন তিনি মসজিদে নফল নামায আদায় করছেন। নামায শেষ করতেই এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললো : হিশাম ইবন 'আবদিল মালিকের স্ত্রী ইনতিকাল করেছেন। মায়মূন 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' পাঠ করলেন। লোকটি কিছুক্ষণ চুপ থেকে মাথা একটু উঁচু করে আবার বললো : আপনি কি জানেন মৃত্যুর আগে অসুস্থ অবস্থায় হিশামের স্ত্রী কী করেছেন? মায়মূন বললেন : না। কী করেছেন? লোকটি বললো : তার মালিকানার সকল দাস-দাসী মুক্ত করে দিয়েছেন। মায়মূন বিস্ময়ের সুরে বললেন : সুবহানাল্লাহ! দুইবার আল্লাহর অবাধ্যতা করেছেন। আল্লাহ অর্থ-সম্পদ খরচ

---

১৫. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১০/৩৯১; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৫৪৭

১৬. 'আসরুত তাবি'ঈন-৫২৫-৫২৬; তাবি'ঈন-৪৯৫

করার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ তিনি সে ব্যাপারে জীবিত অবস্থায় কার্পণ্য করেছেন, আর যখন সে সম্পদ অন্যের হয়ে যাচ্ছে তখন তা খরচের ব্যাপারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন।[১৭]

হাসান আল-বাসরীর (রহ) সাথে একটি সাক্ষাৎকার

মায়মূন ইবন মিহ্‌রান বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। চোখ-কানও দুর্বল হয়ে গেছে। এখন আর একাকী চলতে-ফিরতে পারেন না। যেখানেই যান ছেলে 'আমর ইবন মায়মূনকে সংগে নিয়ে যান। একদিন 'আমর পিতাকে নিয়ে বসরার একটি পথে বের হয়েছেন। পথে সরু একটি নালা। বৃদ্ধ পিতা তা ডিঙ্গিয়ে পার হতে পারলেন না। 'আমর আড়াআড়িভাবে নালার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো, আর পিতা মায়মূন ছেলের পিঠের উপর দিয়ে নালা পার হলেন। তারপর 'আমর উঠে দাঁড়িয়ে আবার পিতার হাত ধরে চলতে লাগলেন।

মায়মূন ছেলেকে হাসান আল-বাসরীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য বললেন। তাঁরা হাসানের দরজায় পৌঁছে তাঁদের উপস্থিতি জানালেন। হাসানের এক দাসী এসে জিজ্ঞেস করলো : এ বৃদ্ধ কে? 'আমর বললো : মায়মূন ইবন মিহ্‌রান এসেছেন হাসান আল-বাসরীর সাথে সাক্ষাৎ করতে। দাসী বললো : কোন মায়মূন, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের কাতিব (সেক্রেটারী)? 'আমর বললো : হাঁ, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের সেক্রেটারী। দাসী সাথে সাথে বলে উঠলো : হায় আমার দুর্ভাগ্য! এমন মন্দ সময়েও আপনি বেঁচে আছেন? দাসীর কথা শুনে মায়মূন কেঁদে দিলেন এবং এত বেশি কাঁদলেন যে তাঁর সারা দেহ কাঁপতে থাকলো। দাসী চলে যাওয়ার পর হাসান আল-বাসরী ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং মায়মূনকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করেন। তারপর তাঁরা সকলে ভিতরে প্রবেশ করেন। বসার পর একটু স্থির হয়ে মায়মূন হাসান আল-বাসরীকে লক্ষ্য করে বলেন : আবূ সা'ঈদ! আমি আমার অন্তরে কঠোরতা অনুভব করছি, এর প্রতিকার কিসে হয় তা বলে দিন। মায়মূনের কথা শুনে হাসান সোজা হয়ে বসলেন, তারপর পাঠ করলেন :[১৮]

بسم الله الرحمن الرحيم ـ أَفَرَءَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِيْنَ. ثُمَّ جَاءَهُمْ مَّاكَانُوْا يُوْعَدُوْنَ. مَـا أَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ.

'তুমি ভেবে দেখ যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দেই এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে, তখন তাঁদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি?' তিলাওয়াত শেষ করে হাসান দীর্ঘক্ষণ অবচেতন অবস্থায় থাকলেন, তারপর সম্বিত ফিরে পেলেন। তখন দাসীটি এসে বললো : আপনারা এই বৃদ্ধকে কষ্ট দিচ্ছেন, এবার উঠুন, যান!

---

১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৫/৭৬

১৮. সূরা আশ-শু'আরা'-২০৫-২০৭

'আমর পিতার হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। চলতে চলতে 'আমর বলে : 'আব্বা! আমার ধারণা ছিল হাসান এর চেয়ে বেশি সবল আছেন। মায়মূন ছেলের বুকে হাত দিয়ে গুঁতো মেরে বলেন : বেটা! তিনি এমন একটি আয়াত আমাদের সামনে পাঠ করেছেন, তুমি যদি তার অর্থ বুঝতে তাহলে তোমার জন্য তার মধ্যে খুব বড় উপদেশ রয়েছে।[১৯]

তারপর তিনি ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেন, এই কুরআন বহু মানুষের অন্তরে অনেক কিছু সৃষ্টি করেছে এবং তারা এর বাইরে হাদীছ তালাশ করেছে। তাদের অনেকে তাদের অর্জিত এই জ্ঞানকে পণ্য বানিয়ে তার বিনিময়ে দুনিয়ার প্রত্যাশী যেমন হয়েছে তেমনি অনেকে চেয়েছে মানুষ তার দিকে আংগুল দিয়ে ইশারা করুক, আবার অনেকে চেয়েছে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদ করে প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী হতে। তবে সেই ব্যক্তিই ভালো যে জ্ঞান অর্জন করে এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য করে। যে কুরআনের অনুসরণ করবে, কুরআন তাকে পথ দেখিয়ে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে। আর যে কুরআন ত্যাগ করবে, কুরআন তাকে ত্যাগ না করে তার পিছে পিছে চলতে থাকবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। তারপর তিনি ছেলেকে বলেন : আল্লাহকে ভয় কর। কোন লোভ ও ক্রোধ যেন তোমাকে বিকৃত না করে।[২০]

তাঁর কিছু ওয়াজ-নসীহত

একদিন 'আমর তার পিতাকে মসজিদে নিয়ে গেল। এক কোণে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানটিতে তিনি বসলেন। মানুষের ভীড় জমে গেল এবং তাঁর চারপাশে বৃত্তাকারে বসে গেল। মায়মূন তাঁর অভ্যাস মত আল্লাহর হামদ ও রাসূলের (সা) প্রতি দরূদ ও সালাম পেশের মাধ্যমে বলতে আরম্ভ করলেন : ওহে যুব সম্প্রদায়, তোমাদের শক্তিকে তোমরা তোমাদের যুবকদের মধ্যে পুঞ্জিভূত কর এবং আল্লাহর আনুগত্যের জন্য তোমাদের কর্ম তৎপরতা পরিচালিত কর। ওহে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ! আর কত দিন মরীচিকার পিছনে ছুটবে?[২১]

আল্লাহর যিক্‌র বা স্মরণ দু'প্রকার। মুখে আল্লাহকে স্মরণ করা, আর এক প্রকার স্মরণ হলো, যখন তুমি কোন পাপ কাজের কাছাকাছি যাবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করে বিরত থাকা। আর এটাই আল্লাহর সর্বোত্তম যিক্‌র বা স্মরণ।

তিনটি জিনিসের ব্যাপারে মু'মিন ও কাফির উভয়ে সমান :

ক. কেউ কোন কিছু আমানত (গচ্ছিত) রাখলে তা ফেরত দেয়া।

খ. মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আল্লাহ বলেন :[২২]

---

১৯. হিলয়াতুল আওলিয়া-৪/৮২-৮৩

২০. 'আসরুত তাবি'ঈন-৫২৯-৫৩১

২১. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৮/৫৫০

২২. সূরা লুকমান-১৫

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.

"তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।'

গ. অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করা।

অধীনস্থ দাস-দাসীকে শাস্তি দিবে না, মারপিট করবে না। তবে তার অপরাধ মনে রাখবে। যদি সে কখনো আল্লাহর অবাধ্যতা করে তখন তার এই পাপের জন্য শাস্তি দিবে। তখন তাকে তোমার সাথে করা তার অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে।

মজলিসের ভিতর থেকে এক যুবক দাঁড়িয়ে বললো : ওহে শায়খ, আল্লাহ আপনাকে সহীহ-সালামাতে রাখুন! আপনি একজন বান্দাহ্ ও তার পাপ সম্পর্কে কিছু বলুন। মায়মূন মাথা নেড়ে যুবকের কথায় সায় দিলে সে বসে পড়ে। তারপর তিনি বলেন : একজন বান্দাহ যখন কোন পাপ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি তাওবা করে তাহলে দাগটি উঠে যায়। মু'মিন ব্যক্তি তা আয়নায় দেখার মত পরিষ্কার দেখতে পায়। শয়তান যে পাশ দিয়েই আসুক না কেন সে তাকে দেখতে পায়। আর যে ক্রমাগত পাপ করতে থাকে, তার প্রতিটি পাপের জন্য তার অন্তরে একটি করে কালো দাগ পড়তে পড়তে তার গোটা অন্তরটিই কালো হয়ে যায়। তখন সে আর কোন দিক দিয়েই শয়তানকে দেখতে পায় না।

আরেকজন শ্রোতা দাঁড়িয়ে বললো : শায়খ! আমাদেরকে ধন-সম্পদ সম্পর্কে কিছু কথা শোনান। তিনি বললেন : ধন-সম্পদের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। যদি কোন ব্যক্তি তিনটির একটি বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্তি পায়, তাহলে তৃতীয়টি থেকে খুব কমই মুক্তি পাবে। অর্থ-সম্পদের জন্য অপরিহার্য হলো পবিত্র হওয়া। আর তা হবে বৈধভাবে উপার্জনের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে সে যদি পরিচ্ছন্ন হয় তাহলে তার উচিত হবে অর্থ-সম্পদের হক বা অধিকারসমূহ আদায় করা। এ ক্ষেত্রেও সে যদি পরিচ্ছন্ন হয় তাহলে তার উচিত হবে তা ব্যয়ের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। বেশিও করবে না, আবার কৃপণতাও করবে না।

নিম্নের কথাগুলো বলার মাধ্যমে মায়মূন তাঁর মজলিস শেষ করেন :

এই পৃথিবী অত্যন্ত মিষ্টি-মধুর ও প্রাণবন্ত যা কামনা-বাসনার চাদর দ্বারা আবৃত। আর শয়তানও সর্বক্ষণ উপস্থিত অতি চালাক শত্রু। আখিরাতের বিষয়টি বিলম্বিত এবং দুনিয়ার বিষয়টি তাৎক্ষণিক। কেউ যদি তার পরকালের স্থানটি জানতে চায় সে যেন দুনিয়াতে তার আমলের দিকে দৃষ্টিপাত করে।[২৩]

ফুরাত ইবন সালমান বলেন, একবার আমরা মায়মূন ইবন মিহ্রানের সংগে চলতে চলতে

---

২৩. হিলয়াতুল আওলিয়া-৮৮-৮৯; আসরুত তাবি'ঈন-৫৩১-৫৩৩

একটি গীর্জার কাছে গিয়ে থামলাম। তিনি একজন পাদ্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন : আচ্ছা বলতো, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে এই পাদ্রীর সমান 'ইবাদত-বন্দেগী করে? সবাই বললাম : না। তিনি বললেন : মুহাম্মাদের (সা) প্রতি ঈমান না এনে তার এই 'ইবাদতে কি কোন ফল হবে? বললাম : কোন ফল হবে না। তিনি বললেন : তেমনিভাবে 'আমল ব্যতিরেকে শুধু কথায় কোন উপকার হবে না।[২৪]

আবুল মালীহ আর-রাক্কী থেকে বর্ণিত হয়েছে, মায়মূন ইবন মিহ্রান বলতেন :[২৫] الظَّالِمُ وَالْمُعِيْنُ عَلَى الظُّلْمِ وَالْمُحِبُّ لَه سَوَاءٌ – 'অত্যাচারী, অত্যাচারের সহযোগী এবং অত্যাচারকে যে ভালো মনে করে সকলে সমান।' তিনি আল কুরআনের ধারক-বাহকদের লক্ষ্য করে বলতেন, তোমরা তো দুনিয়াতে কিছু লাভের আশায় কুরআনকে পণ্য বানিয়ে নিয়েছো। তোমরা দুনিয়াকে দুনিয়ার দ্বারা এবং আখিরাতকে আখিরাতের দ্বারা সন্ধান কর। একবার তিনি ছেলেকে লিখলেন : তুমি তোমার অর্থ থেকে অমুককে ভালোমত সাহায্য করবে এবং মানুষের কাছে কিছু চাইবে না। কারণ তা লজ্জা দূর করে দেয়। তিনি সকলকে বলতেন : তোমার গৃহে কোন অতিথি আসলে তোমার সাধ্যের বাইরে তার জন্য কোন কৃত্রিম তোড়জোড় করবে না। পরিবারের লোকেরা যা খাবে তাই খেতে দেবে এবং হাসিমুখে তার সাথে কথা বলবে। আর যদি তোমার সাধ্যের অতিরিক্ত তার জন্য কিছু করতে যাও তাহলে তোমার চেহারায় এমন বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠবে যা দেখে সে কষ্ট পাবে। তিনি বলতেন :[২৬]

من أساء سرًّا فليتب سرًا، ومن أساء علانيةً فليتب علانية، فإن النـاس يُعَـيِّرون ولا يغفرون، والله يغفر ولا يعيِّرُ.

'কেউ গোপনে কোন পাপ করলে গোপনেই তার তাওবা করা উচিত, আর কেউ প্রকাশ্যে কোন পাপ করলে প্রকাশ্যে তার তাওবা করা উচিত। কারণ, মানুষ হেয় ও অপমান করে, ক্ষমা করে না। আর আল্লাহ ক্ষমা করেন, হেয় ও অপমান করেন না।'

তিনি বলতেন : কেউ যদি কোন প্রয়োজন পূরণের আশায় কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির দরজায় যায় এবং দ্বার রক্ষী তার সাথে সাক্ষাতে বাধা দেয়, তাহলে তার উচিত আল্লাহর ঘর মসজিদে ফিরে আসা। কারণ আল্লাহর ঘরের দরজা সবার জন্য সর্বক্ষণ খোলা। সেখানে দু'রাক'আত নামায আদায় করে নিজের প্রয়োজনের কথা আল্লাহকে বলবে।

ইউনুস ইবন 'উবায়দ বলেন, একবার মায়মূনের আবাসভূমিতে মহামারি আকারে 'তা'উন' (প্লেগ) দেখা দিল। আমি তাঁর নিজের ও পরিবারের অবস্থা জানতে চেয়ে তাঁকে একটি চিঠি দিলাম। জবাবে তিনি লিখলেন : তোমার চিঠি পৌঁছেছে। তুমি আমার পরিবারের লোকদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছো। হাঁ, আমার পরিবার ও ঘনিষ্ঠজনদের

---

২৪. তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৫৪৯

২৫. প্রাগুক্ত-১৮/৫৫০

২৬. প্রাগুক্ত-১৮/৫৫২

মধ্য থেকে সতের (১৭) জন মারা গেছে। এই বালা-মুসীবত যখন আসে তখন আমার খুব খারাপ লেগেছিল, কিন্তু এখন তা নেই সে জন্য আমি উৎফুল্লও নই। তোমরা আল্লাহর কিতাব শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে। মানুষ এখন আল্লাহর কিতাব ভুলে মানুষের কথা মানতে শুরু করেছে। দীনের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করবে। না কোন 'আলিমের সংগে ঝগড়া করবে, আর না কোন জাহিলের সংগে। যদি কোন জাহিলের সংগে ঝগড়ায় লিপ্ত হও তাহলে তোমার অন্তর কঠিন হয়ে যাবে, আর সেও তোমার কথা শুনবে না। অন্যদিকে কোন 'আলিমের সংগে ঝগড়া করলে তিনি তাঁর 'ইল্ম (জ্ঞান) তোমাকে দান করবেন না এবং তোমার কোন কাজে তিনি মনোযোগী হবেন না।[২৭]

সাওয়ার ইবন 'আবদিল্লাহ আল-আনবারী বলেন, একদিন মায়মূন ইবন মিহ্রান বসে আছেন। তখন তাঁর পাশে বসা ছিলেন শামের একজন কারী (কুরআন পাঠ বিশেষজ্ঞ)। মায়মূন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : কিছু ক্ষেত্রে সত্য বলার চেয়ে মিথ্যা বলা উত্তম। শামী লোকটি প্রতিবাদের সুরে বললেন : না, সকল ক্ষেত্রে সত্য বলা উত্তম। মায়মূন বললেন : মনে কর কোন ব্যক্তি তরবারি হাতে নিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে কাউকে তাড়া করলো এবং তাড়িত ব্যক্তি প্রাণ বাঁচাতে তোমার ঘরে এসে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাড়াকারী এসে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে : লোকটিকে কি আপনি দেখেছেন? তখন তুমি কী বলবে? শামী লোকটি বললেন : আমি বলবো : না, আমি দেখিনি। মায়মূন বললেন : দেখ, এ ক্ষেত্রে তুমি মিথ্যা বলা উত্তম মনে করছো।[২৮]

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম দিওয়ান বা বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা করেন দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা)। এ দিওয়ান ব্যবস্থাপনা ইসলামী খিলাফতে দারুণ সুফল বয়ে আনে। একটি দিওয়ানে মুসলিম নাগরিকদের নাম ও পরিচয় লেখা থাকতো। এই দিওয়ানে যাদের নাম থাকতো কেবল তারাই রাষ্ট্রের ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করতো। মায়মূনের সময়ও এ নিয়ম প্রচলিত ছিল। তখন এই দিওয়ানের প্রধান ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন মারওয়ান ইবন আল-হাকাম। তিনি একদিন লক্ষ্য করলেন মায়মূনের মত একজন বিশিষ্ট 'আলিমের নাম দিওয়ানে ওঠেনি। ফলে তিনি ইসলামী ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একদিন মায়মূনকে ডেকে বললেন : আপনি দিওয়ানে নাম লেখাচ্ছেন না কেন? নাম লেখালে ইসলামে আপনার যে অংশ রয়েছে তা লাভ করতেন।

মায়মূন বললেন : আমিও চাই ইসলামে আমার অংশ থাকুক। মুহাম্মাদ বললেন : তা কীভাবে সম্ভব, দিওয়ানে তো আপনার নাম নেই? মায়মূন বললেন : ইসলামে আমার অংশ হলো এ রকম : আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই– একথার সাক্ষ্য দেয়া একটি অংশ, সালাত একটি অংশ, যাকাত একটি অংশ, রমাদান মাসে সিয়াম পালন একটি

---

২৭. প্রাগুক্ত-১৮/৫৫২, ৫৫৩

২৮. প্রাগুক্ত

অংশ এবং বায়তুল্লাহতে হজ্জ আদায় একটি অংশ।[২৯] মুহাম্মাদ বললেন : আমি ধারণা করতাম, দিওয়ানে যাঁদের নাম আছে ইসলামে কেবল তাঁদের অংশ আছে। মায়মূন বললেন : এই যে আপনার পূর্ব পুরুষ হাকীম ইবন হিযাম (রা) দিওয়ান থেকে কোন দিন কোন কিছুই গ্রহণ করেননি। কারণ, তিনি একবার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কোন কিছু সাহায্য চান, রাসূল (সা) তাঁকে বলেন : ওহে হাকীম, এই চাওয়া থেকে বিরত থাকা তোমার জন্য ভালো। হাকীম (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট চাওয়া থেকেও বিরত থাকবো? বললেন : হাঁ, আমার নিকট চাওয়া থেকেও। হাকীম (রা) বললেন : কোন পরোয়া নেই। আপনার ও অন্য কারো নিকট কখনো কিছু চাইবো না। তবে আপনি আল্লাহর নিকট আমার ব্যবসায় উন্নতির জন্য একটু দু'আ করুন। রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করেন।[৩০]

এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কোন কিছু না চাওয়া– এই ছিল মায়মূনের নীতি। আর এ ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিলেন হাকীম ইবন হিযাম (রা)। মায়মূনের মৃত্যু সন নিয়ে মত পার্থক্য আছে। হিজরী ১০৬ থেকে ১১২ সনের মধ্যে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।[৩১]

---

২৯. 'আসরুত তাবি'ঈন-৫২৭-৫২৮

৩০. সাহীহ আল-বুখারী, কিতাব আল-ওয়াসাইয়া, হাদীছ নং-২৭৫০; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড-৫, হাদীছ নং- ১৫৫৭৪; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৫৫৩

৩১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৯; তাহ্যীব আল-কামাল-১৮/৫৫৫

খারিজা ইবন যায়দ (রহ)

হযরত খারিজার (রহ) ডাকনাম আবূ যায়দ। বিখ্যাত সাহাবী হযরত যায়দ ইবন ছাবিতের (রা) পুত্র। মদীনার প্রসিদ্ধ খাযরাজ গোত্রের বানূ নাজ্জার শাখার সন্তান। তাঁর মা উম্মু সা'দ 'আকাবার দ্বিতীয় শপথে উপস্থিত ও রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নিয়োগকৃত 'নাকীব' মহান সাহাবী সা'দ ইবন রাবী'র কন্যা।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

হযরত খারিজার মহান পিতা হযরত যায়দ ইবন ছাবিত (রা) একজন 'আলিম সাহাবী ছিলেন। যে সকল সাহাবী কুরআনের হাফিজ ছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে বিশেষ স্থানের অধিকারী। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর কুরআনের সংগ্রহ ও সংকলন তাঁরই তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। এমন একটা জ্ঞান চর্চার পরিবেশে হযরত খারিজা প্রতিপালিত হন। পিতার নিকট থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে তিনি তাঁর সমকালের শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের মধ্যে পরিগণিত হন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ 'আলিমদের মধ্যে ছিলেন।[২] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, জ্ঞানে তিনি একজন দক্ষ ইমাম ছিলেন এবং তাঁর বিশ্বস্ততা ও শ্রেষ্ঠতার ব্যাপারে সকলে একমত।[৩] ইবন সা'দ মদীনার মনীষীদের দ্বিতীয় স্তরে বা তবকায় তাঁর নাম সন্নিবেশ করেছেন।[৪]

হাদীছ

পিতা যায়দ, মা উম্মু সা'দ ইবন সা'দ, চাচা ইয়াযীদ, উসামা ইবন যায়দ, সাহ্‌ল ইবন সা'দ, 'আবদুর রহমান ইবন আবী 'উমারা উম্মুল 'আলা' (রা) প্রমুখের নিকট থেকে তিনি হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন। আর তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শোনেন তাঁদের মধ্যে তাঁর পুত্র সুলায়মান, ভাতিজা সা'ঈদ ইবন সুলায়মান ও কায়স ইবন সা'দ এবং অন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'উছমান, মুত্তালিব ইবন 'আবদিল্লাহ, ইয়াযীদ ইবন কাসীত (রহ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৫]

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ ছিল তাঁর বিশেষ অধীত বিষয়। এ শাস্ত্রে তিনি ইমাম ও মুজতাহিদের মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহ্‌র মধ্যে তাঁর নামটিও আছে।[৬] আবুয যানাদ বলেন :[৭]

---

১. তাহ্‌যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-৫/৩১৮
২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯১
৩. তাহ্‌যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৪২
৪. তাহ্‌যীব আল-কামাল-৫/৩১৮
৫. প্রাগুক্ত; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৩/৭৫
৬. প্রাগুক্ত
৭. তাহ্‌যীব আল-কামাল-৫/৩১৮

كان السَّبْعَة الذين يسألون بالمدينة ويُنْتَهى إلى قولهم : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار.

'মদীনার যে সাত ব্যক্তির নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা হতো এবং যাঁদের কথা চূড়ান্ত বলে গণ্য হতো তাঁরা হলেন :

সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যাব, আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমান ইবন আল-হারিছ, 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবা, আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, খারিজা ইবন যায়দ ও সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহ)।'

ইসলামী জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা ফারায়েজ (দায় ভাগ) শাস্ত্র)। এ বিষয়ে তাঁর পিতা যায়দ ইবন ছাবিত একজন বড় 'আলিম ছিলেন। এ কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে খারিজা এ জ্ঞানের অধিকারী হন। মদীনার 'আলিমদের মধ্যে তিনি এবং তালহা ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আওফ উত্তরাধিকার (মীরাছ) বণ্টন করতেন এবং বণ্টনের লিখিত সনদ দিতেন। এ বিষয়ে তাঁর কথা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হতো।[৮] 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উমার বলেন, মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের পরে ফিক্‌হ বিষয়টি যাঁদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাঁদের একজন হলেন খারিজা ইবন যায়দ।[৯]

ওফাত

হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) খিলাফতকালে হিজরী ১০০ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি সত্তরটি সিঁড়ি বানানোর পর তাঁর থেকে পড়ে গেছেন। সেই বছর মৃত্যু হয় এবং তখন তাঁর বয়স পূর্ণ সত্তর বছর। তৎকালীন মদীনার ওয়ালী আবূ বাকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন হায্‌ম তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন' পাঠ করেন।[১০]

তাঁর দৈহিক অবয়ব সুগঠিত ও সুন্দর ছিল। "খুয" (রেশম ও পশম মিশ্রিত এক প্রকার সূতা)-এর চাদর গায়ে জড়াতেন। মাথায় কালো পাগড়ী এবং বাঁ হাতে আংটি পরতেন।[১১] মৃত্যুর সময় অনেকগুলো পুত্র-কন্যা রেখে যান। পুত্ররা হলেন : যায়দ, 'উমার, 'আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ এবং কন্যারা হলেন : হাবীবা, হামীদা, উম্মু ইয়াহইয়া ও উম্মু সুলায়মান। উল্লেখিত সন্তানদের সকলের মা ছিলেন উম্মু 'আমর বিনত হায্‌ম।[১২]

---

৮. প্রাগুক্ত-৫/৩১৯; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৩/৭৫

৯. তাহ্‌যীব আল-কামাল-৫/৩১৯

১০. প্রাগুক্ত-৫/৩২০; আত-তাবাকাত-৫/১৯৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৪/৪৪০

১১. আত-তাবাকাত-৫/১৯৪

১২. প্রাগুক্ত

খালিদ ইবন মা'দান (রহ)

হযরত খালিদের (রহ) ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। তাঁর বংশধারা এরূপ : খালিদ ইবন মা'দান ইবন আবী কারূব আল-কিলা'ঈ। শামের হিমসের অধিবাসী ছিলেন। ইবন সা'দ তাঁকে শামের তাবি'ঈদের তৃতীয় তবকায় (স্তর) স্থান দিয়েছেন।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞান অর্জন ও চর্চার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আগ্রহ। জ্ঞান চর্চাই তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যান ও কর্মে পরিণত হয়। বুহাইর বলেন, আমি তাঁর চেয়ে বেশি কাউকে জ্ঞান চর্চায় নিমগ্ন থাকতে দেখিনি। তাঁর এই আগ্রহ-উদ্দীপনা তাঁকে হিমসের বিশিষ্ট 'আলিমে পরিণত করে।[২]

হাদীছ

তিনি হাদীছের একজন বড় হাফিজ ছিলেন। সত্তর (৭০) জন মহান সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভের গৌরব অর্জন করেন।[৩] তাঁদের মধ্যে হযরত ছাওবান, 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, 'উতবা ইবন 'আবদুস সালমী, মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান, মিকদাম ইবন মা'দিকারিব ও আবূ উমারের (রা) নিকট থেকে হাদীছ শোনেন। হযরত 'উবাদা ইবন আস-সামিত, আবুদ দারদা', মু'আয ইবন জাবাল, আবূ 'উবায়দা, আবূ যার আল-গিফারী ও 'আয়িশা সিদ্দীকার (রা) নিকট থেকে শোনা হাদীছ "মুরসাল"[৪] হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৫]

ফিক্হ শাস্ত্রেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। ফকীহ সাহাবায়ে কিরামের পরে শামের ফকীহ্দের তৃতীয় স্তরে তাঁকে গণ্য করা হতো। তাঁর একটি নিজস্ব দারসের আসর ছিল। কিন্তু খ্যাতিকে এত পরিমাণ ভয় করতেন যে, আসরে উপস্থিতির সংখ্যা বেড়ে গেলে নাম-কামের ভয়ে পঠন-পাঠনের এই আসরটি ভেঙ্গে দেন।[৬]

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল-৫/৪০৯, ৪১১
২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১; তাবি'ঈন-১০২
৩. তাহ্যীব আল-কামাল-৫/৪১১
৪. হাদীছের সনদের শেষাংশ থেকে তাবি'ঈর পরে সাহাবী বাদ পড়াকে 'আল-মুরসাল' বলে। যেমন, কোন তাবি'ঈর উক্তি : 'রাসূল (সা) এরূপ বলেছেন, বা এরূপ করেছেন অথবা তাঁর সামনে এরূপ করা হয়েছে' ইত্যাদি। এখানে তাবি'ঈ যে সাহাবীর নিকট থেকে হাদীছটি শুনেছেন তাঁর নাম বাদ দিয়েছেন, তাই হাদীছটি 'আল-মুরসাল' হবে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ ছেড়ে দেয়া, বাদ দেয়া।
৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/১১৯
৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১; তাহ্যীব আল-কামাল-৫/৪১১

ছাত্র

তাঁর কয়েকজন খ্যাতিমান ছাত্র হলেন : বুহায়রা ইবন সা'ঈদ, মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম তায়মী, ছাওর ইবন ইয়াযীদ, হুরায়য ইবন 'উছমান, 'আমির ইবন হাশীব, হাসসান ইবন 'আতিয়্যা, ফুদায়ল ইবন ফুদালা (রহ) ও আরো অনেকে।[৭]

তিনি তাঁর অর্জিত জ্ঞান সবই লিখে নিতেন। তাঁর ছাত্র বুহায়র বলেন, তাঁর অর্জিত সকল জ্ঞান একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।[৮] তাঁর সমকালীন সকল বড় বড় ইমাম তাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকার করেছেন। সুফইয়ান ছাওরী বলতেন, আমি খালিদ ইবন মা'দানের উপর দ্বিতীয় কাউকে প্রাধান্য দিই না।[৯] ইমাম আওযা'ঈ (রহ) তাঁর প্রতি ভীষণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং মানুষকে খালিদের কন্যা "আবাদা"র নিকট পাঠিয়ে তাঁর রীতি-পদ্ধতি অবগত হতেন।[১০]

'ইবাদত

'ইলমের সাথে সাথে তিনি 'আমলেও ঋদ্ধ ছিলেন। ইবন হিব্বান তাঁকে আল্লাহ্‌র উত্তম বান্দাদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন।[১১] রাত-দিনে সত্তর হাজার বার তাসবীহ্ পাঠ করতেন। এছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করতেন।[১২] অত্যধিক 'ইবাদত-বন্দেগীর চিহ্ন তাঁর কপালে দীপ্তিমান ছিল।[১৩] তাঁর মৃত্যুর পর গোসলের জন্য লাশ খাটিয়ায় রাখা হলে দেখা গেল ডান হাতের আংগুল তাসবীহ্ পাঠরত ভঙ্গিতে রয়েছে।[১৪]

মরণের প্রতি তীব্র আকাঙ্খা

সাধারণ মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়। কিন্তু আল্লাহ্ প্রেমিক বান্দারা মৃত্যুকে মিলনের বার্তা বলে মনে করে। আর এ কারণে হযরত খালিদ (রহ) ভীত হওয়ার পরিবর্তে মৃত্যুর অধীর আগ্রহে থাকতেন। তিনি বলতেন, যদি মৃত্যু এমন কোন জ্ঞান হতো যা অর্জনের জন্য দৌড় প্রতিযোগিতা হতো তাহলে সবার আগে তার কাছে পৌঁছে যেতাম। শক্তির জোরে আমাকে অতিক্রম করতে পারতো এমন ব্যক্তি ছাড়া কেউ আমাকে হারাতে পারতো না। ইয়াযীদ ইবন 'আবদিল মালিকের খিলাফতকালে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ১০৩ অথবা ১০৪ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তিনি রোযা ছিলেন।[১৫]

---

৭. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৩/১১৮

৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১

৯. প্রাগুক্ত

১০. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৩/১১৯

১১. প্রাগুক্ত

১২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৮১; তাহ্‌যীব আল-কামাল-৫/৪১৩

১৩. আত-তাবাকাত-৭/১৬২

১৪. তাহ্‌যীব আল-কামাল-৫/৪১৩

১৫. প্রাগুক্ত-৫/৪১২, ৪১৩; আত-তাবাকাত-৭/১৬২

আবূ বুরদা ইবন আবী মূসা আল-আশ'আরী (রা)

আবূ বুরদা ডাকনাম, আসল নাম 'আমির মতান্তরে আল-হারিছ। ডাক নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরীর (রা) পুত্র। কূফার একজন বিখ্যাত ফকীহ্ তাবি'ঈ। তথাকার কাজীও ছিলেন।[১] আল-মাদায়িনী বলেন, তাঁর পিতা আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) 'উমার অথবা 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে যখন বসরার আমীর ছিলেন তখন আবূ বুরদার জন্ম হয়।[২]

তাঁর মহান পিতা হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ছিলেন একজন উঁচুমানের সাহাবী। তিনি তাঁর এই পুত্রকে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) নিকট পাঠিয়ে দেন। উল্লেখ্য যে, ইসলাম পূর্ব জীবনে এই 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম ছিলেন মদীনায় ইহুদীদের একজন বড় 'আলিম। তাঁর নিকট যাওয়ার ঘটনাটি আবূ বুরদা বর্ণনা করেন এভাবে : আমার মুহতারাম পিতা আমাকে জ্ঞান অর্জনের জন্য 'আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) নিকট পাঠান। আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম, তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ভাতিজা! তোমরা এক ব্যবসা কেন্দ্রে বসবাস কর। এ কারণে এদিকে দৃষ্টি রাখবে যে, যখন কারো উপর তোমাদের কিছু অর্থ-সম্পদ পরিশোধ করা ওয়াজিব হয় তখন যদি সে তোমাদেরকে খুশী করার জন্য অতিরিক্ত এক আটি ঘাসও দেয় তাহলে তা গ্রহণ করবে না। কারণ তা সুদ হবে।[৩]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, আমি যখন মদীনায় গেলাম এবং 'আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করলাম তখন তিনি বললেন, চলো, যে ঘরে রাসূল (সা) প্রবেশ করে সালাত আদায় করেন তুমিও সেখানে গিয়ে সালাত আদায় করবে। তোমাকে খেজুর ও ছাতু খাওয়াবো। তারপর বলেন : ভাতিজা! তোমরা এমন এক স্থানে বসবাস কর যেখানে সুদ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তোমরা এমন মানুষ যে, যখন তোমাদের ওখানে কেউ কোন ব্যক্তিকে করজ (ঋণ) দেয় এবং তা পরিশোধের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যায় তখন মাকরূজ (ঋণ গ্রহীতা) খাদ্য-খাবারের একটি পুটলি এবং ঘাসের একটি বোঝা সংগে নিয়ে হাজির হয়। এটা সুদ হবে।[৪]

জ্ঞান ও মনীষা

হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) শিক্ষা ও

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৪৮

২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১২/২২

৩. আত-তাবাকাত-৫/১৮৭

৪. প্রাগুক্ত

প্রশিক্ষণে এবং অন্য সব মহান ব্যক্তির সাহচর্যের কল্যাণে আবূ বুরদা অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন :[৫]

أبو بردة بن أبى موسى الأشعرى الفقيه أحد ائمة الأثبات.

"আবূ মূসা আল-আশ'আরীর (রা) পুত্র আবূ বুরদা একজন ফকীহ্ ও দৃঢ়পদ ইমামদের একজন।"

ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর বিশ্বস্ততা ও মহত্ত্বের ব্যাপারে সকলে একমত।[৬]

হাদীছ

তিনি ছিলেন হাদীছের বিশিষ্ট হাফিজদের মধ্যে একজন। ইবন সা'দ বলেন : كان ثقة كثير الحديث. - 'তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, বহু হাদীছের ধারক-বাহক।'[৭] এ বিষয়ে তিনি আবূ মূসা আল-আশ'আরী, 'আলী ইবন আবী তালিব, হুযায়ফা ইবন আল-ইয়ামান, 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম, আ'য়ায আল-মুযানী, মুগীরা ইবন শু'বা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-'আস, 'উরওয়া ইবন যুবায়র, আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ আত-তায়মী (রা) প্রমুখ সাহাবী ও তাবি'ঈর নিকট থেকে ফায়দা হাসিল করেন।[৮]

তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : তাঁর পুত্র সা'ঈদ ও বিলাল, পৌত্র ইয়াযীদ এবং অন্যদের মধ্যে ইমাম শা'বী, ছাবিত আন-নাবানী, হুমায়দ ইবন হিলাল, 'আবদুল মালিক ইবন নুমায়র, কাতাদা, আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ (রহ) প্রমুখ।[৯]

ফিক্হ শাস্ত্রে তিনি বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ইমাম ও ফকীহ বলেছেন। ফিক্হ বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞানের কারণে কাজী শুরায়হ-এর পরে তিনি কূফার কাজীর পদে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হন। পরে তাঁর পুত্র বিলাল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[১০]

নৈতিক গুণাবলী

নৈতিক গুণাবলীর তিনি বাস্তব রূপ ছিলেন। তাঁর ব্যক্তি সত্তায় সকল নৈতিক গুণ ও সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটেছিল। ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাব যখন খুরাসানের ওয়ালী ছিলেন তখন তাঁর বহু গুণ বিশিষ্ট একজন লোকের প্রয়োজন পড়ে। তিনি লোকদের বললেন,

---

৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৫
৬. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৭৯
৭. প্রাগুক্ত; আত-তাবাকাত-৫/১৮৭; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৫০
৮. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১২/১৮
৯. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/৫০
১০. আত-তাবাকাত-৫/১৮৭; শাজারাত আয-যাহাব-১/১২৬

আমাকে এমন একজন লোক দাও যার মধ্যে উত্তম বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। লোকেরা আবূ বুরদার নাম বলে। ইয়াযীদ তাঁকে ডেকে এনে কথা বলেন এবং তাঁকে উত্তম ব্যক্তি রূপে দেখতে পান। আবূ বুরদার কথায় তিনি দারুণ মুগ্ধ হন। পরীক্ষার পর তিনি তাঁকে বলেন, আমি আপনাকে অমুক অমুক পদে নিয়োগ করলাম। আবূ বুরদা তা গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। ইয়াযীদ তাঁর কথা মানলেন না। তখন আবূ বুরদা নিজের অক্ষমতার সপক্ষে এ দলীল উপস্থাপন করেন যে, আমার মহান পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন, যে ব্যক্তি এমন কোন পদ গ্রহণ করে যে সম্পর্কে নিজেই জানে যে সে তার উপযুক্ত নয়, তাহলে জাহান্নামকে নিজের ঠিকানা বানানোর জন্য তার প্রস্তুত থাকা উচিত হবে। হিজরী ১০৩ অথবা ১০৪ সনে কূফায় তাঁর ইনতিকাল হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বছরের উপরে।[১১]

---

১১. আত-তাবাকাত-৫/১৮৭; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৯/৫২; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯৫

কা'ব আল-আহ্‌বার (রহ)

হযরত কা'ব-এর (রহ) ডাকনাম আবূ ইসহাক, পিতার নাম মাতি' ইব্‌ন হানয়ূ'। তিনি ছিলেন ইয়ামনের বিখ্যাত হিময়ার গোত্রের শাখা গোত্র "আলে যী রু'আইন" -এর সন্তান।[১]

ইসলাম গ্রহণ ও মদীনায় আগমন

হযরত কা'ব (রহ) একজন বিখ্যাত তাবি'ঈ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি একজন ইহূদী 'আলিম ছিলেন।[২] হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায়ও তিনি বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু সঠিক বর্ণনা মতে সে সময় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। একটি বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, সে সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইমাম আশ-শাতিবী বর্ণনা করেছেন, কা'ব বলেন : হযরত 'আলী (রা) যখন ইয়ামন আসেন তখন আমি তাঁর নিকট যেয়ে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পরিচয় ও গুণ-বৈশিষ্ট্য জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন। আমি তা শুনে একটু মৃদু হাসি। 'আলী (রা) আমার এ মৃদু হাসির কারণ জিজ্ঞেস করেন। আমি বলি : আমাদের ধর্মে শেষ যামানার নবীর যে সব আলামত বলা হয়েছে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে তার মিল থাকায় হেসেছি। এরপর আমি মুসলমান হয়ে যাই এবং মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে থাকি। তবে ইয়ামনেই থেকে যাই। 'উমারের (রা) খিলাফতকালে হিজরাত করে মদীনায় যাই। আফসোস! আমি যদি সেই পূর্বেই হিজরাত করতাম। আরেকটি বর্ণনা এ রকম এসেছে যে, তিনি হযরত আবূ বাকরের (রা) খিলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩]

উপরের দু'টি বর্ণনাই দুর্বল বলে মুহাদ্দিছগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সঠিক বর্ণনা সেটাই যা ইবন সা'দ কা'বের হালীফ তথা চুক্তিবদ্ধ আশ্রয়দাতা হযরত 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা দ্বারা খোদ কা'বের বক্তব্যেই হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে তাঁর ইসলাম গ্রহণ প্রমাণিত হয়। সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) বর্ণনা করেছেন। হযরত 'আব্বাস (রা) কা'ব ইসলাম গ্রহণের পর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আবূ বাকরের (রা) সময়ে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকার এমনকি কারণ ছিল যে, এখন 'উমারের (রা) সময় ইসলাম গ্রহণ করছেন? জবাবে তিনি বলেন : আমার পিতা তাওরাত থেকে কিছু অংশ লিখে আমাকে দেন এবং উপদেশ দেন আমি যেন তার উপর 'আমল করি। তারপর ধর্মীয় সকল গ্রন্থের উপর সীল-মোহর লাগিয়ে

---

১. তাহ্‌যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১৫/৩৯৯, ৪০০

২. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫২

৩. আল-ইসাবা ফী তাময়ীম আস-সাহাবা-৩/৩১৫-৩১৬; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৫/৩৯৯

আমাকে পিতৃত্বের অধিকারের কসম করিয়ে অঙ্গীকার নেন, আমি যেন এই সীল-মোহর না খুলি। এজন্য আমি তা খুলিনি এবং পিতার দেয়া লেখার উপর 'আমল করতে থাকি। যখন ইসলামের প্রচার-প্রসার ও তার প্রাধান্য পেতে থাকে এবং কোন ভয়-ভীতির অবকাশ থাকলো না তখন আমার মনে হলো, আমার পিতা আমার নিকট কিছু 'ইল্‌ম গোপন করে গেছেন। এখন আমার এই সীল-মোহরকৃত গ্রন্থগুলো খুলে দেখা উচিত। অতঃপর আমি সীল-মোহর ভেঙ্গে গ্রন্থগুলো পাঠ করি। তাতে আমি মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর উম্মাতের পরিচয় ও গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। সেই সময় আমার নিকট প্রকৃত সত্য প্রকাশ পায়। এজন্য আমি এখন এসে ইসলাম গ্রহণ করেছি।[৪] ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত 'আব্বাসের (রা) সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে থাকেন।

তাঁর জ্ঞান ও মনীষা

হযরত কা'ব (রহ) ছিলেন ইহূদীদের একজন বিশিষ্ট ও বিখ্যাত 'আলিম। ইহূদী ধর্ম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল অতি ব্যাপক। ইমাম যাহাবী লিখেছেন, তিনি ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং আহলি কিতাবদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম।[৫] ইমাম নাওবী লিখেছেন, তাঁর ব্যাপক জ্ঞান ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলে একমত। অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কারণে তাঁকে "কা'ব আল-আহবার" এবং "কা'ব আল-হাবর" বলা হতো। তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য অনেক। তাঁর জ্ঞানগর্ভ অনেক কথা ও মন্তব্য অতি প্রসিদ্ধ।[৬] অনেক বড় বড় সাহাবী তাঁর গভীর জ্ঞানের কথা স্বীকার করতেন। হযরত আবূ দারদা' আল-আনসারী (রা) কা'বের সাথে হিমসে এক সাথে ছিলেন। তিনি বলতেন, ইবন হিময়ারের নিকট বহু জ্ঞান আছে। আমীর মু'আবিয়া (রা) বলতেন, আবুদ দারদা' (রা) হাকীম তথা মহাজ্ঞানীদের অন্তর্গত, আর কা'ব 'আলিমদের অন্তর্গত। তার নিকট সাগরের মত সীমাহীন জ্ঞান ছিল।[৭]

যেহেতু তিনি একটি ধর্মের একজন বড় 'আলিম ছিলেন, এ কারণে ইসলামী জ্ঞানের সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তিনি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞান লাভ করেন মদীনায় সাহাবায়ে কিরামের (রা) নিকট থেকে এবং অন্যদিকে সাহাবায়ে কিরামও তাঁর নিকট আহ্‌লি কিতাবের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র জ্ঞান তিনি লাভ করেন হযরত 'উমার, সুহায়ব ও উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) নিকট থেকে। অন্যদিকে তাঁর নিকট ইসরাঈলিয়াত বা বনী ইসরাঈলের জ্ঞান লাভ করেন সাহাবীদের মধ্যে আবূ হুরায়রা, মু'আবিয়া, ইবন 'আব্বাস (রা) এবং তাবি'ঈদের মধ্যে মালিক ইবন

---

৪. আত-তাবাকাত-৭/১৫৬; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৫/৪০০

৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫২

৬. তাহ্‌যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৯

৭. আল-ইসাবা-৩/৩১৫

আবী 'আমির আসবাহী, 'আতা ইবন আবী রাবাহ, আবদুল্লাহ ইবন রিয়াহ আনসারী, 'আবদুল্লাহ ইবন হামযা সুলূলী, আবূ রাফে' সায়িগ, 'আবদুর রহমান ইবন শু'আয়ব (রহ)সহ বিরাট একটি দল।[৮]

'ইল্‌ম, 'উলামা ও 'ইল্‌মের ক্ষয় ও পতন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য

একবার প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : কা'ব! প্রকৃত 'আলিম কারা? জবাব দেন : যারা 'ইল্‌ম অনুযায়ী 'আমল করে। ইবন সালাম আবার জিজ্ঞেস করেন : 'আলিমদের অন্তর থেকে 'ইল্‌ম দূর করে দেবে কোন জিনিস? বলেন : লোভ এবং মানুষের সামনে নিজের অভাব ও প্রয়োজনের কথা বলা ও প্রত্যাশা করা। 'আবদুল্লাহ ইবন সালাম বলেন : আপনি সত্য বলেছেন।[৯]

শামে অবস্থান

কা'বের পৈত্রিক ধর্ম ছিল ইহূদী। এ কারণে প্রথম থেকেই শামের সাথে তাঁর হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল। ইসলামের দৃষ্টিতেও এ ভূমি অতি পবিত্র ও সম্মানিত। এ কারণে কিছুকাল মদীনায় থাকার পর তিনি শামে চলে যান এবং হিমসে আবাসন গড়ে তোলেন।[১০]

জনগণকে উপদেশ দান

শামে অবস্থানকালে তাঁর প্রধান কাজ ছিল ইসরাঈলী কিস্‌সা-কাহিনী ভিত্তিক মানুষকে উপদেশ দান করা। একবার 'আওফ ইবন মালিক (রা) উপদেশ দানরত অবস্থায় তাঁকে বললেন : আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শুনেছি, আমীর, দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি ও বয়স্কদের সামনে ছাড়া আর কাউকে কিস্‌সা-কাহিনী শোনানো উচিত নয়। এরপর তিনি ওয়াজ ছেড়ে দেন। অবশ্য পরে স্থানীয় আমীরের নির্দেশে আবার একাজ আরম্ভ করেন।[১১]

ইসলামী বর্ণনার মধ্যে ইসরাঈলী বর্ণনার প্রবেশ

হযরত কা'বের গভীর জ্ঞান ও মনীষার ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ নেই। তিনি ইহূদী ধর্মের একজন খ্যাতিমান 'আলিম ছিলেন। তবে ইহূদীদের জ্ঞানের বেশির ভাগ উৎস ছিল কিস্‌সা-কাহিনী। হযরত কা'বের জ্ঞানের উৎসও ছিল তাই। এ কারণে একটি বড় ক্ষতি এই হয়েছে যে, অনেক ভিত্তিহীন ইসরাঈলী কাহিনী ইসলামী গ্রন্থাবলীতে ঢুকে গেছে। তাই কোন কোন ইমাম কা'বের বর্ণনাসমূহকে অগ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে আমাদের শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, আমাদের পূর্ববর্তীকালের পণ্ডিত-

---

৮. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৫/৪৩৮; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৫/৩৯৯

৯. আল-ইসাবা-৩/৩১৬; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৫/৪০১

১০. প্রাগুক্ত; আত-তাবাকাত-৭/১৫৬

১১. আল-ইসাবা-৩/৩১৬; তাবি'ঈন-৩৯২

মনীষীগণ বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন এবং তাঁরা যথাসময়ে এবং যথাস্থানে তা চিহ্নিতও করে গেছেন।

ওফাত

হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফাতকালে হিজরী ৩২ সনে তিনি হিমসে ইনতিকাল করেন। অপর একটি বর্ণনায় হিজরী ৩৪ সনের কথা এসেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৪ বছর।[১২]

কা'ব বলতেন, আমার ওজনের সমপরিমাণ সোনা আমি সাদাকা হিসেবে দান করি– তার চেয়ে আল্লাহর ভয়ে আমি কাঁদি– এ আমার অধিকতর প্রিয়। পার্থিব জীবনে যে দু'টি চোখ আল্লাহর ভয়ে কেঁদে পানি ঝরায় পরকালীন জীবনে সেই দু'টি চোখকে উৎফুল্ল রাখা আল্লাহর দায়িত্ব।[১৩]

---

১২. আত-তাবাকাত-৭/১৫৬; তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/৪০০

১৩. তাহ্যীব আল-কামাল-১৫/৪০১

আবূ 'উছমান আন-নাহ্দী (রহ)

হযরত 'আবদুর রহমানের (রহ) ডাকনাম আবূ 'উছমান এবং এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন একজন "মুখাদরাম" ব্যক্তি অর্থাৎ জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ লাভ করেন।[১] জাহিলী যুগে সাধারণ আরববাসীর মত মূর্তিপূজক ছিলেন। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দর্শন ও সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত থেকে যান। কিন্তু যাকাত-সাদাকা সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) তাহসীলদারের হাতে তুলে দিতেন।[২] আবূ 'উছমানের পিতার নাম মাল্ল ইবন 'আমর। আবূ 'উছমান কূফার অধিবাসী ছিলেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আবির্ভাবের খবর প্রথম যে ভাবে লাভ করেন সে সম্পর্কে তিনি পরবর্তীকালে বলতেন : আমি তখন ১৭ বছরের এক তরুণ। একদিন আমি একটি উপত্যকায় আমাদের উট চরাচ্ছিলাম, তখন সেই পথে আমার পাশ দিয়ে তিহামার একজন লোক যাচ্ছিলেন। আমি তাকে বললাম, শুনেছি আপনাদের মাঝে নাকি একজন 'সাবী' বা ধর্মত্যাগীর আবির্ভাব হয়েছে? ব্যাপারটা কী একটু বলুন তো? তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! একজন লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যে মানুষকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান জানায়। সে নিজেদের পারস্পারিক সম্পর্ক বিনষ্ট করে ফেলেছে।[৩]

প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে তাঁর অবস্থান ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে প্রথম মদীনায় আসেন[৪] এবং ইরাকের অধিকাংশ অভিযান যথা : কাদেসিয়া, জালূলা, তুসতার, নিহাওয়ান্দ, সারওয়ান্দ, ইয়ারমূক প্রভৃতিতে অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করেন।[৫]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞানের জগতে তেমন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না। তবে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান আল-ফারেসীর (রা) সাহচর্যে বারো বছর ছিলেন।[৬] এই মোবারক সাহচর্যের কল্যাণে তিনি এত পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হন যে, তাঁকে বড় বড় 'আলিমদের মধ্যে গণ্য করা হতে থাকে।

---

১. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৬/২৭৭

২. খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ-১০/২০৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৫

৩. তাহ্যীব আল-কামাল-১১/৩৮৪

৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৬/২৭৮

৫. তারীখু বাগদাদ-১০/২০৪

৬. শাজারাত আয-যাহাব-১/১১৮; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৬

হাদীছ

হযরত 'উমার, 'আলী, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, তালহা, সালমান আল-ফারেসী, আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ, হুযায়ফা, আবূ যার আল-গিফারী, উবায় ইবন কা'ব, উসামা ইবন যায়দ, বিলাল, হানজালা আল-কাতিব, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) প্রমুখের মত শ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কিরামের সূত্রে বর্ণিত তাঁর হাদীছ পাওয়া যায়।

ছাবিত আল-বানানী, কাতাদা, আসিম আল-আহওয়াল, সুলায়মান আত-তায়মী, খালিদ আল-হায্যা', আইউব আস-সাখতিয়ানী, হুমায়দ আত-তাবীল (রহ) প্রমুখের মত বিশিষ্ট 'আলিম তাবি'ঈগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন।[৭]

'ইবাদত-বন্দেগী

'ইবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়া-পরহেযগারী ছিল হযরত আবূ 'উছমানের বিশেষ গুণ। এ ক্ষেত্রে তিনি সমকালীনদের মধ্যে বিশিষ্ট বলে গণ্য হতেন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন, তিনি ছিলেন একজন 'আলিম, কায়িমুল লায়ল ও সায়িমুন নাহার– অর্থাৎ জ্ঞানী, রাতে সালাত আদায়কারী ও দিনে সাওম পালনকারী। এত বেশি সালাত আদায় করতেন যে, মাঝে মাঝে অচেতন হয়ে পড়তেন।[৮]

সকল প্রকার পাপ থেকে সব সময় দূরে থাকতেন। তাঁর ছাত্র সুলায়মান আত-তায়মী বলেন, তাঁর এমন অবস্থা দেখে আমার ধারণা হয়, তাঁর দ্বারা কখনো কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়নি।[৯]

আল্লাহর যিক্র

তিনি বলতেন, আমি জানি, আল্লাহ আমাকে কখন স্মরণ করেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন : কিভাবে? বললেন : আল্লাহ বলেছেন :[১০] فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ – 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো।' এ কারণে আমি যখন তাকে স্মরণ করি তিনিও আমাকে স্মরণ করেন এবং যখন আমরা তাঁর নিকট দু'আ করি তখন তিনি তা কবুল করেন। কারণ, তিনি বলেছেন :[১১]

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

"তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।"[১২]

---

৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৬/২৭৮; তাহ্যীব আল-কামাল-১১/৩৮৩-৩৮৪

৮. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৬; তাহ্যীব আল-কামাল-১১/৩৮৪

৯. প্রাগুক্ত

১০. সূরা আল-বাকারা-১৫২

১১. সূরা গাফির-৬০

১২. আত-তাবাকাত-৭/৬৯; তাহ্যীব আল-কামাল-১১/৩৮৫

আহলি বায়ত বা নবী-বংশের সাথে সম্পর্ক

আহলি বায়তের প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড ভক্তি ও ভালোবাসা। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। কিন্তু কারবালায় ইমাম হুসায়নের (রা) শাহাদাতের দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর তিনি চিরদিনের জন্য কূফা ছেড়ে বসরায় আবাসন গড়ে তোলেন। কারণ হিসেবে বলতেন, আমি এমন শহরে অবস্থান করতে পারিনে যেখানে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দৌহিত্র শাহাদাত বরণ করেছেন।[১৩]

ওফাত

মৃত্যু সন নিয়ে মতপার্থক্য আছে। সঠিক বর্ণনা মতে হিজরী ১০০ সন অথবা এর কাছাকাছি সময়ে ইনতিকাল করেন। প্রায় এক শো তিরিশ বছর জীবন লাভ করেন। হিজরী ৯৫ সনের কথাও বর্ণিত হয়েছে।[১৪]

---

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. তারীখু বাগদাদ-১০/২০৫; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১১/৩৮৫

ইউনুস ইবন 'উবায়দ (রহ)

হযরত ইউনুসের (রহ) ডাকনাম আবূ 'উবায়দ মতান্তরে আবূ 'আবদিল্লাহ। তিনি বানূ 'আবদিল কায়সের দাস ও বসরার অধিবাসী ছিলেন।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

যদিও দাসত্বের বেড়ী তাঁর কণ্ঠে ঝোলানো ছিল, কিন্তু তা জ্ঞানের আলো থেকে তাঁকে দূরে রাখতে পারেনি। তিনি তাবি'ঈকূল শিরোমণি হযরত হাসান আল-বাসরীর (রহ) খাস সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে ছিলেন। আর এই সাহচর্য ও এক সাথে উঠাবসা তাঁকে জ্ঞান ও কর্মে ঐশ্বর্যবান করে তোলে। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ইমাম, হুজ্জাত (প্রমাণ) ও অনুসরণীয় নেতা বলেছেন।[২] ইমাম নাওবী (রহ) তাঁর বিশ্বস্ততা, দৃঢ়তা ও মহত্ত্বের ব্যাপারে সকলের ঐকমত্যের কথা বলেছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, ইউনুস ছিলেন একজন উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন তাবি'ঈ।[৩] ইবন হিব্বান বলেছেন, তিনি জ্ঞান, মনীষা, স্মৃতিতে ধারণশক্তি, দৃঢ়তা, সুন্নাহর অনুসরণ, বিদ'আতীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ, দিব্যদৃষ্টি, দীনী বিষয়ে গভীর অনুধাবন শক্তি এবং বহু হাদীছ স্মৃতিতে ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর যুগের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম ছিলেন।[৪]

হাদীছ

তিনি তাঁর যুগের হাদীছের বিশিষ্ট হাফিজদের মধ্যে ছিলেন। ইবন সা'দ বলেন : كان ثقة كثير الحديث. – 'তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, বহু হাদীছের ধারক-বাহক। তিনি তাঁকে বসরাবাসী মুহাদ্দিছগণের চতুর্থ তবকায় স্থান দিয়েছেন।'[৫]

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তিনি হযরত আনাস ইবন মালিকের দর্শন ও সাক্ষাৎ লাভ করেন, তবে তাঁর থেকে কোন হাদীছ শোনার সৌভাগ্য হয়নি। তিনি হযরত হাসান আল-বাসরীর (রহ) জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে সবচেয়ে বেশি অর্জন করেছেন। তারপর মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, ছাবিত আন-নাবানী, 'আবদুর রহমান ইবন আবী বাকরা, হাকীম ইবন 'আন-আ'রাজ, নাফি' মাওলা ইবন 'উমার (রা), হুমায়দ ইবন বিলাল, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ (রহ) প্রমুখের নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন।[৬]

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/৫৪২
২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৪৫
৩. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৬৮
৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/৪৪৫
৫. আত-তাবাকাত-৭/২৩; তাহ্যীব আল-কামাল-২০/৫৪৩
৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৪৫; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/৪৪২

হাদীছ চর্চার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অধিকাংশ সমকালীনের শীর্ষে ছিলেন। সা'ঈদ ইবন 'আমির বলেন, আমি ইউনুস ইবন 'উবায়দের চেয়ে উত্তম কাউকে পাইনি। সকল বসরাবাসীর এই মত। আবূ হাতিম বলতেন, তিনি সুলায়মান আত-তায়মীর চেয়েও উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তায়মী তাঁর স্থানে পৌঁছাতে পারতেন না। সালামা ইবন 'আলকামা বলেন, 'আমি ইউনুসের মজলিসে বসেছি, কিন্তু তাঁর একটি কথাও ভুল ধরতে পারিনি।[৭]

এত জ্ঞান ও যোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি হাদীছ বর্ণনায় দারুণ সতর্ক ছিলেন। হাদীছ বর্ণনার পর সব সময় তিনবার "আস্তাগফিরুল্লাহ" পাঠ করতেন। আর এই সতর্কতার কারণেই হাদীছ লিখতেন না। তিনি বলতেন, আমি কখনো কিছু লিখিনি।[৮]

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাত্র হলেন : তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ্, শু'বা, ছাওরী, উহাইব, হাম্মাদ, 'আবদুল্লাহ ইবন 'ঈসা, খায্যায, খারিজা ইবন মুস'আব ও আরো অনেকে।[৯]

জ্ঞান অর্জনে তাঁর অকপটতা ও নিষ্ঠা

তাঁর জ্ঞান অর্জন ও চর্চা খ্যাতি ও নাম-কামের জন্য ছিল না; বরং কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ছিল। হিশাম ইবন হুসাম বলেন, আমি ইউনুস ইবন 'উবায়দ ছাড়া এমন কাউকে পাইনি যার জ্ঞান চর্চা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।[১০]

নৈতিক গুণাবলী

অগাধ জ্ঞানের সাথে 'আমলও (কর্ম) সেই পর্যায় ও মানের ছিল। 'আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে ছিলেন ভীষণ কঠোর এবং মত পথের ব্যাপারে ছিলেন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি ছিলেন সুন্নাহর বড় পাবন্দ, বিদ'আতের প্রতি দারুণ ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণকারী এবং দিব্য জ্ঞানের অধিকারী একজন মানুষ। 'আকীদার ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, নতুন কোন চিন্তা-বিশ্বাসকে কাবীরা গুনাহর চেয়েও মারাত্মক মনে করতেন। একবার তিনি তাঁর পুত্রকে বলেন, আমি তোমাকে সুদ, চুরি, মদপান ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলি। কিন্তু 'আমর ইবন 'উবায়দ ও তার সাথীদের চিন্তা-বিশ্বাসকে গ্রহণ করে তাঁদের সাথে মিলিত হওয়ার চেয়ে উপরোক্ত পাপে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়াকে আমি বেশি পছন্দ করি।[১১] উল্লেখ্য যে, 'আমর ইবন 'উবায়দ ছিলেন 'একজন বুদ্ধিবাদী মু'তাযিলা।'

---

৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৪৫; তাহ্যীব আল-কামাল-২০/৫৪৪

৮. প্রাগুক্ত; আত-তাবাকাত-৭/২৩

৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/২৪২

১০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৪৬

১১. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/৪৪৪

বিদ'আতীদের 'ইবাদত-বন্দেগীকেও তিনি কোন ছাওয়াবের কাজ বলে মনে করতেন না। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আমার একজন মু'তাযিলা প্রতিবেশী অসুস্থ আছে, আমি তাঁকে দেখতে যেতে চাই। বললেন, ছাওয়াবের নিয়্যাতে যাবে না।[১২]

ফরয ব্যতীত খুব বেশি নফল নামায-রোযা করতেন না। তবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অধিকার ও ফরয আদায়ের ব্যাপারে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন। সাল্লাম ইবন মুতী' বলেন, ইউনুস খুব বেশি নামায-রোযা করতেন না। তবে আল্লাহর কসম! যখন আল্লাহর অধিকারের সময় হতো তখন তিনি তা প্রতিপালনের জন্য বিলম্ব করতেন না।[১৩] জিহাদকে সর্বোত্তম 'ইবাদত বলে বিশ্বাস করতেন। কোন কারণে জিহাদে যোগদান করতে না পারলে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়তেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে অস্থিরতা বিদ্যমান থাকতো। ইসহাক ইবন ইবরাহীম বলেন, ইউনুস অন্তিম রোগ শয্যায় শুয়ে তাঁর পায়ের দিকে তাকিয়ে কাঁদতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, এ পা আল্লাহর রাস্তায় ধূলিমলিন হয়নি।[১৪] মুখ থেকে সব সময় কালিমায়ে ইস্তিগফার অর্থাৎ আস্তাগফিরুল্লাহ উচ্চারিত হতো। 'আবদুল মালিক ইবন মূসা বলেন, আমি তাঁর চেয়ে বেশি আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনাকারী আর দেখিনি।[১৫]

সততা ও সাধুতা

ব্যবসা ছিল তাঁর পেশা। এর মাধ্যমে তিনি জীবিকা উপার্জন করতেন। রেশমী বস্ত্রের ব্যবসা করতেন। ব্যবসায়িক সততায় এত বাড়াবাড়ি করতেন যে, তাতে ব্যবসা করাই দুঃসাধ্য ছিল। তাঁর ব্যবসায়িক সততা ও সাধুতার বহু ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি ঘটনা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

একবার এক বিশেষ স্থানে রেশমের মূল্য বৃদ্ধি পায়। তিনি তা জানতে পেরে অন্য এক স্থানের রেশম বিক্রেতার নিকট থেকে তিরিশ হাজার দিরহামের রেশম ক্রয় করেন। পরে কি যেন চিন্তা করে বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করেন, অমুক স্থানে রেশমের মূল্য বৃদ্ধির কথা কি তুমি জান? লোকটি বললো, সে কথা যদি জানতাম তাহলে আমার এ মাল কি বিক্রি করতাম? তাঁর এ জবাব শুনে তিনি প্রদত্ত মূল্য নিয়ে মাল ফেরত দেন।[১৬]

একবার এক মহিলা তাঁর নিকট আসে "খুযের" চাদর বিক্রির জন্য। তিনি জিনিস দেখে দাম জিজ্ঞেস করেন। সে বললো : ষাট দিরহাম। তিনি তাঁর এক প্রতিবেশীকে চাদর দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এর দাম কত হতে পারে? সে বললো : এক শো বিশ পর্যন্ত হতে পারে। দাম যাঁচায়ের পর তিনি মহিলাকে বলেন, বাড়ীর লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করেছি, তারা এর দাম এক শো পঁচিশ বলছে।[১৭]

---

১২. প্রাগুক্ত

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/৫৪৭

১৬. প্রাগুক্ত-২০/৫৪৯; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/৪৪৩

১৭. প্রাগুক্ত

আরেকবার এক মহিলা রেশমের একটি জুব্বা বিক্রির জন্য নিয়ে এলো। তিনি দাম জিজ্ঞেস করলেন এবং সে পাঁচশো চাইলো। ইউনুসের দৃষ্টিতে জিনিসটির দাম অনেক বেশি ছিল। এ কারণে তিনি এক হাজার বলেন।[১৮]

এত সতর্কতা সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। ইবন শাওযাব বলেন, একবার ইউনুস ও ইবন 'আওন হালাল-হারামের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। এক পর্যায়ে উভয়ে বললেন : আমাদের সম্পদে এক দিরহামও হালাল অর্থ নেই।[১৯]

ওফাত

হিজরী ১৩৯ সনে ইনতিকাল করেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) পৌত্র সুলায়মান ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আলী এবং প্রপৌত্র জা'ফার ও মুহাম্মাদ (রহ) তাঁর লাশের খাটিয়া বহন করেন। তখন তাঁরা বলছিলেন : "আল্লাহর কসম! এ একটি সম্মান ও মর্যাদা।"[২০]

---

১৮. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/১৪৫

১৯. তাহযীব আত-তাহযীব-১১/৪৪৪

২০. আত-তাবাকাত-৭/২৪; তাহযীব আল-কামাল-২০/৫৫৩

সুলায়মান ইবন ইয়াসার আল-হিলালী (রহ)

হযরত সুলায়মানের (রহ) ডাকনাম আবূ আইউব, মতান্তরে আবূ আবদির রহমান। উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনার (রা) দাসত্বের সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত মায়মূনা (রা) তাঁকে মুকাতিব করেন। অর্থাৎ তাঁকে এই শর্তে মুক্তি দানের চুক্তি করেন যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধের বিনিময়ে তিনি দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করবেন। এই দাসত্ব সুলায়মানকে 'ইল্ম ও 'আমলের (জ্ঞান ও কর্ম) ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে তোলে। 'আতা', 'আবদুল মালিক ও 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াসার– এ তিনজন ছিলেন তাঁর ভাই।[১]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) অন্দর মহলে যাতায়াত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনার (রা) দাসত্বের সুবাদে সুলায়মান হযরত 'আয়িশা (রা)সহ অন্যদের কাছে যাতায়াত করতেন। তিনি তাঁর দাসত্বকালে তাঁদের থেকে পর্দা করতেন না। সুলায়মান নিজেই বলেন, একবার আমি হযরত 'আয়িশার (রা) দরজায় উপস্থিত হয়ে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। তিনি আওয়ায শুনে বললেন, তুমি দাসত্ব থেকে মুক্তির ব্যাপারে যে চুক্তি করেছিলে তাকি পূরণ করেছো? আমি বললাম : হাঁ, তবে সামান্য কিছু বাকী আছে। বললেন : তাহলে ভিতরে এসো। তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত দাস যতক্ষণ তোমার চুক্তির শর্ত পূরণে কিছু বাকী থাকবে।[২]

জ্ঞান ও মনীষা

সুলায়মান প্রথমতঃ ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক দিয়ে অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন।[৩] দ্বিতীয়তঃ উম্মুল মু'মিনীনের দাস হওয়ার সুবাদে মদীনায় বসবাসকারী সাহাবায়ে কিরামের (রা) সাহচর্যের বাড়তি সুবিধাও লাভ করেন। এতদুভয় কারণে তিনি মদীনার একজন বিশিষ্ট 'আলিমে পরিণত হন। ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর মহত্ত্ব ও জ্ঞানগত উৎকর্ষের ব্যাপারে সকলে একমত।[৪]

কুরআন ও হাদীছ

কুরআন মাজীদ, হাদীছ, ফিক্হ তথা সকল ইসলামী জ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। কুরআনের বিশিষ্ট কারী ছিলেন।[৫] আর যে গৃহের তিনি সেবক ছিলেন সেটাই তো ছিল হাদীছে

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-৮/১১৯

২. আত-তাবাকাত-৫/১৩০

৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯১

৪. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২৩৪

৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৪/২২৯

নববীর উৎসধারা। এ কারণে স্বাভাবিকভাবে হাদীছের একটা নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার তাঁর অধিকারে চলে আসে। ইবন সা'দ বলেন, তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, ফকীহ ও বহু হাদীছের ধারক-বাহক ছিলেন।[৬]

তাঁর অর্জিত হাদীছ ভাণ্ডারের মূল উৎস উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) ও মায়মূনা (রা)। তাছাড়া আরো অনেক বড় সাহাবীর (রা) নিকট থেকেও তাঁর হাদীছের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। যেমন : যায়দ ইবন ছাবিত, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, ফাদল ইবন 'আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, মিকদাদ ইবন আওস, 'আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা (রা) ও আরো অনেকে। তাঁর সমকালীন মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকেও তিনি হাদীছ শোনেন। যেমন : জা'ফার ইবন 'আমর ইবন উমাইয়্যা আদ-দামরী, 'আবদুল্লাহ 'ইবন আল-হারিছ ইবন নাওফাল, 'আবদুর রহমান ইবন জাবির, 'আররাক ইবন মালিক, মালিক ইবন আবী 'আমির আসবাহী (রহ) প্রমুখ।[৭]

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর ছাত্র-শিষ্যের পরিধি অনেক ব্যাপক। কয়েকজনের নাম এখানে উপস্থাপন করা হলো : 'আমর ইবন দীনার, 'আবদুল্লাহ ইবন দীনার, 'আবদুল্লাহ ইবন ফাদল আল-হাশিমী, আবুয যানাদ, বুকায়র ইবন আল-আশাজ্জ, জা'ফার ইবন 'আবদিল্লাহ, ইবন হাকাম, সালিম, আবুন নাসর, সালিহ ইবন কায়সান, 'আমর ইবন মায়মূন, মুহাম্মাদ ইবন আবী হারমালা, যুহ্রী, মাকহূল, নাফি', ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, ইয়া'লা ইবন হাকীম, ইউনুস ইবন সায়ফ (রহ) প্রমুখ।[৮]

ফিক্হ

ফিক্হ ছিল তাঁর একান্ত ও বিশেষভাবে অধীত বিষয়। এতে তিনি একজন ইমাম ও মুজতাহিদের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি ফকীহ 'আলিম ও ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন ইমাম ছিলেন।[৯] তিনি ছিলেন মদীনার সেই বিখ্যাত সাত ফকীহ্র অন্যতম যাঁদেরকে সে সময় ফিক্হর ইমাম বলে মানা হতো।[১০] বিশেষ করে তালাকের মাসয়ালার তিনি একজন বড় 'আলিম ছিলেন। কাতাদা বলেন, আমি একবার মদীনায় গিয়ে মানুষের নিকট জিজ্ঞেস করলাম, এখানে তালাকের মাসয়ালার সবচেয়ে বড় 'আলিম কে? তারা সুলায়মান ইবন ইয়াসারের নাম বললো।[১১]

কিছু 'আলিম ফিক্হ বিষয়ে তাঁকে ঐ সকল ইমামদের উপরে, জ্ঞানের জগতে যাঁদের

---

৬. আত-তাবাকাত-৫/১৩০

৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৪/২২৮; তাহ্যীব আল-কামাল-৮/১১৯

৮. প্রাগুক্ত

৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯১

১০. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-আসমা'-১/২৩৫

১১. ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান-১/২১৩

শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ছিল, প্রাধান্য দিতেন। মুহাম্মাদ ইবন আল-হানাফিয়্যার (রহ) সুযোগ্য পুত্র হাসান (রহ) তাঁকে সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিবের (রহ) চেয়েও বেশি বুদ্ধিদীপ্ত মনে করতেন। খোদ সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) তাঁর প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, অনেক সময় কেউ তাঁর কাছে কোন মাসয়ালার সমাধান জানতে চাইলে তিনি তাকে সুলায়মানের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।[১২] বলতেন, জীবিত লোকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বড় 'আলিম।[১৩]

তাকওয়া-পরহেযগারী

দুনিয়া বিরাগী মনোভাব এবং 'ইবাদত-বন্দেগীর দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। আবূ যার'আ বলেন, সুলায়মান ইবন ইয়াসার ছিলেন মদীনার একজন জ্ঞানী-গুণী ও তাপস মানুষ।[১৪] আল-'ইজলী তাঁর জ্ঞান-মনীষার সাথে সাথে 'ইবাদত-বন্দেগীরও সাক্ষ্য দিয়েছেন।[১৫]

তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের ছিলেন। যদিও তাবি'ঈদের সেই পূতঃপবিত্র দলটির জন্য এ কোন বড় বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ, তাঁরা সকলেই ছিলেন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী, কিন্তু কেউ যদি জীবনের কোন পর্যায়ে কোন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয় এবং সফলভাবে উৎরে যায় তাহলে সেটা তার জন্য বিশেষ সাফল্য হিসেবে ধরা হয়। সুলায়মান ছিলেন খুবই সুদর্শন ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। একবার এক সুন্দরী মহিলা সুযোগ মত তাঁর ঘরে ঢুকে যায় এবং তাঁকে সম্ভোগের আহ্বান জানায়। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যান। এরপর একদিন তিনি ইউসুফকে (আ) স্বপ্নে দেখেন।[১৬]

ওফাত

তাঁর মৃত্যু সন সম্পর্কে একাধিক মত আছে। সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মতে হিজরী ১০৭ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। মোট ৭৩ বছর জীবন লাভ করেন। ইমাম আল-বুখারী, বলেন : সুলায়মান ইবন ইয়াসার, সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, 'আলী ইবন আল-হুসায়ন ও আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমান একই বছর মৃত্যুবরণ করেন। সেই বছরটি হলো হিজরী ৯৪ সন। এ কারণে এ বছরটিকে বলা হয় سنة الفقهاء – ফকীহদের বছর।[১৭]

---

১২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯১

১৩. শাযারাত আয-যাহাব-১/১৩৪

১৪. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/২৩৫

১৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৪/২৩০

১৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯১; তাহ্যীব আল-কামাল-৮/১২১

১৭. প্রাগুক্ত; আত-তাবাকাত-৫/১৩০

আবুল 'আলিয়া রিয়াহী (রহ)

হযরত আবুল 'আলিয়ার (রহ) আসল নাম রাফী' এবং ডাকনাম আবুল 'আলিয়া। এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। পিতার নাম মাহরান। আবুল 'আলিয়া বানূ রিয়াহ ইবন ইয়ারবূ' গোত্রের এক মহিলার দাস ছিলেন। এ কারণে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁকে রিয়াহী বলা হয়। বানূ রিয়াহ হলো বানূ তামীমের একটি শাখা গোত্র।[১] আসলে পারস্যে তাঁর জন্ম। মুসলিম মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়ে বসরায় আসেন এবং দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে পড়েন।[২]

ইসলাম গ্রহণ

তিনি জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ লাভ করেন, তাই তিনি একজন 'মুখাদরাম' মানুষ। তবে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণের গৌরব থেকে বঞ্চিত থেকে যান। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের দু'বছর পর ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩] আবূ খালদা বলেন, একবার আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি রাসূলকে (সা) দেখেছেন? বললেন : আমি তাঁর ওফাতের দু'বছরের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছি।[৪]

দাসত্ব থেকে মুক্তি

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইসলাম গ্রহণের পর বেশ কিছুকাল দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। অতঃপর তাঁর মনিবা তাঁকে মুক্ত করে দেয়। দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের ঘটনাটি তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন এভাবে : আমি এক মহিলার দাস ছিলাম। তিনি যখন আমাকে মুক্তি দানের সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তাঁর চাচাতো ভাইয়েরা তাঁকে এই বলে বিরত রাখার চেষ্টা করে যে, যদি তুমি তাকে মুক্তি দাও তাহলে সে কূফায় গিয়ে যোগাযোগ ছিন্ন করে দেবে। কিন্তু তিনি মুক্তি দানের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, এ কারণে এক জুম'আর দিন আমার কাছে আসেন এবং আমার কাছে জিজ্ঞেস করে জামি' মসজিদের দিকে চলা শুরু করেন। আমিও তাঁর সাথে চললাম। মসজিদের পৌঁছার পর ইমাম সাহেব আমাকে মিম্বরের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। মহিলাটি আমার একটি হাত ধরে এই বাক্যগুলো উচ্চারণের মাধ্যমে আমার মুক্তি ঘোষণা করেন : "হে আল্লাহ! আমি আমার আখিরাতের জন্য তাকে তোমার কাছে জমা রাখলাম। মসজিদে উপস্থিত

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬১; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/২২০

২. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৯২

৩. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২২৫

৪. তাহ্যীব আল-কামাল-৬/২২১

লোকেরা! সাক্ষী থাকুন। এই দাসকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করলাম। ভবিষ্যতে তার উপর কারো কোন অধিকার নেই।" এরপর তিনি আমাকে মসজিদে রেখে চলে যান এবং আর কখনো আমাকে দেখা দেননি।[৫]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি বিশিষ্ট তাবি'ঈদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের মধ্যে ছিলেন।[৬] আবুল কাসিম আত-তাবারী বলেন, তাঁর বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তার ব্যাপারে সকলে একমত।

কুরআন

তাঁর অতি প্রিয় ও বিশেষ অধীত বিষয়টি ছিল কিতাবুল্লাহ। আল-কুরআনের শিক্ষা তিনি লাভ করেন কুরআনের বিখ্যাত 'আলিম রাসূলুল্লাহর (সা) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত উবায় ইবন কা'বের (রা) নিকট থেকে। এ শিক্ষার শুরু হয় তাঁর দাসত্বের জীবন থেকেই। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, আমি একজন দাস ছিলাম, মনিব পরিবারের সেবা করতাম। আর সেই সাথে কুরআন ও আরবী বই-পুস্তক পড়া শিখতাম।[৭] তবে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার শুরু হয় বেশ বয়স হলে, ইসলাম গ্রহণের সাত-আট বছর পরে। তিনি বলতেন, আমি তোমাদের নবীর ওফাতের দশ বছর পরে কুরআন পড়েছি।[৮]

এত বেশি আগ্রহ, উদ্দীপনা ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে তিনি জ্ঞান অর্জন করেন যে, তাবি'ঈদের মধ্যে কুরআনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিমে পরিণত হন। আবু বাকর ইবন আবী দাউদ বলেন, সাহাবায়ে কিরামের পরে আবুল 'আলিয়ার চেয়ে বড় কুরআনের কোন 'আলিম ছিলেন না।[৯] ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী (রহ) তাঁকে মুফাস্সির বলে উল্লেখ করেছেন।[১০]

হাদীছ

ইবন সা'দ তাঁকে كثير الحديث অর্থাৎ বহু হাদীছের ধারক-বাহক বলেছেন।[১১] হযরত 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, আবূ আইউব আল-আনসারী, উবায় ইবন কা'ব, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা, ছাওবান, হুযায়ফা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, রাফি' ইবন খাদীজ, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী,

---

৫. আত-তাবাকাত-৭/৮১; 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৯৩

৬. তাহ্যীব আল-আসমা'-১/২২৫

৭. আত-তাবাকাত-৭/৮২

৮. তাহ্যীব আল-কামাল-৬/২২১

৯. প্রাগুক্ত-৬/২২২; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬১

১০. শাযারাত আয-যাহাব-১/১০২

১১. আত-তাবাকাত-৭/৮৫

আবূ হুরায়রা, আনাস ইবন মালিক, আবূ যার আল-গিফারী (রা) প্রমুখের মত শ্রেষ্ঠ সাহাবায়ে কিরামের নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন।[১২]

হাদীছ গ্রহণে তাঁর সতর্কতা

হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে তিনি দারুণ সতর্ক ছিলেন। যতক্ষণ প্রথম মূল রাবীর (বর্ণনাকারী) মুখ দিয়ে না শুনতেন, ততক্ষণ মধ্যবর্তী রাবীর বর্ণনা গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন, বসরায় আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের বর্ণনা শুনতাম, কিন্তু ততক্ষণ তাঁর উপর নির্ভর করতাম না যতক্ষণ না নিজে মদীনায় গিয়ে বর্ণনাটির প্রথম সূত্রের মুখ থেকে শুনতাম।[১৩]

ছাত্র-শিষ্য

তাঁর থেকে যাঁরা জ্ঞানগত ফায়দা হাসিল করেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন : খালিদ আল-হায্যা', দাউদ ইবন আবী হিন্দ, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, ইউসুফ ইবন 'আবদিল্লাহ, রুবায়' ইবন আনাস, বাকর আল-মুযানী, ছাবিত আন-নাবানী, হুমায়দ ইবন হিলাল, কাতাদা, মানসূর, 'আওফ আল-আ'রাবী, আবূ 'আমর ইবন আল-আলা' (রহ) ও আরো অনেকে।[১৪]

ফিক্‌হতেও তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। বসরার ফকীহদের মধ্যে তাঁকেও গণ্য করা হতো। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ফকীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৫]

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তাঁর মর্যাদা

হযরত আবুল 'আলিয়া যদিও একজন দাস ছিলেন, তবে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও ব্যাপক মনীষার কারণে অনেক বড় বড় সাহাবী তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) এতখানি সম্মান করতেন যে, আবুল 'আলিয়া যখন তাঁর কাছে যেতেন তখন তিনি তাঁকে একটি উঁচু স্থানে নিয়ে বসাতেন। তখন কুরায়শ বংশের অতি সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তাঁর নীচে বসা থাকতেন। সম্মানের সাথে উচ্চ আসনে বসানোর পর বলতেন, জ্ঞান এভাবে মর্যাদাবান ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয় এবং দাসকে সিংহাসনে বসায়।[১৬]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) যখন বসরার ওয়ালী তখন একবার আবুল 'আলিয়া তাঁর নিকট যান। ইবন 'আব্বাস তাঁর হাত ধরে নিজের পাশে বসান। তাঁর প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শন দেখে তামীম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ধৈর্যহারা হয়ে বলে ওঠে : এতো একজন দাস।[১৭]

---

১২. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৩/৩৮৪; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬১

১৩. আত-তাবাকাত-৭/৮২; তাবি'ঈন-৫৩৮

১৪. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৩/৩৮৪

১৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৬১

১৬. প্রাগুক্ত; তাহ্‌যীব আল-কামাল-৬/২২২

১৭. আত-তাবাকাত-৭/৮২; তাহ্‌যীব আল-কামাল-৬/২২২

'ইবাদত-বন্দেগী

হযরত আবুল 'আলিয়ার যে পরিমাণ জ্ঞান ছিল তাঁর মধ্যে সেই পরিমাণ 'আমলও ছিল। তিনি একজন 'আবিদ ব্যক্তি ছিলেন। রাত জেগে 'ইবাদত-বন্দেগী ও কুরআন তিলাওয়াত করার প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও রুচি। জীবনের একটি সময়ে তিনি সারা রাত নামায পড়তেন এবং এক রাতে কুরআন খতম করতেন। কিন্তু এত কঠোর 'ইবাদত সারা জীবন চালিয়ে যেতে পারেননি। তিনি নিজেই বলেন, আমরা কয়েকজন দাস ছিলাম। তাদের কয়েকজন তাদের উপর ধার্যকৃত ট্যাক্স আদায় করতো, আর কয়েকজন করতো মনিবের সেবা। তবে আমরা সকলে সারা রাত জেগে এক রাতে পুরো কুরআন খতম করতাম। কিন্তু একাজ যখন ভীষণ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো তখন দু'রাতে খতম করতে লাগলাম। কিন্তু এটাও যখন সম্ভব হলো না তখন তিন রাতে করতে লাগলাম। কিন্তু তাও সম্ভব না হওয়ায় আমরা একে অপরকে দোষারোপ করতে আরম্ভ করলাম। অতঃপর আমরা হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাহাবীদের কাছে গেলাম। তাঁরা বললেন, এক সপ্তাহে খতম কর। তাঁদের দিক নির্দেশনার পর আমরা রাতে নামায পড়ার সাথে সাথে ঘুমাতেও লাগলাম। তখন এই ক্লান্তিকর বোঝা হালকা হতে থাকে।[১৮]

তিনি কুরআন হিফ্‌জ (মুখস্থ) করা সম্পর্কে বলতেন : তোমরা পাঁচটি করে আয়াত মুখস্থ করবে। তাতে তোমাদের মাথায় চাপ কম পড়বে এবং বুঝতেও সহজ হবে। জিবরীল (আ) নবীর (সা) নিকট পাঁচটি করে আয়াত নিয়ে আসতেন।[১৯]

বৈরাগ্যবাদ পরিহার

প্রচুর 'ইবাদত-বন্দেগী করতেন সত্য, তবে রুহ্‌বানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। এমনকি রাহিব তথা বৈরাগীদের লেবাস-পোশাক পর্যন্ত পছন্দ করতেন না। একবার আবূ উমাইয়্যা আবদুল কারীম মোটা পশমী কাপড়ের পোশাক পরে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। তাঁকে দেখে আবুল 'আলিয়া বলেন, এতো রাহিব তথা বৈরাগীদের পোশাক ও পদ্ধতি। মুসলিমগণ যখন পরস্পর পরস্পরের সাথে সাক্ষাতের জন্য যায় তখন ভালো পোশাক পরে যায়। তারপর তিনি আবদুল করীমকে লক্ষ্য করে বলেন : তুমি নিজে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ কর এবং যে এমন কাজ করে তাকে ভালোবাস। আর পাপ কাজ থেকে দূরে থাক। আল্লাহ ইচ্ছা করলে পাপীকে শাস্তি দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে মাফও করতে পারেন।[২০]

রিয়া তথা আত্মপ্রদর্শনী ভাব থেকে দূরে থাকা

ভালো কাজের প্রকাশকে তিনি দারুণ খারাপ মনে করতেন, কেউ এমন করলে তাকে রিয়াকার বলতেন। আবূ মাখলাদ বলেন, আবুল 'আলিয়া বলতেন, যখন তোমরা কোন

---

১৮. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৯৩

১৯. প্রাগুক্ত-৩৯৭; হিলয়াতুল আওলিয়া-২/২১৯

২০. আত-তাবাকাত-৭/৮৩; 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৯৬

ব্যক্তিকে একথা বলতে শুনবে যে, আমি আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা করি, তখন তোমরা তার অনুসরণ করবে না।[২১] সুফইয়ান ইবন উয়ায়না বলেন, আবুল 'আলিয়ার নিকট চারজনের বেশি মানুষ সমবেত হলে তিনি তাদেরকে রেখে উঠে চলে যেতেন।[২২]

আল্লাহর পথে ব্যয় করা

আল্লাহর পথে ব্যয় করার ব্যাপারে উদার ছিলেন। তিনি নিজের সকল সম্পদ অথবা তার বড় একটা অংশ ভালো কাজের জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। ইবন সা'দের একটি বর্ণনার একটি বাক্য এ রকম : فأوصى أبو العالية بماله كله

– 'আবুল 'আলিয়া তাঁর সকল সম্পদ (আল্লাহর রাস্তায় খরচের জন্য) অসীয়াত করে যান।'

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, আবুল 'আলিয়া বলেন, আমি সোনা-রূপো যা কিছু রেখে যাচ্ছি তার এক-তৃতীয়াংশ আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবার-পরিজনদের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান ফকীর-মিসকীনদের জন্য। অবশ্য এর মধ্য থেকে আমার বেগম সাহেবার অংশ তোমরা দেবে।[২৩]

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ভালোবাসা

হযরত রাসূলে কারীম (সা) ছিলেন পৃথিবীর সবকিছু থেকে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। এই প্রিয়তম ব্যক্তির সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত থাকার দুঃখ আজীবন বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন। রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পরিমাণ অনুমান করা যায় একটি ঘটনা দ্বারা। একদিন রাসূলে কারীমের (সা) খাদিম প্রখাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) একটি আপেল হাতে নিয়ে আবুল 'আলিয়ার হাতে তুলে দেন। তিনি আপেলটি হাতে নিয়ে ক্রমাগত চুমু দিতে লাগলেন, আর বলতে থাকলেন : যে বরকতময় হাত রাসূলুল্লাহর (সা) হাত স্পর্শ করেছে, সেই হাত এই আপেলটি স্পর্শ করেছে; এই আপেল সেই হাত স্পর্শ করেছে যে হাত রাসূলুল্লাহর (সা) হাত স্পর্শ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।[২৪]

জিহাদ

জিহাদের ময়দানেও আবুল 'আলিয়াকে দেখা যায়। তাঁর একজন সঙ্গী বলেন :[২৫]

---

২১. আত-তাবাকাত-৭/৮১

২২. তাহ্যীব আল-কামাল-৬/২২২

২৩. আত-তাবাকাত-৭/৮১

২৪. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৯৮

২৫. প্রাগুক্ত

كان أبو العالية أول من أذّن وراء النهر، وحارب فى بلاد الفرس والروم، وكان أول من رفع الأذان فى تلك الديار.

'আবুল 'আলিয়া হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি 'মা ওয়ারা' আন-নাহ্র' অঞ্চলে আযান দেন। তিনি পারসিক ও রোমানদের ভূমিতে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং সেই সকল স্থানে সর্বপ্রথম আযান দেন।' উল্লেখ্য যে, মধ্য এশিয়ার জায়হুন ও সায়হুন নদীর অপর তীরের অঞ্চলসমূহকে 'মাওয়ারা' 'আন-নাহ্র' বলে।

শিক্ষাদানের বিনিময়ে কোন প্রতিদান গ্রহণ না করা

তিনি ছাত্রদের যে জ্ঞানদান করতেন তার বিনিময়ে কোন কিছু গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করতেন না। একবার একটি মজলিসে তিনি ছাত্রদেরকে হাদীছ ও উপদেশ শোনালেন। মজলিস শেষে একজন ছাত্র বিনিময়ে কিছু অর্থ দিতে চাইলেন। আবুল 'আলিয়া তাকে আল্লাহর এই বাণীটি শোনালেন :

وَلاَ تَشْتَرُوْا بِأَيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلاً – 'এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না।'[২৬] তারপর ছাত্রটির দিকে তাঁকিয়ে বললেন : ছেলে! আমি তোমাকে যা কিছু শিখিয়েছি তার বিনিময়ে তুমি কোন কিছু কখনো গ্রহণ করবে না। কারণ, জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মানুষদের প্রতিদান তো আল্লাহর কাছে রয়েছে। তাওরাতে লিখিত আছে : ওহে আদমের সন্তান! যেভাবে তোমাকে মুফ্‌ত জ্ঞান দান করা হয়েছে সেভাবে তুমিও মানুষকে মুফ্‌ত জ্ঞান দান কর।

ছাত্রটি তার এমন প্রস্তাব ও শিক্ষকের এমন জবাবে ভীষণ লজ্জা পেল। লজ্জায় সে ঘেমে গেল এবং কপালের ঘাম মুছতে লাগলো। আবুল 'আলিয়া ছাত্রের এমন বিব্রতকর অবস্থা লক্ষ্য করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন : ছেলে! লাজুক ও অহঙ্কারী এই দু'শ্রেণীর মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে না।[২৭] আমাকে মুহাম্মাদ (সা) এর সাহাবীরা বলেছেন : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে কোন কিছু করবে না। তাহলে যার উদ্দেশ্যে তুমি কাজটি করলে তার কাছেই তোমাকে সোপর্দ করা হবে।[২৮]

তারপর তিনি বলেন, আমরা পঞ্চাশ বছর ধরে একথা বলছি যে, মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ নির্দেশ দেন : তোমরা আমার এই অসুস্থ বান্দার আমলনামায় সেসব কাজ লিখতে থাক যা সে সুস্থ অবস্থায় করতো, যতক্ষণ না আমি তার জান কবজ করি অথবা তার পথ ছেড়ে দিই। আমরা একথাও পঞ্চাশ বছর ধরে বলে আসছি যে, মানুষের সব কর্মই আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করা হয়। যেসব কর্ম কেবল আল্লাহর জন্য করা হয়, সেগুলো দেখে তিনি বলেন : এগুলো আমার এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। আর যেগুলো গায়রুল্লাহর জন্য করা হয়, সেগুলো দেখে বলেন : এগুলোর প্রতিদান তার কাছেই চাওয়ার জন্য তোমরা তা করেছো।[২৯]

---

২৬. সূরা আল-বাকারা-৪১

২৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া-২২০

২৮. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৯৬

২৯. প্রাগুক্ত-৩৯৭; হিলইয়াতুল আওলিয়া-২/২১৯

তারপর অত্যন্ত আবেগভরা কণ্ঠে নিম্নের কথাগুলো বলে তিনি মজলিস শেষ করেন :

'তোমরা ইসলাম শেখ ও শেখার পর তা আর প্রত্যাখ্যান করো না। সরল-সোজা পথে চলো। আর সেই পথ হলো ইসলাম। এই সরল-সোজা পথ ছেড়ে ডানে-বাঁয়ে যেয়ো না। তোমরা তোমাদের নবী (সা) ও তাঁর সাহাবীদের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে থাক এবং বিভিন্ন ধরনের মত-পথ থেকে দূরে থাক। বিভিন্ন ধরনের মত-পথ তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যে আমাকে ইসলামের হিদায়াত দান করেছেন অথবা প্রবৃত্তির অনুসারী মত-পথ থেকে রক্ষা করেছেন– এ দু'টি অনুগ্রহের মধ্যে কোন্‌টি যে উত্তম তা আমার জানা নেই।[৩০]

দাসমুক্তি

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিনি দাসদের মুক্তি দিতেন। একবার একটি দাসকে তিনি মুক্তি দেন। তার সেই মুক্তির সনদে নিম্নের কথাটি লেখা ছিল : 'একজন মুসলিম একজন নওজোয়ান দাসকে মুক্ত-স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানো পশুর মত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্তি দিচ্ছে। তার থেকে ভালো কাজ করিয়ে নেয়া ছাড়া তার উপর কারো কোন অধিকার নেই।'[৩১]

যাকাত-সাদাকা

অত্যন্ত নিয়মানুবর্তিতার সাথে যাকাত আদায় করতেন এবং তা বন্টনের জন্য মদীনায় পাঠিয়ে দিতেন। আবূ খালদা বলেন, আবুল 'আলিয়া তাঁর সম্পদের যাকাত নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার জন্য মদীনায় আহলি-বায়ত তথা নবী-পরিবারের নিকট পাঠিয়ে দিতেন।[৩২]

গৃহ-যুদ্ধ থেকে দূরে অবস্থান

আবুল 'আলিয়া একজন বীর এবং যুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই বীরত্ব মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত হয়নি। তাঁর সময়ে সিফ্‌ফীনসহ আরো কতগুলো গৃহ-যুদ্ধ হয় এবং তা থেকে খুব অল্পসংখ্যক মুসলমান নিজেদেরকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়। তিনিও খুব আবেগ-উদ্দীপনার সাথে ঘর থেকে বের হন, কিন্তু পরে রণক্ষেত্র থেকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফিরে আসেন। আবূ খালদা বলেন, আবুল 'আলিয়া বলতেন, 'আলী ও মু'আবিয়ার (রা) মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, আমি তখন যুবক। যুদ্ধ তো আমার কাছে উপাদেয় খাবারের চেয়েও বেশি প্রিয় ছিল। এ কারণে আমিও পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে রণাঙ্গনে উপস্থিত হই। এমন বিশাল বাহিনী দেখলাম যার প্রান্তসীমা কোথায় তা দেখা যাচ্ছিল না। একদল তাকবীর ধ্বনি দিলে অন্য দলও তাকবীর দিচ্ছিল। আমি মনে মনে

---

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. আত-তাবাকাত-৭/৮৪

৩২. প্রাগুক্ত

চিন্তা করলাম, কোন দলকে আমি মু'মিন বলবো এবং কোন দলকে বলবো কাফির এবং কোন দলের সঙ্গেই বা থাকবো। কেউ তো আমাকে যুদ্ধ করতে চাপ প্রয়োগ করেনি। এসব কথা চিন্তার পর সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই আমি ফিরে আসি।[৩৩]

সন্দেহ-সংশয় থেকে দূরে অবস্থান

সন্দেহ-সংশয়পূর্ণ জিনিস থেকে এতখানি সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, যাদের আয়-উপার্জনের মধ্যে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকতো তাদের দেয়া পানিও পান করতেন না। এ কারণে মুদ্রা ব্যবসায়ী এবং ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের 'উশর আদায়কারীর দেয়া কোন খাবার খাওয়া তো দূরের কথা তাদের পানিও পান করতেন না। আবূ খালদা বলেন, একবার আমি আবুল 'আলিয়ার নিকট গেলাম। তিনি খাবার আনলেন। কিছু সবজির তরকারিও ছিল। সেদিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, এ তেমন তরকারি নয় যাতে হারামের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে। এ তরকারি আমার ভাই আনাস ইবন মালিক (রা) তাঁর খামার থেকে পাঠিয়েছেন। বললাম, তরকারিতে এমন কি থাকে যে খাওয়া যায় না। বললেন, সবজি সব সময় নোংরা ও ময়লা আবর্জনার স্থানে ভালো জন্মায়, যেখানে পেশাব-পায়খানা করা হয়।[৩৪]

তিনি অত্যন্ত সরল-সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কোন লোক-লৌকিকতা ও আচার-অনুষ্ঠানের পরোয়া করতেন না। এ কারণে তাঁকে কেন্দ্র করে কোন রকম তোড়জোড় ও বিশেষ ব্যবস্থাপনা মোটেই পছন্দ করতেন না। কোথাও গেলে গৃহকর্তাকে আগেই বলে দিতেন, ঘরে যা কিছু আছে তাই খাওয়াবে, বাজার থেকে কোন কিছু কেনাকাটা যেন তার জন্য করা না হয়।[৩৫]

ওফাত

সঠিক বর্ণনা মতে হিজরী ৯৩ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। তবে ভিন্ন একটি বর্ণনা মতে হিজরী ৯০ সনের শাওয়াল মাসে মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যু হয়।[৩৬] হিজরী ১০৬ ও ১১১ সনেও তাঁর মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়েছে।[৩৭] তবে ইবন হিব্বান ও বুখারী হিজরী ৯৩ সনের উপর জোর দিয়েছেন।[৩৮] মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্ব থেকে তিনি প্রতি মাসে একবার করে নিজের জন্য প্রস্তুতকৃত কাফনের কাপড় পরে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সাথে সাক্ষাতের অনুশীলন করতেন।[৩৯]

---

৩৩. প্রাগুক্ত

৩৪. প্রাগুক্ত

৩৫. প্রাগুক্ত

৩৬. শাযারাত আয-যাহাব-১/১০২; তাবি'ঈন-৫৪১

৩৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬২; তাহ্যীব আল-কামাল-৬/২২৩

৩৮. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৩/২৪৭

৩৯. 'আসরুত তাবি'ঈন-৩৯৮

আবূ ইদরীস আল-খাওলানী (রহ)

হযরত আবূ ইদরীসের (রহ) আসল নাম 'আয়িযুল্লাহ, আবূ ইদরীস তাঁর ডাকনাম এবং এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। পিতার নাম 'আবদুল্লাহ। তাঁর বংশধারা সম্পর্কে দু'রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি এ রকম : 'আয়িযুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আমর এবং অন্যটিতে নাম 'আবদুল্লাহ বলা হয়েছে। সেটা হলো : 'আবদুল্লাহ ইবন ইদরীস ইবন 'আয়িয ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন গায়লান আল-খাওলানী। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় হিজরী অষ্টম সনে হুনায়ন যুদ্ধের বছর তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

তিনি একজন 'ইল্ম ও 'আমলের অধিকারী তাবি'ঈ ছিলেন। শামের বিশিষ্ট 'আলিমদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন :[২]

أبو ادريس الخولاني الدمشقي عالم أهل الشام الفقيه أحد من جمع بين العلم والعمل.

"আবূ ইদরীস আল-খাওলানী আদ-দিমাশ্কী ছিলেন শামের একজন 'আলিম, ফকীহ এবং যাঁদের মধ্যে 'ইল্ম ও 'আমলের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁদের একজন।"

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবুদ দারদা' (রা) যিনি শামে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর আবূ ইদরীস (রহ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[৩] ইউসুফ আল-মিয্যী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :[৪]

كان من علماء أهل الشام وعُبَّادهم وقرائهم.

'তিনি ছিলেন শামের 'আলিম, 'আবিদ ও কারীদের একজন।'

হাদীছ

হযরত আবূ ইদরীস (রহ) উঁচু স্তরের বহু সাহাবীর (রা) নিকট থেকে হাদীছ শোনেন এবং তাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেন। যেমন : হযরত 'উমার, আবুদ দারদা', মু'আয ইবন জাবাল, আবূ যার আল-গিফারী, বিলাল, ছাওবান, হুযায়ফা ইবন আল-ইয়ামান, 'উবাদা ইবন আস-সামিত, 'আওফ ইবন মালিক, মুগীরা ইবন শু'বা, মু'আবিয়া ইবন আবী

---

১. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/৭৫; আত-তাবাকাত-৭/১৫৮

২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৫৬

৩. প্রাগুক্ত-১/৫৭

৪. তাহ্যীব আল-কামাল-৯/৩৮৪

সুফইয়ান, আবূ হুরায়রা, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) ও আরো অনেকে। ইমাম যাহাবী (রহ) হাদীছের শ্রেষ্ঠ হাফিজদের জীবনীর মধ্যে তাঁর জীবনী সন্নিবেশ করেছেন।[৫]

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনাও করেছেন তাঁদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এখানে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম উপস্থাপন করা হলো : ইমাম যুহ্‌রী, রাবী'আ ইবন ইয়াযীদ, বুস্‌র ইবন 'উবায়দিল্লাহ, 'আবদুল্লাহ ইবন রাবী'আ ইবন ইয়াযীদ, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, ওয়ালীদ ইবন 'আবদির রহমান, ইউনুস ইবন মায়সারা, আবূ 'আওন আল-আনসারী, ইউনুস ইবন সায়ফ, মাকহূল, শাহ্‌র ইবন হাওশাব, সালামা ইবন দীনার (রহ) ও আরো অনেকে।[৬]

তিনি ছিলেন শামের বিখ্যাত ফকীহ্। ইমাম যুহ্‌রী (রহ) বলেন :[৭]

كان أبو ادريس من فقهاء الشام.

– 'আবূ ইদরীস ছিলেন শামের ফকীহ্‌দের মধ্যে অন্যতম।' ইমাম আত-তাবারী (রহ) শামের ঐ সকল 'আলিমের সাথে আবূ ইদরীসের জীবনী আলোচনা করেছেন যাঁরা কিস্‌সা-কাহিনী ও হালাল-হারামের বিধান সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন।[৮]

কাজী ও উপদেশ দানের দায়িত্ব পালন

ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর যোগ্যতার বড় সনদ এই যে, খলীফা 'আবদুল মালিকের সময়ে তিনি দিমাশকের কাজীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৯] বিচার-ফায়সালার পাশাপাশি মানুষকে ওয়াজ-নসীহতের মহান দায়িত্বও পালন করতেন। পরে 'আবদুল মালিক ওয়াজ-নসীহতের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেন। তবে কাজীর পদে বহাল রাখেন। বিচার কাজের চেয়ে ওয়াজ-নসীহতের কাজটি তাঁর বেশি প্রিয় ছিল। এ কারণে তিনি বলতেন :[১০]

عزلوني عن رغبتي وتركوني في رهبتي.

"তারা আমার প্রিয় কাজটি থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং যে কাজ করতে আমি ভয় করি সেই কাজে আমাকে বহাল রেখেছে।"

তাঁর সমকালীন 'আলিমগণ তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শামের সবচেয়ে বড় 'আলিম মাকহূল (রহ) বলতেন :[১১]

---

৫. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫৭
৬. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৫/৮৫; তাহ্‌যীব আল-কামাল-৯/৩৮৩
৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫৭
৮. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৫/৮৭
৯. তাহ্‌যীব আল-কামাল-৯/৩৮৫
১০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৫৭
১১. প্রাগুক্ত

ما علمت أعلم من أبـى ادريـس. – 'আমি আবূ ইদরীসের চেয়ে বড় 'আলিম আর কেউ আছে বলে জানিনে।' আবূ যুর'আ দিমাশকী তাঁকে শামের 'আলিম জুবায়র ইবন নুফাইরের উপর প্রাধান্য দিতেন। তিনি বলতেন :

أحسن أهل الشام لقيا لأجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جبير بن نفـير وأبو ادريس وكثير بن مرة.

'রাসূলুল্লাহর (সা) শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের সাথে সাক্ষাতের দিক দিয়ে শামবাসীদের মধ্যে উত্তম হলেন জুবায়র ইবন নুফাইর, আবূ ইদরীস ও কাছীর ইবন মুররা।' একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, এই তিনজনের মধ্যে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য কে? বললেন : আবূ ইদরীস আল-খাওলানী।[১২]

ইমাম আন-নাসাঈ তাঁকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[১৩] ইয়াহইয়া মা'ঈন, আল-কাসিম ইবন সাল্লাম ও খলীফা ইবন খায়্যাত বলেছেন : হিজরী ৮০ সনে তিনি ইনতিকাল করেন।[১৪]

---

১২. তাহযীব আত-তাহযীব-৫/৮৫; তাহযীব আল-কামাল-৯/৩৮৫

১৩. তাযকিরাতুল হুফফাজ-১/৫৭

১৪. তাহযীব আল-কামাল-৯/৩৮৭

আবূ কিলাবা জারমী (রহ)

হযরত 'আবদুল্লাহর (রহ) ডাকনাম আবূ কিলাবা এবং এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বসরার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বংশধারা এ রকম : 'আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন 'উমার ইবন নাতিল ইবন মালিক ইবন 'উবায়দ ইবন 'আলকামা ইবন সা'দ আল-জারমী।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি বসরার বিশিষ্ট তাবি'ঈদের মধ্যে ছিলেন। ইবন হাজার ও ইমাম যাহাবী (রহ) উভয়ে তাঁকে শীর্ষস্থানীয় 'আলিমদের মধ্যে গণ্য করেছেন।[২] ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী তাঁকে ইমাম এবং 'ইল্‌ম ও 'আমলে নেতৃস্থানীয় 'আলিম বলেছেন।[৩] আল-মিয্‌যী তাঁকে শীর্ষস্থানীয় ইমামদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

হাদীছ

হাদীছ বিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও রুচি ছিল। এ কারণে সব সময় তার অন্বেষণে সময় অতিবাহিত করতেন। মাত্র একটি হাদীছের জন্য কয়েক দিন একই স্থানে অবস্থান করতেন। একবার একটি হাদীছের যাঁচাই বাছাইয়ের জন্য তিন দিন পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। শুধু এ ব্যস্ততা ছাড়া তখন সেখানে আর কোন কাজ ছিল না।[৫] তাঁর এমন প্রবল আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসু মনোভাব তাঁকে হাদীছের একজন বিশিষ্ট হাফিজে পরিণত করে। ইবন সা'দ তাঁকে একজন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও বহু হাদীছের ধারক-বাহক বলেছেন।[৬] তিনি তাঁকে বসরাবাসী মুহাদ্দিছদের দ্বিতীয় তবকা বা স্তরে স্থান দিয়েছেন।[৭]

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত ছাবিত ইবন দাহ্‌হাক আল-আনসারী, সামুরা ইবন জুনদুব, 'আমর ইবন সালামা জারমী, মালিক ইবন হুওয়ায়রিছ, আনাস ইবন মালিক আল-আনসারী, হুযায়ফা ইবন আল-ইয়ামান, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা, আনাস ইবন মালিক কা'বী, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, মু'আবিয়া, আবূ হুরায়রা, নু'মান ইবন বাশীর, আবূ ছা'লাবা খুশানী (রা) প্রমুখের সূত্রে বর্ণিত তাঁর হাদীছ

---

১. তাহ্‌যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১০/১৫৫
২. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৫/২২৪; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/৯৪
৩. শাজারাত আয-যাহাব-১/১২৬
৪. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১০/১৫৫
৫. আত-তাবাকাত-৭/১৩৪
৬. প্রাগুক্ত
৭. তাহ্‌যীব আল-কামাল-১০/১৫৭

পাওয়া যায়। বহু বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ তাবি'ঈর নিকট থেকেও তিনি হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন।[৮]

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে আইউব আস-সাখতিয়ানী, আবূ রাজা', ইয়াহইয়া ইবন আবী কাছীর, আশ'আছ ইবন 'আবদির রহমান জারমী (রহ) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৯]

হাদীছ বর্ণনায় সংযত

তাঁর মুখ থেকে হাদীছ শোনার জন্য অনেক বড় বড় 'আলিম আগ্রহ প্রকাশ করতেন। কিন্তু অত্যধিক সতর্কতার কারণে অতি অল্পই বর্ণনা করতেন। আবূ খালিদ বলেন, আমরা হাদীছ শোনার জন্য আবূ কিলাবার নিকট যেতাম। তিনি তিনটি হাদীছ শোনানোর পর বলতেন, যথেষ্ট হয়েছে, আর না। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) মত বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারীও তাঁকে অনুরোধ করে হাদীছ শুনতেন। 'উমার ইবন মায়মূন বলেন, একবার আবূ কিলাবা গেলেন 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) নিকট। তিনি কিছু হাদীছ শোনানোর জন্য অনুরোধ করলেন। জবাবে তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমি বেশি হাদীছ বলা এবং একেবারে চুপ থাকা, দু'টোকেই খারাপ মনে করি।[১০]

ফিক্‌হ শাস্ত্রেও তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। আইউব আস-সাখতিয়ানী বলেন, আল্লাহর কসম! আবূ কিলাবা ছিলেন প্রজ্ঞাবান ফকীহদের একজন।[১১]

বিচার ক্ষমতা

ফিক্‌হ বিষয়ে দক্ষতার কারণে তাঁর মধ্যে বিচার ক্ষমতাও ছিল। আইউব বলেন, আমি বসরায় আবূ কিলাবার চেয়ে বেশি বিচার ক্ষমতাসম্পন্ন আর কাউকে দেখিনি। মুসলিম ইবন ইয়াসার বলতেন, আবূ কিলাবা অনারবদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করলে 'কাজী আল-কুজাত' বা প্রধান বিচারপতি হতেন।[১২]

কাজীর পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি

বিচারের যোগ্যতা ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কাজীর পদ গ্রহণ করতে ভীষণ ভয় পেতেন। আইউব বলতেন, আমি তাঁকে বিচার বিষয়ে যত বড় 'আলিম পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি তার থেকে কঠোরভাবে পলায়ণকারীরূপে। তিনি এ কাজকে ভীষণ খারাপ মনে

---

৮. প্রাগুক্ত-১০/১৫৬; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-৫/২২৫

৯. প্রাগুক্ত

১০. আত-তাবাকাত-৭/১৩৪

১১. প্রাগুক্ত-৭/১৩৩; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১০/১৫৭

১২. প্রাগুক্ত

করতেন। কাজীর পদ গ্রহণের জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়। কিন্তু তিনি ভয়ে শামে পালিয়ে যান। দীর্ঘ দিন পর যখন ফিরে আসেন তখন আমি তাঁকে বললাম, যদি আপনি কাজীর পদ গ্রহণ করতেন এবং মানুষের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতেন তাহলে তাতে ছাওয়াব পেতেন। তিনি জবাব দেন, আইউব! মানলাম, এক ব্যক্তি সাঁতার কাটতে পারে; কিন্তু যদি সে সাগরে পড়ে যায় তাহলে কতটুকু সাঁতরাতে পারবে![১৩]

গ্রন্থাগার

সেই যুগে গ্রন্থাগারের প্রচলন খুব কম ছিল, বরং ছিল না বলা চলে। তবে আবূ কিলাবা জ্ঞানের প্রতি তীব্র আগ্রহের কারণে একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। অন্তিম রোগ শয্যায় সে সম্পর্কে অসীয়াত করে যান যে, সংগৃহীত গ্রন্থগুলো আইউব সাখতিয়ানীকে দিবে। তিনি জীবিত না থাকলে জ্বালিয়ে দিতে হবে।[১৪]

মালিক বলেন :[১৫]

مات ابن المسيب والقاسم ولم يترك كتبا، ومات أبو قلابة فبلغني أنه ترك حمل بغل كتبا.

'সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব ও আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ মৃত্যু বরণের সময় কোন গ্রন্থ রেখে যাননি। তবে আমি জেনেছি, আবূ কিলাবা মৃত্যু বরণের সময় এক খচ্চরের বোঝা পরিমাণ গ্রন্থ রেখে যান।'

বিদ'আত তথা দীনের মধ্যে নতুন কিছু প্রচলন করার প্রতি ঘৃণা

তিনি 'আকীদা ও 'আমল তথা বিশ্বাস ও কর্মে সালফে সালিহীন বা পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে আদর্শ মানতেন এবং এ ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে অসি উত্তোলন করাও বৈধ মনে করতেন। বলতেন, যে ব্যক্তি কোন নতুন কথা বা কাজ চালু করে সে অসি উত্তোলনকে বৈধ করে দেয়। এমন লোকদের সাথে মেলা-মেশা ও তর্ক-বিতর্ক করাও তাঁর পছন্দ ছিল না। তাই তিনি নিষেধ করতেন, কেউ যেন বিদ'আতীদের নিকট না বসে, তাদের সাথে বাহাছ-মুনাজিরা না করে। আমার ভয় হয়, না জানি তারা তোমাদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিয়ে যায় এবং যে জিনিসকে তোমরা পরিষ্কারভাবে জান তাতে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়। তিনি মনে করতেন এর প্রতিবিধান শুধুমাত্র তরবারি। আইউব বলেন, আবূ কিলাবা বলতেন, প্রবৃত্তির অনুসরণকারীরা অর্থাৎ বিদ'আতীরা পথভ্রষ্ট। আমার মতে তাদের ঠিকানা নিশ্চিত জাহান্নাম। আমি তাদেরকে ভালো করে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করেছি, তাদের মধ্যে যারা নতুন মত অথবা নতুন কথা প্রকাশ ও প্রচার করে তারা তরবারি ছাড়া তা থেকে বিরত

---

১৩. তাহ্যীব আল-কামাল-১০/১৫৮

১৪. আত-তাবাকাত-৭/১৩৫; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৪

১৫. তাহ্যীব আল-কামাল-১০/১৫৭

হয় না। নিফাক তথা কপটতার অনেক প্রকার আছে, এটাও তার মধ্যে একটি। অতঃপর নিম্নের এ আয়াতগুলো পাঠ করেন :

١. مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ. ٢. وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ. ٣. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ.

১. তাদের মধ্যে সেই সকল লোকও আছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছে।[১৬] ২. তাদের মধ্যে সেই সকল লোক আছে যারা নবীকে কষ্ট দেয়।[১৭] ৩. এবং তাদের মধ্যে সেই সকল লোক আছে যারা সাদাকা বণ্টনের ব্যাপারে আপনার প্রতি দোষারোপ করে।[১৮]

তারপর তিনি বলেন, যদিও তাদের কথা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, তবে সন্দেহ সৃষ্টি ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে সকলে ঐক্যবদ্ধ। এদের সকলে তরবারির উপযুক্ত এবং তাঁদের সকলের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।[১৯]

বিদ'আতীদেরকে তিনি নিজের কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। কেউ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে নিশ্চিত না হয়ে তাঁকে ভিতরে ঢোকার অনুমতি দিতেন না। গায়লান ইবন জারীর বলেন, একবার আমি তাঁর সাথে মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। এ জন্য তাঁর বাড়ীতে গিয়ে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, হারূরী (খারিজী) না হলে আসতে পার।[২০]

একটি মারাত্মক বিদ'আত

আজকাল ইসলাম চর্চার নামে একটা নতুন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তা হলো কিছু লোক হাদীছের বিপরীতে সব সময় কুরআন উপস্থাপনের দাবী করে। মূলতঃ এ এক মারাত্মক বিদ'আত। হযরত আবূ কিলাবার যুগেও এ জাতীয় কিছু লোকের উদ্ভব হয়। তিনি তাদেরকে পথভ্রষ্ট মনে করতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমরা কারো নিকট কোন সুন্নাহ বর্ণনা করবে এবং সে তার জবাবে যদি বলে এটা বাদ দিয়ে আল্লাহর কিতাব উপস্থাপন কর তাহলে তাকে পথভ্রষ্ট বলে জানবে।[২১]

নিজেকে চেনা

নিজের প্রকৃতি ও রহস্যকে যে চেনে সে মুক্ত এবং যে নিজেকে ভুলে যায় সে ধ্বংসের উপযুক্ত বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তিকে অন্যরা তার চেয়ে বেশি

---

১৬. সূরা আত-তাওবা-৭৯

১৭. প্রাগুক্ত-৬১

১৮. প্রাগুক্ত-৫৮

১৯. আত-তাবাকাত-৭/১৩৫

২০. প্রাগুক্ত-৭/১৩৪

২১. প্রাগুক্ত

জানে সে ধ্বংস এবং সে অন্যদের চেয়ে নিজেকে বেশি জানে সে মুক্তি লাভের উপযুক্ত।[২২]

প্রকৃত বিত্তবান ও প্রকৃত 'আলিম

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দান-অনুগ্রহের উপর যে তুষ্ট থাকে সেই প্রকৃত বিত্তবান, আর যে অন্যের জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয় সেই প্রকৃত 'আলিম বলে তিনি মনে করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করে, সবচেয়ে বেশি বিত্তবান কে? বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করে, সবচেয়ে বড় 'আলিম কে? বললেন, যে অন্যের জ্ঞান থেকে নিজের জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটায়।[২৩]

বিপদ-মুসীবতে ধৈর্যধারণ

ধৈর্যধারণ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ এবং সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ছিল অনেকে উঁচুতে। অনেক বড় বড় বিপদ-মুসীবতে তিনি মোটেও ধৈর্যহারা হননি। 'আবদুল মু'মিন খালিদ বলেন, শেষ জীবনে আবূ কিলাবার হাত, পা ও চোখ অকেজো হয়ে যায়। এমন মারাত্মক অবস্থায়ও আল্লাহর প্রশংসা ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশমূলক কথা ছাড়া অন্য কিছু তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হতো না।[২৪]

তাঁর ব্যক্তি সত্তাকে অন্যদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির উপায় ভাবা হতো। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) শামের অধিবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন : যতদিন তোমাদের মাঝে আবূ কিলাবা অথবা তাঁর মত মানুষ বিদ্যমান আছেন ততদিন তোমরা কল্যাণের মধ্যে থাকবে :[২৫]

لن تزالوا بخير يا أهل الشام، مادام فيكم هذا، أو مثل هذا.

ওফাত

তিনি যখন অন্তিম রোগ শয্যায় তখন একদিন হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) তাঁকে দেখতে আসেন এবং তাঁকে দৃঢ় ও অটল থাকার উপদেশ দেন। এ রোগেই তিনি হিজরী ১০৪, মতান্তরে ১০৫ সনে ইনতিকাল করেন। হিজরী ১০৬ অথবা ১০৭ সনের কথাও বর্ণিত হয়েছে।[২৬]

---

২২. প্রাগুক্ত-৭/১৩৩

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৪

২৫. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-৫/২২৫; তাহ্যীব আল-কামাল-১০/১৫৮

২৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৯৪; তাহ্যীব আল-কামাল-১০/১৫৯; আত-তাবাকাত-৭/১৩৫

ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব (রহ)

হযরত ইয়াযীদের (রহ) ডাকনাম আবূ রাজা'। কুরায়শ গোত্রের বানূ 'আমির ইবন লুওয়াই শাখার দাস ছিলেন।[১] ইবন লাহী'আ বলেন, তাঁর পিতা আবূ হাবীব আসওয়াদ ছিলেন "নাওবী' সম্প্রদায়ের লোক। ইয়াযীদ বলতেন।[২]

كان أبى من أهل دمقلة ونشأت بمصروهم علوية يعنى شيعة فقلبتهم عثمانية.

"আমার পিতা ছিলেন "দামকালা"র অধিবাসী এবং আমি মিসরে বেড়ে উঠি। দামকালাবাসীরা 'আলাবী তথা শী'আ। আমি তাদেরকে 'উছমানিয়্যা বা 'উছমানের (রা) অনুসারীতে পরিবর্তন করি।"

একটি ভিন্ন মতে তাঁর পিতা ছিলেন বানূ হিসল-এর এক মহিলার দাস এবং মাও ছিলেন দাসী।[৩] ইয়াযীদ হিজরী ৫৩ সনে জন্ম গ্রহণ করেন।[৪]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞান ও মনীষায় তিনি তাবি'ঈ ইমামদের মধ্যে ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে "আল-ইমাম আল-কাবীর" বা শ্রেষ্ঠ ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] মিসরে তাঁর মাধ্যমেই সঠিক ধর্মীয় জ্ঞান চর্চা শুরু হয়। আবূ সা'ঈদ ইবন ইউনুস বলেন :[৬]

كان مفتى أهل مصر فى أيامه وكان حليما عاقلا وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام فى الحلال والحرام ومسائل وقيل : إنهم كانوا قبل ذلك يتحدثون فى بالفتن والملاحم والترغيب فى الخير.

"তিনি ছিলেন মিসরবাসীদের মুফতী। অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম মিসরে জ্ঞান, বিভিন্ন মাসয়ালা ও হালাল-হারাম চর্চার সূচনা করেন। তাঁর পূর্বে মিসরবাসীদের জ্ঞান চর্চা মূলতঃ উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা বিষয়ে আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।"

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর রিজাল-২০/২৯৭
২. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৯
৩. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/২৯৫
৪. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/২৭৯
৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৯
৬. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আল-কামাল-২০/২৯৭

হাদীছ

তিনি মিসরের একজন বিশিষ্ট হাফিজে হাদীছ ছিলেন। ইবন সা'দ তাঁকে একজন নির্ভরযোগ্য ও বহু হাদীছের বর্ণনাকারী বলেছেন।[৭] ইমাম আয-যাহাবী (রহ) বলেন :[৮] كان حجة حافظا للحديث. – "তিনি ছিলেন হাদীছের হুজ্জাত (প্রমাণ) ও হাফিজ।"

তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিছ আয-যুবায়দী, আবুত তুফায়ল, আসলাম ইবন ইয়াযীদ, আবূ 'ইমরান, ইবরাহীম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন হুনায়ন, খায়র ইবন নু'আইম, হাদরামী, সুওয়াইদ ইবন কায়স, 'আবদুর রহমান ইবন শাম্মাসা মিহ্‌রী, 'আবদুল 'আযীয ইবন আবিস সা'বা, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ, 'আরাক ইবন মালিক, ইমাম আয-যুহ্‌রী (রহ) এবং আরো বহু মনীষীর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন এবং তাঁদের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন। আর তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছ শোনেন তাঁদের মধ্যে সুলায়মান আত-তায়মী, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, যায়দ ইবন আবী উনায়সা, 'আমর ইবন আল-হারিছ, 'আবদুল হামিদ ইবন জা'ফার, ইবন লাহী'আ, লায়ছ ইবন সা'দ (রহ) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৯]

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ বিষয়েও তিনি ভীষণ পারদর্শী ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) তাঁকে ফকীহ্‌ বলে উল্লেখ করেছেন। খলীফা হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ) মিসরে যে তিন ব্যক্তিকে ইফতার পদে নিয়োগ দেন, তাঁদের একজন হলেন এই ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব।[১০] বলা চলে তাঁরই চেষ্টায় সেখানে ফিক্‌হ চর্চার সূচনা হয়।

সমকালীন 'আলিমদের মূল্যায়ন

লায়ছ ইবন সা'দ বলতেন :[১১] يزيد عالمنا وسيدنا.

"ইয়াযীদ আমাদের 'আলিম ও আমাদের নেতা।" তিনি আরো বলতেন, ইয়াযীদ ইবন আবী হাবীব ও 'আবদুল্লাহ ইবন আবী জা'ফার উভয়ে দেশের দু'টি রত্ন। জনৈক ব্যক্তি 'আমর ইবন আল-হারিছকে প্রশ্ন করে : ইয়াযীদ ও 'আবদুল্লাহ-এ দু'জনের মধ্যে উত্তম কে? জবাবে তিনি বলেন : যদি দু'জনকে দু'পাল্লায় বসানো হয় তাহলে কোন পাল্লাই ঝুঁকবে না।[১২]

---

৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৩০

৮. তাহ্‌যীব আল-কামাল-২০/২৯৮

৯. প্রাগুক্ত-২০/২৯৫, ২৯৭; তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১১/৩১৮

১০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১২৯

১১. প্রাগুক্ত

১২. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১১/২৭৯; তাহ্‌যীব আল-কামাল-২০/২৯৮; টীকা-১

সাবধানতা

হাদীছ বর্ণনায় সতর্ক তাবি'ঈদের মত তিনিও সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যখন তাঁর নিকট প্রশ্নকারীদের সংখ্যা বেড়ে যায় তখন তিনি গৃহ অভ্যন্তরে নির্জনতা অবলম্বন করেন।[১৩]

জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা

তাঁর মধ্যে জ্ঞানের প্রতি প্রবল সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল। এ কারণে কোন শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তির নিকট যাওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না। কারো প্রয়োজন হলে তাঁকে নিজের কাছে ডেকে আনতেন। একবার যাব্বান ইবন 'আবদিল 'আযীয লোক মারফত তাঁকে বলে পাঠালেন যে, আপনি একটু আমার নিকট আসুন, আপনার নিকট কিছু বিষয় আমার জানার আছে। তিনি জবাবে বলে পাঠালেন, আপনিই আমার এখানে আসুন। আমার নিকট আসা আপনার জন্য শোভন হবে, পক্ষান্তরে আপনার নিকট আমার যাওয়া হবে আপনার জন্য অশোভন।[১৪]

স্পষ্টবাদিতা

সত্য উচ্চারণে ছিলেন নির্ভীক। যত ক্ষমতাশালীই হোন না কেন কাউকে পরোয়া করতেন না। মুখের উপর তাদের দোষ-ত্রুটি বলে দিতেন। একবার তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যা নিলেন। মিসরের তৎকালীন আমীর আল-হাওছারা ইবন সুহায়ল সাক্ষাৎ করতে আসলেন। তিনি ইয়াযীদের নিকট জানতে চাইলেন : যে কাপড়ে মশার রক্ত লেগেছে, সেই কাপড়ে নামায আদায় হবে কি? প্রশ্ন শুনে তিনি আল-হাওছারার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তাঁর সাথে কোন কথাই বললেন না। আল-হাওছারা উঠতে যাবেন তখন তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, প্রতিদিন মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছেন, আর আমার নিকট মশার রক্তের কথা জিজ্ঞেস করছেন?[১৫]

ওফাত

হিজরী ১২৮ সনে তিনি ইনতিকাল করেন, একথা ইবন সা'দ বলেছেন। ৭৫ বছরের অধিক জীবন লাভ করেন।[১৬]

---

১৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১২৯

১৪. প্রাগুক্ত

১৫. প্রাগুক্ত-১/১৩০

১৬. তাহ্যীব আল-কামাল-২০/২৯৭

আবূ ওয়াইল শাকীক ইবন সালামা (রহ)

হযরত শাকীকের (রহ) ডাকনাম আবূ ওয়াইল এবং এ নামেই তিনি বেশি প্রসিদ্ধ। পিতার নাম সালামা। তিনি আরবের আসাদ ইবন খুযায়মা গোত্রের সন্তান।[১] ইবন হিব্বান তাঁকে কূফায় বসবাসকারী, তথাকার একজন 'আবিদ এবং হিজরী ০১ সনে তাঁর জন্ম বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

রিসালাত যুগে

হযরত আবূ ওয়াইল (রহ) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকালের কিছু অংশ লাভ করেন। তবে খুবই অল্প বয়স্ক ছিলেন। 'উমার ইবন মারওয়ান বলেন, একবার আমি আবূ ওয়াইলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সময়কাল পেয়েছিলেন? বললেন, হাঁ, তাঁকে দেখেছিলাম। তবে তখন আমি একজন অল্প বয়স্ক বালক।[৩] সঠিক বর্ণনা মতে তিনি একজন তাবি'ঈ ছিলেন। রাসূলে কারীমের (সা) দর্শন ও সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি।[৪]

একটি বর্ণনায় এসেছে, আবূ ওয়াইল বলতেন, আমি জাহিলী যুগের দশ মতান্তরে সাত বছর পেয়েছি। রাসূল (সা) যখন নবুওয়াত লাভ করেন তখন আমি মরুদ্যানে আমার পরিবারের উট-ছাগল চরাতাম।[৫] ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে مُخَضْرَمٌ جَلِيْلٌ –অতি সম্মানিত মুখাদরাম ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।[৬] উল্লেখ্য যে, যাঁরা জাহিলী ও ইসলামী যুগ লাভ করেছেন তাঁদেরকে বলা হয় 'মুখাদরাম'। তবে এ বর্ণনা তেমন নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

ইসলাম গ্রহণ

একটি বর্ণনা মতে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেন। মুগীরা বলেন, আবূ ওয়াইল বলতেন, আমাদের গোত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে যাকাত-সাদাকা আদায়কারী আসেন।[৭] তিনি আমাদের থেকে পঞ্চাশটি উটের একটি উট নিলেন। আমার একটি ভেড়া ছিল। আমি সেটা তাঁর সামনে উপস্থিত করে বললাম, এর সাদাকা নিন। তিনি বললেন, এতে সাদাকা নেই।[৮]

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ–১/৬০
২. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব–৪/৩১৮
৩. আত-তাবাকাত–৬/৬৪
৪. তাহ্‌যীব আল-কামাল–৮/৩৮৭
৫. প্রাগুক্ত–৮/৩৮৮
৬. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ–১/৬০
৭. প্রাগুক্ত
৮. তাহ্‌যীব আল-কামাল–৮/৩৮৮

হযরত আবূ বাকরের খিলাফতকালে

হযরত আবূ বাকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে আরবের যে সকল গোত্র যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল আবূ ওয়াইলের গোত্রও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবূ ওয়াইলও সেই দলে ছিলেন। সুলায়মান আল-আ'মাশ বলেন, শাকীক আমাকে বলতেন, আহা, যদি এমন হতো! তোমরা বুযাখার রণক্ষেত্রে আমাদেরকে খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং সেখান থেকে পালাতে দেখতে! সেদিন আমি উটের পিঠ থেকে ছিটকে পড়ি এবং আমার ঘাড় ভাংতে ভাংতে বেঁচে যায়। সেদিন যদি আমি মারা যেতাম তাহলে আমার জন্য জাহান্নাম নিশ্চিত ছিল। সে সময় আমি ছিলাম দশ বছরের বালক।[৯] উল্লেখ্য যে, বুযাখার এ যুদ্ধটি হয় হযরত আবূ বাকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে বানূ আসাদ ও খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদের মধ্যে। এ যুদ্ধের পর তাঁর গোত্র যাকাত আদায় করে আত্মসমর্পণ করে।

হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে

খলীফা হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী ভুলের পূর্ণ কাফ্ফারা আদায় করেন। ইরাক অভিযানে তিনি একজন মুজাহিদ হিসেবে যোগ দেন। কাদেসিয়ার সেই বিখ্যাত যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। শাম অভিযানেও তাঁর অংশ গ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর নিজের একটি বর্ণনা এ রকম ঃ আমি উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) সাথে শাম অভিযানে অংশ গ্রহণ করি।[১০] সম্ভবতঃ এ দ্বারা তিনি হযরত 'উমারের (রা) শাম সফরের সময় তাঁর সঙ্গে থাকার কথা বলতে চেয়েছেন।

ইসলাম ও মুসলমানদের বড় রকমের সেবার কারণে হযরত 'উমার (রা) তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করতেন। তিনি বলেন, 'উমার (রা) নিজ হাতে আমাকে চারটি উপহার দান করেন এবং বলেন, একবার 'আল্লাহু আকবর' বলা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম।[১১]

সিফ্ফীন যুদ্ধ

এ ছিল মুসলমানদের একটি রক্তক্ষয়ী গৃহ-যুদ্ধ। হযরত 'আলীর (রা) খিলাফতকালে আমীরুল মুমিনীন 'আলী (রা) ও হযরত মু'আবিয়ার (রা) মধ্যে সিফ্ফীনে এ যুদ্ধটি হয়। এ যুদ্ধে আবূ ওয়াইল হযরত 'আলীর (রা) পক্ষে যোগ দেন; কিন্তু পরে এ জন্য ভীষণ অনুতপ্ত হন। আ'মাশ বলেন, জনৈক ব্যক্তি আবূ ওয়াইলকে জিজ্ঞেস করে, আপনি সিফ্ফীন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন? জবাব দেন, হাঁ, অংশ গ্রহণ করেছিলাম।[১২] 'আসিম ইবন বাহ্দালা বলেন, শাকীক বলতেন, 'আলীর চেয়ে 'উছমান আমার বেশি প্রিয়।[১৩]

---

৯. প্রাগুক্ত

১০. আত-তাবাকাত–৬/৬৫

১১. প্রাগুক্ত–৬/৬৪

১২. প্রাগুক্ত

১৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৬০; তাহ্যীব আল-কামাল–৮/৩৮৯

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ও আবূ ওয়াইল

উমাইয়্যা শাসনামলে আবূ ওয়াইল ছিলেন অতি সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী মানুষ। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ছিলেন তাঁর ভীষণ গুণমুগ্ধ ব্যক্তি। তিনি আবূ ওয়াইলের সামনে কয়েকটি বড় বড় পদ উপস্থাপন করে তা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেন, হাজ্জাজ যখন কূফা আসেন তখন আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার নাম কি? বললাম ঃ নাম আপনার জানাই আছে, নইলে আমাকে ডেকে পাঠালেন কিভাবে? জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ শহরে এসেছেন কবে? বললাম ঃ সেই সময় যখন এই শহরের সকল অধিবাসী এসেছে। জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার কতটুকু কুরআন মুখস্থ আছে? বললাম ঃ এতটুকু যে, যদি আমি তা অনুসরণ করি তাহলে তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। উপরোক্ত প্রশ্নগুলো করার পর বললেন, আপনাকে এ জন্য ডেকেছি যে, আমি আপনাকে একটি পদ দিতে চাই। জানতে চাইলাম ঃ কোন ধরনের পদ। বললেন ঃ সিলসিলা অর্থাৎ বেড়ী পরিয়ে শাস্তি দানের পদ। বললাম ঃ এ পদ তো সেই সকল লোকদের জন্য উপযুক্ত যারা অত্যন্ত দায়িত্ব ও দক্ষতার সাথে এ কাজ করতে পারবে। যদি আপনি আমার সাহায্য নিতে চান তাহলে সেটা হবে একজন নির্বোধ ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য নেয়া। এ কারণে, যদি আপনি আমাকে এ পদ গ্রহণ থেকে রেহাই দেন তাহলে তা আমার জন্য উত্তম হবে। আপনি চাপাচাপি করলে এই বিপজ্জনক পদটি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত আছি। তবে একথাও বলতে চাই যে, যখন আমি আপনার কর্মচারী নই তখন রাতের বেলা আপনার কথা স্মরণ করতে করতে ঘুম এসে যায়। তাহলে যখন আপনার কর্মচারী হবো তখন আমার অবস্থা কেমন হবে? মানুষ আপনার ভয়ে এত ভীত যে, অতীতের কোন আমীরের ভয়ে ততটা হয়নি। আমার এ বক্তব্য তাঁর পছন্দ হয় এবং তিনি বলেন, এর কারণ হলো, কোন ব্যক্তি রক্তপাতের ব্যাপারে আমার মত এত দুঃসাহসী নয়। আমি এতসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছি যার ধারে কাছে যেতেও মানুষ ভয় পায়। আমার এমন কঠোরতার কারণে আমার সকল সঙ্কট সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন! আপনি এখন যান। যদি অন্য কোন উপযুক্ত মানুষ পেয়ে যাই তাহলে আপনাকে কষ্ট দেব না। অন্যথায় আপনাকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে। এভাবে মুক্তি পাওয়ার পর আবূ ওয়াইল ফিরে আসেন এবং আর কখনো হাজ্জাজের ধারে কাছে যাননি।[১৪] উমাইয়্যা যুগের শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাঁর মোটেই সুধারণা ছিল না। একবার তিনি তাঁর ছাত্র আল-আ'মাশকে বলেন ঃ[১৫]

يا سليمان مافى أمرائنا هؤلاء واحدة من اثنتين، ما فيهم تقوى أهل الاسلام ولا عقول أهل الجاهلية.

---

১৪. আত-তাবাকাত–৬/৬৬

১৫. তাহযীব আল-কামাল–৮/৩৮৯

'সুলায়মান! আমাদের এ সময়ের আমীর-উমারাদের দু'টি বৈশিষ্ট্যের একটিও নেই। তাদের না আছে ইসলামী যুগের মানুষের তাকওয়া, আর না আছে জাহিলী যুগের মানুষের বুদ্ধিমত্তা।'

তাহসীলদারের পদ

কিছু বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি উমাইয়্যা যুগে সাদাকা-যাকাতের তাহসীলদার পদে কাজ করেছেন। মুহাজির আবুল হাসান বলেন, একবার আমি আবূ বুরদা ও শাকীকের নিকট যাকাতের অর্থ নিয়ে যাই। তাঁরা তখন বায়তুল মালে কাজ করতেন। তাঁরা আমার সে অর্থ বায়তুল মালে ঢুকিয়ে নেন। এই বর্ণনার একজন রাবী সা'ঈদ বলেন, আমি দ্বিতীয়বার যাকাতের অর্থ নিয়ে গেলে শুধু আবূ ওয়াইলকে পাই। তিনি বলেন, এ অর্থ ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং নির্ধারিত খাতসমূহে তা ব্যয় কর। বললাম مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ (অন্তরসমূহকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্টকরণ)-এর অংশটির কি হবে? বললেন ঃ সেটি অন্যদেরকে দিয়ে দাও।[১৬]

জ্ঞান ও মনীষা

জ্ঞানের জগতে হযরত আবূ ওয়াইল (রহ) কূফার একজন বিশিষ্ট 'আলিম ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে কূফার শায়খ ও 'আলিম বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭] ইমাম নাওবী (রহ) বলেন, তাঁর বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা এবং মহত্ত্বের ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য আছে।[১৮] ইবন সা'দ বলেছেন ঃ كان ثقة كثير الحديث 'তিনি ছিলেন অতিবিশ্বস্ত বহু হাদীছের ধারক ও বর্ণনাকারী।'[১৯]

কুরআন

তিনি কুরআনের হাফিজ ছিলেন। এত তীক্ষ্ণ মেধাবী ছিলেন যে, মাত্র দু'মাসে কুরআনের শিক্ষা শেষ করেন। তবে কুরআনের তাফসীর বর্ণনার ক্ষেত্রে দারুণ সতর্ক ছিলেন।[২০]

হাদীছ

ইল্‌মে হাদীছের ক্ষেত্রে ইবন সা'দ তাঁকে দৃঢ়পদ, বিশ্বস্ত ও বহু হাদীছের ধারক-বাহক বলেছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবূ বাকর, 'উমার, 'উছমান, 'আলী, মু'আয ইবন জাবাল, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, হুযায়ফা ইবন আল-ইয়ামান, খাব্বাব ইবন আরাত, কা'ব ইবন 'আজরা, আবূ মাস'উদ আল-আনসারী, আবূ মূসা আল–আশ'আরী, আবূ হুরায়রা, 'আয়িশা, উম্মু সালামা (রা) প্রমুখের মত শ্রেষ্ঠ

---

১৬. আত-তাবাকাত-৬/৬৫

১৭. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৬০

১৮. তাহ্‌যীব আল-আসমা'–১/২৪৭

১৯. তাহ্‌যীব আল-কামাল–৮/৩৮৯; আত-তাবাকাত–৬/৬৫

২০. প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৬০

ব্যক্তিবর্গের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২১] বিশেষতঃ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) হাদীছসমূহ তাঁর স্মৃতিতে বেশি সংরক্ষিত ছিল। কূফায় ইবন মাস'উদের হাদীছের তাঁর চেয়ে বড় কোন হাফিজ ছিলেন না।[২২] একবার আবূ 'উবায়দাকে জিজ্ঞেস করা হয়, কূফায় ইবন মাস'উদের হাদীছের সবচেয়ে বড় 'আলিম কে? তিনি জবাব দেন ঃ আবূ ওয়াইল।[২৩]

ছাত্রবৃন্দ

অনেক বড় বড় তাবি'ঈ তাঁর ছাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যেমন ঃ শা'বী, 'আসিম, আ'মাশ এবং সাধারণ মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মানসূর, যুবায়দ-আল ইয়ামামী, হাবীব ইবন আবী ছাবিত, 'আসিম ইবন বাহদালা, 'আবদুহু ইবন লুবাবা, 'আমর ইবন মুররা, জামি' ইবন রাশিদ, আল-হাকাম ইবন 'উতবা, হাম্মাদ ইবন আবী সুলায়মান, যুবায়র ইবন 'আদী, সা'ঈদ ইবন মাসরূক আছ-ছাওরী, 'আতা' ইবন আস-সায়িব, মুসলিম আল-বাতীন, মুহাজির আবুল হাসান (রহ) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২৪]

'আলিমদের মধ্যে আবূ ওয়াইলের স্থান

সেই যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ তাঁকে শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য করতেন। আ'মাশ বলেন, ইবরাহীম আমাকে উপদেশ দেন যে, তুমি শাকীকের (আবূ ওয়াইল) নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন কর। 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) সাথী ও ছাত্ররা সকলে তাঁকে তাঁদের দলের সেরা বলে গণ্য করতেন।[২৫]

আল্লাহর ভয়

তাঁর অন্তরে আল্লাহর ভয় এত প্রবল ছিল যে, যখন তাঁর সামনে কোন উপদেশ দেয়া হতো অথবা ভীতিমূলক আলোচনা হতো তখন তার দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতো।[২৬] তিনি বসরার 'আবিদ তাবিঈদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। 'ইবাদত-বন্দেগী ছিল তাঁর একান্ত কাজ। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি দৃঢ়পদ বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন। কূফায় স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলেন এবং সেখানকার তাপস ও দুনিয়া বিরাগী মানুষের একজন ছিলেন।[২৭] তাঁর 'ইবাদত-বন্দেগীর বিশেষ সময় ছিল রাতের অন্ধকার। সিজদায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে অত্যন্ত বিনীতভাবে দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমাকে মাফ করে দিন। যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করেন তাহলে

---

২১. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব–৪/৩৬১; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৬০; তাহ্যীব আল-কামাল–৮/৩৮৭

২২. তাহ্যীব আল-আসমা'–১/২৪৭

২৩. তাহ্যীব আল-কামাল–৮/৩৮৮

২৪. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব–৪/৩৬২

২৫. আত-তাবাকাত–৬/৬৭

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব–৪/৩৬৩

ধারাবাহিক পাপসমূহকেও ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি শাস্তি দেন, তাহলে শাস্তি দানের ক্ষেত্রে আপনি জালিম হবেন না।[২৮]

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহীনতা

দুনিয়ার সাথে নামকা ওয়াস্তে একটা সম্পর্ক ছিল। থাকার জন্য মামুলি ধরনের একটা খড়ের ঝুপড়ি ঘর ছিল, সেখানে তিনি জিহাদের সঙ্গী ঘোড়াটিসহ থাকতেন। যখন জিহাদে বের হতেন তখন ঝুপড়ি ঘরটি উঠিয়ে ফেলতেন। ফিরে এসে আবার বানিয়ে নিতেন।[২৯]

হালাল উপার্জন

হালাল উপার্জনের ব্যাপারে দারুণ সতর্ক ছিলেন। বিনাশ্রমে অঢেল সম্পদ প্রাপ্তির বিপরীতে হালাল উপায়ে অর্জিত একটি দিরহামকে বেশি পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, ব্যবসার এক দিরহাম আমার বেতনের দশ দিরহাম থেকে বেশি প্রিয়।[৩০]

তাঁর সত্তাটি ছিল শুভ ও কল্যাণের নিমিত্ত

তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কারণে মানুষ তাঁকে রহমত ও বরকতের (দয়া-অনুগ্রহ) উপলক্ষ্য মনে করতো। ইবরাহীম বলতেন, প্রত্যেক স্থানে এমন এক সত্তা অবশ্যই বিদ্যমান থাকেন যার কল্যাণে সেই জনপদ বিভিন্ন ধরনের আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। আমার বিশ্বাস, শাকীকও সেই সকল লোকের মধ্যে অন্যতম।[৩১] সাহাবায়ে কিরামও তাঁর নৈতিক উৎকর্ষের কথা স্বীকার করতেন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের উপর তাঁর নৈতিক প্রভাব এতখানি ছিল যে, তাঁকে দেখা মাত্র বলতেন, এ হলো তায়িব (তাওবাকারী)।[৩২]

ওফাত

হিজরী ৮২ সনে ইনতিকাল করেন। আল-ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীযের (রহ) খিলাফতকালে তাঁর ইনতিকাল হয়। কিন্তু এ বর্ণনা সঠিক মনে হয় না। কারণ, সে হিসাবে তাঁর বয়স অনেক বেড়ে যায়।[৩৩]

---

২৮. আত-তাবাকাত–৬/৬৭

২৯. প্রাগুক্ত–৬/৬৮

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব–১/২৪৭

৩২. আত-তাবাকাত–৬/৬৮

৩৩. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৬০; তাহ্যীব আল-কামাল–৮/৩৮৮

জা'ফর ইবন মুহাম্মাদ আস-সাদিক (রহ)

তাঁর পূর্ণ নাম আবূ আবদিল্লাহ জা'ফার, আস-সাদিক তাঁর উপাধি। ইতিহাসে তিনি ইমাম জা'ফার আস-সাদিক নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মাদ আল-বাকির (রহ), যিনি শী'য়াদের ইমামিয়া সম্প্রদায়ের ৫ম ইমাম। তাঁর বংশ তালিকা এমন ঃ জা'ফার ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন হুসায়ন ইবন 'আলী ইবন আবী তালিব (রা)। তাঁর মা ফারওয়া ছিলেন হযরত আবূ বাকর সিদ্দীকের (রা) প্রপৌত্র কাসিম ইবন মুহাম্মাদের কন্যা। তাঁর মাতৃকুলের বংশ তালিকা এমন ঃ ফারওয়া বিন্‌ত কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদির রহমান ইবন আবূ বাকর (রা)। এভাবে হযরত জা'ফার আস-সাদিক-এর শিরা-উপ-শিরায় সিদ্দীকী রক্ত বহমান হয়। হিজরী ৮০ (আশি) সনে তিনি মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন।[১]

জ্ঞান ও মনীষা

তিনি 'ইল্‌ম ও 'আমলের এমন এক খান্দানের বংশধর যাদের অতি নগণ্য একজন খাদিমও জ্ঞানের উচ্চ আসন অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁর মহান পিতা ইমাম মুহাম্মাদ আল-বাকির (রহ) এমন উঁচু পর্যায়ের আলিম ছিলেন যে, ইমাম আ'জাম আবূ হানীফার (রহ) মত উম্মাতের শ্রেষ্ঠ সন্তান তাঁর ছাত্র ছিলেন। এ কারণে জা'ফার আস-সাদিক উত্তরাধিকার সূত্রে জ্ঞান লাভ করেন। জ্ঞান ও মনীষার দিক দিয়ে তিনি তাঁর সময়ের একজন ইমাম ছিলেন। ইমাম যাহাবী তাঁকে ইমাম ও শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতা বলে উল্লেখ করেছেন।[২] আহলি বায়তের (নবী-বংশ) মধ্যে জ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। ইবন হিব্বান বলেন, ফিক্‌হ শাস্ত্র, অন্যান্য জ্ঞান এবং কৃতিত্ব ও মর্যাদায় তিনি আহলি বায়তের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।[৩] ইমাম নাওবী লিখেছেন, তাঁর ইমামতি, জালালত ও সিয়াদাত তথা অগ্রগামিতা, মহত্ত্ব ও নেতৃত্বের ব্যাপারে সকলে একমত।[৪]

হাদীছ

হাদীছ তো হলো তাঁরই এক ঊর্ধ্বতন মহান পুরুষেরই কথা, কাজ ও সমর্থন। সুতরাং তাঁর চেয়ে আর কে এর অধিক হকদার হতে পারে? সুতরাং তিনি বিখ্যাত হাফিজে হাদীছের একজন ছিলেন। ইবন সা'দ লিখেছেন;[৫] كان كثير الحديث – তিনি ছিলেন

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ–১/১৬৬

২. প্রাগুক্ত

৩. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব–২/১০৪

৪. তাহ্‌যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত–১/১৫০

৫. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব–২/১০৪

বহু হাদীছের ধারক-বাহক। হাফিজ যাহাবী তাঁকে অন্যতম নেতা ও শীর্ষস্থানীয় হাফিজ বলে উল্লেখ করেছেন।[৬] হাদীছের জ্ঞান তিনি লাভ করেন তাঁর মহান পিতা হযরত ইমাম বাকির, মুহাম্মাদ ইবন মুনকাদির, 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবী রাফি', যুহরী (রহ) ও আরো অনেকের নিকট থেকে। তাঁর খ্যাতিমান ছাত্র শিষ্যদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ শু'বা, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, ইবন জুরায়জ, আবূ 'আসিম, ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা, ইয়াহইয়া আল-কাত্তাল, হাতিম-ইবন ইসমা'ঈল (রহ)সহ আরো অনেক ইমাম। তিনি তাঁর ছাত্রদের বলতেন, তোমরা আমার নিকট জিজ্ঞেস কর। কারণ, আমার পরে তোমাদেরকে আর কেউ আমার মত হাদীছ শোনাতে পারবে না।[৭]

হাদীছের প্রতি সম্মান

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) হাদীছের প্রতি এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল যে, সর্বদা পাক-পবিত্র অবস্থায় হাদীছ বয়ান করতেন।[৮] ফিক্হ শাস্ত্রে এতখানি দক্ষতা অর্জন করেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও ইমামুল আয়িম্মা হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ) বলতেন, আমি জা'ফার ইবন মুহাম্মাদের চেয়ে বড় ফকীহ আর দেখিনি।[৯] তিনি 'আলিমগণকে অত্যধিক সমীহ ও সম্মান করতেন। বলতেন, 'আলিমগণ হচ্ছেন নবীগণের আমানতদার, যতক্ষণ তাঁরা শাসকবর্গের তোষামোদকারী না হয়।

তাঁর কিছু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাণী

তাঁর মূল্যবান কথা ও বাণীসমূহ নীতি-নৈতিকতার ভিত্তি; জ্ঞান, মনন, চিন্তা এবং উপদেশ-অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার স্বরূপ। সুফইয়ান আছ-ছাওরীকে (রহ) একবার তিনি বলেন ঃ সুফইয়ান! আল্লাহ যখন তোমাকে কোন কিছু দান করেন এবং যদি তুমি তা সর্বদা বহাল রাখতে চাও তাহলে বেশি বেশি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর কিতাবে বলেছেন ঃ[১০]

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ.

"যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই আরো বেশি করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" যখন আল্লাহর কোন অনুগ্রহ অথবা কল্যাণ লাভ করবে তখন বেশি করে আল্লাহর নিকট ইসতিগফার করবে। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন ঃ[১১]

---

৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/১৬৬
৭. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব–২/১০৩
৮. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব–২/১০৫
৯. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/১৬৬
১০. সূরা ইবরাহীম–৭
১১. সূরা নূহ–১০-১২

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّه كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهَارًا.

"অতঃপর আমি বলেছি, 'তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।"

যখন তোমাদের নিকট শাসক অথবা কারো কোন আদেশ পৌঁছে তখন বেশি করে لا حول ولا قوة الا بالله – পাঠ করবে। তিনিই প্রশস্ততার চাবিকাঠি। যে ব্যক্তি নিজের ভাগ্যের অংশটুকুর উপর তুষ্ট থাকে সেই ঐশ্বর্যবান। আর যে অন্যের অর্থ সম্পদের দিকে তাকিয়ে থাকে সেই বিত্তহীন। যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্টনে খুশী হয় না, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর ফয়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। যে ব্যক্তি অন্যের গোপন কথা ফাঁস করে দেয়, আল্লাহ তার ঘরের গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দেন। যে বিদ্রোহের জন্য তরবারি কোষমুক্ত করে সে তাতেই নিহত হয়। যে নিজের ভাইয়ের জন্য গর্ত খোঁড়ে সে তাতেই পতিত হয়। যে নির্বোধদের সঙ্গে উঠাবসা করে সে হেয় ও তুচ্ছ হয়ে যায়। যে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করে সে সম্মানিত হয়। যে খারাপ স্থানে যায় তার দুর্নাম হয়ে যায়। সর্বদা সত্যকথা বল, তা তোমার পক্ষে হোক বা বিপক্ষে। মানুষের মূল বস্তু হলো তাঁর বুদ্ধি, আর দীন হল তার আভিজাত্য। তার মহানুভবতা হল তার তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি)। আদমের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে সব মানুষ সমান। শান্তি ও নিরাপত্তা খুব দুর্লভ জিনিস, এমনকি তা তালাশ করার স্থানও গোপনীয়। যদি কোথাও পাওয়া যায় তাহলে সম্ভবতঃ তা নাম-নিশানাশূন্য বিজনতার এক কোণে পাওয়া যাবে। যদি তুমি সেখানে তালাশ কর এবং না পাও, তাহলে একাকীত্বের মধ্যে পাবে। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি একাকী নির্জনবাসের মধ্যে না পাও তা পাবে সালফে সালেহীন তথা পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠ মানুষদের কথার মধ্যে।

ইসতিগফার

তিনি বলতেন, তুমি কোন পাপ করে বসলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাগফিরাত কামনা করবে। মানুষের সৃষ্টির পূর্বেই তার ঘাড়ে ভুলের বেড়ী লেগে গেছে। পাপের উপর জেদ ধরা হলো ধ্বংস হওয়া। তিনি বলতেন, আল্লাহ দুনিয়ার প্রতি প্রত্যাদেশ (وحى) পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি আমার সেবা করবে তুমি তার সেবা কর, আর যে তোমার সেবা করবে, তুমি তাকে অক্ষম করে দেবে।

ভালো কাজের শর্তাবলী

তিনি বলতেন, তিনটি জিনিস ছাড়া কোন ভালো কাজ পূর্ণতা লাভ করে না। যখন তুমি কোন কাজ করবে তখন সে কাজকে নগণ্য মনে করবে, গোপনে করবে ও তাড়াতাড়ি

করবে। যখন তুমি তা নগণ্য মনে করবে তখন তার মর্যাদা বেড়ে যাবে। তুমি তা গোপন রাখলে তা পূর্ণতা পাবে। আর তা তাড়াতাড়ি করলে তুমি মাধুর্য অনুভব করবে।

সুধারণা

তিনি বলতেন, যখন তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে তোমার ব্যাপারে কোন অপ্রিয় কথা প্রকাশ পায় তখন তার যথার্থতার জন্য এক থেকে সত্তরটি ব্যাখ্যা তালাশ কর। যদি তাতেও যথার্থতা না পাও, তাহলে ধরে নেবে অবশ্যই কোন কারণ এবং কোন ব্যাখ্যা আছে যা তোমার জানা নেই। যদি তুমি কোন মুসলিমের মুখ থেকে কোন কথা শোন তাহলে তা থেকে ভালো থেকে আরো ভালো অর্থ বের করার চেষ্টা করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে নিজেকে তিরস্কার করবে।

শিষ্টাচার ও নৈতিকতা

তিনি বলতেন, চারটি জিনিসে কোন ভদ্রজনের লজ্জা করা উচিত নয়। ১. পিতার সম্মানে নিজ আসন থেকে উঠা, ২. অতিথির সেবা, ৩. নিজের গৃহে একশো চাকর-বাকর থাকলেও নিজে অতিথির বাহন পশুর দেখা-শুনা করা, ৪. নিজ শিক্ষকের সেবা করা।

একটি সূক্ষ্ম কথা

যখন দুনিয়া কারো অনুকূলে যায় তখন অন্যের ভালো কিছুও তাকে দিয়ে দেয়, আর যখন মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন তারই ভালো কিছু ছিনিয়ে নেয়।

নৈতিক উৎকর্ষতা

তাঁর ব্যক্তি সত্তাটি ছিল নৈতিক উৎকর্ষতার বাস্তব প্রতীক। তাঁকে এক নজর দেখাই তাঁর খান্দানী শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্যদানের জন্য যথেষ্ট ছিল। আমর ইবন আল-মিকদাম বলেন, যখন আমি জা'ফার ইবন মুহাম্মাদকে দেখতাম তখন তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়ামাত্র আমি জেনে যেতাম যে, তিনি নবী-খান্দানেরই মানুষ।[১২]

'ইবাদত-বন্দেগী

ইবাদত ছিল তাঁর রাত-দিনের বৃত্তি। তাঁর কোন দিন এবং কোন সময় 'ইবাদত থেকে শূন্য ছিল না। ইমাম মালিক বলেন, আমি একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করতাম। সব সময় আমি তাঁকে পেয়েছি হয় নামাযে না হয় রোযা রাখা অবস্থায় অথবা কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে।[১৩]

আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয়

আল্লাহর রাস্তায় অর্থব্যয়, দানশীলতা এবং অন্যের দোষ উপেক্ষা করা– এ তিনটি

---

১২. তাহ্যীব আল-আসমা'–১/১৫০

১৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব–২/১০৪

বিশেষগুণ আহলি বায়তের সকল সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তবে জা'ফার আস-সাদিক-এর সত্তা ছিল এই গুণগুলোর পরিপূর্ণ নমুনা। হায়্যাজ ইবন বুসতাম বলেন, জা'ফার আস-সাদিক (রহ) অনেক সময় বাড়ির সব খাবার অন্যদেরকে খাইয়ে দিতেন এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না।[১৪]

পোশাক-পরিচ্ছদ

প্রকাশ্যে তিনি দুনিয়াদার লোকদের পোশাকে থাকতেন। কিন্তু অভ্যন্তরে থাকতো দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিমুখ মানুষের পোশাক। সুফইয়ান ছাওরী (রহ) বলেন, আমি একবার জা'ফার ইবন মুহাম্মাদের নিকট গেলাম। তখন তাঁর গায়ে ছিল খুযের[১৫] জুব্বা এবং দাখানী খুযের চাদর। আমি বললাম, আপনার মহান পূর্ব-পুরুষের পোশাক তো এ ছিল না। বললেন, তাঁরা ছিলেন দরিদ্র ও অভাবের সময়ের মানুষ। আর এ যুগে সম্পদের প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। এ কথা বলে তিনি তাঁর দেহের উপরের কাপড় উঠিয়ে দেখান। তখন দেখা গেল খুযের জুব্বার নীচে রয়েছে পশমী মোটা জোব্বা। বললেন, ছাওরী, এটা আমরা পরেছি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আর ওটা তোমাদের জন্য। যা আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরেছি তা নীচে গোপন রেখেছি। আর তোমাদের জন্য যা পরেছি তা উপরে রেখেছি।[১৬]

দীনী বিষয়ে মতপার্থক্য করা থেকে দূরে থাকার উপদেশ

দীনী বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য ও বিবাদ করা মোটেই পছন্দ করতেন না। বলতেন, তোমরা দীনী বিষয়ে বিতণ্ডা করবে না। কারণ, তা অন্তরকে ব্যস্ত রাখে এবং তার মধ্যে নিফাক বা কপটতা সৃষ্টি করে।[১৭]

তিনি অত্যন্ত সাহসী, নির্ভিক ও নিঃশঙ্কচিত্তের মানুষ ছিলেন। স্বৈরাচারী শাসকদের সামনেও দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, কোন রকম ভয়-ভীতি তাঁর মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারেনি। একবার প্রতাপশালী 'আব্বাসীয় খলীফা মানসূরের গায়ে একটি মাছি এসে বসে। তিনি তাড়িয়ে দেন, কিন্তু আবার এসে বসে। এভাবে তিনি বার বার তাড়াচ্ছেন, আর মাছিটিও বার বার উড়ে এসে বসছে। এর মধ্যে জা'ফার ইবন মুহাম্মাদ (রহ) এসে হাজির হলেন। মানসূর তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আবূ 'আবদিল্লাহ! মাছি কি জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, স্বৈরাচারীদেরকে অপমান করার জন্য।[১৮]

---

১৪. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ–১/১৬৬

১৫. 'খুয' হলো পশম ও রেশম সূতোর তৈরি কাপড়

১৬. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ–১/১৬৭

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. সাফওয়াতুল সাফওয়া–১৩১

হযরত আবূ বাকর (রা) সম্পর্কে বিশ্বাস

যদিও সকল সত্যপন্থী আহলি বায়ত চার খলীফার প্রতি সমান সুধারণা পোষণ করতেন, তবে যেহেতু জা'ফার আস-সাদিকের (রহ) শিরা-উপশিরায় হযরত আবূ বাকরের (রা) রক্ত প্রবাহিত ছিল, এ কারণে তাঁর সাথে তিনি এক বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি নিজের ঊর্ধ্বতন পুরুষ 'আলীর (রা) মত তাঁর উপরও নিজের অধিকার আছে বলে মনে করতেন। তিনি বলতেন, আমার 'আলীর (রা) নিকট থেকে যে পরিমাণ শাফা'আতের আশা আছে, ঠিক ততটুকু আবূ বাকরের (রা) থেকেও আছে।[১৯] হিজরী ১৪৮ সনে তাঁর ওফাত হয়।[২০]

---

১৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-২/১০৪

২০. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৬৭

মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি' আল-আয্দী (রহ)

মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি' আল-আযদী (রহ) একজন মহান তাবি'ঈ। ডাকনাম আবূ বাক্র, মতান্তরে আবূ 'আবদিল্লাহ। তিনি ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মহান খাদিম ও সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক আল-আনসারীর (রা) ছাত্র। এ কারণে তিনি "যায়নুল ফুকাহা" (ফকীহ্দের শোভা) উপাধি লাভ করেন। তবে তিনি "আবিদুল বাসরা" বা বসরার তাপস উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[১]

বসরায় তাঁর জন্ম এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। মদীনায় জ্ঞান অর্জন করেন। বিশেষতঃ ফিক্হ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। জ্ঞানের জগতে সুউচ্চ আসনের অধিকারী হন। মালিক ইবন দীনার (রহ) তাঁর সম্পর্কে বলেন :

القرَّاء ثلاثة : فقارئى للرحمن، وقارئ للدينار، وقارئى للملكوك، ويــاهؤلاء، محمـد بن واسع الأزدى عندى من قراء الرحمن.

'কারী বা আল-কুরআনের পাঠক তিন প্রকার : দয়াময় (আল্লাহর) কারী, দীনার-দিরহামের কারী এবং রাজা-বাদশাদের কারী। ওহে তোমরা শুনে রাখ, আমার জানা মতে মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি' আল-আযদী হলেন দয়াময় আল্লাহর কারী।[২]

যুহ্দ ও তাকওয়া

তিনি একজন অতি সম্মানীত 'আলিম ও একজন উঁচু পর্যায়ের উপদেশ দানকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মজলিস সব সময় আল্লাহ্ ভীতি (তাকওয়া) ও সত্যের আলোচনায় মুখর থাকতো। এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ মজলিসে একদিন তিনি তাঁর এক ছাত্রকে বলেন :[৩] اذا اقبـل العبـد بقلبـه إلى الله أقبـل بقلـوب المؤمنـين اليـه 'বান্দা যখন সর্বান্তকরণে আল্লাহর দিকে এগিয়ে যায় তখন আল্লাহ্ মু'মিনদের অন্তকরণসহ তার দিকে এগিয়ে যান।'

একদিন বসরার মসজিদে ছাত্রদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি বসে আছেন, এমন সময় একজন ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললো : আবূ 'আবদিল্লাহ, আল্লাহ্ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। বললেন : আমি তোমাকে উপদেশ দিই, তুমি দুনিয়া ও আখিরাতের বাদশাহ্ হও।

বিস্ময়ের সাথে ছাত্র বললো : আল্লাহ্ আপনার প্রতি দয়া করুন। এটা আমার জন্য কেমন

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল—১৭/৩০১

২. আবূ নু'আইম, হিল্য়াতুল আওলিয়া—২/৩৪৫; তাহ্যীব আল-কামাল—১৭/৩০২

৩. 'আসরুত তাবি'ঈন—৩৫৪

করে সম্ভব? বললেন : দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব পরিহার কর, তাহলে মানুষের কর্তৃত্বে যা কিছু আছে তার প্রতি অভাববোধ না করে এখানে বাদশাহ হতে পারবে। আর আখিরাতেও আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম প্রতিদান লাভের মাধ্যমে বাদশাহ হতে পারবে।[৪]

ছাত্র বললো : আবূ আবদিল্লাহ! আমি আপনাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসবো। তিনি বললেন : যে উদ্দেশ্যে তুমি আমাকে ভালোবাসছো, আল্লাহ তোমার সে উদ্দেশ্য পূরণ করুন। তারপর বহু দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অস্ফুট স্বরে বললেন :

اللهم إنى أعوذبك أن أحبَّ فيك وأنت لى كاره.

'হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির জন্য মানুষ আমাকে ভালোবাসুক, আর তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক– এ থেকে আমি তোমার পানাহ্ চাই।'

একদিন এক ছাত্র ভরা মজলিসে উঠে দাঁড়ালো এবং তাঁর নীতি-নৈতিকতা ও আল্লাহ-ভীতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশংসামূলক বাক্য উচ্চারণ করলো। তিনি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে এমনটি আর কখনো না করার কথা সাফ জানিয়ে দিয়ে বললেন :

يا بنى، لو كان للذنوب رائحةٌ تفوح ما استطاع أحد منكم أن يدنو منى.

'ওরে বেটা, পাপের যদি ছড়িয়ে পড়ার মত কোন দুর্গন্ধ থাকতো, তাহলে তোমাদের কেউই আমার কাছে আসতে পারত না।' তিনি আরো বলেন : 'বেটা, আল-কুরআন হলো মু'মিনের উদ্যানস্বরূপ। এর যেখানেই সে অবতরণ করবে, তৃণভূমি পাবে।'[৫]

একবার তিনি তাঁর এক অতি স্থূলকায় ছাত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে নামাযে দাঁড়িয়ে; কিন্তু এমন শব্দ করছে যেন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাকে লক্ষ্য করে বললেন : বেটা, যার আহার কমে গেছে সে নিজে বুঝেছে ও অপরকে বুঝাতে পেরেছে। তার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ ও কোমল হয়েছে। আর বেশি আহার মানুষের অনেক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে কঠিন করে দেয়।[৬]

একদিন এক ব্যক্তি একটু দেরীতে মজলিস ভেঙ্গে যাবার পর এসে সালাম করে জিজ্ঞেস করলো : আবূ আবদিল্লাহ, কেমন আছেন? তিনি জবাব দিলেন : আমি আমার মৃত্যুর কাছাকাছি, আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বহু দূরে এবং কর্মের খুব খারাপ অবস্থায় আছি। সেই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা যে প্রতিদিন আখিরাতের দিকে একটি পর্যায় অতিক্রম করে?[৭]

তিনি ছিলেন তাঁর ছাত্র-শিষ্য, সঙ্গী-সাথী ও ভক্ত-অনুসারীদের জন্য একটি উত্তম আদর্শ। তাঁর জনৈক সঙ্গী তাঁর সম্পর্কে বলেন : একবার আমি মক্কা থেকে বসরা পর্যন্ত মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি'র সফর সঙ্গী ছিলাম। তিনি সারা রাত নামায পড়তেন। বাহনের পিঠে মাথা

---

৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'–৬/১২০

৫. 'আসরুত তাবি'ঈন–৩৫৪

৬. প্রাগুক্ত–৩৫৫

৭. হিলয়াতুল আওলিয়া–২/৩৪৬

ঝুঁকিয়ে ইশারায় বসে বসে রুকু-সিজদা করতেন। পিছনে বসা চালককে উচ্চস্বরে উট চালাতে বলতেন। মাঝে মাঝে নামাযের মধ্যে তাঁর রাত কেটে যেত। প্রত্যুষে একজন একজন করে সঙ্গীদের জাগাতেন। তাদের কাছে গিয়ে বলতেন : আস-সালাত, আস-সালাত : নামায! নামায! তারা সবাই জেগে গেলে বলতেন : নিকটেই পানি আছে, তোমরা ওযু করে নাও। যদি পানি বেশি দূরে হয় এবং সঙ্গে থাকা পানি যদি অল্প হয় তাহলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে নাও। সঙ্গের পানিটুকু পান করার জন্য রেখে দাও।[৮]

বসরার ওয়ালী বিলাল ইবন আবূ বুরদা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন, তিনি মোটা পশমী কাপড়ের জুব্বা পরে আছেন। বিলাল তাঁকে বললেন : আবূ 'আবদিল্লাহ! আপনি এমন মোটা খস্‌খসে কাপড় পরেন কেন? তিনি কোন উত্তর দিলেন না। বিলাল বললেন : আবূ 'আবদিল্লাহ! আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না কেন?

এবার তিনি বললেন : আমি এটাকে যুহ্‌দ তথা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি নির্লিপ্ততা বলতে চাই না। কারণ, তাতে নিজেকে পবিত্র মনে করা হবে। আবার অভাব ও দারিদ্র্যও বলতে চাই না। কারণ, তাতে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে। আমি এ দু'টোর কোনটাই বলতে চাই না।

বিলাল বললেন : আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি যা আমি পূরণ করতে পারি? মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি' বললেন : মানুষের নিকট চাইতে হবে আমার নিজের তো এমন কোন প্রয়োজন নেই। তবে একজন মুসলিম ব্যক্তির একটি প্রয়োজনের কথা আপনাকে বলছি। বিলাল বললেন : বলুন, ইনশাআল্লাহ আমি পূরণ করবো।

সব শেষে বিলাল বললেন : আবূ 'আবদিল্লাহ! তাকদীর বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

জবাবে তিনি বললেন : ওহে আমীর! আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কিয়ামাতের দিন তাঁর বান্দাদেরকে তাকদীর বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন না। তিনি জানতে চাইবেন তাদের অবস্থা ও আমল সম্পর্কে।

এমন জবাব শুনে ওয়ালী চুপ হয়ে যান এবং ভীষণ লজ্জিত হন। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে নীরবে মজলিস ত্যাগ করেন।[৯]

মালিক ইবন দীনার বলতেন : আমি মুহাম্মাদ ইবন সীরীনকে জান্নাতে দেখেছি এবং মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি'কেও জান্নাতে দেখেছি। আল-হারিছ ইবন ওয়াজীহ্ একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : হাসান আল-বাসরী কোথায়? বললেন : হাসান সিদরাতুল মুনতাহা'র নিকটে আছেন।[১০]

---

৮. 'আসরুত তাবি'ঈন–২/৩৪৬, ৩৫৫

৯. প্রাগুক্ত–৩৫৬

১০. তাহ্‌যীব আল-কামাল–১৭/৩০৩

মনীষা ও জ্ঞান

মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি' (রহ) মাত্র ১৫ (পনেরো)টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১১] তিনি একজন বিশ্বস্ত, সৎ ও তাপস ব্যক্তি ছিলেন। অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ দারুকুতনী বলেন :

إن محمد بن الواسع الأزدى رجل ثقة بلى برواة ضعفاء.

'মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি' একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি যিনি দুর্বল রাবীদের দ্বারা পরীক্ষিত বা বিভ্রান্ত হয়েছেন।[১২]

তাঁর সমকালীন আরেকজন মনীষী দামরা ইবন শাওযাব বলেন : মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি' প্রকাশ্য ইবাদতে খুব বেশি নিমগ্ন থাকতেন না। ফাতওয়ার দায়িত্বও অন্যরা পালন করতেন। কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হতো : বসরার সর্বোত্তম ব্যক্তিটি কে? বলা হতো : মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি' আল-আযদী। আমি তাঁর চেয়ে বেশি বিনয়ী লোক কখনো কাউকে দেখিনি।[১৩] বসরার অধিবাসী অপর এক ব্যক্তি বলেন : আমি যখন আমার অন্তরে কিছুটা কঠোরতার ভাব উপলব্ধি করতাম তখন মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি'র নিকট গিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকতাম। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ তাবি'ঈ মালিক ইবন দীনার ছিলেন মুহাম্মাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহচর। একদিন মুহাম্মাদ তাঁর বাড়িতে অবস্থানকালে বসরার আমীর মালিকের নিকট কিছু অর্থ পাঠালেন এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন। শায়খুল বসরা মুহাম্মাদ তাঁকে বললেন : আপনি তাঁদের অনুদান গ্রহণ করলেন? মালিক বললেন : দু'দিন অপেক্ষা করুন এবং আমার সহচরদের নিকট জিজ্ঞেস করুন। তাঁর কথা মত তিনি তাঁর বন্ধুদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন : মালিক ইবন দীনার সেই অর্থ দিয়ে কিছু দাস ক্রয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের মুক্ত করে দেন। এ কথা শোনার পর মুহাম্মাদ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। অত:পর তিনি যখন মালিকের সাথে মিলিত হলেন তখন মালিক বললেন : আবূ 'আবদিল্লাহ, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জানতে চাচ্ছি, আপনি কি আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন? মুহাম্মাদ বললেন : আল্লাহর কসম! না। মালিক বললেন : আমি ভুল করে চলেছি। মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি'র মত লোকেরাই আল্লাহর ইবাদত করে থাকে। মালিক তাঁর দিকে তাকিয়ে আরো বলেন : আমি অবশ্য এমন মানুষকে ঈর্ষা করি যার মধ্যে দীনদারী আছে এবং দুনিয়ার কোন কিছু নেই; অথচ তিনি সন্তুষ্ট।[১৪]

তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ। একবার জনৈক ব্যক্তির সাথে তার একটু ঝগড়া হয়। লোকটি ছেলের বিরুদ্ধে পিতার নিকট নালিশ করে। তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ছেলেকে লক্ষ্য করে

---

১১. প্রাগুক্ত–১৭/৩০২; 'আসরুত তাবি'ঈন–৩৫৬

১২. তাহ্যীব আল-কামাল–১৭/৩০২

১৩. প্রাগুক্ত; 'আসরুত তাবি'ঈন–৩৫৬

১৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'–৬/১২০

বলেন : তুমি মানুষের সাথে বাড়াবাড়ি কর, অথচ আমি তোমার পিতা? আল্লাহ যেন মুসলিম সমাজে তোমার মত মানুষের সংখ্যা না বাড়ান।[১৫]

তিনি সত্য উচ্চারণে তিরস্কার ও অপমান-লাঞ্ছনাকে মোটেও পরোয়া করতেন না। বসরার শাসনকর্তা মালিক ইবন আল-মুনযির মুহাম্মাদকে বসরার কাজী নিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি এই নিয়োগ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন এই বলে : এই বিচারের সাথে আমার সম্পর্ক কি? মালিক দূত পাঠালেন এই নিয়োগ গ্রহণে তাঁকে রাজী করানোর জন্য। তিনিও একই কথা বলে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। মালিক যে ব্যক্তিকে পাঠালেন সে তাঁকে বললো : হয় আপনি কাজীর আসনে বসবেন নয়তো আমি আপনাকে তিন শো চাবুক মারবো। জবাবে তিনি দূতকে বললেন : তুমি মালিককে বল, যদি তিনি এমনটি করেন তাহলে তিনি হবেন একজন অত্যাচারী শাসক। আর দুনিয়ার লাঞ্ছনা আখিরাতের লাঞ্ছনার চেয়ে ভালো।[১৬]

সে যুগে বসরার নিয়ম ছিল, মানুষ কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঘিরে বসতো এবং তিনি তাদেরকে দীন, ফিক্হ ও মাগাযী তথা রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা শোনাতেন। একবার এমন একটি মজলিসে তিনিও বসা ছিলেন। তিনি উপদেশ দানকারী বক্তাকে বলতে শুনলেন : আমার উপদেশ শুনে কারো অন্তর নরম হচ্ছে না, চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে না এবং গায়ের চামড়া ভয়ে কাঁপছে না– আমি এমন দেখছি কেন?

তিনি সাথে সাথে বলে উঠলেন : ওহে, আমার মনে হয় আপনার জন্যই মানুষের এমন অবস্থা হয়েছে। কারণ, উপদেশাবলী যখন অন্তর থেকে বের হয় তখন তা অন্তরের উপরেই পড়ে।[১৭]

এরকম ঘটনা অন্য একজন আমীরের সাথে তাঁর ঘটে। সেই আমীরের নাম বিলাল ইবন আবী বুরদা। তিনি একবার মুহাম্মাদকে তাঁর গৃহে খাবারের দাওয়াত দিলেন। মুহাম্মাদ সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলেন। আমীর ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। মুহাম্মাদকে লক্ষ্য করে বললেন : আমি সব সময় দেখি, আপনি আমাদের খাবার ঘৃণা করছেন। মুহাম্মাদ বললেন : মহামান্য আমীর! আপনি এমন কথা বলবেন না। আল্লাহর কসম! আপনাদের মধ্যে যারা ভালো মানুষ তারা আমার সন্তানদের চাইতেও আমার বেশি প্রিয়।[১৮]

তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা

পারস্যে তখন মুসলিম বাহিনীর সাথে যে যুদ্ধ চলছিল মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি' তাতে অংশ গ্রহণের জন্য সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। বিশেষত: জুরজান ও তাবারিস্তানের যুদ্ধে। এ বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন ইয়াযীদ ইবন আল-মুহাল্লাব ইবন আবী সুফরা। তিনি তখন খুরাসানের ওয়ালী।

---

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. প্রাগুক্ত–৬/১২২; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব–৯/৪৪২

১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'–৬/১২২

১৮. প্রাগুক্ত; সুওয়ারুন মিনহায়াত আত-তাবি'ঈন–২৪৯

মুসলিম বাহিনী দাহিস্তান নামক একটি অঞ্চলে প্রবেশ করলো। যেখানে তুর্কী সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করতো। তারা ছিল দারুণ শক্তিশালী, দু:সাহসী এবং দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহের অধিকারী। তাদের এ অবস্থা দেখে মুসলিম বাহিনী অনেকটা ভীত হয়ে পড়লো। তারা মনে করলো তাদেরকে পরাভূত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

মুসলিম বাহিনীর এমন সংকটজনক পরিস্থিতিতে মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি' এমনি দু:সাহসিক ভূমিকা পালন করেন যা মুসলিম মুজাহিদদের ভগ্ন মনোবলকে আবারো চাঙ্গা ও সতেজ করে তোলে। তিনি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে আহ্বান জানান : ওহে আল্লাহর অশ্বারোহীগণ! তোমরা নিজ নিজ অশ্বের পিঠে আরোহণ কর!

এ আহ্বানের সাথে সাথে মুসলিম মুজাহিদগণ সমুদ্রের তরঙ্গের গতিতে এমনভাবে ধাবিত হতে থাকে যে, তাদের সামনে দাঁড়াতে কেউ দু:সাহস করেনি। তাদের হুঙ্কার ও আস্ফালন দেখে প্রতিপক্ষ বাহিনী ভীত-কম্পিত হয়ে পড়ে।

বসরার 'আবিদ-মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি' কেবল সৈনিকদের মনোবল চাঙ্গা করেই ক্ষান্ত হলেন না, বরং তরবারি কোষমুক্ত করে সজোরে এদিক ওদিক চালাতে থাকেন। এর মধ্যে শত্রুবাহিনীর মধ্য থেকে বিশাল দেহের অধিকারী শক্তিমান ও ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন একজন যোদ্ধা বেরিয়ে আসে এবং মুসলিম বুহ্যের মধ্যে ঢুকে যত্রতত্র আঘাত হানতে থাকে। তার প্রচণ্ড আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর যোদ্ধারা পিছু হটতে থাকে। তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। সে ঔদ্ধত্যের সাথে মুসলিম যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানায় : কে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে? কে আমার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হবে?

মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে বসরার এই 'আবিদ চিৎকার করে বলে উঠলেন : আমিই এই বলদর্পী, অহংকারীর আহ্বানে সাড়া দিতে ইচ্ছুক?

মুসলিম বাহিনীর মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল, তারা সমস্বরে বলে উঠলো, না তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ, তাঁকে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় পাঠানো যাবে না। সবার অনুরোধে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। তবে এক তরুণ মুসলিম সৈনিকের তরবারির খাপ স্পর্শ করে তার সাফল্যের জন্য দু'আ করলেন। এই মহান তাবি'ঈর দু'আর বরকতে সৈনিকটি দু:সাহসী হয়ে ওঠেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সামনে এগিয়ে যান। তিনি তাঁর প্রতিপক্ষের মাথায় তরবারির এমন আঘাত হানেন যে, তা দু'খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। শত্রু-সৈনিকও তাঁর মাথা তাক করে আঘাত হানে, কিন্তু তাঁর লোহার বর্ম তা ঠেকিয়ে দেয়। বর্মটি দু'খণ্ড হয়ে গেলেও মাথা স্পর্শ করেনি। তিনি যখন ফিরে আসলেন তখন তাঁর তরবারি থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছিল।

এ দৃশ্য দেখে মুসলিম বাহিনী তাকবীর ধ্বনি দিয়ে দিক-দিগন্ত মুখরিত করে তোলে। তাঁরা এই মহান 'আবিদ-তাবি'ঈকে শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে দেখতে থাকে এবং তাঁর হাতে চুমু খাওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অতঃপর মুসলিম বাহিনী একযোগে আক্রমণ চালিয়ে শত্রুবাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। তারা সন্ধি করে এবং জিযিয়া দানে সম্মত হয়। মুসলিম বাহিনী এ যুদ্ধে অগণিত ধন-সম্পদ গণিমত হিসেবে লাভ করে। তার মধ্যে ছিল

লক্ষ লক্ষ দিরহাম, অসংখ্য রূপোর পানপাত্র এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণের বহু মুকুট। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন ইয়াযীদ ইবন আল মুহাল্লাব। তিনি সবচেয়ে বড় মুকুটটি হাতে নিয়ে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বললেন : আমার ধারণা, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, এটা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। সবাই বললো : হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। ইয়াযীদ বললেন : আজ আমি তোমাদেরকে দেখাবো, মুহাম্মাদ (সা)-এর উম্মাতের মধ্যে এখনো এমন ব্যক্তিও আছেন যিনি এটা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন। তারপর তিনি মুহাম্মাদ ইবন আল-ওয়াসি'কে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। বহু খোঁজাখুজির পর তাঁকে হাজির করা হলো। ইয়াযীদ সোনার মুকুটটি হাতে নিয়ে বললেন : ওহে আবূ 'আবদিল্লাহ, মুসলিম সৈনিকরা এই মুকুটটির দাবী ত্যাগ করেছে। এটি আমি আপনাকে দিলাম। মুহাম্মাদ সাথে সাথে বলে উঠলেন : মাননীয় আমীর! আমার এর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। ইয়াযীদ আল্লাহর কসম দিয়ে মুকুটটি গ্রহণের জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করলেন। অবশেষে তিনি হাত বাড়িয়ে মুকুটটি নিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন। সৈনিকরা একটু বিদ্রূপের সুরে বললেন, এই কি ঈছার তথা আত্মত্যাগের নমুনা? তিনি তো মুকুটটি নিয়ে চলে গেলেন।

অধিনায়ক ইয়াযীদ একজন তরুণকে নির্দেশ দিলেন গোপনে তাঁকে অনুসরণ করে মুকুটটি তিনি কি করেন তা দেখার জন্য। ছেলেটি তাঁকে অনুসরণ করে পিছে পিছে গেল। বসরার এই 'আবিদ কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় পথ চলছেন। ভাবছেন, এই মুকুটটি তিনি কী করবেন? এমন সময় দেখা পেলেন ছেঁড়া-ময়লা পোশাক পরা উসকো-কুসকো চুল ও ধূলি-মলিন চেহারার একজন লোকের। লোকটি তাঁকে বললো : আল্লাহর মাল থেকে আমাকে কিছু দান করুন! তিনি তাঁকে সোনার মুকুটটি দান করলেন। তারপর এমন উৎফুল্ল অবস্থায় দ্রুত চলতে লাগলেন, যেন কোন মারাত্মক বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছেন। অনুসরণকারী সৈনিকটি ধূলি-মলিন লোকটিকে মুকুটসহ ধরে সেনা-কমাণ্ডার ইয়াযীদ ইবন মুহাল্লাবের নিকট নিয়ে গেল। তিনি তাঁর বাহিনীর সদস্যদের সমবেত করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন : আমি কি তোমাদের বলেছিলাম না যে, এই উম্মাতের মধ্যে এখনো এমন একজন মানুষ আছেন যিনি এই সোনার মুকুট তুচ্ছ মনে করেন? মুকুটের প্রতি তাঁর কোন লোভ নেই?

যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয় হলো। বসরার এই 'আবিদ তাঁর উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব শেষ করে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সেনা-কমাণ্ডারের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন : আপনি আপনার খুশীমত যা ইচ্ছা করতে পারেন। বায়তুল্লাহ পর্যন্ত ভ্রমণের জন্য আমি আপনাকে কিছু নগদ অর্থ দিচ্ছি। বসরার 'আবিদ বললেন : সমপরিমাণ অর্থ কি বাহিনীর সকল সৈনিককে দিচ্ছেন? কমাণ্ডার ইয়াযীদ বললেন : না, সকলকে দিচ্ছি না। বসরার 'আবিদ বললেন : যে অর্থ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হচ্ছে এমন অর্থের আমার প্রয়োজন নেই। তারপর তিনি 'আস-সালামু 'আলাইকা, ইয়া-আমীরুল জায়শ' (সালাম, ওহে সেনা অধিনায়ক) বলে যাত্রা শুরু করেন।

ইয়াযীদের চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো। তিনি মুখে হাসি ফুঁটিয়ে জোরে বলে উঠলেন : ওয়া 'আলাইকাস সালাম! ওহে 'আবদুল্লাহ, কা'বার চত্বরে বসে আমাদের জন্য দু'আ করবেন।[১৯]

দুনিয়ার সকল সুখ-সম্পদের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ নির্মোহ স্বভাবের ছিলেন। ভোগ-বিলাসিতা তাঁকে মোটেও আকর্ষণ করতে পারেনি। তাই আল্লাহর পথে জিহাদের দায়িত্ব পালন শেষে আল্লাহর আরেকটি ইবাদত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর দিকে যাত্রার সিদ্ধান্ত নেন। সম্ভবত এটা তাঁর ৪র্থ অথবা ৫ম বারের হজ্জ ছিল।

ওফাত

হিজরী ১২৩ সনে তিনি অন্তিম রোগ শয্যায় আশ্রয় নেন।[২০] ভক্ত-অনুরাগীদের উপর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভর করে। দর্শনার্থীদের ভীড়ে বাড়ি লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়।[২১] তিনি তাঁর জীবনের সর্বশেষ যে দু'আটি করেন তা নিম্নরূপ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَقَامِ سُوْءٍ قُمْتُهُ، وَمِنْ كُلِّ مَقْعَدِ سُوْءٍ قَعَدْتُهُ، وَمِنْ كُلِّ مَدْخَلِ سُوْءٍ دَخَلْتُهُ، وَمِنْ كُلِّ مَخْرَجِ سُوْءٍ خَرَجْتُهُ، وَمِنْ كُلِّ عَمَلِ سُوْءٍ عَمِلْتُهُ، وَمِنْ كُلِّ قَوْلِ سُوْءٍ قُلْتُهُ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ فَاغْفِرْهُ لِيْ، وَاَتُوْبُ لَكَ مِنْهُ فَتُبْ عَلَيَّ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট মাগফিরাত কামনা করছি, এমন প্রতিটি খারাপ দাঁড়ানোর জায়গা থেকে যেখানে আমি দাঁড়িয়েছি, এমন প্রতিটি খারাপ বসার স্থান থেকে যেখানে আমি বসেছি, এমন প্রতিটি খারাপ প্রবেশ পথ থেকে যে পথে আমি প্রবেশ করেছি, এমন প্রতিটি বের হওয়ার খারাপ পথ থেকে যে পথে আমি বের হয়েছি, এমন প্রতিটি খারাপ কাজ থেকে যা আমি করেছি এবং এমন প্রতিটি খারাপ কথা থেকে যা আমি বলেছি। হে আল্লাহ! আমি এর সবকিছু থেকে তোমার মাগফিরাত কামনা করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি সবকিছু থেকে তাওবা করছি, তুমি আমার তাওবা কবুল কর!"

তারপর তিনি পাশে বসা তাঁর এক বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন :[২২]

أخبرني بالله عليك ما يغني هؤلآء عني إذا أخذبنا صيتي وقدمي غدا وألقيت في النار؟

---

১৯. 'আসরুত তাবি'ঈন–৩৬০–৩৬১; সুওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন–২৩১–২৩৮

২০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'–৬/১২৩

২১. 'আসরুত তাবি'ঈন–৩৬১

২২. প্রাগুক্ত–৩৬১

"আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, তুমি আমাকে বল আগামী কাল যখন আমাকে আমার মাথার সামনের দিকের চুল ও পায়ের গোঁড়ালী ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন উপস্থিত এসকল লোক কি আমার কোন কাজে আসবে?"

তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি অনুচ্চ কণ্ঠে পাঠ করতে করতে অনন্তের পথে যাত্রা করেন :[২৩]

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْأَقْدَامِ.

"অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ হতে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে মাথার ঝুঁটি ও পা ধরে।"

জা'ফার ইবন সুলায়মান বলেন, এই হিজরী ১২৩ সনে ছাবিত, মালিক ইবন দীনার ও মুহাম্মাদ ইবন ওয়াসি' মৃত্যুবরণ করেন।[২৪]

তিনি যে সকল মনীষীর নিকট থেকে হাদীছ শোনেন এবং যাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেন তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী আনাস ইবন মালিক (রা) অন্যতম। তাছাড়া খ্যাতিমান তাবি'ঈদের মধ্যে হাসান আল-বাসরী, যাকওয়ান আবী সালিহ আস-সাম্মান, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার, সা'ঈদ ইবন জুবায়র, সুলায়মান আল-আ'মাশ,তাউস ইবন কায়সান, 'আবদুল্লাহ ইবন আস-সামিত, 'আতা' ইবন আবী রাবাহ, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, মুহাম্মাদ ইবন আল মুনকাদির, মুতাররিফ ইবন 'আবদিল্লাহ আশ-শিখখীর, মু'আবিয়া ইবন কুররা আল-মুযানী, আবূ বুরদা ইবন আবী মূসা আল-আশ'আরী, আবূ সালিহ আল হানাফী, আবূ নাদরা আল-'আবদী (রহ) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঁর সুযোগ্য ছাত্রদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এখানে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো : আযহার ইবন সি'নান আল-কুরাশী, ইসমা'ঈল ইবন মুসলিম আল-'আবদী, হাসান ইবন দীনার, হাম্মাদ ইবন যায়দ, 'উছমান ইবন 'আমর (রহ) ও আরো অনেকে।[২৫]

---

২৩. 'আসরুত তাবি'ঈন–৩৬২

২৪. তাহ্যীব আল-কামাল–১৭/৩০৩

২৫. প্রাগুক্ত–১৭/৩০১-৩০২

হিশাম ইবন 'উরওয়া (রহ)

হযরত আবূ 'আবদিল্লাহ হিশাম ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যুবায়র ইবন আল-'আওয়ামের (রা) পৌত্র। তাঁর পিতা হযরত 'উরওয়া (রহ) একজন অতি উঁচু স্তরের তাবি'ঈ এবং মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহর অন্যতম। তাঁর ডাকনাম ছিল আবূ 'আবদিল্লাহ, মতান্তরে আবূ আল-মুনযির।

'আবদুল্লাহ ইবন দাউদ আল-খুরায়বী বলেন : তালহা ইবন ইয়াহইয়া, আল-আ'মাশ, হিশাম ইবন 'উরওয়া ও 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয– তাঁরা সকলে হুসাইন ইবন 'আলীর (রা) শাহাদাতের বছরে জন্মগ্রহণ করেন। আবূ হাফ্স বলেন : হুসাইন (রা) শহীদ হন হিজরী ৬১ সনে।[১]

হযরত হিশাম (রহ) শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারকে (রা) দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন, একবার আমার ভাই মুহাম্মাদ ও আমাকে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) নিকট পাঠানো হয়। তিনি আমাদেরকে কোলে বসিয়ে চুমু দিয়েছিলেন।[২] সম্ভবতঃ এই সাক্ষাতে অথবা অন্য কোন সাক্ষাতে ইবন 'উমার (রা) তাঁর মাথার উপর হাত বুলিয়ে দু'আ করেছিলেন।[৩] তাছাড়া তিনি আনাস ইবন মালিক, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ ও সাহ্ল ইবন সা'দের (রা) দর্শনও লাভ করেন[৪]

জ্ঞান ও মনীষা

হিশাম (রহ) যেমন একজন অতি উঁচু স্তরের তাবি'ঈর পুত্র, তেমনি একজন অতি উঁচু স্তরের মহান সাহাবীর পৌত্রও ছিলেন। এজন্য বলা চলে উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর মধ্যে 'ইল্ম ও 'আমল তথা জ্ঞান ও কর্মের সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁকে তাঁর সময়ের 'আলিম তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য করা হতো। ইমাম নাওবী (রহ) লিখেছেন, তাঁর বিশ্বস্ততা, মহত্ত্ব ও ইমামত বা ইমাম হওয়ার ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য আছে।[৫]

হাদীছ

হাদীছের একজন বিশিষ্ট হাফিজ ছিলেন। ইবন সা'দ তাঁকে ثقة ثبت كثير الحديث. – বলেছেন। অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ় ও বহু হাদীছের ধারক-বাহক। তিনি হুজ্জাত (প্রমাণ)ও ছিলেন।[৬]

---

১. তাহ্যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল-১৯/২৬৬, ২৭০
২. খাতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ-১৪/৩৮
৩. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১১/৪৮
৪. তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/২৬৬
৫. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৩৮
৬. আত-তাবাকাত-৭/৬৭

ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ইমাম, হাফিজ ও হুজ্জাত বলেছেন। শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদগণ তাঁর ব্যাপক জ্ঞানের কথা স্বীকার করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী তাঁকে হাদীছের ইমাম বলতেন এবং উহায়ব, হাসান আল-বসরী ও ইবন সীরীনের (রহ) সমমর্যাদা দান করতেন। 'উছমান আদ-দারিমী একবার ইবন মা'ঈনকে জিজ্ঞেস করেন : হিশাম আপনার বেশি প্রিয় না যুহ্‌রী? তিনি বলেন : তাঁরা দু'জনই আমার প্রিয়। তিনি কাউকে প্রাধান্য দেননি।[৭]

তাঁর শায়খ বা শিক্ষকগণ

সাহাবীদের মধ্যে তিনি কেবল স্বীয় চাচা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তাছাড়া তৎকালীন অন্য 'আলিমদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উরওয়া, 'আব্বাদ ইবন 'আবদিল্লাহ, 'আমর ইবন খুযায়মা, 'আওফ ইবন হারিছ ইবন তুফায়ল, আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান, ইবন মুনকাদির, ওয়াহাব ইবন কায়সান, সালিহ ইবন আবিস সালিহ আস-সাম্মান, 'আবদুল্লাহ ইবন আবী বাকর, 'আবদুর রহমান ইবন সা'দ, মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম (রহ) প্রমুখের নিকট থেকেও হাদীছ শোনেন ও তাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেন।[৮]

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন হলেন : ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-আনসারী, আইউব আস-সাখতিয়ানী, মালিক ইবন আনাস, 'উবায়দুল্লাহ ইবন 'উমার, ইবন জুরায়জ, সুফইয়ান আছ-ছাওরী, লায়ছ ইবন সা'দ, সুফইয়ান ইবন 'উয়ায়না, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আল-কাত্তান, ওয়াকী' ইবন আল-জাররাহ, আবান ইবন ইয়াযীদ আল-'আত্তার, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, ইউনুস ইবন বুকাইর (রহ) প্রমুখ।[৯]

তাঁর মুহতারাম পিতা হযরত 'উরওয়া (রহ) ছিলেন মদীনার বিখ্যাত সাত ফকীহ্‌র অন্যতম। পিতার এ শাস্ত্রের জ্ঞানের একটা বিরাট অংশ তিনি লাভ করেন। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁকে ফকীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[১০]

তিনি যেমন ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী তেমনি ছিলেন 'আমল-আখলাকে উৎকর্ষমণ্ডিত। ইবন হিব্বান তাঁকে একজন বিদ্বান ও খোদাভীরু বলে উল্লেখ করেছেন।[১১]

তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্র মানুষ ছিলেন। মুখ থেকে কখনো কোন অহেতুক কথা বের হতো না। মুনযির ইবন 'আবদিল্লাহ বলেন, আমি হিশামের মুখ থেকে মাত্র একবার ছাড়া

---

৭. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৪৪

৮. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১১/৪৮; তাহ্‌যীব আল-কামাল-১৯/২৬৬

৯. প্রাগুক্ত

১০. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/১৪৪

১১. তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব-১১/৪৯

আর কখনো কোন খারাপ কথা শুনিনি।[১২] অত্যন্ত উদার ও দানশীল ছিলেন। দানশীলতা এত সীমা ছেড়ে যায় যে, এক লাখ দিরহাম ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

বাগদাদ সফর

বিরাট অংকের ঋণ পরিশোধের দুঃশ্চিন্তায় ছিলেন। তাই তিনি এর একটা উপায় বের করার জন্য বাগদাদে আব্বাসীয় খলীফা আবূ জা'ফার আল-মানসূরের নিকট যান। তিনি হৃষ্টচিত্তে স্বাগতম জানান। আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি তাঁর ঋণের বিষয়টি উত্থাপন করেন। খলীফা জানতে চান : ঋণের পরিমাণ কত? বললেন : এক লাখ দিরহাম। মানসূর বললেন, আপনি এত বড় বিদ্বান, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি হয়ে এত মোটা অংকের ঋণ গ্রহণ করেন কেন, যা পরিশোধ করা আপনার সাধ্যের বাইরে? তিনি বললেন : আমার বংশের অনেক ছেলে যুবক হয়েছে। শঙ্কিত হলাম এই ভেবে যে, যদি তাদের বিয়ে না দেয়া হয় তাহলে খারাপ পথে চলে যেতে পারে। তাই আমি আল্লাহ ও আমীরুল মু'মিনীনের উপর ভরসা করে তাদের বিয়ে দিলাম এবং তাদের পক্ষ থেকে ওলীমাও করলাম। এসব ঋণ সেই কারণে। আবূ জা'ফার মানসূর বিস্ময়ের সুরে দু'বার উচ্চারণ করেন : এক লাখ! এক লাখ! তারপর তিনি হিশামকে দশ হাজার দিরহাম দানের নির্দেশ দেন। হিশাম বললেন : আমীরুল মু'মিনীন যা কিছু দিচ্ছেন তা কি সন্তুষ্টচিত্তে নাকি একান্ত বাধ্য হয়ে? আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন : যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে যা কিছু দেয়, তাহলে তাতে দানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি হয়। আল-মানসূর বললেন : সন্তুষ্টচিত্তে দিচ্ছি।[১৩]

ওফাত

হিজরী ১৪৬ অথবা ১৪৭ সনে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনাক্রমে সেই দিন 'আব্বাসীয় খলীফা আল-মানসূরের একজন অতি সম্মানিত ও খ্যাতিমান দাসের মৃত্যু হয়। এ কারণে দু'জনের জানাযা একই সাথে হয়। তবে মানূসর হিশামের মর্যাদার কারণে তাঁর জানাযার নামায প্রথমে পড়ান। তারপর সেই দাসের নামায পড়ান। হিশামের জানাযায় চার তাকবীর এবং দাসের জানাযায় পাঁচ তাকবীর উচ্চারণ করেন। তারপর বলেন, তাঁদের প্রত্যেকে তাকবীরের ব্যাপারে যে যে মত পোষণ করতেন সেই মত অনুযায়ী তাদের জানাযার নামায আদায় করেছি। খলীফা হারূন আর-রশীদের মা খায়যুবানের নামে প্রতিষ্ঠিত কবরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৪] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।[১৫] তবে ইমাম যাহাবী ৮০ বছরের কথা বলেছেন।

---

১২. তারীখু বাগদাদ-১৪/৩৮

১৩. প্রাগুক্ত-১৪/৩৯

১৪. প্রাগুক্ত-১৪/৪১; আত-তাবাকাত-৭/২৭; তাবি'ঈন-৫০৭-৫০৯

১৫. তাহ্যীব আল-কামাল-১৯/২৭০

আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমান (রা)

ডাকনাম আবূ বাকর– এ নামে তিনি এত প্রসিদ্ধি অর্জন করেন যে, আসল নামটি ঢেকে যায়। তাই অনেকে ধারণা করেছেন তাঁর আসল নাম আবূ বাকর। তবে তাঁর আসল নাম মুহাম্মাদ। ইমাম যাহাবী (রহ) তাঁর ডাকনামটি আসল নাম হওয়ার ব্যাপারে যে কথাটি আছে তাই সর্বাধিক সঠিক বলেছেন। তিনি কুরায়শ বংশের মাখযূমী শাখার সন্তান। তাঁর ঊর্ধ্বতন বংশধারা এ রকম : আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমান ইবন আল-হারিছ ইবন হিশাম ইবন আল-মুগীরা আল-কুরাশী আল-মাখযূমী।[১] তাঁর মায়ের নাম ফাখ্তা। মাতৃকূলের ঊর্ধ্বতন বংশধারা নিম্নরূপ : ফাখ্তা বিন্ত 'উতবা ইবন সুহায়ল ইবন 'আমর ইবন 'আবদি শাম্স। হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) খিলাফতের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেন।[২] উটের যুদ্ধের সময় বয়স কম হওয়ায় তালহা ও যুবায়রের (রা) বাহিনী থেকে তাঁকে ও 'উরওয়াকে বাদ দেয়া হয়।[৩]

জ্ঞান ও মনীষা

তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। মদীনা ছিল তখন জ্ঞান চর্চা ও 'আলিম-'উলামার নগরী। তাঁর মধ্যে জ্ঞান অর্জনের প্রতি দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল। এ কারণে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধৈর্যের সাথে জ্ঞান অর্জন করেন এবং মদীনার বিখ্যাত 'আলিমগণের মধ্যে পরিগণিত হন। ইবন সা'দ বলেন :[৪]

كان ثقة فقيها كثير الحديث عالما عاقلا عاليا سخيا.

"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, ফকীহ্, বহু হাদীছের ধারক-বাহক 'আলিম, বুদ্ধিদীপ্ত, উঁচু মর্যাদার অধিকারী ও দানশীল মানুষ।"

ইবন খিরাশ তাঁকে 'আলিমদের ইমাম বলে গণ্য করতেন।[৫]

হাদীছ

তিনি হাদীছের একজন বড় হাফিজ ছিলেন। ইমাম যাহাবী (রহ) বলেন :

كان ثقة حجة فقيها إماما كثير الرواية سخيا.

---

১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৩

২. প্রাগুক্ত

৩. আত-তাবাকাত-৬/১৫৩

৪. প্রাগুক্ত

৫. তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৯৫

"তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, হুজ্জাত (প্রমাণ), ফকীহ্, ইমাম, বহু হাদীছ বর্ণনাকারী ও দানশীল ব্যক্তি।"

একথা আল-ওয়াকিদীও বলেছেন। সাহাবীদের মধ্যে তাঁর পিতা 'আবদুর রহমান, আবূ হুরায়রা, 'আম্মার ইবন ইয়াসির, আবূ মাস'উদ আল-বাদরী, 'আবদুর রহমান ইবন মুতী', উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকা, 'উম্মু সালামা (রা) প্রমুখের নিকট থেকে হাদীছ শোনেন এবং তাঁদের সূত্রে বর্ণনা করেন।[৬]

তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীছের জ্ঞান লাভ করেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনাও করেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর পুত্রগণ যথা : 'আবদুল মালিক, 'উমার, আবদুল্লাহ, সালাম; ভাতিজা আল-কাসিম ইবন মুহাম্মাদ এবং অন্যদের মধ্যে ইমাম যুহ্রী, 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয, হাকাম ইবন 'উতবা, 'আবদুল ওয়াহিদ ইবন আয়মান (রহ) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৭]

ফিক্হ

ফিক্হ বিষয়েও তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। তিনি মদীনার বিখ্যাত সাতজন ফকীহ্র মধ্যে ছিলেন।[৮] আবুয যানাদ বলতেন, মদীনার যে সকল ফকীহ্ ও 'আলিমের মতের ভিত্তিতে বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান দেয়া হতো তাঁরা ছিলেন ছয়জন। তাঁদের একজন আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমান।[৯]

'ইবাদত-বন্দেগী

তাঁর মধ্যে তাকওয়া-পরহেযগারী এবং পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্যের প্রতি একটা নির্লিপ্ত ভাব অত্যন্ত গভীরভাবে ছিল। মদীনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আবিদ ব্যক্তিগণের অন্যতম ছিলেন। দুনিয়া বিরাগী মনোভাব এবং অতিরিক্ত সালাতে নিমগ্ন থাকার কারণে মানুষ তাঁকে "রাহিবু কুরায়শ" (কুরায়শ বংশের সাধু ব্যক্তি) উপাধি দেয়।[১০] ইমাম যাহাবী বলেন :[১১]

كان صالحًا عابدًا متألهًا. – "তিনি ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ, 'আবিদ ও আল্লাহ্ওয়ালা মানুষ।" তিনি একাধারে কয়েক দিন সাওম পালন করতেন। তাঁর ভাই 'আমর ইবন 'আবদির রহমান বলেন, তিনি সাওমের পর সাওম অর্থাৎ ক্রমাগত পালন করতেন। মাঝে রোযা ভাংতেন না।[১২]

---

৬. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৩
৭. প্রাগুক্ত; তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১২/৩০
৮. ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/২৪; তাবি'ঈন-৫২৮
৯. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১২/৩১
১০. আত-তাবাকাত-৬/১৫৩
১১. তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৪
১২. তাহ্যীব আত-তাহ্যীব-১২/৩১

বিশ্বস্ততা বা আমনতদারী

আমানতদারী ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ের প্রতি তিনি এত গুরুত্ব দিতেন যে, কেউ তাঁর নিকট কোন কিছু গচ্ছিত রাখলে এবং তাঁর কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেলে মালিক তা মাফ করে দিলেও তিনি ক্ষতিপূরণসহ পুরো আমানত ফেরত দিতেন। 'উছমান ইবন মুহাম্মাদ বলেন, হযরত 'উরওয়া (রহ) আবূ বাকরের নিকট কিছু সম্পদ আমানত রাখেন। সেই সম্পদের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায়। 'উরওয়া বলে পাঠলেন, এ ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব নেই, তুমি তো একজন আমানতদার মাত্র। আবূ বাকর জবাব দিলেন, আমি জানি যে, আমার উপর কোন ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নেই। তবে এ আমার মনোপুতঃ নয় যে কুরায়শদের মধ্যে তোমার মুখ থেকে একথা বের হোক যে, আমার আমানত নষ্ট হয়ে গেছে। মোটকথা 'উরওয়ার কথা তিনি মানেননি এবং নিজের সম্পদ বিক্রি করে তাঁর আমানত প্রত্যার্পণ করেন।[১৩]

তাঁর চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল দানশীলতা। অল্পতে তুষ্ট থাকতেন। ইবন সা'দ বলেন : وكان مكفوفا ـ – ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ হলে তুষ্ট হয়ে যেতেন।[১৪]

বানূ উমাইয়্যাদের নিকট তাঁর স্থান ও মর্যাদা

বানূ উমাইয়্যা খলীফাগণ তাঁকে এত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন যে, তাঁর কারণে মদীনার অধিবাসীগণ উমাইয়্যাদের বাড়াবাড়ির হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। খলীফা 'আবদুল মালিক বিশেষভাবে তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি বলতেন, বানূ উমাইয়্যাদের সাথে মদীনাবাসীদের আচরণের কারণে তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার ইচ্ছা করি, কিন্তু যখন আবূ বাকর ইবন 'আবদির রহমানের কথা স্মরণ হয় তখন লজ্জিত হই এবং আমার ইচ্ছা ত্যাগ করি। 'আবদুল মালিক তাঁর উত্তরাধিকারী ওয়ালীদ ও সুলায়মানকেও আবূ বাকরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অসীয়াত করে যান।[১৫]

ওফাত

একদিন 'আসর নামায আদায়ের পর গোসলখানায় যান এবং সেখানে পড়ে যান। সাথে সাথে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় : 'আল্লাহর কসম! আমি আজ দিনের শুরুতে কোন নতুন কথা বলিনি।' সেই দিন সূর্যাস্তের পূর্বে ইনতিকাল করেন। ইবন সা'দ বলেন :

مات بالمدينة فى سنة الفقهاء وهى سنة أربع وتسعين.

"তিনি হিজরী ৯৪ সনে, যেটাকে ফকীহদের বছর বলা হয়, মদীনায় মারা যান।[১৬]

---

১৩. আত-তাবাকাত-৬/১৫৪

১৪. প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৪

১৫. আত-তাবাকাত-৬/১৫৪

১৬. প্রাগুক্ত; তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৬৪

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল কারীম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

২. আল-ইমাম আয-যাহাবী

(ক) সিয়ারু আ'লাম আল-নুবালা' (বৈরূত : আল-মুওয়াস্ সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-৭, ১৯৯০)

(খ) তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ (বৈরূত : দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাছ আল-ইসলামী)

(গ) তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম (কায়রো : মাকতাবা আল-কুদসী, ১৩৬৭ হি.)

৩. ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী, শাযারাত আয-যাহাব (বৈরূত : আল-মাকতাব আত-তিজারী)

৪. ইবনুল জাওযী, সিফাতুল সাফওয়া (হায়দ্রাবাদ : দারিয়াতুল মা'আরিফ, ১৩৫৭ হি.)

৫. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা (বৈরূত : দারু সাদির)

৬. ইবন 'আসাকির, আত-তারীখ অল-কাবীর, (শাম : মাতবা'আতুশ শাম, ১৩২৯ হি.)

৭. ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জাম আল-বুলদান (বৈরূত : দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী)

৮. ইবন হাযাম, জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব (মক্কা : দারু আল-মা'আরিফ, ১৯৬২)

৯. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান (মিসর : মাকতাবা আন-নাহদা আল-মিসরিয়্যা, ১৯৪৮)

১০. আল-বালাযুরী :

(ক) আনসাব আল-আশরাফ (মিসর : দার আল-মা'আরিফ)

(খ) ফুতূহ আল-বুলদান (মিসর : মাতবা'আ আল-মাওসূ'আত, ১৯০১)

১১. আয-যিরিক্লী, আল-আ'লাম (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, সংস্করণ-৪, ১৯৭৯)

১২. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যা (বৈরূত)

১৩. ইবন সাল্লাম আল-জাহমী, তাবাকাত ফুহুল আশ-শু'আরা' (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ১৯৮০)

১৪. ইবন কুতায়বা, আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, সংস্করণ-১, ১৯৮১)

১৫. আল-জাহিজ :

(ক) আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন (বৈরূত : দারুল ফিক্র)

(খ) কিতাব আল-হায়ওয়ান

১৬. ইবন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, আত-তুরুক আল-হিকামিয়্যা ফী আস-সিয়াসা (কায়রো : দারুল হাদীছ, সংস্করণ-১, ২০০৩)

১৭. ইমাম আন-নাওয়াবী, তাহ্যীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা)

১৮. ইবন হাজার, তাকরীব আত-তাহ্যীব (বৈরূত : দারুল মা'রিফা)

১৯. ইবন 'আবদি রাব্বিহি আল-আন্দালুসী, আল-'ইকদ আল-ফারীদ (কায়রো : মাতবা'আতু লুজনা আত-তা'লীফ ওয়াত তারজমা, সংস্করণ-৩, ১৯৬৯)

২০. আল-মাস'উদী, মুরূজ আয-যাহাব (বৈরূত : দারুল মা'রিফা)

২১. ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত তারীখ (বৈরূত : দারু সাদির, ১৯৮৬)

২২. ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরূত : মাকতাবাহ্ আল-মা'আরিফ; দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ১৯৮৩)

Contents

২৩. জামাল উদ্দীন ইউসুফ আল-মিয্‌যী, তাহ্‌যীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৪)

২৪. ড. 'আবদুর রহমান আল-বাশা, সাওয়ারুন মিন হায়াত আত-তাবি'ঈন (কায়রো : দারুল আদাব আল-ইসলামী)

২৫. মুহাম্মাদ আল-খাদারী বেক, তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা (মিসর : আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়্যা আল কুবরা, ১৯৬৯)

২৬. মু'ঈন উদ্দীন নাদবী, তাবি'ঈন (ভারত : মাতবা'আ মা'আরিফ, ১৯৬৫)

২৭. 'আবদুল মুন'ইম আল-হাশিমী, 'আসরুত তাবি'ঈন (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, সংস্করণ-৩, ২০০০)

২৮. ড. 'উমার ফাররূখ, তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৫)

২৯. আন-নাওবাখ্‌তী, আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান, কিতাবু ফিরাক আশ-শী'আ (ইস্তাম্বুল, ১৯৩১)

৩০. আল-বুখারী, আত-তারীখ আল-কাবীর (আল-মাকতাবা আশ-শামিলা)

৩১. ড. জাওয়াদ 'আলী, আল-মুফাস্‌সাল ফী তারীখ আল-'আরাব কাবলাল ইসলাম (বৈরূত : দারুল 'ইলম লিল মালায়ান)

৩২. ইবন নাদীম, আল-ফিহ্‌রিস্ত (তাব'আ মিসর)

৩৩. ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, ই'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন, (কায়রো : দারুল হাদীছ, ২০০৪)

৩৪. আদ-দায়নাওয়ারী, আল-আখবার আত-তিওয়াল

৩৫. ইবন কাছীর, আস-সীরাহ্‌ আন-নাবাবিয়্যাহ্‌ (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা

৩৬. ড. হাসান ইবরাহীম, তারীখ আল-ইসলাম (বৈরূত : দারুল আন্দালুস, সংস্করণ-৭, ১৯৬৪)

৩৭. শাহ্‌রাস্তানী, কিতাব আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (১৩১৭ হি.)

৩৮. ইবন হাজার :

(ক) তাহ্‌যীব আত-তাহ্‌যীব (হায়দ্রাবাদ : দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩২৫ হি.)

(খ) মীযান আল-ই'তিদাল (হায়দ্রাবাদ : ১৩৩১ হি.)

৩৯. খতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ (বৈরূত)

৪০. জুরজী যায়দান, তারীখ আত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী, (বৈরূত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৬৭)

৪১. ড. মাহমুদ আল-হাসান, আরবূঁ মেঁ তারীখ নিগারী কি নাশ্‌ ও নামা (জার্নাল : ইসলাম আওর 'আসরে জাদীদ, খণ্ড-১, ১৯৬৯)

৪২. আবূ নু'আইম আল-ইসফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া (বৈরূত : দার আল-কিতাব আল-'আরাবী, সংস্করণ-২, ১৯৬৭)

৪৩. আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী (বৈরূত : 'আলাম আল-কুতুব)

৪৪. ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ, তাবি'ঈদের জীবনকথা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, সংস্করণ-১, খণ্ড-১, ২০০২)

৪৫. দায়িরা-ই মা'আরিফ-ই-ইসলামিয়া (লাহোর)

৪৬. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

৪৭. ইবন কাছীর, মুখতাসার তাফসীরু ইবন কাছীর (বৈরূত : দারুল কুরআন আল-কারীম, ১৯৮১)

৪৮. ইবন মানজূর, লিসান আল-'আরাব বৈরূত : দারু লিসান আল-'আরাব, ১৯৭০)